বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদন-পর্ষৎ

ডঃ অনিমেষকান্তি পাল, অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, নিশিকান্ত মাইতি, ডঃ বিষ্ণু বসু, ডঃ শ্যামাপদ পাল, সুকুমার ভট্টাচার্য সুনীলকুমার ঘোষ॥

প্রকাশকাল

আশ্বিন ১৩৮১, অক্টোবর ১৯৭৪

প্রাপ্তিস্থান

জিজ্ঞাসা

১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

১৩৩ এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯

প্রচ্ছদ

রণেন মুখোপাধ্যায়

দাম

কুড়ি টাকা

গোয়াল কম্পাউণ্ড মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজের পক্ষে উৎপল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং মেদিনীপুর প্রেস মীরবাজার হইতে মুদ্রিত।

বিদ্যাসাগর স্মারক-গ্রন্থ

সূচীপত্র

বিষয়-সূচী

বি দ্যা সা গ র ৭

ভূমিকা

বিদ্যাসাগরের কাল, জীবন ও কর্মকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি নিবন্ধ এই সংকলন-গ্রন্থে গ্রথিত হওয়া সত্ত্বেও "বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ" একান্তভাবে বিদ্যাসাগর-বিষয়ক গ্রন্থ নয়। নামেই গ্রন্থটির পরিচয়; প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ বিদ্যাসাগরের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত পঁয়ত্রিশজন বুদ্ধিজীবি বাঙ্গালীর পঁয়ত্রিশটি নিবন্ধ নিয়ে এই গ্রন্থ। নিবন্ধগুলি বাঙ্গালী ও বাংলাদেশের নানা সাংস্কৃতিক জিজ্ঞাসাকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে। সংকলন-কর্তাদের এই বুদ্ধির প্রশংসা করি। আমার ধারণা, এই ধরণের স্মৃতি-তর্পণে বিদ্যাসাগরের আত্মা তৃপ্তিলাভ করবে। বিদ্যাসাগর আজীবন ব্রতী ছিলেন বাঙ্গালী-মানসের, বাঙ্গালী-চরিত্রের সংস্কার ক্রিয়ায়, তার বোধের উদয় থেকে বুদ্ধির ঐহিক পরিণতি পর্যন্ত, এবং সবটাই বুদ্ধি ও যুক্তির উজ্জ্বল আলোকে। কোনো অলৌকিক শক্তি ও যুক্তির উপর তাঁর কোনো বিশ্বাস ছিল না। এই গ্রন্থের নিবন্ধগুলিও বুদ্ধি ও যুক্তি-নির্ভর, ঐতিহ্য ও ইতিহাসাশ্রয়ী এবং তা' বাঙ্গালী জীবনের. বাঙ্গালীর বহমান সংস্কৃতির কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে। যে-সুতোয় এই নিবন্ধমালা গাঁথা হয়েছে তা' এই সুতোয়; তা নইলে বিষয়ের দিক থেকে আর কোনো যোগসূত্র ঐ মালায় নেই। তা' না থাকুক; তবু, একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, যাঁরা যে বিষয়ে লিখেছেন সেই বিষয়ে তাঁরা অনুরাগী ও অভিজ্ঞ, এবং বাঙ্গালী জীবন ও সংস্কৃতি তাঁদের শ্রদ্ধেয় অনুশীলনের বস্তু।

মেদিনীপুর মফঃস্বল শহর যে-শহর ও শহরবাসী শিক্ষিত জনসাধারণ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান এবং তাঁর স্মৃতিরক্ষা ও পূজায় আগ্রহশীল। "বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ" তাঁদের এই শ্রদ্ধা ও আগ্রহের অন্যতম প্রমাণ। এ-ধরণের সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশনায় অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরাই জানেন, কাজটা সহজ নয়। গ্রন্থের পরিকল্পনা, নিবন্ধ সংগ্রহ, মুদ্রণ প্রকাশন ইত্যাদি ব্যাপারে স্থানীয় বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ যে উদ্যোগ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন তা সাধুবাদযোগ্য।

আমার একান্ত আশা ও বিশ্বাস, এই নিবন্ধমালা বাঙ্গালী বিদ্বজ্জন সমাজে সমাদর লাভ করবে। যে কাজটি এই সূত্রে করা হলো. সন্দেহ নেই, এটি বিদ্যাসাগরের প্রিয় কাজ ; প্রিয় কাজ করাই তো প্রিয়জনের প্রীতি উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ উপায়, আর সেই প্রীতি উৎপাদনই তো শ্রেষ্ঠ পূজা।

কলকাতা

১৯শে এপ্রিল, ১৯৭৪

নীহাররঞ্জন রায়

সম্পাদকীয়

বিদ্যাসাগর স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ করতে বছর তিনেক দেরী হয়েছে। প্রথমত, এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশে স্বাভাবিক দেরী হয়েই থাকে কেননা পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলনগ্রন্থ এটি নয়। দ্বিতীয়ত, দেশ-বিদেশের শতাধিক লেখক নির্বাচিত করে তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম এবং লেখা পাঠাবার একটা তারিখও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সবার কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি। যাঁরা সাড়া দিলেন তাঁরা কেউই নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রচনা পাঠাতে পারেননি। ইচ্ছে ছিল প্রাপ্ত রচনাগুলিকে বিষয় অনুযায়ী সাজিয়ে দেব। কিন্তু তা হল না কারণ তা করতে গেলে আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়। সেজন্যে কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে শেষ পর্যন্ত নিজেদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হয়েছে। যে সময়ে যেভাবে লেখা পেয়েছি সেইভাবে পর পর প্রেসে লেখা দিয়েছি। তৃতীয়ত, মফঃস্বল থেকে ছাপা হয়েছে। টানা কাজ রেখে মরশুমী কাজের প্রতি প্রেসের সর্বাধিক আকর্ষণ থাকে এজন্যেও কিছু বিলম্ব ঘটেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সার্ধশততম জয়ন্তী-উপলক্ষে গতানুগতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন কিংবা ঐ উপলক্ষে সস্তাজাতীয় স্মরণিকা বের না করে বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয়ের এক মূল্যবান স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যিনি যে-বিষয়ে গবেষণা করছেন কিংবা ক'রে কৃতবিদ্য হয়েছেন অথবা ঐ বিষয়ের যিনি যথার্থ অধিকারী তাঁকে দিয়েই প্রবন্ধ লেখানো হয়েছে। সাহিত্য সংস্কৃতির সব দিকের ওপর লেখার জন্য কৃতবিদ্য লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। সব বিষয়ের ওপর লেখা পাওয়া যায়নি — অনেকেই অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন। অনেকের সৌজন্যবোধের অভাব দেখে মর্মাহত হয়েছি তেমনি অনেকেই অযাচিতভাবে লেখা পাঠিয়ে অবাক করে দিয়েছেন। যাঁদের রচনা এই স্মারক-গ্রন্থে প্রকাশিত হল তাঁদের ঋণ শোধ করা যায় না, এখানে ঋণ স্বীকার করে ভারমুক্ত হতে চাই।

বিদ্যাসাগর স্মারক-গ্রন্থে বিদ্যাসাগর সম্পর্ক এমন রচনা দিতে চেষ্টা করেছি যা নিয়ে ইতিপূর্বে কেউই আলোচনা করেন নি। তিনি যে জেলার মানুষ ছিলেন সেই জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ও কয়েকটি প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর মৌলিক গবেষণাধর্মী চিন্তাশীল প্রবন্ধ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের লেখক যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের অমূল্য প্রবন্ধগুলি দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমাদের অকুন্ঠিত চিত্তের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। স্মারক-গ্রন্থে যে পঁয়ত্রিশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে সেগুলি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি—প্রকাশিত রচনা দিয়ে স্মারক গ্রন্থের পৃষ্ঠা ভরাবার পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। প্রথম থেকেই স্থির করেছিলাম যে লেখকদের একমাত্র অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধই স্মারক-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এজন্যে অনেকের মুদ্রিত রচনা ফেরৎ দিয়েছি স্মারক-গ্রন্থে ঐ বিষয়ক প্রবন্ধের অভাব থাকা সত্ত্বেও। গ্রন্থশেষে যে লেখকপরিচিতি দিয়েছি তা প্রধানতঃ লেখকদের প্রদত্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে।

স্মারক-গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধের বিশ্লেষণসূত্রে সংক্ষিপ্তসার তৈরী করা কিংবা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে সম্পাদকীয় ভূমিকাকে অহেতুক রবারের মত বাড়াবার কোন প্রয়োজন দেখিনা। কারণ এই স্মারক-গ্রন্থ পরীক্ষা পাশের পাঠ্যপুস্তক নয় যে

সম্পাদকীয় অংশে পাঠকের মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির ওপর সংশয় প্রকাশ করে অধ্যাপকসুলভ নোট তৈরী করে দিতে হবে।

স্মারক-গ্রন্থের একটি প্রত্যয়বুদ্ধ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। বহু কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও তিনি অসীম স্নেহের সহিত আমাদের অনুরোধ রক্ষা ক'রে মূল্যবান ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আচার্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন শুধু নিজের মূল্যবান প্রবন্ধই দেননি উপরন্তু বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য যথাসময়ে বহু উপদেশ দিয়েছেন, তাঁর এই ঋণ অপরিশোধ্য। বিনা পারিশ্রমিকে প্রচ্ছদ অংকন করে দিয়েছেন শ্রীরণেন মুখোপাধ্যায়, গভীর ভালবাসার সঙ্গে তাঁর করমর্দন করছি। 'মেদিনীপুর প্রেসে'র কর্তৃপক্ষ ও কর্মীরা অনেক উপদ্রব সহ্য করেছেন, আগাগোড়া নতুন টাইপ দিয়ে মুদ্রণকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

সুগভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে তদানীন্তন জেলা শাসক শ্রীবিমলরঞ্জন চক্রবর্তী আই, এ, এস ও জেলা সমাজ-শিক্ষা আধিকারিক শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্যের আনুকূল্যেই স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে পাঁচহাজার টাকা পেয়েছিলাম। তাঁদের আনুকূল্য সানন্দে আজ স্মরণ করি। ইতিমধ্যে কাগজ, বাঁধাই ইত্যাদির দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় ঐ টাকায় স্মারক-গ্রন্থের কাজ শেষ করা সম্ভব হচ্ছিল না। বর্তমান জেলাশাসক শ্রীদীপককুমার ঘোষ আই, এ, এস মহাশয়ের কাছে আবেদন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিনা সুদে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী তহবিল থেকে টাকা ঋণস্বরূপ দেন। তাঁর সহৃদয়তার কাছে আমরা ঋণী। বই বিক্রী করে তাঁর টাকা শোধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এইভাবে সরকারী সাহায্য পাওয়ার ফলেই স্মারক-গ্রন্থের মূল্য যথাসম্ভব কম করে ধার্য করা হল।

নির্ভুল ছাপা বই বের করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমাদের সকলের অধিকাংশ সময়ই জীবিকার্জনে ব্যয়িত হয়, তারই মধ্যে সময় করে সবদিকের কাজ বজায় রাখতে চেষ্টা করি। মুদ্রণ সংশোধনে সর্বাধিক সাহায্য করেছেন শ্রীবীতশোক ভট্টাচার্য। যথোচিত সতর্কতার সঙ্গে প্রুফ দেখা সত্ত্বেও ছাপার ভুল রয়ে গেল। কিছু মারাত্মক মুদ্রণত্রুটি নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে। বাকীগুলো সহৃদয় পাঠকের মার্জনার ভরসাতেই রেখে দেওয়া হল।—

৪৯ পৃষ্ঠার ২২ ছত্রে মন্যমাজঃ স্থলে 'মন্যমানঃ' ৫০/২৩ তুলনাভাবে স্থলে 'তুলনা-ভারে', ৫১/৬ লোকগণের স্থলে 'লেখকগণের', ৫৪/২৮ সাদৃশ স্থলে 'মাদৃশ'।

৭৭/১২ অনিরুদ্ধদের স্থলে 'অনিরুদ্ধদেব', ৭৯/২৮ রত্নৌখচ্ছুরিতা স্থলে 'রত্নৌঘচ্ছুরিতা', ৮১/১০ সাক্ষাৎ স্থলে 'সাক্ষ্য' ৮২/৯ খেলা স্থলে 'লেখা', ৮৩/১৪ জদ্‌গীতকীর্তিপ্রপঞ্চ স্থলে 'জগদ্‌গীতকীর্তিপ্রপঞ্চঃ'।

৮৮/২২ বর্মসেত স্থলে 'বর্মসেতু', ৮৯/৩ পাশুপতশখোর স্থলে 'পাশুপাতশাখার', ৯৭/১০ 'বালক-মূর্তি' স্থলে 'ব্যালক-মূর্তি' ৯৮/২০ পগানে স্থলে 'পগান'।

১০৬/৮ জানিস স্থলে 'জানিল', ১০৯/২ উলিখাছে স্থলে 'উলিয়াছে', ১০৯/৩১ প্রত্যেক স্থলে 'প্রতেক' ১১১/১২ করে নিও স্থলে 'করে নিত্য' ১১৪/১৫ মাদার স্থলে 'উদার' ১১৪/১৭ চম্পরাত্র স্থলে 'চম্পরাএ'।

১৬৪/৭ সর্পদর্শন স্থলে 'সর্পদংশন',।

১৭৪/৭ হালে স্থলে 'হাতে', ১৭৪/১৭ দারী স্থলে 'দাঢ়ি', ১৭৫/১২ পুরুষের অধিক স্থলে 'পুরুষে আধিক'।

২১৮/২৩ Z. A. Tofazell স্থলে 'Z. A. Tofayell'।

৪২২/১৫ জাম স্থলে 'জ'মে'।

৪২৮/৭ 'অবদান অসামান্য' পর 'এ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে গবেষক দলটির সৃষ্টি হয়', ৪৩০/১৪ তাদের বাজার স্থলে 'তাঁতের বাজার' ৪৩৬/১৬ আমার স্থলে 'আমরার', ৪৩৬/১৭ তুমারার স্থলে 'তুমরার', ৪৩৭/২৮ অল কালে দল কালে কালে উরতুর তারা স্থলে 'অল কাপে দল কাপে কাপে উরতুর তারা', ৪৩৮/৫ মুগা স্থলে 'মুগী', ৪৩৮/৯, ধৃষ্টতা স্থলে 'ঘৃষ্টতা' ৪৩৮/১৪ স্থলে ডাইনি 'ডাহ্‌নি', ৪৪১/৩ স্পষ্ট স্থলে 'সৃষ্ট', ৪৪১/৪ কাইনদা স্থলে 'বাইনদা' ৪৪১/২৬ বিকৃতধ্বনি স্থলে 'বিবৃত ধ্বনি' ৪৪২/১২ সংস্কৃত স্থলে 'সংবৃত', ৪৪২/১৩ বিকৃত স্থলে 'বিবৃত', ৪৪৭/২৬ ইস্নুন দ স্থলে 'ইমুন দ', ৪৫১/৯ বা'র বাইর স্থলে 'বা'র বাইত'. ৪৫১/২১ কাস্‌লারা চাসাইরারা স্থলে 'কামরারা চাষাইরারা', ৪৫২/৫ কত আইসে স্থলে 'কত অইসে.' ৪৫২/১৯ কান্তাইলাস স্থলে 'কানডাইলাম', ৪৫২/২৪ জরা স্থলে 'জুরা', ৪৫৩/৭ ঘানু স্থলে 'মানু' ৪৫৪/৮ কলসী স্থলে 'কলমী', ৪৫৪/১৭ সতুন লত স্থলে 'মতুন লত্‌' ৪৫৪/১৮ কাড বাগুন স্থলে কাডা বাগুন। ৪৩৮ পৃষ্ঠার পাদটীকার সংখ্যা ৮ এর স্থলে ৯ হবে এবং সেই অনুযায়ী ৪৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাদটীকার সংখ্যা ১৪-তে গিয়ে শেষ হবে।

৫৫১/২৯ সিরাজীর কন্যা স্থলে 'শিবাজীর কন্যা'।

৫৬৩/৪ ট্যাব স্থলে 'ট্যাবু', ৫৬৩/১৫ পত্রিকায় স্থলে 'পঞ্জিকায়'।

'উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক রচনাটি ছাপা হওয়ার পর লেখক আরও কয়েকটি তথ্য পাঠিয়েছেন যেটি যথাযথ স্থানে সংযোজিত হয়নি, এখানে সেটি উল্লেখ করা হল—আঠারো শতকের মনসা মঙ্গলের কবি জীবন মৈত্র ও জগজ্জীবন ঘোষাল। এঁরা দুজনে যথাক্রমে পাবনা মতান্তরে বগুড়া ও দিনাজপুরের বাসিন্দা এবং রাজশাহী (নাটোরের) বিখ্যাত রাণী ভবানী ও দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের সমকালীন ছিলেন। এঁদের রচনায় বারেন্দ্রী ঐতিহ্য তথা বারেন্দ্রী আবহ অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। অতি আধুনিক কালের প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে পাবনার আব্দুল জব্বার ও তদীয় ভ্রাতা খান সাহেব আবিদ আলীর নামও বাদ পড়েছে। আব্দুল জব্বার তিনখণ্ডে "বিজ্ঞানে মুসলমানের দান" শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। আবিদ আলী সাহেব "কোরানের গল্পগুচ্ছ" "হাদিসের গল্পগুচ্ছ" ইত্যাদি কতিপয় সদ্‌গ্রন্থের রচয়িতা। এঁরা দুজনেই পাক-ভারত বিভাগের পূর্বকালের লেখক। আব্দুল জব্বারের গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন ভাষাচার্য ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আরও একটি কথা। 'পারস্য প্রতিভা' গ্রন্থের লেখক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ রাজশাহী জিলার নন ঘোড়াশাল পাবনার বাসিন্দা।

যাঁকে নিয়ে এই স্মারক-গ্রন্থ তাঁর সম্পর্কে এতক্ষণ কোন কথা বলা হয়নি আর নতুন করে বলারও কিছু নেই। তাঁর দৃপ্ত ভঙ্গিমার ছবি দেখলে, তাঁর বই পড়লে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন বিরামহীন সংগ্রামকাহিনী পড়লে আজকের প্রেক্ষাপটে যে কথাটি আমার বারবার মনে পড়ে সেটি হল— চূড়ান্ত নৈরাশ্যে ভেঙে পড়তে পড়তে সহসা দৃপ্ত হয়ে ওঠার মত স্ফুলিঙ্গ বিদ্যাসাগরের জীবন থেকেই আমরা পেতে পারি। তিনিই আমাদের বুঝতে শিখিয়েছেন ভক্তি থেকে যুক্তি বড়, শাস্ত্র থেকে মানুষ বড়। জীবনের শেষ প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের মাটিতে এসে তাঁর সম্পর্কে যা বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তারই কিয়দংশ আবৃত্তি করে সেই অমিত প্রাণশক্তির অধিকারী তেজস্বী ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে প্রণাম জানাই—

ঃ আজ বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার দিন এল যে, সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীবশক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়। স্বাধীনচেতা তেজস্বী ব্রাহ্মণ যে অসামান্য পৌরুষের সঙ্গে সমাজের বিরুদ্ধ একদা তাঁর সকরুণ হৃদয়ের আঘাতে ঠেলে দিয়ে উপেক্ষা করেছিলেন, অদম্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে জয়ী করেছিলেন আপন শুভ সংকল্পকে, সেই তাঁর উত্তুঙ্গ মহত্ত্বের ইতিহাসকে সাধারণত তাঁর দেশের বহু লোক সসংকোচে নিঃশব্দে অতিক্রম করে থাকেন। একথা ভুলে যান যে, আচারগত অভ্যস্ত মতের পার্থক্য বড়ো কথা নয়, কিন্তু যে দেশে অপরাজেয় নির্ভীক চারিত্রশক্তি সচরাচর দুর্লভ সে দেশে নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের নির্বিচল হিতব্রত পালন সমাজের কাছে মহৎ প্রেরণা। (বিদ্যাসাগর স্মৃতি ঃ বিদ্যাসাগর চরিত)

শাসনে শোষণে, অভাবে অনটনে জীবন সংগ্রামের কঠোরতায় জীবনের অর্থ আজ হারিয়ে যাচ্ছে। অশিব অসুন্দর অকল্যাণ অবিদ্যার পাপ থেকে উত্তরণের জন্য তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার আরতিটুকু অনির্বাণ রেখে তাঁর নাম আমাদের কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণের মতো গ্রথিত হোক, নিভে যাওয়া প্রতিটি জীবনে তাঁর আদর্শ জ্বলে উঠুক এক একটি নক্ষত্রের মতো॥

মীরবাজার, মেদিনীপুর — আজহারউদ্দীন খান্‌

শ্রাবণ ২২, ১৩৮১।

বিদ্যাসাগর স্মারক-গ্রন্থ

প্রবোধচন্দ্র সেন

শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থ থেকে শুধু যে বাংলা বর্ণেরই পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, স্বয়ং রচয়িতার চারিত্রিক বর্ণের পরিচয়ও পাওয়া যায়। মানুষের চারিত্রিক রূপ প্রতিফলিত হয় তার কর্মের মধ্যেই। শুধু যে বৃহৎ কর্মেই মানুষের মহত্ত্ব ধরা পড়ে তা নয়। বরং ক্ষুদ্র কর্মেই মানুষের স্বাভাবিক চিত্তপ্রকৃতি সত্যরূপে প্রকাশ পায়। 'বর্ণপরিচয়' একটি ক্ষুদ্র পুস্তক। তাই এটির মধ্যে বিদ্যাসাগর-চরিতের স্বাভাবিক রূপটি কতখানি প্রকাশ পেয়েছে তা দেখাবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ প্রকাশের তারিখ সংবৎ ১৯১২ বৈশাখ ১ (১৮৫৫ এপ্রিল)। বইটির ষষ্টিতম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সংবতের ১লা পৌষ তারিখে (১৮৭৫ ডিসেম্বর)। মাত্র কুড়ি বৎসরে ষাট সংস্করণ! এই বইটির দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯১২ সংবতের ১লা আষাঢ় (১৮৫৫ জুন) তারিখে। দ্বিষষ্টিতম সংস্করণের তারিখ ১৯২০ সংবৎ। আট বৎসরে বাষট্টি সংস্করণ! এই আশ্চর্য জনপ্রিয়তার দ্বারাই বোঝা যায় এই বইটি আপন বৈশিষ্ট্যে পূর্ববর্তী শিশুপাঠ্য প্রাথমিক পুস্তকগুলিকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই বর্ণপরিচয়ের বৈশিষ্ট্য কি বুঝতে হলে পূর্বগামী শিশুপাঠ্য বইগুলির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

॥ ১ ॥

লঙ সাহেব-কৃত বাংলা গ্রন্থের তালিকায় (A Descriptive Catalogue of Bengali Works by J. Long. 1855) ১ কতকগুলি শিশুপাঠ্য প্রাথমিক পুস্তকের বিবরণ দেওয়া আছে। তার থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বইএর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল। লঙ সাহেব সর্বত্র বাংলা নাম উল্লেখ না করে ইংরেজিতেই বইএর পরিচয় দিয়েছেন। এ স্থলে বাংলা নামগুলি উদ্ধৃতি-চিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট হল। অন্যত্র অনুমিত বাংলা নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি বর্ণনা দেওয়া গেল।

১৮১৬ সালে প্রকাশিত 'লিপিধারা'। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২। এটিতে বাংলা বর্ণগুলি সাজানো ছিল বর্ণের আকৃতি অনুসারে। যেমন, ত্রিকোণ বর্ণগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছিল এক সঙ্গে। বইটিতে মোট ৭৬০টি অযুক্ত ও যুক্তবর্ণের লিপিরূপ দেখানো ছিল। স্পষ্টতঃই প্রথম শিক্ষার্থীকে হাতের লেখা শেখানোই ছিল লেখকের অভিপ্রায়।

লঙ সাহেবের মতে ১৮২০ সালে রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) একটি বানান শিক্ষার বই (spelling book) প্রকাশ করেন। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৫৬। কিন্তু সাহিত্যসাধক-চরিতমালা থেকে জানা যায় রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' প্রকাশিত হয় ১৮২১ সালে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৮৮। এই গ্রন্থে বর্ণমালা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিতাদি নানা বিষয় ছিল। এটি লঙ-কথিত বইটির পরিবর্তিত রূপ কিনা জানি নে।

১৮৩৫ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গবর্ণমালা' পুস্তকটিও (পৃ ২৪, মূল্য এক আনা) প্রাথমিক বানানশিক্ষার বই (spelling book) বলে বর্ণিত হয়েছে। এটিতে কিছু পাঠ্য বিষয়ও (reading lessons) ছিল। রচয়িতার নাম অজ্ঞাত।

তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত বানানশিক্ষার বইটি ছিল অতীব ক্ষুদ্রকায়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩। লঙ সাহেব তার অধিকতর বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করেছেন।

এর থেকে বোঝা যায়, তখনও শিশুদের প্রথম শিক্ষার উপযোগী বই রচিত হয় নি। এ ক্ষেত্রে প্রতিভার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল কবি মদনমোহন তর্কালংকারের (১৮১৭-৫৮) 'শিশুশিক্ষা' পুস্তকে। এই পুস্তক রচনার একটু ইতিহাস আছে। সুবিখ্যাত ভারতবন্ধু ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (বেথুন সাহেব নামে

অধিকতর পরিচিত) ১৮৪৯ সালে কলকাতায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান বেথুন কলেজ তারই পরিণত রূপ। উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক হিসাবে মদনমোহন প্রথমাবধি এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি তার দুই কন্যাকে এই বিদ্যালয়ে ভরতি করিয়ে দেন এবং নিজেও অবৈতনিক শিক্ষকরূপে প্রত্যহ এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে ব্রতী হন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় দান হল 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থ প্রকাশ। এই বইটির দ্বারা শুধু যে বেথুন ইস্কুলের বালিকাদের ভাল পাঠ্য পুস্তকের অভাব ঘুচল তা নয়, এটি দীর্ঘকাল ধরে বালকবালিকা-নির্বিশেষে সমগ্র বাংলাদেশের শিশুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক রূপে গণ্য হয়ে রইল। মদনমোহন শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ বইটি বীটন সাহেবের নামেই উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গপত্রে গ্রন্থরচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে।—

"অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশ ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্রদ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।"

শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগের অল্প কালের মধ্যেই দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের মুখবন্ধে (৭ বৈশাখ ১৯০৬। ইং ১৮৪৯) লেখক বলেন—

"শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগে, কেবল অসংযুক্তবর্ণপরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সংযুক্তবর্ণপরিচয়ের নিমিত্ত, দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলিত হইল।"

এ বইএর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সম্বন্ধে লঙ সাহেবের অভিমত এ স্থলে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। প্রথম ভাগ সম্বন্ধে তিনি বলেন—"*A good elementary work*, containing spelling to three syllables and simple reading lessons." দ্বিতীয় ভাগ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এই।—"Gives short sentences to illustrate compound letters, and *on a very ueful new plan*, a description of the six seasons." (বক্রলিপি বর্তমান লেখকের।)

এরকম একখানি বই যে অচিরকালের মধ্যেই জনপ্রিয় হবে তা বিচিত্র নয়। লঙ সাহেবের বিবরণ থেকে জানা যায়, মাত্র ছয় বৎসরেই শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগের দশটি সংস্করণের প্রয়োজন হয়। দশম সংস্করণের (পৃষ্ঠা ২৭, মূল্য এক আনা) তারিখ ১৮৫৫। দ্বিতীয় ভাগের ষষ্ঠ সংস্করণ (মূল্য এক আনা)

প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালে। পরবর্তী সংস্করণে দ্বিতীয় ভাগের আয়তন ২০ থেকে বাড়িয়ে ২৬ পৃষ্ঠা করা হয়। মনে হয় কোনো কোনো বিষয়ে সংযোজন ও উন্নতিবিধান করা হয়েছিল।

মদনমোহনের শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে। লেখকের অভিপ্রায় জানা যায় এটির মুখবন্ধ (১৬ ভাদ্র ১৭৭২ শক) থেকে। —

"শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বর্ণপরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় ভাগে অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানাবিষয়ক প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত হইল।"

পরের বৎসর প্রকাশিত হয় শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ (১৮৫১ এপ্রিল)। এটি অধিকতর পরিচিত 'বোধোদয়' নামে। রচয়িতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দেখা যাচ্ছে মদনমোহন-পরিকল্পিত শিশুশিক্ষা পুস্তকমালার চতুর্থ পুস্তকটি রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র। এটা কিছুমাত্র অপ্রত্যাশিত নয়। মদনমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সুদীর্ঘ কালের সহাধ্যায়ী (১৮২৯-৪২), সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই দুই বন্ধু সংস্কৃত কলেজেও চার বৎসরের অধিক কাল (১৮৪৬ জুন-১৮৫০ নভেম্বর) সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন এবং ওই সময়েই উভয়ের মিলিত উদ্‌যোগে 'সংস্কৃতযন্ত্র' নামে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৪৭)। তা ছাড়া স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি 'মহৎ কার্যে'ও মদনমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের উৎসাহী সমর্থক। তাই ১৮৫০ সালের শেষভাগে মদনমোহনের কলকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে অন্যত্র যাবার ফলে শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ (নামান্তর 'বোধোদয়') রচনার দায়িত্ব স্বভাবতঃই গ্রহণ করতে হয় তাঁর সহকর্মী বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রকে। এর থেকে অনুমিত হতে পারে যে, শিশুশিক্ষা প্রথম তিন ভাগও ঈশ্বরচন্দ্রের অনুমোদিতই ছিল। তবে কেন তিনি শিশুশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশের ছয় বৎসর পরে, অর্থাৎ প্রথম ভাগের দশ সংস্করণ ও দ্বিতীয় ভাগের ছয় সংস্করণ প্রকাশের পরে, 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশে ব্রতী হলেন? এ প্রশ্নের আলোচনা করার পূর্বে তৎকালে প্রচলিত আর-একখানি বইএর কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

॥ ২ ॥

পাঠশালায় শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা অর্বাচীন নয় মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে (রচনাকাল ১৫৯৪-১৬০৬) 'শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ' বর্ণনা থেকে তৎ-কালীন শিক্ষাব্যবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। শুভক্ষণে 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠানের পরে শ্রীমন্তকে গুরুর পাঠশালায় পাঠানো হল। গুরুকে প্রতি মাসে পঞ্চাশ কাহন কড়ি বেতন দিতে হত। শ্রীমন্ত ধনীর সন্তান, বোধ করি সেজন্য তাকে অন্যদের চেয়ে বেশি বেতন দিতে হত। যা হক, 'শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ' বর্ণনা থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্‌ধৃত করছি। —

পড়য়ে সাধুর বালা প্রথমে আঠার ফলা
ক খ আঙ্ক আস্ক বানান।
গুরুবাক্যে দিয়া কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ
পড়িল শুনিল সুলক্ষণ॥
কাব্যের প্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি
রত্নাবলী সাহিত্য দর্পণে।
নানাশাস্ত্র বিধিমত বিশেষ বলিব কত
প্রসন্নরাঘব রাম শুনে॥
করিতে কবিত্ব খণ্ডি পড়িল বামন দণ্ডি
নানা ছান্দে পড়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগ পড়িল ভারবি মাঘ
বন্ধুজনে বাড়ে কুতূহল॥ ২

নামে বিদ্যারম্ভ হলেও কার্যতঃ সমাপ্তি পর্যন্ত তৎকালীন শিক্ষার একটি সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস দেখা যায় এই বর্ণনাটিতে। এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, তৎকালে একই গুরুর কাছে বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে সংস্কৃত কাব্য, অলংকার, ছন্দ প্রভৃতি নানাশাস্ত্র শেখার ব্যবস্থা ছিল, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এই বর্ণনায় স্মৃতি, দর্শন, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি তৎকালীন শিক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ প্রায় নেই। মনে হয় সাহিত্য-পারদর্শিতাই সেকালে শিক্ষাভিজাত্যের লক্ষণ বলে গণ্য হত, আর এজাতীয় শিক্ষার বর্ণনা সাহিত্যিক প্রথারূপে পরিগণিত হয়েছিল। একটু পরে এরকম আর-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে।

সে যুগে পাঠশালায় শিশুদের বর্ণপরিচয় ও প্রাথমিক শিক্ষা দেবার কি ব্যবস্থা ছিল তাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। শিশুশিক্ষার উপযোগী কোনো পুস্তকের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে কি না আমার জানা নেই। কিন্তু একখানি মুদ্রিত পুস্তক থেকেই তৎকালীন শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা ও শিশুপাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। পুস্তকখানির নাম 'শিশুবোধক'। লঙ সাহেবের তালিকায় এই পুস্তকের (২৩৫-সংখ্যক) যে বিবরণ দেওয়া আছে তা এখানে সমগ্রভাবেই উদ্‌ধৃত করে দিলাম। —

"Shishubodhak, Child's Instructor, 1854, pp. 81, 2 as. This work, *the Lindlay Murray of Bengali,* has passed through several editions, and at various price,—giving letters, multiplication tables, land measure, arjea, praises of the Ganges, and guru, praises of Datakarna, Chanak's slokas, 108 in number, Prahlad Charitra ; on mensuration with the rules in poetic language, directions for letter writing.

The Guru Dakhina describes the fee Krishna gave to his master, and is sung by boys when they go from house to house to beg for donations for their master. The Datakarna shews the hospitality of Karna, the prime minister of Duryodhana, who, in order to feed a Brahmin killed his own son, the Bramhin was Krishna, who in disguise came to try his faith similar to Abraham's trial in Issac's case.

This book has been *for centuries the key of Bengali reading.*" (বক্রলিপি বর্তমান লেখকের।)

ছেলেবেলায় আমার পিতার গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে তাঁর ও আমার কাকার ইস্কুলপাঠ্য কতকগুলি পুস্তকের সন্ধান পেয়েছিলাম। সেগুলির মধ্যে ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের 'বোধোদয়' (১৮৫১) এবং অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' তিন ভাগ (যথাক্রমে ১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯) ও 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬)। আর ছিল এক খণ্ড 'শিশুবোধক'। এগুলি, বিশেষতঃ 'পদার্থবিদ্যা' বইখানি বার বার পড়ে কি আনন্দ পেয়েছিলাম তা এখনও মনে আছে। এই বইগুলি যে কখন কিভাবে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল বলতে পারি নে। অনেক কাল পরে সত্যেন্দ্রনাথের

'ছন্দসরস্বতী' প্রবন্ধে (ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ) শিশুবোধকের একটি উদ্‌ধৃতি পেয়ে বইটির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।[৩] আরও পরে রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' বইটিতে (১৩৭১ ভাদ্র) শিশুবোধকের কোনো কোনো লেখার পরোক্ষ উল্লেখ দেখে বইটি সংগ্রহে উৎসাহী হই। আমার সংগৃহীত পুস্তকটির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এটি পূর্ণচন্দ্র শীল-সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৪৩), প্রকাশক অক্ষয় লাইব্রেরী (৪০ গরাণহাটা স্ট্রীট, কলিকাতা), মূল্য বার আনা। তাতে আছে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তাক্ষর, বানান, নাম ও ঠিকানা সহ পত্রলেখার রীতি প্রভৃতি কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় ; শতকিয়া, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া এবং বাজার ওজন, ভূমির মাপ, দৈর্ঘ্য ও সময় প্রভৃতি হিসাবের তালিকা, অমিশ্র ও মিশ্র গুণের নামতা, এবং মাসমাহিনা, দরকষা, সুদকষা প্রভৃতি নানা হিসাবের আর্যা (formula) প্রভৃতি প্রাথমিক গণিত ; কবিকঙ্কণ চক্রবর্তীর 'গঙ্গার বন্দনা', অযোধ্যারামের 'গুরুদক্ষিণা', দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'দাতাকর্ণ' ও 'কলঙ্কভঞ্জন' এবং কোনো অজ্ঞাত লেখকের 'প্রহ্লাদচরিত্র', এই পাঁচটি ছন্দোবদ্ধ সহজ পাঠ ; এবং পদ্যানুবাদ সহ, এক শো পাঁচটি চাণক্যশ্লোক।[৪] লঙ সাহেবের দেখা শিশুবোধকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮১। আর আমার সংগৃহীত বইটিতে আছে ৮৪ পৃষ্ঠা। কিন্তু তা হলেও ৮১-সংখ্যক পৃষ্ঠার শেষাংশে আছে সমাপ্তিসূচক এই কয় পঙ্‌ক্তি।[৫]

বেলা গেল এস ভাই। পড়া হলো বাড়ী যাই॥
সারি সারি সবে যাব। কোন দিকে নাহি চাব॥
ধীরে ধীরে পায় পায়। শিশুগুলি ঘরে যায়॥
একে একে দু-পা ফেলি। চলে যাই সবে মিলি॥
এক দুই তিন চারি। এস সবে সারি সারি॥
ধীরে ধীরে পায় পায়। শিশুগুলি ঘরে যায়॥

এই রচনাটির পাদটীকায় বলা হয়েছে— "ছুটীর সময় যখন শিশুরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাড়ি যাইবে, তখন পদ্যটী পাঠ করিবে ও ধীরে ধীরে পদনিক্ষেপ-পূর্বক গমন করিবে।" সুতরাং এখানেই যে মূল পুস্তকের সমাপ্তি তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তী তিন পৃষ্ঠায় (৮২-৮৪) আছে চারটি কবিতা : তত্ত্বোপদেশ, মাতৃভক্তি, মিত্র ও প্রভাতবর্ণন। এগুলি যে পরবর্তী যোজনা তাতেও সন্দেহ নেই। 'প্রভাতবর্ণন' কবিতাটি স্পষ্টতঃই মদনমোহনের শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ থেকে সঙ্কলিত।

শিশুবোধক যে মূলতঃ গ্রামের পাঠশালার শিশু ছাত্রদের জন্য অভিপ্রেত এবং এটিতে যে মধ্যযুগের গ্রামবাংলার শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রায় অবিকল প্রতিফলিত হয়েছে তার প্রমাণ আছে বইটির সর্বত্রই। একটি প্রমাণ এই যে, শিশুদের প্রতি সমস্ত উপদেশ-নির্দেশই আছে পদ্যে, গদ্যের প্রয়োগ প্রায় নেই। যেমন পত্র লেখার রীতি। —

পিতা জ্যেষ্ঠ খুড়া আদি সব সমতুল।
জ্যেষ্ঠ মধ্যম আর শ্বশুর মাতুল॥
জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত গুরুজন।
সেবক প্রণাম করি লিখি নিবেদন॥
পরম পূজনীয় বলি দিবে শিরোনাম।
পত্রের নিয়ম এই স্থির করিলাম॥

গণিতের কয়েকটি আর্যার নমুনা এই। —

১। তেরিজ

তেরিজ ধরণ কথা শুন শিশুগণ।
দক্ষিণে কড়ার স্থান করিবে গণন॥ ...
চারি চোকে টাকা হয় তেরিজ লেখা কর।
নরসিংহ রচয়ে তেরিজ অঙ্ক ধর॥

২। জমা ও ওয়াশীল বাকী

জমা ওয়াশীল বাকী শুন শিশু ভাই।
জমা ছোট খরচ-বড় ফাজিল বলে তাই॥

৩। কাঠাকালী

কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে।
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে॥
কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ।
দশ বিশ গণ্ডা হয় কাঠার প্রমাণ॥

৪। মাস মাহিনা

মাস মাহিনা যত দিন তার পড়ে কত॥
তঙ্কা প্রতি দশ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি
বলে গেল ধুল দন্তি॥

৫। টাকার হিসাব মণের প্রতি

মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি অষ্ট গণ্ডা সের প্রতি ধর॥
আনা প্রতি দুই কড়া গণ্ডায় অষ্ট তিল।
শুভঙ্কর দাস কহে এই মত মিল॥

৬। আড়াই সেরের দাম

যত টাকা মণ প্রতি হইবেক দর।
তত আনা আড়াই সের কহে শুভঙ্কর॥

গণিতের এই মধ্যযুগীয় আদর্শ উনবিংশ শতকেও অচল হয়ে যায় নি। এমন কি, বিংশ শতকের প্রথম দিকেও ছাত্রদের কাছে এসব আর্যা অজ্ঞাত বা অশিক্ষণীয় ছিল না। প্রথম ছাত্রজীবনে আমাকেও অনেক আর্যা শিখতে হয়েছিল। বাড়িতে আমার পিতার কাছে শেখা একটি আর্যা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। —

মণের দামের বামে ইলেক মাত্র দিলে।
আধ পোয়ার দাম ভাই নিমেষেতে মিলে॥

এই আর্যা বা 'ফরমুলা অনুসারে এক মণের দাম পাঁচ টাকা হলে আধ পোয়ার দাম হবে এক পয়সা।

প্রসঙ্গক্রমে এসব আর্যার ইতিহাসও সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। সকলেই জানেন যে, ভাস্করাচার্যের "লীলাবতী" প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের সূত্র রচিত হত ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে। মনে হয় পরবর্তী কালে লোক-শিক্ষার প্রয়োজনে এজাতীয় শ্লোক সংস্কৃতের বদলে প্রাকৃত ভাষাতেই রচিত হত। বাংলা আর্যাগুলি এসব সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোকেরই উত্তরকালীন বিবর্তিত প্রাদেশিক রূপ। আরও অনুমান করা যায়, এক কালে এসব শ্লোক প্রধানতঃ প্রাচীন 'আর্যা' ছন্দেই রচিত হত। ফলে বাংলা ছন্দে রচিত সূত্রগুলিও 'আর্যা' নামেই পরিচিত হয়ে গেল। এগুলির উৎপত্তিগত প্রাচীনতার কিছু কিছু নিদর্শন শিশুবোধকে সংকলিত আর্যাগুলিতেও পাওয়া যায়। যেমন— কুড়বা (বিঘা), লিচ্ছে (গ্রহণীয়) ও তঙ্কা। এই আর্যাগুলির বিবর্তন যে মধ্যযুগেও স্তব্ধ হয়ে যায় নি, আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগই তার প্রমাণ। যেমন— তেরিজ (যোগ), জমা, ওয়াশীল, ফাজিল (উদ্‌বৃত্ত)। এসব আর্যা সম্ভবতঃ মুখে মুখেই রচিত ও প্রচলিত হত। কোনোকোনো রচয়িতার নাম জানা যায় আর্যাগুলি থেকেই।

যেমন—শুভঙ্কর দাস ও নরসিংহ। শুভঙ্করই সর্বাধিক খ্যাত। আর্যা রচয়িতারা অনেকেই সম্ভবতঃ ছিলেন পাঠশালার গণিতজ্ঞ শিক্ষাগুরু। এসব গাণিতিক আর্যার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি নে। এরকম সংকলন প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে। শিশুবোধকে আংশিক সংকলন মাত্র দেখা যায়। অযোধ্যা-রাম, কবিচন্দ্র- প্রমুখ শিশুপাঠ্য কবিতা-রচয়িতারাও সম্ভবতঃ অনেকেই ছিলেন পাঠশালার গুরু; যেমন শিশুশিক্ষা-প্রণেতা মদনমোহন ছিলেন বেথুন ইস্কুলের শিক্ষক।

উল্লিখিত বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শিশুবোধক মৌলিক পুস্তক নয়, সংকলন-পুস্তক মাত্র। মনে হয় এরকম আরও অনেক শিশুপাঠ্য সংকলন-পুস্তক বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এগুলির মধ্যে শিশুবোধক হয়তো জনপ্রিয়তায় অগ্রগণ্য ছিল। অন্যান্য সংকলন-পুস্তকের ন্যায় এটিতেও যে বহুকালের প্রচলিত প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাই, 'This book has been for centuries the key of Bengali reading' — লঙ সাহেবের এই মন্তব্যকে এই বিশেষ পুস্তকটি সম্বন্ধে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। তবে এই মন্তব্য যদি উক্ত পুস্তকের প্রণালী সম্বন্ধে অভিপ্রেত হয়ে থাকে তাহলে তা অবশ্য স্বীকার্য। তা ছাড়া শিশুদের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লঙ সাহেবের মন্তব্য অনেকাংশে সত্য। তবে এই বিষয়বস্তু যে শিক্ষার ভাষার মত যুগের প্রয়োজনে কালে কালে কিছু পরিবর্তিত হত, তার প্রমাণও আছে শিশুবোধক পুস্তকেই। যেমন বাংলা বর্ণপরিচয়ের পরেই আছে 'ইংরাজী অক্ষর শিক্ষা', বড় ও ছোট হাতের ছাপার হরফ এবং এক থেকে দশ পর্যন্ত ইংরেজি সংখ্যালিপি (পৃ ৭); বাংলা হাতের লেখার নিদর্শনের পরেই আছে 'ইংরাজী হাতের লেখা', শুধু বড় ও ছোট হাতের বর্ণলিপি (পৃ ২৬); আর বাংলা বার ও মাসের সঙ্গে আছে ইংরেজি বার ও মাসের নাম বাংলা অক্ষরে (পৃ ২৮)। সব নিয়ে দুই পৃষ্ঠার কিছু বেশি। এই ছিটে ফোঁটা ইংরেজি সংযোগ যে লঙ সাহেবের দৃষ্ট সংস্করণের (১৮৫৪) পরবর্তী নয় তা মনে করার প্রথম কারণ এই যে, ইংরেজি অংশটুকু নিয়েও মূল পুস্তকের সমাপ্তি ঘটে ৮১ পৃষ্ঠায়। দ্বিতীয়তঃ, যে পরিমাণে ও যে পদ্ধতিতে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বইটিতে, তাতে দেশে ইংরেজি প্রবর্তনের প্রথম পর্বই সূচিত হয়। লঙ সাহেব জানিয়েছেন ১৮৫৪ সালের পূর্বেও বইটির অনেকগুলি সংস্করণ (several editions) বেরিয়েছিল। মনে হয় এগুলির মধ্যে কোনো প্রাথমিক

সংস্করণে ওই ইংরেজি অংশগুলি যুক্ত হয়েছিল উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। বইটির আর একটি বৈশিষ্ট্য তার পাঁচটি চিত্র— সরস্বতী, গঙ্গাদেবী, সান্দীপনি মুনির পাঠশালা, দাতা কর্ণ বা কর্ণের দানপরীক্ষা, এবং হিরণ্যকশিপুবধ। বস্তুতঃ দ্বিতীয় আখ্যাপত্রে (পৃ ১) বইটি 'সচিত্র শিশুবোধক' নামে অভিহিত হয়েছে। প্রত্যেকটি চিত্র পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী ও পৃষ্ঠাঙ্কসূচিত (যথাক্রমে ২, ৩৬, ৩৯, ৪৮ এবং ৬২)। তা ছাড়া, প্রত্যেক চিত্রের উলটো পৃষ্ঠায় আছে পাঠ্য বিষয়। চিত্রাঙ্কনের উৎকর্ষ বিচারেও বইটিকে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে স্থাপন করতে হয়। লঙ সাহেব সম্ভবতঃ তাঁর বিবরণে এই চিত্রগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক মনে করেছিলেন। সব দিক্ বিবেচনা করে অনুমান হয় উক্ত ইংরেজি অংশ ও চিত্রগুলি বাদে শিশুবোধক বইটি অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশের পাঠশালাগুলিতে সুপ্রচলিত ছিল। লঙ সাহেব এটিকে বহু শতাব্দী যাবৎ শিশুশিক্ষার মুখ্য পুস্তক (for centuries the key to Bengali reading) বলে বর্ণনা করলেও এটিকে অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী মনে করার বিশেষ কারণ দেখা যায় না।

মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কোনো সময়ে সচিত্র শিশু-বোধক প্রকাশিত হবার পরে বিংশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত বইটির বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি, অবশ্য ৮১ পৃষ্ঠায় পুস্তক সমাপ্তির পরে সংযোজিত চারটি কবিতা ছাড়া। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষিত-সমাজে, বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে কি প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটে গেছে তা কারও অজানা নয়। কিন্তু তার পাশেই গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাক্ষেত্রে যে গতিহীন জড়তা দীর্ঘকাল ধরে বিরাজ করছে তা যেমন বিস্ময়কর তেমনই বেদনাদায়ক। বাহ্যজীবনে যত পরিবর্তনই এসে থাকুক, গ্রামবাংলার মনোজীবন যে বিংশ শতকেও অষ্টাদশ শতককে ছাড়িয়ে যায় নি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই শিশুবোধক। বোধ করি এখনও গ্রামের মেলার বাজারে সেই চিরকেলে সর্বজনপাঠ্য পুস্তকখানি অপ্রাপ্য হবে না। আমি তো পেয়েছিলাম ১৯৫১ সালেও। ছেলেবেলায় আমার পিতার ছাত্রজীবনে পঠিত এ পুস্তকখানির সন্ধান পেয়েছিলাম তার সঙ্গে ১৯৫১ সালে সংগৃহীত বইটির ও কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে নি। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লুপ্ত হয়ে গেল, কিন্তু এই সেকালের শিশুবোধক বইটির চিরস্থায়িত্ব হারাবার কোনো লক্ষণ এখনও দেখি নে। মনে হয় অবোধ শিশুর মত শিশুবোধকও যেন একটি চিরন্তন বস্তু, ছেলেভুলানো ছড়া-গুলির সঙ্গে একাসনেই যেন তার স্থান। এই চিরন্তনতার আমিই একমাত্র সাক্ষী নই।

আরও অন্ততঃ দুজন সাক্ষী আছেন— সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। এবার তাঁদের কথাই বলছি।

॥ ৩ ॥

সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রকাশিত হয় ১৩২৫ সালের বৈশাখ-সংখ্যা ভারতী পত্রিকায়। তার 'প্রথম প্রকাশ' নামক বিভাগে এক স্থানে আছে—

"নৌকো আরো এগিয়ে এলে দেখলুম ·· আরোহী একজন মাত্র মেয়ে; তার গলায় কুঁদফুলের মালা, হাতে শ্বেতপদ্ম ··। দেখেই মনে হল, ইনিই গঙ্গাদেবী। যেমন মনে হওয়া অমনি পাঠশালের পোড়োদের মতন সুর করে জোর গলায় বলতে সুরু করলুম—

'বন্দোঁ মাতা সুরধুনী,
পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিতপাবনী পুরাতনী।'

আমি গঙ্গাবন্দনার দ্বিতীয় পদটায় না পৌঁছতেই নৌকো আমার সামনে এসে পড়ল। ·· নৌকোয় পা দিতেই দেবী বললেন, — "তুমি বোধ হয় আমায় মকরবাহিনী গঙ্গা ঠাউরেছ·· আমি গঙ্গা নই, আমি ছন্দসরস্বতী।"[৭]

১৩২৫ সালে এ অংশটুকু দেখেই মনে পড়ে গিয়েছিল শিশুবোধকের 'গঙ্গার বন্দনা' রচনাটির কথা। এই রচনাটির সামনের পৃষ্ঠাতেই আছে মকরবাহিনী গঙ্গার ছবি। গঙ্গার গলায় সরু মালা এবং ডান হাতে পদ্মও আছে। আর উক্ত গঙ্গাবন্দনার প্রথমেই আছে 'বন্দোঁ মাতা সুরধুনী' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি এই—

বিষ্ণুপদে উপাদান,
দ্রবময়ী তব নাম,
সুরাসুর নরের জননী॥[৮]

রচনাটির ভণিতায় আছে— 'গাহিয়া তোমার আগে, গোবিন্দভকতি মাগে, চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণে'। এই কবিকঙ্কণ চক্রবর্তী আর চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম অভিন্ন কিনা বলতে পারি নে। আমি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যেসব সংস্করণ দেখেছি তাতে 'বন্দোঁ মাতা সুরধুনী' ইত্যাদি গঙ্গাবন্দনার সাক্ষাৎ পাই নি। যা হক, 'পাঠশালের পোড়োদের' মুখে সুর করে জোর গলায় আবৃত্তি-করা গঙ্গা-

মকরবাহিনী গঙ্গা

পৃঃ ১২

হিরণ্যকশিপু বধ

পৃঃ ১৩

বন্দনার উল্লেখ থেকে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, পাঠশালার পাঠ্য শিশুবোধকে সংকলিত উক্ত গঙ্গাবন্দনাই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের লক্ষ্য। তা ছাড়া, শিশুবোধকের মকরবাহিনী গঙ্গার পূর্ববর্ণিত চিত্রখানিই যে তাঁর 'মকরাঙ্গী-ডিঙ্গা বাহন' ও 'গাঙ্গিনী-তরণ পদ্ধতি' কল্পনার উৎসস্থল তাতেও বোধ করি সন্দেহ করা চলে না।

রবীন্দ্রনাথও যে অল্পবয়সেই সত্যেন্দ্রনাথের মত শিশুবোধকে সংকলিত রচনাগুলি ও তার চিত্রের পরিচয় পেয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থের (১৩৭৭) অষ্টম পরিচ্ছেদে। তাতে আছে, চণ্ডীমণ্ডপে গুরু মশায়ের পাঠশালায় বর্ণপরিচয় লাভের পরে—

"বই পড়ার কথা প্রথম যা মনে পড়ে সে ষণ্ডামার্ক মুনির পাঠশালার বিষম ব্যাপার নিয়ে, আর হিরণ্যকশিপুর পেট চিরছে নৃসিংহ অবতার, বোধ করি সীসের ফলকে খোদাই-করা তার একখানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে। আর মনে পড়ছে কিছু কিছু চাণক্যের শ্লোক।"

এর থেকে নিঃসন্দেহেই বলা যায়, গুরু মশায়ের ওই পাঠশালাতে অ আ ক খ শেখার অল্প পরেই রবীন্দ্রনাথ এই 'সচিত্র শিশুবোধক' পড়েছিলেন। কেননা, এই বইএরই 'প্রহ্লাদচরিত্র' - নামক শেষ কবিতায় আছে ষণ্ডামার্ক মুনির পাঠ-শালায় পাঠগ্রহণ-কালে শিশু প্রহ্লাদের উপর পিতা হিরণ্যকশিপুর অমানুষিক অত্যাচারের এবং পরিণামে নৃসিংহের হাতে হিরণ্যকশিপুবধের ভয়াবহ বিবরণ। এই বইএ হিরণ্যকশিপুবধের যে ছবিটি আছে তাও রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে। তা ছাড়া, এ বইতেই প্রহ্লাদচরিত্রের পরে আছে ১০৫টি চাণক্যশ্লোক ও তার বাংলা পদ্যানুবাদ। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে, এই সচিত্র শিশুবোধক রবীন্দ্রনাথের প্রথম-পড়া বই বলে অসামান্য গৌরব লাভের এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হবার অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথ যখন শিশুবোধক পড়েছিলেন তখন তাঁর বয়স ছয় বছর ধরে নিলে মানতে হবে যে, ১৮৬৭ সালেও ঠাকুরবাড়ির পাঠশালায় শিশুবোধক পড়ানো হত। কিন্তু প্রায় আশি বছর বয়সে তিনি যখন ছেলেবেলায় প্রথম-পড়া এই বইটির বিবরণ লিখছিলেন তখনও যে এট অদূরবর্তী শ্রীনিকেতনের মেলায় পল্লীশিশুদের জন্য প্রথমশিক্ষার সচিত্র পত্রপুট উন্মুক্ত করে রাখত সে কথা তাঁর জানা ছিল না। সে পত্রপুট দৈন্যজীর্ণ, কিন্তু তাতে চিরন্তন উদারতার আমন্ত্রণ ছিল অবারিত।

দেখা গেল সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে আছে শিশুবোধকের প্রথম

সচিত্র কবিতা গঙ্গাবন্দনার পরোক্ষ উল্লেখ (১৩২৫ বৈশাখ), আর রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' বইতে পাওয়া গেল তার শেষ সচিত্র কবিতা প্রহ্লাদচরিত্রের সুস্পষ্ট বিবরণ (১৩৪৭ ভাদ্র)।

সর্বশেষে শিশুবোধকের দ্বিতীয় কবিতা 'গুরুদক্ষিণা'র একটু পরিচয় দিয়ে এই আশ্চর্য বইটির প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব। সর্বশাস্ত্রে শিক্ষালাভের আশায় কৃষ্ণ-বলরাম গেলেন অবন্তীনগরে সান্দীপনি মুনির পাঠশালায়। সেখানে তাঁরা যা যা শিখলেন তার থেকেই তৎকালীন শিক্ষণীয় বিষয়ের একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়।—

গুরুর চরণে দোঁহে করিল প্রণাম।
হস্তে খড়ি ধরিলেন কৃষ্ণ বলরাম॥
ক খ গ ঘ আদি ছত্রিশ অক্ষর।
দৃষ্টিমাত্র শিখিলেন হরি হলধর॥
ঐক্য অবধি আর ফলা সাঙ্গ করি।
লিখিবারে নাম গ্রাম শিখিল শ্রীহরি॥
অঙ্কশাস্ত্র লিখিয়া করিল সমাপন।
পাঠ আরম্ভিল মুগ্ধবোধ ব্যাকরন॥
অষ্ট শব্দ মূল টীকা পড়ে অভিধান।
টিপ্পনী নৈষধ স্মৃতি বরাহ পুরাণ॥
মীমাংসা বেদান্ত তর্কশাস্ত্র মেঘদূত।
ভট্ট (ভট্টি ?) রঘু বাখানিল জ্যোতিষ অদ্ভুত॥
নাটক নাটিকা ছন্দে মঞ্জরী দীপিকা।
আগম নিগম বেদ বাখানিল টীকা॥

এই বর্ণনার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভের বর্ণনাকে মিলিয়ে নিলে তৎকালীন শিক্ষাদর্শের পূর্ণতর চিত্র পাওয়া যায়। তবে মনে রাখতে হবে উভয় বর্ণনাই অনেকটা প্রথাসিদ্ধ, বাস্তবে এই আদর্শ সম্ভবতঃ খুব কমই অনুসৃত হত। যা হক, দুই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় তখনকার দিনে শিক্ষাক্রমের দুটি সুস্পষ্ট পর্যায়বিভাগ ছিল। এক, পাঠশালায় অতি নিম্ন মানের (অর্থাৎ চিঠিপত্র লিখতে পারার মত) কিছু বাংলা লেখাপড়া ও প্রাত্যহিক প্রয়োজনসাধনের উপযোগী কিছু গণিত শিক্ষা ; আর দুই, চতুষ্পাঠী পর্যায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও অন্যান্য

শাস্ত্র শিক্ষা। এক গুরুই দুই পর্যায়ের শিক্ষাদানে অথবা সর্বশাস্ত্র অধ্যাপিনায় নিরত থাকতেন বলে মনে করা যায় না। বিশেষ লক্ষনীয় বিষয় এই যে, সংস্কৃত শিক্ষার তুলনায় বাংলা শিক্ষার মান ছিল অতি নিম্ন স্তরের, প্রায় নগণ্য। ইংরেজিতে যাকে বলে Three R's তখনকার পাঠশালায় শুধু তাই শেখানো হত। শিশুবোধক এই শিক্ষামানেরই একটি আদর্শ পুস্তক।

নিরপেক্ষ গুণের বিচারে বইটি অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু এটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। তাই এটির আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতার অভিপ্রেত সীমা রক্ষায় বিরত থাকা গেল।

॥ ৪ ॥

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পাঠশালা-জগতে শিশুবোধকের একাধিপত্য অব্যাহত ছিল। অবশেষে মদনমোহনের শিশুশিক্ষা এসে ওই একাধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে মধ্যযুগীয় শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপ্রণালীর অচলায়তনে ভাঙন ধরাতে উদ্যত হল। শিশুবোধকের স্থলাধিকারই যে এটির লক্ষ্য ছিল তার ইঙ্গিত রয়েছে 'শিশুশিক্ষা' নামটির মধ্যেই। এই 'শিশুশিক্ষা' বইটি যেন শিশুশিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে মধ্য-যুগের অন্ধকার থেকে সহসা আধুনিকতার অরুণালোকে নিয়ে এল। এই প্রথম একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি প্রাথমিক শিশুশিক্ষার উপযোগী পুস্তক রচনায় বিচার-শক্তির প্রয়োগ করলেন। তাই এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কি কি বিষয়ে তিনি পরিবর্তন আনলেন তার বিস্তৃত পরিচয় দেবার অবসর আমাদের নেই। এক কথায়, তিনি মধ্যযুগীয় মানসিকতার অর্থাৎ চিরন্তন গতানুগতিকতার স্থলে আনলেন দেশকালপাত্রবিচারে যুক্তিপ্রয়োগের আদর্শ। প্রথার বদলে বিচার, রীতির বদলে নীতি। মদনমোহন প্রথমেই গণিত প্রভৃতি ব্যাবহারিক শিক্ষা থেকে ভাষাশিক্ষাকে স্বাতন্ত্র্য দান করলেন এবং জ্ঞাতব্যক্রমের প্রতি লক্ষ রেখে এই ভাষাশিক্ষাকে নানা পর্যায়ে বিন্যস্ত করলেন, ঠিক যেন শিশুর হাত ধরে তাকে একটি একটি সিঁড়ি পার করে ভাষামন্দিরের দোরগোড়ায় পৌছিয়ে দিলেন। এই ক্রমারোহণের প্রতি লক্ষ রেখেই তিনি শিশুশিক্ষা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ রচনা করেন চতুর্থভাগের রচয়িতা ঈশ্বরচন্দ্র। প্রথম ভাগে আছে স্বরবর্ণ ও অযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ এবং অযুক্তবর্ণের সহজ শব্দ ও সহজ বাক্য পাঠ। এসব বিষয়ের বিন্যাসেও অতি সুকৌশলে ক্রমারোহ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। শিশুর বর্ণপরিচয় যাতে সুনিশ্চিত

হয় তার জন্যে স্বর ও ব্যঞ্জনের স্বাভাবিক ক্রমের পরেই দেওয়া আছে এগুলির বিপর্যস্ত ক্রম এবং বিপর্যয় ঘটানো হয়েছে যথাসম্ভব বর্ণলিপির আকৃতি অনুসারে। যেমন— ব র ক ধ ঝ। এই বিপর্যস্ত ক্রমের উপরে নির্দেশ আছে—'শ্লেট অথবা কাষ্ঠফলকে নিম্নলিখিত ধারা অনুসারে বর্ণপরিচয় করাইবেন।' তার পরে আছে শুধু অকারান্ত বর্ণের শব্দপাঠ। এ ক্ষেত্রেও সুচিন্তিত ক্রমানুসরণের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, প্রথমে কর কর, খল খল ; তার পরে হল-ধর, চল-ঘর ; পদ-তল, শত-দল এবং সর্বশেষে আছে জল-শয়ন, ফল-চয়ন ; শমনভয় দমন হয় ইত্যাদি। দ্বিতীয় পাঠে প্রথমে আকার ইকার প্রভৃতি স্বরবর্ণ সংযোগের বিভিন্ন রূপ দেখিয়ে প্রচুর দৃষ্টান্তযোগে শিশুদের বহু সহজ শব্দ পাঠে আকৃষ্ট করার প্রয়াস দেখা যায়। এই দৃষ্টান্তগুলিরও বহু পর্যায়। যেমন—কাল কাক, ভাল নাক ; দান চায়, মান যায় ; মালা গাঁথি গলে পরি, বাঁশি বাজে গান করি ; পবন বহিছে, ভবন দহিছে। এভাবে সরল শব্দপাঠে অভ্যস্ত করিয়ে শিশুদের নিয়ে যাওয়া হল সরল বাক্য পাঠের পর্যায়ে। এই বাক্যগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এগুলির মধ্যে অর্থগত সংগতি রাখা হয়েছে। এরকম কয়েকটি বাক্য নিয়ে গঠিত হয়েছে এক-একটি অনুচ্ছেদ। প্রত্যেক অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র। ভাষাপাঠের এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে শিশুদের এমন অবলীলায় চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, তাদের মনে কখনও ক্লান্তি বা পাঠের প্রতি বিরাগ দেখা দেবার অবকাশ হয় না, বরং উত্তরোত্তর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বাড়তে থাকে। সর্বশেষে আছে কবিতাপাঠের সূত্রপাত। তাও দুই পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে আছে—

বার মাস সাত বার।
আসে যায় বার বার॥
লেখা পড়া করে যেই।
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই॥

আর সর্বশেষে আছে বাঙালি শিশুজীবনের আদি ঋক্‌মন্ত্র—'পাখী সব করে রব' ইত্যাদি 'প্রভাতবর্ণন' নামক মাত্র বারো পঙ্‌ক্তির বিখ্যাত শিশুকবিতা। এর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এই—

গগনে উঠিল রবি, লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক, পুলকিত মন।
শীতল বাতাস বয়, জুড়ায় শরীর।

পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির ॥

কবিতাটির যত্রতত্র এমনভাবে মিল-ছিটনো আছে যে, আবৃত্তির সময় স্বতঃই শিশুর কানে মধু বর্ষিত হয়। আরও লক্ষ করার বিষয়, প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতেই আট মাত্রার পরে যতিসূচক কমা চিহ্ন আছে যাতে শিশু সহজেই যতিরক্ষা করে কবিতা আবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়। এরকম সুবিবেচনার নিদর্শন আছে এই ক্ষুদ্র পুস্তকটির সর্বত্র।

এই সুবিবেচনা, শৃঙ্খলাবোধ ও ক্রমোন্নয়ন সম্বন্ধে বিশদতর আলোচনার অবকাশ আছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা অপ্রাসঙ্গিক। তবু যে টুকু পরিচয় দেওয়া গেল তা বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল। আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, পাঁচ বৎসর বয়সে 'হাতে খড়ি' হবার পরেই আমার শিক্ষার সূত্রপাত হয় এই অসামান্য পুস্তকটি দিয়ে । পড়িয়েছিলেন আমার স্বর্গতা কাকীমা। কেমন অনায়াসে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই 'কর কর খর খর' থেকে 'আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ' পর্যন্ত পড়া হয়ে গিয়েছিল তা এখনও মনে আছে। শুধু তাই নয়, এই বইয়ের অনেক গদ্য ও পদ্য (বিশেষতঃ পদ্য) পঙ্‌ক্তি চিরকালের মত মনে গাঁথা হয়ে আছে। যথাস্থানে এ প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করা যাবে।

শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ শেষ করার পরেই শুরু হয় আমার পাঠশালা-জীবন। দুঃখের বিষয়, সেখানে এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে আমার শিক্ষার ক্রমরক্ষা করা হয় নি। তার বদলে পড়তে হয়েছিল 'বাল্যশিক্ষা'। পাঠশালায় ভরতি হবার দ্বিতীয় দিনেই 'ব্যাঘ্র' বানান করতে পারি নি বলে গুরু মহাশয় যে আক্রমণ করেছিলেন তাতে তাঁকে বাঘের চেয়েও ভয়ানক মনে হয়েছিল। এখানে বলে রাখা কর্তব্য যে, পরে তাঁর কাছ থেকে যে সস্নেহ ও সযত্ন শিক্ষা লাভ করেছি তার জন্য এখনও তাঁকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে থাকি। কিন্তু 'বাল্যশিক্ষা' নামটা ও 'ব্যাঘ্র' শব্দটা ছাড়া সে বই সম্বন্ধে আর কিছুই মনে নেই। অবশ্য তার সচিত্র মলাটাও মনে আছে। কিন্তু গুণে সে আমার হৃদয় হরণ করতে পারে নি। শুধু শিক্ষার পরীক্ষায় নয়, কালের পরীক্ষাতেও সে বই উত্তীর্ণ হতে পারে নি। কিন্তু শিশুশিক্ষা এখনও টিঁকে আছে। শিশুমনের পরিপোষণের প্রতি যে সযত্ন ও সতর্ক দৃষ্টি রেখে শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ রচিত হয়েছিল, এ বইএর দ্বিতীয় ভাগ [illegible] তা অব্যাহত ছিল। সুতরাং এ প্রসঙ্গের বিস্তার অনাবশ্যক।

॥ ৫ ॥

'বর্ণপরিচয়' প্রকাশ করে ঈশ্বরচন্দ্র 'শিশুশিক্ষা'য় স্বীকৃত নীতি থেকে কোন্ কোন্ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করলেন এবং শিশুশিক্ষার প্রণালীতে কোন্ কোন্ বিষয়ে উন্নতিসাধন ও নূতনত্ব প্রবর্তন করলেন, এখন তা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১), ঋজুপাঠ তিন ভাগ (১৮৫১-৫২) এবং ব্যাকরণকৌমুদী তিন ভাগ (১৮৫৩-৫৪) প্রকাশের পরে বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয় রচনায় হাত দেন। তাই সহজেই বোঝা যায়, পরিণত বিশ্লেষণবুদ্ধি ও পাকা হাত নিয়েই তিনি এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ 'বর্ণপরিচয়'কে বাংলা শিক্ষার উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ব্যাকরণের বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় এই ক্ষুদ্র বইটির প্রতি পৃষ্ঠায়। বইটির 'বিজ্ঞাপন' অংশেই বিদ্যাসাগরের এই চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এটির ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়। তাই এটি এখানে সমগ্রভাবেই উদ্ধৃত হল। —

"বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বহুকাল অবধি বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন, এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায়, দীর্ঘ ঋ কার ও দীর্ঘ ৯ কারের প্রয়োগ নাই, এই নিমিত্ত, ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এজন্য, ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর চন্দ্রবিন্দু, ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে, এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ড, ঢ, য, এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে, ড়, ঢ়, য়, হয়; ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়থাই পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহারা স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হওয়া উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ; এজন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।"

এই কয়েকটি পঙ্ক্তির মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাকরনকারের মননস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ সুস্পষ্ট। বাংলা বর্ণমালার এই সংস্কারসাধন ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে গণ্য হবার যোগ্য। এই বর্ণমালা থেকেই 'শিশুশিক্ষা' থেকে 'বর্ণপরিচয়'-এর পার্থক্য শুরু হয়। শিশুশিক্ষায় ছিল দুই ঋ, দুই ৯ এবং

অং অঃ নিয়ে মোট ষোলটি স্বর এবং ক থেকে ক্ষ পর্যন্ত মোট চৌত্রিশটি ব্যঞ্জন। রামমোহনও তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে' (১৮৩৩) বলেছেন, 'গৌড়ীয়েরা সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে তাঁহাদের অক্ষর সকলকে ৩৪ হলে এবং ১৬ স্বরে বিভক্ত করিয়াছেন' এবং তদনুসারে তিনি নিজেও ক্ষ সহ চৌত্রিশটি হল্ আর অং অঃ সহ ষোলটি স্বর স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তার প্রায় এক শো বছর পূর্বে বৈষ্ণব পদকর্তা নরহরি চক্রবর্তীও তাঁর 'ছন্দঃসমুদ্র' গ্রন্থে 'অকারাদি ক্ষকার পর্যন্ত বর্ণ যত' সেগুলিকে ষোল স্বর (অং অঃ সহ) ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জনে বিভক্ত করেছিলেন। স্বরবর্ণের সংখ্যা সম্বন্ধে তাঁর উক্তি এই।—

অকারাদি ষোড়শেতে পঞ্চ লঘু লেহ।
একাদশ গুরু সংযোগাদি পদান্তেহ॥

দেখা গেল নরহরি ও রামমোহন, উভয়ের মতেই ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন নিয়ে বাংলা অক্ষরের মোট সংখ্যা পঞ্চাশ। মনে হয় তাঁরা এ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রচলিত প্রথাই অনুসরণ করেছিলেন। সুতরাং, বাংলা বর্ণমালা 'বহুকাল অবধি' মোট পঞ্চাশ অক্ষর নিয়ে গঠিত ছিল, বিদ্যাসাগরের এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকতে পারে না। আর এ কথাও বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় যে, নরহরি এবং রামমোহনের ন্যায় বিদ্যাসাগরেরও শিক্ষারম্ভ হয়েছিল ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জনের বর্ণমালার যোগেই। তবে বোধ করি তার পাশাপাশি, বিশেষতঃ পাঠশালা-জগতে, ছত্রিশ ব্যঞ্জন গণনার একটা প্রথাও প্রচলিত ছিল। তাই এ বিষয়ে ছেলেবেলায় আমার মনে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তখনকার দিনে একটি ধাঁধা সুপ্রচলিত ছিল। সেটি এই।

"শুভঙ্করের ফাঁকি—
৩৬ থেকে ৩০০ গেলে কত থাকে বাকি?"

অর্থাৎ ছত্রিশ ব্যঞ্জন থেকে শ, ষ, স, এই তিন শ-কার গেলে কত বাকি থাকে? উত্তর তেত্রিশ। আমার প্রশ্ন ছিল ক থেকে ক্ষ পর্যন্ত তো মোট চৌত্রিশ অক্ষর, ছত্রিশ হবে কেমন করে? গুরুজনদের কাছে উত্তর পেয়েছি অনুস্বার-বিসর্গ নিয়ে ছত্রিশ। আবার প্রশ্ন করেছি অনুস্বার বিসর্গ তো অ আ গুলির সঙ্গে আছে, ক খ গুলির সঙ্গে নয়। সদুত্তর পাই নি। বোধ হয় তা সম্ভবও ছিল না। পরে শিশুবোধকের 'গুরুদক্ষিণা' তালিকায় দেখা গেল—

"ক খ গ ঘ আদি করি ছত্রিশ অক্ষর।

দৃষ্টি মাত্র শিখিলেন হরি হলধর ॥"

শিশুবোধকের বর্ণমালাতেও দেখা গেল ং ঃ এই দুই বর্ণকে ব্যঞ্জন বলে গণ্য করা হয়েছে, যদিও অং অঃ স্বরবর্ণের তালিকায় স্থান পেয়েছে। মনে হয় এক কালে অনুস্বার ও বিসর্গ স্ব-রূপে স্থান পেত ব্যঞ্জনমালায় আর অং অঃ রূপে স্থান পেত স্বরমালায়। শিশুবোধকেও তাই থাকত। শুভঙ্করের ফাঁকিটি যে সেকাল থেকেই অবিকৃতরূপে চলে আসছে তাতে সন্দেহ নেই। নতুবা আধুনিক কালে ৩৬-কে অনায়াসে ৩৪ করে ধাঁধাটির সংস্কার করা যেত। হয়তো অনুস্বার-বিসর্গের এই দ্বিচারিতা লক্ষ করেই মদনমোহন এ দুটির স্বরত্ব মেনে নিয়ে ব্যঞ্জনতালিকা থেকে বাদ দেন। অথবা তিনিও তাঁর ছেলেবেলা থেকে পরিচিত চৌত্রিশ ব্যঞ্জনই মেনে নিয়েছিলেন। যা হক, চৌত্রিশের চিরকালীনতা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের উক্তি সম্পূর্ণ স্বীকৃতিযোগ্য বলে মনে করা যায় না।

ক্ষ যে আসলে একটি যুক্তবর্ণ, এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে রামমোহনের গৌড়ীয় ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়েই। তবু তাঁর ন্যায় সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনচিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি যে চিরাগত প্রথার অনুসরণে ক্ষ-কে অযুক্ত ব্যঞ্জনের তালিকায় স্থান দিলেন, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। আর ক্ষ সহ চৌত্রিশ হল্ এবং অং অঃ সহ ষোল স্বর নিয়ে গঠিত বাংলা বর্ণমালা 'সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে' স্বীকৃত, তাঁর এই অভিমত যে অনবধানতার ফল তাতেও সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগরের মেধাবী সহপাঠী ও অভিজ্ঞ সংস্কৃতবিৎ মদনমোহন যে অনুস্বার-বিসর্গকে স্বর এবং ক্ষ-কে অযুক্ত ব্যঞ্জন বলে গণ্য করলেন, তাতেও চিন্তাহীন গতানুগতিকতাই সূচিত হয়। এ ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরই প্রথম স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিলেন। এই একটি সামান্য বিষয়েও তাঁর প্রতিভার অসামান্যতা প্রকাশ পেয়েছে। চিরাগত প্রথাকে স্বাধীন চিন্তার নিকষে যাচাই করে নেবার প্রবৃত্তিই তাঁর মনোজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শিশুশিক্ষায় ক্ষ নিয়ে মোট চৌত্রিশ ব্যঞ্জন স্বীকৃত ছিল। ফলে এই বই-এর প্রথম ভাগেই নানা স্থানে শিক্ষা, রক্ষা, চক্ষু, ক্ষুধিত প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পক্ষান্তরে এই ভাগে খণ্ড ৎ স্থান পায় নি। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের ষষ্টিতম সংস্করণে (১৮৭৫) খণ্ড ৎ-কে অযুক্ত বর্ণের পর্যায়ভুক্ত করা হয়, কিন্তু অনুস্বার-বিসর্গের ন্যায় স্বতন্ত্র বর্ণ বলে গণ্য করা হয় নি। এ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের বক্তব্য এই।—

"বাঙ্গালা ভাষায় তকারের ত, ৎ, দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে। দ্বিতীয়

কলেবরের নাম খণ্ড তকার। ঈষৎ, জগৎ, মহৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময় খণ্ড তকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ড তকারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার শেষভাগে, তকারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।"

এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে ঈশ্বরচন্দ্রের আরও দুটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। তার থেকে বোঝা যাবে ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও তাঁর চিন্তা কেমন সজাগ ছিল।—

"প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, বালকেরা অ, আ, এই দুই বর্ণকে স্বরের অ, স্বরের আ বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা সেরূপ না বলিয়া, কেবল অ আ এইরূপ বলে, তদ্রূপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।

যে সকল শব্দের অন্ত্য বর্ণে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এইসকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, উহাদের অধিকাংশ হলন্ত, কতকগুলি অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা, হলন্ত—খল, গজ, ঘট, জল, পথ, রস, বন ইত্যাদি; অকারান্ত—ছোট, বড়, ভাল, ঘৃত, তৃণ, মৃগ ইত্যাদি। কিন্তু, অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণ্যের অনুসরণ না করিয়া, তাদৃশ শব্দমাত্রেই অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। বর্ণযোজনার উদাহরণস্থলে যেসকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি অকারান্ত উচ্চারিত হয়, উহাদের পার্শ্বদেশে * এইরূপ চিহ্ন যোজিত হইল। যেসকল শব্দের পার্শ্বদেশে তদ্রূপ চিহ্ন নাই, উহারা হলন্ত উচ্চারিত হইবে।"

এর থেকে বোঝা যাবে, বর্ণপরিচয় প্রকাশের কুড়ি বছর পরেও শিশুশিক্ষার প্রতি তাঁর মনের নিবিষ্টতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। আরও লক্ষণীয় এই যে, বর্ণ ও শব্দের দৃষ্ট রূপের চেয়ে তার উচ্চারিত রূপের প্রতি তাঁর মনোযোগ বেশি বই, কম নয়। এজন্যই 'বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা' বিভাগে ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে বিপর্যস্ত করা হয়েছে যুগপৎ বর্ণের দৃষ্টরূপ স্বরূপ ও শ্রুতরূপের প্রতি লক্ষ করে। যেমন—ল র ক ধ ঝ, ড ড় ঙ ভ, জ য য় ষ ইত্যাদি। মদনমোহনের শিশুশিক্ষার বিপর্যস্ত বর্ণমালায় বর্ণের আকৃতির প্রতি যতখানি মনোযোগ দেখা যায় তার ধ্বনিরূপের প্রতি ততটা নয়। বর্ণপরিচয়ের আপেক্ষিক উৎকর্ষ অর্থাৎ বর্ণ ও শব্দের উচ্চারণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব স্থাপন ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যাকরণ-বিশ্লেষণে অভ্যস্তচিত্ততারই অন্যতম ফল। একটু পরে এ বিষয়ের পুনরুত্থাপন করা যাবে। তার পূর্বে, শিশুশিক্ষার প্রতি কি সতর্ক আগ্রহ ও শিশুচিত্তের প্রতি কি গভীর মমতা নিয়ে তিনি বর্ণপরিচয় রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তার নিদর্শনস্বরূপ এই পুস্তকের

দ্বিতীয় ভাগের 'বিজ্ঞাপন'টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।—

"বালকদিগের সংযুক্তবর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্তবর্ণের উদাহরণ স্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে গুরু, শিষ্য, উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষা বিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।

ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগের শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক। এজন্য, মধ্যে মধ্যে, এক-একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় এরূপ বিষয় লইয়া, ঐসকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়েরা উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য ছাত্রদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন।"

এসব মন্তব্য বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ সম্বন্ধেও অনেকাংশে প্রযোজ্য। প্রধান পার্থক্য প্রথম ভাগের পাঠগুলি উচ্চারণ ও বর্ণযোজনা অনুযায়ী শব্দসংকলনের মাঝে মাঝে স্থাপিত না হয়ে পুস্তকের শেষাংশে একসঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগে সুচিন্তিততর বিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণপরিচয় প্রকাশের পরেও শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগের জনপ্রিয়তা অব্যাহত থাকার অন্যতম কারণ এই বিন্যাসগত উৎকর্ষ। তা ছাড়া আরও কারণ ছিল। সে কথা পরে বলছি। এসব কারণে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও অনেক শিশুরই শিক্ষারম্ভ হত শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ দিয়ে। আমারও যে তাই হয়েছিল তা আগেই বলছি। তবে বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগ যে প্রথম ভাগের চেয়ে বেশি চলত তার প্রমাণ এই যে, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের ষাট সংস্করণ প্রকাশিত হয় কুড়ি বছরে আর দ্বিতীয় ভাগের ষাটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় মাত্র আট বৎসরে। বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের এই বিস্ময়কর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগের তুলনায় এটির উৎকৃষ্টতর স্তরবিন্যাস ও অধিকতর শিক্ষাসৌকর্য। মনে হয় এই প্রতিযোগিতায় শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ একসময় প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ গুণহীন ছিল না, বিশেষতঃ এটির কতকগুলি পাঠের উৎকর্ষ ঈশ্বরচন্দ্রের কাছেও স্বীকৃতিলাভ করেছিল। তাই এগুলি কোনো সময়ে বর্ণপরিচয়ের অঙ্গীভূত হয়ে শিশুশিক্ষার জগতে প্রতিষ্ঠিত রইল। কিন্তু কেন জানি না বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের দ্বিষষ্টিতম

সংস্করণ (১৮৬৩) থেকে ওই স্বীকৃত অংশগুলি বর্জিত হয়। ওই সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' ঈশ্বরচন্দ্র জানিয়েছেন—

"এই সংস্করণে…চারিটি নূতন পাঠ সঙ্কলিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষভাগে, শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্‌ধৃত হইয়াছিল, তাহা নিষ্কাশিত হইয়াছে ।"

বর্ণপরিচয়ের প্রভাবে শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ হীনপ্রভ হল বটে, কিন্তু তার বিলুপ্তি ঘটল না। পক্ষান্তরে শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয়ের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও আপন শক্তিতে স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত রইল। মদনমোহন সম্পর্কে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য আক্ষেপ করে বলেছেন[১০] —

"তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্যদান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিস। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারিত, শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষাই বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া থাকিত না।"

বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কৃষ্ণকমলের এই উক্তির সত্যতা যাচাই করার উপায় প্রায় নেই। কিন্তু প্রাথমিক শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আদর্শই যে একমাত্র আদর্শ নয় তা অবশ্যস্বীকার্য। শিশুশিক্ষা তিন ভাগে, বিশেষতঃ প্রথম ভাগে মদনমোহনের যে প্রতিভা ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছে তা যে অনন্যসাধারণ ও অমূল্য সে বিষয়ে মতপার্থক্যের অবকাশ নেই।

এবার বর্ণপরিচয় ও শিশুশিক্ষার আপেক্ষিক উৎকর্ষের একটু পরিচয় দিতে চেষ্টিত হব।

॥ ৬ ॥

শিশুবোধকের পরিচয়প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, লঙ সাহেব প্রথমেই এই বইটিকে "The Lindlay Murray of Bengali" বলে বর্ণনা করেছেন। এই উক্তির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে Lindlay Murray-প্রণীত Spelling Book অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠার অধিকারী ছিল। সুদীর্ঘকাল এটি ইরেজি শিক্ষার আদর্শ পুস্তক বলে স্বীকৃত ছিল। উনবিংশ শতকে, এমন কি বিংশ শতকের গোড়াতেও এটি ছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান অবলম্বন। আমারও ইংরেজি পড়া

শুরু হয়েছিল এই বই দিয়েই। তখনকার দিনে এটি Murray's Spelling Book অথবা শুধু Spelling Book নামে পরিচিত ছিল। তেমনি 'প্রথম ভাগ' বললে বোঝাত শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ। অন্ততঃ আমাদের কালে তাই দেখেছি। সেকালে বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার বৈতরণী পার হবার দুটি তরণী ছিল, শিশুশিক্ষা ও Murray's Spelling Book। দুটি সোনার তরীও বলা যায়। শিশুশিক্ষার কথা আগেই বলেছি, আর এই Spelling Book-এর ছোট ছোট ধাপের সিঁড়ি বেয়ে কেমন অনায়াসে ইংরেজি পাঠের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত উঠে গিয়েছিলাম তার সানন্দ স্মৃতি আজও অমিলন আছে। বলা বাহুল্য, এ বইএর বানান ও উচ্চারণ অনুযায়ী ক্রমোন্নত পর্যায়ে শব্দগুচ্ছ বিন্যাসের প্রণালী বোঝবার ক্ষমতা সে বয়সে আমার ছিল না। কিন্তু মনের আনন্দপ্রকোষ্ঠে তার স্মৃতি সমুজ্জ্বল থাকায় পরবর্তী কালে সে পুস্তকে সংকলিত শব্দাবলীর সুচিন্তিত, সুরবিন্যাসকৌশলের সার্থকতা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু সেকাল আর নেই, এখন ইংরেজি শিক্ষায় অন্য আদর্শের প্রচলন ঘটেছে। তাই শিশুবয়সের পরে গৌরবভ্রষ্ট Murray's Spelling Book এর আর দেখা পাইনি। তবু যেটুকু মনে আছে তার সাহায্যেই বইখানির একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

প্রবন্ধের আরম্ভেই লঙ সাহেবের তালিকা থেকে যে কয়খানি বানান শিক্ষার বইএর উল্লেখ করেছি, মনে হয় সেগুলি মূলতঃ উক্ত Spelling Book-এর আদর্শেরই আংশিক ও অসার্থক অনুসরণের ফল। কিন্তু মদনমোহনের শিশুশিক্ষায় এই আদর্শের কোনো প্রভাব দেখা যায় না। এটাও তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণপরিচয়ে Murray সাহেবের আদর্শ অনুসরণের লক্ষণ সুস্পষ্ট। ইংরেজি শিক্ষার এই সার্বজনীন বাহনটি যে তৎকালে সুপ্রচলিত ছিল, লঙের তালিকা থেকেই তা বোঝা যায়। এই তালিকা ও বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হয় একই বৎসরে (১৮৫৫)। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে এই ইংরেজি আদর্শ অনুসরণ করা অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। অবশ্য বর্ণপরিচয়ে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণও সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্রের মত ব্যাকরণবিৎ ও ভাষাশিল্পীর পক্ষে তার অন্যথা হওয়াই অপ্রত্যাশিত ছিল। তা ছাড়া, ইংরেজি শিক্ষার আদর্শ বাংলায় অপরিবর্তিতরূপে প্রয়োগ করাও সম্ভব ছিল না। ইংরেজি আদর্শকে যথাযথভাবে বাংলার উপযোগী করে নূতন রূপ দেওয়াতেই ঈশ্বরচন্দ্রের আসল কৃতিত্ব। আর এখানেই নিহিত রয়েছে বর্ণপরিচয়ের অভূতপূর্ব সাফল্য ও

জনপ্রিয়তার কারণ।

মারে সাহেবের বানান শিক্ষার বইএ ইংরেজি শব্দগুলি প্রথমতঃ দলসংখ্যা (সিলেবল্‌সংখ্যা) অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ে সাজানো ছিল। তার পরে বিভিন্ন পর্যায়ের শব্দগুলি আবার বানান ও উচ্চারণ অনুসারে নানা গুচ্ছে ভাগ করা ছিল। যেমন একদল (monosyllabic) শব্দগুলি বিভক্ত ছিল go, no ; do, to ; it, hit ; but, hut ইত্যাদি নানা গুচ্ছে। যেসব শব্দে th-এর উচ্চারণ দ যেমন (than, them, this) সেগুলি ছিল এক গুচ্ছে, আর যেগুলিতে th-এর উচ্চারণ থ যেমন (thank, theme, thin) সেগুলি ছিল অন্য গুচ্ছে। এভাবে দ্বিদল ত্রিদল থেকে বহুদল (polysyllabic) শব্দগুলি আশ্চর্য সূক্ষ্মতা ও দক্ষতা সহকারে বহু বিচিত্র গুচ্ছে সাজানো ছিল। আর শব্দের দলগুলি নির্দিষ্ট করা ছিল বিভাজক-চিহ্নযোগে। তদুপরি প্রস্বরিত (stressed) দলগুলি সূচিত ছিল রেফ চিহ্নের দ্বারা —যেমন po´-si-tive, po-si´-tion। প্রত্যেক গুচ্ছের শিরোভাগে লেখা ছিল তার বৈশিষ্ট্যের পরিচয়। যতদূর মনে পড়ে সর্ব্বশেষ গুচ্ছে ছিল কতগুলি বহুদল শব্দ আর সে গুচ্ছ সমাপ্ত হয়েছিল va-le-tu-di-nar-i-an এই সপ্তদল শব্দটি দিয়ে।

এবার বর্ণপরিচয়ের বিন্যাসপ্রণালীর প্রতি লক্ষ করা যাক। স্বর ও ব্যঞ্জনের পরিচয়ের পরেই আছে 'বর্ণযোজনা'। তার প্রথমে আছে আকার-ইকারাদিবর্জিত সরল শব্দপাঠ ; তাও আবার ছয়টি উপবিভাগে বিভক্ত.—যেমন অজ, আম ; কই খই ; কর, খল ; অচল, অধম ; লইব, হইল ; কপট, গগন। তার পরে দশটি বিভাগে আছে আকারাদিক্রমে স্বরবর্ণযোগের দৃষ্টান্ত। এগুলির পরে আছে যথাক্রমে দুই, তিন, চার ও পাঁচ অক্ষরের মিশ্র উদাহরণ, —যেমন বেণু, মেধাবী, বিবেচনা পারিতোষিক। মারে সাহেবের বইএ শব্দের দলসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে বর্ণপরিচয়ের এই ক্রমিক অক্ষরবৃদ্ধির সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তারপরে আছে অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু যোগের পরিচয়। তারও পরে উ ঊ ঋ যোগের বিশেষ রূপ—যেমন গুণ, রুচি, শুচি, বহু, রূপ, হৃত। অতঃপর বাক্যপাঠের কুড়ি অধ্যায়। তারও ক্রমবৃদ্ধি এত সুচিন্তিত যে ভাবলে অবাক হতে হয়। 'বড় গাছ, হাত ধর, জল পড়ে,' দিয়ে যার আরম্ভ তার সমাপ্তি ঘটেছে নিম্নোক্ত প্রকারের দীর্ঘ বাক্য দিয়ে।—

"ছুটী হইলে, বাড়ীতে গিয়া, রাখাল পড়িবার বই কোথায় ফেলে, কিছুই ঠিকানা থাকে না। কোনও দিন, পাঠশালায় ফেলিয়া আইসে ; কোনও দিন, পথে হারাইয়া আইসে।"

শিশুদের পড়ার ও অর্থবোধের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বাক্যগুলিকে কিভাবে যতিচিহ্নযোগে বিভিন্ন বাক্পর্বে ভাগ করে দেখানো হয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শিশুমনের প্রতি এই সযত্ন লক্ষ বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের ন্যায় দ্বিতীয় ভাগেও সর্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান। এই ভাগে প্রথম কয়েকটি পাঠের পূর্বে য, র, ল, ব, ণ, ন, ম এই সাতটি ফলা ও রেফ সংযোগ শেখানো হয়েছে অতি সতর্কতার সঙ্গে। এই সংযোগের ফলে বিভিন্ন অক্ষর যে বিচিত্ররূপ ধারণ করে তাও দেখানো হয়েছে বর্ণপরম্পরাক্রমে। এখানে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। যেমন —স য স্য, ক র ক্র, ষ ণ ষ্ণ, হ ণ হ্ণ, হ ন হ্ন, হ ম হ্ম। তার পরে আছে যথাক্রমে দুই, তিন ও চার অক্ষরের মিশ্র সংযোগের দৃষ্টান্ত। এখানেও অক্ষরের রূপবিকার বর্ণানুক্রমিকভাবেই দেখানো হচ্ছে। যেমন—ক ত ক্ত, ক ষ ক্ষ, স থ স্থ, ন ধ য ন্ধ্য, র ব ধ ব র্দ্ধ।

বলা বাহুল্য দ্বিতীয় ভাগে মারের বইএর মত ক্রমোন্নত পর্যায়পদ্ধতি অনুসৃত হলেও অধিক অনুসরণের উপায় নাই। কেননা ইংরেজীতে যুক্তাক্ষর নেই। বরং যে একটি ক্ষেত্রে সে আদর্শ অনুসরণের অবকাশ ছিল সেটি উপেক্ষিত হয়েছে। ইংরেজির ন্যায় বাংলাতেও উচ্চারণ বিকার ঘটে। বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে তা দেখালেই নবশিক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচার করা হত। যেমন—ত্ব প্রভৃতি ব-ফলাযুক্ত সব বর্ণ, হ্য, হ্ন, হ্ম, ক্ষ, জ্ঞ, প্রভৃতি যুক্তবর্ণের উচ্চারণবিকার বাংলাভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া বাংলায় অবস্থানবিশেষেও যুক্তাক্ষরের উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটে। যেমন—ত্বরা ও রাজত্ব, ক্ষার ও রক্ষা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। অন্যবিধ উচ্চারণ-পার্থক্যও বিরল নয়। যেমন উদ্যম কিন্তু উদ্‌যাপন, উদ্‌যোগ (উদ্যাপন, উদ্যোগ নয়), তেমনি বিদ্বান্, কিন্তু উদ্‌বেগ, উদ্‌বেল, ঋগ্‌বেদ (উদ্বেগ, উদ্বেল, ঋগ্বেদ নয়), বিস্ময় শ্মশান, কিন্তু কাশ্‌মীর (যদিও লিখিতরূপে কাশ্মীর)। জন্ম, পদ্ম প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্যও শিক্ষণীয়। বর্ণপরিচয়ে যুক্তাক্ষরের রূপবিকারের প্রতিই লক্ষ রাখা হয়েছে, উচ্চারণ-বিকারের প্রতি নয়। এটা এ বইএর একটি দুর্বলতা। যা হক, চাক্ষুষ পরিচয়ের বিচারে বর্ণপরিচয়ের সমকক্ষ কোনো বই আগেও ছিলনা, এখনও নেই। সুতরাং এই বইএর জনপ্রিয়তাও যে সমস্ত পূর্বাকাষ্ঠা ছাড়িয়ে গিয়েছিল তা বিচিত্র নয়।

আমরা দেখেছি মুকুন্দরামের পূর্বকাল থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা শিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা বিধৃত হয়েছিল শিশুবোধক বইটিতে। সে শিক্ষার মান যতই নিচু হক না তাতে সামগ্রিকভাবে একটি জাতীয়তার রূপ ছিল।

এই সর্বজনীনতার প্রতি লক্ষ রেখেই লঙ সাহেব এই বইটিকে 'the Lindlay Murray of Bengali' বলে বর্ণনা করেছিলেন, তাতে অনুসৃত পদ্ধতির জন্য নয়। এটির একাধিপত্য তথা পদ্ধতির প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা দিল মদনমোহনের শিশুশিক্ষা। আর তারই পরিণতি ঘটে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ে। শেষ পর্যন্ত এই বর্ণপরিচয় শিশুবোধককে মর্যাদাচ্যুত করে বিষয়বিন্যাস তথা সর্বজনীনতা, এই উভয় দিক্ থেকেই 'the Lindlay Murray of Bengali' বলে অভিহিত* হবার যথার্থ অধিকার লাভ করল।

॥ ৭ ॥

শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টাও একটু বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। পথপ্রদর্শনের কৃতিত্ব শিশুশিক্ষারই। অযুক্ত ও যুক্ত বর্ণের জন্য দুই খণ্ড পুস্তক রচনার আদর্শ, বিপর্যস্ত বর্ণমালার যোগে বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার ব্যবস্থা, ক্রমোন্নত স্তরবিন্যাসে শব্দ ও বাক্যপাঠের বিধান এবং পাঠ্যবিষয় নির্বাচন, এসব বিষয়ে শিশুশিক্ষাই পথিকৃৎ ও অগ্রণী। কিন্তু বর্ণপরিচয় পরে এসেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই সূক্ষ্মতর বিচারবিশ্লেষণ ও নিপুণতর বিষয়বিন্যাসের দ্বারা শিশুশিক্ষাকে পিছনে ফেলে অনেক এগিয়ে গেল। দুঃখের বিষয় কলকাতার বাইরে কর্মান্তর গ্রহণ ও অকালমৃত্যু (১৮৫৮), এই দুই কারণে মদনমোহন বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কারসাধনের দ্বারা শিশুশিক্ষাকে বর্ণপরিচয়ের সমস্তরে উন্নীত করবার অবকাশ পান নি। নতুবা তিনি যে সে বিষয়ে বিরত থাকতেন না তাতে সন্দেহ নেই। কেননা দুই বন্ধুর চিন্তা ও আদর্শে সমতার অভাব ছিল না। আবার দেখতে পাই শিশুশিক্ষায় তথা শিশুবোধকে বিদ্যাসাগরকৃত বর্ণমালাসংস্কারের কিছু প্রভাব পড়েছে। যেমন, ব্যঞ্জনমালায় ক্ষ বর্জন এবং ড় ঢ় ৎ ং ঃ গ্রহণ। এই সংস্কার যে মদনমোহনের মৃত্যুর পরে অন্য কারও কৃত, তাতে সন্দেহ নেই। অথচ স্বরমালায় দীর্ঘ ঋ, দীর্ঘ ৯, অং, অঃ এবং অযুক্ত বর্ণের বাক্যপাঠে যুক্ত শব্দ (যেমন—শিক্ষা, রক্ষা, চক্ষু) পূর্ববৎ যথাস্থানে বহাল আছে। মদন-মোহনের মত মনস্বী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ আংশিক সংস্কার বিশ্বাসযোগ্য নয়। আংশিক গ্রহণবর্জনের সামান্য কাজটুকু মদনমোহনের মৃত্যুর পরে অন্য কেউ করে-ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। শিশুবোধকের পরবর্তী সংস্করণে ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায়

ড় ঢ় ২ ং ঃ গৃহীত হলেও ক্ষ বর্জিত হয় নি, চিরন্তন অধিকারবলে হ-এর পরে ক্ষ তার নির্দিষ্ট আসনে সমাসীন আছে।

মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের চিন্তা ও আদর্শগত সমতার সবচেয়ে বেশি পরিচয় পাওয়া যায় শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়ের পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে। এই সমতা ছিল বলেই ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর 'বোধোদয়' বইটি রচনা করেছিলেন শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ হিসাবে এবং শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগের কয়েকটি পাঠ বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। এই সমতার স্বরূপ কি, তা জানা যায় মদনমোহন-রচিত শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগের (১৮৫০/শক ১৭৭২ ভাদ্র) 'মুখবন্ধ' থেকে।—

"শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বর্ণপরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় ভাগে অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানাবিষয়ক প্রস্তাব -সকল সঙ্কলিত হইল৷

কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ চিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত হংসীর স্বর্ণডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস-নিমন্ত্রণ,··· পুরস্কারলোভে বককর্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া কাকের স্বীয় মধুর স্বরের পরিচয় দান প্রভৃতি অসম্বদ্ধ অবাস্তবিক বিষয়-সকল প্রস্তাবিত না করিয়া সুসম্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান-সকল সম্বদ্ধ করা গেল।"

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। শিশুদের উন্মেষোন্মুখ মনকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও দুর্নীতিহীন জাগতিক ও ব্যাবহারিক জ্ঞানে পুষ্ট করা ও তাদের কাছে চারিত্রিক আদর্শস্থাপন, এই ছিল মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র উভয়েরই লক্ষ্য। শুধু জ্ঞানদান নয়, চরিত্রদানও ছিল উভয়ের অভিপ্রেত। তাঁদের রচিত শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলির যে-কোনো একটি পাঠের প্রতি একটু দৃষ্টি দিলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে।

কিন্তু একটি বিষয়ে মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান। মদনমোহন ছিলেন পাকা ছন্দশিল্পী, আর ঈশ্বরচন্দ্র পাকা গদ্যশিল্পী। ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্যশিল্পের কথা সুবিদিত, মদনমোহনের ছন্দোনৈপুণ্যের কথা খুবই স্বল্পবিদিত। মদনমোহন দুখানিমাত্র কবিতার বই লিখেছিলেন, তাও অতি অল্প বয়সে। মাত্র সতর বৎসর বয়সে রচিত তাঁর 'রসতরঙ্গিণী' গ্রন্থেই (১৮৩৪) 'পয়ারাদি নানা ছন্দোবন্ধে'র প্রতি আসক্তি দেখা যায়, আর উনিশ বৎসর বয়সে রচিত তাঁর 'বাসবদত্তা'

কাব্যগ্রন্থটি (১৮৩৬) বিশেষভাবে স্মরণীয় তার ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য। দুঃখের বিষয় পরবর্তী কালে তিনি আর কবিতা রচনায় হাত দেন নি। যদি তিনি কবিতা রচনায় নিবৃত্ত না হতেন তবে তৎকালে ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-৫৯) অদ্বিতীয় কবি বলে গণ্য হতে পারতেন কিনা সন্দেহ।[১১] যা হক, তবু দেখা যায় শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনাকালেও তাঁর ছন্দপ্রীতির অভাব ঘটে নি। শিশুশিক্ষা তিন ভাগেই তিনি গদ্যের পাশে পদ্যকেও সমমর্যাদায় স্থাপন করেছিলেন। বোধ করি তিনিই এ রীতির প্রবর্তক। তা ছাড়া, এই শিশুপাঠ্য কবিতাগুলিতেও যাতে ছন্দোবৈচিত্র্যের অভাব না ঘটে সে দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। সব চেয়ে বড় কথা তিনি বর্ণপরিচয়ের পরে শিশুর প্রথম পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন পদ্য দিয়েই, গদ্য দিয়ে নয়। মায়ের মুখে ছড়া শুনে যে শিশুর জ্ঞানের আরম্ভ তার পড়ার আরম্ভও হবে ছোট ছোট ছড়াজাতীয় রচনা দিয়ে, এটাই শোভন ও সংগত। এই ছোট ছোট রচনাগুলির ছন্দোবৈচিত্র্যও উপেক্ষণীয় নয়। তাই লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁর 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থে (১৮৬২) চণ্ডীদাস থেকে মধুসূদন পর্যন্ত কবিদের রচনা থেকে ছন্দের দৃষ্টান্ত সংকলন-কালে মদনমোহনের 'বাসবদত্তা'র ন্যায় তাঁর 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ভাগ থেকেও ছন্দোরূপের উদাহরণসংগ্রহে দ্বিধাবোধ করেন নি। শিশুচিত্তের পক্ষে ছন্দের চেয়ে মিলের আকর্ষণ-শক্তি যে কম নয়, মদনমোহন সে বিষয়েও সমভাবে সচেতন ছিলেন। তাই দেখি শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগে ছন্দোবৈচিত্র্যের সঙ্গে মিলের অজস্রতাও সমন্বিত হয়েছে। অথচ ছন্দ ও মিলের-প্রাচুর্য রক্ষা করতে গিয়ে অকারাদি স্বরবর্ণযোজনার পর্যায়ক্রমও উপেক্ষিত হয় নি। শিশুশিক্ষার এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বোধ করি এখনও অদ্বিতীয় না হলেও অনতিক্রান্ত রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের কিছু দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে অন্য প্রসঙ্গে। এখানে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

ঝড় বয় বড় ভয়।
যত কয় তত নয়।
পাত পাড় ভাত বাড়।
শিখি নাই লিখি তাই।
শীত পায় গীত গায়।
খুদ খায় সুদ চায়।
কৃশ কায় বৃষ ধায়।
দেশে চল শেষে বল।

কোথা রাখি   তোতা পাখী।
খৈ খাই   দৈ চাই।

এই দৃষ্টান্তগুলির প্রতি পর্বে আছে চার মাত্রা, প্রতি উপপর্বে দুই। তা ছাড়া এগুলির সর্বাঙ্গীণ মিলও লক্ষণীয়।

দুই-তিন মাত্রার উপপর্ব-যোগে পঞ্চমাত্রক পর্ব। যথা।—

কর যতন ধর রতন।
জল-শয়ন ফল-চয়ন।

তিন-দুই মাত্রার পঞ্চমাত্রক পর্ব। যথা—

শমন-ঘরে গমন করে।
কৈল কাজ শৈল-রাজ।
গৌর-কায় চৌর ধায়।
অংশ করে বংশ মাঝ।
হংস ধরে কংস-রাজ॥
দুঃসাহসে দুঃখ হয়
দুঃশীলের নিঃসংশয়॥

আমার এখনও মনে আছে 'নিঃসংশয়' কথাটা আমি ঠিকমত বলতে পারতাম না, বারবারই আমার মুখে আসত 'নিসংশয়'। কাকিমা বারবার সংশোধন করে আমাকে 'নিঃসংশয়' বলতে শিখিয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারছি দোষ আমার নয়, দোষ ওই বিসর্গটারই। শুধু ছন্দপতন নয়, আমারও পতন ঘটাত ওই দুঃশীল চিহ্নটাই।

ছয় মাত্রার পর্ব। যথা—

কোকিল ডাকিল অখিল হাসিল।
ভাল কৈরব কাল-ভৈরব।
কৌরব যত গৌরব-হত।

মিলের সুচিন্তিত ও সার্বত্রিক প্রয়োগের দ্বারা উপপর্বগুলিকে প্রকট করে কিভাবে যথাযথ আবৃত্তির সহায়তা করা হয়েছে তা লক্ষণীয়। এসব লাইন শিশুর রসনায় যেন আপনি গড়িয়ে চলে। সুদূর বাল্যকালে এসব মিলের ঝংকার ও ছন্দের বিচিত্র দোলা কাকিমার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে অস্বাদিতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার করেছিল তার মায়া আজও মন থেকে মুছে যায় নি। সে মায়া ছিল বস্তুভারহীন, ধ্বনিরসমুগ্ধ চিত্তে কথার অর্থগ্রহণে কোনো ঔৎসুক্য দেখা দেয়

নি, আবছায়া ভাবের আভাসেই মন তৃপ্ত থাকত। প্রথম শিক্ষায় এটাই বোধ করি স্বাভাবিক ও সংগত। কিন্তু অর্থসংগতিহীন কথায় মিলের অতিলালিত্য ও ঘন ঘন ছন্দদোলার আতিশয্য শিশুর মনোবিকাশের সহায়ক নয়, মদনমোহন এ বিষয়েও সচেতন ছিলেন। তাই তিনি দীর্ঘতর পঙ্‌ক্তিতে মিল ও দ্রুততালের বিরলতা ঘটিয়ে শিশুচিত্তকে ক্রমে ক্রমে অর্থগ্রহণে অভ্যস্ত করাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। যেমন—

মালা গাঁথি গলে পরি।
বাঁশি বাজে গান করি॥
পুথি পড় পাঠ বল।
বেলা নাই বাড়ী চল॥
লেখাপড়া যেই জানে
সব লোক তারে মানে॥

তার পরেই আসে পয়ার। তাই পরবর্তী 'প্রভাতবর্ণন' কবিতায় শিশুকে সরল পয়ারের স্তরে উত্তীর্ণ করিয়ে দিয়েই শিশুশিক্ষার সমাপ্তি ঘটল। উদ্‌ধৃতি সহ এই রচনাটির পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পূর্বে বলেছি আমার শিক্ষারম্ভ হয়েছিল এই শিশুশিক্ষা দিয়ে। শুধু তাই নয়, আমার ছন্দবোধের উন্মেষও ঘটেছিল এই বই পড়েই। এই উপলক্ষে আমার জীবনের আদি ছন্দোগুরু মদনমোহনের উদ্দেশে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

কবিতা ও ছন্দের প্রসঙ্গটা কিছু দীর্ঘ হল। এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অনুরাগই তার আসল কারণ নয়। আরও নিগূঢ় কারণ আছে। ঈশ্বরচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের চাক্ষুষ রূপের যোগে শিশুর বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত ও জ্ঞানকে প্রবুদ্ধ করা, ভাষার ধ্বনিরূপ ছিল গৌণ কিংবা উপেক্ষিত। তাই তাঁর শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলিতে ছন্দোবদ্ধ পদ্যরচনা স্থান পায় নি। কিন্তু ভাষা তো স্বরূপতঃ চাক্ষুষ বস্তু নয়। ভাষা স্বরূপতঃ ধ্বনিময়, কণ্ঠ এবং কানই তার আশ্রয়। ভাষার লিখিত রূপ আসলে ধ্বনিময় ভাষার প্রতীক মাত্র। সে জগতেও আমরা প্রবেশ করি আসলে কানের পথেই, যদিও অনেক সময় চোখের পথেই প্রবেশ করলাম বলে ধারণা হয়। কিন্তু সে ধারণা মায়ার ছলনা মাত্র। মদনমোহন এ সত্যটা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁকে ভাষার ধ্বনিরূপের 'সৌন্দর্যে ভুলায়ে' শিশুর হৃদয়

হরণ করে তাকে জ্ঞানের লিখিত রূপের মায়াময় প্রতীকজগতে উপনীত করার উপায় উদ্‌ভাবন করতে হয়েছিল। এজন্যই তিনি শিশুর শব্দপাঠের গোড়া থেকেই ক্রমে ক্রমে এত মিল ও ছন্দের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। চোখে প'ড়ে বুদ্ধির যোগে যে জ্ঞান লাভ হয়, স্মৃতির ভাণ্ডারে তার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। কিন্তু যে জ্ঞান কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ ক'রে স্মৃতিতে সঞ্চিত হয় তার স্থায়িত্ব নিশ্চিততর। তাই শিশুশিক্ষা পড়ে যাদের শিক্ষারম্ভ, এ বইএর অনেক কথা পরবর্তী কালেও তাদের স্মৃতিতে অম্লান থাকে। বর্ণপরিচয় পড়ে ততটা থাকে না। অন্য অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও 'বর্ণপরিচয়'এর এই বড় অভাবটা মনকে পীড়িত করে।

॥ ৮ ॥

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ হয়েছিল কোন্ বই দিয়ে, শিশুশিক্ষা না বর্ণপরিচয়? —পরিশেষে এই প্রশ্নের একটু আলোচনা করা অনুচিত হবে না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-কথা থেকে কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। তাই অন্যবিধ প্রমাণের বলে অনুমানসিদ্ধ সিদ্ধান্ত করা ছাড়া উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথের লেখাপড়ার সূত্রপাত হয়েছিল বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাছে, এ কথা জানা যায় তাঁর 'ছেলেবেলা' বই থেকে। এ বইএর অষ্টম অধ্যায় আছে—

"ঐখানে গুরুমশায়ের পাঠশালা বসত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়া-প্রতিবেশীর ছেলেদেরও ঐখানেই বিদ্যার প্রথম আঁচড় পড়ত তালপাতায়। আমিও নিশ্চয় ঐখানেই স্বরে অ স্বরে আ-র উপর দাগা বুলোতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সৌরলোকের সব চেয়ে দূরের গ্রহের মতো সেই শিশুকে মনে-আনাওয়ালা কোনো দূরবীন দিয়েও তাকে দেখবার জো নেই।"

অর্থাৎ শিক্ষারম্ভের কোনো স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল না। মনে না থাকার কারণটা বোঝা যায় তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র এই উক্তি থেকে—

"আমরা তিনটি বালক একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গী-দুটি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়ো। তাহারা যখন গুরু মহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুরু হইল, কিন্তু সে কথা আমার মনেও নাই।"

রবীন্দ্রনাথের উক্ত সঙ্গী-দুটি হলেন তাঁর দাদা সোমেন্দ্রনাথ ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ। তাঁরা ছিলেন তাঁর চেয়ে দুই বছরের বড়ো। যদি তৎকালীন রীতি অনুসারে বিদ্যারম্ভের সময় তাঁদের বয়স পূর্ণ পাঁচ বছর হয়ে থাকে তবে রবীন্দ্রনাথ তখন তিন পার হয়ে চতুর্থ বৎসরে পা দিয়েছিলেন। কি বই দিয়ে পড়া শুরু হয়েছিল, এরকম নীরস কথা ওই বয়সের শিশুর পক্ষে মনে রাখা স্বাভাবিক বা প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা বা সরস তথ্য ওই বয়সের শিশুরও মনে থাকে, রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। তাই শিক্ষারম্ভের কথা 'আমার মনেও নাই' বলার পরেই তিনি বললেন—

"কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সে দিন পড়িতেছি 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সে দিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না, তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সে দিন আমার চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

'জল পড়ে পাতা নড়ে', এই আদিকবিতাটির সাক্ষাৎ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন 'কর, খল' প্রভৃতি বানান শেখার পরে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় এটি ছিল তাঁর প্রথম পাঠ্যপুস্তকেই। আমরা দেখেছি শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়, এই দুটি শিশুপাঠ্য বই-ই সে সময়ে সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে কোন্‌টি রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাঠ্যপুস্তক হবার গৌরবের অধিকারী, সেটাই প্রশ্ন। রবীন্দ্র সাহিত্যে কোথাও 'শিশুশিক্ষা'র উল্লেখ পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না। কিন্তু 'বর্ণপরিচয়'-এর উল্লেখ আছে তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিত' প্রবন্ধে (১৩০২)।—

"বিদ্যাসাগর তার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল-নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। ...যে প্রকার [illegible] উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে নাই।"

গোপাল ও রাখালের চরিতকাহিনী আছে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের শেষ দুই পাঠে। এই কাহিনী-দুটি রবীন্দ্রনাথ পড়লেন কখন? তিনি নিজেই বলেছেন, কি বই পড়ে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়েছিল তা তাঁর মনে ছিল না। সুতরাং স্বীকার করতে হবে বর্ণপরিচয়ের উক্ত উল্লেখ তাঁর শিশুবয়সের স্মৃতির ফল নয়, পরিণত বয়সে এ বইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফল।

যা হক, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার-প্রমুখ কেউ কেউ মনে করেন বর্ণপরিচয়ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাঠ্যপুস্তক এবং 'উহারই সাহায্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সহিত ভাবী কবির প্রথম পরিচয় ঘটে।'[১২] এ বইএর বর্ণযোজনা অংশে প্রথম পাঠের শেষ দিকে 'কর' ও 'খল' আছে ছয়, ঝড়, তল প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে; বাক্যরচনার তৃতীয় পাঠে আছে 'কথা কয়, জল পড়ে, মেঘ ডাকে' ইত্যাদি, 'পাতা নড়ে' নেই; আর অষ্টম পাঠে পাই 'জল পড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে, ফল ঝুলিতেছে'। কোথাও 'জল পড়ে পাতা নড়ে' নেই। বর্ণপরিচয়ের তৎকালীন সংস্করণে ছিল কিনা জানি নে। কিন্তু এ বইএ যে মিল ও ছন্দের আভাসমাত্রও ছিল না সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এ বইএ তাঁর জীবনের 'আদিকবির প্রথম কবিতা'র সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। পক্ষান্তরে শিশুশিক্ষার একেবারে প্রথমেই আছে— 'কর কর খর খর, কল কল খল খল' ইত্যাদি বর্ণযোজনার মিল ও ছন্দোময় দৃষ্টান্ত; আর এই বর্ণযোজনা পাঠেরই শেষের দিকে আছে—

> জল পড়ে ছাতি ধর,
> তাড়াতাড়ি গাড়ী চড়।

কিন্তু 'জল পড়ে পাতা নড়ে' নেই। দেখা গেল শিশুশিক্ষায় ছন্দোগত মিল আছে, তথ্যগত মিল নেই, আর বর্ণপরিচয়ে তথ্য ঠিক আছে, ছন্দ বা মিল নেই। এই বিষয়টি লক্ষ করে বহুকাল পূর্বে আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ দুখানি বই-ই পড়েছিলেন এবং একটি থেকে ছন্দ ও মিল আর অপরটি থেকে তথ্য নিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই ওই আদিকবিতাটি রচনা করে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ রবীন্দ্রকথিত ওই আদিকবিটি তারই শিশুচিত্তে বিরাজমান ছিল, বাইরে তার অস্তিত্ব ছিল না।[১৩]

বিভিন্ন উৎস থেকে উপাদান সংকলন করে নূতন 'কবিতা' রচনা যে শিশু রবীন্দ্রনাথের স্বভাবগত ছিল তার প্রমাণ আছে 'ছেলেবেলা' গ্রন্থের দ্বিতীয়

অধ্যায়ে উল্লিখিত সিন্ধি-বলির মন্তরটিতে। তাঁর বানানো মন্তরটি এই—

সিন্ধিমামা কাটুম
আন্দিবোসের বাটুম,—
উলুকুট ঢুলুকুট, ঢ্যাম কুড়কুড়,
আখরোট বাখরোট খটখটখটাস
পট পট পটাস।

রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন— 'এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার-করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের।' লক্ষণীয় বিষয় এই যে, শিশু রবীন্দ্রনাথ তাঁর শোনা কতকগুলি ছড়া থেকে কোনো কোনো অংশ ধার করে নিয়ে সেগুলির সমবায়ে উক্ত মন্তরটি বানিয়েছিলেন। ছড়াগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ যথাক্রমে এই— তালগাছ কাটম বোসের বাটম গৌরি এল ঝি, উলুকুট ধুলুকুট নলের বাঁশি, ঢ্যাম কুড়কুড় বাদ্দি বাজে চরকডাঙায় ঘর। শিশুবয়সে শ্রুত এই সব-কয়টি ছড়াই তাঁর পরিণত বয়সে সংকলিত ছেলেভুলানো ছড়াসংগ্রহে স্থান পেয়েছে, এটাও মনে রাখার মত বিষয়।

সুতরাং শিশুশিক্ষা থেকে ছন্দ ও মিলের প্রেরণা এবং বর্ণপরিচয় থেকে জল পড়া ও পাতা নড়ার তথ্য নিয়ে শিশুকবি নিজেই ওই আদিকবিতাটি রচনা করেছিলেন, এ কথা বোধ করি অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ কোথাও শিশুশিক্ষার কথা উল্লেখ না করলেও এই বইটিই তাঁর শিশুহৃদয়ে গভীরতর রেখাপাত করেছিল, এ কথা মনে করার আরও হেতু আছে। আমরা দেখেছি শিশুবোধকের ন্যায় শিশুশিক্ষাতেও স্বর ও ব্যঞ্জন-বর্ণমালায় যথাক্রমে দীর্ঘ ৠ ও ঌ এবং ক্ষ স্বীকৃত ছিল, পক্ষান্তরে বর্ণপরিচয়ের বর্ণমালা থেকে এই তিনটি বর্ণ 'পরিত্যক্ত' হয়েছিল। স্বরে অ স্বরে আ প্রভৃতি বর্ণের উপর দাগা বুলোতে বুলোতে যে বর্ণমালা শিশুর হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়, পরবর্তী কালেও তার প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও যায় নি। সুবোধচন্দ্র মজুমদারের সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের যে 'পকেটবুক'-টি পাওয়া গিয়েছে তাকে 'মজুমদার-পুঁথি' না বলে 'সুবোধপুঁথি' বলাই সমীচীন মনে করি।[১৪] তাতে পুঁথিখানির পরিচয় অধিকতর নির্দিষ্ট হয়, আর 'মালতীপুঁথি' নামের সঙ্গেও সংগতি রক্ষা হয়। যা হক, এই পকেটবুকে দেখা যায় আনুমানিক ১৩০২ সালে রবীন্দ্রনাথ শিশুদের বর্ণমালা শেখাবার জন্য কতকগুলি সূত্র রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে আছে এই

তিনটি সূত্র—

দুই বুড়ো ঋ ৠ
চলে ধীরি ধীরি।
দুই বোন ঌ ৡ
হাসে খিলি খীলি।
হ হাঁচে হক্ষ,
ক্ষ কাশে খক্ষ।[১৫]

যদি বর্ণপরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ হত তা হলে তাঁর রচিত এই সূত্রগুলিতে দীর্ঘ ৠ, ৡ ও ক্ষ স্বভাবতঃই আসতে পারত না। শিশুশিক্ষার বর্ণমালাই শিশুরবির কোমল চিত্তে অনপনেয়রূপে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল, তাই পরিণত বয়সেও তাঁর রচিত সূত্রগুলিতে তার পুনঃপ্রকাশ ঘটেছে। আরও পরবর্তী কালে 'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগে (১৩৩৭ বৈশাখ) বর্ণমালা শেখাবার জন্যে যেসব নূতন সূত্র রচিত হয়েছিল তাতে শুধু দীর্ঘ ৠ ৡ নয়, হ্রস্ব ঌ-ও বর্জিত হয়। কারণ বাংলা ভাষায় এই তিন বর্ণের প্রয়োগ নেই। কিন্তু ক্ষ বহাল আছে।—

শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ
কোণে বসে কাশে খক্ষ।

সুবোধপুঁথির সূত্রের সঙ্গে এই সূত্রটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। শুধু বর্ণমালায় নয়, শিশুশিক্ষার ন্যায় সহজ পাঠের পাঠ্যবিভাগেও নানা স্থানেই ক্ষ-এর প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন ষষ্ঠ পাঠে আছে—

কচি ধানগাছে ক্ষেত ভ'রে আছে,
হাওয়া দোলা দেয় তারে।

বলা প্রয়োজন যে, সব-ক'টি স্থানে শুধু 'ক্ষেত' শব্দেই ক্ষ-এর প্রয়োগ দেখা যায়। বোধ করি ক্ষ-যুক্ত শিশুবোধ্য সরল শব্দের অভাবেই এরকম হয়েছে। সহজ পাঠের পরবর্তী কোনো সংস্করণ থেকে, কি কারণে জানি নে, সবগুলি 'ক্ষেত'’ই হয়েছে 'খেত'। অথচ বর্ণমালা থেকে ক্ষ-এর নির্বাসন ঘটে নি। সহজ পাঠের পাণ্ডুলিপিতে তথা প্রথম সংস্করণে কিন্তু সর্বত্রই আছে 'ক্ষেত'। তা ছাড়া, সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগে অন্যান্য যুক্তাক্ষরের ন্যায় ক্ষ যুক্তাক্ষরটি শেখাবার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় নি। শুধু তৃতীয় পাঠে ক্ষ-শিক্ষা উপলক্ষে চারটি শব্দে (ক্ষতি, ক্ষিতি, ক্ষেত, অক্ষয়) ক্ষ-এর প্রয়োগ দেখা যায়। রক্ষা, শিক্ষা, ভিক্ষা, বক্ষ, চক্ষু ইত্যাদি বহু শব্দ

উপেক্ষিত হয়েছে। ক্ষ-এর যুক্তাক্ষরত্ব সম্বন্ধে (অন্ততঃ শিশুপাঠ্য প্রাথমিক পুস্তকরচয়িতার পক্ষে কাম্য) যথেষ্ট সচেতনতার অভাবই বোধ করি এর কারণ। বর্ণপরিচয় পড়ে শিক্ষারম্ভ হলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ক্ষ-এর সম্বন্ধে এরূপ অনবধানতা ঘটতে পারত না বলেই মনে করি।

সর্বোপরি সহজ পাঠে ছন্দ ও মিলের যোগে শিশুদের ভাষা শেখাবার যে প্রয়াস দেখা যায় তা ছেলেবেলায় শিশুশিক্ষা পড়ার অবচেতন প্রভাবের ফল হওয়া বিচিত্র নয়। অন্ততঃ এ বিষয়ে এই দুটি বইএর সাদৃশ্যটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। অবশ্য দুই রচয়িতার কালগত ও প্রতিভাগত ব্যবধানও স্বভাবতঃই তাঁদের বই-দুটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ দুই বইএর সমধর্মিতা একেবারে অলক্ষ্য নয়। দুএকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। শিশুশিক্ষায় বর্ণপরিচয়ের পরেই আছে এইজাতীয় পদ্যকণিকা—

নরগণ মণিহারা
কর পণ। ফণিপারা।
কাল কাক, ডুব দাও,
ভাল নাক। খুব খাও।

সহজ পাঠে বর্ণশিক্ষার পরেই আছে অনুরূপ পদ্যকণিকা—

আলো হয়, বায়ু বয়
গেল ভয়। বনময়।
চারি দিক্ বাঁশ গাছ
ঝিকি মিক। করে নাচ।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ছেলেবেলায় যে-জাতীয় শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, পরবর্তী কালে বোধ করি অবচেতন মনের প্রেরণাতেই অন্য শিশুদেরও সেজাতীয় শিক্ষা-দানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

উদ্ধৃত দুই গুচ্ছ পদ্যকণিকার পার্থক্যের কথাটাও নির্দেশ করা উচিত। শিশুশিক্ষার পদ্যকণিকাগুলি রচিত হয়েছে দুটি নীতি অনুসারে— এক, যথাক্রমে অকার-আকারাদি স্বরযুক্ত বর্ণের লিপিরূপ শেখানো এবং দুই, প্রতি দুই পঙ্‌ক্তিতে সর্বাঙ্গীণ মিল দিয়ে ধ্বনিরঙ্গের যোগে শিশুর স্মৃতির সহায়তা করা। যুগপৎ এই দুই নীতি রক্ষা করতে গিয়ে সর্বত্র অর্থের সংগতি রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। বস্তুতঃ প্রথম শিক্ষার্থী শিশুদের ধ্বনিরসে মুগ্ধ করে ভাষার লিপিরূপ শেখানোই

ছিল মদনমোহনের অভিপ্রায়। কারণ শিশুদের কাছে অর্থের চেয়ে ধ্বনির আকর্ষণই বেশি। এইজন্যই শিশুর অস্ফুট মনে অর্থহীন ছড়াগুলি এমন মায়া সঞ্চার করে। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল ছন্দ ও মিলের সঙ্গে অর্থের সংগতি রক্ষা করে ভাষাশিক্ষার পূর্ণাঙ্গতা বিধান করা। আরও নানা বিষয়ে শিশুশিক্ষার (তথা বর্ণপরিচয়ের) তুলনায় সহজ পাঠের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তা ছাড়া সহজ পাঠের এমন কতকগুলি গুণ আছে যাতে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্য প্রতিফলিত হয়েছে। এগুলির পরিচয় দেবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও আছে। কিন্তু বর্তমান আলোচনার পক্ষে তা অপ্রাসঙ্গিক।

যা হক, এ বিষয়ে বোধ করি সন্দেহ করা চলে না যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ হয়েছিল শিশুশিক্ষা দিয়ে এবং তার পরে সম্ভবতঃ বর্ণপরিচয়ের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। তারও পরে পড়েছিলেন শিশুবোধক, আর এই শিশুবোধকেই পেয়েছিলেন মূলপাঠসহ চাণক্যশ্লোকের বাংলা পদ্যানুবাদ। তাঁর পঠিত দ্বিতীয় বই কৃত্তিবাসের রামায়ণ। শিশুবোধকের গুরুদক্ষিণা, প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি কবিতাপাঠের পরেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়া দুঃসাধ্য নয়। এ দুই বইএর ভাষার ব্যবধান অতি সামান্যই। শিশুবোধক ও রামায়ণের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছিলেন ভৃত্যমহলে।[১৬] জীবনস্মৃতির শিক্ষারম্ভ অধ্যায়ে আছে—

"নিতান্ত শিশুবয়সেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের মহলে যেসকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস-রামায়ণই প্রধান।"

জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায়, অন্তঃপুরে দিদিমার জিম্মায় রক্ষিত কৃত্তিবাসী রামায়ণও তাঁর অনধিগম্য ছিল না।

দেখা গেল চণ্ডীমণ্ডপে গুরুমশায়ের পাঠশালায় শিশুশিক্ষা দিয়ে তাঁর শিক্ষারম্ভ, আর ভৃত্যমহলে তথা অন্তঃপুরে মেয়েমহলে প্রচলিত শিশুবোধক ও ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি বই পড়েই তার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। অন্যান্য কারণের কথা বাদ দিয়ে শুধু এই কারণের কথা মনে রাখলেও তাঁর এই উক্তির সার্থকতা বোঝা যাবে—

"যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলা দেশের মাটি দিয়ে তৈরি।"

—ছেলেবেলা, অধ্যায় ১৪

১৩৭৮ চৈত্র ৮

উৎস-নির্দেশ ও টীকা

সংখ্যা পৃষ্ঠা

১ দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত ২

২ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য-সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'চণ্ডীমঙ্গল : ধনপতি উপাখ্যান' (১৯৬৬) পৃ ২৭২-৭৩। ৫

৩ আরও কিছুকাল পরে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (চতুর্থ সংস্করণ, ১৯২১) গ্রন্থ, নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট অংশে (পৃ ৫৩২) শিশুবোধকের উল্লেখ চোখে পড়ে। ৭

৪ শিশুবোধকে চাণক্যশ্লোকের শেষ শ্লোকের শেষাংশে আছে—
'অষ্টোত্তরং পঞ্চং চাণক্যেন প্রযুজ্যতে'। কিন্তু তার পাশেই আছে শ্লোকাঙ্ক ১০৫। হয়তো শ্লোক সংগ্রহের মুখবন্ধের তিনটি শ্লোক গণনায় ধরে ১০৮টি শ্লোক স্বীকৃত হত। লঙ সাহেবও ১০৮ শ্লোকের কথাই বলেছেন। ৭

৫ কলকাতা সাহিত্যপরিষদ-গ্রন্থাগারে সচিত্র শিশুবোধক আছে দুখানি। একখানি নৃত্যলাল শীল-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত (১৩০৫)। এন, এল, শীলের যন্ত্র ; ৯৯ আহীরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৬। অন্যখানি বেণীমাধব ভট্টাচার্য-কর্তৃক 'উত্তমরূপে সংশোধিত' ও জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত। ১১৫ চিৎপুর রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৵০ + ১২৬। প্রকাশকাল বোধকরি ছিল ছিন্নাংশে। তিনখানি বইএর তুলনা করে সহজেই বোঝা যায় সাহিত্যপরিষদের বই-দুখানির চেয়ে লঙ সাহেবের দেখা বইটির সঙ্গে আমার সংগৃহীত বইটিরই মিল বেশি। ৭

৬ আমার শিশুবোধক বইটি ১৯৫১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীনিকেতনের মেলায় কেনা। ১১

৭ দ্রষ্টব্য অলোক রায়-সম্পাদিত 'ছন্দ-সরস্বতী' গ্রন্থ (১৩৭৪ ফাল্গুন), পৃ ৪। ১২

৮ বলা বাহুল্য শিশুবোধকে এই পঙ্‌ক্তিগুলি এভাবে সাজানো ছিল না। সাবেকি প্রথায় গদ্যের মত টানা লাইনে মুদ্রিত ছিল। আর পঙ্‌ক্তি বিভাগ সূচিত ছিল অযুগ্ম ও যুগ্ম দাঁড়ি চিহ্নের দ্বারা। ১২

৯ বোধকরি লিপিকরের বা ছাপার ভুলে 'ছন্দোমঞ্জরী' হয়েছে 'ছন্দে মঞ্জরী'। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে আছে পিঙ্গলের ছন্দশাস্ত্রের কথা (পৃ ৫) আর শিশুবোধকে আছে গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থের উল্লেখ, এটুকুও লক্ষণীয়। ১৪

১০ দ্রষ্টব্য সাহিত্যসাধক-চরিতমালা ১৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৫৫। ২৩

১১ গদ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পদ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, এই দুই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার প্রতিভা ছিল মদনমোহনের। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে প্রতিভা ফলপ্রসূ হতে পারল না। ২৯

১২ দ্রষ্টব্য প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৭৭ বৈশাখ), পৃ ১৯। ৩৪

১৩ দ্রষ্টব্য 'কবিতা' পত্রিকা, ১৩৫১ আষাঢ় সংখ্যা, পৃ ২৭০-৭২ এবং রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও শিশিরকুমার দাশ-সম্পাদিত 'শশিভূষণ স্মারকগ্রন্থ, (১৩৭৪ অগ্রহায়ণ), পৃ ১০১-০৩। ৩৪

১৪ দ্রষ্টব্য অমিতাভ চৌধুরী-লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের পকেট বুক' প্রবন্ধ, 'শারদীয়া দেশ ১৩৭৭, পৃ ১৮ ও ২২ এবং তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের পকেট বুক এবং' গ্রন্থ (১৩৭৮ অগ্রহায়ণ) পৃ ১-২ ও ৭-৮। ৩৫

১৫ দ্রষ্টব্য কানাই সামন্ত-প্রণীত 'রবীন্দ্রপ্রতিভা' (১৩৬৮ শ্রাবণ ২২), পৃ ২৬৫-৬৭'-মেয়েলি ছড়া' নামান্তরে 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ (সাধনা ১৩০১ ভাদ্র-আশ্বিন এবং সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৩০১মাঘ), 'বিদ্যাসাগর-চরিত' প্রবন্ধে (১৩০২ শ্রাবণ, সাধনা ১৩০২ ভাদ্র-কার্তিক) বর্ণপরিচয়ের উল্লেখ এবং বর্ণমালা-পরিচায়ক এই সূত্রাবলী রচনা[১] (১৩০২), এগুলির কালসামীপ্য বিবেচনায় মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ এ সময়ে শিশু পুত্রকন্যাদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের বিভিন্ন প্রণালী নিয়ে চিন্তা করছিলেন। ৩৬

১৬ শিশুবোধকের সংঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল কোথায়, পাঠশালায় না চাকরদের মহলে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার উপায় নেই। এ বিষয়ে তাঁর স্মৃতি অস্পষ্ট। পাঠশালায় হওয়াও অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত নয়। তখনকার দিনে পাঠশালায় শিশুবোধক খুবই প্রচলিত ছিল। ৩৮

স্বীকৃতি

মকরবাহিনী গঙ্গাদেবী ও হিরণ্যকশিপুবধ, এই দুখানি ছবির আলোকচিত্র তুলে দিয়েছেন কৃতী আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীমান্ জ্ঞানরঞ্জন সেন। তাঁকে আমার আশীর্বাদ জানাই।

১০ আশ্বিন ১৩৭৯ প্রবোধচন্দ্র সেন

সম্পূরণ

॥ ১ ॥

শিশুবোধক সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৭-১৯৩২) তাঁর স্মৃতিকথায় যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য।—

Shishu-Bodh was the name of the first printed book placed in my hands. I do not know if it has entirely ceased publication ; but though possibly less scientifically arranged and much less nicely got up, I liked this book much better than I did the more modern *Shishu-Shiksha* or *Varna-Parichaya* which I had to read later in the school to which I was sent...*Shishu-Bodh* had of course the Bengalee alphabets, but instead of placing a number of single words before boys and girls to help them to be familiar with the alphabets, it at once started with nice attractive stories, the subject matter of wihch riveted the attention and often times enthralled the imagination of little folks and thus taught them the use of the alhpabets without any serious and conscious effort. Most of the stories in our current school primers of the class to which *Shishu-Shiksha* belonged are commonplace, stale, jejune ; these neither excite youthful curiosity nor inspire youthful enthusiasm or idealism. They do not touch any of the deeper emotions, neither of wonder, nor fear, nor any other which are so common in the psychology of little children. In this respect *Shishu-Bodh* was mnch better than most of our presentday primers. Another distinguishing feature of *Shishu-Bodh* was the collection of Sanskrit *slokas* which it contained. These were mostly from Chanakya or were at least

believed to be his. These are in very simple Sanskrit...They can be easily committed to memory...When taking my lessons from *Shishu-Bodh* I was never put to the amount of torture to which I was subjected, I very well remember, in learning my lessons from *Varna-Parichaya* or *Shishu-Shiksha* ; yet while I soon forgot practically everything that I had been forced to commit to memory from these latter text-books at my school, many of the things that I learnt from the former book still live in my recollection...Of the stories in this book that of *Data-Karna*, the man who sacrificed his first-born to do his duty as a householder by a guest, made the profoundest impression upon my child-mind, I read and re-read it and eagerly committed the whole poem to memory until it became almost a part of my mental life.—*Memoirs of My Life & Times, Vol. I, pp. 17-19*

বিপিনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বয়সের পার্থক্য বেশি নয়। তাই বিপিনচন্দ্রের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও উক্ত তিনখানি বই-ই পড়েছিলেন, এ কথা মনে করা অন্যায় নয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ হয়েছিল অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। তাই তাঁর পক্ষে বইগুলির নাম মনে রাখা সম্ভব হয় নি। তবে বিপিনচন্দ্রের ন্যায় তাঁর মনেও একই কারণে শিশুবোধকের স্মৃতি ছিল স্পষ্টতর। কিন্তু তাঁর মনোজীবনে শিশুশিক্ষার প্রভাবই ছিল সবচেয়ে গভীর। শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয় সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র যে বিরূপতা প্রকাশ করেছেন, মনে হয় তা প্রধানতঃ বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে যুক্তাক্ষর শিক্ষার বেদনাদায়ক স্মৃতির ফল। তাঁর উক্ত স্মৃতিকথার (পৃ ৩১) নিম্নোদ্‌ধৃত অংশটুকু থেকে তাই সমর্থিত হয়।—

Murray's *Spelling Book* and Pyaree Charan Sircar's *First Book of Reading* were the text-books for the lowest class in English schools in Bengal in those days. I read Murray's in preference to Pyaree Charan Sircar's. Iswar Chandra Vidyasagar's *Varna-Parichaya* Part II and Madan Mohan Tarkalankar's *Shishu-Shiksha* Part III were my earliest Bengalee tex-books at school.

॥ ২ ॥

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে (১৮২৪-৯৪) - সম্পাদিত *Bengal Magazine* পত্রিকার ১৮৭৫ জুলাই সংখ্যার Recent Publications - শীর্ষক পুস্তকপরিচয় বিভাগে শিশুবোধ পুস্তকের একটি বিশেষ সংস্করণের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তারও কিছু ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। তাই সেটুকু এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

Sisubodha—By Baikuntha Nath Goswami Tattwabhushana, late Deputy Inspector of Schools, South Burdwan. Calcutta, Gupta Press, 1875.

This book which has been ushered into the world by a recommendatory preface by the Rev. C. Bomwetsch, contains as the author tells us on the title-page "all the arithmetical formulae of Subhankara, the first four fundamental rules of arithmetic, reading lessons on physical subjects" and a great deal more. We look upon this as a very useful publication especially as it contains the celebrated formulae of Subhankara, the Indian Cocker. But Subhankara was infinitely greater than Cocker, since by his empirical rules he has made Bengali shop-keepers the readiest and quickest arithmeticians in the world.

এখানে শুভঙ্করের কৃতিত্বের যে মূল্যনিরূপণ করা হয়েছে তাতে কিছুমাত্র আতিশয্য হয়েছে বলে মনে করি নে।

॥ ৩

মূল প্রবন্ধে (পৃ ২২-২৩) বলা হয়েছে বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের দ্বিষষ্টিতম সংস্করণ (১৮৬৩) থেকে শিশুশিক্ষার কয়েকটি পূর্বস্বীকৃত পাঠ বর্জিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' পুস্তিকাটি (১৮৮৮ এপ্রিল) থেকে মনে হয় মদনমোহনের মৃত্যুর (১৮৫৮) পরে শিশুশিক্ষার স্বত্বাধিকার নিয়ে বিরোধ নিরসনের অভিপ্রায়েই

ওই পাঠগুলি বর্জিত হয়েছিল। উক্ত পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে দেবকুমার বসু-সম্পাদিত ও মণ্ডল বুক হাউস - প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ডে।

স্বীকৃতি

বিপিনচন্দ্রের স্মৃতিকথা থেকে উদ্‌ধৃত দুটি অংশ এবং **Bengal Magazine** থেকে উদ্‌ধৃত অংশটুকু সংকলন করে পাঠিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীমান্ দেবীপদ ভট্টাচার্য। আর বিদ্যাসাগরের 'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস' পুস্তিকাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিশ্বভারতীর তীক্ষ্ণধী তরুণ অধ্যাপক শ্রীমান্-সুখময় মুখোপাধ্যায়। উভয়েরই অধিকতর জ্ঞানখ্যাতি ও কল্যাণ কামনা করি।

প্রবোধচন্দ্র সেন

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

বিদ্যাসাগরের একটি রচনার ভাষা-বিচার

"বীরসিংহের সিংহশিশু, বিদ্যাসাগর বীর"— প্রণম্য সেই কর্মবীর মহাপুরুষের অপূর্ব তেজস্বিতা ও প্রচণ্ড বীরব্যক্তিত্বের পরিচয় এই সুন্দর ছত্রে পরিস্ফুট। বস্তুতঃ তাঁহার জীবনের বহু কাহিনী এই গুণাবলীর সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে অদ্যাপি আদর্শ ও শিক্ষণীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু ইহার সহিত স্মরণীয় তাঁহার প্রদীপ্ত প্রতিভা, যাহার গুণে তাঁহার সুদুর্লভ "বিদ্যাসাগর" উপাধি তাঁহার নামকে সম্পূর্ণ ও সার্থকভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সেই প্রতিভার প্রখর দীপ্তিতে,— কখনও দুরন্ত ব্যাধি, কখনও নিদারুণ অনটন, কখনও প্রবল প্রতিকূল অবস্থা— সকলই তুচ্ছ ও পরাভূত হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার বহুবিচিত্র বিদ্যাশিক্ষার প্রত্যেকটি স্তর অবলীলাক্রমে প্রশংসার সহিত সমুত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ফোর্টউইলিয়াম কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটারী জি. টি. মার্শাল ২৮শে মার্চ ১৮৪৬ তারিখে বিদ্যাসাগরের একটি অভিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার প্রকৃত স্বীকৃতি দেখা যায়।

> "......তিনি গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং সাহিত্য বিজ্ঞানের যাবতীয় শাখায় শিক্ষালাভ করিয়া সর্বোত্তম পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং এ যাবৎ নিজ অধ্যয়নের সাহায্যে ইংরাজী ভাষায় প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয়

করিয়াছেন। তাঁহার কার্যাসংক্রান্ত ব্যাপারে আমি তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধির সমুচিত সাহায্য লাভ করিয়াছি এবং অন্যান্য বিষয়েও বিশেষতঃ গত চারি বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত কলেজে বৃত্তি পরীক্ষাতে তাঁহার স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্যলাভ করিয়াছি, যাহাতে আমি তাঁহার কার্যাকুশলতা, বিচক্ষণ বুদ্ধি ও অন্যায়-উদ্দেশ্য-বর্জিত-কার্য্যাবলীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইয়াছি। সর্বোপরি আমি মনে করি, তিনি ব্যাপক জ্ঞান, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, কঠোর শ্রমশীলতা, সাধু ব্যবহার ও সমুন্নত চরিত্রগুণের অপূর্ব সমন্বয়।" (ইংরাজী হইতে নিজস্ব ভাবানুবাদ)

কিন্তু ইহা ছাড়া বিদ্যাসাগরের আরও একটি অত্যুজ্জ্বল পরিচয় আছে। ইহা বঙ্গকুলোদ্ভব কবি মাইকেল মধুসূদনের স্বীয় তীব্র জীবনাভিজ্ঞতাপ্রসূত একটি সুকোমল সনেটে বিধৃত—

"বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে
দীন যে, দীনের বন্ধু।"

ঐ প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অন্তরালে যে করুণার সুগভীর স্রোতস্বিনী ফল্গুধারায় প্রবহমান ছিল, তাহার পরিচয় জীবনের নানা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়। ইহারই দুরন্ত আবেগে আবর্তিত তাঁহার জীবন স্রোত স্বাভাবিক ভাবে সমাজের কল্যাণকার্য্যে প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সমাজের উপকারে নিয়োজিত কার্য্যধারার একটি শাখায় তাঁহাকে লোক শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই, এবং তাহারই প্রত্যক্ষ ফল তাঁহার সাহিত্যিকতা।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে দেশবাসীর লাঞ্ছিত হতভাগ্য দীনদুরবস্থা মোচনে সম্মিলিত হইল একদিকে তাঁহার বদ্ধপরিকর দৃঢ় মনোভাব, দৃপ্ত তেজস্বিতা, প্রচণ্ড কর্মশক্তি ও উদার বিদ্যাবুদ্ধি অন্যদিকে নামিয়া আসিল স্বার্থহীন করুণার প্রবল প্রবাহ।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে যুক্তভাবে নিয়োজিত তাঁহার প্রচেষ্টা তেমন প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয় নাই। কিন্তু দেশের হতভাগ্য বালবিধবাগণের আমৃত্যু দুঃখক্লেশের জন্য ব্যথাতুর এই পরাক্রান্ত কর্মবীরকে প্রথম হইতেই সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, এবং অবশেষে তিনি দিগ্বিজয়ীর বরমাল্য ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই সংগ্রামের বিভিন্ন পর্বে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রচনাশক্তি সহায় হইয়াছিল, এবং তিনি ১৮৫৫ সালে "বিধবাবিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ" পরে উহারই দ্বিতীয় পুস্তক প্রণয়ন

করিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ ব্যতীত বহুবিবাহ রহিত করার উদ্দেশ্যেও তিনি কয়েকটি স্বাধীন রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল রচনার মধ্যে কয়েকটি অতিশয় সরস এবং এই সকল সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়।

ইহা ছাড়া তাঁহার সকল রচনাই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত। শিক্ষার্থীগণের উপযুক্ত ক্রমানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের অভাব এবং অশ্লীলতা প্রভৃতি দোষদুষ্ট গ্রন্থের পরিবর্তনের প্রয়োজন তাঁহাকে বহু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষায় 'মুগ্ধবোধ' অথবা 'পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী' অপেক্ষা সরলতর ব্যাকরণ প্রণয়ন প্রচেষ্টায় প্রথমে 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' এবং পরে চারিখণ্ডে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করিয়া অদ্যাপি বাঙ্গালী শিক্ষার্থীগণের সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয়া রাখিয়াছেন; অশ্লীলতা প্রভৃতি বিভিন্ন ত্রুটি সংশোধনের দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া নূতন সুরুচিপূর্ণ ক্রমানুসারী পাঠসংকলন করিয়া তিনটি 'ঋজুপাঠ' গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের একটি ইতিহাস রচনা করিলেন 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে।' ইহা ব্যতীত উত্তরকালে তাঁহার কতিপয় নিজস্ব সংস্কৃত রচনা ও সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা শিক্ষাদানেও তিনি ফোর্টউইলিয়াম কলেজের বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থের দীনতা ও হীনতা মোচনকল্পে হিন্দী 'বৈতাল পচিসী' গ্রন্থের পরিচ্ছন্ন ও সুললিত বাঙ্গালাভাষায় ভাবানুবাদ করিয়া প্রথম প্রকাশ করিলেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। ইহার পর মার্শম্যানের রচনা অবলম্বনে 'বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশ করিলেন। ১৭৫৬ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃত্তান্ত এইভাগে বর্ণিত। বিদ্যাসাগর অনেক মহানুভব ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহাতে সাধারণভাবে ইংরাজদিগের গুণাবলী তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তাঁহার সরলতাগুণেও তাহাদের রচিত ইতিহাসের সত্য সম্বন্ধে তিনি বিন্দুমাত্র সন্দিহান ছিলেন না। বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি ঐ ইতিহাসে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে অতি দুরাচার এমন কি মহারাজা নন্দকুমারকেও দুরাচার বলিয়া মূলানুসারেই বিবৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ রচনা দ্বারা অজ্ঞাতসারে যে অন্যায় তিনি করিয়াছিলেন; ইহার পর রবার্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্সের বৃত্তান্ত অনুযায়ী জীবন চরিত প্রণয়ন করিয়া ঐ গ্রন্থের বিষয় বস্তুর মহত্ত্ব দ্বারা তাহার যথেষ্ট পরিপূরণ করিয়াছেন।

এ পর্যন্ত শিশুশিক্ষার উপযোগী তিনটি আদ্য ক্রমিক পাঠ্য 'শিশুশিক্ষা' প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ ও তৃতীয়ভাগ বিদ্যাসাগরের পরম সুহৃদ মদনমোহন তর্কালঙ্কার

প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি তাহার অনুরূপ পাঠ্য রচনা না করিয়া প্রথমে 'শিশুশিক্ষা চতুর্থভাগ' নামে একটি উন্নততর ক্রমিক পাঠ্য রচনা করিলেন। পরে ইহার নামকরণ করিলেন 'বোধোদয়।' ইহার চারি বৎসর পরে তিনি 'বর্ণপরিচয়' প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ প্রণয়ন করেন। এই দুই গ্রন্থ এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে যে, শিশুশিক্ষার জন্য এই দুইটিকেই একমাত্র 'প্রথমভাগ' ও 'দ্বিতীয়ভাগ' নামে সকলে চিহ্নিত করিয়া থাকে। ইহার পর আবার Aesop এর Fables গুলি অনুসরণ করিয়া তিনি কিশোরপাঠ্য 'কথামালা' এবং কয়েকজন আদর্শ-পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের বর্ণনায় 'চরিতাবলী' ও কয়েকটি পাশ্চাত্ত্য কাহিনী অবলম্বনে দুরূহতর ভাষায় 'আখ্যান মঞ্জরী' রচনা করেন। বলাবাহুল্য, সকল গ্রন্থরচনায় ভাষায় ঈপ্সিত ক্রমমান রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

॥ ২ ॥

এক্ষণে প্রথমে সাধারণভাবে বিদ্যাসাগরের ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ভাষাশিক্ষণ তাঁহার রচনার মধ্যে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলনা। তিনি প্রথমতঃ শিক্ষাব্যবস্থায় নীতি ও সহজগম্যতার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ভাষার মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও সৌষম্য আনয়ন করিয়া তিনি প্রথম হইতেই ভাষাশিল্পীর পরিচয় দিয়াছেন। বেতাল পঞ্চবিংশতি রচনার মধ্যে মূলগ্রন্থের তুলনায় অবশ্যই বিদ্যাসাগর স্বীয় রচনার চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে তেমন সন্দিহান ছিলেন না কিন্তু কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলমের অনুবাদে তাঁহার ভাষা যে মূলের চমৎকারিত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না এইরূপ সংশয় তাঁহার ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থ রচনায় সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকসমাজের নিকট সহজবোধ্য। স্পষ্টান্বয়ী, মার্জিত-শব্দযুক্ত, স্বচ্ছন্দ ও সুমিত বাক্য ব্যবহারে ভাষাকে নিয়োজিত করিয়া তিনি যে কিরূপ সফল গদ্যশিল্পীর পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা কিছু পরে আলোচ্য। তৎপূর্বে প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁহার ভাষাশিক্ষণকার্যে অবতীর্ণ হওয়ার কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক।

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ বাঙ্গালীর ভাষাশিক্ষার প্রথম সোপান। বর্তমান কালে শিক্ষণ-পদ্ধতির নবাবিষ্কার ও সংস্কার বশত নবতর পদ্ধতিতে কয়েকটি শিশুদিগের প্রথম পাঠ্যগ্রন্থ রচিত হইলেও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ অদ্যাপি পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ৠ ও ৡ এর প্রয়োগ

নাই অথচ এ যাবং উহাদিগকে বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত করা হইত। বিদ্যাসাগর ঐ বৃথা বর্ণ দ্বয় পরিত্যাগ করিয়া গতানুগতিকতা উল্লঙ্ঘন করার সাহসিক বিবেচনা বর্ণ-পরিচয় প্রথমভাগে প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য ঌ বর্ণেরও বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ নাই উহাকেও বর্ণমালা হইতে বিদায় দেওয়া উচিত ছিল, অথচ বিদ্যাসাগর তাহা করেন নাই, তাহার কারণ সম্ভবত বর্ণমালার মধ্যেও একটা সুমিতি ও সাম্য রক্ষার চেষ্টা। ড় ঢ় য় এই তিন বর্ণের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি প্রয়োজন এবং ক্ষ এই যুক্তবর্ণ বর্ণমালা হইতে বর্জন প্রয়োজন। ইহাতে তিনি তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন। এই বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ আরও দেখা যায় তাঁহার ক্রমে ক্রমে উদাহরণ ও পাঠের বিন্যাসে। বিভিন্ন স্বরের সংযোগ সাধনের দুই ও তিন অক্ষর পর্যন্ত অক্ষরের উদাহরণ দিয়া বিভিন্ন স্বরযুক্ত দুই তিন চারি ও পাঁচ অক্ষরের মিশ্র যোজনার উদাহরণ তাহার পর ং, ঃ ও ঁ যোগ দেখাইয়াছেন। এক্ষণে বিবেচ্য, যদি স্বর সংযোগই প্রথমভাগে বিচার্য তবে ং, ঃ ও ঁ স্বরবর্ণ বলিয়া পরিগণিত না করিয়া ইহাদের সংযোগে উদাহরণ এই ভাগে কেন প্রদর্শিত হইল। মনে হয় অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর ক্রমোদ্ভব বিবেচনা করিয়াই বিদ্যাসাগর উহাদিগকে স্বরবর্ণমালা হইতে বর্জন করিয়াছেন। বর্ণ মালার মধ্যে খণ্ড-"ত" এর সন্নিবেশ করিলেও ইহার সংযোগ কেন তিনি কোথাও দেখাইলেন না ইহা বিস্ময়কর; সম্ভবত তিনি নিজে খণ্ড-'ত'এর ব্যবহার তেমন করিতেন না বলিয়া তিনি "বৎসে চন্দ্রমুখী" এইরূপে লিখিতেন। পাঠবিন্যাসে কখনও কখনও পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়, আবার কখনও পাওয়া যায় না। যেমন ১ পাঠ ও ৫ পাঠে যথাক্রমে দুই অক্ষরের ও তিন অক্ষরের বিশেষণ বিশেষ্য, ২ পাঠে কর্মকারকের বিশেষ্যপদের সহিত অনুজ্ঞাবাচক মধ্যমপুরুষের ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়, কিন্তু ৩ পাঠ, ৪ পাঠ, ৬ পাঠে-বিমিশ্র ব্যবহার, অবশ্য ইহাদের একটি দুই অক্ষরের ক্রিয়াপদ। ৭ পাঠে কর্তা বিভিন্ন সর্বনাম এবং বিভিন্ন কালবাচক ক্রিয়াপদ, ৮ পাঠে কর্তা বিশেষ্য ক্রিয়া সবগুলিই-'ইতেছে' যুক্ত অপূর্ণ যৌগিক বর্তমান কালের পদ। ৯ পাঠের পদগুলিতেও বিমিশ্র উদাহরণ দুই-এর অধিক পদের। ১০ ও ১১ পাঠের চারি বা পাঁচ পদের বাক্য। ১২ পাঠে সকল বাক্যই নিষেধাত্মক। ১৪ ও ১৫ পাঠে আছে পরস্পরান্বিত বাক্য সমুদয়; ১৬, ১৭ ও ১৮ পাঠে রাম, নবীন ও গিরিশকে সম্বোধন করিয়া বাক্য সমুদয় এবং ১৯ ও ২০ পাঠে যথাক্রমে সুবোধ বালক গোপাল ও অবাধ্য দুরন্ত রাখালের কথা বলা হইয়াছে। সকলদিক বিবেচনা করিয়া মনে হয়, এই পাঠরচনার মধ্যে বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ

প্রশিক্ষণের কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। বরং ছন্দঃ ও একধরণের শ্রুতিসুখকর ভারসাম্যের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল। যেমন

"পথ ছাড়। জল খাও।
হাত ধর। বাড়ী যাও।" অথবা
"কাক ডাকিতেছে।
গরু চরিতেছে।
পাখী উড়িতেছে।" ইত্যাদি।

আবার—"আমি মুখ ধুইয়াছি। রাখাল কাপড় পরিতেছে।
ভুবন কাপড় পরিয়াছে।
গোপালের পড়িবার বই নাই।
মাধব কখন পড়িতে গিয়াছে।
যাদব এখনও শুইয়া আছে।" অথবা
"রাম তুমি হাসিতেছ কেন।
নবীন কেন বসিয়া আছে। ……… ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনের বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন "বালকদিগের সংযুক্ত বর্ণপরিচয়ই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।" তিনি শিক্ষকমহাশয়গণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। "……বালকদিগকে উহার বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না।" মধ্যে মধ্যে যে পাঠগুলি রচিত হইয়াছে, প্রথম ভাগের পাঠগুলির ন্যায় শিক্ষার্থিগণের নীতিজ্ঞানদানই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু য—ফলা যুক্ত উদাহরণগুলির মধ্যে ব্যয়, ন্যায়, ধ্যান প্রভৃতি আদ্য যফলা যুক্ত অক্ষরের উদাহরণের অভাব বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র "শ্যামল" এই উদাহরণ না থাকিলে বিবেচনা করা যাইত য ফলা যুক্ত হইলে ধ্বনির সমীভবন হয় ইহারই দৃষ্টান্ত বুঝি বিদ্যাসাগর দিতে চাহিয়াছিলেন। আরও একটি ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সতর্কতা লক্ষ্য করা যায়। অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব বাঙ্গালা ভাষায় লিপি লিখনে বিভিন্ন করিয়া দেখানো হয় না। কিন্তু ব—ফলা সংযোগের প্রতি উদাহরন অন্তঃস্থ ব সংযুক্ত এবং বর্গীয় ব এর সংযোগ 'মিশ্র সংযোগ দুই অক্ষরে' ইহারই উদাহরণে প্রদর্শিত হইয়াছে—যেমন অব্জ, শব্দ, লুব্ধ, কম্বল প্রভৃতি। অবশ্য বিদ্যাসাগরের ন্যায় সংস্কৃতে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পক্ষে ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই।

'বোধোদয়' গ্রন্থে নানা প্রসঙ্গক্রমে তিনি "ভাষা" সম্বন্ধে যে আলোচনা

করিয়াছেন, তাহাতে বড় একটা ভ্রান্তি নাই। 'জীবন চরিত' রচনায় বিদ্যাসাগর অনেক পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার এ বিষয়ে দক্ষতা প্রকাশিত। এই সকল গঠিত শব্দের মধ্যে অনেকগুলি অদ্যাপি আদৃত, যেমন perspective-পরিপ্রেক্ষিত, elasticity-স্থিতি স্থাপক, ইত্যাদি। পারিভাষিক শব্দসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ এবং বর্তমান শব্দবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টাও সম্পূর্ণভাবে অবিসংবাদিত বলিয়া গণ্য করা হয় না দেখা যায়। অতএব বিদ্যাসাগর তাঁর সৃষ্ট শব্দের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ছিলেন না—ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। সংস্কৃতে অপরিসীম ব্যুৎপত্তি এবং ক্ষুরধার বিচার বুদ্ধি তাঁহার এই কার্যে সহায় হইয়াছিল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তিনি একটি বাঙ্গালা শব্দকোষও রচনার প্রয়াস করিয়াছিলেন কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার এই দিকে তাঁহার সুমহান্ দান অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

॥ ৩ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক বহু সাহিত্যবিচারক বাঙ্গালা গদ্যরচনায় শিল্পসৌন্দর্যসাধনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ মতের ,সারবক্তব্য বিদ্যাসাগরের পূর্বে যে বাঙ্গালা গদ্যের ভাষা ব্যবহৃত হইত তাহার বহু ত্রুটি ছিল। বিদ্যাসাগরের ভাষায় সেই ত্রুটিগুলি অনেকখানি সংশোধিত হইয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্য গদ্য" গ্রন্থে এই বিষয়ে সবিস্তারে পর্যালোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য কয়েকজনও গ্রন্থকারও এই ব্যাপারে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। সেই সকল বক্তব্যের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী রচনার সহিত বিদ্যাসাগরের অনুরূপ রচনার তুলনাও কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়। এইরূপ আলোচনার প্রকৃত মূল্য আছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কোনও গ্রন্থের অথবা তৎপূর্ববর্তী রচনার বিস্তৃত ভাষা বিচার না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা নিতান্তই অসম্পূর্ণ এবং সিদ্ধান্ত খণ্ডিত ও ত্রুটিবহুল থাকিবে। সাধারণতঃ এইরূপ ভাষাবিচারের মধ্যে রচনাশৈলীর আলোচনাও প্রাসঙ্গিক। যুক্তিপ্রধান প্রবন্ধের ভাষা হইতে আখ্যানের গদ্যভাষার পার্থক্য বিচার করা প্রয়োজন। অতএব সেই মহান্ ভাষা শিল্পপ্রসাধকের প্রবন্ধ ও আখ্যানমূলক রচনার ভাষাও পৃথকভাবে আলোচ্য। প্রস্তুত প্রবন্ধে তাঁহার একটি

সর্বোত্তম আখ্যানমূলক সাহিত্য "শকুন্তলা"র ভাষাশিল্পের সমীক্ষা পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার রচনার গুণাবলীই কেবল প্রদর্শিত হইতেছে না, তাঁহার রচনাদোষগুলিও উল্লিখিত হইতেছে। এই সকল রচনাদোষের মূলকারণ, প্রথম সংস্কৃত রচনারীতির প্রভাব হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই, দ্বিতীয়, প্রকৃত সংস্কার প্রচেষ্টায় তিনিই প্রথম সিদ্ধ। তৃতীয়, তাঁহার কতকগুলি নিজস্ব ব্যবহার যাহাকে মুদ্রাদোষ জাতীয় বলা চলে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে প্রথম হইতেই লেখ্য বাঙ্গালা গদ্যের আদর্শ ছিল সংস্কৃত রচনা রীতি। বহুল উদ্ধৃত ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত অহোমরাজের প্রতি কুচবিহার রাজের পত্রের বাঙ্গালা প্রাচীন গদ্যভাষা সম্পূর্ণ সংস্কৃত গদ্যেরই রূপান্তর। যথা

> "এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার—আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।" ......ইত্যাদির সংস্কৃত আদর্শ এইরূপ—
>
> "অত্রাস্মাকং কুশলম্। ভবতাং কুশলং নিরন্তরং কাময়ে। অধুনা অস্মদ্-ভবতাং সন্তোষ-সম্পাদকে পত্রাপত্রি—গতায়াতে সতি উভয়ানুকূলং প্রীতিবীজম্ অঙ্কুরিতং ভবতি। ......ইত্যাদি।

অবশ্য মুখের ভাষাও কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ;—বিশেষতঃ পত্র ও দলিলের ভাষা মুখের ভাষার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিল। বলা বাহুল্য সংস্কৃত মূলক শব্দ ব্যতীত যুগপ্রভাবে আরবী ফারসী শব্দাবলী পত্রে দলিলে এবং কোনও কোনও সাহিত্যিকের রচনায় যথেষ্ট অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণভাবে সংস্কৃত বাগ্‌রীতি ও শব্দাবলীই সাহিত্যের গদ্যে গৃহীত হইয়াছিল, এমন কি বাংলা গদ্যে যিনি স্বাস্থ্য ও তেজ সঞ্চার করিয়াছিলেন মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্যে সম্পন্ন করিয়াছিলেন সেই সুপণ্ডিত চিন্তানায়ক রামমোহনও সংস্কৃত ভাষ্য রচনারীতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বিতর্কমূলক প্রবন্ধাবলীর ভাষা রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার মনোহারিত্ব বাঙ্গালা গদ্যে সঞ্চারিত করিতে গিয়া বহু পণ্ডিত লেখক একপ্রকার উৎকট ও কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শব্দগুলি ইতস্ততঃ অসংযতভাবে প্রকীর্ণ, অনর্থক পুনরুক্ত, পরস্পর সঙ্গতিহীন ও ক্লিষ্টতা দোষ জর্জরিত ছিল। শব্দগুলির ধ্বনিগত ও অর্থগত অসম্পূর্ণতাও থাকিত। সেইস্থলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাঙ্গালা গদ্যের কখনও কখনও নির্দোষ রূপ দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাঙ্গালা

গদ্যের ভাষায় সংযম, সুষমা, সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতা আনয়নে বিদ্যাসাগরই ছিলেন প্রথম কৌশলী শিল্পী। তথাপি তাঁহার ভাষায় যে ত্রুটি ছিল না তাহাও নহে। কিন্তু সেগুলির যথাযথ আলোচনা করিলে সঙ্গত কারণও নির্ণয় করা সম্ভব।

অনুবাদ কৌশলে বিদ্যাসাগরের পারদর্শিতা "শকুন্তলা" রচনার পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভাষান্তর হইতে আক্ষরিক অনুবাদ যে অনেকস্থলে রীতি পরিপন্থী ও কৃত্রিমতা-দোষ দুষ্ট হয় এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ সংস্কৃত সাহিত্যের একটি রত্ন হইলেও ইহার ভাষা সংস্কৃত এবং ইহা দৃশ্যকাব্য ছিল। বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা আখ্যানরূপে পরিবেশিত হওয়ায় আবশ্যকীয় বহু বর্জন, সংযোজন এবং পরিবর্তন করিতে হইয়াছে—ইহাতে বিদ্যাসাগরের সাহিত্য শিল্পীরই পরিচয় পাওয়া যায়। দৃশ্য-কাব্যের সাতটি অঙ্ক আখ্যানের সাতটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। কিন্তু নাটকে অপরের মুখ দিয়া যে সকল ঘটনা শুনাইতে হইয়াছে যেমন অঙ্গুরীয় প্রাপ্তির পর দুষ্মন্তের পশ্চাত্তাপ—অবস্থা জানাইবার জন্য সানুমতী, উদ্যান পালিকাদ্বয় ও কঞ্চুকীকে আনিতে হইয়াছে, আখ্যানে তাহা বর্ণনার সাহায্যে বলা হইয়াছে ঐ সকল পাত্রপাত্রীকে অকারণে আনা হয় নাই। নাটকে পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলাকে দুই তরুণ ঋষি লইয়া আসিয়াছেন, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত—তাঁহাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য দুইপ্রকারের। একজন বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া থাকেন অন্যজন উপসংহার করেন। নাটকে শার্ঙ্গরব বাকৃপটু, স্পষ্টবাদী, রূঢ়ভাষণে বিমুখ নহেন, শারদ্বত স্বল্পভাষী, কার্যসিদ্ধিই তাহার কথার লক্ষ্য। নাটকে যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না—তখন প্রচণ্ড ক্রোধে শার্ঙ্গরব বলিলেন:

> "কৃতাভিমর্শামনুমন্যমাজঃ সুতাং ত্বয়া নাম মুনির্বিমান্যঃ।
> মুষ্টং প্রতি গ্রাহয়তা স্বমর্থং পাত্রীকৃতো দস্যুরিবাসি যেন॥"

অর্থাৎ তুমি যাহার কন্যাকে অভিমর্শ করিয়াছ সেই মুণি তাহা অনুমোদন করিলেন এইরূপ মুণির অবমাননাই প্রাপ্য, যিনি অপহারী দস্যুকে সৎপাত্র বলিয়া অপহৃত নিজ ধন আপনার ন্যায় ব্যক্তির নিকট সমর্পন করিতেছিলেন। কুলপতি কণ্বের কার্যের সমালোচনা, কঠোর ব্যঙ্গ ও ভৎর্সনা করিতেছেন তাঁহার শিষ্য। শারদ্বত তাঁহাকে বিরত করিয়া শকুন্তলাকে প্রত্যয় জন্মাইবার মত কথা বলিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর এই অংশে নাটকের বক্তব্য যথাযথ অনুসরণ করেন নাই।

"শাঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ। বিবেচনা করুন, মহর্ষি কেমন মহানুভাবতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনি, তাঁহার অগোচরে তাঁহার অনুমতি নিরপেক্ষ হইয়া তদীয় কন্যার পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি তাহাতে রোষ প্রকাশ বা অসন্তোষ প্রদর্শন না করিয়া বিলক্ষণ সন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কন্যারে আপনকার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে প্রত্যাখ্যান করিয়া, তাদৃশ সদাশয় মহানুভাবের অবমাননা করা মহারাজের কোনও মতেই, কর্ত্তব্য নহে। আপনি, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।"

সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র সৃষ্টি। আবার লিখিয়াছেন—

"শারদ্বত শাঙ্গরব অপেক্ষা উদ্ধতস্বভাব ছিলেন, তিনি কহিলেন, ওহে শাঙ্গরব! স্থির হও, আর তোমার বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। আমি এক কথায়, সকল বিষয়ের শেষ করিয়া দিতেছি।......

বস্তুতঃ শাঙ্গরবের গুরুর প্রতি কঠোর মন্তব্য বিদ্যাসাগরের রুচিকে আহত করিয়াছে। তিনি স্বাধীনভাবে রচনা করিয়া চরিত্র দুইটিকে পাঠকের নিকট রুচিকর করিয়া দিয়াছেন।

সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর তাঁহার সকল রচনায় অশ্লীলতা বিরোধী ও নীতিবাগীশের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার শকুন্তলাতে প্রথম দৃশ্যে সখীদের দ্বারা বল্কল শিথিল করার প্রসঙ্গ যে পরিত্যক্ত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

তিনি শকুন্তলার আখ্যান জনসাধারণের নিকট রুচিকর ভাবে পরিবেশন করিতে চাহিয়াছেন কালিদাসের ভাষা ও নাট্যকারের কৌশল প্রদর্শন করিতে চাহেন নাই। সেইজন্য—"স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু —"ইত্যাদি মূল্যবান্ শ্লোকগুলির লোভনীয় অনুবাদ পরিহার করিয়াছেন যেহেতু উপাখ্যানের জন্য সেগুলির তেমন প্রয়োজন হইতেছে না। গল্পস্রোত অব্যাহত ও সরল রাখিবার জন্য এই লোভ তিনি সংবরণ করিয়াছেন। অকারণ তুলনাভাবে তিনি বক্তব্য-কে প্রপীড়িত করেন নাই কারণ তাহা বাঙ্গালী পাঠক সমাজের রুচিকর হইবে না এবং রচনার মধ্যে কৃত্রিমতা দোষ আসিয়া যাইবে। সেই জন্য শকুন্তলায় তাপসেরা রাজকে হরিণ বধে নিবৃত্ত করিতে আসিয়া "আপনার বজ্রসম শর তূলরাশিতে অগ্নির মত" ইত্যাদি উপমা ব্যবহার করেন নাই। পঞ্চম অঙ্কে নাটকে শকুন্তলাকে রাজার নিকট উপস্থাপিত করিয়া শাঙ্গরব প্রথমে কণ্বের বক্তব্য বলিয়াছেন—

"ত্বমর্হতাং প্রাগসর স্মৃতাহসি, নঃ
শকুন্তলা মূর্তিমতী চ সৎ ক্রিয়া।

সমানয়ং স্থলা-গুণং বধূবরং
চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতি ঃ।"

বিদ্যাসাগর এই অংশের বক্তব্যটি শুধু "আপনি সর্বাংশে আমার শকুন্তলার যোগ্য পাত্র;" বলিয়া শেষ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার "আমার শকুন্তলা" কথাটির ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়—সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের পরিচয় এই সকল স্বাধীন শব্দব্যবহারে।

ছেদচিহ্নের অভাব বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী লোকগণের একটি প্রধান দোষ বলিয়া উল্লিখিত হয়। সত্যই বিদ্যাসাগর পূর্ণচ্ছেদ ও অর্ধচ্ছেদের কখনও উদ্ধৃতি-চিহ্নের সুষ্ঠু ব্যবহার করিয়া বাক্যার্থ সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই সকল চিহ্ন দিলেও ঐ সকল লেখকের বাক্যার্থ অনেক স্থলে সুস্পষ্ট হইত না, তাহার কারণ তাহাদের প্রধানতঃ দোষ পদের দুরন্বয় ও দূরান্বয়। রাজা রামমোহন রায়ের রচনাতেও এই দোষ বিদ্যমান। বিদ্যাসাগরের পূর্বে কেবল মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনায় ক্লিষ্টান্বয় অল্পতর। বিদ্যাসাগরের অন্বয় দোষ উল্লেখযোগ্য নহে তাহার কারণ তিনি আকাঙ্খা যোগ্যতা ও আসক্তি বিচার করিয়া বাক্য মধ্যে পদগুলির যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়াছেন। শকুন্তলার মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে যে অন্বয় দোষ দেখা যায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া কারণ নির্ণয় করা হইতেছে।

"গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাববশতঃ, ইহার ঈদৃশ অসুখ, কি যে কারণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে, ইহারাও তাহাই।" (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) এখানে "গ্রীষ্মের প্রদুর্ভাববশতঃ —ইহার পরে চিহ্নটি অনর্থক দিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। পরের বাক্যটি হইতে জানা যায় এই বাক্যটি সংশয়াত্মক, সেজন্য "কি" শব্দটির বিশেষ অর্থ স্ফুট করিতে ইহার পরে একটি কমা চিহ্ন (Comma) দিলে অর্থ সুগম হইত। "গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাববশতঃ ইাহার ঈদৃশ অসুখ, কি, যে কারণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে, ইহারও তাহাই।" কতকগুলি ক্ষেত্রে বাক্য অসম্পূর্ণ বাক্যার্থ সম্পূর্ণ হয় পূর্বপ্রসঙ্গের সাহায্যে যেমন—

১) "প্রিয়ংবদা কহিলেন, এই মনে করিয়া, যে, বনতোষিনী যেমন সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন সেইরূপ, আপন অনুরূপ বর পাই।" (প্রথম পরিচ্ছেদ) (ইহার পূর্বে আছে—"অনসূয়ে! 'কি জন্যে, শকুন্তলা সর্বদাই বনতোষিনীকে উৎসুকনয়নে নিরীক্ষণ করে, জান?") অর্থাৎ শকুন্তলা এই মনে করিয়া উহাকে নিরীক্ষণ করে……ইত্যাদি।

২। "হাঁ মহাশয়! নির্বিঘ্নে তপস্যাকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, এক্ষণে, অতিথিবিশেষের সমাগম লাভ দ্বারা, সবিশেষ সম্পন্ন হইল।" অর্থাৎ প্রথম বাক্যের কর্তা "তপস্যাকার্য্য" দ্বিতীয় বাক্যেরও

প্রসঙ্গানুযায়ী কর্তা।

৩। "রাজা কহিলেন, নদীর বেগ তাহার কারণ। মাধব্য কহিলেন, তুমিও আমার অঙ্গবৈকল্যের।" (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) এখানে "অঙ্গবৈকল্যের" পদটির পর "কারণ" শব্দটির পুনরুল্লেখ করিলে বিশেষ রচনা দোষ ঘটিত না।

৪। "শকুন্তলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সন্তুষ্ট না হইয়াই বা কি করে।"

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ) স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এখানে কর্তা উহ্য—পূর্বপ্রসঙ্গ হইতে "মধুকর" পদটি বুঝিয়া লইতে হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে সংলাপের মধ্যে একজনের উল্লিখিত পদ অন্যের বক্তব্যে প্রসঙ্গক্রমে ধরিয়া লইতে হইতেছে বলিয়া তেমন দূষনীয় নহে। সংস্কৃত নাটকের এইরূপ ব্যবহার বিদ্যাসাগর অনুসরণ করিয়া যথেষ্ট দোষ করেন নাই।

প্রত্যক্ষ উক্তির (Direct naration) ব্যবহারে বিদ্যাসাগর অনেক সময়ে কর্তার পরে একটি কমা চিহ্ন দিয়া উক্তিটি তাহার পরে লিখিয়া একটি অর্ধচ্ছেদ চিহ্ন (Semicolon) বা যতি চিহ্নের পরে "এই বলিয়া" ব্যবহার করিয়া ক্রিয়াপদটির প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন—

১। "তাপসেরা, এক্ষণে আমরা চলিলাম, এই বলিয়া, প্রস্থান করিলেন।" (প্রথম পরিচ্ছেদ)

২। "মাধব্য, ভাল, আমি চলিলাম ; কিন্তু তুমি যেন আমায় নিশাচর-ভয়ে কাতর মতে করিও না ; এই বলিয়া কহিলেন………" ইত্যাদি। (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

৩। "রাজা, সুন্দরি ! শঙ্কা কি, এই বলিয়া, শকুন্তলার নয়নে ফুৎকার প্রদান করিতে লাগিলেন।" (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

অবশ্য কর্তার পরে "কহিলেন" পদ প্রয়োগ করিয়া একটি কমা চিহ্ন ব্যবহার করিয়া প্রত্যক্ষ উক্তির খণ্ডবাক্য স্থাপন করাই তাঁহার সাধারণরীতি। যে ক্ষেত্রে, উক্তিটি করিবার পর অন্যকিছু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতে চাহিয়াছেন, কেবল সেই ক্ষেত্রেই উক্ত রূপ পদক্রম ব্যত্যয়। এই সকল স্থানে কর্তার ক্রিয়া হইতে দূরান্বয় ঘটে। "এই বলিয়া" এইরূপ ব্যবহার না করিয়া সমাপিকা ক্রিয়া "কহিলেন" ও তাহার পর সংযোগমূলক অব্যয় "ও" অথবা "এবং" ব্যবহার করিলে এইরূপ দূরান্বয় দূর করা যাইত। কিন্তু ঐ রূপ বাক্য ব্যবহার ইংরাজী ভাষার প্রভাবের ফল। ইহা বিদ্যাসাগরের রচনায় তেমন দেখা যায় না।

বিদ্যাসাগরের সর্বত্রই প্রত্যক্ষ উক্তির (Direct narration) ব্যবহার করিয়াছেন। যেখানে উক্তির ভিতরে উক্তি সেখানেও পরোক্ষ উক্তি (indirect

narration) ব্যবহৃত হয় নাই—কারণ পরোক্ষ উক্তির ব্যবহারও পাশ্চাত্ত্য ভাষার প্রভাবজাত। যেমন (১) "শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আমাদের গুরুদেবের যে সন্দেশ লইয়া আসিয়াছি, নিবেদন করি শ্রবণ করুণ—মহর্ষি কহিয়াছেন, আপনি আমার অনুপস্থিতিকালে, শকুন্তলার পানিগ্রহণ করিয়াছেন…" ইত্যাদি। (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) ২) "শকুন্তলা কহিলেন,……তখন তুমি পরিহাস করিয়া কহিলে, সকলেই সজাতীয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে; তোমরা দুজনেই জঙ্গলা; এ জন্য ও তোমার নিকটে গেল।"—ইত্যাদি

কয়েকটি পদের ব্যাকরণ দোষ আসিয়া পড়িয়াছে। যেমন "আপনকার শস্ত্র……নিরপরাধীকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে।" ("নিরপরাধ"-ই শুদ্ধপদ)। (প্রথম পরিচ্ছেদ) "সাতিশয়" ও "নিরতিশয়" শব্দদ্বয় তিনি প্রায়ই ব্যবহার করিয়াছেন। "অতিশয়" শব্দ বিশেষণরূপেই ব্যবহার করা হয় এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগে উহা বিশেষ্যরূপে গ্রহণীয় কিনা সন্দেহ। "তাত! এই হরিণী নির্বিঘ্নে প্রসব হইলে, আমায় সংবাদ দিবে,…" (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) ব্যাকরণ-শুদ্ধ প্রয়োগ হইবে "হরিণী নির্বিঘ্নে প্রসূত হইলে" অথবা "হরিণীর নির্বিঘ্ন প্রসব হইলে"। "আমি, তৎকলে তাঁহার প্রতি যে ক্রূরের ব্যবহার করিয়াছি……" (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 'ক্রূর'-বিশেষণ, এইস্থলে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে—স্বীকার করা যায় কিন্তু 'ক্রূর ব্যবহার' বলিলেই চলিত--বর্তমানে "ক্রূরের ন্যায় ব্যবহার" প্রয়োগ হইয়া থাকে।

"তখন কণ্ব কহিলেন, "…তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হইয়া, তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে" (চতুর্থ-পরিচ্ছেদ)। "না হইয়া" কথাটি "কোথায়" কথাটির সহিত সংযুক্তার্থক, কিন্তু উপস্থিত ব্যবহারে "সান্ত্বনা করিবে" ইহার সহিত "না করিয়া" ব্যবহার করিলে সঙ্গততর হইত।

ধ্বনিতত্ত্বানুসারী একটি অশুদ্ধ প্রয়োগ দেখা যায় "পিসি আমার ডানি চোক নাচিতেছে কেন" (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) "চক্ষু" হইতে "চউখ" ও "চোখ" হওয়া সঙ্গত এবং "দক্ষিণ" হইতে "ডাহিন" লেখা উচিত ছিল—"হ" ধ্বনি লোপ বশতঃ "ডাইন" হইতে পারিত—কিন্তু "ডানি" হয় না ইহার মূলে রহিয়াছে "ভ্রান্ত নিরুক্তি"। কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্রিয়া ব্যবহরে চলিত রূপ আসিয়া পড়িয়াছে। গৌতমী ও শকুন্তলার কথোপকথনে (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) সাধু ও চলিতরূপের মিশ্রণ দেখা যায়।

"শুনিলাম! আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল; এখন কেমন আছ, কিছু উপসম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল, এখন অনেক ভাল আছি।

তখন গৌতমী·········কহিলেন, বাছা! সুস্থ শরীরে চিরজীবিনী হয়ে থাক।·········তখন গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর রোদ নাই। অপরাহ্ন হয়েছে, এস কুটীরে যাই।"

এই স্থলে গৌতমী বৃদ্ধা তাপসী বলিয়া তাঁহার মুখে ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মুখে চলিত রূপ ব্যবহার যদি অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তথাপি তাহার সহিত "শুনিলাম" "নাই" ইত্যাদি সাধুরূপ মিশ্রিত রহিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ পরিচ্ছেদে অকস্মাৎ প্রিয়ংবদার মুখে দেখ যায়—

> "সখি! তুমি কি পাগল হয়েছ? একথাও কি শকুন্তলাকে শুনাতে হয়?" অথচ তাহার পূর্বেই প্রিয়ংবদা অনসূয়াকে বলিয়াছে—"দেখ দেখ, শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া একবারে বাহজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছে···············" ইত্যাদি।

এমন কি, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দুষ্যন্তও বয়স্যের সহিত আলাপ করিতে করিতে বলিয়াছেন "মরিলেও আমার এ দুঃখ যাবে না।" ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ধীবর চৌকিদার ও নগরপালের সংলাপে ক্রিয়ারূপে সাধুভাষাই ব্যবহৃত। মনে হয় শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংলাপের ভাষার পার্থক্যের জন্য সাধু ও চলিতরূপ যথাক্রমে ব্যবহার করা অপেক্ষা তৎসম প্রধান ও প্রায় তৎসমবর্জিত শব্দ ব্যবহারই বিদ্যাসাগর রীতিসিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। তথাপি সার্থক প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে অতি সঙ্গত কারণেই কিছু অসাবধানতাবশতঃ প্রয়োগ শৈথিল্য দেখা গিয়াছে।

সর্বনাম প্রয়োগেও চলিত সাধুর পার্থক্য রক্ষা হইয়া উঠে নাই। কর্তারূপে সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম "এ" এবং "ও"-এর ব্যবহারই দেখা যায়, তির্যক প্রাতিপদিকরূপে "ইহা" এবং "উহা"ই প্রযুক্ত। কর্মরূপে "এই" শব্দ নিয়োজিত। সর্বনামীয় বিশেষণরূপে "এই" শব্দের ব্যবহারই সমধিক কখনও কখনও "এ" শব্দেরও ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা, "এক্ষণে" "এ রূপ" "এ দিকে" প্রভৃতি আবার "এই আশঙ্কা", "এই নিমিত্ত" প্রভৃতি। সম্বন্ধসূচক সর্বনাম "যা" "যাহা" শব্দদ্বয়ের ব্যব্যহারেও অনুরূপ শিথিলতা দেখা যায়। যেমন, প্রথম পরিচ্ছেদে, প্রিয়ংবদা যা মুখে আসিতেছে, তাই বলিতেছে,······" চতুর্থ-পরিচ্ছেদে "তিনি কহিলেন, আমি যাহা করিয়াছি, তাহা অন্যথা হইবার নহে। "তদীয়" শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে আবার "তাহার" "তাঁহার" ইত্যাদি শব্দও দেখা যায়। "ইহার মত". "আমার মত" বা "যেরূপ", "সেইরূপ" ইত্যাদি স্থলে "—দৃশ" যুক্ত "ঈদৃশ" "সাদৃশ", "যাদৃশ", "তাদৃশ" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে বিদ্যাসাগর তাঁহার নিজস্বতা চিহ্নিত করিয়াছেন। যেমন "ঈদৃশ স্থানে মাদৃশ জনের এতদনুযায়ী ফললাভের

সম্ভাবনা কোথায়।" (প্রথম) "যখন তাদৃশ অনুরাগ এতাদৃশ ভাব অবলম্বন করিয়াছে, তখন আমি পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া কি করিব "তৎকালে, তপোবনে, তাদৃশী অমায়িকতা দেখাইয়া ও ধর্মপ্রমাণ প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে এরূপ দুর্বাক্য বলিয়া, প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নয়।" (পঞ্চম)। এই উদাহরণই "এরূপ" —এর ব্যবহারও দেখি আবার চতুর্থ-পরিচ্ছেদে দেখি "তেমন আকৃতি কখনও গুণ-শূন্য হয় না।"

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পদের ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্য স্ফুটিত। "সবিশেষ ক্লেশ", "মহান্ কোলাহল", "সাতিশয় প্রীত", "নিরতিশয় ব্যস্ত", "যৎপরোনাস্তি বিরক্ত", "অশেষবিধ সুখসম্ভোগে" প্রভৃতি কয়েকটি উদাহরণে যে সকল বিশেষণের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ঐগুলি তাঁহার বিশিষ্টতা সূচিত করে।

"প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত", "আজ অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম", "এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা", "যাবৎ বিবাহ না হইতেছে, তাবৎ পর্য্যন্ত মাত্র" ইত্যাদি ব্যবহার বিদ্যাসাগরের নিজস্ব।

"সঙ্গে" অর্থে "সমভিব্যাহারে" তাঁহার অতীব প্রিয়। যেমন "সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে" ইত্যাদি। এমন কি "একসঙ্গে" অর্থেও ইহার প্রয়োগ করা হইয়াছে। "চল আজ উভয়ে এক সমভিব্যাহারে ভগবানের চরণ দর্শন করিব।" (সপ্তম পরিঃ) "সহচরী সহিত" এখানে সহিতের প্রয়োগ আছে, কিন্তু "সঙ্গে" শব্দের ব্যবহার বিরল। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে "নগরপাল······চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।" এখানে মনে হয় ইতরজনের কার্য বর্ণনা প্রসঙ্গে "সমভিব্যাহারে" পরিত্যক্ত হইল। নতুবা সংলাপে কণ্বের মুখে ঐ একই অর্থে সমভিব্যাহারে প্রযুক্ত হইয়াছে। "দুই শিষ্য ও গৌতমীকে সমভিব্যাহারে দিয়া তোমায় পতিসন্নিধানে পাঠাইয়া দিব।" (চতুর্থ পরিঃ) "জন্মাবচ্ছিন্নে" শব্দটি বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রিয়। "জন্মাবচ্ছিন্নে দারপরিগ্রহ করেন নাই," (প্রথম) যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে চাতুরী শিখে নাই (পঞ্চম)। ক্রিয়াপদে সমাপিকা ক্রিয়ারূপে সর্বত্র "কহিল" "কহিলেন" ইত্যাদি পাওয়া যায়, অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে "বলিয়া" প্রভৃতি পদই প্রচলিত। "বলে" সমাপিকা ক্রিয়াপদ পাওয়া যায় "এইজন্যেই তোমায় সকলে প্রিয়ংবদা বলে" (প্রথম)। "কথা কহিতে কহিতে" অসমাপিকা ক্রিয়া পদে কহ্ ধাতুর প্রয়োগ শুধু এই স্থলেই পাওয়া যায়।

প্রাগ্ বিদ্যাসাগর রচয়িতাগণ সম্মানসূচক ক্রিয়াপদের যত্র তত্র ব্যবহার

করিয়াছেন। রামমোহনও প্রয়োগ করিয়াছেন—'শাস্ত্র হয়েন'। বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে সাবধান ছিলেন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ধীবর, চৌকীদার ও নগরপালের এবং সপ্তম পরিচ্ছেদে বালক ভরতের জন্যই কেবল সম্মানসূচক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় নাই। অন্যান্য সকল পাত্রের জন্যই বর্ণনায় সম্মানসূচক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্মান সূচক ক্রিয়াপদ না হইলে, অতীত কালে ও ভবিষ্যৎ কালে স্বার্থে—'ক'-এর ব্যবহার বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্য, যথা "প্রিয়ে! তোমার মৃণালবলয়, অচেতন হইয়াও, এই দুঃখিত ব্যক্তিকে আশ্বাসিত করিলেক, কিন্তু তুমি তাহা করিলে না" (তৃতীয়) "......পরিশেষে সমধিক ক্ষোভ পাইতে হইবেক" (সপ্তম) ......ইত্যাদি। সম্ভব হওয়া, জিজ্ঞাসা করা ও সম্বোধন করা বিশেষতঃ এই কয়েকটি —ক্রিয়ায় নামধাতুর প্রয়োগ বিদ্যাসাগরের বিশিষ্টতা চিহ্নিত করে।

অনির্দিষ্ট কর্তায় '—এ' বিভক্তির প্রয়োগ কচিৎ দেখা যায়—"এক অতি বৃহৎ রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে।" করণ, অপাদান ইত্যাদি অর্থে কয়েকটি বিশিষ্ট '-এ' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়। "আঙ্গুরীয় রাজকীয় নামাক্ষরে অঙ্কিত" "ইনি ঋণে মুক্ত হইলেন" (প্রথম)। সাধারণতঃ বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ যখন ক্রিয়াবিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত, তখন '—এ' বিভক্তি সংযুক্ত হইয়াছে। '...রক্ষণার্থে সত্বর ও যত্নবান্ হও' "স্থির কর্ণে শ্রাবণ করিতেছে", "সহাস্য বদনে, কহিলেন" (প্রথম), শাপ দিয়া রোষভরে সত্বরে প্রস্থান করিতেছেন (চতুর্থ)। বিশেষণরূপে "সত্বরে", যথা "সত্বর ও যত্নবান্ হও" (প্রথম)। কিন্তু "নিমিত্ত" ও "নিমিত্তে" পদদ্বয়ের ব্যবহারে পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই। "অনসূয়ে......আমি চলিলাম......কি নিমিত্তে?" (প্রথম); আবার "আমিও তপোবনের পীড়া পরিহারের নিমিত্ত চলিলাম" (প্রথম)। নিমিত্ত/নিমিত্তে পদের স্থলে একমাত্র 'জন্যে', পদই ব্যবহৃত, 'জন্য' পদের ব্যবহার নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদে "বিনা প্রণাম প্রদক্ষিণ......যাওয়া অবিধেয়" এই স্থলে উপসর্গরূপে "বিনা"-র ব্যবহার বিদ্যাসাগরের রচনায় এক বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। আসন্নভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতে অতীত ক্রিয়াপদের ব্যবহারও বিদ্যাসাগরের ভাষার একটি বিশিষ্টতা আনিয়াছে। যেমন "এক্ষণে আমরা চলিলাম এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন" (প্রথম) "আজ অবধি দূরবর্ত্তিণী হইলাম" (চতুর্থ) "অমাত্যকে বল আমি কিয়ৎ দিনের নিমিত্ত দেবকার্য্যে ব্যাপৃত হইলাম।" (ষষ্ঠ)।

বাক্যে কতকগুলি সূচক-পদের ব্যবহার বিদ্যাসাগরের বাক্যরীতিকে বিশিষ্টতা দিয়াছে। সূচক-পদ হিসাবে "দেখ"-ক্রিয়াপদ অনেক সময়ে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবজাতও

দেখা যায়। কেরীর বাইবেলে ইহার অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। "আইস" ক্রিয়াপদও বিদ্যাসাগর অনেক সময় প্রস্তাবসূচক বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহার করিয়াছেন। বিতর্ক-মূলক সংলাপে বা জিজ্ঞাসাবাদে "ভাল" পদ অনেক সময়ে বাক্যকে সূচিত করিয়াছে। "মাধব্য"··· ভাল বয়স্য যদি····

সপ্তম পরিচ্ছেদে "ভাল ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলেই এক কালে সকল সন্দেহ দূর হইবে"।

বিশিষ্ট অর্থে বিদ্যাসাগরের কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়— আধুনিক শব্দার্থের সঙ্গে ঐ সকল শব্দের অর্থ পৃথক্।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে— "ভগবান্ কণ্বের কুশল?" এই জিজ্ঞাসার উত্তরে "ঋষিরা কহিলেন, হাঁ মহারাজ, মহর্ষি সর্বাংশেই কুশলী"। বর্তমানে কুশলী শব্দটির প্রয়োগ কৃতিত্ববান্ বা কৃতী অর্থে। এই স্থানে "কুশল" বিশেষ্য পদ ধরিয়া, কুশল আছে যাহার এই অর্থে কুশলী শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে।

মৃগয়ারত দুষ্যন্ত "মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে "ঘুরিতে ঘুরিতে" অর্থে। "ভ্রমণ" অপেক্ষা "পরিভ্রমণ" শব্দটি সুষ্ঠুতর হইত। "ভ্রমণ" শব্দটির ব্যবহার অন্যরূপ।

"আমি এই রাজ্যের ধর্মাধিকারে নিযুক্ত, পুণ্যাশ্রমদর্শন প্রসঙ্গে এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছি" (প্রথম পরিঃ) রাজা দুষ্যন্তের এই পরিচয় গোপনের মধ্যে "প্রসঙ্গে" শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত।

"বিশ্বামিত্র নামে এক অতি প্রভাবশালী রাজর্ষি আছেন" (প্রথম পরিঃ) এখানে প্রভাবের অর্থ প্রতিপত্তি বা প্রভূত ক্ষমতা,— বর্তমানে উহার অর্থ ভিন্ন।

"অনর্থ কাল হরণ করিতেছ কেন" (চতুর্থ পরিঃ) এখানে "অনর্থ" বৃথা অর্থে ব্যবহৃত। বর্তমানে "অনর্থ" একটি বিশেষ অর্থে বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। বৃথা অর্থে "অনর্থক" শব্দই ব্যবহৃত।

"ধর্ম-প্রমাণ প্রতিজ্ঞা" (পঞ্চম পরিঃ) — এখানে "প্রমাণ" কথাটির বর্তমান অর্থ হইতে অন্য এক অর্থ— ধর্মকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা এই অর্থ।

"তোমরা, দুজনেই জঙ্গলা" (ষষ্ঠ পরিঃ) — এখানে জঙ্গলা শব্দের স্থলে বন্য বা আরণ্যক শব্দ প্রয়োগ সুষ্ঠুতর হইত। সম্ভবতঃ ইহা বিদ্যাসাগরের জ্ঞাত একটি চলতি ভাষায় ব্যবহৃত হইত— সেইজন্য ইহা শকুন্তলার সংলাপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

॥ ৪ ॥

বর্তমান গদ্য ভাষার ক্রমোন্নত অবস্থার দৃষ্টিকোণ হইতে সাহিত্যিক গদ্য ভাষার সফল প্রসাধকের রচনার দোষগুণ বিচার করা হইল। ভাষার দোষত্রুটি যে কয়েকটি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার যথাসম্ভব কারণও নির্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহার পূর্ববর্তী লেখকগণের ভাষায় যে পরিমাণে ক্লিষ্টান্বয়, অনুপযুক্ত শব্দ ব্যবহার ইত্যাদি রচনা দোষ দেখা যায় বিদ্যাসাগরের ত্রুটি তাহার তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। রচনাগুণের উদাহরণ দিতে হইলে সমগ্র গ্রন্থের উদ্ধার করা প্রয়োজন হইবে। গদ্যের মধ্যে ছন্দ আনয়ন বিদ্যাসাগরের অপূর্ব কৃতিত্ব। বাক্যমধ্যে শব্দের ভারসাম্য কি ভাবে আসিতে পারে, সে দিকে সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের চেতনার মধ্যেই এক বিশেষ পটুত্ব ছিল। বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের পাঠ-বিন্যাসের প্রসঙ্গে উহা আলোচিত হইয়াছে। শব্দাবলীর মিতাক্ষর প্রয়োগ বাক্যগুলিকে ছন্দঃসুষমা দান করিয়াছে।

অনেক সংস্কৃতে পণ্ডিত লেখক বাঙ্গালা ভাষার রচনায় শব্দানুপ্রাসে আসক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর জানিতেন যে ইহার আধিক্য সৌকুমার্যগুণ বিনষ্ট করে। সেইজন্য তিনি উহা পরিহার করিতে যত্নবান্ ছিলেন।

শব্দার্থের যথাযথ প্রকাশক্ষম পরিমিত শব্দ-ব্যবহারের দ্বারা বিদ্যাসাগর তাঁহার রচনায় কান্তগুণ ও প্রসাদগুণ সমবেত করিয়াছেন। ভাবানুযায়ী গাম্ভীর্য ও ওজস্বিতা এবং সুললিত স্নিগ্ধতা ভাষার মধ্যে সঞ্চার করার প্রচেষ্টায় তিনি অনেক সাফল্য লাভ করিয়াছেন। যথাযথ ভাববহনে তাঁহার ভাষার অকৃত্রিমতা প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। বাঙ্গালা গদ্যে সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সফল প্রতিভার উদ্দেশে প্রণাম জানাই।

ক্ষেত্র গুপ্ত

মৃত্যুঞ্জয় থেকে বিদ্যাসাগর : বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা

মুখবন্ধ

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে বোধগম্য এবং সব রকমের ভাব ও চিন্তাপ্রকাশের যোগ্য করে তোলেন। বিষয়ের গুরুভার নিয়ে রামমোহনের গদ্য বেশ ক্লেশের সঙ্গে চলেছে। বিদ্যাসাগর সেই শ্রান্তি হরণ করলেন। যুক্তিনিষ্ঠা, প্রতিবাদীর বক্তব্য-খণ্ডন, তথ্যবিন্যাস, প্রমাণ প্রয়োগের কাজ প্রথম দেখা গিয়েছিল রামমোহনের লেখায়। যদিও বাংলা গদ্যে বই লেখা হয়েছে রামমোহনের অনেক আগে থেকে। কিন্তু এতদিন তা ছিল গালগল্পের ভাষা। রামমোহনই প্রথম বিষয়ের গুরুত্ব আনলেন। কিন্তু তাঁর স্থাবর গদ্যে সে লক্ষ্য যথার্থ বিদ্ধ হল না।

মৃত্যুঞ্জয়ের লক্ষ্য ছিল ভাষা। রামমোহনের বিষয়। বিদ্যাসাগর এদের মিলন ঘটালেন। বিষয় যেখানে তুচ্ছ ভাষা সেখানে ক্ষীণজীবী হতে বাধ্য। মৃত্যুঞ্জয়ের ফোর্ট উইলিয়ামী লেখা তার নিদর্শন। আবার বিষয় যেখানে গুরুতর ভাষা সেখানে ক্লিষ্টগতি হলে অভিপ্রায় সিদ্ধ হতে পারে না। রামমোহনে তার প্রমাণ। বিদ্যাসাগর বিষয়ের তুচ্ছতা একেবারে দূর করলেন এবং ভাষাকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তুললেন।

মৃত্যুঞ্জয় এবং রামমোহন

বাংলা গদ্যভাষা নিয়ে রীতিমত সাধনা শুরু হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিল নব্য চাকুরিয়াদের ভাষা শেখানো এবং গৌণ কিন্তু বৃহত্তর উদ্দেশ্য বাংলা গদ্যকে লেখার উপযোগী করে গড়ে তোলা। উইলিয়াম কেরী বাইবেল অনুবাদ করতে গিয়ে সমস্যাটি বুঝেছিলেন—লেখার গদ্য চাই। যদিও প্রয়োজন সাধনই তাঁর চিন্তার উৎস। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার বাইবেল প্রকাশ করতে করতে কেরী কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও 'কাশীদাসী মহাভারত মুদ্রিত করেছিলেন। বাংলা ভাষাকে শুধু উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহনরূপে দেখলে এরূপ ঘটত না। তিনি বাংলা সাহিত্যকেও ভালোবেসেছিলেন। এই সাহিত্য প্রীতির ফলেই বাংলা গদ্যরীতির যথার্থ অনুসন্ধানে তিনি নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন। তিনি সচেতনভাবে গদ্য ষ্টাইলের কথা ভেবেছেন। বাইবেল অনুবাদের কৃত্রিম ঢঙটি ত্যাগ করে তিনি 'কথোপকথন' এর মত পুস্তক সঙ্কলনের পরিকল্পনা করেছিলেন। লক্ষ্য করার মত এই পুস্তকের ভূমিকায় তাঁর "natural stile" রক্ষা করার ব্যাগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পুস্তকগুলি বিষয়ে মূল্যহীন, যদিও গদ্যরীতির পরীক্ষায় ও কর্ষণায় গুরুত্বপূর্ণ। 'লিপিমালা'—চিঠি লেখার আদর্শ। 'কথপোকথন' —তথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষের প্রাত্যহিক কথাবার্তার নিদর্শন, 'বত্রিশপুতুল' 'হিতোপদেশ' 'পুরুষপরীক্ষা' 'তোতাকাহিনী'—রূপকথা-উপকথা-নীতিকাহিনী প্রভৃতি সাধারণ স্তরের গল্প। ইতিহাস নামে প্রচলিত বইগুলো (যেমন প্রতাপাদিত্য বা কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র বা রাজাবলি) আসলে কিম্বদন্তী আর গালগল্পের শিথিলবদ্ধ সঙ্কলন। বড় বড় পণ্ডিত- মুন্সীর দল এই সব অকিঞ্চিৎকর প্রসঙ্গ অবলম্বন করেছিলেন। প্রসঙ্গগুলি অবলম্বনমাত্র ছিল। আসলে এঁদের অনুশীলন ভাষার রীতি নিয়ে। *

বাইবেল - অনুবাদের ইংরেজী-ঘেঁষা 'সাহেবীরীতি' আরম্ভেই বর্জিত হয়েছিল। ফার্সিবহুল 'আদালতী রীতি'ও রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিতে'র সঙ্গেই সমাপ্ত। 'কথ্যরীতি' বা সাধারণের কথাবার্তার ভঙ্গীও নিদর্শনরূপেই মাত্র সঙ্কলিত হয়েছিল 'কথোপকথনে'; মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় (১৮১৩) এই রীতি নিঃসন্দেহে একটি দ্বিতীয় ষ্টাইল। প্রথম অবশ্য সংস্কৃতবহুল 'পণ্ডিতী রীতি'। একেই

* এর কারণও নির্ণয় করা যায়। এই সব লেখকদের চিন্তা আসলে পুরানো যুগের অবশেষ। নুতন যুগের ভাবনার স্ফুরণ এখনও দূরবর্তী। তাই এঁদের বিষয়ের মূল্য এত কম।

ক্রমশ সহজ ও বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল। এবং তার নেতৃত্বে ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়।

বাংলা গদ্যের লেখক হিসেবে রামমোহনের আবির্ভাব এর পরে—এই ঐতিহ্য নিয়ে।

রামমোহন যে গদ্যভাষা তৈরী পেয়েছিলেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট কি ছিলেন জানা যায় না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি দুর্দম অভিযাত্রী ছিলেন—ভাষার ক্ষেত্রেও। যে গদ্য গালগল্প করায় অভ্যস্ত, যে ভাষা চিঠির আদর্শ শেখায়, তাতে বেদান্ত আলোচনার দুঃসাহস রামমোহনের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। পশুপাখির উপকথা থেকে সহমরণ নিবর্তন বিষয়ে বিতর্ক, ঈশ্বরের স্বরূপ ভাবনা—বিষয়ের দিক থেকে এক পায়ে এতটা পথ ডিঙিয়ে যাওয়া বড় দ্রুতগামিতার চিহ্ন। বাংলা গদ্য শৈশবে যৌবনের দায়িত্ব পেল। সেভাবে ভাষা কিঞ্চিৎ নুয়ে পড়েছিল। ভেঙে পড়ে নি। আর সে-কারণেই ভার বইতে শিখেছে, দায়িত্বহীন শৈশবকে প্রলম্বিত করে নি।

রামমোহন বিদ্যালয়ের গণ্ডী থেকে বাংলা গদ্য সাহিত্যকে মুক্তি দিলেন, ভাষাকে সাহস দিলেন। নূতন যুগের চিন্তা ও সমাজ-আন্দোলনের সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক ঘটালেন।

স্মরণ করা চলে রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে গ্রানিট স্তরের উপরে দাঁড় করাবার জন্য রামমোহন রায়ের প্রশংসা করেছিলেন। তা স্তুতি নয়, আলঙ্কারিক অতিশয়োক্তিও নয়। আসলে ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজে গদ্যভাষা যে কার্যে নিযুক্ত ছিল তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য খুব বড় হলেও পনের বছর কালও নাতিবিস্তৃত নয়। এবারে নতুনতর ও মহত্তর দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। রামমোহন এসে বাংলা গদ্যকে বিষয় মাহাত্ম্যে স্থিত না করলে এ ভাষার অগ্রগতি রুদ্ধ হত।

গদ্য হ'ল (ক) প্রয়োজনের (খ) তথ্যবহন ও জ্ঞানপ্রকাশের (গ) চিন্তার যুক্তির বিশ্লেষণের ঘ) এবং আবেগেরও ভাষা। নিত্য বাস্তব জীবনে গদ্য উক্ত প্রথম কাজটি করে চলেছে। এ তার স্বভাবোপার্জিত, সাহিত্যিকদের কর্ষণার উপরে নির্ভরশীল নয়। আবার পূর্বকথিত চতুর্থ দায়িত্বটি পালন করতে পারে কবিতাও।

বাংলা কবিতার ভাষা অবশ্য চতুর্থ এবং দ্বিতীয়— এই দ্বিবিধ কাজই করেছে গোটা মধ্যযুগ ধরে। এমন কি যুক্তি বিশ্লেষণেও হাত দিয়েছিল 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মত বইয়ে। কিন্তু এর ফলে কবিতার শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে, গদ্য সাহিত্যের আবির্ভাব বিলম্বিত হয়েছে এবং যুক্তি ও চিন্তার যোগ্য প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আসলে মধ্যযুগের জীবনযাত্রার সারল্য এবং মানস ভূগোলের সঙ্কীর্ণতা চিন্তা-যুক্তি-বিশ্লেষণের ব্যাপক তাগিদ নিয়ে আসে নি, জ্ঞানের যথার্থ আয়োজনের দায়িত্ববোধ করে নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তার মুক্তি, বহুমুখী জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন এবং যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা গদ্যভাষাচর্চাকে অপরিহার্য করে তুলল। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকেরা গদ্যচর্চা করতে গিয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি চিন্তার বিকাশ ও যুক্তি নিষ্ঠার কথা ভাবার অবকাশ পাননি। তাঁরা ভাষাকে সাবলীল ও যোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন। অথচ বিষয়ের গুরুত্ব নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাঁদের পরিবেশের সীমাবদ্ধতা এর জন্য অনেকটা দায়ী। তাঁরা যাঁদের জন্য লিখেছেন, তাঁদের সঙ্গে বিষয়-আলোচনার সুযোগ ছিল না। কোম্পানীর যোগ্য কর্মচারীরূপে তাঁরা ইংলণ্ড থেকে আগেই নির্বাচিত। তাছাড়া মৃত্যুঞ্জয় রামরাম বসু রাজীবলোচনের সমগ্র অস্তিত্বজুড়ে নবযুগের ভাবনা ও কর্মবাসনা তরঙ্গিত হয়ে ওঠে নি। যুক্তির দ্বারা মূঢ়তাকে খণ্ডিত করতে, নবজ্ঞানের ভিত্তিতে জীবনকে সমুন্নীত করতে, সমাজের সংস্কার সাধনে, মনুষ্যত্বের সামগ্রিক উদ্বোধনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকেরা ব্রতী ছিলেন না। ফলে বাংলা গদ্য সাহিত্যের যথার্থ প্রয়োজন ও সম্ভাবনার পূর্ণ-দিগন্ত তাঁদের কাছে মুক্ত হবার কথা নয়। এই বিশাল ঐতিহাসিক বোধ নিয়ে রামমোহন গদ্য লিখেছেন। এবং তিনিই জ্ঞানের যুক্তির চিন্তার বিশ্লেষণের জন্য প্রথম বাংলা গদ্যকে ব্যবহার করলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মৃত্যুঞ্জয় ভালো গদ্য লিখেছেন সন্দেহ নেই। রামমোহনের চেয়ে উন্নত তাঁর শৈলী। কিন্তু রামমোহনই গদ্যকে গদ্যের কাজে লাগালেন — যে কাজ কবিতার ভাষার অনায়ত্ত। মৃত্যুঞ্জয় আগে গদ্যের এই কার্য-কর ক্ষমতার কথা ভাবেন নি। তাকে ব্যবহার করেন নি। তাঁর একমাত্র বিষয়প্রধান পুস্তক 'বেদান্তচন্দ্রিকা' ১৮১৭ সালে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ রামমোহনের অন্ততঃ ছয়টি বইয়ের পরে।

মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের গদ্যে বিষয় ব্যবহারের এই পার্থক্য লক্ষ্য করার মত।

মৃত্যুঞ্জয় 'রাজাবলি' তে লিখেছেন—

যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধ প্রকার রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিত সর্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। সে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারী রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের সম্মুখে অঞ্জলীকৃত হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিত সেই সিংহাসনের রাজা স্বয়ং উর্দ্ধবাহু হইল।

[উদাহরণ ১]

'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় মৃত্যুঞ্জয় লিখেছেন—

ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল তবে কি আজি খাওয়া হবে না ক্ষুধায় কি মরিব! তৎপত্নী কহিল মরুকম্যানে আজি কি পিঠা না খাইলেই নয় দেকি দিকি হাঁড়ি কুঁড়ী খুদ কুঁড়া যদি কিছু থাকে। ইহা কহিয়া ঘর হইতে খুদ কুঁড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল শীলটা ভাল ঘটে লোড়াটা ঘা ইচ্ছা তা এতে কি চিকণ বাটা হয় মরুক যেমন হউক বাটি ত। ইহা কহিয়া খুদকুঁড়া বাটিয়া কহিল বাটা তো একপ্রকার হইল অলুনি পিঠা খাইবা না লুনতেল আনিতে হইবে। গতিক্রিয়ার এই কথা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল ওরে বাছা ঠক তৈল লবণ কোথা হইতে গোছে গাছে কিছু আন। ইহা শুনিয়া ঠক নামে তৎপুত্র কোন পড়সীর ছালিয়াকে আয় আমার সঙ্গে তোকে মোয়া দিব এইরূপে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া ঐ বালককে বন্ধক রাখিয়া তৈল লবণ লইয়া ঘরে আসিল।

[উদাহরণ ২]

রামমোহন রায়ের 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সম্বাদ' থেকে উদ্ধৃতি—

বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধঅঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীগৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতিপ্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান, মার্জ্জন, ভোজনাদিপাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে,......ঐ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোন অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন; ......যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামির ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টি গোচরে প্রায় ব্যাভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই, স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে.........

[উদাহরণ ৩]

রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মণসেবধি'তে লিখেছেন—

কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাহারা মিশনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে, লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের উৎকর্ষ ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা-সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যাপিও যিশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানাদেশে আপন ধর্ম্মের উৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেইরূপ মিশনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাংলাদেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপরও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না,............

[উদাহরণ ৭]

উদ্ধৃত উদাহরণগুলি অনেকটাই প্রতিনিধিত্বমূলক, সতর্কভাবে নির্বাচিত নয়। এদের বিষয় ও বিন্যাসের তুলনা করলে দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয় গল্প করেছেন, বর্ণনা দিয়েছেন। কোথাও ভাষায় চিত্র রচিত হয়েছে, ক্বচিৎ চরিত্রের রূপরেখাও প্রকাশিত। অপরপক্ষে রামমোহন চিন্তা করেছেন, যুক্তি দিয়েছেন — মানব অস্তিত্বের, জীবনের চিন্তার ও কর্মের স্বাধীনতা নিয়ে ভেবেছেন, নারীর মূল্য নিয়ে বড় রকমের প্রশ্ন তুলেছেন। মৃত্যুঞ্জয় গদ্যকে দিয়ে যে কাজ করিয়েছেন আগে তা পদ্য করত। পরবর্তীকালে কথাসাহিত্য সে দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু বাংলা গদ্যকে চিন্তার ভাষারূপে দাঁড় করাবার ক্ষেত্রে রামমোহনের নেতৃত্ব ছিল অসপত্ন।

.....

মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরীতি যে রামমোহনের চেয়ে উন্নততর পূর্বোদ্ধৃত চারটি উদাহরণের তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে। সুবিধার জন্য একটি তুলনামূলক ছক এখানে দেওয়া হল।

মৃত্যুঞ্জয়	রামমোহন
১. বাক্যগুলি ছোট। গঠনভঙ্গী সরল। জটিল বাক্যও [যেমন ১নং উদাহরণে] দুটিমাত্র বাক্যাংশের সহযোগে গঠিত, সংখ্যায় কম। সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার বেশী।	১. বাক্যগুলি দীর্ঘ, জটিল, বহু বাক্যাংশ সমন্বিত। এক কর্তার একাধিক সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া।
২. কর্তা ও ক্রিয়ার সংশক্তি। একে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করায় কখনও বাক্য - কাঠামো নিয়ন্ত্রণাতীত হয়ে পড়ে না।	২. কর্তা-ক্রিয়ার দূরান্বয় প্রায়ই অর্থগত দুরূহতার জন্য দায়ী।
৩. ক্রিয়াপদের ও শব্দ - বিভক্তির ব্যবহার সামঞ্জস্যপূর্ণ।	৩. শব্দবিভক্তির ব্যবহার যথাযথ। কিন্তু ক্রিয়াপদের প্রয়োগে নানারূপ অসঙ্গতি আছে। 'সহিষ্ণুতা করে' 'উপদেশ করিয়াছে' —এই জাতীয় ব্যবহার আছে। ক্রিয়াপদের বাচ্যানুগামিতাও সামঞ্জস্যহীন।
৪. বাক্য মধ্যে সুরের উত্থান-পতন অনুভব করা যায়।	৪ "তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।" [প্রমথ চৌধুরী]
৫. বাক্যগুলির আকৃতি সুনির্দিষ্ট। [illegible] ক্লান্তি অতিক্রম করা সম্ভব।	৫. বাক্যগুলির আকার সুনির্দিষ্ট নয়। শুধু বিরাম চিহ্নের অভাবের

মৃত্যুঞ্জয়	রামমোহন
বাক্য পরম্পরায় একটি গতিশীলতা আছে।	জন্য এরূপ ঘটে নি। 'এবং' 'যদ্যাপি' 'অর্থাৎ' 'যেহেতু' প্রভৃতি অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত হয়ে এক রুদ্ধ-শ্বাস বাক্যব্যূহ গঠিত। যেন অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু ঠিক ভাবে বলা যাচ্ছে না তার জন্য রয়েছে অস্থৈর্য। আবার বিভিন্ন বাচ্য একই বাক্যে সংবদ্ধ।
৬. ভাষা চিত্রময়।	৬. ভাষা যুক্তিপূর্ণ, চিন্তা-উদ্রেককারী।

কিন্তু 'বেদান্তচন্দ্রিকা'য় তত্ত্বকথা বলতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা এত সাবলীল ও প্রাণবন্ত থাকতে পারে নি। উদাহরণ—

দুর্গম বন পর্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া প্রথম পথপ্রবর্তক প্রাচীনতর বিজ্ঞাজ্ঞান বৃদ্ধ পণ্ডিতদের কর্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া সেই পথের পূর্বাপেক্ষা উত্তমত্বকারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা তদাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতেরদের হইতে বড় হন না যে প্রথম পথ প্রবর্ত্তক সেই বড় ও তৎপ্রবর্ত্তিত ও তদুত্তর পণ্ডিত পরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ।

[উদাহরণ ৫]

১৮১৭ সালে এই পুস্তক প্রকাশিত। এটি লেখকের সর্বশেষ রচনা। এর সঙ্গে রামমোহনের 'ঈশোপনিষৎ' গ্রন্থের ভূমিকার (১৮১৬ সালে প্রকাশিত) অংশ বিশেষের তুলনা সহজেই করা যেতে পারে।

এস্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে অতি অল্পদিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারি আর অতিমুল্য হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না আপনার বংশের পরম্পরা মতে আর কেহ ২ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেইরূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তমফল হইবে।

[উদাহরণ ৬]

এই দুই অংশের তুলনা করলে দেখা যাবে মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন উভয়ের ভাষাই দূরান্বয় দোষদুষ্ট, বিন্যাসে বিশৃঙ্খল, কর্তার বিভক্ত্যান্তরূপ ত্রুটিপূর্ণ এবং বাক্য অতিদীর্ঘ ও জটিল। যে সব লক্ষণে রামমোহনের গদ্য মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা থেকে দুর্বল বিবেচিত হয়েছিল সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ে বর্তেছে। মৃত্যুঞ্জয় যদি রামমোহনের ন্যায় বিষয় নিয়ে লিখতেন তাহলে তাঁর চেয়ে উন্নত গদ্যরীতি আবিষ্কারের সুযোগ পেতেন কি?

মৃত্যুঞ্জয় ও বিদ্যাসাগর : রামমোহন ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয়ের সাবলীলতা এবং রামমোহনের বিষয় মর্যাদার মধ্যে মিলন ঘটালেন। এই মিলন সাধনের পালার কয়েকটি দিক। প্রথমেই গভীর চিন্তা ও যুক্তির ভাষা হিসেবে ভাষার জড়ত্বমোচন। ব্যাপারটি যথার্থ পরিচয় নেবার জন্য বিদ্যাসাগরের রচনা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত হল।

'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' বই থেকে স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়ম দোষে পুরুষ জাতির নিতান্ত অধীন; এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের অতিশয্যবশতঃ স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পুরুষজাতি, কতিপয় অতিগর্হিত প্রথার নিতান্ত বশবর্তী হইয়া, হতভাগা স্ত্রীজাতিকে অশেষবিধ যাতনাপ্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহ-প্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

[উদাহরণ ৭]

বিদ্যাসাগরের বাক্যগঠন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। লেখক তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। ভাষা তার সম্পূর্ণ আয়ত্ব। পদবিন্যাস, বাক্যাংশ সমন্বিত জটিল বাক্য-রচনা, বিশেষণের প্রয়োগ, সমাসবদ্ধপদের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত ও ভাবঘনত্ব সৃষ্টি অনায়াসসাধ্য হয়ে উঠেছে।

রামমোহনের পূর্বোদ্ধৃত রচনাগুলির [উদাহরণ ৩, ৪, ৬] সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির তুলনা করা যেতে পারে। মৃত্যুঞ্জয়ের ও রামমোহনের ভাষার তুলনা আগে করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের ভাষার সামনে রামমোহনের গদ্যের আরও কিছু

দুর্বলতা চোখে পড়ে। যেমন —

১. ক্রিয়া ও কর্তার সম্পর্ক ঘটিত ত্রুটি—

'…যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যাভিচারদোষে মগ্ন হয়…' [উদাহরণ ৩ থেকে]
কে মগ্ন হয়? এই ক্রিয়ার কর্তা 'স্বামী' ক্রিয়া থেকে দূরবর্তী, তার রূপ ষষ্ঠি বিভক্তির [স্বামীর]; ফলে এই ক্রিয়াপদের যোগ্য কর্তা সে হয়ে ওঠে নি। আবার, উদ্ধৃত অংশের পরেই '… এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই…' 'তাহার' বলতে অবশ্যই পূর্বোক্ত স্বামীকে বোঝানো হয়েছে; কিন্তু একটু আগেই 'স্ত্রীর'-এই পদটিও আছে। সর্বনামটি কোন্ পদের প্রতিনিধি তা ধরা কঠিন। আবার 'আলাপ নাই' যে 'স্ত্রীর' সেই পদটিকে এত দূরে বসানো হয়েছে যাতে সম্পর্ক আবিষ্কার করে নিতে কষ্ট হয়। '…স্বামী দরিদ্র যে পর্যন্ত থাকেন তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়…' [উদাহরণ ৩]
'ক্লেশ পায়' এবং 'কাতর হয়' এই দুটি ক্রিয়ারই কর্তা 'স্ত্রী' পদটি অনুল্লিখিত থাকায় অর্থবোধ দুরূহ হয়ে পড়েছে।

২. জটিল বাক্যে বিন্যাসগত বিপর্যয় —

'কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাহারা মিশনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহারদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন।' [উদাহরণ ৪ থেকে]
নিম্নরেখ বাক্যাংশটি ইংরেজী Adjective clause- এর মতো। বাংলায় তার যথাযথ অনুসরণ করায় অর্থবিপত্তি ঘটেছে।
'… প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয়…' [উদাহরণ ৪ থেকে]
নিম্নরেখ বাক্যাংশে এখানেও Adjective clause- এর অনুকরণ।

৩. বিশেষণ ব্যবহারে ত্রুটি —

ঠিক আগে ২ নং পর্যায়ে উল্লিখিত Adjective clause গুলি বিশেষণে রূপান্তরিত করলে ভাষারীতি যে অনেক স্বাভাবিক হয়ে আসত রামমোহন তা অনুধাবন করতে পারেন নি। আবার বিশেষণকে নামপদের সঙ্গে অন্বিত না করে ক্রিয়াপদে যুক্ত করার প্রবণতাও তাঁর আছে। যেমন —

'…পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন…।'
'…যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন।'

৪. ইংরেজী ধরণের ক্রিয়াপদের ব্যবহার —

'...কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়....' [উদাহরণ ৪]

'...প্রশংসনীয় হয় না।' — [উদাহরণ ৪]

'...তাহার সহিত আলাপ নাই...' [উদাহরণ ৩]

নিম্নরেখ পদগুলি যথাক্রমে is, is not, has no talk জাতীয় ইংরেজীপদের হুবহু অনুবাদ। বাংলা ব্যবহারের সঙ্গে এগুলি একান্ত সামঞ্জস্যহীন।

৫. অব্যয় ব্যবহারে বিপর্যয় —

"যেহেতু", "যদ্যপি", "কিন্তু", "যেমন", "তবে" প্রভৃতির সুসম ও যথাযথ প্রয়োগ রামমোহন আবিষ্কার করতে পারেন নি।

চিন্তামূলক গদ্যে যে মন্ত্রে বিদ্যাসাগর রামমোহনের জগত থেকে অনেক পথ অনায়াসে এগিয়ে গেলেন পূর্বোদ্ধৃত অংশটির [উদাহরণ ৭] সাহায্যে তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

১. বিদ্যাসাগরের গদ্যে ইংরেজী ভঙ্গীর অনুকরণ নেই। 'স্ত্রী জাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়মদোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন।' 'পৃথিবীর প্রায় সর্বপ্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা।' দুটি বাক্যেই ক্রিয়াপদ উহ্য। এটি বাংলার নিজস্ব বাগ্‌রীতি। ইংরেজী আদর্শে রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগর 'হয়' ক্রিয়াটি যোগ করেন নি।

২. জটিল বাক্য গঠনে বিদ্যাসাগরের সতর্কতা লক্ষ্য করার মতো।

ক. বহু অংশ - সমন্বিত বাক্য তৈরি করতে গিয়ে ইংরেজী Complex Sentence এর গঠন ভঙ্গীর হুবহু অনুকরণ করেন নি, যেমন অনেক ক্ষেত্রেই করেছিলেন রামমোহন। বিদ্যাসাগরের পদ্ধতিটি বুঝবার জন্য একটি বড় জটিল বাক্য উদ্ধৃত হল।

'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তকে' আছে —

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, এই প্রস্তাব যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, তৎকালে আমার এই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে এতদ্দেশীয় লোকে পুস্তকের নাম শ্রবণ ও উদ্দেশ্য অবধারণ মাত্রেই, অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন, আস্থা ও আগ্রহপূর্বক গ্রহণ ও পাঠ করিবেন না; সুতরাং পুস্তকের সঙ্কলন বিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছি, সে সমুদয় ব্যর্থ হইবেক।
[উদাহরণ ৮]

ইংরেজী রীতিতে বিশ্লেষণ (বা Clause Analysis) করলে দেখা যাবে এখানে ছয়টি অঙ্গবাক্য আছে। অন্ধভাবে ইংরেজী বাক্যগঠনরীতির অনুসরণ করলে যে দুরূহতা দেখা দিত তা পরিহার করবার জন্য প্রথমেই শেষ দুটি অঙ্গবাক্যকে একটি পৃথক স্বাধীন বাক্যের রূপ দিয়েছেন। তাছাড়া 'এতদ্দেশীয় লোক পুস্তকের নাম শ্রবণ ও উদ্দেশ্য অবধারণ মাত্রেই' এই বাক্যাংশে উহ্য বা ব্যক্ত ক্রিয়াপদ্ না থাকায়, এটি ইংরেজী মতে Clause না হয়ে, হয়েছে Phrase। 'অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন', 'আস্থা ও আগ্রহপূর্বক গ্রহণ ও পাঠ করিবেন না,'—এই দুটি আসলে Subordinate Noun clause, কিন্তু বাংলা ব্যবহারে স্বাধীন বাক্য বলে মনে হয়।

খ. বহুক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর জটিল বাক্যকে একাধিক স্বাধীন বাক্যে বিভক্ত করেছেন।

গ. বাংলা কথায় clause (ক্রিয়াযুক্ত) এবং phrase (ক্রিয়াহীন) বাক্যাংশের পার্থক্য স্পষ্ট নয়—এই বোধ নিয়ে তিনি clause-কে-phrase-য়ে রূপান্তরিত করেছেন। যেমন —

'এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন' [উদাহরণ ৭]

'এই হতভাগ্য দেশে পুরুষজাতির ··· প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশতঃ' [উদাহরণ ৭]

ঘ. সমাপিকার বদলে তিনি অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রাচুর্য দ্বারা জটিল বাক্যবন্ধ নির্মাণ করার সম্ভাবনাকে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ কাজে লাগিয়েছেন। [উদাহরণ ৭-য়ে এর অনেক উদাহরণ আছে।]

ঙ. বিশেষণের প্রয়োগের দ্বারা তিনি ইংরেজী Adjective clause এর কাজ চালিয়েছেন—বাক্যকে অধিক জটিলতার ও দুর্বোধ্যতার হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

জটিল বাক্যের সাবলীল ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষে নয়, কারন তাঁর বিষয়ের অতি সারল্য। জটিল বাক্যরীতির জন্য তাঁকে কমই অপেক্ষা করতে হয়েছে। বিষয়গত জটিলতা ও যুক্তিব্যূহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ভাষায় জটিল বাক্যের প্রাচুর্য অপরিহার্য ছিল। রামমোহনের গদ্য এই সমস্যার শিকার। বিদ্যাসাগর এই সমস্যার সমাধান করে ভাষার আদর্শ গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হলেন।

২ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের পথসন্ধানে সংস্কৃতের সাহায্য

নিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও আত্মসমর্পণ করেন নি। বাংলায় বাক্যগঠনরীতি বিভক্তি প্রত্যয়াস্ত (syntactical) নয়, ব্যাখ্যানধর্মী (analytical)। অর্থাৎ বিভক্তি-প্রত্যয় ব্যবহার করেই কোন পদের কারকবাচক অর্থ এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বিভক্তি যুক্ত পদ বাক্যের যে কোনো স্থানে বসালে অর্থবোধ হয় না। বাংলায় একই কারকে বিভিন্ন বিভক্তি, বিভিন্ন ভিন্ন কারকে একই বিভক্তি, প্রচুর বিভক্তিহীন পদ, বিভক্তির স্থানে নানা (নতুন নতুন শব্দ ব্যবহারেরও সুযোগ আছে) অনুসর্গপদ সর্বদা প্রযুক্ত হয়। বাক্যটি এমনভাবে গঠন করা দরকার যাতে বিভিন্ন পদের পারস্পরিক সম্পর্কটি ব্যাখ্যাত হয়। বাংলা কবিতা পুরাতন আটশত বছরের ইতিহাসে এই সমস্যা ছিল না। যে কোনো পদ যে কোনো স্থানে বসানো যেত গদ্যে এটি নতুন এবং বড় সমস্যা। রামমোহন এখানে ভুল করেছিলেন—কাজেই অনেক সময়ে দূরান্বয়ের শিকার হয়েছেন। মৃত্যুঞ্জয়ে এ জাতীয় ভ্রান্তি প্রায় নেই। বিদ্যাসাগর জটিল ও দীর্ঘবাক্যকেও সুনিয়মিত করে এই সমস্যার মূলোচ্ছেদ করেন।

সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যাসাগর সমাসবদ্ধ পদের মূল্য সম্পূর্ণই বুঝেছিলেন। ভাষা ব্যাখ্যামূলক বলে স্বভাবত ছড়িয়ে-পড়া বাংলা গদ্যকে সংহত করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রচুর সমাসবদ্ধ পদেরও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বহু পদের সমাস বন্ধনের ফলে সংস্কৃত ভাষার যে দুর্ভেদ্যতা তাকে অনেক সরল করে নিয়েছেন। তাঁর গদ্যে দুই-তিন পদের সমাসবদ্ধ রূপই বেশী। অনেক পদের সমাস এবং সমস্তপদের শ্রুতিকটুতা তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন।

আসলে বিদ্যাসাগরের ভাষাঘটিত সব সাফল্যের মূলে আছে বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস। ইংরেজী ভাষাভঙ্গীর আনুগত্য তিনি মানেন নি। এবং সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুরক্তি সত্ত্বেও বাংলা যে পৃথক ভাষা এ সত্য তিনি বুঝেছিলেন। পূর্বের কোনো লেখকের রচনা থেকে তিনি এই আদর্শের খোঁজ পান নি, সাধারণ মানুষের কথাবার্তার ভাষারীতি অনুধাবন করেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছন। কেরী বা মৃত্যুঞ্জয় লোকের মুখের ভাষার নিদর্শন সঙ্কলন করেছিলেন। এই ভাষার সম্ভাবনার তথা প্রয়োজনের কথা ভেবেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় কচিৎ বৈচিত্র্যের জন্য (হয়ত বা অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে) কথ্যভাষাকে ব্যবহারও করেছেন। বিদ্যাসাগরে কথ্যরীতির কোনোরূপ বহিরঙ্গ অনুসরণ দেখা যায় না। বরং বিদ্যাসাগর কথ্যরীতির বিরুদ্ধ প্রান্তের লেখক—এইরূপ জনশ্রুতি। কথাবার্তার প্রচলিত

ভাষাকে বিদ্যাসাগর শুধু কৌতূহলের বিষয়রূপে দেখেন নি, একটি পরীক্ষাযোগ্য-ভাষাভঙ্গী বলে মাত্র মনে করেন নি। কথ্যরূপই ভাষার আত্মা। তাঁকে ভিত্তি না করে কোনো লেখ্যরূপই সফল হতে পারে না এই বোধ তাঁর ছিল। বাঙালীর মুখের ভাষার বৈশিষ্ট্যকে তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে কিছু প্রমাণ উপস্থিত করছি।

'শব্দসংগ্রহ'* পুস্তকে বিদ্যাসাগর বাংলা শব্দের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে তাঁর প্রগতিশীল ভাষাচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই তালিকার পূর্ণ বিশ্লেষণ অবশ্য প্রয়োজন। এখানে যদৃচ্ছ নির্বাচিত কিছু শব্দের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক. উচ্চারণ অনুযায়ী বানান—

অকাজুআ	অধঃপাতিআ	অলম্বড়িআ	অ-দ
অস্যুচ	আউলিআ	আলগছ	একসাট্ট
এবে	ওসার	কতড়ানি	খিটখিটিআ

খ. অনুকার শব্দের প্রাচুর্য—

কুটুরকাটুর	কচকচ	কট	খুসখুস
খকখক	খচর	চকচকানি	ঝক

গ. বিশিষ্টার্থক শব্দ—

অকালকুষ্মাণ্ড	আক্কেলগুড়ুম	আলুদোষ	কলাচুসা
চসমখোর	জারিজুরি	তুইতকারি	খয়ের খাঁ

ঘ. একান্ত লোকব্যবহৃত (অর্থাৎ অমার্জিত) শব্দ—

নাদনা	দোষেসড়া	তেরিআ	থেঁতলান
ফক্কুড়ি	পাতড়ামারা	নোলা	নাবাল

তা ছাড়া নানা বিদেশী শব্দ, অর্ধতৎসম শব্দও (যেগুলি আসলে তৎসম শব্দের স্থানীয় উচ্চারণ বিকৃতির ফল) তার তালিকায় স্থান পেয়েছে।

১৮৭৩ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের বেনামী দুটি পুস্তকের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল। 'অতি অল্প হইল' বই থেকে—

*"বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ" ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য। শ্রীগোপাল হালদার সম্পাদিত।

এত দিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, তারানাথ তর্কবাচস্পতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। আজ-কাল শুনিতেছি, তার যত বড় নাম, যত ধুমধাম, তত বিদ্যা ও জ্ঞান নাই।' ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, বহু বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া, একখানা বহি লিখিয়াছিলেন! তর্কবাচস্পতি খুড় তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় একখানা বহি বাহির করিয়াছেন। সেই বহি পড়িয়া, সবাই বলিতেছে, এবার তারানাথের দফারফা হয়েছে। সকল লোকেই অবাক হয়েছে ও কহিতেছে, তাইত হে। তারানাথটা কি! কিসের জারি করিয়া বেড়ায়।

[উদাহরণ ৯]

'আবার অতি অল্প হইল' পুস্তকে তিনি লিখছেন—

খুড়র আমার, দুর্ভাগ্যক্রমে, ঠিক সেইরূপই ঘটিয়াছে, পেটে নানা বিদ্যা বোঝাই লইয়াছেন, অদ্যাপি সাজাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বোধ হয়, এ যাত্রা এইভাবেই গেল। এদিকে নিকট হয়ে এল, আর কবে সাজাইবেন। ......সংস্কৃত শব্দ কামধেনু বটে ; কিন্তু খুড়, কামধেনু-দোহন না করিয়া, কামধেনু বধ করিয়াছেন।

[উদাহরণ ১০]

বিদ্যাসাগরের ভাষা এ সব স্থলে আশ্চর্য দ্রুতগতি। সংস্কৃতানুসারী ভাষার স্বভাব মন্থর-চালকে অনায়াসে অতিক্রম করে তিনি এই গদ্যকে ধাবমান ও লঘুপদ করে তুলেছেন। এ চাল কথ্যবাংলার নিজস্ব। বাংলা বিশিষ্টার্থকশব্দ, একান্ত লোক প্রচলিত শব্দ এবং প্রবাদ-প্রবচনের যথার্থ ব্যবহারে তথা কথোপকথনের প্রাণবন্ত ভঙ্গী সংযোজনে এই গদ্যরীতি কথ্যভাষার চিত্তধর্ম আয়ত্ত করেছে।

আপাত দৃষ্টিতে এরূপ মনে হতে পারে মৃত্যুঞ্জয়ের সংস্কৃতানুগ পণ্ডিতী রীতিই কিছু মার্জিত হয়ে বিদ্যাসাগরী সাধু গদ্যের রূপ নিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এদের মধ্যে দূরত্ব অনেকখানি। এই পার্থক্য একটি ছকের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

মৃত্যুঞ্জয়	বিদ্যাসাগর
১. বাংলা গদ্যের অন্বয় সম্পর্কে মৃত্যুঞ্জয়ে ধারনা ছিল মোটা রকমের। সরল বিষয়ে বাক্য গঠনে তাঁর বিন্যাস স্বাভাবিক। [উদাহরণ ১, ২]। চিন্তাপূর্ণ বিষয়ে বাক্য গঠন একেবারে বিশৃঙ্খল। [উদাহরণ ৫]।	১. বিদ্যাসাগরের অন্বয়বোধ যথার্থ ও পরিপূর্ণ ছিল।

বড় ভাবনাকে প্রকাশ করার মতো ভাষাবোধ তাঁর ছিল না।

২. তিনি পণ্ডিতী এবং কথ্য দুই রীতি নিয়েই পরীক্ষা করেছিলেন। পণ্ডিতী রীতিরই প্রাধান্য। তবে কথ্য ভাষা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল। কখনও কখনও তিনি এই রীতির ব্যবহারও করেছেন। দুই রীতি তাঁর রচনায় পাশাপাশি থেকেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের মূল ভাষা বিশিষ্টতা কথ্যভঙ্গীর দ্বারা ভিতরের দিক থেকে প্রভাবিত হয় নি।

২. বিদ্যাসাগর কথ্যরীতির নিদর্শন সঙ্কলন করেন নি। এই ভাষার আশ্রয়ে কোনো পুস্তক রচনা করেন নি। কিন্তু কথ্য বাংলার প্রাণধর্ম তিনি আয়ত্ত করেছিলেন এবং তাকে সর্বত্র সঞ্চারিত করেছেন — এমন কি সাধু - রীতির সংস্কৃতানুগ ভাষায়ও।

৩. মৃত্যুঞ্জয় ভাষা বিষয়ে কোন আদর্শ মাণ দাঁড় করাতে পারেন নি। তাঁর ছিল অনেকখানি খেলাচ্ছলে সন্ধান। তাঁর অবলম্বিত বিষয়ে কোনো বৈচিত্র্য ছিল না বিষয়ের গৌরব স্বীকৃত ছিল না। ফলে ভাষাঘটিত কোনো রীতিমত অনুসন্ধান ও পরীক্ষার প্রশ্নই ওঠে না।

৩. বিদ্যাসাগর তাঁর বিষয় বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন সুরচর্চ্চার মধ্যে ভাষাঘটিত একটি আদর্শ মানের প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদ্যাসাগর ! বিদ্যাসাগর !!

তুলনার সূত্র আর বাড়িয়ে লাভ নেই। বিদ্যাসাগরের বিশিষ্টতাগুলি এখান থেকে অতুলনীয়। মৃত্যুঞ্জয় বা রামমোহনের গদ্যচর্চা চটাই, সিদ্ধি বিদ্যাসাগরে। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সচেতনভাবে বাংলা গদ্যের আদর্শ বেঁধে দিয়েছিলেন।

'মহাভারতের উপক্রমণিকা' কিংবা 'ব্রজবিলাস' সর্বত্র তিনি একই ভাষা কাঠামোর মধ্যে কাজ করেছেন। বিধবা বিবাহ বিষয়ক বিতর্ক বা সীতার বনবাসের কাহিনী সর্বত্র ভাষার মূল চেহারা এক। একই কাঠামোয় প্রয়োজনবোধে কথ্যের লঘু দ্রুত চাল, কখনো সাধু মন্থরতা বা গাঢ় গাম্ভীর্য এনেছেন তিনি। কখনো দেশী শব্দের প্রাচুর্য, লৌকিক উচ্চারণ ভঙ্গীর ব্যবহার, আবার সমাসবদ্ধপদের বাহুল্যে

ধীর মহিমা। ভাষার আন্তরিক সরলতা (আত্মজীবনীতে) এবং আবেগোচ্ছ্বাস (প্রভাবতী সম্ভাষণে) কিংবা বুদ্ধির খেলা ও যুক্তির ক্ষুরধার অস্ত্রচালনা (সমাজ বিতর্ক)—ভাষার মূল কাঠামো একটিই। সেই ভাষাই বাংলাগদ্যের আদর্শ ভিত্তি—বিদ্যাসাগরী সাধুভাষা।

বিদ্যাসাগরের রচনাজগত অতি বিস্তৃত। তাঁর আগের বা সমকালের আর কেউ চিন্তা ও অনুভূতির এত সব ভিন্ন ভিন্ন মহলে পরিক্রমা করেন নি। আধ্যাত্মিক প্রশ্নে তিনি জিজ্ঞাসু ছিলেন না সত্য। কিন্তু মানবমনের অপরাপর প্রশ্নগুলি পর্যন্ত তাঁর সানন্দ গতি বিবি ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের এই বিচিত্র মানস ভ্রমণের পরিচয় নেওয়া যাক।

১. শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্ তিনি প্রথম পর্যায়ের শিক্ষার্থী থেকে আরম্ভ করে কলেজে উচ্চশ্রেণীর উপযোগী পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন। এর মধ্যে জীবনচরিত ও ইতিহাসের অনুবাদ, কিশোর সেব্য কাহিনীগুচ্ছ 'ঋজুপাঠ' 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি যেমন আছে, তেমন রহিয়াছে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা পুস্তক।

২. সমাজ সমালোচন। বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তকগুলি।

৩. সমাজপ্রসঙ্গে লঘুরস ব্যঙ্গরচনা ও নৈয়ায়িক বিতর্ক। 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা' প্রভৃতি। সংস্কৃত নৈয়ায়িকের বিচার পদ্ধতি এবং আধুনিক ব্যঙ্গাত্মক ভাষাভঙ্গীর মিশ্রণ ঘটেছে এই সব লেখায়।

৪. সাহিত্য সমালোচনা ও গবেষণা। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর ছাত্রদের লক্ষ্য করে লেখা হলেও বাংলা সমালোচনার নীহারিকা-পর্যায়ে এই রচনাটি সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যায়নের উল্লেখযোগ্য চেষ্টা। 'মেঘদূতম', 'উত্তরচরিতম্', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' 'হর্ষচরিতম্' প্রভৃতি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন অংশে এই রচনাগুলির সাহিত্যমূল্য এবং সম্পাদনার নীতি সম্পর্কে যে সব মন্তব্য আছে তাকে সমালোচনা ও গবেষণার নিদর্শনরূপে গণ্য করা উচিত।

৫. অনুবাদধর্মী (অল্পাধিক মৌলিকতাযুক্ত) কাহিনী। এই সব কাহিনীতে সাহিত্য রসের বৈচিত্র আছে। 'শকুন্তলা'য় রোমান্টিক সৌন্দর্য-মাধুর্য, 'সীতার বনবাসে' গাঢ় দুঃখ, 'ভ্রান্তি বিলাসে' কৌতুক এবং 'মহাভারতের উপক্রমণিকা'য় মহাকাবিক গম্ভীর মহিমা প্রকাশিত।

৬. মৌলিক আত্মকথন। স্মিত হাস্যসিক্তিত আত্মজীবনী এবং বেদনাবিহ্বল

'প্রভাবতী সম্ভাষণে'র উচ্ছ্বাস ক্ষুদ্র হলে লেখকের নিপুণ রচনার উদাহরণ।

এত বিচিত্র সব ব্যাপার—বিষয় ও স্বাদের নানা দিগন্তকে প্রকাশের উপযোগী ভাষাগত উৎকর্ষ তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় থেকে আরম্ভ হয়েছিল যে ভাষা-সন্ধান বিদ্যাসাগরে তা শেষ হল। বাংলা গদ্যরীতির প্রতিষ্ঠা পেল।

এর চেয়ে আরও উঁচু কিছু হয় না— এরপর অন্য কিছু করার পালা।

নিয়ম ও আদর্শের সুশৃঙ্খল বন্ধনের এবং তার মধ্য দিয়ে স্বাদ ও চিন্তাঘটিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির চূড়ান্ত হল বিদ্যাসাগরে।

এরপরে ভাষাশিল্পের শৃঙ্খলা-ভাঙা বিস্ফোরনের পালা—যার শুরু বঙ্কিমে।

সুখময় মুখোপাধ্যায়

পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালী রাজপণ্ডিত

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে অনেক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যার বিশেষ বিশেষ শাখায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে তাঁরা বাণীর মন্দিরে শাশ্বত আসন লাভ করেছেন। বাংলা সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করতে হ'লে তার মধ্যে এঁদের কথা স্বতই এসে পড়ে। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসে এই সব জ্ঞানতপস্বীদের কোন ভূমিকা থাকা কেউ আশা করে না। অথচ বাস্তব ক্ষেত্র আমরা দেখতে পাই, ঐ শতাব্দীর কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী পণ্ডিত রাজশক্তির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁদের কাছে সমাদর লাভ করেছেন এবং বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসেরও এক কোণে নিজেদের নামের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এঁদেরই কথা বলব।

পদ্মনাভ

এঁদের মধ্যে সময়ের দিক্ দিয়ে প্রথম হচ্ছেন—রূপ সনাতনের প্রপিতামহ পদ্মনাভ। জীব গোস্বামীর লেখা (ভাগবতের টীকা) 'লঘু বৈষ্ণবতোষণী'র ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, পদ্মনাভের পিতামহ অনিরুদ্ধদেব কর্ণাটের ভূস্বামী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর দুই পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহরের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিয়ে যান। রূপেশ্বর ছিলেন পণ্ডিত মানুষ, যুদ্ধনিপুন হরিহর তাঁর কাছ থেকে রাজ্য

কেড়ে নেন। তখন রূপেশ্বর শিখর ভূমিতে (আধুনিক পঞ্চকোট বা পাঁচেৎ) চলে আসেন। তাঁর পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে বাস করতে ইচ্ছুক হন এবং "নবহট্টকে" বসতি স্থাপন করেন। এই সময়ে রাজা গনেশ 'দনুজমর্দনদের' নাম নিয়ে সারা বাংলার রাজা হয়েছিলেন। তিনি পদ্মনাভকে খুব ভক্তি করতেন। জীব গোস্বামী লিখেছেন,

> "বিহার গুণিশেখরঃ শিখর ভূমিবাস স্পৃহাং
> স্ফুরৎ সুরতরঙ্গিনী তটনিবাস পর্য্যুৎ সুকঃ॥
> ততো দনুজমর্দ্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমা-
> দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী॥"

[রাজা দনুজমর্দন দেবের নিত্য যাঁর পাদপূজা করতেন, সেই গুণিশ্রেষ্ঠ কৃতী পদ্মনাভ শিখরভূমি বাসের স্পৃহা পরিত্যাগ করে গঙ্গাতীরে বাস করতে উৎসুক হয়ে নবহট্টকে বসতি করেছিলেন।]

দনুজমর্দন দেবের ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দের (১৪১৭-১৮ ও ১৪১৮-১৯ খ্রীঃ) মুদ্রা পাওয়া যায়। অতএব পদ্মনাভ এই সময়েই বর্তমান ছিলেন। রূপ-সনাতনের সময় থেকে হিসাব করলেও পদ্মনাভকে এই সময়েই পাওয়া যায়।

"নবহট্টক" নৈহাটির পূর্ব নাম। কিন্তু বাংলার গঙ্গাতীরে নৈহাটি নামে দু'টি জায়গা আছে। একটি কাটোয়ার উত্তরে আধুনিক সীতাহাটির কাছে নৈহাটি গ্রাম; অপরটি বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নৈহাটি শহর্। প্রথম নৈহাটি বর্তমানে নগণ্য একটি গ্রাম হলেও তার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এখানে বল্লালসেনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছিল, 'চৈতন্যচরিতমৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজের গ্রাম ঝামটপুরকে এই নৈহাটির নিকটবর্তী বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই নৈহাটি গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত, যা বরাবরই পূর্বকূলের তুলনায় পবিত্র বলে গণ্য হত। দ্বিতীয় নৈহাটি গঙ্গার পূর্ব কূলে অবস্থিত, তার কোন প্রাচীন ঐতিহ্যের কথাও জানা যায় না। সুতরাং পদ্মনাভ প্রথম নৈহাটিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলেই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় নৈহাটির দাবীও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ১৬২০ শকাব্দে (১৬৯৮-৯৯ খ্রীঃ) রচিত রূপ সনাতনের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধীয় একটি পুস্তিকায় লেখা আছে, "স চ পদ্মনাভ গঙ্গাতীর বাসলুব্ধ শিখর দেশং পরিত্যজ্য কুমারহট্ট নামা গ্রামে বাসং চকার।" এর থেকে দ্বিতীয় নৈহাটির দাবী সমর্থিত হয়, কারণ কুমারহট্ট (হালিশহরের পাশে অবস্থিত) নৈহাটির খুবই নিকটবর্তী। অতএব পদ্মনাভ কোন্ নৈহাটিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তা আরও নিশ্চিন্ত

প্রমান না পাওয়া গেলে সঠিকভাবে বলা যাবে না।

বৃহস্পতি মিশ্র

বৃহস্পতি মিশ্র পদ্মনাভের সমসাময়িক হলেও তাঁর রাজানুগ্রহলাভ অপেক্ষাকৃত পরে ঘটেছিল। কিন্তু বৃহস্পতি বাংলার সুলতানদের কাছে যে স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করে ছিলেন, তার তুলনা বিরল। সে যুগের এই কৃতী ও সৌভাগ্যবান মনীষীর একটু বিস্তৃত পরিচয় দিচ্ছি।

বৃহস্পতি ছিলেন মহিন্তা-বংশীয় ব্রাহ্মণ ('মহিন্তাপনীয়')। তাঁর বাড়ী ছিল রাঢ়ে। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি বিষ্ণুর বন্দনা করেছেন। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থপ্রণেতা। 'গীতগোবিন্দটীকা', 'কুমারসম্ভবটীকা' (নামান্তর 'সুবোধ' বা 'ব্যাখ্যাবৃহস্পতি'), 'রঘুবংশ টীকা' (নামান্তর 'রঘুবংশবিবেক' বা 'ব্যাখ্যাবৃহস্পতি'), 'মেঘদূত টীকা' (নামান্তর 'বোধবতী'). 'শিশুপাল-বধটীকা' (নামান্তর 'মাঘ টীকা' বা 'নির্ণয় বৃহস্পতি'), স্মৃতিরত্নহার, কাব্যপ্রকাশ পঞ্জিকা, 'অমরকোষ টীকা' (নামান্তর 'পদ্মচন্দ্রিকা')—প্রভৃতি অনেকগুলি বই তিনি রচনা করেছিলেন। তিনি বহু উপাধিও লাভ করেছিলেন, যেমন—মিশ্র, আচার্য, কবিচক্রবর্তী, রাজ্যধরাচার্য, পাণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য্য, রাজপণ্ডিত, পণ্ডিতসার্বভৌম এবং রায়মুকুট। গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে প্রথম উপাধিটি তিনি পেয়েছিলেন গুরুর কাছ থেকে আর শেষ দু'টি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি 'রায়মকুট' নামেই পরিচিত হন।

বৃহস্পতি তাঁর বিভিন্ন বইয়ের সূচনায় নিজের পরিচয়সূচক শ্লোক লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্যান্য গ্রন্থে এই জাতীয় একটি বা দু'টি করে শ্লোক পাওয়া যায়, আর 'পদচন্দ্রিকা'র সূচনায় পাচটি শ্লোক পাওয়া যায়। এই শ্লোকগুলি থেকে জানা যায় যে, বৃহস্পতির পিতা, মাতা ও গুরুর নাম ছিল যথাক্রমে গোবিন্দ, নীলমুখায়ী ও শ্রীধর। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল নির্বৃতা এবং অন্যতম পুত্রের নাম ছিল বিশ্বাস রায়। গৌড়েশ্বরের কাছে তিনি "প্রচুর প্রতিষ্ঠা" পেয়েছিলেন। গৌড়েশ্বর তাঁকে 'পণ্ডিতসার্বভৌম' ও 'রায়মুকুট' উপাধি দিয়েছিলেন। শেষোক্ত উপাধি দান করার সময়ে রাজা যে সাড়ম্বর অনুষ্ঠান করেছিলেন, তার বর্ণনা বৃহস্পতির কাছ থেকেই শোনা যাক্,

> "জ্যোতিজ্জন্মণি পুঞ্জ মঞ্জুলরুচং হারং জ্বলৎ কুণ্ডলে।
> রত্নৌঘচ্ছুরিতা দশাঙ্গুলিজুষঃ শোচিষ্মতীরূর্মিকাঃ॥
> যঃ প্রাপ্য দ্বিরদোপবিষ্ট কনক স্নানৈরবিন্দন্ন্পা-

ছত্রেতৈস্তুরগৈশ্চ রায়মুকুটাভিখ্যামভিখ্যাবতীম্॥"

[যিনি (রাজার কাছ থেকে) উজ্জ্বল মণিময় সুন্দর হার, দ্যুতিমান্ দু'টি কুণ্ডল, রত্নখচিত দশ আঙুলের আংটি পেয়েছেন এবং রাজা যাঁকে হাতীর পিঠে চড়িয়ে স্বর্ণ কলসের জলে অভিষেক করিয়ে ছাতা ও ঘোড়া সমেত শোভাময় 'রায়মুকুট' উপাধি দান করেছেন।]

এখন, বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বর কে বা কারা, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

'পদচন্দ্রিকা' বৃহস্পতির সর্বশেষ গ্রন্থ। ১৩৯৬ ("সেনানীবদনগ্রহাগ্নিবিধুভিঃ") শকাব্দ বা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এর রচনা সম্পূর্ণ হয়। ঐ সময়ে বাংলার সুলতান ছিলেন রুকনুদ্দীন বারবক শাহ, যিনি বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। অতএব বারবক শাহের কাছেই বৃহস্পতি 'পণ্ডিতসার্বভৌম' ও 'রায়মুকুট' উপাধি পেয়েছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। কিন্তু বৃহস্পতির গোড়ার দিককার বইগুলিতেও তাঁর গৌড়াধিপের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের উল্লেখ আছে। বৃহস্পতি ছিলেন গৌড়াধিপ জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের (বৃহস্পতির ভাষায় "জল্লালদীন নৃপতি") সেনাপতি রায় রাজ্যধরের গুরু। অতএব জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহই বৃহস্পতির প্রথম জীবনের পৃষ্ঠপোষক গৌড়াধিপ বলে স্থির করা যায়; স্থির করার অনুকূলে আরও একটি যুক্তি এই যে, জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজত্বের একটি বছরে—১৩৫৩ শকাব্দ বা ১৪৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে—'পদচন্দ্রিকা'র প্রথমাংশ রচিত হয়েছিল।

বৃহস্পতি শুধু ব্যাপকতর অর্থে নয়, আক্ষরিক অর্থেও 'রাজ পণ্ডিত' ছিলেন। 'পদচন্দ্রিকা'য় "রাজ পণ্ডিত" তাঁর অন্যতম উপাধি হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে।

বৃহস্পতির বিশ্বাস রায় প্রভৃতি পুত্রেরাও পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁরা গৌড়েশ্বরের মন্ত্রীর পদ লাভ করেছিলেন—ঐ কথা 'পদচন্দ্রিকা'র সূচনা থেকে জানা যায়।

কৃত্তিবাস

ফুলিয়ার অমর কবি—মুরারি ওঝার পৌত্র ও বনমালী ওঝার পুত্র—কৃত্তিবাস ওঝাও গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণের রচয়িতা হিসাবেই বিখ্যাত, কিন্তু প্রথম জীবনে তিনি পাণ্ডিত্যের জন্যই প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়ে — স্বরচিত সাতটি সংস্কৃতশ্লোক তাঁকে শুনিয়ে — পণ্ডিত হিসাবেই কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের সংবর্ধনা লাভ করেন। গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসকে ফুলের মালা ও পাটের পাছড়া দেন এবং তাঁর বিশিষ্ট সভাসদ কেদার

রায় কৃত্তিবাসের চন্দনের ছড়া ঢেলে দেন।

কৃত্তিবাসের সংবর্ধনাকারী এই গৌড়েশ্বর যে রুকনুদ্দীন বারবক শাহ, তা নীচের দু'টি প্রমাণ থেকে বলা যায়।

(ক) কৃত্তিবাস তাঁর আত্মকাহিনীতে কেদার রায়, নারায়ণ ও গন্ধর্ব রায় নামে গৌড়েশ্বরের তিনজন সভাসদের উল্লেখ করেছেন। বারবক শাহের আমলে কেদার রায়, নারায়ণ ও গন্ধর্ব খান নামে তিনজন রাজপুরুষের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের মধ্যে কেদার রায় মিথিলা বা ত্রিহুতে বারবক শাহের প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরিত হন; নারায়ণ ছিলেন "রাজবৈদ্য;" গন্ধর্ব খান (কুলজীগ্রন্থের উক্তি অনুসারে) ছিলেন রাজার "ধনাধ্যক্ষ।"

(খ) ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' ও জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গলে'র সাক্ষ্য মেলালে দেখা যায় যে, কৃত্তিবাসের পৌত্র স্থানীয় সুবেন পণ্ডিত ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিদাস ঠাকুরের ফুলিয়া থেকে নীলাচলে যাওয়ার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। গড়পড়তা হিসাব অনুসারে কৃত্তিবাসকে ১৫১৬ খ্রীঃ র পঞ্চাশ বছর আগে, অর্থাৎ ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত পাওয়া যায়। ঐ বছরে বারবক শাহই গৌড়েশ্বর ছিলেন।

মুকুন্দ

আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের অর্থাৎ বারবক শাহের যে সব সভাসদের নাম উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে রাজপণ্ডিত মুকুন্দেরও নাম পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস লিখেছেন,

মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর॥
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥

তার থেকে জানা যায়, গোড়েশ্বরের মহাপাত্র জগদানন্দ ছিলেন মুকুন্দের পিতা। জগদানন্দ গৌড়েশ্বরের ঠিক ডান পাশে বসতেন। কিন্তু জগদানন্দ ও মুকুন্দ সম্বন্ধে আর কোন তথ্য জানা যায় না।

বিশারদ

হরিদাসের 'শ্রাদ্ধবিবেকে' বিশারদ নামে একজন স্মৃতিগ্রন্থকারের একটি বচন উদ্ধৃত হয়েছে। ১৩৯৭ শকাব্দ বা ১৪৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে একই বছরে দু'টি মলমাস ও একটি ক্ষয়মাস পড়েছিল, এই আশ্চর্য ব্যাপার স্বচক্ষে দেখে বিশারদ বচনটিতে লিপিবদ্ধ

করেছেন এবং বলেছেন ঐ বছরে "গৌড় প্রৌঢ়পরিবৃঢ়ে বারবকে রাজ্যং শাসতি।" বারবক শাহের এই আকস্মিক উল্লেখ থেকে মনে হয়, বিশারদ সুলতানের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে এই বিশারদ বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা নরহরি বিশারদের সঙ্গে অভিন্ন। এই মত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

সার্বভৌম

চৈতন্যদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য বাসুদেব সার্বভৌম বিভিন্ন চৈতন্যচরিতগ্রন্থে বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছেন ও সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেছেন। কিন্তু পণ্ডিত হিসাবে ও শিক্ষক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি অসামান্য। তাঁর লেখা ন্যায়শাস্ত্রের ও বেদান্তদর্শনের গ্রন্থ 'মণিটীকা,' 'অদ্বৈতমকরন্দটীকা প্রভৃতি মণীষার অপূর্ব নিদর্শন।

বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে বাংলার সুলতানের কোন সম্পর্ক ছিল কি না জানা যায় না। বরং, বাংলার একজন সুলতানের শত্রুসুলভ আচরণ বাসুদেবকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল।

১৪৮১ ও ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোন সময়ে বাংলার সুলতানের জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ গুজব শোনেন যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। শুনে তিনি নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর অকথ্য অত্যাচার সুরু করেন। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নবদ্বীপের অনেক ব্রাহ্মণ দেশত্যাগ করেন—তাঁদের মধ্যে বাসুদেব সার্বভৌম অন্যতম। সার্বভৌম নীলাচলে চলে যান। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যার রাজা হন। সার্বভৌম তাঁর কাছে বিশেষভাবে সম্মান লাভ করেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' লেখা আছে,

"উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্দ্ধর রাজা।
রত্নসিংহাসনে সার্ব্বভৌমে কৈল পূজা॥"

সুতরাং সার্বভৌমও শেষ পর্যন্ত রাজপণ্ডিত হন, তবে বাংলার রাজার নন, উড়িষ্যার রাজার।

নীলাচলেই সার্বভৌমের সঙ্গে চৈতন্যদেবের দেখা হয়। তিনি চৈতন্যদেবকে বেদান্তের মতে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের কাছে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করেন। মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়— সার্বভৌম চৈতন্যদেবের সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হন নি, চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়েই তিনি নতি স্বীকার করেছিলেন।

সার্বভৌমের ছাত্রদের অন্যতম সনাতন গোস্বামী ও নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি স্মার্ত রঘুনন্দন, তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও চৈতন্যদেবও সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন বলে প্রবাদ আছে। কিন্তু এ প্রবাদ অমূলক।

বিদ্যাবাচস্পতি

বিদ্যাবাচস্পতি সার্বভৌমের অনুজ। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর যখন বাংলার সুলতান অত্যাচার করেছিলেন, তখন ইনি গৌড়ে ছিলেন বলে অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। বিদ্যাবাচস্পতি সাধারণত গঙ্গার পশ্চিম তীরে কুলিয়া গ্রামে বাস করতেন। ইনিও সনাতনের অন্যতম শিক্ষাগুরু ছিলেন। চৈতন্যদেব যখন নীলাচল থেকে বাংলায় এসেছিলেন, তখন এঁর বাড়িতে উঠেছিলেন।

বিদ্যাবাচস্পতি তাঁর সমসাময়িক এক বা একাধিক গৌড়েশ্বরের কাছে বিশেষ সম্মান পেয়েছিলেন, এ কথা তাঁর পৌত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির 'ভ্রমরদূত' কাব্য থেকে জানা যায়। রুদ্র অত্যুক্তিপূর্ণ ভাষায় লিখেছেন,

যোঽভূদ্ গৌড়ক্ষিতিপতিশিখারত্নঘৃষ্টাঙ্ঘ্রিরেণু
বিদ্যাবাচস্পতিরিতি জগদ্গীতকীর্তিপ্রপঞ্চ।

সত্যি সত্যি অবশ্য বিদ্যাবাচস্পতির পদরেণু গৌড় ক্ষিতিপতির মুকুটমণিকে ঘর্ষণ করত না, তবে তিনি গৌড়েশ্বরদের সমাদর যে পেয়েছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিদ্যাবাচস্পতির সম্মানকারী গৌড়েশ্বরদের মধ্যে যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ অন্যতম, তা'ও কতকটা নিঃসংশয়েই বলা চলে।

সনাতন মিশ্র

সনাতন মিশ্র ছিলেন চৈতন্যদেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা। তাঁর উপাধি ছিল "রাজপণ্ডিত" —এ কথা বিভিন্ন চৈতন্যচরিতগ্রন্থ থেকে জানা যায়। তবে তিনি কোন্ রাজার পণ্ডিত ছিলেন,—বাংলার সুলতানের, না কোন স্থানীয় ভূস্বামীর, তা ঠিকভাবে বলার উপায় নেই। যদি তিনি বাংলার কোন সুলতানের পণ্ডিতের পদ লাভ করে থাকেন, তা হলে সেই সুলতান নিশ্চয়ই আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। সনাতন মিশ্র অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন এবং কন্যার বিবাহে আড়ম্বরের পরাকাষ্ঠা করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য জানা যায় না।

হিমাংশু ভূষণ সরকার

দ্বীপময় ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বাঙালীর অবদান

বাঙালীরা একদা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়, বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশ ও দ্বীপময় ভারতে, এক নূতন প্রাণচঞ্চল জীবনের উদ্বোধনে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে এই সমস্ত স্থানের ধর্মে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, সাহিত্যের অঙ্গনে এবং রূপকথার কল্পলোকে। প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে সমস্ত সদাগরী নৌকা তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সুবর্ণভূমি বা সুবর্ণদ্বীপে গিয়া পৌছাইত, তাহাতে হয়তো বাঙালী অভিযাত্রী কিছু সংখ্যক থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহার সঠিক বৃত্তান্ত আমাদের নিকট আজিও পৌছায় নাই। ইহাদের লইয়া যে কিম্বদন্তী গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় জাতকের কাহিনীতে, গুণাঢ্যের বৃহৎকথায় (৩য় শতাব্দী) এবং তাহা হইতে সঙ্কলিত ক্ষেমেন্দ্রের (১০৩৭ খৃঃ অঃ) বৃহৎকথামঞ্জরীতে এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে (১০৭০ খৃঃ অঃ)। এই সমস্ত উপাখ্যান অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি বলিয়া আজ আর তাহার জের টানিলাম না।[১]

কিম্বদন্তীর জগৎ হইতে খাঁটি ইতিহাসের যুগে ফিরিয়া আসিলেই আমাদের পাল রাজাদের আমলে চলিয়া আসিতে হয়। যে সময়ে বাঙলা দেশে পাল রাজাদের অভ্যুদয় সেই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম এসিয়ায় দেখা দিলেন আব্বাসিদ রাজবংশ এবং দ্বীপময় ভারতে শৈলেন্দ্র রাজবংশ। এই সমস্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সুযোগে আরব-সাগর, বঙ্গোপসাগর, শ্যাম উপসাগর এবং দক্ষিণ চীন-সমুদ্রের উর্মিমুখর বারিরাশি অতিক্রম

করিয়া আরো অধিক অসংখ্য তরণী দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল; কেহ গেল ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার জন্য, কেহ গেল ধর্মপ্রচারে বা অন্য উদ্দেশ্যে। এই উপলক্ষ্যে বাঙালীরাও দ্বীপময় ভারতে আসিয়া পৌছিল এবং সেখানকার সভ্যতার বিকাশে অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করিল।

মালয় উপদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলে বাঙালীরা যে যবদ্বীপে যাইবার বহু পূর্বেই গিয়া পৌছিয়াছিল তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান। কর্ণসুবর্ণের নিকটস্থ রক্তমৃত্তিকা[২] হইতে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত মালয় উপদ্বীপে গিয়াছিলেন। তাঁহার একটি শিলা-লিপি ওয়েলেসলী জেলার মুদ-নদীর দক্ষীণ তীর হইতে পাওয়া গিয়াছে। লিপিটি চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর হস্তাক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।[৩] বাঙালীদের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যাত্রাপথের ইহাই প্রথম ঐতিহাসিক স্বাক্ষর : তাম্রলিপ্ত হইতে কটাহ বন্দর, সেখান হইতে সুমাত্রা ও জাভা। মালয় উপদ্বীপে বাঙ্গালীগণের আবির্ভাব অন্ততঃ ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে হইয়াছিল, কিন্তু যবদ্বীপে তাহাদের আগমন সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের পূর্বে পাওয়া যায় না। তখন বঙ্গ-বিহারে পাল-সাম্রাজ্য বিস্তৃত; দ্বীপময় ভারতে শৈলেন্দ্র রাজবংশ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই দুই রাজবংশের যোগাযোগের ফলেই যেন নিবিড় মৈত্রীর দক্ষিণ দুয়ার অকস্মাৎ উন্মুক্ত হইয়া গেল। পাল এবং শৈলেন্দ্র রাজগণ ছিলেন বজ্রযান ধর্মমতের পৃষ্ঠপোষক, সুতরাং সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মণিকাঞ্চন যোগাযোগ ঘটিয়া গেল।

এই ধর্মের ব্যাখ্যায় এবং প্রচারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় দায়িত্বপূর্ণ স্থান পরিগ্রহণ করিল। এখানে দেশ বিদেশের ছাত্ররা আসিতেন বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখার গভীর জ্ঞানানুশীলন করিতে; এতদ্ব্যতীত তাঁহারা বিরুদ্ধবাদীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করিতেন। বস্তুতঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই পাল সম্রাটেরা এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় একযোগে বা স্বতন্ত্রভাবে বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন।

পূর্বভারত হইতে আগত আগন্তুকগণের প্রথম ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে কলসন শিলালিপিতে (৭৭৮ খৃঃ অঃ)।[৪] ইহার প্রারম্ভেই আমরা পড়িতেছি আর্যতারার প্রশস্তি। ইহাতে বলা হইয়াছে যে শৈলেন্দ্র রাজগণের গুরুদেব মহারাজ দ্যহ্ পঞ্চপণ পনংকরণকে সম্মত করাইয়া তারা দেবীর একটি অপূর্ব মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই দেবী সম্ভবতঃ ছিলেন শ্যামা তারা; কারণ সমসাময়িক বঙ্গদেশে এই দেবী এবং মঞ্জুশ্রী খুব জনপ্রিয় ছিলেন এবং বহির্ভারতে

যে-যে অঞ্চলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল সেই স্থলেই এই দেবদেবীর উপাসনাও মহাসমারোহে করা হইত। এই কলসন শিলালিপি প্রাক্-নাগরী হস্তাক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহার পূর্বে পশ্চিম ও মধ্য যবদ্বীপে যে সমস্ত শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহা ছিল পল্লব হস্তাক্ষরে। এইবার দেখা দিল পূর্ব-ভারতীয় প্রাক-নগরী হস্তাক্ষর। কলসন শিলালিপি ছাড়াও এই হস্তাক্ষর আমরা দেখতে পাই কেলুরক,[৫] রতুবক[৬], প্লাওসন[৭] প্রভৃতি অনুশাসন-লিপিতে। লিপিগুলির পল্লব-হস্তাক্ষর সহসা প্রাক্-নাগরী হস্তাক্ষরে রূপান্তরিত হওয়ায় সহজেই এই অনুমান করা চলে যে যবদ্বীপীয় সাংস্কৃতিক জীবনে এইবার পূর্বভারতীয় প্রভাব প্রবলভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ এই একই হস্তলিপি ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে আমরা দেখিতে পাই ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে,[৮] দেবপালদেবের মুঙ্গের এবং নালন্দা লিপিতে[৯] এবং নবম-দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ নেপালী অনুশাসন লিপিগুলিতে। উপরোক্ত কলসন-লিপিটি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আলেচনা করিবার সময় ডঃ ভাণ্ডারকর বলিয়াছিলেন যে লিখিবার পদ্ধতি নালন্দার সন্নিকটস্থ ঘোষরাবন লিপির অনুরূপ।[১০] এই প্রাক-নাগরীতে লিখিত লিপি সুমাত্রা এবং ইন্দোচীনেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে পালসাম্রাজ্যের অনেক অধিবাসী দ্বীপময় ভারতে এবং দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িয়া ছিলেন। এই শিলালিপিগুলির হস্তাক্ষর তাহারই প্রভাবের পরিচায়ক। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে যদি আমরা যবদ্বীপীয় প্রাক্-নাগরী হস্তাক্ষরের সহিত ঐ শ্রেণীর পূর্বভারতীয় লিপির তুলনামূলক আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে যবদ্বীপীয় লিপিগুলিতে প্রাচীনেত্বের ছাপ তো নাই-ই, পরন্তু যে বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্বভারতীয় লিপিতে সবে মাত্র দেখা দিয়াছে বা অর্দ্ধ-বিকশিত অবস্থায় রহিয়াছে, যবদ্বীপের লিপিগুলিতেও ইতিমধ্যেই তাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইহার তাৎপর্য পরিষ্কার। পাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজ্যের নিবিড় সংযোগের জন্যই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল।

এইবার আবার পূর্বের কথাতে ফিরিয়া যাই। কলসন শিলালিপিতে শৈলেন্দ্র রাজগুরু কর্তৃক তারামন্দির নির্মাণের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই রাজগুরুর বিশদ বর্ণনা ইহাতে নাই। তাহার পরিচয় পাইতেছি ৭৮২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ কেলুরক শিলালিপি হইতে। এই শিলালিপিটি একটি মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা

করা উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। ইহার সপ্তম শ্লোকে আমরা পড়িতেছি :

"গৌড়ীদ্বীপগুরুক্রমাম্বুজরজঃপূতোত্তমাঙ্গাত্মনা......"

এই গৌড়দেশাগত গুরুর চরণাম্বুজরজঃ শিরে ধারণ করিয়া তৎকালীন শৈলেন্দ্র নরপতি নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় এই রাজগুরু অজ্ঞাত-কুলশীল নহেন, কারণ, এই শিলালিপির অন্যত্র বলা হইয়াছে যে তাঁহার নাম ছিল কুমার ঘোষ। এই কুমার ঘোষই বৌদ্ধগণের বিদ্যার দেবতা মঞ্জুশ্রীর মূর্তি মধ্য যবদ্বীপের একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব মনে হয় না যে কুমার ঘোষ স্বয়ং পূর্বোলিখিত তারাদেবীর এবং মঞ্জুশ্রীর ব্রোঞ্জধাতুনির্মিত মূর্তি দুইটি নালন্দায় নির্মাণ করাইয়া উহা সঙ্গে করিয়া তাম্রলিপ্তি বন্দর হইতে মধ্যযবদ্বীপে লইয়া আসিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কলসন-মন্দিরের স্থাপত্যশিল্পও পূর্বভারতীয় শিল্পকলার স্বাক্ষরসহ।

পাল রাজগণের রাজত্বের প্রথম পর্ব্বে পূর্বভারত হইতে দুইটি বিভিন্ন ধর্মের স্রোত আসিয়া মধ্যযবদ্বীপে যেন একটি সঙ্গমতীর্থক্ষেত্র রচনা করিয়াছিল : উহার একটি হইল বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম, অপরটী হইল তান্ত্রিক শৈবধর্ম্ম। এই বৌদ্ধধর্মের যে বিশিষ্ট-শাখা এই সময়ে পাল ও শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যে পল্লবায়িত হইয়াছিল তাহার শ্রীবৃদ্ধির মূলে ছিল আদিবুদ্ধ বজ্রধরের কল্পনা। এই দেবতার ধ্যানধারণা এবং মূর্তি নালন্দার আচার্যগণ অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। স্মরণ করা যাইতে পারে যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই বজ্রযান-ধর্ম্মজগতে বহুদেব মতবাদ প্রাধান্য লাভ করিতেছিল এবং ইহার জন্য বজ্রযান আচার্যগণ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কারণ বৌদ্ধধর্মমতে মূলতঃ কোন দেবদেবীর স্থান নাই। সুতরাং নালন্দার আচার্যগণ কর্তৃক পরিকল্পিত হইল শূন্যের প্রতীক বজ্রধর নামক দেবতা; ইনিই আদিবুদ্ধের মানব-সংস্করণ। ইঁহারই প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে বরবুদুরের পাষাণ গাত্রে। মনে হয় এই বরবুদুরের শীর্ষে বজ্রধরের স্বর্ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ আর সে মূর্তি সেখানে নাই।

এই আদিবুদ্ধ বজ্রধর পাল সম্রাট ধর্মপালের (৭৭০—৮১০ খৃঃ) আরাধ্য দেবতা ছিলেন। বিখ্যাত তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথ (১৬০৮ খৃঃ) লিখিয়াছেন এই বজ্রধর সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্মপালের রাজ্যে অতীব প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিলেন। স্বয়ং রাজার গুরু ছিলেন বুদ্ধ জ্ঞানপদ ; তিনি ছিলেন বিক্রমশীল মঠের বজ্রাচার্য। তাঁহার উপদেশানুযায়ী এবং তাঁহার নেতৃত্বে বজ্রধরগণ রাজার মঙ্গলের জন্য অনেক

বৎসর ধরিয়া হোম করিয়াছিলেন। রাজার আনুকুল্যে এই ধর্ম্মমত তিব্বত, সুমাত্রা জাভা প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত হইল। যতদূর জানা যায় এই ধর্ম্মের প্রথম প্রশস্তি-কারক হইলেন নালন্দা মঠের অধ্যক্ষ শান্তরক্ষিত; তিনি তিব্বতে গিয়া সেখানকার রাজা কর্তৃক ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সম-যশ মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি বজ্রধর সম্বন্ধে যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন তাহার নাম হইল বজ্রধর সঙ্গীত ভগবৎ স্তোত্র টীকা।[১১]

উপরোক্ত তথ্যাদি হইতে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, যে-কুমার ঘোষ ধর্মপালের রাজত্বকালে গৌড় দেশ হইতে শৈলেন্দ্র রাজার গুরু হিসাবে যবদ্বীপে মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছিলেন তিনি স্বভাবতঃই বজ্রধরের উপাসক হইবেন। শৈলেন্দ্র রাজগণের অবিনশ্বর কীর্তি বরবুদুরও তাই বজ্রধরের মহিমাই কীর্তন করিতেছে। কেহ কেহ মনে করেন যে বরবুদুরের মন্দিরটী একান্তভাবে বজ্রধর-সম্প্রদায়ের না হইলেও ইহার রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব তাহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল।[১২] শৈলেন্দ্র রাজগণের আমলে সঙ্গ হ্যঙ্গ কমহাযানিকন এবং সঙ্গ হ্যঙ্গ কমহাষানন মন্ত্রনয়[১৩] নামে যে পুস্তক রচিত হইয়াছিল তাহাতে বজ্রধরের উপাসনা এবং ঐ সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে।

কেবলমাত্র ধর্মের নিগূঢ় বন্ধন যে পাল এবং শৈলেন্দ্ররাজগণকে এক মিলনমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা নহে; কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা উপস্থাপিত করেন নালন্দা তাম্রশাসনের বিবরণী।[১৪] উহার একস্থলে লিখিত হইয়াছে যে "তারা সেই রাজার (অর্থাৎ সমরাগ্রবীরের) মহিষী এবং চন্দ্রবংশীয় মহারাজ ধর্মসেতুর কন্যা ছিলেন।" শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় ধর্মসেতুর স্থলে পড়িয়াছেন বর্মসেতু এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বর্মসেত-পাঠ "সন্দেহাতীত" বলিয়া মনে করেন।[১৫] যদি কেহ ধর্মসেতু পাঠ সঠিক বলিয়া ইহাকে পালরাজ ধর্মপালের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন তাহা হইলেদেখা যাইবে যে দ্বীপময়ভারতের শৈলেন্দ্র বংশসম্ভূত সমরাগ্রবীর পালরাজবংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই মতের বিশিষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ডাঃ ষ্টুটেরহেইম; তাঁহার এই অভিমত পণ্ডিতেরা গ্রহন করেন নাই। পণ্ডিতপ্রবর কোয়েডেস এই ধর্মসেতুকে শ্রীবিজয়ের রাজা (যিনি মালয় উপদ্বীপের শিলালিপির বৃহত্তর অংশটি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন) বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।[১৬]

সে যাহাই হউক, এই সময়ে বাঙলাদেশে বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের (বজ্রধর) সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক শৈবধর্মও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই শৈবধর্ম ছিল পাশুপতশখোর; ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পিঙ্গলমতের লেখক শ্রীকণ্ঠনাথ এবং লাকুলিস (ইনি সম্ভবতঃ শ্রীকণ্ঠনাথের শিষ্য)। কিম্বদন্তী অনুযায়ী লাকুলিস ছিলেন শিবের অষ্টবিংশতম অবতার এবং পূর্ব ভারতে ইহার অনেক মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লাকুলিসের যে চারজন শিষ্য ছিলেন তাঁহাদের নাম হইল কুশিক, গর্গ, মিত্র এবং কুরুষ্য। পতঞ্জলিকে লইয়া এই চারিজন পাশুপতসম্প্রদায়ের গুরুকে বলা হয় পঞ্চকুশিক। এই পঞ্চকুশিকের খ্যাতি এত বিপুল ছিল যে যবদ্বীপের তাম্রশাসন-শিলালেখগুলির অন্তিমে—যেখানে ধর্মস্থানের নিয়মভঙ্গ করার জন্য অভিশাপবাণী উচ্চারিত হইয়া থাকে সেইখানে—এই পঞ্চকুশিকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৮৬০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ কাঞ্চনের তাম্রফলকে। এই পাশুপতশাখা ভারতীয় শৈব শাখাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এই শাখার প্রচারকগণ সমসাময়িক পাল-সাম্রাজ্য হইতেই গিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়, কারণ দক্ষিণভারতে এই শাখার প্রাধান্য ঘটিয়াছিল আরো কয়েক শতাব্দী পরে। ১৭

উপরোক্ত বৌদ্ধ বজ্রযান এবং শৈব তান্ত্রিক মতবাদ দ্বিধারায় পাল-সাম্রাজ্য হইতে আসিয়া মধ্যযবদ্বীপে যেন গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম সৃষ্টি করিল। বজ্রযান (বজ্রধর) মতের প্রতিভূ নালন্দা—শ্রীবিজয়—শৈলেন্দ্র—বরবুদুরের সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ট সহযাত্রীর মত চলিল চঙ্গল-দিনজ-লোরো জংগ্রাং এর তান্ত্রিক শৈব-যান। ইহারা পরস্পরের ঘাটে তরণী ভিড়াইয়া একে অপরের শাস্ত্র মন্থন করিয়া অনেক কিছু আপন আপন কুম্ভে ভরিয়া লইল। উভয় মতের জারক রসে এই সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চলিল। মধ্য যবদ্বীপে অষ্টম এবং নবম শতাব্দী ব্যাপিয়া এই প্রচেষ্টার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিল; ইহার ফলপ্রাপ্তি ঘটিল শিব-বুদ্ধ ধর্মমতের আবির্ভাবে। পূর্বেই বলিয়াছি, বরবুদুরের চূড়ায় বজ্রধরের স্বর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়; ইহা সম্ভবতঃ ছিল শৈলেন্দ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইন্দ্রের দেবায়িত-রূপ। ১৮ সেই বজ্রধর-ইন্দ্র মূর্তি, বুকির-পর্বতশীর্ষে রাজা সঞ্জয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ এবং প্রাম্বানান উপত্যকার মহাদেব-মূর্তি মধ্যযবদ্বীপের অধিবাসীদের এই মিশ্র শিব-বুদ্ধ ধর্মের পরিমণ্ডলে সামিল করিতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়াছিল। পাল-সাম্রাজ্যেও এই সময়ে শিব তথা বুদ্ধের সমন্বয় স্থাপনের প্রচেষ্টা চলিতেছিল; শিবের বুদ্ধায়ন বা বুদ্ধের শিবায়ন অনেক পূর্বভারতীয় মূর্তিতে প্রতিফলিত হইয়া ভারতবর্ষেও সেই সামঞ্জস্য সাধনের

চেষ্টার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পালযুগের অবসানে হিন্দুগণ বুদ্ধকে দশাবতারের মধ্যে স্থান দেওয়ায় বুদ্ধদেব স্বকীয় মর্যাদায় স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু দেবতাদের মধ্যে স্থান লইলেন, কিন্তু দ্বীপময় ভারতে সেই সমন্বয় সাধনের চেষ্টার বিরাম ঘটিল না। শৈলেন্দ্র-যুগে রচিত যবদ্বীপীয় গ্রন্থ সঙ্গ হ্যঙ্গ কমহাযানিকনে (লম্বক-সংগ্রহের ৫০৬৮ নং পুঁথি) বলা হইয়াছে বুদ্ধ তুঙ্গল লবন শিব অর্থাৎ বুদ্ধ এবং শিব অভিন্ন। যবদ্বীপে এই শিব-বুদ্ধ ধ্যানধারণার পরবর্তী ইতিহাস আমি অন্যত্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া উহা আর এখানে আলোচনা করিলাম না।১৯

এই যুগের তান্ত্রিক মতবাদ বাঙলাদেশের দুইটী অঞ্চলে বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছিল। একটা হইল বিষ্ণুক্রান্তা অঞ্চল ; উহা পূর্ববঙ্গে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। অপরটীর নাম হইল অশ্বক্রান্তা অঞ্চল এবং উহা উত্তর বঙ্গের করতোয়া নদী হইতে যবদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে বিষ্ণুক্রান্তা অঞ্চলের সম্মোহন এবং নিরোত্তর তন্ত্র কাম্বোডিয়ার অনুশাসন লিপিতে সম্মোহ এবং নিরোত্তর-তন্ত্র নামে আখ্যাত হইয়াছে। অনুমান করা যাইতে পারে যে এই অশ্বক্রান্তা অঞ্চলের তান্ত্রিক আচার্যগণ দ্বীপময় ভারতে বহু সংখ্যায় আসন জমাইয়াছিলেন, নতুবা যবদ্বীপের তান্ত্রিক মতবাদে এত জোয়ার দেখা দিত না। এই জোয়ার শুধু ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ ৭৬২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ কুটি বা জাহার তাম্রশাসনে২০ বিভিন্ন দেশাগত লোকের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে আছে চম্পা, কলিঙ্গ, আর্য, সিংহল, গৌড়, চোল, মালয়ল, কর্ণাট, প্রভৃতি। ইহারা ধর্মপ্রচারক হিসাবে না আসিলেও ইহাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেশী ছিল নতুবা এই তাম্রশাসনে ইহাদের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন ছিল না। কালক্রমে পূর্বভারতে[illegible] দ্বীপময় ভারতের বৌদ্ধ এবং শৈব তান্ত্রিক মতবাদে নানাপ্রকার অনাচার প্রবেশ করিয়া গেল। সহজযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, ভৈরবমার্গ, পঞ্চমকার, শ্রীচক্র প্রভৃতির অনুষ্ঠান ইহারই পরিচায়ক।

কালচক্রযান সম্ভবতঃ পালযুগের শেষপর্বে বাঙলাদেশে উদ্ভূত হইয়াছিল।২১ ইহার বিস্তার ঘটিয়াছিল নেপালে এবং দ্বীপময় ভারত ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এই কালচক্রযানের পরবর্তী অধ্যায় জাভা এবং সুমাত্রায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। যবদ্বীপ হইতে ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে অমোঘপালের যে মূর্তিটি সুমাত্রায় আনা হইয়াছিল তাহার পৃষ্ঠ-দেশে উৎকীর্ণ লিপি পাঠ করিলে দ্বীপময় ভারতে কালচক্রযানের বীভৎসরূপ উপলব্ধি হইবে।২২ যবদ্বীপের রাজা কৃতনগর (১২৬৮-৯২) এবং সুমাত্রার রাজা আদিত্য-বর্মন (১৩৪৭-৭৫) উভয়েই এই ধর্মের প্রায় অন্ধ অনুরাগী ছিলেন।২৩ কৃতনগর

সুভূতিতন্ত্র নামক একটি তন্ত্রশাস্ত্রও অধিগত করিয়াছিলেন এবং সাধনচক্র ও পঞ্চমকারে সিদ্ধলাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর মোয়েন্স একটী ভৈরব-মূর্তিকে রাজা কৃতনগরের প্রতিমূর্তি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মূর্তিটি একটী নগ্ন স্থূলদেহী পুরুষের ; উহার সর্বাঙ্গে মুণ্ডমালা। মূর্তিটি নরমুণ্ডের আসনের উপরে নৃত্য করিতেছে। ইহার দংষ্ট্রাগুলি মুখবিবর হইতে নির্গত হইয়াছে, চক্ষুদুটী যেন এখনই কোটর হইতে ছুটিয়া বাহির হইবে। ইহার চারিহস্তে যথাক্রমে আছে ত্রিশূল, ছুরিকা, ডমরু এবং নরমুণ্ড দিয়া রচিত মদ্যপাত্র। ইহা কৃতনগরের মূর্তি না হইলেও সমসাময়িক কালচক্রযানের এক সার্থক বা বীভৎস রূপায়ণ। এদিকে সুরবাস অনুশাসনলিপি[২৪] পাঠ করিলেও সুমাত্রার রাজা আদিত্যবর্মণ সম্বন্ধে একই প্রকার ধারণা জন্মিবে। ইহাতে জানা যায় যে রাজা কাপালিকের আচারাদি পালন করিতেন। তিনি নরবলি দিয়া ভৈরব-মার্গে দীক্ষার পর ক্ষেত্রজ্ঞ বিশেষধরণী উপাধি গ্রহণ করেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে যখন কালচক্রযানী নরপতি আদিত্যবর্মণ সুমাত্রায় রাজত্ব করিতেছিলেন তখন যবদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন রাজা হয়ম ভুরুক ; ইহার দরবারী নাম হইল রাজসনগর। এই রাজত্বকালে ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ছন্দে এক-খানি ঐতিহাসিক কাব্য লেখা হইয়াছিল প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় ; উহার নাম হইল নাগরকৃতাগম।[২৫] এই গ্রন্থখানি যেন সমসাময়িক কালের আলেখ্যস্বরূপ। এই কাব্যের ৮৪ সর্গের চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে কর্ণাটক এবং গৌড়দেশ হইতে বণিককুল এবং ব্রাহ্মণগণ রাজ দরবারে আসিতেন। বণিকেরা যে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে পূর্বযবদ্বীপে যাইতেন তাহার পরিচয় কিন্তু অন্য ভাবেও পাওয়া যায়। উপরোক্ত নাগরকৃতাগম কাব্যেরই[২৬] অন্যত্র লেখা আছে যে এই সময় দুকূল-নামক সূক্ষ্মবস্ত্র যবদ্বীপে খুব জনপ্রিয় ছিল। এই দুকূলবস্ত্রের ইতিহাস অতি প্রাচীন ; ইহার পরিচয় দিতে গিয়া কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে বলিয়াছেন[২৭] যে বঙ্গদেশে প্রস্তুত এই বস্ত্র ছিল অতীব শুভ্র নরম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই বস্ত্রের খ্যাতি দেড় হাজার বৎসরেরও বেশী দেশেবিদেশে অম্লান ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে এই সময় মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দ্বীপময় ভারতের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক বন্ধন যেন অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিল।[২৮] ইহাদের আক্রমণে ভারত-বর্ষের বহু বৌদ্ধমন্দির ও বিহার বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ইহার ফলে দলে দলে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ দেশান্তরে চলিয়া গেলেন। ইহার স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধমন্দিরে পোড়ামাটিনির্মিত উপহার—পট্টের (Votive tablet) হস্তলিপিতে এবং

পূর্বযবদ্বীপীয় প্রস্তরনির্মিত, তৃণবিন্দু মূর্তির পৃষ্ঠদেশের উৎকীর্ণ লিপিতে। উহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙলা হস্তাক্ষরের মত।

॥ ২ ॥

এইবার আমরা লিপিতত্ত্ব ও ধর্মের জগৎ হইতে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করিতে পারি। এখানেও সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে বাঙালীর অবদান অবিস্মরণীয়। পূর্ব যবদ্বীপের বঞ্জনেগর নামক স্থলে যে কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহার তৃতীয় তাম্রপট্টটীতে তৎকালীন বৌদ্ধ সংগঠনগুলির (কসোগতন) অধ্যক্ষ হিসাবে ডঙ্ আচার্য নাদেন্দ্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে তিনি চান্দ্র ব্যাকরণ অধিগত করিয়াছিলেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে এই ব্যাকরণটী লিখিয়াছিলেন বৌদ্ধ পণ্ডিত চন্দ্রগোমিন; তিনি বঙ্গদেশে বরেন্দ্রভূমির এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ হইতে নির্বাসিত হইয়া তিনি কিছুকাল চন্দ্রদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। এই ব্যাকরণ গ্রন্থটি ঘনিষ্টভাবে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সহিত সংযুক্ত ছিল, তবে ইহার কিছু কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও ছিল। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে কাতন্ত্রের ধাতুপাঠ অংশটি কার্যতঃ চান্দ্র-ব্যাকরণ হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু উহা দুর্গসিংহের দ্বারা পরিমার্জিত হইয়াছিল। এই দিক হইতে সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করিলে মনে হইবে যে যবদ্বীপের প্রাচীন অনুশাসন ও পুঁথিতে উল্লিখিত পাণিনি-কাতন্ত্র চন্দ্রের যে নামোল্লেখ দেখা যায় তাহা সম্ভবতঃ চান্দ্রব্যাকরণের পঠন-পাঠনের জনপ্রিয়তার উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[২৯]

বিশুদ্ধ সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এই যোগাযোগের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমি গদ্যে রচিত প্রাচীন যবদ্বীপীয় মহাভারতের আদিপর্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। বহুদিন পূর্বে পণ্ডিতপ্রবর সিলভাঁ লেভী ইহার প্রারম্ভিক তিনটি সংস্কৃত শ্লোকের দ্বিতীয়টীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে উহা ভট্টনারায়ণের বেণী-সংহার হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছে।[৩০] স্বভাবতঃই ইহা হইতে কেহ কেহ যবদ্বীপের সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙালীর অবদান খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বাংলায় প্রবাদ আছে যে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ কনৌজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ছিলেন এবং তিনি আদিশূর কর্তৃক বঙ্গদেশে সংস্থাপিত হইয়াছিলেন।[৩১] দুঃখের বিষয় ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান নাই, কিন্তু যদি ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমানও থাকিত

তাহা হইলেও উপরোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটী কোন পথে যবদ্বীপে গিয়া পৌছিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইত। লেভী মহোদয় এই যোগাযোগকে যবদ্বীপীয় ছায়া-নাট্যের উদ্ভবের দিক দিয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া অন্যত্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যত্র, বিশেষতঃ দক্ষিণভারতে, ছায়ানাট্যের জনপ্রিয়তা অবশ্য দীর্ঘকাল ধরিয়া অব্যাহত ছিল, কিন্তু ইহা বাংলাদেশ হইতে দ্বীপময় ভারতে পাড়ি জমাইয়াছে বলিয়া নিঃসন্দেহে বলিবার সময় এখনো আসে নাই। তবে কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে যবদ্বীপীয় সঙ্গীতমহলে যে স্লেন্দ্রো বা শৈলেন্দ্র স্কেল (Slendro-scale) প্রচলিত তাহা বাঙলাদেশ হইতেই গিয়াছে, কিন্তু এই অভিমত সকলে গ্রহণ করেন নাই।

উপরোক্ত তথ্যগুলি হইতে বাঙলাদেশ ও যবদ্বীপের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। একটা সংশয় ও দ্বিধার ভাব থাকিয়া যায়, কিন্তু একটি ক্ষেত্রে এই সংযোগ সম্বন্ধে কোন বিতর্কের অবকাশ নাই। এই সময়ের নেপালের একটী পুঁথিতে "যবদ্বীপে দীপঙ্কর" নামক একটী চিত্রের সন্ধান পাইতেছি৩২। এই দীপঙ্কর পূর্ববঙ্গে ৯৮২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষার পর তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল সুবর্ণদ্বীপে (সুমাত্রা) বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্ম-কীর্তির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।৩৩ সম্ভবতঃ তিনি ১০১৩ হইতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুমাত্রায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে কোন অবকাশে হয়তো যবদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। এই চিত্রখানি সম্ভবতঃ ১০১৩ হইতে ১০১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস।৩৪

রূপকথার জগতেও দ্বীপময় ভারত ও বাঙলাদেশে কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত আছে যাহা একেবারেই অভিন্ন কিংবা যাহার রূপ প্রায় একই প্রকার। মুখ্যতঃ এই সমস্ত কাহিনী বাপীতটে নায়ক-নায়িকার প্রেমোপাখ্যান কিংবা স্বপ্নের জগতে নায়ক-নায়িকার মিলন-বিচ্ছেদের কাহিনীতে রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেক ভারতীয় গল্পে, বিশেষতঃ বাঙলাদেশের গল্পে বলা হইয়াছে যে রাক্ষসগণের জীবনকাঠি বাক্স, বৃক্ষ বা কোন প্রাণীর শরীরের মধ্যে সংস্থাপিত করা আছে। যাঁহারা লালবিহারী দে সম্পাদিত Folk Tales of Bengal পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এই প্রসঙ্গে ডালিমকুমার, রাক্ষসগণ, মাতজননীর স্তন্যপালিত বালকের কাহিনী স্বভাবতঃই স্মরণ করিবেন। দ্বীপময় ভারতের রোমান্টিক সাহিত্যে পরী, গন্ধর্ব ও অপ্সর-অপ্সরাগণ অপেক্ষাকৃত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

ইহার অজস্র কাহিনী কথাসরিৎসাগর, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণে যেমন বর্ণিত হইয়াছে তেমনি আবার মধ্যযুগীয় যবদ্বীপীয় তুর্ম-নামক কাব্য, মচপৎ ছন্দে বিরচিত কাব্য রাদেন সপুত্র, অঙ্গর পিকতন প্রভৃতি গ্রন্থেও একই প্রকারে পরিবেশিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গল্প সাহিত্যের মধ্যে পঞ্জি-রোমান্সের স্থান অতি উচ্চে; ইহার উপজীব্য বিষয় হইল পঞ্জির নায়িকার প্রতি প্রেম, প্রিয়ার অন্তর্ধান-কাহিনী, তাহার জীবনের অসমসাহসিকতার কাহিনীগুলি এবং অন্তিমে নায়ক-নায়িকার মিলন। ইহার সর্বাঙ্গে জড়িত রহিয়াছে যে লক্ষণগুলি তাহাকে আমি ভারত (বাংলা) মালয়-পলিনেশীয় সংজ্ঞা দিয়াছি।৩৫ এই সমস্ত কাহিনীর মধ্যে গোলকুণ্ডা, তাঞ্জোর, গুজরাট, বঙ্গদেশ প্রভৃতি রাজ্যের নরপতি জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। দ্বীপময় ভারতের এই প্রকার নানাশ্রেণীর রূপকথার মধ্যে অন্ততঃ একটি কাহিনী আছে যাহা ভারতের অন্যত্র প্রচলিত আছে বলিয়া আমি জানিনা। বাংলা গল্পটিতে বলা হইয়াছে যে একদা একটি শৃগাল কুম্ভীরের সঙ্গে মারাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এক সময় যখন শৃগালটি নদী উত্তীর্ণ হইতেছিল তখন কুম্ভীরটী তাহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য শৃগালের পা তাহার মুখের মধ্যে লইয়া উহা চূর্ণ করিতে উদ্যত হইল। শৃগালটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে কুম্ভীরের মুখে যাহা ধৃত রহিয়াছে তাহা হইল একটি লাঠি মাত্র, শৃগালের পা নহে। নির্বোধ কুম্ভীরটি পা ছাড়িয়া দিলেই শৃগালটিও লম্ফ প্রদান পূর্বক তীরে পৌছিয়া গেল। ইহার কিছুকাল পরে যখন কুম্ভীরটি একটী নদীর তীরে রৌদ্র পোহাইতেছিল তখন শৃগালটিকে বাধ্য হইয়া ঐ পথে যাইতে হইয়াছিল। কুম্ভীরটি জাগ্রত আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য শৃগালটি উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল, "এই কুম্ভীরটি যদি জীবিত থাকে তাহা হইলে উহা নিশ্চল অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে; যদি উহা মরিয়া গিয়া থাকে এবং মনে হইতেছে উহা মরিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই লেজ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালিত করিবে।" কুম্ভীরটি মৃত ইহা প্রমাণ করিবার জন্য নড়িতে-চড়িতে আরম্ভ করিলে শৃগালটি পলায়ন করিল।

দ্বীপময় ভারতের কঞ্চিল-কাহিনীতে৩৬ শৃগালের স্থান অধিকার করিয়াছে পিউচঙ্গ এবং কিডঙ্; কোন কোন স্থলে আমরা পিউচঙ্গ, কোন কোন স্থলে আবার কিডঙ্-কে দেখিতে পাই। বাঙলা রূপকথার মত পিউচঙ্গ কুম্ভীরের মুখ বিবর হইতে অব্যাহতি পাইয়া অবশেষে এক দ্বীপে ঘুমাইবার জন্য চলিয়া গেল।

অনতিকাল পরেই ঐ দ্বীপটি ক্ষুধার্ত কুম্ভীর কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গেল। পিউচঙ তাহাদের সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিলে কুম্ভীরগুলি সন্নিকটবর্তী হইয়া সারিবদ্ধ হইয়া গেল। পিউচঙ্গটী তখন উহাদের পিঠের উপর দিয়া দৌড়াইয়া চক্ষুর পলকে অপর পারে অদৃশ্য হইয়া গেল। অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই যে একটী কিডঙ্গ কিউচঙ্গের পরিবর্তে আবির্ভূত হইয়াছে। কিডঙ্গটিও শৃগালের মত কুম্ভীরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল যে তাঁহার সম্মুখস্থ দেহটি কি কুম্ভীরের, না উহা একটী বৃক্ষকাণ্ড। গল্পটির অবশিষ্ট অংশ বাঙলা রূপকথার অনুরূপ। সুতরাং ইহা পরিস্কাররূপেই দেখা যাইতেছে যে এই বাঙলা রূপকথাটি নাম এবং তথ্যাদির দিক দিয়া উপরোক্ত কাহিনীদ্বয়ের সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যাইতেছে। সমস্ত দিক পর্যালোচনা করিয়া মনে করা যাইতে পারে এই গল্পটী বাংলাদেশ হইতে বাহিরে গিয়াছে, কিন্তু ইহার মূল উৎস অষ্ট্রিক হওয়াও অসম্ভব নহে।

(৩)

বাঙ্গালীদের যাতায়াতের পরিচয় দ্বীপময় ভারতের স্থাপত্যে এবং ভাস্কর্যেও দেদীপ্যমান। ইহার প্রভাব এত ব্যপক যে এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একটী গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। এস্থলে ইহার শুধু সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। প্রারম্ভেই এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে এই আর্ট একান্তভাবে ভারতীয়ও নহে, যবদ্বীপীয়ও নহে এবং এই জন্যই পণ্ডিত-মহল এই আর্টের ললাটে ইন্দো-যবদ্বীপীয় টীকা আঁটিয়া দিয়াছেন। এই আর্টের প্রথম অভ্যুদয় হইল মধ্য-যবদ্বীপে ; এই স্থলে পাহাড়পুরের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়৩৭। প্রাম্বানান উপত্যকার লোরো জংগ্রাং এবং চণ্ডি সেবুর মন্দির অনেকটা পাহাড়পুরের স্থাপত্য শিল্পের রচনা শৈলীতেই নির্মিত হইয়াছিল।৩৮ লোরো জংগ্রাং মন্দিরের angular projection, খণ্ডিত পিরামিডের মত আকৃতি এবং সরল রেখার অন্তর্বর্তী প্রাচীরের ভাস্কর্যের মধ্যে পাহাড়পুরের রচনা শৈলীর অভিব্যক্তিই দেখিতে পাই। চণ্ডি সেবুর অভ্যন্তরস্থ নির্মাণ শৈলী লক্ষ্য করিলে স্বভাবতঃই মনে পড়িবে পাহাড়পুরের কেন্দ্রীয় উপাসনাগৃহ এবং উহার দ্বিতলের কথা। বস্তুতঃ মধ্য-যবদ্বীপের কয়েকটী মন্দিরের পরিকল্পনাতেই যেন পাহাড়পুরের নির্মান কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। কোথাও বা মন্দিরগুলির প্রত্যেক পার্শ্বের মধ্যস্থলে এক একটী ক্ষুদ্র কক্ষ সংযোজিত হইয়া সমগ্র মন্দিরকে যেন একটী ক্রুশচিহ্নের মত রূপ প্রদান করিয়াছে। কলসন৩৯ এবং সেবুর মন্দিরে উপসনার সংলগ্ন

পার্শ্ব-কক্ষ (side chapel) বিদ্যমান। সেবুতে উপরকার প্রদক্ষিণ-পথটি গর্ভগৃহটী বেষ্টন করিয়া যাইতে যাইতে উপাসনা-গৃহের একদিককার দেয়াল ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, যাহা পাহাড়পুরেরও বৈশিষ্ট্য। বিশ্ববিখ্যাত বরবুদুরের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য শিল্পেও পূর্বভারতীয় প্রভাব বিদ্যমান। পণ্ডিতপ্রবর রোলাণ্ড মনে করেন যে বরবুদুর এবং গিয়ানংসের বৃহৎ মন্দিরটির মধ্যে এমন কতকগুলি সাদৃশ্যের লক্ষণ বিদ্যমান, যাহার জন্য মনে হয় যে উভয় মন্দিরই পালযুগের কোন মন্দিরের আদর্শে নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু পূর্বভারতীয় জলবৃষ্টি. আবহাওয়া, মানুষের অত্যাচারে সেই মন্দিরটির আর কোন অবশিষ্ট বিদ্যমান নাই।

স্থাপত্য শিল্প অপেক্ষা ভাস্কর্যেই পাল-সেন যুগের প্রভাব বেশী পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ ফরাসী পণ্ডিত ক্রসে[৪০] বলিয়াছেন যে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগেই প্রাম্বানানের মন্দিরাবলীর ভাস্কর্যে এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; মধ্য যবদ্বীপের ভাস্করগণ মেণ্ডুতের প্রাচীর-মূর্তিতে এবং বরবুদুরের রিলিফে সময় সময় পাহাড়পুরের রচনাশৈলীর অনুকরণ করিয়াছেন। আমি এখানে গুপ্তযুগীয় রীতিতে রচিত মূর্তি-গুলির কথা বলিতেছিনা; উহাদিষকে দেখিলেই চিহ্নিত করা যায়। কারণ, ইহাদের অনাড়ম্বর ভারী মূর্তি একটি বিশেষ যুগের স্বাক্ষরবহ। বরবুদুরের মন্দির ঘুরিতে ঘুরিতে স্থলে স্থলে দেখা যাইবে দোহারা গঠনের দীর্ঘায়ত সুন্দরমূর্তি, দেহে অলঙ্করণের পারিপাট্য আছে, অঙ্গ-ভঙ্গীও মনোরম এবং শরীরের গতি সাবলীল ছন্দে রূপায়িত হইয়াছে। এইরূপ মূর্তি-রচনা পাহাড়পুরের অবদান এবং ইহার আদর্শ প্রাম্বানান এবং বরবুদুর উভয়স্থলেই যেন কোথাও কোথাও প্রতিফলিত হইয়াছে। যবদ্বীপে প্রাপ্ত কুবের মূর্তির সহিত বিক্রমপুরে প্রাপ্ত জম্ভল-মূর্তি, প্রাম্বানান-প্লাওসনে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্বের মূর্তির সহিত কলিকাতা, ঢাকা এবং লক্ষ্ণৌর যাদুঘরে রক্ষিত বোধিসত্ত্বের মূর্তির তুলনা করিলেই উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থ নিরূপিত হইবে। প্লাওসনে প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রী মূর্তির সহিত কলিকাতা যাদুঘরস্থ মহারাজলীলায় সমাসীন মঞ্জুশ্রীর মূর্তির আশ্চর্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই মূর্তিগুলি পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে আবদ্ধ। ইহা যে কেবল ধর্মের আদর্শের জন্য সম্ভবপর হইয়াছে তাহা নহে; বস্তুতঃ সাধারণ শিল্পবোধ, রুচি, মধুর প্রশান্তি, অলংকরণের সাদৃশ্য এবং রচনাকুশলতার পারিপাট্যের দিক দিয়া এই সমস্ত মূর্তির একত্ববোধ বিস্ময়কর। এতদ্ব্যতীত মধ্যযবদ্বীপের মন্দির-গুলির মধ্যে লতাপাতার যে জটিল সমারোহ পরিলক্ষিত হয় তাহা এবং কলসন ও পাহাড়পুরের মন্দিরের বিকটাকার কাল-মুণ্ড (Kala Head) বাংলাদেশের আদর্শ

হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বার্নেট কেম্‌পার্স মঞ্জুশ্রী এবং মৈত্রেয়ের কয়েকটী ব্রোঞ্জ ধাতু নির্মিত মূর্তি পূর্ব-ভারতীয় আর্টের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিলেও মধ্য-যবদ্বীপের শিল্প বিবর্তনের ইতিহাসে পাল-প্রভাবের কথা সাধারণভাবে অস্বীকার করিয়াছেন। এই অভিমত অনেক বিশেষজ্ঞই অবশ্য গ্রহণ করেন নাই। ইহা অবশ্য সত্য যে মধ্যযবদ্বীপীয় ভাস্কর্যে কিছু কিছু বিভিন্নতার লীলাও পরিলক্ষিত হয়; স্থানীয় জীবনাচরণ এবং চতুস্পার্শ্বস্থ প্রাণী এবং উদ্ভিদ-জগতের সাড়াতেই ভাস্কর্যে এই বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। তবে ইহা দ্বারা পূর্ব-ভারতীয় আর্টের ধ্যান-ধারণার আমূল পার্থক্য স্থচিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত, বরবুদুরের রিলিফে, চণ্ডি মেণ্ডুৎ এবং চণ্ডি কলসনের সিংহাসনে, অমিতাভ-গণেশ-কুবের মূর্তির রচনায় আমরা যে বালক-মূর্তি সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাই তাহা সহজ-সুন্দর গজ-সিংহের তুলনায় অনেকটা আতিশয্য দোষে দুষ্ট, কিন্তু এই উভয় প্রকার মূর্তিই পাল-শিল্পে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এতদব্যতীত, মূর্তির পিছনের দিকের কাঠামোটি, কাঠামোর উপরের দিকের প্রান্ত বেষ্টন করিয়া যে বিশেষ ধরণের ঢেউ-খেলানো রেখা চলিয়া গিয়াছে, মূর্তির সিংহাসনস্থ সু-অলঙ্কৃত পাদ চতুষ্টয়, মূর্তির পশ্চাৎ দিককার চক্রাকার মুদ্রা প্রভৃতি পাল যুগের আর্টের বিশেষত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

পাল যুগের আর্টের যে বৈশিষ্ট্য ছিল, সেন যুগেও (আনুমানিক ১০৯৬-১১২৫ খৃঃ) তাহার ধারা অব্যাহত ছিল, কিন্তু ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে অলঙ্কার বাহুল্য। এই সেনযুগের আর্টের স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে পূর্ব যবদ্বীপের জঙ্গল এবং কেদিরির শিল্প-শৈলীতে। রচনার সাধারণ আতিশয্যে এবং অলঙ্করণের বাহুল্যে সেন-আমল এবং পূর্ব যবদ্বীপের সমসাময়িক আর্ট যেন একই পথ ধরিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেদিরি যুগের কোন কোন দেবদেবীর মূর্তির ভাবগম্ভীর প্রশান্তিতে যেন সেনযুগের প্রভাব পড়িয়াছে। ক্রুসে [৪১] বলিয়াছেন যে গরুড়ারূঢ় ঐরলঙ্গ মূর্তি এবং রাণী ডেডেসের প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্তি সমসাময়িক পূর্বভারতীয় আর্টের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাদের অঙ্গে যে অলঙ্কার আমরা দেখিতে পাই তাহা বাঙলাদেশে এই শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। অনেক সময় রাজমুকুট আটকাইয়া রাখিবার জন্য যে ধরণের বন্ধনী পালযুগের ব্রোঞ্জ এবং প্রস্তরমূর্তিতে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অনুরূপটি আমরা নেপাল, কাশ্মীর এবং সিংহলেও দেখিতে পাই। ইহার নিখাদ পরিচয় পাওয়া যায় সিংহসরির শিল্প নিদর্শনে। আজিও যবদ্বীপীয়

সেরিম্পি-নর্তকগণ তাহাদের শিরোপায় এইরূপ বন্ধনী ব্যবহার করিয়া প্রাচীন যুগের স্মৃতিরক্ষা করিতেছেন।[৪২] এতদ্ব্যতীত, পালযুগের অলঙ্কারের মধ্যে চক্রাকার বৃহৎ পেণ্ডান্ট বা দোলক যবদ্বীপে জনপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যদিও যবদ্বীপের ব্রোঞ্জ-মূর্তিগুলির অঙ্গে শাল বা উত্তরীয় নাই, কিন্তু অনেক প্রস্তর নির্মিত মূর্তির অঙ্গে আমরা পাল-ফ্যাসানে বিলম্বিত উত্তরীয় দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে চণ্ডি জাগোর মন্দিরে যে ভৃকুটি-মূর্তিটি দেখিতে পাওয়া যাইবে উহার বাম বক্ষ সম্পূর্ণভাবে এবং দক্ষিণ-বক্ষ আংশিকভাবে পালযুগের রীতিতে উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদিত। সিংহসরির দুর্গা-দেবীর (ইহা অধুনা লেইডেন যাদুঘরে রক্ষিত আছে) অঙ্গে বডিস্ (bodice) রহিয়াছে; গৌরী ভৃকুটির মূর্তিটির অঙ্গেও আমরা বডিস্ দেখিতে পাই। এই উভয় দেবীই অনুচর পরিবৃতা এবং তাহাদের মূর্তি রচনায় পাল-প্রভাবের কথা অস্বীকার করা দুঃসাধ্য।[৪৩]

যবদ্বীপের মত সুমাত্রাতেও এই পাল প্রভাবের পরিচয় স্থানীয় আর্টে প্রতিফলিত হইয়াছে; তবে সুমাত্রার স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য নিতান্তই নগণ্য হওয়ায় এই সম্বন্ধীয় নিদর্শণের সংখ্যা খুব অল্প। সুমাত্রার মলগাই-স্তূপের সহিত পালযুগের গির্যেক স্তূপের সাদৃশ্য অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।[৪৪] পদঙ্ লভসে দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে যে সমস্ত স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে আছে চতুষ্কোণ ইষ্টক-নির্মিত মন্দির; উহার প্রত্যেক দিকের মধ্যস্থল হইতে ক্ষুদ্রাকৃতি কক্ষ বাহির হইয়াছে। চূড়ায় রহিয়াছে ব্রহ্মদেশস্থ পগানের মন্দিরের মত বৃহদায়তন স্তূপ। ইহার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া মনে হয় যে ইহা পগানে মন্দিরের মতই পাহাড়পুরের আদর্শে নির্মিত হইয়াছিল। রিলিফে যে পোড়ামাটির মূর্তিগুলি বিদ্যমান, তাহার আনন্দময় স্বাভাবিকতা পূর্ব-ভারতীয় আর্টের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পদঙ লভসের নৃত্যপটিয়সী মূর্তিগুলির স্বচ্ছন্দ গতিশীলতা এবং অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য ঐ একই দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে। শিল্প-রসিকেরা কেহ কেহ এখানকার বজ্রযান দেবতা হেরুকের মূর্তির সঙ্গে বিহারস্থ দশম শতাব্দীতে নির্মিত নৈরাত্ম-মূর্তির তুলনা করিয়াছেন।[৪৫] এতদ্ব্যতীত পালেম্বাং বোধিসত্ত্বের জটামুকুট, সাধারণ অলঙ্কার, বিশেষভাবে কণ্ঠহার, উত্তরীয় এবং সুকুমার দেহসৌষ্ঠব লক্ষ্য করিলে কাহারো মনে দ্বিধা থাকে না যে ইহার প্রেরণা জোগাইয়াছে পালযুগের শিল্পীগণ।[৪৬]

উপরে যে কথাগুলি বলা হইল তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে

দ্বীপময় ভারতের সভ্যতার সৃষ্টিতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কোন অবদান নাই। বস্তুতঃ এই বিষয়ে দক্ষিণ ভারতেরও একটি মুখ্য ভূমিকা ছিল; পশ্চিম ভারত এই বিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অবদান গ্রহণ করিবার জন্যে যে বুদ্ধি, শক্তি ও মনের পটভূমিকা প্রয়োজন তাহা দ্বীপময় ভারতে ছিল। আশ্চর্য শিল্পবোধে উদ্বুদ্ধ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ভারতের নিকট শিল্পে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহযোগিতায় যে বিস্ময়জনক সাহিত্য ও শিল্প, ধর্ম ও সমাজ, মানবীয় মূল্যবোধ ও জীবনাচরণের বিধি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা সর্বকালের মানুষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। নিঃসন্দেহে এই সভ্যতার সৃষ্টিতে বাঙালীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পাদটীকা

১। দ্রষ্টব্য লেখকের The Port of Tamralipta in Fiction and History (Acharya Raghuviria Commemoration Volume, New Delhi, 1971)

২। দ্রষ্টব্য S. R. Das, Rajbadidanga : 1962.

৩। Ibid, pp. 57 ff.

৪। H. B. Sarkar, Corpus of the Inscriptions of Java, Vol. I, no V.

৫। Ibid, no. VI.

৬। Ibid, no. VI—A

৭। Ibid, no. VI—B.

৮। Ep. Ind., IV pp. 243 ff.

৯। Ind. Ant, XXI, pp. 253 ff.; Ep. Ind. XVII, p. 310.

১০। Ind. Ant, XVII., p. 307,

১১। L. Chimpa and A. Chattopadhyaya, Taranatha's History of Buddhism in India, p. 415.

১২। Stutterheim, Studies in Indonesian Archaeology, p. 54.

১৩। Ed. Kats, Sang Hyang Kamatrayanan (1910); Ed. Wulff, S. H. Kamatrayanan Mantranaya (1935).

১৪। Ep. Ind., XVII, p. 310.

১৫। Suvarnadvipa I, p. 153. fr. 1.

১৬। The Indianized States of South-East Asia, p. 109.

১৭। H. B. Sarkar, Some Contributions of India to the ancient civilisation of Indonesia and Malaysia, pp. 176 ff.

১৮। ইহার বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য H. B. Sarkar, Identification of the Image on the Terminal Stupa of Barabudur. (Transactions of the 28th International Congress of Orientalists, Canberra, Australia, 1971).

১৯। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহার জন্যে লেখকের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ Some Contributions of India.........গ্রন্থের নবম অধ্যায় পাঠ করিতে পারেন।

২০। H. B. Sarkar, Corpus of the Inscriptions of Java, Vol. I, no. XII. এই দলিলটীকে ডঃ ব্র্যাণ্ডেস প্রমুখ (Pararaton, 2nd ed., pp. 112 ff) অনেকে জাল মনে করিয়া থাকেন। আমার মনে হয় যে মজপহিত সাম্রাজ্যের অন্তিম যুগে যখন এই দলিলটী নকল করা হইয়াছিল তখন নকল-নবীশ ব্যক্তি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতার জন্য নানা প্রকার ব্যাকরণ-গত এবং অন্যান্য ভুল করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস ইহার মূল দলিলটী খাঁটি।

২১ Coedes, The Indianized States of South-East Asia p. 199.

২২। দ্রষ্টব্য Kern, Verspreide Geschriften VII p. 163; Krom, Inbid ng tot de Hindoe-Jav. Kunst, pp, 131—33 and Schnitger, the Archacology of Hindoo Sumatra, p. XVI.

২৩। Mones in Tijdschrift. Bat Gen, LXIV, pp. 558-79

২৪। Kern, op, cit, VI pp. 252-61; Oudh. Versl., 1912, p, 52 and Moens, op. cit.

২৫। ডঃ পিগো ৫ খণ্ডে ইহার সর্বাধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

২৬। ৬৫ সর্গ, ৩·২

২৭। Ed. Shamasastry, p. 82.

২৮। হিমাংশু ভূষণ সরকার, হিন্দু যুগে দ্বীপময় ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা, পৃঃ ৬৬।

২৯। বিস্তারীত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: হিমাংশু ভূষণ সরকার, দ্বীপময় ভারতের

প্রাচীন সাহিত্য, পৃঃ ১১২, ১১৬ ; H. B. Sarkar, The Migration of Sanskrit Grammar, lexicography, prosody and rhetoric to Indonesia in Journal Asiatic-Society., Vol. VIII pp. 82-৪4.

৩০। Sanskrit Texts from Bali, p, XXXIII.

৩১। R. C. Majumdar, History of Bengal I, pp, 306, 631.

৩২। Foucher, Etude sur I' iconographic bouddhique de L'Inde I pp. 79, 189 and pl. 11, 2

৩৩। দীপঙ্করের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন A. Chattopadhyaya, Atisa and Tibet (1967).

৩৪। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Foucher, op. cit. pp 16ff, MS. Add. 1643 Cambridge.

৩৫। এই সমস্ত কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ৩৫৪ পৃষ্ঠা হইতে।

৩৬। Tijdschr. Bat. Gen., XLII (1900) pp. 356ff, also Ibid XXXVII (1894) pp 39, 48.

৩৭। দ্রষ্টব্য K. N. Dikshit, Excavations at Paharpur Bengal (Mem. Arch. Surv. Ind., no 55,1938)

৩৮। Ibid p. 7 মন্দিরগুলির ছটোর জন্য দ্রষ্টব্য Bernet Kempers, Ancient Indonesian Art., pls. 124, 126, 127, 129, 130, 131 (চণ্ডি সেবু); pls. 139, 140, 141, 142 (লোরো জংগ্রাং।

৩৯। Bernet Kempers, op. cit., pls. 100-104.

৪০। ইহার একটী বিখ্যাত প্রবন্ধের উল্লেখ এই রচনার বিভিন্নস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রবন্ধটীর নাম হইল : L, Art Pala et Sina dans L'Inde exterieure, a la memoire of Raymonde Linossier, 1932.

৪১। op. cit., p. 284.

৪২। Bernet Kempers, Bronzes of Nalanda and Hindu-Javanese Art, p. 51

৪৩। Ibid, fig. 16.

৪৪। Stutterheim, Tjandi Baraboe doer, p. 61, Studies in Indo-

nesian Archaeology, p. 23 fn 23.

৪৫। Schnitger, the Archaeology of Hindoo Sumatra, pl. XXXIV.

৪৬। D. P. Ghosh in India, Greater Ind. Soc. I p. 35; Ibid III p. 53.

আহমদ শরীফ

একখানি বিশিষ্ট পুথি ঃ শেখ সাদী বিরচিত গদা-মালিকা সম্বাদ

সূচনা ঃ

গ্রীক পণ্ডিতদেরও আগের কাল থেকেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞান আহরণের রীতি চালু রয়েছে। ফলে সে কালের গ্রন্থের গুরু-শিষ্যের কিংবা জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই ঐহিক ও পারত্রিক সব রকমের বিষয় ও শাস্ত্র আলোচিত হত। আঠারো শতক অবধি আমাদের বাঙলা ভাষায় ও উক্ত প্রাচীন রীতির অনুসরণে শাস্ত্র কথা ও তত্ত্বচিন্তা প্রশ্নোত্তরে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মুসার সওয়াল, আবদুল্লাহ্‌র সওয়াল, মালিকার হাজার সওয়াল, গদা-মালিকা সম্বাদ, সিরাজ কুল্‌ব, হরগৌরী সম্বাদ, তালিব নামা প্রভৃতি উক্ত রীতিতে লিখিত বাঙলা গ্রন্থ। এই বৈশিষ্ট্যে গুরুত্ব দিয়ে এ গুলোকে 'সওয়াল সাহিত্য' নামে চিহ্নিত বা অভিহিত করা অসঙ্গত নয়।

একের অভিজ্ঞতাই অপরের কাছে জ্ঞান। কাজেই অভিজ্ঞতায় লভ্য জ্ঞানের বিকাশ ও বিস্তার চিরকালই মন্থর। তাছাড়া অভিজ্ঞতার পৌনঃপুনিকতায় জন্মায় ভুল ও নির্ভুলজ্ঞান। সব ক্ষেত্রে তেমন পৌনঃপুনিক অভিজ্ঞতার সুযোগ ঘটেনা। তাই আদি কালের মানুষের নানা বিষয়ক অনেক জ্ঞানই ছিল ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যোগ্যতা তখনো অর্জিত হয় নি। ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যতো প্রশ্ন মনে জেগেছে তার বুদ্ধিও কল্পনাপ্রসূত উত্তর সন্ধান করেই তাদের সন্তুষ্ট

থাকতে হয়েছে। এমনি মনোময় ধারণা-ভিত্তিক শাস্ত্র, জ্ঞান, তত্ত্ব ও তথ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে মানুষের জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনা।

বৈষয়িক প্রয়োজন ছাড়া অন্য প্রয়োজনের প্রতি সাধারণ মানুষ সাধারণত উদাসীন। তাই জ্ঞান, বিদ্যা ও ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ পরবুদ্ধিজীবী ও পরচিন্তানুসারী। তাছাড়া, আজন্ম লালিত বিশ্বাস-সংস্কার ঘরোয়া ও সামাজিক সমর্থনে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্তরে উন্নীত হয়ে ধর্ম শাস্ত্রীয় বিশ্বাসে পরিণতি পায়। এ কারণেই আজকের দিনেও মানুষ বিদ্যালব্ধ জ্ঞানকে অবহেলা করে এবং শাস্ত্রোক্ত সত্যকে বরণ করে নিশ্চিন্ত হয়। সুতরাং মানব সভ্যতার শৈশব-বাল্যের সে-সব ধ্যান-ধারণা, জগৎ-চিন্তা ও জীবন-ভাবনা আজও পরচিন্তানুসারী উদাসীন মানুষের চেতনা নিয়ন্ত্রণ করে।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত যে-সব রহস্য-জিজ্ঞাসা মানুষকে চিরকাল আকুল করেছে, সেগুলোর শাস্ত্রীয়, কাল্পনিক ও নীতি জ্ঞান প্রসূত উত্তর দানের চেষ্টা আছে 'সওয়াল সাহিত্যে'। যেহেতু জগৎ ও জীবনের উৎস ও আধার হচ্ছেন স্রষ্টা আল্লাহ্, সেহেতু জ্ঞানও আল্লাহ্-প্রোক্ত। রসুলের মাধ্যমে সে-জ্ঞান প্রচারিত-প্রচলিত হয় মর্ত্যে। তাই মুসলিম জীবনে হযরত আদম থেকে হযরত মুহম্মদ-অবধি নবী পরম্পরায় জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে।

মুহম্মদ আকিলের মুসানামা, নসরুল্লাহ্ খোন্দকারের মুসার সওয়াল, আবদুল করিম খোন্দকারের হাজার মসায়েল, রজ্জাক-নন্দন আবদুল হাকিমের সাহাবুদ্দীন নামা, শেখ চান্দের তালিব নামা, হর-গৌরী সম্বাদ ও শাহ্দৌলাপীর, মুহম্মদ খানের সত্য-কলিবিবাদ সম্বাদ, আলি রজার সিরাজ কুলব, এতিম আলমের আবদুল্লাহ্র হাজার সওয়াল, শেখ সাদীর গদা মালিকা সম্বাদ, সের রাজের মালিকার হাজার সওয়াল ও ফকর নামা, সৈয়দ নুরুদ্দীনের মুসার সওয়াল, আদম ফকিরের জোহরার সওয়াল, মুহম্মদ খাতেরের সওয়াল ও জওয়াব প্রভৃতিতে মুখ্যত শাস্ত্রীয় জ্ঞানদানের চেষ্টা আছে। সে জ্ঞান কখনো শরীয়তী কখনো বা মারফতী কিন্তু সবক্ষেত্রে তা ধর্মশাস্ত্রানুগ নয়, লৌকিক বিশ্বাস ও শ্রুতি-স্মৃতি ভিত্তিক। লেখকদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা, অধ্যাত্মতত্ত্বে আগ্রহ, পীর-নির্ভরতা ও দেশগত লৌকিক সংস্কারের প্রভাবই এ বিকৃতির মুখ্য কারণ। তাছাড়া মুমীনের কাছে কোরআন সব জ্ঞানের ও চিরন্তন তত্ত্বের উৎস ও আধার। এ বিশেষ তাৎপর্যেই হয়তো লেখকেরা সব বিষয়েই প্রায় নির্বিচারে কোরআনের, রসুলের ও আল্লাহ্র দোহাই ও বরাত দিয়েছেন। প্রায়

ক্ষেত্রেই না জেনে দিয়েছেন, জেনে দিয়েছেন ক্বচিৎ। কাজেই তাঁদের পরিবেশিত সত্য ও শাস্ত্র, তথ্য ও তত্ত্ব তাঁদের অধ্যাত্মচিন্তা, তাঁদের লব্ধ জ্ঞান, তাঁদের অর্জিত ধারণাও তাঁদের কল্পনা ও জীবন-ভাবনার প্রসূন। সাধারণ সত্য কিংবা বাস্তব তথ্যের সঙ্গে এ গুলোর সম্পর্ক পরোক্ষ কিংবা অনির্ণিত। শাস্ত্র কথার ফাঁকে ফাঁকে অন্য জ্ঞানদানের চেষ্টাও আছে। কিছু ভৌগোলিক, কিছু পৌরাণিক, কিছু প্রাকৃতিক জ্ঞান-দানের আয়োজন যেমন রয়েছে, ধাঁধাঁ, হেয়ালীর ব্যবস্থাও তেমনি বিরল নয়। বিদ্যা ও বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য অথবা রহস্যচিন্তা উদ্রিক্ত করবার জন্যই হয়তো এগুলো দেয়া হয়েছে। এদিক দিয়ে ধাঁধাঁ, হেয়ালীর উপযোগিতা অবশ্যই স্বীকার্য।

মধ্যযুগের এই সব গ্রন্থের লেখকরা লোক-শিক্ষকের ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। এ-দৃষ্টিতে এঁদের সওয়াল-সাহিত্যকে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' নামে চিহ্নিত করা অসঙ্গত নয়। সেকালে কথকতার মাধ্যমে অথবা শ্রুতি-স্মৃতির মাধ্যমেই নিরক্ষর মানুষ জগৎ ও জীবন, ধর্ম ও সমাজ, নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করত। আর এভাবে লব্ধ জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে মানুষ পারিবারিক, সামাজিক, বৈষয়িক, নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যত্নবান হত। সেদিক দিয়ে এ সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিমেয়। কেননা এতে মানুষের মনুষত্বের বিকাশ না ঘটলেও, সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়েছে, একটি স্থূল নীতিবোধ ও ধর্মচেতনা মানুষের পতন পথ রুদ্ধ রেখেছিল।

॥ ২ ॥

কবি শেখ সাদী রচিত 'গদা-মালিকা সম্বাদ'-ও সওয়াল সাহিত্য। অন্যান্য সওয়াল সাহিত্যে মুসা ও আল্লাহ্, আলি ও রসুল মুহম্মদ, হর ও গৌরী, আবদুল্লাহ্ ও রসুল, শিষ্য ও পীর প্রভৃতির কথোপকথনের মাধ্যমে গুরুতর বিষয় আলোচিত হয়েছে। পাঠকের ও শ্রোতার কৌতূহল জাগাবার উদ্দেশ্যে শেখ সাদী ও কবি সেরবাজ স্বয়ম্বর-কামী বিদুষী রাজ্ঞী বা রাজকন্যা কর্তৃক বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রে ভাবী বরের [illegible] পরীক্ষাচ্ছলে প্রশ্নোত্তর পরিবেশন করেছেন। কবির উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। তার প্রমাণ কবি শেখ সাদীর ও কবি সেরবাজের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আজো সুলভ। বোঝা যাচ্ছে রোমান্স-সন্ধানী পাঠক-শ্রোতা পরম আগ্রহে উক্ত দুটো পুথি পড়েছেন ও শুনেছেন। রোমান্সের মোড়কে নীরস ধর্মকথা শুনানোর এই সদিচ্ছা [illegible] মিষ্টি ঔষধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রুমরাজের মৃত্যুর পরে তাঁর একমাত্র সন্তান বিদুষী মালিকা রাজ্য শাসন করতে লাগল।

রূপসী মালিকার :

যৌবন-পুষ্পেত যদি মধু উপজিল
কাম বাণে তনু তান দহিতে লাগিল।

তখন মালিকা বুঝল :

কান্ত না থাকিলে যদি বাদশাই করএ
অসার জীবন তার জানিস নিশ্চএ।
চন্দ্র না থাকিলে জান গগন উপর
কোটি কোটি—নক্ষত্রে না হএ পসর।

কাজেই অভিভাবক পিতৃহীনা মালিকা :

নামাজ পড়িয়া পতি মাগে প্রভু পাএ।

এভাবে তো আর রাজকন্যা ও রাজ্ঞীর পতি মেলে না! তাই অবশেষে একদিন সর্ব সংকোচ পরিহার করে মালিকা দরবারে পাত্রদের কাছে নিজের সংকল্প ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল।

শুন পাত্র গণ তবে বচন আমার
সোয়াল উত্তর যেবা দিতে পারে মোরে
খসম কবুল করি বাদশাই দিব তারে।

অতএব রাজ্ঞীর স্বয়ম্বর-সংকল্পের কথা যথাকালে দিকে দিকে বিঘোষিত হল। দূর-দূরান্তর থেকে শত শত রাজকুমার এল, প্রশ্নের উত্তর দানে ব্যর্থ হয়ে বন্দী জীবন বরণ করল। অবশেষে আবদুল আলিম বা হালিম নামের এক তুর্কী গদা (ফকির, দরবেশ) এসে তার প্রশ্নের জবাব দিতে চাইল। আবদুল আলিম গদা হাজার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে মালিকার স্বামী হবার সৌভাগ্য লাভ করল। গ্রন্থের প্রথম দিকে মালিকার রূপের বর্ণনা এবং শেষের দিকে বিবাহোৎসবের বর্ণনা রয়েছে। গ্রন্থোক্ত রুম হয়তো রোম-তুরস্ক নয়। এবং তুরুক তুরস্কবাসী অর্থে ব্যবহৃত।

এখানে প্রশ্নোত্তরের কিছু বর্ণনা দিচ্ছি। শাস্ত্রকথায় দলিল হিসেবে নিঃসঙ্কোচে কোরআনের আয়াতের দোহাই দেয়া হয়েছে, যদিও কোরআনে তা ক্বচিৎ মিলবে। দেশ-দুনিয়ার নানা কথাও প্রশ্নোত্তরে বিধৃত। আর প্রহেলিকাও বিরল নয় :

প্রশ্ন :

কোথা হন্তে আসিয়াছ কহ তুমি সার ?
কোন্ স্থানে থাক তুমি কহ মোর ঠাঁই ?

উত্তর :

পিতার ঔরস আর মাতৃগর্ভ হতে।
নানাস্থানে থাকি আমি স্থান স্থিতি নাই।

প্রশ্ন :

কি খাও এবং কি পান কর ?

উত্তর :

খাই খাবেরের গম এবং 'গুলা পিই অবিরত'।

আল্লাহ্‌র উদ্ভব, রসুল সৃষ্টি ও জগৎ-পত্তনের দীর্ঘ বর্ণনার পরে—

প্রশ্ন :

তবে পুছে কথা হন্তে স্বর্গ-নরক সৃজন ?

উত্তর :

আল্লাহ্‌র গজব দৃষ্টে দোজখ হইছে
কোহ্‌তুরের দৃষ্টে ভেহেস্ত নির্মিছে।
অন্যত্র, (আল্লাহ্‌র গৌরব দৃষ্টে ভেহেস্ত নির্মিছে।)

প্রশ্ন :

তবে পুছে রবি-শশী কা-হতে জন্মিল ?
বীর্যের উৎপত্তি বোল কিরূপে হইল ?

উত্তর :

প্রভুর ধ্যান হইতে তারা (রবি-শশী) উপজিল।
নুরের যে অঙ্গ হতে (বীর্য) ফকিরে কহিল।

তারপর, দিন-রজনী, সুমেরু-কুমেরু প্রভৃতির সৃষ্টি তত্ত্ব বর্ণিত।

প্রশ্ন :

আব আতস খাক বাত কিরূপে হইছে ?

উত্তর :

নুরের অঙ্গের ঘর্মে প্রভুএ সৃজিছে।

রিজিক ও দৌলত :

পূর্বদিক হন্তে জান রিজিক আইসএ।
পশ্চিমদিক হন্তে দৌলত জানিও নিশ্চএ।

দেহের হাড়ের ও রগের সংখ্যা :

গদা বোলে তিনশত ষাটখান জান।
তিনশত ষাট 'রগ' জানিও নিশ্চএ।

মালিকা এবার প্রহেলিকার আশ্রয়ে প্রশ্ন করল :

তবে আর এক কথা পুছে মালিকাএ
এক বৃক্ষের বার ডাল আছএ নিশ্চএ।
এক এক ডালে ধরে ত্রিশ ত্রিশ পাত
বেশ কম নাহি জান সমসর তাত।
সে পত্রের এক পৃষ্ঠে সফেদ আকার
এক পৃষ্ঠে 'ছেহা' রঙ্গ শুন কহি সার।
এক এক পত্র মধ্যে পঞ্চ পঞ্চ ফুল।

উত্তর হচ্ছে :

বৃক্ষ হল বৎসর, ডাল হল মাস,
পাতা হল দিন পাতার সাদা-কাল
রঙ হল দিবা-রাত্রি এবং পঞ্চ ফুল
হচ্ছে দিনের পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ।

প্রশ্ন :

কোন্ কোন নবী বাদশাহ্ও ছিলেন?

উত্তর :

ইউসুফ, সোলেমান, জুলকর্ণ ও মুহম্মদ—এই চার জন।

প্রশ্ন :

চিরজীবী কারা?

উত্তর :

ঈসা আর ইলিয়াস, আলি আজগর (ইদ্রিস)
খিজির যে পয়গাম্বর এই জান চার।

এঁদের মধ্যে ঈসা ও ইদ্রিস যথাক্রমে আকাশে ও স্বর্গে বাস করেন, এবং খিজির জলে এবং ইলিয়াস স্থলে বিচরণশীল।

পেচক দানা-পানি খায় না, তার কারণ : গুন্দম ভক্ষণ করেই আদম স্বর্গ ভ্রষ্ট হন এবং নুহ্ নবী প্লাবনে কষ্ট পেয়েছিলেন। পেচক 'আপনার রক্ত আপে ভক্ষিএ সদাএ' বেঁচে থাকে।

শরীরে বিভিন্ন রাশির সংস্থিতি সম্বন্ধেও 'কোরান আয়াত পড়ি ফকির কহিল।'—যেমন,

অজুদ আসমানে জান সিংহরাশি রএ
কন্যারাশি গর্দানেত ফকিরে বোলএ।
মেষ জানুতে থাকে বৃষ পদমূলে
মিথুন পদ্ম মুলে রহে কহিল সকলে।

আবার শরীরে চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র, পবন প্রভৃতির অবস্থান তত্ত্বও বর্ণিত হয়েছে।

চন্দ্র উলিখাছে জান দীলের অন্তর
নক্ষত্র রহিছে জান কলিজা উপর।
অরুণ উদিত জান কোমর মধ্যেত…
মগজ হন্তে উথলিয়া বসন্তের বায়
মানুষের নাভিমূলে রহেন্ত সদায়।

অদ্বৈততত্ত্ব : আল্লাহ্ এই সৃষ্টিরূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত কাজেই

শশীরূপ ধরি তবে করএ পসর।
রবিরূপে তাপদিয়া চৌদিগে ব্যাপিত
শীতলরূপে রহিয়াছে জলের সহিত।
তেজরূপে রহিয়াছে অনল মাঝার
শীতল সুগন্ধিরূপে পবন সঞ্চার।
অলিরূপ ধরি চরে পুষ্পের মাঝার
মোহাম্মদ নবী জান নিজ অবতার।
আকাশ পৃথিবী মধ্যে যথ শূন্যাকার
নানারূপে কেলি করে হৈয়া অবতার।

প্রশ্ন :

হিন্দুস্থানী কিরূপে হৈল কহ শুনি?

উত্তর :

পুরাণ-কোরাণ দুই শাস্ত্র যে সৃজিল
হিন্দু-মুসলমান দুই পরিচিহ্ন কৈল।
পূর্বে পুরাণ শাস্ত্র আছিলেক শুদ্ধ
অখনে ইব্লিসে পাইয়া করিছে অশুদ্ধ।

হিন্দুর উদ্ভব অনাদি থেকে। অনাদির সন্তান, পিশাচ, দেও, পরী প্রভৃতি এবং অনাদি মুখ-নিঃসৃত হচ্ছেন ব্রহ্মা। তাঁর—'চারিমুখ চতুর্ভুজ পরম সুন্দর। ইব্লিসের খপ্পরে পড়ে হিন্দুরা নানা মিথ্যাচার বরণ করে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে।

শ'বে মে'রাজ কালে নবী মুহম্মদ আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন'

আল্লাহ্‌র অবয়ব :

পুরান পুরুষ অতি নবীন সুরত।
মনুষ্য শরীর নহে নাহি রূপ রেখ
নয়ান গোচরে নবী দেখিল প্রত্যেক।

দুইদিকে উত্তাল কুন্তল জলাকার
নির্লক্ষ্য নিরূপ অতি পরম সুন্দর।

প্রশ্ন ঃ

এ সপ্ত জমিন রৈছে কাহার উপর ?

উত্তর ঃ

মৎস্তের উপরে ক্ষিতি বহে মহাভার
জলমধ্যে সেই মৎস্য ভাসএ অপার।
মৎস্তের শিরের পরে গোশৃঙ্গ আকার
গোশৃঙ্গ উপরে রহে হুকুমে আল্লাহ্‌র।

গর্ভের শিশুর উদ্ভব ও দেহ গঠন তত্ত্ব সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ্‌র হুকুমে মিকাইল ফিরিস্তা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। মিকাইল—

এক এক স্থানে তবে ধূম্র আকার
মণে মণে পানি মাপি দেয়ন্ত সবার।

তারপর,

জলের গুরুজ ঝামা কান্দেত করিয়া
সকল ফিরিস্তামিলি ফিরএ ভ্রমিয়া
একেক গুরুজ মারে একেক যে স্থানে
সেই সে গুরুজ সব ঠাঠা বিজুলির
গুরুজের ঘাতে হএ সহাস্রেক চির।
তবেত শাণিত হএ মেঘের সাজন
বরিখএ জলধারা করিয়া গর্জন।

প্রশ্ন ঃ

ছুনিয়া পত্তন কাহাত, কাহাত নিমজ্জন ?

উত্তর ঃ

গদা কহে খোয়াজের হতে উৎপণ
আখেরে খোয়াজের হাতে হৈব নিমজ্জন !

প্রশ্ন ঃ

সপ্ত আসমান হৈছে এ সপ্ত জমিন
কা হতে প্রচার হৈছে কহত সুজন ?

উত্তর ঃ

গদা কহে মোহাম্মদ হতে সর্বকথা
প্রচার হৈছে, আকাশ-ভুবনের কথা।

রুহ ও আত্মা পাঁচ প্রকার : হায়ওয়ানী, রহমানী, সোবহানী, সুলতানী ও হাবিলি।

উস্তাদ মাহাত্ম্য : উস্তাদ অন্ধের আক্ষি শুন নরগণ।

প্রশ্ন :

আল্লাহ্‌র শের, নবীর শের বোলএ কাহারে?

উত্তর :

আল্লাহ্‌র শের জান আলিম—খলিফা,
রসুলের শের জান মোহাম্মদ হানিফা।

নামাজ—রোজা—এল্‌ম হচ্ছে যথাক্রমে স্তম্ভ, বেড়া ও চাল :

নামাজ দীনের 'ঠুনি' বোলএ ফকিরে।
রোজা দীনের টাটি জানিও নিশ্চএ
এলেম দীনের ছা'নি ফকিরে যে কএ।

প্রশ্ন : দুনিয়াতে মানুষ ছোট, ধনী-নির্ধন হয় কেন? অল্পায়ুই বা হয় কেন?

উত্তর : আল্লাহ্ মানুষের রুহ্ বা আত্মা সৃষ্টি করে স্তূপাকার করে মজুদ রেখেছেন। সেগুলো 'তপজপ করে নিও' এবং 'অবিরত ভাবে প্রভু একমন চিত'। এবং এই তপস্যার পুণ্যানুসারেই অর্থাৎ—

যেবা যত তপ কৈল তার তত পদ
দুনিয়াত আসি পাএ এ সুখ সম্পদ।

আর :

যে সকল বালক মরএ পৃথিস্থিত
সে সকল মনুষ্য নহে জানিও নিশ্চিত।

—তারা ফিরিস্তা, এবং

দুনিয়া দেখিতে তারা আসিয়া থাকএ।
যতদিনের আউ-বাস্ত- লৈয়া আইসএ
ততদিনে বাদে পুনি মউত যে হএ।

কলিযুগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তামাক সেবন!

গদা কহে যেই ক্ষণে কলির প্রবেশ
তামাকু পিবারে লোকে করিব আবেশ
অন্ন হতে তামাকু জানিব বড় ধন
তামাকুতে বৃদ্ধ-বালকের রহিব জীবন।
লজ্জা হারাইব লোকে তামাকুর হতে

হাটিতে চলিতে লোকে পিব পথে পথে।
পিতায় তামাকু পিতে পুত্রে করে আশ
তামাকুতু করিবেক ভুবন বিনাশ।

কবি আফজাল আলিও তাঁর 'নসিহত নামায়' তামাকের নিন্দা করেছেন এবং 'তেরোশ' হিজরী সনের অর্থাৎ আখেরী জামানার লক্ষণ বলে জেনেছেন। এছাড়া হুক্কা পুরাণ (বিশ্বভারতী) এবং তামাকু পুরাণ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) গ্রন্থ রচিত হয়েছে দেখতে পাই।

কলিযুগের অন্যান্য লক্ষণ ঃ

ক.
লোকে মিছাকথা কইব দিনে চারিশত বার
বে-ইমান হৈব লোক সংসার মাঝার।

খ.
নারী পুরুষের মধ্যে ভেদ না থাকিব
পুরুষে নারীর কথা ধরিয়া চলিব।
পুরুষের কথা কভু নারী না ধরিব।

গ.
বাপে পুতে দ্বন্দ্ব করিব প্রতিনিত—

ঘ.
সোয়ামীর সহিতে নারীর না রৈব পিরীত। ইত্যাদি—

ঙ.
অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন
চোর, উজ্জ্বল হৈব সাধু হৈব মলিন। ইত্যাদি।

চ.
বিঘৎ-প্রমাণ জান নর সব হৈব।

কেয়ামতের সময় ঃ
চল্লিশ দিবস জান আখেরের সমএ
বরিখিব মুষলধারা জানিও নিশ্চএ।

তারপর হাসরে ভেহেস্তের হুরেরা এগিয়ে এসে পুণ্যবানদের অভ্যর্থনা করে নেবে,—
কেহ নানা যন্ত্রবাদ্য বাজাইব আনন্দে
মঙ্গল গাহিব কেহ মিলিব সানন্দে।

আলিমের মর্যাদা :

আলিম দেখিয়া যেবা সালাম না করএ
ভিহিস্ত না পাইব সে আখের সমএ।
আলিমের সনে যেবা করএ বড়াই
সত্যসত্য হইব তার দোজখেতে ঠাঁই।

নরক যন্ত্রণা, পাপীর শাস্তি ও ভিহিস্তের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্‌র হুকুমে যে রদ হবে না—পরিবর্তন হবে না তার প্রতীকী ইঙ্গিত হবে :

ততক্ষণে এক অজা আল্লা—আজ্ঞাএ আনি
সেইক্ষণে ফিরিস্তাএ করিবা কোরবানী।

গদা মালিকার বিয়ের সময় :

নানা বাদ্য ধ্বনি আছিল বাজিতে
মেঘের গর্জন সম ভয় লাগে চিতে।

বাদ্যও বিচিত্র : ঢাকা-ঢোল, নাকাড়া, দমাবিউগুল, সানাই, কন্নাল ভেউর, রামশিঙ্গা, ডম্বুর, ঝাঞ্ঝারী, মৃদঙ্গ, তাম্বুরা, মুরলী কবিলাস, দোতারা, মোরচঙ্গ, মন্দিরা, মারিন্দা প্রভৃতি। এ সঙ্গে—

চলিতে চলিতে কেহ গাএ নানা গীত
বাজিকর নাটুয়া যাএ সকলে মিলিয়া।

গজারোহণে গদা বিয়ে করতে গেল, মহাধূমধামে মহোৎসব হল। যথারীতি মারুয়া তৈরী হল, জুলুয়া দেয়া হল এবং বর কনে গেরুয়াও খেল্‌ল। মধুর দাম্পত্য এ ভাবেই হল শুরু।

॥ গ্রন্থোৎপত্তি ॥

যদিও কবি তাঁর কাব্যকে ফারসী কাব্যের অনুরাদ বলে দাবী করেছেন, তবু এটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ছায়াবলম্বন মাত্র। কবি তাঁর আদর্শ ফারসী কাব্যের নাম উল্লেখ করেন নি। হয়তো তাঁর স্বরচিত কাব্যের মূল্য মর্যাদা বাড়াবার জন্যই ফারসীর অনুবাদ বলে প্রচার করেছেন। আমাদের এই সন্দেহের কারণ এই যে এতে বর্ণিত শাস্ত্র কথা কচিৎ শরীয়ত অনুগ এবং দেশী ও লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কারের প্রভাবও প্রতুল। বলা বাহুল্য আল্লাহ্‌, রসুল ও কোরানের দোহাই দিয়েই কবি সব বক্তব্য

প্রকাশ করেছেন। বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্যই হয়তো ফারসী কিতাবের কথা বলেছেন :

মুঞি দাসাধম কিছু কিতাব দেখিয়া
শেখ সাদীএ কহে পাঁচালী রচিয়া।
এক নিবেদন করম সবার চরণ
ফারসী বাঙ্গালা করি করিলুঁ রচন।
যে সবে কিতাব না পড়িছে পৃথিবীত
সে সকলে বুঝিবারে করিলুঁ রচিত।

॥ কাব্য রচনা কাল ॥

গ্রন্থসূত্রে প্রকাশ—গ্রন্থে কবি শেখ সাদী রাজ প্রশস্তি করেছেন। সেই প্রশস্তি থেকে পরোক্ষে কবির আবির্ভাবকাল ও কাব্যের আনুমানিক রচনাকাল নিরূপণ করা সম্ভব। প্রশস্তির প্রয়োজনীয় অংশ এখানে বিধৃত হচ্ছে :

ত্রিপুরা নামেতে এক আছেএ দেশ
এবে আমি কহি কিছু তাহার উদ্দেশ।
রত্নসেন নামে তথা বৈসে মহারাজা
কুকি, মেখল সব করে যার পূজা।
ধর্মবন্ত নরপতি মহিমা মাদার
অবিশ্রাম দান ধর্ম করে নিরন্তর।......
চম্পরাত্র নাম তাত ধর্ম যুবরাজ
রাজ্যের পালন করে মন্ত্রীর সমাজ।

ত্রিপুররাজ রত্ন মাণিক্যের সময় শেখ সাদী তাঁর কাব্য-রচনা করেন। রত্ন মাণিক্যের রাজত্বকাল ছিল ১০৯২—১১২২ ত্রিপুরাব্দ [অথবা ১১১৬ ত্রিপুরাব্দ-ভূপেন চক্রবর্তী] বা ১৬৮২ থেকে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ অবধি। রত্ন মাণিক্য মহারাজ রাম মাণিক্যের সন্তান।- সিংহাসনারোহণ কালে রত্ন মাণিক্যের বয়স ছিল পাঁচ বৎসর। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বয়োপ্রাপ্ত রাজা শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। রাম মাণিক্যের দ্বিতীয় ভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুরের পুত্র চম্পক রায় কিছুকাল রত্ন মাণিক্যের প্রথমে দেওয়ান ও পরে যুবরাজ ছিলেন। 'চম্পকবিজয়' গ্রন্থে এই চম্পক রায়ের কীর্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে গ্রন্থ অপ্রকাশিত ও অনালোচিত। ১৬৮২—৯৫ সনের মধ্যে

বালক রাজার পক্ষে যুবরাজ ছিলেন তাঁর মাতুল বলিভীম নারায়ণ। বলিভীম প্রজা পীড়ক ছিলেন। রাজ্যের লোকের অভিযোগক্রমে সুবাদার শায়েস্তা খান কেশরী দাসকে সসৈন্যে পাঠিয়ে বলিভীমকে বন্দী করিয়ে ঢাকায় ও পরে মুর্শিদাবাদে আটক রাখেন।

এর পরে রাম মাণিক্যের তৃতীয় ভ্রাতা দুর্গা ঠাকুরের পুত্র দ্বারকা নরেন্দ্র মাণিক্য নামে স্বল্প কালের জন্য ত্রিপুর সিংহাসন দখল করেন, তাঁকে বাঁধা দিতে গিয়ে জগন্নাথ ঠাকুরের পুত্র ও রাজ্যের উজির সূর্যনারায়ণ যুদ্ধে নিহত এবং অপর পুত্র ও দেওয়ান চম্পক রায় প্রথমে চট্টগ্রামে ও পরে ভুলুয়ায় পালিয়ে বাঁচেন। পরে রত্ন মাণিক্যের ভ্রাতা দুর্যোধন বা দুর্জয় দেব ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে চম্পক রায় ঢাকায় যান এবং মুগল ফৌজ নিয়ে নরেন্দ্র মাণিক্যকে বন্দী করে ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। তথায় সম্ভবতঃ তিনি প্রাণদণ্ড পান। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে রত্নমাণিক্য সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন।[১] ১৭১২ বা ১৭১৬ সনে রত্ন মাণিক্যকে হত্যা করে তাঁর ভাই ঘনশ্যাম মহেন্দ্র মাণিক্য নামে ত্রিপুরার রাজা হন।

অহোমরাজ রুদ্রসিংহের দূত রত্নকন্দলী রচিত ত্রিপুরা বুরঞ্জী[২] সূত্রে জানা যায়ঃ চম্পক রায় রাম মাণিক্যের সম্বন্ধী তথা শ্যালক ছিলেন। তিনি রত্ন মাণিক্যের যুবরাজ ছিলেন। নরেন্দ্র মাণিক্যকে নিহত করে চম্পক রায় রত্নমাণিক্যকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিজে যুবরাজ পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু ঈর্ষ্যা-অমাত্যদের ষড়যন্ত্র জাত রাজরোষে চম্পক রায় পদচ্যুত হন, এবং দেশ থেকে পলায়নকালে গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান।

অতএব চম্পক রায় ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দেই যুবরাজ হন এবং বয়োপ্রাপ্ত রাজার আমলে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের অনতি পরে কোন সময় নিহত হন। এতে মনে হয়, শেখ সাদী ১৬৮৪—১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তার কাব্য রচনা করেন।

"লোক উপকারী ছিল চম্পক রায়।
ধর্মশীল কীর্তিমন্ত সবে গুণ গায়।"

—এটি সম্ভবত চম্পক রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরের কোন লিপিকারের সংশোধিত পাঠ। অথবা এটিই শুদ্ধ পাঠ। তা হলে মানতে হবে, যে চম্প করায়ের মৃত্যুর পরে কোন সময়ে সাদী তাঁর কাব্য রচনা করেন। অধ্যাপক আলি আহমদ সংগৃহীত একটি খণ্ডিত পুথিতে দুটো অর্থপূর্ণ চরণ পাওয়া যায়ঃ

পড়িয়া বুঝিয়া সব শাস্ত্রের উদ্দেশ
একাদশ বিংশ দুই পুস্তক বিশেষ।

একাদশ বিংশ দুই=১১২২। এটিকে ত্রিপুরাব্দ ধরলে ১১২২+৫৯০=১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ডক্টর এনামুল হকও একে রচনার তারিখ ও বঙ্গাব্দরূপে গ্রহণ করে ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'গদা,মালিকা' রচিত হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন।৩ অধ্যাপক আলি আহমদও বলেন "আমরা যদি ধরিয়া লই যে, শেখ সাদী তাঁহার গদা-মলিকা কাব্য ১৬৮৪ [সনের] পরে ও ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচনা করিয়াছিলেন তবে সকল সন্দেহ দূর হইয়া যায়"।৪

॥ কবি শেখ সাদীর পরিচয় ॥

চম্পক রায় যখন চট্টগ্রামে পলাতকজীবন যাপন করছেন তখন এই শেখ সাদীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে চম্পক রায় সাদীকে বলছেন :

ত্রিপুরা বংশেত জন্ম বসি উদয়পুর
জ্ঞাতি সঙ্গে বাদ করি হইছি বাহির।

[কালীপ্রসন্ন সেন : রাজমালা, ১ম লহর, মধ্যমণি, পৃঃ ৯০। আলি আহমদ কর্তৃক উদ্ধৃত : বাঙ্গালী কবি শেখ সাদী, পৃঃ ১৭।] সাদী নিজে বলেছেন :

শেখ সাদী তাত ক্ষুদ্র একজন
সভাসদে বড় সে যে অতি বিচক্ষণ।

সম্ভবতঃ ধার্মিক সাদীর দ্বারা পলাতক চম্পক রায় দুর্দিনে উপকৃত হয়েছিলেন। এবং সৌভাগ্য উদয়ে তিনি সাদীকে উদয়পুরে এনে রাজদরবারে কোন চাকরী দিয়েছিলেন। অতএব শেখ সাদীর জন্মভূমি তথা পিতৃভূমি সম্ভবত চট্টগ্রাম।

পাদটীকা :

১। ক, রাজমালা—কৈলাসচন্দ্র সিংহ পৃঃ ৯৭।
খ, ঐ—ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী পৃঃ ১৭৫।
অধ্যাপক আলি আহমদ কর্তৃক উদ্ধৃত পৃঃ ১৪।
২। রাজগী(প্রবন্ধ)ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী--আনন্দবাজার, শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৩।
৩। মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য ১ম সং, পৃঃ ২২৬-২৭।
৪। বাঙ্গালী কবি শেখ সাদী, পৃঃ ১৬।

মুহম্মদ আবূ তালিব

উত্তর বঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য

এক ॥ প্রাচীন ও মধ্যযুগ ঃ ৬৫০–১৭৬৫

বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে ভাষাচার্য গ্রীয়ার্সন বলেছেন, "Goudi is the parent of Bengali of North Bengal and of Assamese, spreading to the south east, Magadhi devoloped into the Bengali of Gangetic Delta, and still further towards the rising sun, Dhakki (or the Magadhi of Dacca) became the Modern eastern Bengali."[১]
মানে—গৌড়ী বা গৌড় দেশীয় ভাষা হ'ল উত্তর বাংলার বাংলা এবং অসমীয়া ভাষার জননী, দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় মাগধী গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায় বাংলায় রূপান্তরিত হয়, এবং সূর্যোদয়ের দিকে আরও অগ্রসর হ'য়ে ঢক্কী (বা ঢাকা অঞ্চলীয় মাগধী) পূর্বাঞ্চলীয় আধুনিক বাংলার জন্ম দেয়। এই জন্মকাল অনুমিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী কোন সময়ে। বস্তুতঃ বাংলা দেশের উত্তর এলাকাতেই যে বাংলা ভাষার প্রথম অঙ্কুর উদ্গত হয়েছিল, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাই বাংলা ভাষার আদি জন্মভূমি হিসেবে উত্তর বাংলাকে চিহ্নিত করলে বিশেষ দোষের হয় না। আর শুধু বাংলা ভাষাই বা কেন, বাংলা সাহিত্যের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের উদ্দাম দিনগুলিও অতিবাহিত হয়েছে এই উত্তর বাংলাতে। অথচ কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, সেই ভাষা ও সাহিত্যের আদিকালের বিশেষ কোন নমুনাই এ-যাবৎ

সংরক্ষিত হয়নি, বা তার কোন বিশেষ পরিচয়ও উদ্ঘাটিত হয়নি। আরও কৌতূহলের ব্যাপার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নমুনা বলে যা উদ্ধৃত হয়েছে, তাও বাংলার বাইরে থেকে, মানে সুদূর নেপাল তিব্বত থেকে আনা হয়েছে।

উত্তর বাংলা কেন, বাংলা আসামের কোন অঞ্চল থেকেই তার সামান্যতম নমুনা উদ্ধৃত হয়নি। অথচ একথা সকলেই বলছেন বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন (চর্যাপদ) যা উদ্ধৃত হয়েছে তা বাংলা ভাষারই নিজস্ব সম্পদ[১]। অবশ্য অসমীয়া, উড়িয়া মৈথিলি, হিন্দী ইত্যাদি ভাষাওয়ালারাও চর্যাপদের উত্তরাধিকারিত্বের দাবীতে বহুদিন থেকে লড়া পেটা করছেন। বাঙ্‌লার পণ্ডিতগণ কিন্তু তাঁদের সে দাবীকে আদৌ পাত্তা দিতে নারায। শেষ পর্যন্ত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্[২], ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের ন্যায় উদারনৈতিক ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ তাঁদের দাবীর আংশিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য অবশ্যি তা নয়—আমাদের বক্তব্য হ'ল —বাংলা চর্যাপদের উদ্ধার যেখান থেকেই হোকনা কেন, তার আদি জন্মভূমিই উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্রী এলাকায়। অদ্যাবধি বরেন্দ্রীর লোক-ভাষায় ও লোক-সংস্কৃতিতে চর্যাপদের প্রতিভাস পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত চর্যাপদের সর্বপ্রধান লেখক কহ্নপা ওরফে কানু পা সহ সবরী পা, লুয়িপা, সরহপা প্রভৃতি অনেকেই সমকালীন পুণ্ড্রদেশ নামক ভূখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। বর্তমানে বাঙ্‌লাদেশের উত্তরাঞ্চল ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গের কুচবিহার সহ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও পশ্চিম আসাম এই ভূখণ্ডের অন্তর্গত ছিল।

অসমীয়া ভাষাভাষিগণও যে বাংলা চর্যাপদের উত্তরাধিকারিত্বের দাবীদার হ্তে পারেন, এ থেকে তা বুঝতে কষ্ট হয়না। অসমীয়া ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার আত্মীয়তা যে কতখানি তার পরিচয় মেলে খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের কবি নারায়ণদেবের মনসা মঙ্গল কাব্যে। এই কবিকে অসমীয়াগণ তাঁদের নিজেদের কবি বলে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে মধ্যযুগের বিখ্যাত মৈথিল কবি বিদ্যাপতিকেও বাঙ্গালী বলে গ্রহণ করতে বাংলা ভাষাভাষীরা কোনদিনই আপত্তি করেন নি। এ থেকে একথা মনে করতে দোষ নেই যে, বাংলা এককালে অসমীয়া এবং মৈথিল ভাষার সমতলীয় ভাষা ছিল এবং তাদের সঙ্গে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী সম্পর্কও ছিল। কতদিন থেকে এই মৈত্রী ছিন্ন হয়েছে জানা নেই, তবে আজ এগুলিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে।

চর্যাপদের আদি লেখক মীননাথ ছিলেন বাংলা দেশের অন্তর্গত বাকলা-

চন্দ্রদ্বীপের বাসিন্দা। এই বাকলা চন্দ্রদ্বীপ আজকাল বরিশাল জিলার অন্তর্গত। মীননাথ ছিলেন ধীবর বা বাগ্‌দী সম্প্রদায়ভুক্ত। সমকালীন উত্তরবঙ্গে ধীবর সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। ধীবর সম্প্রদায় নীচ জাতীয় বিধায় উচ্চ সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু দশম শতকে বিখ্যাত রামপাল দেবের পিতা মহারাজাধিরাজ মহীপাল দেবকে পরাজিত করে ধীবর নেতা দিব্যোক ও ভীম উত্তর বঙ্গে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বেও আর একবার বিদেশী কম্বোজ বংশীয়দের দ্বারা উত্তর বঙ্গ (পালরাজ্য) বিজিত হয়েছিল।৩ এবং লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই কম্বোজ বংশীয়দের প্রাচীন কীর্তি কাহিনীর সংগে বাংলার, বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের নাথ সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি প্রাপ্ত একটি প্রাচীন বাংলা শিলালেখ থেকে এই অনুমান আরও দৃঢ়তর হচ্ছে। শিলালেখটি দিনাজপুর জিলার রাণীসংকৈল থানার এলাকাধীন গোরকুই নামক গ্রামের একটি প্রাচীন গোরক্ষনাথের মঠ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। গোরকুই নামটিও গোরক্ষনাথের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এবং গোরক্ষনাথ পাক-ভারতের নাথ ধর্মের প্রধান প্রচারক। শিলা-লিপিটি বাংলা হরফে উৎকীর্ণ এবং জনৈক রাজা সমবর্মা বা সমবর্মদেবের নাম যুক্ত। প্রতিষ্ঠাকাল ৯২০ শক=৯৯৮খ্রীষ্টাব্দ। বাংলা লিপির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় এই লিপিকাল সম্পর্কে কারো মনে সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে; তবে মনে রাখতে হবে, পাণ্ডুয়ার হযরত শাহ সুলতানের মাজার সংলগ্ন মসজিদ শিলালেখে যে 'শ্রীনরসিংহ দাসস্য' নামটি বাংলা হরফে উৎকীর্ণ হয়েছে, সেই শ্রীনরসিংহ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের লোক। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, নরসিংহ সেনরাজ বল্লাল সেনের প্রতিদ্বন্দ্বী নরপতি ছিলেন এবং তিনি বরেন্দ্র কায়স্থকুলের আদিপুরুষ রূপে পরিচিত।৪

বাংলা ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমার এতকথা বলার উদ্দেশ্য হল এই যে, বরেন্দ্রী এলাকায় যে বাংলা ভাষার অঙ্কুর উদ্গত হয়েছিল, তার লিপি, লেখন পদ্ধতির জন্মভূমি হিসেবেও যে সে এলাকা পরিচিত ছিল তা প্রমাণিত করার চেষ্টা করা। বাংলা হরফ সাধনায় উত্তর বাংলার অবদান কতখানি এ আলোচনা মূলতবী রেখেও বলা যায়, বাংলা দেশে আর্যভাষা ও সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন মিলেছে একমাত্র উত্তর বঙ্গের মহাস্থান গড়ে। মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব তিন শতকে উৎকীর্ণ এই ব্রাহ্মী শিলালেখটিকে এই এলাকায় প্রাপ্ত আর্য-প্রভুত্বের একমাত্র প্রাচীন নিদর্শন বলে মনে করা যাচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই শিলালিপিটিকে বাংলা লিপি

লেখনেরও আদি জননী বলে মনে করতে পারা যাচ্ছে। কেননা, পাকভারতীয় অন্যান্য লিপি-লেখনের মত বাংলা লিপি-লেখনও এক প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত বলে লিপিতত্ত্ববিদগণ মনে করেছেন। এই লিপির উদ্ভব কাল ঈসায়ী একাদশ দ্বাদশ শতক বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। তাই যদি হয়, তবে দশম একাদশ শতকেই বা তার জন্মকাল না হবে কেন? উত্তর বঙ্গে প্রাপ্ত এই দু'টি শিলালিপিকে (গোরকুই ও মহাস্থান গড় লিপি) কি আমরা বাংলা লিপির প্রাচীনতম নমুনা মনে করতে পারিনে?

সম্প্রতি বাংলা ভাষার গবেষকগণ বাংলা ভাষার বিচার বিশ্লেষণ করে এরূপ সিদ্ধান্তে পৌছতে চেষ্টা করেছেন যে, বাংলা ভাষা চর্চার আদিস্থান গৌড় বা বাংলাদেশে হলেও বাংলা ভাষার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে নাকি একে মূলতঃ পশ্চিম বঙ্গ বা রাঢ় এলাকার ভাষা বলে মনে হয়। আধুনিক বাংলা সম্পর্কেও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু বলা হয়েছে, বাংলা ভাষার আদি জন্মভূমি গৌড় বা বরেন্দ্রী এলাকা এবং শুধু চর্যাপদই নয়, মধ্যযুগীয় বাংলাভাষার মূল এই এলাকার লোকভাষাতে নিহিত ও অদ্যাবধিই পরিদৃশ্যমান। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাভাষাকে রাঢ়ীয় বা বঙ্গীয় না বলে তাকে আমরা সোজাসুজি গৌড় বা 'বরেন্দ্র'ও বলতে পারি। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের প্রথম ভাগে লিখিত রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাকরণের নামও ছিল 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ'। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অবিশ্যি সবকুল রক্ষা করে চর্যার ভাষাকে 'বঙ্গ কামরূপী' ভাষা বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু বারেন্দ্র লোকভাষার সঙ্গে চর্যাগীতির শুধুমাত্র ভাষাগত সাদৃশ্যই নয়-এর ধ্বনি মাধুর্য, এমনকি আবহ পর্যন্ত বারেন্দ্র, বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে তা বোঝা যায়। তাই বাংলা ভাষা শুধুমাত্র পশ্চিম বঙ্গীয় উপভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, এমন কথা বিশ্বাস্য নয়। বরং বাংলা চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে উত্তর বঙ্গের লোকভাষার তুলনামূলক আলোচনা করলে তাকে বারেন্দ্র ভাষারই অধিকতর নিকট আত্মীয় বলে মনে হয়। একটু উদাহরণ দিলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে মনে করি—

"নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্মণা নাড়িআ॥

আধুনিক উত্তর বঙ্গীয় উপভাষায় এর রূপ দাঁড়ায়:—

নগরের বাহিরে রে ডোম্বী তোহার কুড়িআ।
ছোই ছোই যাইছে ব্রাহ্মণ নাড়িআ॥

বলতে কি এতে বিশেষ কোন ভাষা তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে না। পশ্চিম বঙ্গীয়

উপভাষায় এটি হবে—

নগরের বাহিরে রে ডোম্বী তোঁর কুঁড়ে।
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে ব্রাহ্মণ নেড়ে॥

বলাবাহুল্য. বারেন্দ্র উপভাষায় 'কুড়িয়া' বা 'নাড়িআ' কখনোই 'কুঁড়ে' বা 'নেড়ে' হয় না। আবার 'তোহোর' 'যাহছে' (যাওছে >যাছে)ইত্যাদি শব্দ এখনও নবাবগঞ্জ, রাজশাহী এলাকার সাধারণ মানুষ দিব্যি-ব্যবহার করে চলেছে। এমনকি পনেরো শতকের বিখ্যাত দরবীশ হযরত নূর কুতব-ই-আলমের যে রেকতাহ কবিতাটি মরহুম ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কল্যাণে উদ্ধৃত হয়েছিল, সেই কবিতার বাংলা অংশেও চর্যার ভাষাও ভাবাবহের প্রতিধ্বনি মেলে, যথা,—

উহ চেঃ কর্দম রূ এ তু দিদম
উমত পাগল ভৈঁলু।
হামচু মজনু বাহরে তু লাইলী
ভাবত বেকল ভেঁলুঁ॥

অর্থাৎ— বাঃ কি করলাম মুখ তোমার দেখলাম
উন্মত্ত পাগল হলাম।
যেমন মজনু আমি লায়লীর জন্য ভাবে বিকল হলাম।

তুলনীয় চর্যার—

"উমত শবর পাগল শবর
মা করু গালি গোহারী।
তোহোর নিঅ ঘরিনী
নামে সহজ সুন্দরী॥"

অর্থাৎ—

হে উন্মত্ত শবর, পাগল শবর
করিসনে গোলমাল নালিশ
তোর নিজ ঘরনী নামে সহজ সুন্দরী॥

আবার—

"গর তোরা ব গুযারম খলক চেঃ গোয়ন্দ
নেহা কেঙ্গে তো সনে কৈলুঁ।
মা খাঁ (খুঁ) দর্দত পা কোশায়েস
এলায়ত কেনে না মৈলুঁ॥

অর্থাৎ—

যদি তোমাকে আমি ছাড়ি লোকে কি বলবে
কেন তোমার সঙ্গে আমি নেহা (প্রেম) করলাম।
আমি তোমার জন্য পা ফিরাই
এর থেকে কেন না মরলাম।

তুলনীয়—

আলো ডোম্বী তো এ সম করিব মো সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালী জোই লাঙ্গ॥

অর্থাৎ—

ওলো ডোমনী, তোর সাথে আমি সাঙ্গা করব
নিঘিন কানু কাপালী যোগী উলঙ্গ।

এখানে লক্ষ যোগ্য যে, কুতুব-ই-আলমের কবিতাটিতে করু ধরু, মৈলুঁ ভৈলুঁ, কেহ্নে, নেহা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার একে নিঃসন্দেহে চর্যার উত্তরাধিকার বলে চিহ্নিত করে। কুতুব-ই-আলম উত্তর বঙ্গের রাজধানী পাণ্ডুয়া নগরীর বাসিন্দা ছিলেন (ওফাত ৮১৮ হিঃ=১৪১৬'ঈ)। অদ্যাবধি সেখানেই তাঁর মাজার অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, 'ইউসুফ জলিখা' কাব্যের লেখক শাহ মুহম্মদ সগীরও ছিলেন কুতুব-ই-আলমের সমসাময়িক। এবং যতদূর জানা যায়, এই উভয় কবিই মধ্যযুগের প্রাচীনতম কবি নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনকার বড়ুচণ্ডী দাসেরও এঁরা কনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। অনেকে শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যভাষার প্রাচীনতা বিষয়ে সন্দিহান। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষার পাশে ইউসুফ জলিখার ভাষা রাখলে এই ধারণা যে নেহায়েৎ ভ্রান্ত তা প্রমাণিত হবে। একটু নমুনা দেওয়া যাচ্ছে, যথা,—

"দোসর স্বপ্নের কথা
কহিতে মরম ব্যথা
প্রাণের সখিল।
কহিল সে মোক কথা
আকুল হইলুঁ তথা
শুনিতে হইলুঁ বুদ্ধি হানি!"

আরও একটি কথা। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচয়িতা পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসি হলেও তাঁর কাব্য রচনার ক্ষেত্র উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্রী এলাকা; তাই তাঁর কাব্যে বরেন্দ্রীর লোক ভাষাই শুধু নয়—বারেন্দ্র আবহও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। সত্যি কথা বলতে কি, শ্রীকৃষ্ণ

কীর্তন মূলতঃ বারেন্দ্র লোক-গীতি 'ধামালী' (আধুনিক নাম জাগের গান) বই নয়। স্বয়ং কবিই তাঁর রচনা 'ধামালী' বলেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন মনে হয়।

ক) "না বুঝো রঙ্গ ধামালী।
না জানো সুরতী কেলী
বাহুড়িআঁ চল সে নিষদ বনমালী।

খ) "সব গোপী ছাড়ি বনমালী
মোরে কেহ্নে বোলএ ধামালী।

গ) আপন খায়াঁ বোলে ধামালী
সম্বন্ধ না মানে বনমালী॥

'ধামালী' মানে শ্রীকৃষ্ণের অসংযত রাসলীলার বর্ণনাত্মক কাব্য (ধামালী ∠ঢামালী ∠ঢঙ্গ)। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে শব্দটি 'দৈশিক'। অর্থ শঠতা বা চতুরালী (Horse play, sport)। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ধামালী শব্দের যে অর্থের দ্যোতনা আছে তাতে তাকে শুধুমাত্র শঠতা বা চতুরালী বলে চালানো যেতে পারে না। ডক্টর প্রিয়রঞ্জন সেন সত্যিই বলেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের সঙ্গে এই সব জাগের গান ও ধামালী গানের ভাবের দিক দিয়া যোগ আছে, সুতরাং ইহা বাঙ্গলা সাহিত্যে নিতান্ত খাপছাড়া ব্যাপার নহে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনও পালাবদ্ধ ধামালী শ্রীকৃষ্ণের গান কানাই এর গান।" (সাহিত্য প্রসঙ্গে) এবং এই গানের যে সামান্য নমুনা অদ্যাবধি উদ্ধৃত হয়েছে তার সবটুকুই পাওয়া গেছে উত্তর বঙ্গের রংপুর ও দিনাজপুর এলাকা থেকে। তাই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কবি যেখানকার বাসিন্দাই হোন না কেন, তাঁর কাব্য নিতান্তই বারেন্দ্র কাব্য, এবং তার ভাব ও আবহও পুরামাত্রায় বারেন্দ্র এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রসংগতঃ আরও একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস ও মালাধর বসু ওরফে গুণরাজ খান এই তিনজন পশ্চিম বঙ্গীয় কবি গৌড়ীয় রাজ দরবারের পৃষ্ঠপোষকতাতে কাব্য চর্চা করেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, তবে মনে রাখতে হবে—তাঁরা গৌড়ের প্রবাসী কবি, সমকালীন গৌড়বাসী কবিদের অবদানের কথা অস্বীকার করে শুধু তাঁদের নিয়ে আমরা গৌরব করতে পারিনে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্চে, সমকালীন গৌড়বাসী কবি ছিলেন কারা? দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁদের যথার্থ পরিচয় অদ্যাবধি উদ্ধার

করতে পারিনি। তবে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা যাচ্ছে—কবি চণ্ডিদাস কৃত্তিবাস প্রভৃতির সমকালে খাস গৌড় এলাকাতেই পূর্বোক্ত শাহ মুহম্মদ সগীর, হযরত নূর কুত্বি আলম ও 'রসুল বিজয়'কার জয়েন উদ্দীন, 'নিজাম পাগলা' লেখক মুহম্মদ কালা, 'আত্ম পরিচয়' লেখক শেখ জাহিদ প্রভৃতি কবির আবির্ভাব ঘটে। এঁরা যথাক্রমে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ, সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে আবির্ভূত হন (১৪৭৪-১৫১০)। অবিশ্যি জয়েন উদ্দীন গৌড়বাসী কি প্রবাসী কবি ছিলেন এ নিয়ে পণ্ডিত সমাজে মতদ্বৈত আছে। তবে একথা সত্য, আমীর জয়েন উদ্দীন হরুয়ী নামে একজন ফারসী কবি শামসুদ্দীনের দরবার অলঙ্কৃত করেন এবং গৌড়ীয় দরবারে ইনি ছিলেন 'মালিকুশ শুয়ারা' বা কবি-সম্রাট নামে পরিচিত।

ডক্টর সুখময় মুখোপাধ্যায় আমীর জয়েন উদ্দীন হরুয়ীকেই বাংলা রসুল বিজয় কাহিনীর রচয়িতা মনে করেছেন।৬ ডক্টর আহমদ শরীফ একজন অবাঙালীকে সমকালের বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য বাংলা কাব্য রচয়িতা বলতে দ্বিধা করেছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, শুধু জয়েন উদ্দীন কেন, মধ্যযুগের এমন অনেক মুসলিম কবিই ছিলেন বা থাকা সম্ভব যাঁরা একাধারে ফারসী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেছেন। পূর্বোক্ত হযরত কুতুব-ই-আলম যার দৃষ্টান্ত। হযরত কুতুব-ই-আলম একাধারে ফারসী ও বাংলা ভাষার কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। পূর্বোক্ত রেখতাহ্ কবিতাটি ব্যতীত তাঁর 'সুব্হি গুলশান,' 'আনিসুল গুরারা,' 'মাকতুবাত' ইত্যাদি ফারসী গদ্য-পদ্যেরও সন্ধান মিলেছে।

কবি মুহম্মদ কালার নিজাম পাগলা কাহিনীর একাধিক পুথি সম্প্রতি উত্তর বাংলার রংপুর ও দিনাজপুর জিলা থেকে আবিস্কৃত হয়েছে। এই সব পুথি থেকে অনুমিত হয়, তিনি খ্রীষ্টীয় পনেরো-ষোল শতকের কবিদের অন্তর্গত ছিলেন। 'নিজাম পাগলা' রূপকথা জাতীয় রোমান্টিক কাহিনী কাব্য।

মুহম্মদ কালার পরে নাম করতে হয় শেখ জাহিদ ও আবদুস সোবহানের। সেখ জাহিদ ছিলেন হযরত কুত্ব-ই-আলমের বিখ্যাত পৌত্র। ইনি অতি উঁচু দরজার আধ্যাত্ম সাধক ছিলেন। হযরত কুতুব-ই-আলমই নাকি তাঁকে এরূপ দোয়া করে যান যে, তাঁর ধারা কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। আজও শেখ জাহিদ একজন উঁচুস্তরের সাধক পুরুষ হিসাবে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, রাজা গণেশ নিহত হলে পুত্র যদু যখন দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন যদু তাঁর পিতা

কর্তৃক নির্বাসিত শেখ জাহিদকে পুনরায় দরবারে আহ্বান করে তাঁর হাতে মুরিদ হন। ইনি ১৪৫৫ খৃঃ ওফাত পান।[৭]

সম্প্রতি শেখ জাহিদের 'আদ্য পরিচয়' নামক একখানি প্রাচীন পুথি রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়ামের তরফ থেকে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।[৮] সম্পাদক দাবী করেছেন যে, এই কবি শেখ জাহিদ ও হযরত শেখ জাহিদ অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু কাব্যখানির রচনাকাল বিচার করলে ১৪২০ শক=১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। তা যদি হয় তাহলে তাঁর অন্ততঃ তিপ্পান্ন বৎসর আগে হযরত শেখ জাহিদের ইন্তিকাল হয়েছে। অবিশ্যি শেখ জাহিদকে হযরত কুতুব-ই-আলমের পৌত্র হতেই হবে এমন কোন কথা নেই, তবে বলতে দোষ নেই যে, হযরত কুতুব-ই-আলম বাংলা সাহিত্যে যে আধ্যাত্ম সাধনার ধারা বয়ে এনেছিলেন, তারই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন শেখ জাহিদ প্রমুখ মুসলিম দরবীশ কবিকুল। সত্যি কথা বলতে কি, এই শেখ জাহিদ থেকে মুসলিম দেহ তত্ত্বমূলক মরমী কাব্য সাহিত্যের যে ধারা প্রবাহিত হয়, তারই একটি ধারা পরবর্তীকালে নাথগীতিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং অন্যতর ধারা তথাকথিত যোগ পন্থি বাউল-মারফতী-মুর্শিদী ইত্যাদি গীতিধারার জন্ম দেয়। কেননা এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম নাথগুরু গোরক্ষনাথের সাধন-পন্থের সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায় এবং বৌদ্ধ নাথ যোগতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামী সুফী সাধনার ধারার সমন্বয় সাধনের সক্রিয় প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, শেখ জাহিদ স্পষ্টই বলেছেন, তাঁর কাব্যে 'গর্ভতন্ত্র' 'যোগতন্ত্র' ও 'সিদ্ধের কাহিনী' পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। আর এই দেহতত্ত্ব সাধনাই হল তাঁর মতে, সকল সাধনার সার। কেননা,—

"শেখ জাহিদ কএ জানিলুঁ জে নিশ্চএ
ঘট কৈল গোসাঞি ভাণ্ডার।
সংসারেতে জথ দেখোঁ সব যে উগতে লখোঁ
ঘট হইতে সকল প্রচার॥

এই ঘট=মানব দেহ। স্বয়ং ঈশ্বরও এই ঘটে ভর করে আছেন। এই ঈশ্বর যখন ঘট ছেড়ে পালিয়ে যাবেন তখন ঘটের লীলা খেলারও হবে শেষ—

"ঘটের ঈশ্বর জবে জাএ পলাইআ।
শূন্য হইয়া ঘট থাকএ পড়িআ॥"

তুলনীয়—লালন ফকীরের 'মনের মানুষ'তত্ত্ব। আদ্য পরিচয়ের ভূমিকা লেখক

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ডক্টর এ আর.মল্লিক সাহেবও এই গ্রন্থে বাংলা দেশে নাথযোগ পন্থীর সংমিশ্রণে যে নূতন ইসলামী সমাজ বাদের জন্ম নিচ্ছিল তার আদিরূপ লক্ষ্য করেছেন।

শেখ জাহিদের পরবর্তী কবিদের মধ্যে গোরক্ষ বিজয় ইত্যাদি কাব্য রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লাহ, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস রচয়িতা শুকুর মামুদ ও 'সত্য পীর' কাব্যের রচয়িতা তাহির মামুদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর সুকুমার সেন প্রমুখ মনীষিবৃন্দ শেখ ফয়জুল্লাহর গোরক্ষ বিজয় কাব্যের অত্যাধিক প্রশংসা করলেও সত্যি কথা বলতে কি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শেখ ফয়জুল্লাহ একজন উপেক্ষিত কবি। যে যুগে মাত্র একখানি কাব্য বা গ্রন্থ রচনা করে রাজদরবারে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হওয়া যেত, সেকালে তিনি বহুবিধ বিচিত্র কাব্য কবিতার স্রষ্টা হয়েও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিতান্তই উপেক্ষিত রয়েছেন। তাঁর কাব্য-গ্রন্থের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকলেও এ যাবৎ তাঁর নিম্নলিখিত কাব্যের পুথি উদ্ধৃত হয়েছে যথা— গোরক্ষ বিজয়, গাজী বিজয়, সত্যপীর, জয়নাবের চৌতিশা, সুলতান জমজমা ও রাগমালা। উল্লেখ্য যে, সুলতান জমজমা কাব্যখানি সম্পাদিত হয়ে সম্প্রতি ঢাকার বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।৯ প্রসংগত উল্লেখ্য যে, প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য পাঠকালে একজন সাধারণ পাঠকেরও এরূপ ধারণা জন্মান অসম্ভব নয় যে, বাংলা কাব্যে বিষয়বস্তুর বড় অভাব। সেই এক ঘেয়ে রামায়ণ ও মহাভারত ও মঙ্গল কাব্যে কাহিনীর সুরে বাঁধা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য পড়তে পড়তে পাঠক যদি হঠাৎ ফয়জুল্লাহর কাব্যের সন্ধান পান তাঁর মনে হবে এ যেন ধূসর মরুর বুকে এক অফুরন্ত পানির প্রস্রবন। শুধু কি বিষয় বৈচিত্র্যে? কি বিষয় গৌরবে, কি ছন্দ মাধুর্যে, কি উদার মানব স্বভাবে শেখ ফয়জুল্লাহর কাব্য সমকালীন বাংলা সাহিত্যে কেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ডক্টর সুকুমার সেন তাই যখন বলেন,—"সমগ্র পুরানো বাংলা সাহিত্যে এমন (গোরক্ষ বিজয়ের মত) মহনীয় কাহিনী আর নাই এবং বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা অদ্বিতীয় মনে করি।" তখন অতিশয়োক্তির মতো মনে হলেও সত্য বলে বিশ্বাস হয়। পক্ষান্তরে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন একে অশোক স্তম্ভের সঙ্গে তুলনা করে বলেন,—"যেমন অশোকস্তম্ভ বৌদ্ধ যুগের নিদর্শন এই পুস্তক তেমনি নাথ ধর্মের একটি গৌরব জনক নিদর্শন।" বস্তুতঃ তাই! শেখ

ফয়জুল্লাহর কাব্য সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই একটি গৌরব জনক স্তম্ভ স্বরূপ।

অবিশ্যি ফয়জুল্লাহর আবির্ভাব কাল ও জীবন কথা সম্পর্কে সুধী সমাজে মত-দ্বৈত আছে। তবে যতদূর মনে হয়, তিনি খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের প্রথম পাদের লোক। অন্ততঃ তাঁর 'সত্য পীর' কাহিনীর রচনা কাল জ্ঞাপক পয়ারটি থেকে এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। পয়ারটি এই—

"মুনি রসবেদ শশি শাকে রহে সন।
শেখ ফয়জুল্লা ভণে ভাবি দেখ মন॥"

এ থেকে ১৪৬৭ শক = ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, কাব্যরচনার ক্রম হিসেবে সত্যপীর যদি তাঁর তৃতীয় কাব্য হয়, তাহলে তাঁর গোরক্ষ বিজয় ও গাজি বিজয় কাব্য ইতিপূর্বেই রচিত হয়ে থাকবে। কেননা, তাঁর উক্ত কাব্যেই উক্ত হয়েছে,—

"গোর্খ বিজয় আছে মুণি সিদ্ধা কত।
কহিলাম সবকথা শুনিলাম যত॥
খোঁটা দুরের পীর ইসমাইল গাজী।
গাজীর বিজএ সেহ মোক হইল রাজী॥
এবে কহি সত্য পীর অপূর্ব কথন।
ধন বাড়ে শুনিলে হয় পাতক খণ্ডন॥" ইত্যাদি।১০

তাই বলতে পারা যায়, শুধু গোরক্ষ বিজয় নয় বাংলা সাহিত্যে 'গাজীবিজয়' 'সত্যপীর' এমন কি জঙ্গনামা কাহিনীর তিনি আদি পথ প্রদর্শক। ডক্টর এনামুল হক মনে করেন—তাঁর 'জয়নাবের চৌতিশা' থেকে বাংলা জঙ্গনামা কাহিনীরও সূত্র-পাত হয়েছে।

ডক্টর সুকুমার সেন প্রমুখ মনীষিবৃন্দ মনে করেন, সত্যপীর কাহিনী কাব্য ধারারও সূত্রপাত হয় প্রধানতঃ স্কন্দ পুরাণের রেবা খণ্ডে বর্ণিত সত্য নারায়ণের ব্রত কথা থেকে এবং শেখ ফয়জুল্লাহ প্রমুখ হিন্দু মুসলমান কবিগণ পরবর্তীকালে এ কাহিনী হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রয়াসী সত্যপীরের কাহিনী কাব্য-রূপে প্রকাশ করেন। কিন্তু শেখ ফয়জুল্লাহর কাল নির্ণয়ের পর প্রতীতি জন্মে যে, স্কন্দ পুরাণ থেকে নয়, এ কাহিনী শেখ ফয়জুল্লা প্রমুখ মুসলিম কবিদের স্বকপোল কল্পিত কোন সত্যপীর বা পীর বরহকের কাহিনী মাত্র। হিন্দু কবিগণ পরবর্তীকালে এর সঙ্গে সত্যনারায়ণ কাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বলা বাহুল্য, স্কন্দ পুরাণের সত্য নারায়ণের কাহিনী নিতান্তই অর্বাচীন এবং পুরানবিদ পণ্ডিতগণের

মতে এ কাহিনী প্রক্ষিপ্ত। আরও উল্লেখ্য যে, পুরাণ কাহিনীতে 'সত্যপীর' নামটিই অনুপস্থিত এবং তাতে এই কাহিনীর মূল বিষয় হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথাও নেই।১১ অবিশ্যি শেখ ফয়জুল্লাহ্ উত্তর বঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন কি না নিশ্চিত করে বলা না গেলেও তাঁর অধিকাংশ রচনাই উত্তর বঙ্গীয় ঐতিহ্যমূলক এবং তাঁর অনুসারী কবিদের মধ্যে অনেকেই উত্তর বঙ্গের বাসিন্দা বলে জানা যায়। যাঁদের মধ্যে রামপুর বোয়ালিয়ার সিন্দূর কুসুমী গ্রামের শুকুর মামুদ ও রঙ্গপুর ঘোড়াঘাটের দুর্গাপুর নিবাসী তাহির মামুদের নাম আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

ডক্টর সুকুমার সেন শুকুর মামুদকে রঙ্গপুরের 'মধুমালা মনুহর কাব্য' রচয়িতা শাকের মামুদ থেকে অভিন্ন মনে করেন। পক্ষান্তরে ডক্টর এনামুল হকের মতে শুকুর মামুদ কুমিল্লা জিলার বাসিন্দা। ডক্টর মযহারুল ইসলাম আবার পাবনা জিলার শাহবাজপুরের নিকটবর্তী দুলাই গ্রামের বাসিন্দা 'গুলে বাকাওলী' ইত্যাদি কাহিনী রচয়িতা আব্দুস শুকুর ওরফে মাণিক মিঞাকেও শুকুর মামুদ থেকে অভিন্ন মনে করতে চেয়েছেন। কিন্তু বলা হয়েছে, এরা সকলেই ভিন্ন ব্যক্তিই শুধু নন—ভিন্ন সময়ে ভিন্নস্থানে এঁদের আবির্ভাব ঘটেছে এঁদের যথার্থ পরিচয়ও উদ্ঘাটিত হয়েছে।১২ শাকের মামুদ অঠারো শতকের শেষার্ধে ঘোড়াঘাটের রাজা গৌরনাথের জমীদারী আমলে (১৭৭১-৭২ খ্রীঃ) রেফায়েতপুর গ্রামে আবির্ভূত হন এবং বলা হয়েছে শুকুর মামুদ ও মাণিক মিঞা যথাক্রমে রাজশাহীর সিন্দূর কুসুমী পাবনা জিলার দুলাই গ্রামের বাসিন্দা। বলাবাহুল্য, শেষোক্ত মাণিক মিঞা উনিশ শতকের শেষার্দ্ধের লোক।

সম্প্রতি প্রাপ্ত উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কবিদের মধ্যে তাহির মামুদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা প্রয়োজন যে, এই কবির কাব্য নব আবিষ্কৃত নয়—তবে তিনি এক ভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। ডক্টর সুকুমার সেন 'সত্যপীরের বিচিত্রতম এবং বৃহত্তম কাব্য' রচয়িতা উত্তর বঙ্গের যে কৃষ্ণহরি দাসের নাম করেছিলেন তাঁর 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে আলোচ্য তাহির মামুদই সেই কৃষ্ণহরির গুরু এবং কাহিনীর মূল রচয়িতা, এবং কৃষ্ণহরি তার অনুলেখক মাত্র।

কৃষ্ণহরির নামে প্রচলিত উত্তর বঙ্গের একটি ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতি 'নয় আনার কবি' নামে প্রচলিত আছে। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেল, এই রচনাটিও তাহির মামুদের। রচনা কাল ১১৯০ সাল ১৭৮৩ খ্রীঃ।১৩ তাহির মামুদ ঘোড়া

ঘাটের অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর পিতার নাম শমশের। উল্লেখ্য যে শেষোক্ত কবিতাটিতে একটি সমকালীন গণআন্দোলনের ছবি পরিস্ফুট হয়েছে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই—রঙ্গপুরের কালেক্টর অন্যায়ভাবে ঘোড়াঘাটের রাজার মনোনীত দেওয়ানকে নিযুক্ত না করে অন্য লোককে নিযুক্ত করেন। এই দেওয়ান রাজার সঙ্গে নানা অসদ্ব্যবহার করতে থাকায় প্রজারা বিক্ষুব্ধ হয়ে দেওয়ানের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করেন এবং সেই আন্দোলনের ফলে গুডল্যাড সাহেব পূর্ব দেওয়ানকে পদচ্যুত করতে বাধ্য হন। ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু একদল নিরীহ ও নিরস্ত্র জনসাধারণের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে দাবী আদায়ের কাহিনী আঠারো শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনব। প্রসংগত উল্লেখ্য, তাহির মামুদের অন্যতর কাব্য 'সত্যপীর' কাহিনীতেও এই ধরণের একটি গণদাবীর উল্লেখ আছে। তাতে দেখা যায়, স্বয়ং আল্লাহতায়ালার এক অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এসেছেন বেহেস্তের 'সওয়া লক্ষ' নারী সমাজের চল্লিশজন প্রতিনিধি!

তাহির মামুদের সমকালীন, অথবা কিঞ্চিৎ পরবর্তী কবিদের মধ্যে 'রসুল বিজয়' রচয়িতা গোলাম রসুল (১১৯৭=১৭৯০ খ্রীঃ) 'হানিফার লড়াই,' কলমদার নামা রচয়িতা মীর মনুহর, 'জ্ঞান বাক্য' (গ্যান বাক্য) রচয়িতা আমিরুল্লা (১২১২=১৮০৫ খ্রীঃ) 'হাতেম তাই', 'কেচ্ছা বদরে মুনীর' (রসনামা) রচয়িতা মুন্সী কাদেরুল্লা ওরফে মুহম্মদ মূসা মিঞা (১৮২৮=১৮২১ খ্রীঃ), 'আগম পুথি' রচয়িতা জের শেখ, 'মনসামঙ্গল' রচয়িতা দ্বিজ রামচন্দ্র, 'জ্ঞান শব্দ সার' রচয়িতা কবি কুসাই উল্লিখিত কবিদের কাব্য সম্প্রতি উদ্ধৃত হয়েছে। এঁদের পরিচয় যতদূর জানা যায়—গোলাম রসুল রঙ্গপুরের মীর মনুহর ও মূসা মিঞা যথাক্রমে বগুড়া ও দিনাজপুরের বাসিন্দা ছিলেন। জের শেখ মালদহের এবং দ্বিজ রামচন্দ্র বগুড়া জিলার (ঘোড়াঘাট) [illegible] পল্লী গ্রামের বাসিন্দা। আমিরুল্লা ও কবি কুসাই ছিলেন ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ([illegible]) খট্টবিলা পরগণার বাসিন্দা। ঘোড়াঘাটের নয় আনী পরিবারের রাজগণের বংশাবলী পাঠে জানা যায়, দ্বিজ রামচন্দ্র রাজা বিশ্বনাথের সময়ে আবির্ভূত হন। বিশ্বনাথ ছিলেন বাংলার নওয়াব মুর্শিদকুলী খানের সমসাময়িক এবং কবি শাকের [illegible] পৌত্র রাজা গৌরনাথের ঠাকুরদা। উল্লেখ্য যে, শাকের মামুদের কাব্যে ঘোড়া-ঘাটের নয় আনী অংশের জমিদার বংশের এমন নিখুঁত এবং পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে যাকে শুধুমাত্র কাব্য না বলে ঘোড়াঘাটের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তও বলা যায়।

ঘোড়াঘাটের এই রাজ পরিবার বাংলা সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্টপোষকতা করতেন

বলে জানা যায়। অন্ততঃ মধ্যযুগের চারজন উল্লেখযোগ্য কবির সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্ক ছিল। তাঁরা হলেন যথাক্রমে, 'রসকদম্ব' রচয়িতা কবি বল্লভ (১৫৯৯), 'মনসা মঙ্গল' রচয়িতা দ্বিজ রামচন্দ্র (১৭১২—১৭২৫), 'মধুমালা মন্নুহর' রচয়িতা শাকের মামুদ (১১৭৮-৭৯ = ১৭৭১-৭২) ; ও 'নয় আনার কবি' ও সত্যপীর রচয়িতা তাহির মামুদ সরকার (১১৯০ = ১৭৮৩)। এঁদের পৃষ্ঠপোষকও হলেন যথাক্রমে—রাজা বিশ্বনাথ, রাজা শিবনাথ, রাজা গৌরনাথ ও রাজা সীতারামরায়। রাজা সীতারাম রায়ের সময় গুডল্যাড সাহেব ছিলেন রঙ্গপুর প্রদেশের শাসনকর্তা।[১৪] আঠারো শতকের খ্যাতনামা মুসলিম কবিদের মধ্যে পশ্চিম বংগের গরীবুল্লাহ ও উত্তর বংগের হায়াত মামুদের নাম উল্লেখযোগ্য। শাহ গরীবুল্লাহ তথাকথিত দোভাষী পুথি সাহিত্যের কবিগুরু। হায়াত মামুদ গরীবুল্লাহর মত কোন বিশেষ রীতির স্রষ্টা না হলেও বাংলা সাহিত্যে ধর্ম ও ইতিহাস চেতনামূলক সাহিত্য সাধনার অগ্রদূত। তাঁর 'জঙ্গ নামা', 'আম্বিয়া বাণী', তারই ফলশ্রুতি। ইতিপূর্বে সৈয়দ সুলতান মুহম্মদ খান প্রভৃতি কবি মুসলিম ইতিহাস অবলম্বনে কাব্য রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন ; সৈয়দ সুলতানের ভাষায় যা ছিল অবহেলিত 'খুদা রসুলের কথা', কিন্তু সে কথা-কাহিনী যথার্থ ইতিহাস সম্মত না হওয়ায় হায়াত মনঃক্ষুন্ন হ'য়ে 'জারি জঙ্গনামা' ও 'আম্বিয়া বাণী' লিখেছিলেন। তাতে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন :

"পড়িনু শুনিনু ভাই আরবী ফারসী।
ইমামের কথা শুনি দুঃখ মনে বাসি।
যতেক শুনিনু ভাই পুস্তক বয়াতে।
কথো আছে কথো নাই কিতাবের মতে॥
নাহি জানে আদ্য কথা নাহি জানে তত্ত্ব।
পাচাল পড়িয়া মিথ্যা ফিরয়ে সতত॥"

কবির 'আম্বিয়া বাণী'তেও অনুরূপ অভিযোগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পূর্বতন সৈয়দ সুলতান তাঁর নবীবংশে হিন্দু অবতার যথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, নৃসিংহ প্রভৃতিকে মুসলিম নবীদের মধ্যে আসন দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম ইতিহাসসম্মত নয় বলে হায়াত এঁদের নাম তাঁর 'আম্বিয়া বাণী'তে স্থান দেননি। বলতে কি এ ভাবে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ মুসলিম ইতিহাস-সচেতন সাহিত্য ধারার জন্ম হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, হায়াতের কিঞ্চিৎ পূর্বেই আব্দুস সোবহান নামে এক কবির আবির্ভাব হয়। সাহিত্য সাধনার ধারা হিসাবে ধরলে ইনি হায়াত মামুদেরও

পূর্বসূরী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর কাব্য খানি বহুল প্রচলিত হলেও আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে উপেক্ষিত। সম্প্রতি রঙ্গপুর, দিনাজপুর থেকে এর একাধিক পুথি ও একখানা ছাপা পুথি উদ্ধৃত হয়েছে। তার বিষয় বস্তু কবির ভাষায় 'মুসলমানী কথা'। কাব্যের নাম 'ইমাম সাগর' বা ইমান সাগর। এর প্রকৃতি বিচার করতে গেলে হায়াতের হিতজ্ঞান বাণী ও আম্বিয়া বাণীর প্রত্নরূপ বলা যেতে পারে। কবি এতে মুসলিম বিশ্বাসের মূল নীতি (ঈমান) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে মুসলিম ঐতিহ্য সম্মত নবী কাহিনী এবং সর্বশেষে কারবালার মর্মন্তুদ ইতিহাস বর্ণনা করে কাব্য খতম করেছেন।

তাঁর পিতার নাম নূরউদ্দীন আলী (নুদ্দিআলী) এবং পীর কাসেম আলীর নিবাস ঘোড়াঘাট বলেই মনে হয়। কবির দাদা পীর নামে উল্লিখিত হযরত শাহ দরীয়া বোখারীর মাজার অদ্যাবধি প্রাচীন ঘোড়াঘাট শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। কবি হায়াত মাহমূদের 'আম্বিয়া বাণী' (১৭৫৮) কাব্যেও এবং পীর শাহ দরীয়া বোখারীর বন্দনা থেকে মনে হয়, শাহ দরীয়া বোখারী খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের বেশ কিছু পূর্ববর্তী কালের হবেন। যথা,—

ঘোড়াঘাটে বন্দো আর আউলিয়া জামন্ত।
সানবিন্দ শা দরিয়া বোখারী মোহন্ত॥

এ-থেকে অনুমিত হয়, কবি আব্দুস সোবহানও হায়াত মাহমূদের পূর্ববর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন

এতদ্বতীত 'রসূল বিজয়' কাব্য রচয়িতা গোলাম রসূল (১১২৭ = ১৭২০), 'নূরনামা' রচয়িতা আমিরল্লাহ (১১১২ = ১৮০৫), 'হাতেম তাই' ও 'রস নামা' কাব্য রচয়িতা কাদেরুল্লাহ্ ওরফে মুহম্মদ মূসা মিঞা (১১২৮ = ১৮২১), 'হানিফার জঙ্গনামা' রচয়িতা কুতুবউদ্দীন, 'কেয়ামত নামা' রচয়িতা বুরহানুল্লাহ (খাকী), 'নবীনামা', 'আহকামোল এছলাম', 'হেন্দুগণ জাতি দর্পণ' ইত্যাদি কাব্য রচয়িতা বুরহানুল্লাহ (দ্বিতীয়) প্রভৃতি কবিগণকেও উত্তর বঙ্গের বাসিন্দা বলে সনাক্ত করা যাচ্ছে। বলা-বাহুল্য, এইসব কবিদের কাব্যের পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি রংপুর-দিনাজপুর এলাকা থেকে বর্তমান নিবন্ধকার সংগ্রহ করেছেন।

এই এলাকার অন্যান্য সুপরিচিত কবিদের মধ্যে যাঁদেরকে খাস উত্তরবঙ্গীয় গণ্য করা যায়, তাঁরা হ'লেন যথাক্রমে—অদ্ভুত রামায়ণ রচয়িতা অদ্ভুতাচার্য, খেতুরী মহোৎসবের নায়ক সতেরো শতকের কবি নরোত্তম দাস, 'চন্দ্রিকা বিজয়' কাব্য রচয়িতা

দ্বিজ কমললোচন, গোসানী 'মঙ্গল রচয়িতা' রাধাকৃষ্ণ দাস। শেষোক্ত দু-জন কবিই উত্তর বঙ্গের ঘোড়াঘাট এলাকার বাসিন্দা। এঁদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ দাস ছিলেন ঘোড়াঘাটের বানদ্বার গ্রামের বাসিন্দা এবং দ্বিজ কমললোচনের বাসস্থান ছিল রঙ্গপুরের মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত চরকাবাড়ী গ্রামে।

কবির জীবন কালে বাঙ্‌লা দেশে 'দিল্লীশ্বরসুত' শাহ মুহম্মদ শুজার সুবাদারীর আমল ছিল (১৬৩৯—১৬৬১)। সম্প্রতি এই এলাকারই আর একজন প্রাচীন কবির পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। কবির নাম দ্বিজ রামচন্দ্র, কাব্য—'বিষহরি' অর্থাৎ মনসামঙ্গল কাব্য-কাহিনী। দ্বিজ রামচন্দ্র ঘোড়াঘাটের নয় আনী অংশের জমিদার রাজা বিশ্বনাথের আমলে আবির্ভূত হন। রাজা বিশ্বনাথ বাঙ্‌লার নবাব মুরশিদকুলি খানের সুবাদারী আমলে জীবিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই জমিদার পরিবারের রাজা গৌরনাথের আমলে কবি সাকের মামুদ তাঁর 'মধুমালা মনুহর' কাব্য রচনা করেন।

দুই। আধুনিক যুগ বা ব্রিটিশ আমল। ১৭৬৫—১৯৪৭

॥ ১ ॥

পয়লাতেই বলে রাখা ভালো, আধুনিক বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টির সংগে আমাদের জাতীয় জীবনের এক বড় বেদনাময় স্মৃতি বিজড়িত। আমরা যখন এই সাহিত্য সৃষ্টি করি, তখন এ-দেশ আগামী দুইশত বৎসরের জন্য পরাধীনতা শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়ে গেছে। এই শৃঙ্খল বেদনা যত বেশী ভারি হয়েছে, আধুনিক সাহিত্য তত বেশী গভীর হ'য়েছে। এর প্রথম শতাব্দীর ইতিহাস যেমন বেদনা-কাতর, পরবর্তী শতাব্দীর ইতিহাস তেমনি অশ্রুঘন। ইংরেজ কবির ভাষাতেই বলা যায়—"মিষ্টতম সেই সঙ্গীত যার সঙ্গে গভীরতম বেদনা জড়িত।" হালের বাঙালী কবি তাই সত্যই বলেছেন—

"শিকল পরা ছল মোদের এই
শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরে শিকল তোদের
ক'রবে রে বিকল।"

প্রথম যুগের কবিরা কিন্তু কথাগুলি এ-ভাবে বলতে পারেননি, তাঁরা যা বলেছেন, তাতে মনে হয়, বিদেশী রাজারা তাঁদেরকে উদ্ধার করতে এসেছেন। তাঁরা পতিত ছিলেন, অন্ধকারে ছিলেন ইত্যাদি। নমুনাস্বরূপ পাবনা জিলার হরপ্রসাদ মিত্রের

ছড়া থেকে সামান্য অংশ তুলে দেওয়া যাচ্ছে—

"অপূর্ব্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে
হাতে ছড়ি শিরে দিলা টুপি,
বাঙ্গালার অভিলাষে আইলা সদাগর বেশে
কৈলকাতা পুরাণ কুঠি আদি।"১

ঠিক যেন ছয়শত বৎসর পূর্বে এ-দেশে মুসলিম রাজারাজড়াদের আগমন অবস্থা। সেদিন বিদেশী মুসলিম শাসককে যাঁরা দেবতা জ্ঞানে বরণ করে নিয়েছিল, এবারও তারাই যেন সাতসমদ্দুর তের নদী পারের ইংরেজ জাতিকে বরণ ক'রে নিচ্ছে! কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। দেখতে দেখতে পরাধীনতার বেদনা ঘনীভূত হয়, ফলে, গর্জে উঠে উত্তর বঙ্গের ফকীর-সন্ন্যাসী বিপ্লবীরা। নবাব-বাদশাদের রঙ্গমঞ্চ ততদিনে ধ্বসে পড়েছে, বাংলার জনসাধারণ তাদের ভাগ্য-বিধাতার নির্মম অট্টহাস্য যেন শুনতে পেয়েছে। অতএব, আর নয়, তারা নতুনভাবে নতুন শাসক সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় ঝাপিয়ে পড়েছে। রঙ্গপুরের (ইটাকুমারীর) কবি রতিরামের গানে সমকালীন বিপ্লবী বাংলার একটি ছবি দেখতে পেয়েছি। রতিরাম ইংরেজ-প্রতিভূ গুডল্যাড ও তাঁর সহকারী দেবী সিং হররামের জুলুমের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার এক রসঘন চিত্র এঁকেছেন। এ-থেকে জানা যায়, মন্থনা-পীরগাছার মহিলা জমিদার "জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী"র নেতৃত্বে সেদিন প্রজাকুল কোম্পানী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের ফলে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ চরমভাবে নাজেহাল হয় ও প্রবল ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইতিহাসে অবশ্য এই আন্দোলনকে 'প্রজাবিদ্রোহ' নামে অভিহিত করা হ'য়েছে। এ-আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন নবাব নূরউদ্দীন নামে জনৈক স্থানীয় জন-নেতা। কিন্তু কৌতূহলের ব্যাপার, রতিরামের গানে নূরউদ্দীন কেন, কোন মুসলমান নেতারই নাম নেই। রঙ্গপুরের মন্থনা, কাকিনা, বামনডাঙ্গা, কাজির হাট ইত্যাদি এলাকার তথা সারা উত্তর বাংলায় এ আন্দোলন প্রবল দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। রতিরামের গানে রূপকের ছলে হ'লেও এর অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে; যথা,—

"সব জমিদারক ভাঙ্গিয়া চুরিয়া
দেবী সিং হররাম।
যেমন কঠিন হয়্যা মোটা হয়
উচ্চা হয়্যা করে নাম। ইত্যাদি।২

কবি পঞ্চানন দাসের নামে প্রচারিত 'মজনুর কবিতা' শীর্ষক আরও একটি ছড়ায় সমকালীন মজনু ফকিরের লুটতরাজের যে চিত্র দেওয়া হ'য়েছে, বলতে বাধা নেই, এ-চিত্রও সমকালীন প্রজা-বিদ্রোহের। সত্যি কথা বলতে কি, প্রজা-বিদ্রোহটি ছিল দেশের বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের (ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলন) একটি শাখা মাত্র। এই আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক ছিলেন মজনু শাহ। নবাব নূরউদ্দীন ছিলেন অন্যদের শাখার নেতা। কবি রতিরাম এই বিদ্রোহের চিত্র এঁকেছেন। এই প্রসঙ্গে তাহির মামুদের 'নয় আনার কবি'র কথা উল্লেখযোগ্য। কবি তাহির মামুদ ছিলেন সমকালীন রঙ্গপুর-ঘোড়াঘাট সরকারের অধীন ঘোড়াঘাট জমিদারীর নয় আনা অংশের মালিক সীতারাম রায়ের অনুগৃহীত। রঙ্গপুর প্রদেশের কালেক্টর গুডল্যাড সাহেবের এক অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে কি ভাবে দেশজুড়ে প্রজা-অসন্তোষ ধূমায়িত হ'য়ে গণ-আন্দোলনে রূপায়িত হয় এবং সে আন্দোলনের কাছে গুডল্যাড সাহেবকেও নতি স্বীকার করতে হয়, তারই বিবৃতি রচনা করেছেন তাহির মামুদ তাঁর 'নয় আনার কবি'তে। মোট কথা, আঠারো শতকের বাংলা দেশে, বিশেষ করে উত্তর বঙ্গে, গণ-আন্দোলন, গণবিক্ষোভ, যে একটি দৈনন্দিন কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়, এই সব কাব্য-কবিতা থেকে তা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। কিন্তু আফসোসের বিষয়, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিখ্যাত ফোর্টউইলিয়ম কলেজে (১৮০০ ঈ) যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির বুনিয়াদ গড়ে উঠে তার সংগে এই সব গণ-বিক্ষোভ, গণ-আন্দোলন ইত্যাদির কোন সম্পর্কই নেই। মনে হয় যেন রতিরামের বা তাহির মামুদের বংশ তখন বিলুপ্ত হ'য়েছে এবং হরপ্রসাদ-পঞ্চানন দাসের অনুসারিগণ এ-দেশে প্রভাব বিস্তার করেছে। উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে হরপ্রসাদ মিত্ররই যোগ্য প্রতিনিধি। তাই তাঁর হাতেই আমরা ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের এক অপ্রকৃত ও অনৈতিহাসিক চিত্র পাচ্ছি। বলাবাহুল্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' ও 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসদ্বয়ই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকদের এ-কথা অজানা নেই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইংরেজ ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের হাতে তথাকথিত আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা ও আধুনিকতার জন্ম হয়। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি হন তার সূত্রধর। কিন্তু অনেকেরই এ-কথা জানা নেই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম বৎসরেই রাজশাহী শহরে উত্তর বঙ্গের বিখ্যাত দরবেশ হযরত শাহ মখদুমের যে বাংলা জীবনীগ্রন্থ রচিত

হয় (১৮৩৮) তার সংগে ফোর্ট উইলিয়মের আধুনিক সাধু গদ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত কম। এবং এই গদ্যগ্রন্থ রচিত হয় 'বাংলা গদ্যের জনক' নামে পরিচিত বহু খ্যাত বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনারও (১৮৪৭) নয় বৎসর আগে। তাই আজ এ-কথা বিশেষ জোরের সংগেই বলতে পারা যায় যে, ফোর্ট উইলিয়মের বাংলা গদ্য স্বাভাবিক ধারার ব্যতিক্রমই শুধু নয়—অনেকটা অবাস্তরও। পক্ষান্তরে, শাহ মখদুম জীবনীর গদ্য স্বাভাবিক ধারারই যথার্থ উত্তরাধিকার। তুলনামূলক আলোচনার জন্য সমকালীন বাংলা গদ্য ধারার পাশে শাহ মখদুম জীবনীর গদ্যের সামান্য নমুনা পেশ করা গেল—

ক ॥ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষা :

"অকারাদি অকারান্তারমালা যদ্যপি পঞ্চাশৎ সংখ্যাকা কিম্বা এক পঞ্চাশৎ কিংবা সপ্ত-পঞ্চাশৎ সংখ্যা পরিমিতা হউক তথাপি এতাবন্মাত্র কতিপয় বর্ণাবলী বিন্যাস বিশেষ বশতঃ বৈদিক লৌকিক সংস্কৃত প্রাকৃত পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানাদেশীয় মনুষ্য জাতীয় ভাষা বিশেষ বশতঃ অনেক প্রকার ভাষা বৈচিত্র শাস্ত্রোত লোকতর প্রসিদ্ধ আছে। যেমন কুক্কুর ধ্বনি-তুল্যধ্বনি নিষাদ স্বর। গোরবানুকারি ঋষভ স্বর।"

('প্রবোধচন্দ্রিকা', পৃঃ ১, ১৮৩৩ই)

খ ॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :

"বেতাল কহিল, মহারাজ!
ভারতবর্ষের উত্তর সীমায়, হিমালয় নামে, অতি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। তাহার প্রস্থদেশে, পুষ্পসর নামে, পরম রমণীয় নগর ছিল। গন্ধর্ব্বরাজ জীমূৎকেন্দ্র ঐ নগরে রাজত্ব করিতেন।" ইত্যাদি।

(বেতল পঞ্চবিংশতি, ১৮৪৭)

গ ॥ শাহ মখদুম জীবনীর ভাষা :

(তাহার) কবরের বুকস্থানে ১টি পাথর ঐ পাথরের উপর দৃষ্টি করিলে কত রঙ্গ বেরঙ্গ ফুলবাগ ও ঘরবাড়ী দেখা যায় এবং কবরের পায়ের দিকে কবরের গায়ে একটি ছিদ্র। ঐ ছিদ্রের মধ্যে ১টি কঙ্করকণা বা ছোট ঢিল প্রবেশ করাইয়া দিলে কিছুক্ষণ পরে কোন সুগভীর পানিতে পড়িবার মত 'টুবুক' শব্দ শোনা যায় এবং প্রতি নামাজের সময় অজু করিয়া মসজিদে যাইবার সম্পূর্ণ পদচিহ্ন দেখা যায়। তাঁহার বহু কেরামত দেশ মাশহুর রহিয়াছে। প্রবাদ এই মাজারে বহু ধনরত্ন রহিয়াছে। ইহার জাহিরী কেরামত লিখিতে হইলেই বড় পুস্তক হইয়া পড়িবে"।

(হজরত শাহ মখদুমের জীবনী তোয়ারিক, পৃঃ ১৪ ১২৪৫ = ১৮৩৮ইঃ)

লক্ষণীয় যে, শেষোক্ত উদ্ধৃতিতে বেশ কিছু সংখ্যক আরবী-ফারসী শব্দ আছে, যে

শব্দগুলি ইতিপূর্বেই ফোর্ট উইলিয়মীয় পণ্ডিতদের বিশেষ প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা থেকে বর্জিত হয়েছিল। এই শব্দ বর্জনের পূর্বে বাংলা গদ্যের রূপ কিরূপ ছিল তার সার্থক নমুনা রয়েছে রামরাম বসুর প্রথম রচনা "প্রতাপআদিত্য চরিত্রে" (১৮০১ই)। একটু নমুনা দিই :

> "যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙ্ বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙ্ বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসা হুইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙ্ ছিলেন বৃহৎ গোষ্টি তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ লইয়া বিস্তার২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগাদা কিছু হইয়াছিল না।"

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রতাপাদিত্য চরিতের ভাষাই মুসলমান লেখকদের হাতে "শাহ মখদুম জীবনী" রচনায় উৎসাহিত ক'রেছে এবং সে ভাষা সার্থক সাহিত্যিক -রূপ লাভ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তৎকালীন শহর কলকাতাবাসী পণ্ডিত সমাজের বিরাগভাজন হওয়ায় এই বাংলা প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয়নি। পক্ষান্তরে, বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের প্রাণপণ প্রচেষ্টায় যে ভাষা 'পৃথিবীর ভদ্র সভার উপযোগী' হয়ে উঠেছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষের কল্যাণে সে ভাষার যে দুর্গতি ঘটেছিল, বিদ্যাসাগরের রচনার পার্শ্বে পূর্ববর্তীদের রচনা রাখলেই তা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। সৌভাগ্যক্রমে সে কালে বিদ্যাসাগরের মত কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন একজন ভাষা-শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল তাই সে যাত্রা বাংলা ভাষা আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। বাংলা ভাষার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের এই মহান কীর্তির তুলনা নেই!

ফোর্ট উইলিয়মীর পণ্ডিতকুল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যে খেলা শুরু করেছিলেন, তার চমৎকার বিবরণ দাখিল করেছেন সজনীকান্ত দাস তাঁর আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এই বিশেষ পর্ব তাঁর ভাষায়—"আরবী-পারসী নিস্দন যজ্ঞ" নামে অভিহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর শুরু হয়েছিল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং তার সমাপ্তি ঘটেছিলো ১৮৩৮ সালে। বলাবাহুল্য, এই সময়ের মধ্যে তথাকথিত বাংলা গদ্যের জন্ম দেওয়া হয়েছিল এবং ফারসী ভাষার বদলে ইংরাজি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সজনীকান্ত প্রদত্ত তারিখ থেকে মনে হয়, তিনি হ্যালহেড সাহেব রচিত বাংলা ব্যাকরণ রচনার কাল থেকে এই "আরবী পারসী নিস্দন যজ্ঞে"র সূত্রপাত ধরেছেন। এবং এই ব্যাকরণই সাক্ষ্য দেয় যে, তখনকার দিনে কথ্য ভাষায় যিনি যত বেশী

আরবী-ফারসী শব্দের সংযোজন করতে পারতেন, তাঁকে ততবেশী শুদ্ধভাষী বলে মনেকরা হ'ত। বলাবাহুল্য, এই কথ্যভাষাকে ভিত্তি করেই উক্ত শতকের গোড়ার দিকে বিখ্যাত কবি শাহ গরীবুল্লাহ এক অভিনব কাব্যরীতির জন্ম দিয়েছিলেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি তথাকথিত দোভাষী রীতি বা মুসলমানী বাংলা রীতি নামে পরিচিত পেয়েছে।

অবশ্য ব্রিটিশ রাজত্বে ইংরেজি রাজভাষা হবে বা ইংরেজি ভাবধারার প্রাধান্য ঘটবে, এটি স্বাভাবিক। কিন্তু সেদিন স্বদেশবাসী এক বিশেষ সম্প্রদায় ইংরেজীর পক্ষে এবং আরবী ফারসী তথা মুসলমানী শিক্ষা-সভ্যতার বিরুদ্ধে যে প্রচারণা শুরু শুরু করে দিয়েছিল, তা রীতিমত বিস্ময়কর। ১৮৩১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের একটি স্থানীয় পত্রিকার নিম্নলিখিত বিবৃতিটি থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। পত্রিকাটির নিজের ভাষায়ঃ (ফরাসীর বদলে ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হ'লে)—

> "first and foremost the hautiness of the Javans—will be brought low, which will be of much service to us When the Bengali language is brought into use the Mussalmans will be driven out, for they are not and never will be able to read and write Bengali."৩

এই উক্তির মধ্যেই সমকালীন বাঙালী হিন্দু মানসের পরিচয় অতি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

শুধু বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে নয়, রাজনীতি ক্ষেত্র থেকেও মুসলিম প্রাধান্য খর্ব করাই ছিল তখনকার ইংরাজ কর্তৃপক্ষের মূল লক্ষ্য। বাঙালী হিন্দু তথা পাক ভারতীয় হিন্দু সমাজকে তার শিখণ্ডী হিসেবে খাড়া করা হয়েছিল। অবিশ্যি [illegible]ও তাতে স্বার্থ ছিল। তাঁরা ইরেজ জাতিকে যে কারণে সহজে গ্রহণ করে নিতে পেরেছিলেন, সেই কারণেই ইংরেজি সভ্যতাকে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। মুসলিম বিদ্বেষটা এসেছিল তার অনুসঙ্গী হ'য়ে। প্রায় ছয়শ বছরের মুসলিম শাসনের আওতায় থেকে মুসলিম প্রীতি যতখানি জন্মেছিল, মুসলিম বিদ্বেষ তার চেয়ে কম জন্মেছিল না, মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্য-সাহিত্যে তার পরিচয় বিরল নয়।

মনসামঙ্গলের হাসান-হোসেনের পালা, অন্নদামঙ্গলের জাহাঙ্গীরের অন্নদামুজার উপাখ্যানের মাধ্যমে হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু তাই

নয়, যে চৈতন্যদেবকে মুসলিম ভাবাপন্ন মনে করে হিন্দু-সমাজ ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ করতেও দ্বিধা করেনি, মুসলিম কাযীর প্রতি তাঁর দুর্ব্যবহারের সাক্ষ্য চৈতন্য ভাগবতকারগণও রেখে গেছেন। প্রেমধর্মের অবতার চৈতন্যদেবও এতদূর অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারেন, তা ভেবে একালের মনীষিগণও বিস্ময়বোধ করেছেন ![৪]

সে যাই হোক বাংলা গদ্যের প্রাথমিক যুগে মুসলিম প্রভাবিত বাংলা সাহিত্য-ধারা বর্জিত হওয়ায় পাশ্চাত্য ভাবধারায় সমৃদ্ধ আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলমান সাহিত্যিকরা স্বাভাবিকভাবেই অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তাই বলে স্বভাব শিল্পী মুসলিম সাহিত্যিকরা কি নিশ্চেষ্টভাবে বসেছিলেন? না, তাও নয়। তাঁরা মুসলিম ঐতিহ্য বজায় রেখে শুধু পদ্য নয়— গদ্য-সাহিত্য চর্চাতেও অগ্রসর হ'য়েছিলেন। মুসলিম পদ্য লেখকদেরকে এতদিন তথাকথিত দোভাষী পুথির শায়ের বলে অবহেলা করা হ'লেও অধুনা তাঁরা এক বিশেষ ধারায় সাহিত্য স্রষ্টার ঐতিহাসিক মর্যাদালাভ করেছেন।

সমকালীন মুসলিম গদ্য লেখকদের কোনো রচনা এ-যাবত উদ্ধৃত না হওয়ায় এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। শুধু অনুমান ক'রে বলা হ'য়েছে যে, তাঁরা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে নয়— তাঁরা আরবী পারসীর চালনা করেন; অতএব তাঁরা সাহিত্যিক মর্যাদা পেতে পারেন না। বলা বাহুল্য, পূর্ব বর্ণিত দোভাষী পুথির লেখকদের দিকে লক্ষ্য ক'রেই এই সব মন্তব্য করা হ'য়েছে। সম্প্রতি শাহ-মখদুম জীবনী ও পরবর্তী কালে কহোর সরকার রচিত 'পালাজ্বরের ইতিকথা,' জামাল উদ্দীন রচিত প্রেমরত্ন (১৮৫৩) ইত্যাদি গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ আমাদের এই ধারণা বদলে দিতে সক্ষম হ'য়েছে। মখদুম জীবনী সম্পর্কে আগেই বলেছি, এখানে কহোর সরকারের গল্পটির ভাষা সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। 'পালাজ্বরের ইতিকথা'র ভাষা সমকালীন উত্তর বঙ্গের জন সমাজে ব্যবহৃত কথ্যভাষা। তার সাহিত্যিক মূল্য যাই হোক অন্ততঃ শতবর্ষ পূর্বেকার লিপিবদ্ধ কথ্যভাষার যে রূপটি এতে রক্ষিত হয়েছে, ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে তার মূল্যও নগণ্য নয়। আর তা ছাড়া সেকালের লিখিত লোকগল্পের নমুনা হিসেবেও বলা যায়, আমাদের সাহিত্যে ছোট-গল্পধারায়ও এর একটি বিশেষ মূল্য আছে। বিশেষ করে যখন বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প রচনার সূত্রপাতও হয়নি, এমন কি ছোটগল্পের আদি-রূপকার বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবও হয়নি, এমন সময়ে কহোর সরকার এ গল্পটি রচনা করেছেন বা লিপিবদ্ধ করেছেন সমকালীন বাংলা গদ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সুদূর ক'লকাতার সুধী-মহলে

পরিচয় লাভের সুযোগ-বঞ্চিত উত্তর বঙ্গের কবি-সাহিত্যিকগণ অদ্যাবধি অবহেলিত ও অবজ্ঞাত রয়েছেন। সুখের বিষয়, তাঁদের এই সব কলমী পুথি উত্তর বঙ্গের ঘরে রক্ষিত হওয়ায় তাঁদের কবি-কৃতি সম্পর্কে আজ আমরা জানবার সুযোগ পাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি, বাংলা গদ্যের প্রাচীনতর লেখক হিসেবেই শুধু নয় — আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ছিন্ন সূত্র সংযোজক হিসেবে তাঁদের দান আমাদের কাছে বিশেষ প্রেরণার সামগ্রী হ'য়ে থাকবে।

॥ ২ ॥

বলা হ'য়েছে, ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকেই ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব বাংলা সাহিত্যে বাসা বেঁধেছে। প্রথম প্রথম ছড়া ও কবিতায় এই মনোভাব ব্যক্ত হ'য়েছে, পরে ইংরেজ শাসন যখন ধীরে ধীরে এ-দেশে স্থায়ী হ'য়ে এসেছে, তখনও তাঁরা এই মনোভাব পরিবর্তন করেন নি, তবে কাব্য-সাহিত্যের রূপক-অলংকার ইত্যাদি আবরণে তাকে গোপন করবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। অবশ্য কাব্য-সাহিত্যের সাধারণ ধারা যেমন ছিল তেমনিই চলছে। এবং বলা বাহুল্য, ফোর্টউইলিমে নবতর সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলন অন্যপথে পরিচালনা করার চেষ্টা সত্ত্বেও সে ধারা কোনদিনই বিলুপ্তি হয়নি। এবার সেই স্বাভাবিক কাব্যধারা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

বলা হ'য়েছে, কবি রতিরাম, তাহির মামুদ প্রভৃতি কবির কাব্যে সমকালীন গণ-আন্দোলনের ছবি মিলেছে। এই সব ডামাডোলের বাইরে থেকেও যাঁরা কাব্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন তন্মধ্যে গোলাম রসূল, আমীরুল্লাহ, কবি কুসাই, মুনশী কাদেরুল্লাহ্, ওরফে মুহম্মদ মূসা মিঞার নাম করা যায়। এঁদের সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, তা এই যে — কবি কাদেরুল্লার তাখাল্লুস হ'ল — মূসা মিঞা। জনৈক মূসা মিঞা বা মূসা শাহ সমকালীন ফকির আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। সম্প্রতি কেউ কেউ এই মূসা মিঞাকেই ফকির নেতা মূসা শাহ বলে মনে করতে চেয়েছেন। কিন্তু মূসা মিঞার 'রসনামা' পুথিতে প্রাপ্ত তারিখ থেকে (১৮২১) প্রতীয়মান হয় যে, ইনি ফকির নেতা মূসা শাহ থেকে আলাদা ব্যক্তি। কারণ, ফকির নেতা মূসা শাহের মৃত্যু হয় ১৭৯৩ ঈসায়ীতে অন্যতর ফকীর নেতা পরাগ আলির (ফারাগুল শাহ) সংগে এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে।

মূসা মিঞার এক পুত্র জামালউদ্দীন 'প্রেমরত্ব' (১২৬০ সাল=১৮৫৩) নামক একখানি বিখ্যাত কাব্যের রচয়িতা। যতদূর জানা যায়, জামালউদ্দীন সমকালীন মুসলিম কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, উপরন্তু সমকালীন বাংলাদেশে তাঁর সমকক্ষ কবি দ্বিতীয় কেউ ছিলেন বলে জানা যায় না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, তখনও পাশ্চাত্য ভাবদীপ্ত আধুনিক বাংলা কাব্যধারার উদ্ভব হয়নি। ফোর্ট উইলিয়মীয় পণ্ডিতকুলের প্রচেষ্টায় তখন যে অভিনব বাংলা ভাষার সৃষ্টি হ'য়েছিল, প্রধানতঃ বাংলা গদ্যের বাহন হিসেবেই তা চালু হ'য়েছিল এবং বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের হাতে তা সবেমাত্র সাহিত্যিক গদ্য রচনার উপযুক্ততা অর্জন করেছে; বাংলা কাব্য-সাহিত্যের বাহন হিসেবে তখনও তা স্বীকৃতি পায়নি। ঠিক এমনি সময়ে কবি জামালউদ্দীনের আবির্ভাব রীতিমত বিস্ময়কর ঘটনা।

'প্রেমরত্ব' একখানি রূপক কাব্য। বাহ্যতঃ সুফী দেহতত্ত্বমূলক একখানি কাব্যের নিদর্শন হ'লেও এই কাব্যে সমকালীন মুসলিম বাংলার চিন্তা-কল্পনা, ধ্যান-ধারণার, আশা-নিরাশার কথা অতি সুকৌশলে প্রকাশিত হ'য়েছে।[৫]

প্রথমেই এর ভাষার কথা বলা যায়। প্রেমরত্বের ভাষা শুধুমাত্র বাংলা নয়—কবির ভাষায় এর অর্ধেক 'বাঙ্গালা' (= সংস্কৃত প্রধান বাংলা) এবং বাকী অর্ধেক 'জবানে মোছলমানী' মানে, আরবী-ফারসী প্রধান সমকালীন চলিত বাংলা। স্পষ্টই বোঝা যায়, সমকালীন ফোর্ট উইলিয়মীয় তথাকথিত আরবী-ফারসী বর্জিত খাঁটি বাংলার প্রতিবাদে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কাহিনীর নায়ক-নায়িকা প্রথম জীবনে অমুসলমান ছিলেন, পরে হিন্দুস্থান থেকে আগত এক বিখ্যাত যাবন যোগীর (=মুসলিম দরবীশ) নিকট যবন ধর্মের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাতে দীক্ষিত হয় অর্থাৎ মুসলমান হয়। কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, কবির কাব্য শুরু হ'য়েছিল 'বাঙ্গালা' ভাষায়, তখন তাঁর নায়ক-নায়িকা ছিল অমুসলমান; কিন্তু যেই মাত্র তাঁর নায়ক-নায়িকা মুসলমান হ'ল, কবির ভাষাও পরিবর্তিত হ'ল—'বাঙ্গালা' থেকে 'জবানে মোছলমানী'তে। এর অর্থ বুঝতে মোটেই কষ্ট হওয়ার কথা নয়। মুসলমান লেখকগণ তথাকথিত খাঁটি বাংলা ভাষাকে তাঁদের জাতীয় সাহিত্যের বাহক করতে আদৌ রাজী ছিলেন না। ইতিপূর্বে কবি মালে মুহম্মদ প্রভৃতি কবিগণও এ-কথা সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু জামালউদ্দীনের উক্তির সংগে মালে মুহম্মদের উক্তির পার্থক্য হ'ল—জামাল উদ্দীন তাঁর কাব্যে উভয় ভাষার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করেই দেখিয়ে দিবার চেষ্টা করেছেন যে, আরবী-ফারসী বর্জিত তথাকথিত

খাটি বাংলায় বাঙালী হিন্দুর প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে বটে, তবে বাঙালী মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাত, তাঁর ধ্যান ধারণা চিন্তা-কল্পনার বাহন হওয়ার যোগ্যতা ঐ তথাকথিত বাংলা ভাষার নেই। শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইস্‌লাম ধর্মের যে শ্রেষ্ঠত্ব আছে এবং কার্যকারিতার দিক দিয়েও ইস্‌লাম সর্বসংস্কার-মুক্ত এক বিশ্বজনীন ধর্ম, প্রেমরত্নের ভাষায় ইস্‌লাম ধর্মের এই সর্বজনীন রূপটিও সুপরিস্ফুট হ'য়েছে। কবি জামাল উদ্দীন স্পষ্ট বলেছেন :

"যবন পবিত্রকুল বিধি বেদে বলে।
অকুলে পাইছে কুল যবনের কুলে॥
ফুলের উত্তম যেন গোলাবের ফুল।
কুলের উত্তম তেন মুসলমানী কুল॥
সকলের শাস্ত্র হইতে যবনের শাস্ত্র ভালো।
অন্ধ নিশি মধ্যে যেন পূর্ণ চন্দ্র আলো॥"

শুধু জামালউদ্দীনই নন — সমকালীন আর একজন উত্তর বঙ্গীয় কবি ইস্‌লামের এই সর্বজনীন মানবতা ও উদারতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন :

"মোছলমান কুল গোলাবের ফুল
বিধবা একুলে আইস।
আহারে ব্যাভারে কত মজা ধরে
বুঝিতে পারিবে শেষও॥"

সমকালীন হিন্দু-সমাজের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা, বিশেষ করে বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রাণপণ প্রয়াস লক্ষ্য করে কবি এ-কথা বলেছেন। কবি তাঁর 'হেন্দুগণ জাতি দর্পণ' নামক একখানি ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থে হিন্দুদের সমাজ সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বিধবা বিবাহের প্রবক্তা বিদ্যাসাগর ও তাঁর অন্যতম সহকর্মী বাবু দ্বারকানাথের (বিদ্যাভূষণের) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।৬ অবশ্য এই প্রশংসা শেষে কবি এরূপ কটাক্ষ করতেও ভুলেন নি যে, হিন্দু-সমাজের এই সংস্কার প্রচেষ্টার চেয়ে বরং ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া ভালো। ইস্‌লাম ধর্মের মত এমন উদার মানবিক ধর্ম আর পৃথিবীতে নেই। বুরহানুল্লাহ্‌র অন্যতর কাব্য 'আহকামোল এছলাম'—এ তরীকায়ে মহম্মদী আন্দোলনের অগ্রদূত সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর প্রশস্তি স্থান পেয়েছে। এ-থেকে সমকালীন উত্তর বঙ্গে সে আন্দোলনের প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে যশোরের বিখ্যাত মনীষী মেহেরউল্লাহ্ সাহেব রচিত 'হিন্দু ধর্ম রহস্য' ও 'বিধবা গঞ্জনা" কাব্যদ্বয়ের

বিষয়বস্তুর সংগে বুরহানুল্লাহ্‌র "হেন্দুগণ জাতি দর্পণে"র বিষয়বস্তুরও আশ্চর্য মিল আছে। তবে কি মুনশী সাহেব বুরহানুল্লাহ্‌র এই কাব্য-কাহিনীর বিষয়ে অবগত ছিলেন? মেহেরুল্লাহ পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে পাবনার ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০—১৯৩১), ফজলুল্‌ করীম সাহিত্য বিশারদ (১৮৮২—১৯৩৬), মেহের উল্লাহ সানী (সিরাজগঞ্জী) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ মুনসী সাহেবের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে এঁরা কাব্য-জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। জানা যায়, সিরাজীর প্রথম ও বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অনল প্রবাহ' (১৯০০) এবং ফজলুল করিমের 'পরিত্রাণ' কাব্য (১৯০৩) সর্বপ্রথমে মুনসী সাহেবেরই অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত হয়। সিরাজী ও ফজলুল করিম গদ্য ও পদ্যে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশেষ করে সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' যে অগ্নিযুগের সৃষ্টি করে তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা নজরুল ইস্‌লাম, আশ্‌রাফ আলীর মত ('কঙ্কাল' ও 'শেকোয়ার' কবি) বিপ্লবী কবির সাক্ষাৎ লাভ করি। ফজলুল করিমের নীতিমূলক রচনাবলী যথা,—পথ ও পাথেয়, চিন্তার চাষ, রাজর্ষি ইব্রাহীম, লায়লী মজনু ইত্যাদি গ্রন্থ আমাদের সমাজ-জীবনের অনেক ক্লেদ ও গ্লানি দূরীকরণে সাহায্য করেছে। মুনশী মেহেরুল্লাহর (২য়) রচনাও এ-এলাকার মানুষের মনের অনেক আশার সঞ্চার করেছে। এঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার এখানে স্থানাভাব।

কি গদ্যে কি পদ্যে উত্তর বঙ্গের মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের এই ধারা বরাবরই অক্ষুন্ন রয়েছে।

॥ ৩ ॥ বাংলা গদ্যের মুসলমান লেখকগণ

বাংলা গদ্যের প্রথম মুসলিম লেখক হিসেবে পশ্চিম বঙ্গের (বর্ধমান জিলার) খোন্দকার শামসুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেবের নাম সুপরিচিত। গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত 'উচিত শ্রবণ' গ্রন্থের লেখক হিসেবে তাঁর এই পরিচিতি। কিন্তু শামসুদ্দীন সিদ্দিকীর এই গদ্য রচনা সাহিত্যিক প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূল নয়। আর তা ছাড়া রচনাকাল হিসেবেও এটি বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও অনেক পরবর্তী (১৮৬০) হওয়ায় বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাসেও এর বিশেষ মূল্য আছে বলে বলা যায় না। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার এইযে, সিদ্দিকী সাহেব প্রাচীন কাব্যরীতিতেও একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বাংলা গদ্যে আধুনিক রীতি গ্রহণ করলেও তা আদৌ সাহিত্যিক গদ্য নয়, তাই প্রথম মুসলিম গদ্য-সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি স্বীকৃতি পেতে পারেন না। পক্ষান্তরে তাঁর 'উচিত শ্রবণে'র আট বৎসর পরে প্রকাশিত 'রত্নবতী'কে

(১৮৬৯) আধুনিক মুসলিম গদ্য সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ ব'লে স্বীকৃতি দেওয়া হ'য়েছে। 'রত্নবতী' বিখ্যাত মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯০৯) রচিত সর্বপ্রথম গদ্যগ্রন্থ। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে পূর্বকথিত কহোর সরকার রচিত 'পালাজ্বরের ইতিকথা'ও 'রত্নবতী'র সাত বৎসর পূর্বে রচিত ; শাহ মখদুম জীবনীর কথা আগেই বলা হ'য়েছে।

হেদাএতুল্লাহ ও মোফিদুল হোজ্জাজ

উত্তর বঙ্গীয় লেখকদের পক্ষে আরও একটি গৌরবের বিষয় এই যে, মীর সাহেবের সমকালেই দিনাজপুর জেলার যোগীবাড়ী গ্রামনিবাসী আছী হেদাএতুল্লা (জন্ম ১২৪০ সাঃ =১৮৩৩— ?) বিদ্যাসাগরের ভাষার অনুসরণে ভ্রমণ-কাহিনী বিষয়ক কিছু মৌলিক গদ্য রচনা করেছিলেন। যতদূর জানা যায়, আধুনিক বাংলা গদ্যে ভ্রমণ-কাহিনী রচয়িতাদের মধ্যে হেদাএতুল্লাহ্ই প্রাচীনতম মুসলমান লেখক হবেন। অবশ্য এই রচনা তাঁর পদ্যে রচিত 'মোফিদল হোজ্জাজ' গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। গদ্যে রচিত অংশে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দুটি বিশেষ ঘটনার বিবৃতি লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। সুধী সমাজের অবগতির জন্য তার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দেওয়া যাচ্ছে —

> "মহাশয়, অদ্য তমস্বিনী জোগে দুষ্টের কর হইতে নিস্কৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা কি প্রকার অবধান করুন। আমরা উষ্ট্রের পশ্চাত ২ আগমনে ঘোরতর নিদ্রা আকর্সনপূর্ব্বক পথিমধ্যে সরনে পথশ্রমে বালিভূমি সজ্য পুষ্প সজ্যার ন্যায় অতি নিবৃতান্তকরণে নিদ্রিত ছিলাম। ক্ষণকাল পরে দুষ্ট বদ্দুগণ আসিয়া বলে আসেখ গুমগুম অর্থাৎ উঠ ২। সুখের নিদ্রাভঙ্গে দেখি সংসর্গে পথিক জনেক বই নাই। বদ্দুরা শিলা হস্তে ধারণ করিয়া বলে ফুলুহ ২, অর্থাৎ পয়সা দাও ২। হায় কি দুঃখের বিষয়, আমরা একেত দুখি, রিক্ত হস্ত পয়সা সম্পর্কে বিমুখ তাহাতে দুষ্টেরা দুষ্টামি আরম্ভ করিল, তখন আমি বলিলাম, আসেখ আনা মিছকিন, ফুলুস মা ফিস ও আল্লা ওহে ছাহেব আমি মিছকিন, পয়সা নাই আল্লা জানে। তশন বদ্দু বলে বাঙ্গালি হারামি কেজাব বাঙ্গালি বদমাইস মিথ্যুক এই বলিয়া চাহে কি পাথর নিক্ষেপে সমাননাঘাত করে।" ইত্যাদি

একখানি আরবী-ফারসী সমৃদ্ধ বাংলা কাব্যগ্রন্থে এই ধরণের সংস্কৃত-প্রধান গদ্যরচনা কৌতুককর। হেদাএতুল্লাহ্র পর উত্তর বঙ্গের মুসলিম গদ্য লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হ'লেন যথাক্রমে রাজশাহীর মহাদেবপুর নিবাসী ও বিখ্যাত 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' রচয়িতা মির্জা ইউসুফ আলী, (১৮৫২—১৯২০) 'আনোয়ারা' লেখক নজিবর রহমান (১৮৫২—১৯২৫), 'রায়নন্দিনী' লেখক ইসমাঈল হোসেন শিরাজী (১৮৮০—১৯৩১), সমগ্র কুরআন শরীফের বাংলা অনুবাদক খান বাহাদুর তসলীম

উদ্দীন আহমদ (১৮৫২—১৯২৭), মোহাম্মদীয় ধর্ম সোনাম রচয়িতা সমীর উদ্দীন আহমদ বখ্তীয়ারী, 'মোহসেন চরিত' লেখক হামেদ আলী, চিন্তাশীল প্রবন্ধ লেখক তরীকুল্লাহ (১৮৮৯—১৯৩২) প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে সমকালে দু-জন মুসলিম গদ্য লেখিকারও নাম ও পরিচয় মেলে তাঁরা হ'লেন যথাক্রমে 'অবরোধ বাসিনী' রচয়িতা বেগম রোকেয়া (১৮৮০—১৯৩২) ও 'সতীর পতিভক্তি' রচয়িতা বেগম খয়রুন্নিসা।

মির্জা ইউসুফ আলী (১৮৫৮—১৯২০ ইং)

এদের মধ্যে মির্জা ইউসুফ আলীর সাহিত্যিক খ্যাতি অপেক্ষাকৃত কম হ'লেও উত্তর বঙ্গের তথা বাঙালী মুসলিম জাগরণের ইতিহাসে যশোরের মুনশী মেহেরউল্লাহর পরেই মির্জা ইউসুফ আলীর নাম উল্লেখযোগ্য। মুনশী মেহেরউল্লাহ্ প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কারক; সাহিত্য-চর্চা করলেও তাঁর সাহিত্যে বাগ্মীতারই জয় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। মির্জা ইউসুফ আলী সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে মুনশী সাহেবের উত্তর-সুরী ছিলেন। শুধু মির্জা সাহেব কেন, আগে যাঁদের নাম করা হ'ল তাঁরাও প্রধানতঃ মুনশী সাহেবেরই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। কেউবা প্রত্যক্ষে কেউবা পরোক্ষে মুনশী সাহেবের ধর্মীয় ও জাতীয় জাগরণ-মূলক ওয়াজের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়েছিলেন। তবে মুনশী সাহেবের বানীকে সাহিত্যের মাধ্যমে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হ'য়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মির্জা সাহেবই সকলের অগ্রনী এবং নেতৃস্থানীয়। বিশেষ করে তাঁর ১২০৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত বিখ্যাত 'সৌভাগ্য স্পর্শমণির' বঙ্গানুবাদ যেদিন প্রকাশিত হ'ল — মুসলিম বাংলা সাহিত্যের সেদিন এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'ল।

একদিকে মুনশী মেহেরউল্লাহ্র জাগরনীমূলক ওয়াজ-নসীহত অন্যদিকে সৌভাগ্য স্পর্শমণির আদর্শে বাঙ্লার মুসলিম সমাজে এক নবজাগরণের সাড়া পড়ে।

শুধু সৌভাগ্যে অনুবাদক হিসেবে নয় — মৌলিক গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর দান নগণ্য নয়। 'দুগ্ধ সরোবর' নামে মৌলিক উপন্যাসের আকারে লিখিত একখানি বাংলা নিবন্ধও তিনি রচনা করেন (১৮৯০)। এ-খানি আসলে ছিল তাঁর সমাজ-সংস্কারের মহাপরিকল্পনা (Master Plan)। ইতিপূর্বেই রাজশাহীতে "নূরুল ঈমান সমাজ" নামে একটি সংস্থা প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টায় সংগঠিত হয় (১৮৮৪); এই সমাজের ভবিষ্যত কর্মসূচীই তিনি দুগ্ধ সরোবরে পেশ করেন। যতদূর মনে হয়, মুসলিম জাগরণের প্রাথমিক যুগের আরবীয় 'ইখওয়ানস্ সাফা' বা সাফা ভ্রাতৃসঙ্ঘের অনুকরণে এই সংস্থা গঠিত হয়। হযরত ইমাম আল্গাজ্জালীর বিখ্যাত "কিমিয়া-ই-সা'দত" গ্রন্থের অনুবাদের মূলেও ছিল এই সমাজের প্রেরণা। ১৮৮৪ ঈসায়ীতেই

এর অনুবাদ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৯১৭ ঈসায়ীতে অর্থাৎ সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরের কঠিন সাধনার ফলশ্রুতি ১৯০৮ পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থ। মূল ফারসী গ্রন্থেরই মত সমকালীন বাংলার ঘরে ঘরে 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'—স্পর্শমণিরই মত সৌভাগ্য বিলাতে সক্ষম হ'য়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সৌভাগ্য যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি।৮

মির্জা সাহেবের সহযোগী ও অনুসারীদের মধ্যে যাঁরা ভবিষ্যতে খ্যাতিমান হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), তসলীম উদ্দীন আহমদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), ফজলুল করীম সাহিত্য বিশারদ (১৮৮২-১৯৩৬), মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, (১৮৬৯-১৯৬৮) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে মাওলানা আকরাম খাঁ, ইসলামাবাদী ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ব্যতীত আর সকলেই উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। এই সুধীমণ্ডলীর মিলন কেন্দ্র প্রধানতঃ কলকাতা শহরে থাকলেও রংপুর-রাজশাহীতেও তাঁদের আস্তানা ছিল। কলকাতা থেকে এঁদের প্রচেষ্টায় 'সোলতান' (১৯০৪) পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'সোলতান' সুদীর্ঘ সাত বৎসর ধরে চালু ছিল। সোলতানের অবলুপ্তি ঘটলেও তার ধারার অপমৃত্যু ঘটেনি—অচিরেই সোলতানের স্থানে মাওলানা আকরাম খাঁয়ের পরিচালনায় সাপ্তাহিক মোহাম্মদী প্রকাশিত হয়েছে (১৯১১)। অদ্যাবধি মোহাম্মদী তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে (মাসিকরূপে)। উল্লেখ্য যে, মির্জাসাহেবের মৃত্যুর আট বৎসর পরে তাঁরই স্মৃতি-রক্ষা কল্পে রাজশাহী শহর থেকে সাপ্তাহিক 'পল্লী বান্ধব' প্রকাশিত হয় (১৯২৮)। সম্পাদক হন মির্জা সাহেরে পুত্র মির্জা মুহম্মদ ইয়াকুব।৯ সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত এই পত্রিকা স্থায়ী হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মির্জা ইউসুফ আলী সাহেব রাজশাহীতে জনশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে 'শিক্ষা সমবায়' নামে পত্রিকাও প্রকাশিত করেন (১৯১৯)। এর এক বৎসর পরে তাঁর ইন্তিকাল হয় (১৯২০ সালের ৩০শে মে)। সিরাজী ও ফজলুল করীমের কথা প্রসঙ্গক্রমে আগেই বলা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার এখানে স্থানাভাব।

॥ নাজিবর রহমান ॥

কথাশিল্পী নাজিবর রহমান এঁদের অনেকেরই বয়োজ্যেষ্ঠ হ'লেও সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে তিনি কনিষ্ঠ ছিলেন। প্রধানতঃ 'আনোয়ারা' উপন্যাস (১৯১৪) রচয়িতা হিসেবে ইনি সুপরিচিত। বলতে কি আনোয়ারার মত বহুল প্রচারিত ও প্রশংসিত

উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই বিরল। শিল্পগুণে অধিকতর নিম্নমানের হলেও সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লী সমাজ' ইত্যাদি উপন্যাসের পাশে সহজেই এর স্থান দেওয়া যেতে পারে। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে সমকালীন বাঙালী হিন্দু সমাজের যে নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করেছেন, আনোয়ারাতে তার অন্যপিঠ অর্থাৎ মুসলিম সমাজের চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য রচনা হ'ল—প্রেমের সমাধি (১৬ শ সং, ১৩৬৯) গরীবের মেয়ে (১৯২৩); দুনিয়া আর চাই না (১৯২৩); চাঁদতারা বা হাসান গঙ্গা বাহমনী; পরিণাম (২য় সং ১৩৫৫) মেহেরুন্নিসা (১৯২৩)। সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯০৪) নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ সংকলনও আছে।

॥ তসলীম উদ্দীন আহমদ ও তরীকুল আলম ॥

অধুনা বিশেষ অপরিচিত হ'লেও সমকালীন মুসলিম বাঙ্‌লার এঁরা দু-জন জাগ্রত হৃদয় সাহিত্যসাধক ছিলেন। তস্‌লীম উদ্দীনের প্রধান কীর্তি হল বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় সমগ্র কুরআন শরীফের অনুবাদ। যতদূর জানা যায়, ব্রাহ্ম-সমাজের ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের পরে (১৮৮১-১৮৮৬) ইনিই সার্থকভাবে সমগ্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেন। অবশ্য মুসলিম সমাজের মধ্যে তিনিই প্রথম কুরআনের অনুবাদক নন—তাঁর বহু আগে, এমন কি গিরিশচন্দ্রেরও আগে রংপুরের মটুকপুর নিবাসী আমীরউদ্দীন বসুনিয়া কুরআনের অনুবাদ শুরু করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর অনুবাদের কোন কপি আমাদের হাতে পৌঁছেনি, তবে 'বাসনা' পত্রিকার সম্পাদক ফজলুল করীম সাহিত্য-বিশারদ সাহেব তাঁর রচনার অংশবিশেষ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে 'বাসনা' পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন করেন। এই অনুবাদাংশ ছিল ১৬৮ পৃষ্ঠার। অবশ্যি বসুনিয়া সাহেব কুরআনের কতটুকু অনুবাদ করেছিলেন জানা যায় না। তবে তসলীম উদ্দীন সমগ্র কুরআন অনুবাদের গৌরব অর্জন করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি হ'ল—সম্রাট পয়গম্বর, প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় কথা ও সাহাবিয়া।

'সম্রাট পয়গম্বরে' তিনি বিশ্বনবী মুহম্মদের বিস্তারিত জীবনী, 'প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় কথায়' তাঁর অমৃতময় বাণী ও 'সাহাবিয়া' গ্রন্থে তাঁর প্রিয় সহধর্মিণীদের পুণ্য জীবন-কথা আলোচনা করেছেন।

তরীকুল আলম ছিলেন তাঁর পুত্র। ইনি বিশেষ চিন্তাশীল এবং প্রতিশ্রুতিশীল প্রবন্ধকার ছিলেন। সমকালীন বিখ্যাত 'সবুজ পত্রে' তাঁর কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে, তাঁর মত একজন প্রতিশ্রুতিশীল

লেখকের অকাল বিয়োগ হওয়ায় তাঁর দান থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর প্রতিভা বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাদৃশ্য ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেছেন।

বগুড়া জিলার নরহট্ট গ্রাম নিবাসী হামেদ আলীও একজন শক্তিশালী গদ্য লেখক ছিলেন। 'মোহসেন চরিত' নামে একখানি সুলিখিত জীবন-চরিত গ্রন্থ সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হয়েছে। গ্রন্থখানি দানবীর হাজী মুহম্মদ মুহসিনের জীবন-চরিত সংক্রান্ত। রচনায় শক্তির পরিচয় আছে, তার ভাষা সমকালীন সাধু গদ্য এবং লেখকের রচনা-রীতিও সাবলীল ও মনোহারী। উক্ত গ্রন্থের কভার পৃষ্ঠা থেকে জানা যায়—লেখক "মোসলেম কর্ম্মবীর চরিতমালা" নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। কেবলমাত্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। তাতে—"হজরত ওমর (রাজি), স্যার সৈয়দ আহমদ, হাজী মোহাম্মদ মোহসেন, আব্দুর রহমান, বাবর, বখতিয়ার খিলিজী, শেখ সাদী, আবুল ফজল, খাঁ বাহাদুর খোদা বক্স, হারুণ অর রসিদ, মামুন, আকবর, সালাদিন, ইমামদ্দিন জঙ্গী, মুসা ও তারিখ" —এই ক'জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হয়েছে। বইখানি যে সুধী সমাজের আদৃত হয়েছিল, তার প্রমাণ মাত্র দুই বৎরর পর তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৭ = ১৯১০ ঈসায়ীতে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে = ১৯০৮। কলকাতা সেণ্ট্রাল টেক্সটবুক কমিটি থেকে বইখানি অনুমোদিতও হয়েছিল।

এতদ্ব্যতীত হামেদ আলীর একটি প্রধান কীর্তি ছিল এই যে, তিনিই সর্বপ্রথমে উত্তর বঙ্গে সাহিত্য-সাধনার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেন। তার একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ সমকালীন রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হয় ও পরে পরিষৎ পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়। বলতে কী, অদ্যাবধিই উত্তর বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করতে গেলেই হামেদ আলীর প্রবন্ধটিকেই প্রধান সূত্র হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দু'জন মহিলা সাহিত্যিকের মধ্যে বেগম রোকেয়া সুপরিচিত। বাংলা গদ্য ও পদ্যে ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। রংপুর জিলার পায়রাবন্দ নামক গ্রামের বিখ্যাত জমীদার সাবের পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। দ্বিতীয় জন পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার বাসিন্দা ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, রঙ্গপুরের সাবের পরিবারের কাহিনী নিয়ে বিশ শতকের গোড়ার দিকে আফতার উদ্দীন আহমদ পদ্যে পায়রাবন্দ

কাহিনী রচনা করেছেন।

পরবর্তী কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন—'আরব জাতির ইতিহাস' লেখক ক্বযী শেখ রেয়াজ উদ্দীন; 'বাইরের ডাক', 'পীরখাঞ্জা' ইত্যাদির গ্রন্থকার মুহম্মদ খেরাজ আলী প্রভৃতি রঙ্গপুরের; তেরা নম্বরে পাঁচ বছর (১৩৭৪) অন্যদিন অন্য জীবন (১৩৭৫), ইতিহাসের শহীদ (২য় সং ১৩৬১), 'আমি যেদিন দারোগা ছিলাম' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক সাদত আলী আখন্দ (১৮৯৯-১৯৭০); 'সমন্বয়ের শাঁখ,' 'তস্‌বীরাতে পাকিস্থান' (১৯৫৫) ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক রোস্তম আলী কবি কর্ণপুর (১৯০২ —) প্রভৃতি বগুড়ার; 'খালেদার সমর স্মৃতি', ,Perso Arabic element in Bengali language", "হজরতের জীবন নীতি' (১৯৬৫) ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক ডক্টর গোলাম মকস্দ হিলালী (১৯০০-১৯৬১); 'ভাগ্যচক্র', 'রাবণ বধ' 'রাখী ভাই' ইত্যাদির নাট্যকার নফর উদ্দীন আহমদ; 'মস্তানা'র কবি আজিজর রহমান; 'জমজমের' কবি ফজর আলী (১৯৩০) প্রভৃতি রাজশাহীর, 'পারস্য-প্রতিভা,' 'মানব ধর্ম' 'কারবালা' ইত্যাদির প্রখ্যাত সাহিত্যিক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (জন্ম-১৮৯৮); 'হারামণি' সংগ্রাহক অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন (১৯০৪—) ও 'ময়নামতীর চরে'র কবি বন্দে আলী মিঞা (জন্ম ২৯০৭—) পাবনার অধিবাসী।

উল্লেখ্য যে এঁদের মধ্যে ক্বাযী শেখ রেয়াজ উদ্দীন বাঙ্‌লার একজন শ্রেষ্ঠ লাঠিয়াল সর্দার এবং ডক্টর গোলাম মকস্দ হিলালী দুর্লভ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। সাহিত্যিক হিসেবে সবচেয়ে খ্যাতিমান হলেন মুহম্মদ বরকতুল্লাহ। বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী গদ্যশিল্পী ও প্রবন্ধকার বলেই তাঁর খ্যাতি অধিক। বিশেষ করে তাঁর 'পারস্য প্রতিভা' (ষষ্ঠ সং ১৯৬৫); 'মানুষের ধর্ম' (১ম সং ১৯৩৭) 'কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত' (১ম সং ১৯৫৭) তাঁকে অমর করে রাখবে। তার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ হ'ল—'নবী গৃহ সংবাদ' (১৯৬০), 'নয়া জাতিস্রষ্টা হযরত মুহম্মদ' (১৯৬৩), 'হযরত ওসমান,' ১ম ও ২য় খণ্ড, (১৯৬৯)। রাজশাহী জিলার ঘোড়াশালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন (১৮৯৮)। কবি হিসেবে বন্দে আলী মিঞা সুপরিচিত। বিশেষ করে পল্লী জীবনের একজন দরদী চিত্রকর কবি হিসেবেই তিনি খ্যাতিমান। পল্লী-দরদী কবি হিসেবে কবি জসীম উদ্দীনের পরেই তাঁর স্থান। শুধু তাই নয়—গল্প, উপন্যাস, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি ছোটবড় প্রায় অর্ধশত বই রচনা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে পরিচিত কাব্য 'ময়নামতীর চর' সেকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী লাভ করেছিল

(১৯৩২)। তাঁর গল্প উপন্যাসের মধ্যে 'অরণ্য গোধূলি' (১৩৫৬), 'নারী রহস্যময়ী' (২য় সং) 'মনের ময়ূর (১৯৫৬); 'শেষ লগ্ন', 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'; 'ঘূর্ণি হাওয়া' উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি তাঁর জীবন স্মৃতি-মূলক গ্রন্থ 'জীবনের দিনগুলি' (১৩৭৩) সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্বোক্ত কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে শক্তিমান হলেও যাঁরা খ্যাতিহীন এবং অবজ্ঞাত আছেন তাঁদের মধ্যে রংপুরের মৌলবী খেরাজ আলী ও রাজশাহী শহরের মীর আজিজর রহমানের (মাস্তানা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। বললে অতিশয়োক্তি মনে হবে যে আমাদের গদ্য সাহিত্যের একজন শক্তিশালী প্রবন্ধকার হিসেবে খেরাজ মিঞার নাম প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হ'তে পারে। তাঁর 'বাইরের ডাক' (১৯৩৮) ও 'পীরখাঞ্জা' বাংলা সাহিত্যের দুর্লভ সৃষ্টি। কবি আজিজর রহমানের 'মাস্তানা' কাব্যও তাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে 'মাস্তানা' প্রথম প্রকাশিত হয় (১৯৪১)। ফরাসী কবি ওমর খয়্যামের রুবাঈ কবিতার আদর্শে এই কাব্য রচিত। আজিজর রহমান হযরত মঈন উদ্দীন চিশ্‌তীর 'দিউয়ান' কাব্যগ্রন্থের একখানি বাংলা অনুবাদও প্রকাশ করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাজশাহীর কবি তালিম হোসেনের পিতা তৈয়ব উদ্দীনও একজন শক্তিশালী কবি ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম 'নকশা' (১৯৫২)।

॥ ৪ ॥

বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার (১৮৭০—১৯৫৮), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬২—১৯৩০), কান্তকবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫—১৯০৮), নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয় (১৮৯৬—১৯৩৫), তুলসী দাস লাহিড়ী; সবুজ পত্রের বিখ্যাত সম্পাদক ও গদ্যশিল্পী প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮—১৯৪৬); সমালোচক ও কথাসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতিও জন্মগতভাবে উত্তর বঙ্গের লোক ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্যার যদুনাথ রাজশাহীর সিঙ্গড়া থানার বাসিন্দা ছিলেন। রাজশাহী শহরেও তাঁর একটি পৈত্রিক নিবাস আছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রের আবাসভূমিও অদ্যাবধি রাজশাহী শহরের পাঠান পাড়ায় অবস্থিত রয়েছে। অক্ষয় মৈত্রেয় প্রধানতঃ ঐতিহাসিক। বাংলার ইতিহাসে নবাব সিরাজদ্দৌলা, মীর কাশিম প্রভৃতির চরিত্রে স্বেচ্ছাকৃত কলঙ্ক আরোপ করে ব্রিটিশ এবং ব্রিটিশ ভক্ত ঐতিহাসিকগণ যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছিলেন; মিঃ মৈত্রেয় সে কলঙ্ক ভঞ্জন করে যথাক্রমে 'সিরাজদ্দৌলা' (১৩০৪ = ১৮৯৭); 'মীর কাসিম' (১৩১২ = ১৯০৫) ও 'ফিরিঙ্গি বণিক' (১৯২২) নামে তিনখানি অমূল্য গ্রন্থ

রচনা করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একখানি ত্রৈমাসিক গবেষণা-পত্রের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও বরেন্দ্র মিউজিয়ামেরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ মিউজিয়াম সংলগ্ন প্রধান শড়কটি তাঁর নামে নামকরণ করা 'হয়েছে। বরেন্দ্র মিউজিয়ামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নাটোরের বিখ্যাত রাজবংশের উত্তরাধিকারী মহারাজ জগদিন্দ্রনাথও একজন কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর রচিত 'নূরজাহান' (১৯১৭) ও 'শ্রুতি ও স্মৃতি' বাংলার ইতিহাস বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে আদৃত হ'য়েছিল বলে জানা যায়। 'সন্ধ্যাতারা' (১৯১৬) নামে একখানি কাব্যগ্রন্থও তিনি প্রকাশিত করেন।

কবি রজনীকান্ত সেন সাধারণতঃ 'কান্তকবি' নামে পরিচিত। তাঁর 'বাণী' (১৯০২), 'কল্যাণী' (১৯০৫), 'অমৃত' (১৯১০), 'অভয়া' (১৯১০), 'আনন্দময়ী' (১৯১০) ও 'বিশ্রাম' (১৯১০) কাব্যগ্রন্থগুলি তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হ'য়েছিল। পরে 'সদ্ভাব কুসুম' (১৯১৩) ও 'শেষদান' (১৯২৭) প্রকাশিত হয়।

কবিতা হিসেবে রজনীকান্তের রচনার দাম২০ আছে বলে অনেকে স্বীকার করতে না চাইলেও 'গান' হিসেবে তার বিশেষ মূল্য অনস্বীকার্য। তাঁর গান সমকালীন স্বদেশী আন্দোলনে সুর যুগিয়েছিল ; বিশেষ করে তাঁর 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই' অথবা 'আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ গর্ব করিতে চুর' ইত্যাদি গান তাঁকে জন্ম-পল্লীর বাইরেও বৃহত্তর সুধী-মহলে পরিচিত করতে সমর্থ হ'য়েছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁর রচিত হাসির গানও করুণ-চিত্ত বাঙালী হৃদয়ে হাস্য-রসের যোগান দিতে সক্ষম হ'য়েছিল। বলাবাহুল্য, তাঁর হাস্য-রসাত্মক গানের গুরু ছিলেন হাস্যরসিক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর ভক্তি রসাশ্রিত গানের একজন অন্তরঙ্গ অনুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁর একটি গানের জবাবে লিখেছিলেন,

"সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, স্নায়ু,-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোন মতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। ....

আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন, তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা, আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই ত তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত ত তাহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য

সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন, আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা সঙ্গীত তাহাই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।"১১

বলাবাহুল্য, গানটির প্রথম কলি ছিল—"আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ" ইত্যাদি। ১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র মঙ্গলবার মাত্র পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি মহাপ্রয়াণ করেন (=১৯০৮)।১২

রাজশাহী শহরের সাহেব বাজারের মস্‌জিদের পিছনে তাঁর বাসভবনটি অদ্যাপি বিদ্যমান রয়েছে। বলাবাহুল্য, তাঁর জন্মস্থান ছিল পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে।

রবীন্দ্র মৈত্র (১৮৯৬—১৯৩৫) ও তুলসী লাহিড়ী আধুনিক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের দু'টি বিশেষ নাম। বিশেষ করে ব্যঙ্গাত্মক নাট্যরচনায় এঁরা সিদ্ধ হস্ত।

রবীন্দ্র মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' (১৯৩৮) সমকালীন চলচ্চিত্র জগতের, বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। ইনি গল্প-কবিতাও কিছু কিছু লিখেছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে থার্ডক্লাস (১৩৩৫=১৯২৮), বাস্তবিকা (১৯৩২), দিবাকরী (১৩৩৮ =১৯৩১), উদাসীর মাঠ (১৩৩৮=১৯৩১), পরাজয়, ত্রিলোচন কবিরাজ (১৯২৯), নিরঞ্জন (১৯৪৮) উল্লেখযোগ্য। 'সিন্ধু সরিৎ' (১৩৩৩=১৯২৬) তাঁর একমাত্র কবিতার বই।

রবীন্দ্র মৈত্রের রচনায় সমকালীন অখ্যাতজনের ও অজ্ঞাত মনের ছায়াছবির আলোকপাত হ'য়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় (নন কো-অপারেশন) যে সব তরুণ বাঙালী সন্তান স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন ত্যাগ করে সাধারণ জন-সমাজের উন্নয়ন কার্যে ব্রতী হন এবং আমরণ সেই কার্যে জীবন উৎসর্গ করেন রবীন্দ্র বাবু তাঁদেরই একজন। তাঁর গল্পচিত্রগুলিতেও এই জন-জীবনের রোমান্স রসহীন বাস্তবিকতা'র ছায়াপাত হ'য়েছিল।

তুলসীদাস লাহিড়ীর মায়ের দাবী (১৯৪১), 'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৭) ও 'ছেঁড়া তার' (১৯৫২) নাটকত্রয় উভয় বাঙলা দেশের সর্বত্রই বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হ'য়েছিল। তাঁর মায়ের দাবী ইংরেজী সিনেমা চিত্রের কাহিনী অনুসরণে পরিকল্পিত হ'য়েছিল। তাঁর রচনার একটি বিশেষত্ব এই যে, আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় (রঙ্গপুরী) সম্পূর্ণ নাটক সেকালের রাজধানী কলকাতার সুধীমহলেও বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

আনন্দকিশোর মুনশীর 'রাঘব বোয়াল' 'ডাক্তারের ডায়েরী' ইত্যাদিও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ইনি রঙ্গপুর শহরের সেনপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন।

উত্তর বঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে বগুড়ার ইতিহাস লেখক প্রভাসচন্দ্র সেন, পাবনার ইতিহাস লেখক রাধারমণ সাহা, গৌড়ীয় রাজমালার লেখক রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি খ্যাতিলাভ করেন।

॥ ৫ ॥

উত্তর বঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রঙ্গপুর কুণ্ডীর জমিদার রায় সুরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রায় মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে এঁদেরই প্রচেষ্টায় বিশ শতকের গোড়ার দিকে রঙ্গপুরের 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা-কালে বাঙ্‌লা দেশে কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ছিল না। এমন কি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও তখন জন্ম হয়নি। প্রধানতঃ এই পরিষদেরই দৃষ্টান্তে পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয় কলকাতায়। বলা বাহুল্য, রঙ্গপুরের পরিষদটিকে এই সাহিত্য পরিষদের প্রথম শাখার মর্যাদা দেওয়া হয়। (১৩১৩=১৯০৬) পরবর্তীকালে রাজশাহী শহরে বরেন্দ্র মিউজিয়াম ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রধানতঃ কুণ্ডীর জমিদারদের প্রচেষ্টায় রঙ্গপুর থেকে অন্যতম প্রাচীন সংবাদ পত্র রঙ্গপুর দিক প্রকাশের প্রকাশ হয় রঙ্গপুর থেকে। অতঃপর 'রঙ্গপুর দর্পণ', হিন্দু-রঞ্জিকা' ইত্যাদি পত্রিকাও যথাক্রমে রঙ্গপুর ও নাটোর (রাজশাহী) থেকে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ঊনিশ শতকীয় বাঙ্‌লা দেশে হিন্দু-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ও নাট্য আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীও ছিলেন কুণ্ডীর জমিদার বংশের সুসন্তান। প্রধানতঃ তাঁরই উৎসাহে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সার্থক নাটক "কুলীনকুল সর্ব্বস্ব" (১৮৫৪) রচিত হয়। এই নাটকের জন্য রায়চৌধুরী মশায় ৫০/০০ (পঞ্চাশ) টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন নামে এক ব্যক্তি 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক লিখে পুরস্কার লাভ করেন। বলাবাহুল্য, সমকালে এই নাটকের খ্যাতি এত অধিক হয়েছিল যে নাট্যকার 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে প্রসিদ্ধ হ'য়েছিলেন। রঙ্গপুর বার্তাবহের বরাত দিয়ে সংবাদ প্রভাকর নিম্নরূপ সংবাদ প্রকাশ করেন (১৮৫৮ এর ২৮শে আগষ্ট) যে, কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী "পতিব্রতোপাখ্যান" নামক একখানি গ্রন্থ রচনার জন্য 'কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজের

স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যায়ি শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ শর্মা'কে ৫০ টাকা পারিতোষিক দান করেছেন। মনে হয়, এটি তাঁর দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ। কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী বাংলা সাহিত্য রচনায় উৎসাহী তরুণদের প্রতি কিরূপ দরদী ছিলেন, এ-থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সমকালীন সংবাদ প্রভাকর পাঠে আরও জানা যায়, তিনি প্রভাকরে প্রকাশিত কবিতা রচনার জন্য কিশোর কবি বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বারকানাথ অধিকারী এবং দীনবন্ধু মিত্রকেও পুরস্কৃত করেছিলেন। "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব" গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই পুরস্কার প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা—"যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন,···কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন।" বলা বাহুল্য এই পুরস্কার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীই দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলী কলেজের ছাত্র ছিলেন। দীনবন্ধু হিন্দু কলেজের এবং দ্বারকানাথ অধিকারী ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের, মানে, ইস্কুলের ছাত্র। ১৮৫৩ সালে এই প্রতিযোগিতা হয়।

কালীচন্দ্র নিজেও কবি ছিলেন। তিনি 'গীতমালা' এবং 'স্বভাব দর্পণ' নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'কাব্য সেবধী' নামে আরও একখানি অলঙ্কার শাস্ত্র জাতীয় পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তা প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। বইখানা ছাপা সুরু হয়েছিল, কিন্তু তার কোন অস্তিত্ব আছে বলে জানা যাচ্ছে না। ১২৬১ সালের ২৪শে ফাল্গুন (=১৮৫৫) তাঁর মৃত্যু হয়। ১৭ই মার্চ, ১৮৫৫=৫ই চৈত্র ১২৬১ সাল তারিখের সংবাদ প্রভাকরে এই সংবাদ ছাপা হয়।[১৩]

কৌতূহলের ব্যাপার এই যে কলকাতা শহরে বসে রঙ্গপুরের কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর পৃষ্টপোষকতায় যখন বাংলা সাহিত্যের সংস্কারমূলক 'কুলীনকুল সর্বস্ব' ইত্যাদি নাটকের মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্যান্দোলন জোরদার হ'চ্ছে সুদূর রঙ্গপুর-দিনাজপুরের কবি জামাল উদ্দীন-বুরহানুল্লাহ্ প্রমুখ কবিগণ তখনই ইস্‌লামী জাতীয়-চেতনায় উদ্বুদ্ধ 'প্রেমরত্ন' (১৮৫৩), 'আহকামোল ইস্‌লাম', 'হেন্দুগণ জাতি দর্পণ' ইত্যাদি কাব্য-কবিতা রচনা করে চলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের আধুনিক সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে এই সব কাব্য-কবিতার কোন স্থান হ'তে পারেনি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই তাঁদের সাহিত্য-সাধনার দৈন্য এত প্রকট, সত্যের অনুরোধে এ-কথা বলতে হবে।

পাদটীকা

॥ এক ॥

১। জর্জ গ্রীয়ার্সন — দি লিঙ্গুইস্‌টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ১ম খণ্ড, ১ম পর্ব, দিল্লী, ১৯৬৮, পৃঃ ৫।

২। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ — বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা, ১৯৬৬), পৃঃ ২-৮।

৩। মৎলিখিত — বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায় (ঢাকা, ১৯৬৮), প্রথম অধ্যায়।

৪। নগেন্দ্রনাথ বসু — বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড (কলিকাতা ১৯১৪) পৃঃ ২২১-২২।

৫। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত, ১ম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৬৩) পৃঃ ১৭৯।

৬। সুখময় মুখোপাধ্যায় — কৃত্তিবাস পরিচয়, (কলিকাতা, ১৯৪৯), পৃঃ ১২২।
"একে (আমীর জৈনুদ্দীন হরয়ী) এবং রসূল বিজয় জৈনুদ্দীনকে অভিন্ন মনে করা যেতে পারে।"

৭। Dr. A. Karim—The Social History of the Muslim ef Bengal (Dacca).

৮। মনীন্দ্রমোহন চৌধুরী সম্পাদিত আত্ম পরিচয় (রাজশাহী ১৯৬৪), পৃঃ ১১২।

৯। আব্দুল গফুর সম্পাদিত সুলতান জমজমা (ঢাকা, ১৯৬৯)।

১০। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক—মুসলিম বাংলা সাহিত্য (ঢাকা ১৯৫৫) পৃঃ ৮৮-৮৯।

১১। মৎলিখিত — উত্তর বঙ্গে সাহিত্য-সাধনা (রাজশাহী, ১৯৭০) পৃঃ ৪০০-৪০১ (প্রকাশিতব্য)।

১২। পূর্বোক্ত। পৃঃ ২৯১-২৯২।

১৩। পূর্বোক্ত।

১৪। পূর্বোক্ত। ঘোড়া-ঘাটে সাহিত্য চর্চা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

॥ দুই ॥

১। ডক্টর সুকুমার সেন — বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

২। মৎলিখিত—মজনু শাহ (ঢাকা, ১৯৬৯), পৃঃ ৩৮।

৩। সমাচার দর্পণ পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত — আধুনিক বাংলা সাহিত্য। মোহাম্মদ মনীরুজ্জামান (ঢাকা, ১৩৭২) পৃঃ ৪০।

৪। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্— বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, ২য় সং (ঢাকা ১৩৭৪), পৃঃ ১২০-২১।

৫। দ্রষ্টব্য মৎলিখিত — বাংলা সাহিত্যের একটি হারানো ধারা (ঢাকা, ১৯৭০), প্রেমরত্ন প্রসঙ্গ।

৬। মৎসম্পাদিত—'হেন্দুগণ জাতি দর্পণ' বাঙলা একাডেমী পত্রিকা। মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৭, পৃঃ ৮৭।

৭। পূর্বোক্ত।

৮। মৎলিখিত—মির্জা ইউসুফ আলী, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা (ঢাকা)।

৯। গত বৎসর মির্জা ইয়াকুব সাহেব দীর্ঘরোগ ভোগের পর ইন্তিকাল করেছেন। (১৯৭১)

১০। ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৩৬৫ = ১৯৫৮। পৃঃ ৬২।

১১। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪।

১২। কান্তকবি রজনীকান্ত। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (কলিকাতা, ১৩২৮), পৃঃ ২৭০।

১৩। ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব" (কলিকাতা, ১৯৬৮), পৃঃ ৩৩২।

গ্রন্থ-পঞ্জী

॥ ক ॥ বাংলা :

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ১ম খণ্ড। কলিকাতা, ১৯৬৩।

আবূতালিব, মুহম্মদ। বাংলা সাহিত্যের ধারা। উত্তর বঙ্গ লাইব্রেরী, রাজশাহী, ১৯৬৮।

—— লালন শাহ ও লালন গীতিকা, ১ম ও ২য় খণ্ড। বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৬৮।

—— বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়। পাকিস্তান বুক কর্পোরেশনস, ঢাকা, ১৯৬৮।

—— মজনু শাহ। পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৬৮।

—— (সম্পাদিত) হযরত শাহ মখদুম রূপোশের (রহ্) জীবনেতিহাস। পাকিস্তান বুক কর্পোরেশনস, ঢাকা ১৯৬৮।

—— বাংলা সাহিত্যের একটি হারানো ধারা। সোসাইটি ফর কালচারাল ফ্রীডম, ঢাকা, ১৯৭০।

—— উত্তর বঙ্গে সাহিত্য সাধনা (৬৫০-১৮০০)। গবেষণা-নিবন্ধ (অপ্রকাশিত) রাজশাহী, ১৯৭০

আব্দুল গফুর, অধ্যাপক। সুলতান জমজমা। বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৯

আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৬৮।

এনামুল হক, ডক্টর মুহম্মদ। মুসলিম বাংলা সাহিত্য। পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৫৫।

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। কান্তকবি রজনীকান্ত। ঋষিকেশ সিরিজ, নং ৪। কলিকাতা, ১৩২৮ = ১৯২১।

প্রিয়রঞ্জন সেন, ডক্টর। সাহিত্য প্রসঙ্গ। কলিকাতা, ১৩৫৩ (= ১৯৪৬)।

মনীন্দ্রমোহন চৌধুরী (সম্পাদিত)। আত্মপরিচয়, বরেন্দ্র মিউজিয়াম, রাজশাহী, ১৯৬৪

শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ। বাংলা সাহিত্যের কথা, ১ম খণ্ড, রেনেসাঁ প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৬। ২য় খণ্ড, ২য় সং, ১৯৬৭।

সুকুমার সেন, ডক্টর। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম-৪র্থ খণ্ড। ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা—৯।

সুখময় মুখোপাধ্যায়, ডক্টর। কৃত্তিবাস পরিচয়। কলিকাতা, ১৯৪৯।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম। কলিকাতা, ১৯৫৮।

॥গ॥ ইংরাজি ঃ

Abdul Karim, Dr. The Social History of the Muslims of Bengal. Asiatic Society of Pakistan, Dacca.

Ali Ahsan, Syed. Ed The Literary Scene in East Pakistan Dacca (P.E N.) 1955.

Chatterjee, Dr. S.K. Origin and Development of Bengali Language Part I Calcutta, 1926.

Grierson, G. A. The Linguistic Survey of India vol V, Part I, Delhi, 1968.

Majumder, R. C. Ed. History of Bengal, vol I, D. U. 1943.

Shahidullah, Dr. Muhammad. The Buddhist Mystic Songs. Karachi, 1960.

Sarker, Sir J.N. Ed. The History of Bengal vol II, D. U. 1948,

॥ গ ॥ তালিকা গ্রন্থ :

শামসুল হক সংকলিত — বাংলা সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী (ন্যাশনাল বুক সেন্টার, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৭০)।

কামিনীকুমার রায়

বাংলা ভাষায় শব্দ-বৈচিত্র্য

বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারে শুধু ভারতীয় আর্যগণের সংস্কৃত ভাষার শব্দের প্রাচুর্য নহে, যুগে যুগে অপর বহু জাতির বহু ভাষার শব্দ সম্ভার আসিয়া ইহাতে সঞ্চিত হইয়া ইহাকে এক বিশাল শব্দ-রত্নাকরে পরিণত করিয়াছে। ইহাতে যে কত মণিমুক্তা, আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কত তথ্য ও তত্ত্ব, কত কথাকাহিনী, কত ঐতিহাসিক উপাদান আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধার করা কাহারও একক চেষ্টায় সম্ভবপর নহে। সংস্কৃত এবং অপর বহু ভাষার বহু শব্দ অর্থ, বানান এবং উচ্চারণের দিক দিয়া প্রায় অবিকৃত অবস্থায় সরাসরি বাংলা ভাষায় আসিয়াছে। আবার বহু শব্দ ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়া পরিবর্তিত আকারে আমাদের ভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত এবং বিদেশী ভাষা হইতে আগত অনেক শব্দেরই মূল আমরা ধরতে পারি; কিন্তু আর্যদের আগমনের পূর্বে এই দেশে যারা বাস করিত তাদের ভাষা হইতে যে সকল শব্দ বাংলায় গৃহীত হইয়াছে এবং বৈয়াকরণেরা যেগুলিকে 'দেশী শব্দ' বলিয়া অভিহিত করেন, তাদের অনেকগুলিরই বংশ পরিচয় আমাদের জানা নাই। জ্ঞাতমূল এবং অজ্ঞাত মূল,—এই উভয় শ্রেণীর শব্দ দ্বারাই বাংলা ভাষার কান্তিপুষ্টি এবং উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

যে পাথেয় লইয়া ভারতীয় আর্যগণ এতদাঞ্চলে আসিয়াছিলেন, একমাত্র তাহাই তাঁহারা সম্বল করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে,

নূতন নূতন পরিস্থিতিতে অনেক গ্রহণ-বর্জন তাঁহাদিগকে করিতে হইয়াছে। বাংলার মাটিতে আর্য অনার্য দ্রাবিড় চীন শক হূণ পাঠান মোগল ইংরেজ কত জাতি যুগে যুগে আসিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ঘর বাঁধিয়াছে, তাহাদের সহিত আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। জাতিকে জাতি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সংস্কৃতির ছাপ, ভাষার ছাপ বাঙালীর জীবনের সর্বস্তরে, তাহার সংসারে সমাজে, ধর্মেকর্মে, ভাষায় ও সাহিত্যে রহিয়া গিয়াছে। বাঙালী জাতি পৃথিবীর অপর বহু জাতির ন্যায়ই একটি মিশ্র জাতি; বাংলা ভাষাও তাহাই,—সেই মিশ্র জাতির একটি মিশ্র ভাষা।

সাহিত্যের ভাষায় বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের সকল ঐশ্বর্য, সকল সম্পদ এখনও ধরা পড়ে নাই। সেগুলির অধিকাংশই মুখের ভাষায় প্রচলিত থাকিয়া আপনার অটুট জীবনীশক্তির পরিচয় দিতেছে। এক একটি শব্দের কত রূপ, কত অর্থ, কত প্রতিশব্দ জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া আছে। শব্দের উচ্চারণে এবং ব্যবহারে অঞ্চলে অঞ্চলে পার্থক্য আছে, আবার একই অঞ্চলে একই পরিবেশের মধ্যেও এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে ব্যবহৃত অনেক শব্দ, শব্দার্থ কান্দি অঞ্চলে অপরিচিত; তমলুকের 'কাঁথা' হিজলীতে 'গাঁথা'; ময়মনসিংহের 'চাউল' টাঙ্গাইলে 'চাইল'; ঢাকার 'চিকা' কলিকাতায় 'ছুঁচো'; আবার চব্বিশ পরগনায় 'চিতি' এক জাতের সাপ, জলপাইগুড়িতে 'চিতি' প্রজাপতি; মেদিনীপুরে 'টোকা' চাল ধোয়ার বাঁশের ধুচুনি, হাওড়া হুগলী বর্ধমানে 'টোকা' পাতা ও বাঁশের চেঁচাড়ির তৈয়ারি টুপির ধরণ ছাতা; একই গ্রামে শিক্ষিতেরা বলে, 'শোব,' 'নব্বুই', অশিক্ষিতেরা বলে 'শুবো', 'লব্বই'। আমাদেরই এক আত্মীয়ের বাড়িতে একই তরকারি ফলকে গিন্নী বলেন 'মিঠালাউ', বড় বউ বলে 'বৈতাল', ছোট বউ বলে 'ডিংলা', ঝি বলে 'কুমড়া'।

বাংলা ভাষায় এই যে শব্দ-বৈচিত্র্য, একই শব্দের নানা অর্থ, আবার একই অর্থে উচ্চারণের পার্থক্য সহ একই শব্দের অথবা নানা শব্দের ব্যবহার, ইহার মূলে অনেক কারণ থাকিতে পারে; তন্মধ্যে একই ভাষাভাষী অঞ্চলে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠির সহাবস্থান ও সংমিশ্রণ কারণটিকেই অনেকে প্রধান মনে করেন। আদিতে একই গোষ্ঠির লোক যে একই বস্তুকে কখনো এই নামে, কখনো ওই নামে, কখনো বা আর এক নামে অভিহিত করিত, তাহা বলা চলে না। কোনও মানবগোষ্ঠি দ্বারা নিজেদের জ্ঞানবিশ্বাস ও চিন্তাধারা অনুযায়ী একটি বস্তুকে বিশেষ

একটি নামে চিহ্নিত করাই স্বাভাবিক। কিন্তু উন্নতিশীল মানবগোষ্ঠীর কেহই তো চিরকাল একই অঞ্চলে স্বাতন্ত্র্যের পাঁচিল তুলিয়া বসিয়া থাকে নাই; তাহাদের পরিক্রমণ ও সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে; এক গোষ্ঠীর মানুষ অপর গোষ্ঠীর মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে; একের সহিত অপরের নানা সম্পর্ক,—বৈবাহিক সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে ভাব আদানপ্রদানের একটা সাধারণ ভাষাও গড়িয়া উঠিয়াছে; সেই ভাষায় বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর ব্যবহৃত শব্দ, বাক্‌ধারা অবশ্যই অল্পবিস্তর স্থান পাইয়াছে। এইরূপে এক একটি বস্তুর এক গোষ্ঠীর দেওয়া এক নামের সঙ্গে বহু গোষ্ঠীর বহু নাম যুক্ত হইয়াছে। শুধু বাংলাভাষী অঞ্চলেই নহে, সর্বত্র সকল দেশেই, যেখানেই বিভিন্ন জাতের মানবগোষ্ঠীর মেলামেশা হইয়াছে বা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানেই এইরূপ শব্দ-বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। একই অর্থে এক শব্দের পরিবর্তে বহু শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। উপরে একই পরিবারে একটি তরকারি ফলের চারটি নাম ব্যবহার সম্পর্কে যে উদাহরণটি দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূলেও আছে এই একই কারণ। 'মিঠালাউ' বলিতে অভ্যস্ত পরিবারে আসিয়াছে 'বৈতাল' ব্যবহারকারী অঞ্চলের এক বধূ; আবার এই পরিবারেরই আর এক বধূর পিত্রালয় সেই অঞ্চলে, যে অঞ্চলে উক্ত ফলটি 'ডিংলা' নামে পরিচিত; ইহাদেরই সংসারে কাজ করে যে ঝি, সে 'বৈতাল' বা 'ডিংলা'কে আশৈশব 'মিষ্টি কুমড়া' বা 'কুমড়া' বলিয়াই জানে। এইরূপে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর লোকদের সহাবস্থানের ফলে একই বস্তু বহু নামের 'নামাবলী' পরিয়া একই বাংলাভাষীর ঘরে নির্বিবাদে কাজ করিয়া যাইতেছে।

সাহিত্যের ভাষায় 'পেয়ারা' নামটি বহু প্রচলিত হইলেও অঞ্চলে অঞ্চলে ইহার নামান্তরের অন্ত নাই,—অবশ্য উহাদের মধ্যে কতকগুলি একই নামের উচ্চারণ ভেদ: আঞ্জির, আঁজির, সবরী, সবরী আম, আম সবরী, গৈয়ব, গৈয়া, গয়া, গায়ে গয়ম, টামসুপারি। 'সবরী' কাহারো কাহারো মুখে 'সফরী'ও শুনা যায়।

ব্যয়কুণ্ঠ অর্থে 'কৃপণ' শব্দটির কিরপিন, কিরপন, কিপ্পন, কিপ্পিন, কেপ্পন —নানা উচ্চারণভেদ শুনা যায়। আবার উহার সম নামেরও অন্ত নাই: আইটি, কঞ্জুস, কশা, কাঁই, কাঁইয়া, কাইটাল, কাঙঠী, কাটুয়া, কাংটা, কাপটে, কিপটে, কিষ্টে, কিচক, কিরমিষ্টি, কোটকা, খদে, খবিস, চিকি, চিপটা চিপা, চিপ্পু, চিপ্পু, ঢিপা, টেপা, বক্‌খিল, যক্ষ, সুম ইত্যাদি।

আমাদের অতি পরিচিত 'ঝাঁটা'র প্রতিশব্দ এবং তাহাদের উচ্চারণভেদও কত : ঝাঁটা/ঝেঁটা / ঝ্যাঁটা, খাংরা / খেংরা / খ্যাংরা, খররা, খরকা / হরকা, বাড়ুন/ বাড়োন, আইটা, পিছা, শলাপিছা, শলা, বাদিনি, সামটা, কোস্তা, ঘরবরা, হাচুন/সাচুন, হুরইন/ফুরইন ইত্যাদি।

চাল ইত্যাদি মাপিবার বাঁশের বা বেতের ছোটপাত্র বাঙালীর ঘরে কত বিচিত্র নামেই না অভিহিত হয়। যেমন, কুনকে, কুনি, কোঁচা, খুঁচি, খুবি, টালা, ঠিকে, দন, দোন, পাই, পালি, পুরা, পোয়া, রেক, সের।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এক একটি শিল্পবস্তুর নামের বিভিন্নতার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে উহাদের আকৃতি প্রকৃতিরও অল্পবিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 'জালা' এবং 'মটকি' একই পর্যায়ভুক্ত হইলেও দুইটির গড়ন পিটন এক নহে। আবার জলপাত্র অর্থে কলস/কলসী নামটি বাংলার সর্বত্র বহু প্রচলিত হইলেও মেদিনীপুরের কলসের গড়ন, আর ঢাকার কলসের গড়নের মধ্যে শিল্প-শৈলীতে পার্থক্য আছে। নদীয়ার 'ঝাঁকা' আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার 'ঝাঁকা' একরূপ নহে। এপার বাংলার কোন কোন অঞ্চলের লাঙ্গল জোয়ালের গড়ন ওপার বাংলার কোন কোন অঞ্চলের গড়ন হইতে ভিন্ন। বীরভূমের কোথাও এক 'খুঁচি'র পরিমাণ দুই ছটাক, খুলনায় পাঁচ ছটাক, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় দশ ছটাক। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় এক 'পালি' চাল বলিতে বুঝায় আড়াই সের, আবার খুলনায় পাঁচসের। এই সকল পার্থক্যের মূলে যে কারণটি প্রধান বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতেছে একই ভাষাভাষীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী গোষ্ঠীর বিদ্যমানতা এবং পুরুষানুক্রমে অনুসৃত এক একটি শিল্প-শৈলীর প্রতি সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর আনুগত্য ও সংরক্ষণশীলতা

একই বস্তুর বিভিন্ন নামকরণের আরও নানা কারণ থাকিতে পারে। মুখের ভাষার অধিকাংশ শব্দই শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তুটির কিছুটা পরিচয় বহন করে। বহু শব্দ দ্বারা একই বস্তুকে চিহ্নিত করিলেও এক একটি শব্দ বস্তুটিকে ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা আকার সম্পন্ন করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। কোনও শব্দের ভিতর দিয়া বস্তুটির আকৃতির, কোনও শব্দ দ্বারা বা উহার প্রকৃতির, কোনওটি দ্বারা বা উহার অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের আভাষ পাওয়া যায়। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি ও সংস্কারাদি অনুসারে কোনও বস্তু বা বিষয়কে বিশেষ বিশেষ নামে চিহ্নিত করে। একটি বস্তুর অনেক দিক থাকিতে পারে; সামান্য একটি শব্দ দ্বারা উহার সকল দিক প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। এজন্য প্রায়ই

বস্তুটির দুই একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র এক একটি শব্দের উপাদানরূপে গৃহীত হয়। সকল মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং গ্রহণ-বর্জনের ক্ষমতা একরূপ নয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লোকের কাছে স্থান-কাল-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়াই স্বাভাবিক। ফলে একই বস্তু, একই প্রাণী বা একই বিষয় নানা নাম-রূপ গ্রহণ করে। গায়ে ভীষণ উগ্র গন্ধ বলিয়া মূষিকের আকৃতি এক শ্রেণীর প্রাণীকে সংস্কৃতে গন্ধ মূষিক বলা হয়। উহারই প্রাদেশিক এক নাম 'চিকা' (সংস্কৃতে 'চিক্ক' শব্দটিও পাওয়া যায়)। হয়ত প্রাণীটির 'চিক চিক' শব্দ হইতেই কোন কোন অঞ্চলে উহার 'চিকা' নাম হইয়াছে। চিকা শুধু চিক চিক শব্দেই করে না,—এটা ওটায়, বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্যে মুখ দেওয়া উহার একটি বিশ্রী স্বভাব। এই স্বভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাংলার অপর কোন কোন অঞ্চলে মানুষ আবার উহাকে 'ছুঁচো' নামে অভিহিত করিয়াছে। একটি জালের কথা বলি। যেমন, 'খেপলা জাল'। এই জালের কতকাংশ কনুই-এর উপর তুলিয়া বাকি অংশ মুঠ করিয়া ধরিয়া, শরীর একটু ঝাঁকিয়া মাছের ঝাঁকের উপর ঘুরাইয়া উড়াইয়া জোরে নিক্ষেপ করিতে হয়। একটি জালের এতগুলি দিক কখনও কোন একটি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। তাই কোন কোন অঞ্চলের মানুষ উহার ক্ষেপণের দিকটার উপর বেশি জোর দিয়া উহার নাম রাখিয়াছে 'খেপলা জাল', 'খ্যাপলা জাল', 'খ্যাওলা জাল', 'খেয়া জাল'। বাংলায় 'ফিকা' শব্দের এক অর্থ নিক্ষেপ করা, তাই কোথাও কোথাও 'ফিকা জাল' কথাটিও শুনা যায়। শরীর একটু ঝাঁকিয়া ফেলিতে হয় বলিয়া ইহার আর এক নাম 'ঝাঁকি জাল'। কনুই-এর উপর তুলিয়া লইতে হয় বলিয়া ইহাকে 'কনুই জাল'ও বলা হয়। মুঠ করিয়া ফেলিতে হয় বলিয়া কোথাও আবার ইহা 'মুঠ জাল' নামে পরিচিত। ঘুরাইয়া উড়াইয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে হয় বলিয়া ইহার 'ঘুরনি জাল', 'উড়া জাল' নামও শুনা যায়। এক একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশক শব্দগুলি একত্র করিয়া তবেই আমরা বস্তুটিকে সুন্দররূপে, অনেকটা পরিপূর্ণরূপে জানিতে পারি। বিলাতিকুমড়া, বিলাতি বেগুন, মর্তমান কলা, বাতাবি লেবু' প্রভৃতি নাম হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, নামোদ্দিষ্ট বস্তুগুলি এককালে এতদঞ্চলে ছিল না, বাহির হইতে কোনও সূত্রে আসিয়া বাংলার মাটিতে উৎপন্ন হইতেছে। অনেকে বলেন, ব্যাটাভিয়া হইতে আগত বলিয়া ফল-বিশেষের নাম 'বাতাবি', মার্টাবান হইতে আগত বলিয়া কলা বিশেষের নাম 'মর্তমান'। কিন্তু বাংলায় ফল দুইটির আরও বহু নাম আছে। 'বাতাবি' বাংলাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলে

'বাদামি', 'বাতাপি', জম্বুরা/জাম্বুরা, জম্বীর, মাতু, ঝাদি, ছোলম্, ছোলঙ্ প্রভৃতি নামে এবং 'মর্তমান কলা' 'সবরী কলা' নামে বহু প্রচলিত। সংস্কৃত জাত (তদ্ভব) এবং বিদেশী শব্দের পরিবর্তিত রূপের মূল আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, কিন্তু অনেক দেশী শব্দেরই বুৎপত্তি আমরা জানি না বলিয়া সেই সকল অজ্ঞাত-মূল শব্দ বস্তুটির কোন পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য বহন করে, তাহা বুঝিতে পারি না।

তবে সব নামই যে নামধারীর আংশিক বা পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে, তাহা নহে। অনেকে দেবতার নামে সন্তানের নাম রাখেন। যেমন, অন্নদাশঙ্কর, কালীকিঙ্কর, গোবিন্দগোপাল। এই নামগুলির ভিতর দিয়া নামধারীর আকৃতি প্রকৃতির বা গুণপনার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, এইগুলি নামদাতারই এক বিশেষ চিন্তাধারার ছাপ বহন করে। সন্তানকে দেবতার নামে ডাকার ভিতর দিয়া একদিকে যেমন পরোক্ষভাবে ভগবানের নামকীর্তন করা হয়, অপরদিকে তেমনই সন্তানকে দেবতার নামাশ্রিত বা পদাশ্রিত করিয়া রাখিলে তাহাকে রক্ষার দায়িত্ব যদি দেবতাই গ্রহণ করেন। থাকমণি এবং আন্নাকালী (আর না মা কালী) এই নাম দুইটির প্রথমটিতে সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য জনকজননীর একটা তীব্র আকুতিই প্রকাশ পাইয়াছে। সন্তান যতই কাম্য হউক; অধিক কন্যা সন্তানের জনক-জননী হইতে কেহই বড় চান না, কারণ কন্যাদায় বড়দায়,—এই মনোভাব-প্রসূত দ্বিতীয় নামটি। কাঙ্গালী, খ্যাঁদা পাগলা, পঁচা—এই সব ডাক নামের সঙ্গে নামধারীর আকৃতি প্রকৃতির প্রায়ই কোনও সম্পর্ক থাকে না। এইগুলির পশ্চাতে আছে স্নেহের অতিশয্য এবং অন্ধসংস্কার —যমকে, কুদৃষ্টি সম্পন্ন অপদেবতাকে বিভ্রান্ত করিবার আদিম মনোভাব, নাম শুনিয়াই যাহাতে মৃত্যু-দেবতার অরুচি হয় !

কতকগুলি শব্দ বা সাঙ্কেতি বাক্য আক্ষরিক অর্থে বা পরিচিত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া অন্য কোনও বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূলেও আছে নানা সংস্কার, ভয়ভীতি, অপ্রিয়তা নিবারণ ইত্যাদি নানা কারণ।

কেহ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলে বলা হয়, 'অমুকের উপর মায়ের দয়া হয়েছে।' আমাদের দেশের মেয়েরা অনেক সময় অমঙ্গলসূচক কোনও কথা সোজাসুজি না বলিয়া অন্য কোন কথা দ্বারা (প্রায়ই বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা) উদ্দিষ্ট বিষয়টি ঘুরাইয়া প্রকাশ করে। ইহার মূলে আছে অন্ধ সংস্কার বা ভয়। বসন্ত একটি ভীষণ রোগ ; ইহার নাম লইলে যদি সে আরও ভীষণ হইয়া উঠে,

অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলার কোপ আরও বাড়িয়া যায়, তাই উহাকে 'মায়ের দয়া' বলিয়া উহার ভয়াবহতাকে মনের কোণে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয়। আবার মায়ের কোপকেও মায়ের দয়া বলিয়া শরণ লইলে সত্যই যদি তার দয়ার উদ্রেক হয়। একই কারণে শিশুদের ফোসকা জাতীয় রোগ বিশেষকেও 'মাসীপিসী' অভিহিত করা হয়।

রাত্রিতে বাঘকে বলা হয় 'পোকা', সাপকে বলে 'লতা', 'কাঠি'। 'কাঠির ঘা' বলিলে বুঝায় সর্পদর্শন। রাত্রিতে চোর বলা নিষিদ্ধ, তখন সে 'রাতের কুটুম' হইয়া দাঁড়ায়। রাত্রিতে যখন বলা হয়, 'বাড়িতে কাতলা পড়েছে", তখন বুঝিতে হইবে, বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছে বা ডাকাতে মানুষ কাটিয়াছে। বাদায় (সুন্দর বনে) অসুখ অশান্তির কথা প্রকাশ করিতে হইলে বলা হয়, 'বাদাই' ভাল আছি;' সেখানে 'অমুকের ভাল হইয়াছে' বলিলে বুঝিতে হইবে, অমুকের মৃত্যু ঘটিয়াছে বা অমুক ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে।

ঘরে কোনও জিনিষ না থাকিলে গৃহিণীরা 'নাই' না বলিয়া বলেন 'বাড়ন্ত'। 'ঘরে চাল বাড়ন্ত' মানে ঘরে চাল নাই। 'নাই' বলিলে যদি কোনদিনই না থাকে! শাঁখা 'খুলিয়া রাখা' কথাটি সধবাদের মুখে জোয়ায় না, তাহারা বলে 'শিথলে রাখা/ শিতনিয়া রাখা'। খুলিয়া ফেলা বা খুলিয়া রাখার মধ্যে হয়ত একটা আশঙ্কা মনের কোণে উঁকি দেয়। প্রিয়জনকে বিদাই জানাইতে আমরা বলি, 'এসো',—বলি না, 'যাও'। 'যাও' কথায় আমাদের বুকটা যেন ছ্যাঁং করিয়া উঠে। মৃত্যুকে বলি 'গঙ্গা-প্রাপ্তি', যদিও অনেকক্ষেত্রেই ঘটনার ত্রিসীমানার মধ্যেও গঙ্গা থাকে না।

অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষায়ও একই অর্থে উচ্চারণের পার্থক্যসহ একই শব্দের এবং ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার যেমন আছে, তেমনই বিভিন্নার্থক শব্দেরও অবধি নাই। একই বানান, প্রায় একই উচ্চারণ, অথচ শব্দটি এক এক অঞ্চলে এক এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থ-পার্থক্য যে শুধু স্থানের দূরত্ব এবং পরিবেশের অনৈক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাহা নহে। একই অঞ্চলে একই পরিবেশের মধ্যেও নানার্থক বহু শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আবার এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলির কোনও একটি অর্থ বাংলার সর্বত্র প্রচলিত থাকিলেও, অঞ্চলে অঞ্চলে উহারা আরও নানা অর্থে, সম্পূর্ণ নূতন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে ঃ

'কাঠগড়া'র বহু প্রচলিত অর্থ, কাঠের রেলিং দেওয়া নাতি উচ্চ মঞ্চ, আদালতে

যেখানে আসামীরা দাঁড়ায় বা সাক্ষীরা দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু কোথাও কোথাও ইহার অপর অর্থ, ছাগ মহিষাদি বলি দিবার হাড়িকাঠ বা যূপকাষ্ঠ।

'কাতলা' নামীয় মাছের সঙ্গে বাঙালীমাত্রই পরিচিত। কিন্তু বাংলার উপ-ভাষা এবং বিভাষাগুলিতে শব্দটি আরও নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'কাতলা' যশোহর ও পাবনায় হাড়িকাঠ ; আবার পাবনারই কোন কোন অঞ্চলে উহা ঠাস বোনা কাপড়ের পাজামা বিশেষ। কোথাও বড় দাকেও কাতলা বলা হয়। বরিশালে ঢেকির খাঁজ কাটা খুঁটি, যাহার উপর আঁকশলি বসে, তাহারও নাম কাতলা; গাঙ্গেয় অঞ্চলে ইহা পুয়া/পোয়া নামে পরিচিত।

'তবলা' বলিতে প্রথমেই মনে পড়ে সুপ্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্রটির কথা। মেদিনীপুরের কোথাও কোথাও ভারী ছোট কুড়ালকেও তবলা/দবলা বলিতে শুনা যায়। নদীয়ায় করাতীর অপর নাম 'তবলদার' (হয়ত উহারা ভারী কুড়াল ব্যবহার করে বলিয়া)।

'তসলা' পিতলের বিস্তৃত মুখ রন্ধনপাত্র হিসাবেই বাঙালীর হেঁশেলে অধিক পরিচিত। কিন্তু কোথাও কোথাও যূপকাষ্ঠকেও তসলা বলা হয়।

থেলো হুঁকা বা চাষীদের সাধারণ হুঁকার বহুপ্রচলিত নাম 'ডাবা'। কিন্তু নদীয়া এবং টাঙ্গাইলের কোথাও গোরুকে জাব দিবার গামলা জাতীয় একরূপ পাত্রকে বলা হয় 'ডাবা'। আবার যশোহর, ফরিদপুর ও বরিশালে শিশুদের নিউমুনিয়া রোগকেও 'ডাবা' বলিতে শুনা যায়।

'পোনা/পনা', পোনামাছ/পনামাছ কথাগুলি সারা বাংলায়ই শুনা যায়। কিন্তু একই নাম ব্যবহার করিলেও সর্বত্র ইহাদের দ্বারা একই জিনিস বুঝায় না। গাঙ্গেয় অঞ্চলে 'পোনা' বলিতে রুই কাতলা ইত্যাদির বাচ্চা এবং 'পোনামাছ' বলিতে রুই কাতলা ইত্যাদি বড় মাছ বুঝায়। পক্ষান্তরে ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা ও ঢাকার বহু জায়গায় শোল, শাল, লেটার একেবারে বাচ্চাকে 'পনা' বা 'পনামাছ' এবং ইহাদের ঝাঁককে 'পনাবাইস' বলা হয়। একই নাম কোথাও প্রযুক্ত হয়, মাছের সেরা রুই কাতলার প্রতি, কোথাও নগণ্য শোল লেটার বাচ্চার প্রতি।

'খড়ি'র বহুপ্রচলিত অর্থ খড়িমাটি, chalk,—যাহা হইতে বাঙালীর একটি সংস্কারের নাম দাঁড়াইয়াছে 'হাতেখড়ি'। কিন্তু বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষা ও বিভাষায় শব্দটি আরও নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। লাকড়ি (হি লোকড়ী) বা জ্বালানী কাঠ বাঁশ অর্থে 'খড়ি' শব্দটি পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে, শ্রীহট্টে, উত্তর আসামে বহুপ্রচলিত। একই অর্থে যশোহর এবং নদীয়াতেও শব্দটি বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ লাঠিকেও অনেক বৃদ্ধা 'খড়ি' বলিয়া থাকেন (খড়িখানা নিয়ে আয়)।

তমলুকে কাশ বা খাগড়াজাতীয় একরূপ শক্ত তৃণকে খড়ি/খড়িগাছ এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শরখড়ি বলা হয়। ময়মনসিংহ এবং কুমিল্লার কোথাও কোথাও এই খড়িগাছ 'ইকর' এবং 'বাতা' নামে পরিচিত। পানের চাষে, বরোজ বাঁধায় খড়িগাছ চাষীদের বিশেষ কাজে লাগে এবং তাহারা 'খড়ি'র রীতিমত চাষও করে।

জমির মাপ অর্থে 'কাঠা' শব্দটির সঙ্গে বাঙালীমাত্রই পুরিচিত। কিন্তু এই মাপের পরিমাণ স্থানভেদে এতই বিভিন্ন যে দীর্ঘকাল অনুসন্ধানেও তাহার কূলকিনারা পাওয়া যাইবে না। শহরে বন্দরে সরকারী খাতাপত্রে কাঠার মাপ অবশ্য সুনির্দিষ্ট ঃ ·৩৩ শতাংশে এক বিঘা বা ২০ কাঠা এবং এককাঠায় ৭২০ বর্গ ফুট। কিন্তু গ্রাম-বাংলায় মহকুমায় মহকুমায়, পরগনায় পরগনায় কাঠার স্থানীয় মাপ ভিন্ন ভিন্ন। ময়মনসিংহের নশিরুজিয়াল ও হুসেনসাহী পরগনায় ৭॥ শতাংশে সেখানকার স্থানীয় এক কাঠা। স্পষ্টতঃই ওদিককার এক কাঠা কলিকাতার আদর্শ মাপের প্রায় ৬ কাঠার সমান। আবার কলিকাতার এক বিঘা শ্রীহট্টের অঞ্চল বিশেষের স্থানীয় মাপে পাঁচ কাঠায় দাঁড়ায়।

শস্যাদি, বিশেষ করিয়া ধান মাপিবার বাঁশ বা বেতের পাত্রবিশেষকেও 'কাঠা' বলা হয়। ইহার পরিমাপও ভিন্ন ভিন্ন। এক কাঠা ধান বলিলে কোথাও বুঝায় দশ কিলো, কোথাও পাঁচ কিলো, কোথাও পনেরো কিলো। কুন্‌কে জাতীয় একরূপ ছোট পাত্রকেও 'কাঠা' বলিতে শুনা যায়। জমির ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় মাপের উক্তরূপ তারতম্যের মূলে ছিল হয়ত, এই সকল কাঠানামীয় পাত্রের পরিমাণ-ভেদ। ইহাদের এক একটিতে যে পরিমাণ ধান ধরিত, সেই পরিমাণ যতটা জমিতে বোনা যাইত, ততটা জমিই হয়ত এক এক কাঠারূপে গণ্য হইত। যেহেতু এক এক অঞ্চলে এক এক মানের কাঠা-পাত্র ব্যবহৃত হইত, সেইহেতু জমি-কাঠার পরিমাণও সর্বত্র এক হয় নাই।

ভাষাচার্যগণ বলেন, আদিতে বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দের বুৎপত্তি ও রূপ ভিন্ন ভিন্নই ছিল ; ক্রমে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে এবং অন্য কারণে একই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অন্য কারণের মধ্যে স্থানের দূরত্ব বা পরিবেশের অনৈক্য এবং বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর একত্রে একই ভাষা এলাকায় বসবাস কারণটিও থাকিতে পারে। এক অঞ্চলের মানুষ একটি বস্তুকে যে নামে চিহ্নিত করে, অপর অঞ্চলের মানুষ সেই নামটি দ্বারা অপর বস্তুকেও চিহ্নিত করিতে পারে। কলিকাতা অঞ্চলে

লুচি বেলিবার গোল পিঁড়িকে 'চাকি' বলে ; আবার পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে গম কলাই ইত্যাদি পেষিবার জাঁতাকেও 'চাকি' বলা হয়। কোথাও পদ্ম-ফলের এক নাম 'চাকি' (পদ্মের চাকি); আবার উত্তরবঙ্গে কানের উপরিভাগে পরিবার আংটির আকার অলঙ্কারও 'চাকি'। হয়ত এই চারিটি বস্তুর মধ্যেই চক্রের গোলত্বের একটা আদল আছে বলিয়াই উহাদের প্রত্যেকের নাম 'চাকি' হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কোন ভাষাতেই এইরূপ হওয়ার মধ্যে সর্বদাই কোন বাঁধাধরা নিয়ম কাজ করে না। কতকগুলি শব্দ এবং সাঙ্কেতিকবাক্যের ভিতর দিয়া বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের অনেক টুকরা খবর পাওয়া যায়। এক সময়ে কৌলিন্য-গৌরব অত্যন্ত প্রবল ছিল ; কুলীনেরা পারতপক্ষে অকুলীনে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহিত না, পক্ষান্তরে অকুলীনেরা সর্বদাই কুলীন বিবাহ দিতে বা করাইতে চেষ্টা করিত। এজন্য তাহাদিগকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে এবং নানাভাবে বেগ পাইতে হইত। বর কুলীন এবং কন্যা মৌলিক হইলে কুলীনেরা 'বাঙ্গাল' গ্রামে (অকুলীনদের গ্রামে) প্রবেশ করিবার জন্য 'গ্রামদর্শনী' নামে একটা মোটা টাকা পাইতেন। কন্যাপক্ষের পক্কান্ন তাহারা খাইত না, ঠাকুর চাকর নিয়া যাইত, সিধা পাইত, নূতন চুলা খোদাইয়া রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করিত। এই চুলা খোদানোর জন্যও তাহারা টাকা পাইত, উহা 'চুলাখোদানি' নামে কথিত হইত। বিবাহ-ভোজে মৌলিক ও কুলীনেরা পৃথক পৃথক বসিত। বিবাহের পর অভ্যাগত কুলীনেরা প্রত্যেকে কন্যাপক্ষ হইতে ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫ কিংবা ততোধিক টাকা 'বিদায়' পাইত ; তাহাদের সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, গোমস্তা, ধোপা নাপিত —তাহারাও বাদ যাইত না। 'গ্রামদর্শনী', 'চুলাখোদানী', 'বাঙ্গাল গ্রাম' কথাগুলি আজ বাস্তব ছাড়িয়া পুথি-পুস্তকের পাতায় আশ্রয় নিলেও আমাদের সামাজিক ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে মূল্যহীন নয়।

'হুঁকাবন্ধ' কথাটির ভিতর দিয়াও আমরা সেকালের সামাজিক বিচার-আচারের একটা আভাস পাই। 'হুঁকা বন্ধ করা' মানে সামাজিক বয়কট। সেকালে কেহ কাহারো বাড়িতে উপস্থিত হইলে তাহাকে পান তামাক দিয়া সংবর্ধনা করাই বহু-প্রচলিত রীতি ছিল। তখন আগন্তুককে পান তামাক না দেওয়া মানে ছিল, তাহাকে অপমানিত করা। তখনকার দিনে সমাজপতিরা কোনও ব্যক্তিকে কোনও অপরাধের জন্য সমাজচ্যুত করিলে কেহ তাহার বাড়ি যাইত না, তাহাকে হুঁকা দিত না, ধোপা নাপিত তাহার কাজ করিত না।

'হুঁকা বন্ধের' ন্যায় 'একঘরে' কথাটিও সেকালের সামাজিক বিচারের আভাস

দেয়। আধুনিক যুগের মানুষ সমাজকে তোয়াক্কা করে না; ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কাছে সমাজ শক্তিহীন, নিশ্চুপ। কিন্তু সেকালে 'একঘরে হওয়া', স্বসমাজ কর্তৃক বর্জিত হওয়া চরম শাস্তি ও বিপত্তি বলিয়া গণ্য হইত।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের শতকরা ৮০ জনই কৃষিজীবী। বাংলা ভাষায় কৃষিবিষয়ক শব্দের শেষ নাই। এখানে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

বর্গাদার—যে চাষী অন্য লোকের জমি চাষ করিয়া ফসলের ভাগ পায় বা নেয়, তাহার লোক প্রসিদ্ধ নাম 'বর্গাদার', বিভিন্ন অঞ্চলে আরও আইদারী, আধিদার, আধিয়ার, ভাগচাষী, ভাগারো, ভাগীদার ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত। জমির মালিক এবং বর্গাদারের মধ্যে উৎপন্ন ফসলের কে কত অংশ পাইবে, তাহা স্থানীয় প্রথা, চুক্তি বা সরকারী আইনানুসারে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বাংলার বহু অঞ্চলেই উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বর্গাদার পায় এবং অর্ধেক মালিক নেয়। ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বর্গাদারের, দুই-তৃতীয়াংশ মালিকের, — এইরূপ ব্যবস্থাকে 'তেভাগা', 'ত্যাভাগো' বলা হয়। জমি খুব সরস হইলে মালিক তিন ভাগ এবং বর্গাদার একভাগ পায়। বরিশালের কোথাও কোথাও এই প্রথার নাম 'চতৈ'। উৎপন্ন ফসলের ১৬ ভাগ মালিকের ৮ ভাগ চাষীর, অঞ্চল বিশেষে এই প্রথাকে 'ষোলচব্বিশে' বলিতে শুনা যায়।

খেতমজুর — ইহারা অপরের খেতে খামারে রোজ, মাস কিংবা বৎসরের হিসাবে কাজ করিয়া ফসলাদি উৎপাদনে সহায়তা করে, কিন্তু বর্গাদারের ন্যায় ফসলের কোনও ভাগ পায় না, টাকায় বা ফসলে, কখনো বা দুই প্রকারেই মজুরি দেওয়া হয়। বর্গাদার বা খেতমজুর শ্রেণীর চাষীর আবাদী ভূমির উপর কোনও স্বত্বস্বামিত্ব বর্তায় না।

কামিন—কৃষিকার্যে নিযুক্ত নারীশ্রমিক। কৃষক রমণীরা শুধু হাঁড়িশালেই দিন কাটায় না। কৃষিকার্যেও নানাভাবে তাহারা পুরুষদের সাহায্য করে।

দাদনী—যে শ্রমিক আক্রার সময় ধান কর্জ নিয়া ফসলের মরশুমে মজুরী খাটিয়া তাহা শোধ করে। অন্য সাধারণ মুনিবরা যে হারে মজুরি পায়, দাদনীদের মজুরির হার তাহার চেয়ে কম। যেহেতু কর্জ দেওয়া ধানের মূল্যের সহিত তাহার সুদের অঙ্কটাও দাদনীর দায় বলিয়া ধরা হয়; অনেক ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত বেশী।

বাটায় চাষ—অনেক গরীব চাষী হালের দুইটি ভাল গোরু এক সঙ্গে কিনিতে পারে না। এরূপস্থলে এক বলদের মালিক যদি অপর এক বলদের মালিকের সহিত

যুক্ত হইয়া পরস্পরের গোরুর সাহায্যে চাষ-আবাদ করে, তবে এইরূপ চাষীকে 'বাটায় চাষ', 'আধহালা', 'গুপিনাহালা', 'আঙ্গুরে হাল' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

গাঁতা, গাঁতো, গাঁতি—কোনও কার্য সম্পাদনের জন্য বহুজনের মিলন। চাষ-আবাদের ক্ষেত্রেই এই কথাগুলি বেশি শুনা যায়। যাহার নিজের খাটিবার লোক তেমন নাই, অথচ খেতমজুর রাখিবারও অর্থ সংস্থান নাই, এইরূপ চাষী প্রায়ই সমযোগ্যতা সম্পন্ন অপর কয়েকজনের সহিত একটি দল গঠন করে। এই দল পালাক্রমে এক একদিন দলের এক একজনের কাজ করিয়া দেয়। এইরূপ দল গঠন করার অপর নাম 'হাঙ্গার করা'।

ধান বাড়ি করা, ধান বাড়ি দেওয়া—গ্রামে প্রায়ই অভাবগ্রস্ত চাষী সম্পন্ন জোতদারের নিকট হইতে এই সর্তে ধান কর্জ করে যে, সে যে পরিমাণ ধান কর্জ লইতেছে, আয়ামের সময় তাহার চেয়ে বেশি দিয়া তাহা শোধ করিবে। কত ধানে কত বাড়ি (বৃদ্ধি) দিতে হইবে, তাহা চাষী ও জোতদারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা দ্বারা স্থির হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছয়মাসে (সাধারণত আষাঢ়ে কর্জ নিয়া পৌষে শোধ করিতে হয়) এক মণ ধানে দেড় মণ ফিরাইয়া দিতে হয়।

উধারি—বর্গাদারের শৈথিল্যে ফসলের ক্ষতি হইলে, সেই ক্ষতি পূরণের জন্য জমির মালিক অনেক সময় বর্গাচাষীর নিকট হইতে কিছু টাকা অগ্রিম লয়। ইহা কতকটা সেলামির মত, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই টাকা আর ফেরত দেওয়া হয় না।

বাংলা ভাষার শব্দ-রত্নাকরের কূলকিনারা নাই। যিনি শ্রদ্ধার সহিত, নিষ্ঠার সহিত উহাতে প্রবেশ করিবেন, তিনিই উহার বিপুল ঐশ্বর্য ও অপরূপ বৈচিত্র্যের পরিচয় পাইবেন।

উল্লেখন : ১) লৌকিক শব্দকোষ, ১ম ও ২য় খণ্ড—শ্রীকামিনীকুমার রায়।
২) বাগর্থ—ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য।
৩) ভাষার ইতিবৃত্ত—ডঃ সুকুমার সেন।

সুধীর করণ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গোপীবল্লভপুর

বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামক গ্রন্থের ভাষা যে আদি-মধ্য-বাঙ্‌লা ভাষার ধারক, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। স্বভাবতঃই—মনে করা হয় যে,—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বিলুপ্তি ঘটেছে অথবা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরিবর্তিত হ'তে হ'তে আধুনিক বাঙ্‌লা ভাষায় তার রূপান্তর ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের মূল পুঁথির লিপি দেখে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উক্ত গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে যে অভিমত প্রদান করেছিলেন, সেই অভিমতকে ভিত্তি করেই, পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন যে, গ্রন্থখানির রচনা কাল ১৩৫০ থেকে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' নামক গ্রন্থে যে অভিমত দান করেছেন, তা'তে বলা হয়েছে—"পুঁথিখানির অক্ষর দেখে প্রাচীন-লিপি-বিৎ স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির করেছিলেন যে, এখানি ১৩৫০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে লেখা। কিন্তু অত প্রাচীন না হলেও বাঙ্‌লা ভাষার এমন প্রাচীন পুঁথি আর নেই। দু একজন সুপণ্ডিত সাহিত্যিক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে প্রতিকূল মত দিয়েছেন; কিন্তু তাঁদের সংশয় অমূলক বলে আমার মনে হয়। বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে আলোচনা করে আমার এই ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, এর ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের এ ধারে কিছুতেই হতে পারে না।"

বলাবাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানি, বাঙ্‌লা ভাষা তত্ত্বের বিচারে একটি

অসাধারণ গ্রন্থ। চর্যাপদের পরবর্তীকালের, আদি-মধ্য-বাঙ্‌লার ভাষার সমস্ত লক্ষণই এর মধ্যে যথাযথ ভাবে রক্ষিত আছে বলে মনে করা হয়। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিশদ্ আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থখানির অসাধারণত্ব প্রমাণ ক'রে বলেছেন :—

> "The next great landmark in the study of Bengali, after the Charyas, is the Sri Krishnakirtan of Chandidas. This work from point of view of language, is of unique character in Middle Bengali literature." (O.D.B.L.)

আরো বলেছেন—

> "It gives us the genuine West Bengali as used in literary composition in the middle of that century. The genuineness of the work is borne out by the remarkably archaic character of the forms, which agree with such widely distant dialects as North Bengali and Assamese ; and some of its expressions are found in Early Oriya." (O.D.B L.)

বলাবাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা এবং রচনাকাল সম্পর্কে নোতুন কোন বিতর্কে প্রবেশ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তবু, এমন কিছু নোতুন ইংগিত দেওয়া যেতে পারে, যা হয়তো পরবর্তী গবেষকদের কাছে অর্থবহ মনে হ'তে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর মূল পুথি, বন-বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধিকারে রক্ষিত ছিল। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পুথিখানি আবিষ্কার করেন এবং সম্পাদনা ক'রে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। পুঁথির অধিকারী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নিজের পরিচয় জ্ঞাপনের সূত্রে, নিজেকে প্রভু-পাদ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশজ বলে অভিহিত করেছিলেন।

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছিল ব'লে, স্বাভাবিক কারণে, এ কথা মনে হতে পারে যে. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায়, তৎকালীন—অর্থাৎ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর বিষ্ণুপুরী বাঙ্‌লা ভাষার রূপ ও রীতি বিধৃত। অবশ্য, এ কথাও মনে হ'তে পারে যে, পুথিখানি, কোনও সূত্রে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং তা'র রচনাস্থান পশ্চিম-সীমান্ত বাঙ্‌লার অন্য কোন জায়গায় ; কিংবা কামরূপ অঞ্চলে অথবা উত্তর বঙ্গের কোথাও। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সঙ্গে উত্তর

ঃরণ

়র্তন ও গোপীবল্লভপুর

বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামক গ্রন্থের ভাষা যে আদি-মধ্য-বাঙ্‌লা ধারক, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। স্বভাবতঃই—মনে করা [,—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বিলুপ্তি ঘটেছে অথবা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে র্তিত হ'তে হ'তে আধুনিক বাঙ্‌লা ভাষায় তার রূপান্তর ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণ-নের মূল পুঁথির লিপি দেখে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে যে অভিমত প্রদান করেছিলেন, সেই অভিমতকে ভিত্তি রই, পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন যে, গ্রন্থখানির রচনা কাল ১৩৫০ থেকে ১৪৫০ ব্দ। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' নামক গ্রন্থে অভিমত দান করেছেন, তা'তে বলা হয়েছে—"পুঁথিখানির অক্ষর দেখে প্রাচীন-নপি-বিৎ স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির করেছিলেন যে, এখানি ১৩৫০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে লেখা। কিন্তু অত প্রাচীন না হলেও বাঙ্‌লা ভাষার এমন প্রাচীন পুঁথি আর নেই। দু একজন সুপণ্ডিত সাহিত্যিক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে প্রতিকূল মত দিয়েছেন; কিন্তু তাঁদের সংশয় অমূলক বলে আমার মনে হয়। বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে আলোচনা করে আমার এই ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, এর ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের এ ধারে কিছুতেই হতে পারে না।"

বলাবাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানি, বাঙ্‌লা ভাষা তত্ত্বের বিচারে একটি

ভাষার সীমা নির্ধারিত করা যায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ভাষার গ্রীয়ারসন নির্ধারিত সীমারেখা তখন প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর ও তৎসন্নিহিত বিহারের কোন কোন অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

তা'বলে দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙ্‌লা ভাষার চেহারা যে উক্ত অঞ্চলের সর্বত্রই এক তাও নয়; তবে উপ-আঞ্চলিক উপভাষাগুলির যোগসূত্র অত্যন্ত স্পষ্ট। গোপীবল্লভপুরের কথ্য ভাষাও এই দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্‌লা ভাষার অন্তর্গত।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষার সঙ্গে গোপীবল্লভপুরের ভাষার একটি তুলনামূলক আলোচনা থেকে সম্ভবতঃ নোতুন কোন ইংগিত লাভ করা যেতে পারে। লক্ষ্য করা গেছে--ভাষা-রক্ষার ক্ষেত্রে, পশ্চিম বাঙ্‌লার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি অনেক বেশী রক্ষণশীল। প্রাকৃতিক দুর্গমতার জন্যই বাইরের প্রভাব এই সব অঞ্চলে তেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ফলে ভাষাগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও প্রচণ্ড মন্থরতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বলাবাহুল্য রক্ষণশীলতার জন্যই গোপীবল্লভপুরের ভাষা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার শব্দে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন একটি সমতা রক্ষা করেছে যা'তে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে নোতুন কিছু চিন্তা করার কথা মনে হতে পারে।

ধ্বনিগত ভাবে, উভয় ক্ষেত্রে যে স্পষ্ট মিল, তা'হচ্ছে মূর্ধণ্য ন (ণ) এবং মূর্ধণ্য 'ল' এর উচ্চারণ। ওড়িয়া ভাষাতেও এই দুটি ধ্বনির উচ্চারণ রক্ষিত আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বানান থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, উক্ত ধ্বনি দু টি, যথাযথ ভাবেই উচ্চারিত হ'ত। অন্ত্য মিলের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব মূর্ধন্য ন-এর এবং মূর্ধণ্য ল-এর মিলই পরিলক্ষিত হয়।২

এ ছাড়া ঢ়, হ্ন, হ্ম প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির ব্যবহার (বুঢ়ী, কাহ্নাঞি, আহ্মার), শব্দের মধ্যবতী যুগ্মস্বরের 'আ'—এর হ্রস্বীকরণ প্রভৃতি উভয় ভাষারই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আরো যে কয়েকটি বৈশিষ্টের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে :

(ক) বহুবচনে 'রা' বিভক্তির অল্প প্রয়োগ,

(খ) অনুসর্গ 'ঠাএ'-র' ব্যবহার,

(গ) কর্তৃকারকে 'মুঞি'-র ব্যবহার'

(ঘ) মধ্য বাঙ্‌লা ভাষায় প্রচলিত, মুঞি, মোর, মোকে, (মোক) আহ্মার,

তুহ্মার—প্রভৃতি সর্বনামের প্রয়োগ,

(ঙ) খাওঁ, যাওঁ, করোঁ, করু. ধরু, আইলা, গেলা, খাউ, যাউ, নেউ, আইস্থ, পশু (=প্রবেশ করুক), খাইতোঁ, যাইতোঁ প্রভৃতি ক্রিয়ারূপের ব্যবহার,

(চ) করিলান্ত, গেলান্ত, দিলান্ত প্রভৃতি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অন্ত্য ত-এর অবলোপ ঘটিয়ে, বহু বচনে অথবা শ্রদ্ধার্থে ব্যবহার (যথা, করলান, গেলান, দিলান),

(ছ) অনুসর্গ 'করি'-র প্রয়োগ (হালে খড়ি করি, বলোঁ মো কাহ্ন)

(জ) ইল, ইলা প্রত্যয় যোগে বিশেষণ-নির্মিত—

(পাকিল দায়ী=পাকাদাড়ী, ভুখিল বাঘ=ভুখা বাঘ, মৈলা=মৃত)।

এ ধরণের উদাহরণ অবশ্যই অনেক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা থেকে, গোপীবল্লভপুরের উপভাষার সূত্রগুলি এই ভাবেই আবিষ্কার করা সম্ভব। বলাবাহুল্য—মধ্য-বাঙ্‌লা ভাষায় বিশেষ করে, বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে ভাষাতত্ত্বগত অনেক সূত্র-ই বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত সংখ্যাহীন শব্দ এখনও গোপীবল্লভপুরের ভাষায় যথাযথ ভাবেই রক্ষিত এবং পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লাতেই তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ। এ ধরণের শব্দের প্রাচুর্য-হেতু সমস্ত শব্দের উদাহরণ না দিয়ে কিছু কিছু শব্দের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :—

দারী=দাড়ী	বাই=পাগল, একগুঁয়ে
বুড়ী=বুড়ী	চুরণী=চোর (স্ত্রী)
পশি=প্রবেশ ক'রে	বিচ্‌নী=বাজনী, পাখা
সৎ=সত্য	আই=মাতামহী
স্বপন=স্বপ্ন	তুণ্ড (তুঁড়্)=মুখ
বাটিয়া=দড়ি	ভোল=বিহ্বল
বাট=পথ	পহ্রি=পরিধান করে
হালে/হলে=নড়ে	শাগুনি=শকুনি
ওলাহা=নামাও	ঘসি=ঘুঁটে
পো=পুত্র	ভোক্=ক্ষুধা
ঝি=কন্যা	শোস্=তৃষ্ণা
নিঁদ্=নিদ্রা	গুআ=সুপারী
সুআ=শুকপাখী	আঁওলা=আমলকী

এবারে পাশাপাশি কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার ও গোপীবল্লভ-পুরের ভাষার বাক্যরীতির তুলনা করা যেতে পারে, যার ফলে, রীতিগত ভাবেও একটি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হতে পারে।

	॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥	॥ গোপীবল্লভপুর ॥
১।	আইলা দেবের[৩] মিনতি শুনি।	আইলা দেবের্ মিনতি শুনি।
	কংসের[৩] আগক নারদ[৩] মুণি ॥	কংসের্ আঘুকে নারদ্ মুনি ॥
২।	ফুল[৩] পিন্ধিলে সে খাইবে তাম্বুল[৩]।	ফুল পিঁধ্লে/পিঁধ্নে সে খাবে তাম্বুল্
৩।	যে থানে শুচি না যাএ	যে-ঠে ছুঁচ্ যাবে নি।
	তথা বাটিয়া বহা এ ॥	সে-ঠে বাটিয়া বহাইবে/গলাইবে।
৪।	ভোলে পড়িগেলা তাত নান্দের নান্দন ॥	ভোলে পড়ি গেলা তাঁহে নন্দের্ নন্দন্
৫।	পানির ফোঁটা	পানির্ ফোঁটা
৬।	পুরুষের অধিক তিরি আণ্ডিয়া।	পুরুষের অধিক তিরি আঁড়িয়া।
৭।	তাহার ঠাইকে যাইতে লাগে বড় ডর।	তাহার/তার ঠিকে যাইতে লাগে বড় ডর ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য। সামান্য কিছু উদাহরণ থেকে গোপীবল্লভপুরের ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাগত সাদৃশ্য, পুরোপুরি স্পষ্ট না হলেও এরই ভিতর থেকে ভাষাতত্ত্বের অনেক মূল্যবান ইংগিত লাভ করা অসম্ভব হবে না। এই সব ইংগিত থেকে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় যে, গোপীবল্লপুভরের দক্ষিণ-পশ্চিমী-বাংলা ভাষা থেকে আদি-মধ্য-বাঙলার চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নি। মনে হতে পারে,—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনা-স্থান গোপীবল্লভপুরও হ'তে পারে। বলা বাহুল্য,—পশ্চিমসীমান্ত বাঙ্লার সীমান্ত রাঢ়ী বাঙ্লাতেও এইসব চিহ্ন কিছু কিছু বর্তমান, কিন্তু গোপীবল্লভপুরের ভাষায় তা যতখানি রক্ষিত, তা আর অন্যত্র কোথাও নেই। গোপীবল্লভপুরের উপভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ গবেষণা প্রকাশিত হলে, আদি-মধ্য-বাঙলা ভাষার আরো অনেক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে। ওড়িয়া ভাষার রক্ষণশীলতার জন্য, ঐ ভাষাতেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু সে ভাষার সংগে কোন কোন ক্ষেত্রে—গোপীবল্লভপুরের ভাষার সাদৃশ্য আবিষ্কার ক'রে, সে ভাষাকে ওড়িয়া-ভাষা বলে মনে করা ভাষাতত্ত্বের বিচারে অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে। ভাষাতত্ত্বের বিচারে এই কথাই স্বীকৃত যে, আদি-মধ্য-বাঙলার সঙ্গে ওড়িয়া ভাষার যথেষ্ট মিল ছিল।[৪] ওড়িয়া ও পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কথা স্মরণে

রেখেই, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে বাঙ্‌লা ভাষারূপেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই কারণেই, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার মুকুরেই গোপীবল্লভপুরের ভাষার বিশদ্‌ বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। তা'তে বাঙ্‌লা ভাষার ক্ষেত্রে আর একটি উপভাষা সংযোজিত হবে, সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম এবং পূর্ব-দক্ষিণ মেদিনীপুরকে যার অন্তর্ভূক্ত করা চলবে। তখন রাঢ়ী বরেন্দ্রী বাঙ্গালী এবং কামরূপীর সঙ্গে আর একটি বিশিষ্ট উপভাষার নাম সংযোজিত হবে, যার ঐতিহাসিক নামকরণ এখনও হয় নি; দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙ্‌লা ভাষা নামেই যাকে অভিহিত করা হয়।

পাদটীকা

১। হায় কি কল্লু রে কিষ্ট,
কিস্‌কে আছু ভুঁয়ে পড়া, লিহাং কি যাউঠু রে ছাড়া।

২। বোলহ রাধারে মোর বাণী।
সুখে নেউ যমুনার পানী॥

৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত শব্দগুলিতে অন্ত্য-অ-কারের (যথা = দেবের-অ) উচ্চারণ ছিল; গোপী-বল্লভপুরের ভাষায় অন্ত্য-অ-কারের উচ্চারণ বিলুপ্ত।

৪। "Oriya is very closely related to Bengali. West Bengali and Oriya seem to have developed from one from of Magadhi Apabhransa as current in South West Bengal in the 7th-8th centuries." Suniti Kumar Chattopadhay O.D B.L.

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

লোকনাট্যের কাহিনী ও চরিত্র

রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী, ভাগবতের কৃষ্ণকথা, চণ্ডীর মহিষাসুর বধের গল্প, বেদের সূর্যপত্নী সংজ্ঞা, অশ্বিনীকুমার ও বৃত্রাসুরের কাহিনী, চৈতন্যচরিত, চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল-ধর্মমঙ্গলের উপাখ্যান বিংশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত অধিক জনপ্রিয় ছিল বলে নাট্যকারগণ পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক কাহিনীকেই লোকনাট্যের প্রধান অবলম্বন বলে বিবেচনা করতেন। এই সব কাহিনীর মধ্য দিয়ে জনচিত্তের বিশ্বাস অনুযায়ী অলৌকিক শক্তির লীলাখেলা, দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বে দৈবের জয়, ত্যাগ ও দান মাহাত্ম্য, ভক্তিভাবের জাগরণ, ধর্মের জয়, পাপের পরাজয় ও শাস্তি, শাস্ত্রনির্দেশ ও নীতিশিক্ষা প্রভৃতি লোকনাট্যে দেখাবার ব্যবস্থা করা হত। কাহিনীর দিক থেকে রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণাদির যুদ্ধাত্মক ও ভক্তিভাবমূলক ঘটনাবলী প্রধান উপাদান রূপে পালাকারদের অবলম্বনীয় বিষয় ছিল। লোকনাট্যে যুদ্ধের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। এতে দর্শকদের মধ্যে বেশ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। অধিক রাত হওয়ায় আসরে যারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তারাও এই সময় যেন একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। তাই পৌরাণিক পালা ছাড়াও কাল্পনিক বা সামাজিক পালায়ও যুদ্ধের ব্যবস্থা থাকে। ঐতিহাসিক পালার তো যুদ্ধ অপরিহার্য অঙ্গ। পৌরাণিক পালায় জ্ঞান-কর্ম ভক্তিমূলক দার্শনিক সমস্যা, ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের অত্যাচার অস্পৃশ্যতা বর্জন, ধনী ও দরিদ্রের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সামাজিক

সমস্যারও অবতারণা করা হয়। 'মাতৃপূজা'য় স্বাধীনতা কামনা ও দেশপ্রেমকে পরোক্ষরূপে স্থান দিয়ে কুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলী তৎকালের যাত্রায় নূতনত্বের সঞ্চার করেন।

পুরাণ-মঙ্গল কাব্যাদির পার্শ্বে বিংশ শতকের লোকনাট্যে ঐতিহাসিক কাহিনীকে স্থান দেবার চেষ্টা করেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন ও চিতোরের রাণা ভীমসিংহের দ্বন্দ্ব অবলম্বনে 'পদ্মিনী', হিন্দুধর্মত্যাগী ব্রাহ্মণ কালা-চাঁদের কাহিনী নিয়ে 'কালাপাহাড়', মুদ্রারাক্ষসের কাহিনী নিয়ে 'চাণক্য', রণজিৎ সিংহের যুদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে 'রণজিতের জীবন যজ্ঞ' প্রভৃতি ঐতিহাসিক পালা তিনি রচনা করেন। শেষোক্ত পালাটি দেশ প্রেমের জন্য তৎকালীন ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। উনিশ শতকে চয়ে পাগলার 'কালাপাহাড়' ঐতিহাসিক পালা রচিত হলেও যাত্রায় হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বিংশ শতকের প্রথম দশকে ঐতিহাসিক পালার প্রচলন করেন। মথুর সার দলে এই শ্রেণীর পালা অভিনীত হয়ে খুব জনপ্রিয় হতে থাকে। এর ফলে অন্যান্য নাট্যকাররাও ঐতিহাসিক পালা রচনায় মনোনিবেশ করেন। পঞ্চনদ, আদিশূর, দাক্ষিণাত্য নামে তিনটি পালা রচনা করেন ভোলানাথ রায়। ভাস্করপণ্ডিত, টিপুসুলতান প্রভৃতি পালা রচনা করেন পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়। অঘোর কাব্যতীর্থ রচনা করেন মেবারকুমারী। ব্রজেন্দ্র দে রচনা করেন বঙ্গবীর, চাঁদের মেয়ে; কানাই শীল লেখেন দলমাদল নামক ঐতিহাসিক পালা। এই সব ঐতিহাসিক পালার মূল গল্পাংশ ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করলেও লোকচিত্তের চাহিদা মেটাবার জন্য এতে প্রচলিত সংস্কার, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা, ধর্মবোধ, পাপের শাস্তি দেবার রীতি বজায় রেখে কাহিনীতে ঘটনা সন্নিবেশ করা হত। ঐতিহাসিক লোকনাট্যে সতীত্ব, নরনারীর প্রেম, মনুষ্যত্ববোধ, বীরত্ব, ভ্রাতৃ বাৎসল্য, শরণাগতকে আশ্রয় দান, ধর্মানুশীলন প্রভৃতি যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি সমসাময়িক আন্দোলনাদির প্রভাবে দেশপ্রেম, হিন্দুমুসলমানের ঐক্যও এ থেকে বাদ যায় নি। কাজেই পৌরাণিক কাহিনী অপেক্ষা ইতিহাসের বাস্তব কাহিনী উল্লিখিত বিষয়বস্তু নিয়ে লোকচিত্ত জয়ে দ্রুত সমর্থ হল।

দেশমাতার বন্ধন মুক্তির জন্য প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন, স্থানে স্থানে সাময়িক স্বদেশী-সরকার প্রতিষ্ঠা, ইংরেজ সরকার সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নাশ, ভারত উদ্ধার কল্পে বিপ্লবী বীর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূর্বভারত আক্রমণ ও ভারতীয় সৈন্যদের বৃটিশ বিরোধী করে ইংরেজ সরকারের ভিত্তিভূমিতে দ্রুত তীব্র কম্পন সৃষ্টি, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, ধর্মের ভিত্তিতে কৃত্রিম দেশবিভাগের

মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে অশেষ লাঞ্ছনা ও দুঃখ কষ্টের বারি বর্ষণ, প্রকৃত স্বদেশ-সমাজ বিরোধী কালোবাজারী, জোতদার, মুনাফাখোর ও মজুতদারের আকস্মিক অবস্থা স্ফীতি, অন্যায়ের চোরাগলিতে বিচরণকারী বকধার্মিকদের জাগতিক উন্নতি, ব্যক্তি চরিত্রের আদর্শের অবমাননা প্রভৃতির জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে সমাজে এক অশান্ত অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। মানুষ বুঝতে পারে যে কোন অলৌকিক শক্তি এসে তাদের দুর্দশার অবসান ঘটাতে পারবে না। রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্রুত পরিবর্তনের জন্য গণচিত্তে এই বৌদ্ধিক উন্মেষের ফলে মানুষের বাস্তববোধ ক্রমে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে এবং জীবনবোধের মূল্যায়ণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে। কাজেই পুরাণের অলৌকিক কাহিনী জনচিত্তজয়ের সামর্থ হারাতে থাকে, আর ঐতিহাসিক বাস্তব কাহিনী লোকনাট্যের আসরে বিজয় অভিযান চালাতে থাকে। যুদ্ধোত্তর কালে ব্রজেন্দ্রকুমার লেখেন 'বাঙ্গালী', 'সম্রাট জাহান্দার', 'বিচারক, 'দেশের ডাক', সৌরীন্দ্রমোহন লেখেন 'পলাশীর পরে', 'মাটির মা', বিনয়কৃষ্ণ রচনা করেন 'মারাঠা মোগল', 'বীরাঙ্গনা', জিতেন্দ্রনাথ লেখেন 'সম্রাট অশোক', 'দ্বিতীয় পাণিপথ', নন্দ গোপাল লেখেন 'রাণী দুর্গাবতী', কানাই নাথ—'কবরের কান্না', আনন্দময়—'পৃথ্বীরাজ', 'শিবাজী', দেবেন নাথ—'বাপ্পাদিত্য' এবং প্রসাদকৃষ্ণ লেখেন 'মসনদ কার', ভৈরব গাঙ্গুলী রচনা করেন 'অশ্রু দিয়ে লেখা'। থিয়েটার নাট্যকারগণও যাত্রানাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। মন্মথ রায়ের 'দিগ্বিজয়', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'রাষ্ট্রবিপ্লব', মহেন্দ্র গুপ্তের 'রক্তস্নাত দিল্লী', উৎপল দত্তের 'সিপাহী বিদ্রোহ' প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্ত্য বীর ও নেতাদের কাহিনী অবলম্বনেও ঐতিহাসিক যাত্রা পালা আসরে পরিবেশিত হতে থাকে। এই শ্রেণীর নাটক হচ্ছে শম্ভু বাগের 'হিটলার', 'লেনিন' ও রমেন লাহিড়ীর 'রাহুমুক্ত রাশিয়া'।

যুদ্ধোত্তর কালে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার লাভ এবং স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার ফলে দেশের জন্য সর্বত্যাগী বিপ্লবী ও অতীতের রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। এর ফলে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র, মহাত্মাগান্ধী, বিনয়-বাদল-দিনেশ, বাঘা যতীন, সূর্য সেনকে অবলম্বন করে লোক -নাট্য রচিত হয়। গান্ধী ও অহিংসানীতি অবলম্বনে ব্রজেন্দ্রকুমারের ধরার দেবতা, সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে মায়ের ডাক, আজাদহিন্দ ফৌজ অবলম্বনে পূর্ণচন্দ্র দাসের স্বপ্ন-সাধনা, সুভাষচন্দ্রের সংগ্রাম অবলম্বনে জিতেন বসাকের বিদ্রোহী বাঙ্গালী, পশুপতি

চট্টোপাধ্যায়ের বাংলার বিপ্লবী ছেলে ক্ষুদিরাম, নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর বিপ্লবী কানাইলাল, ব্রজেন দে'র সূর্যসেন, বীরু মুখোপাধ্যায়ের বাঘা যতীন, নরেশ চক্রবর্তীর বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রভৃতি নাটকের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলার জনজীবনে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। ভারতের মুক্তি সাধনায় আজাদহিন্দ ফৌজের কর্মাবলী সুভাষ জীবনের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অধ্যায়। তাঁর নিঃস্বার্থ উদার দৃষ্টিভঙ্গি, গঠন নৈপুণ্য, দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে অভাবনীয় কঠোর ও বীরত্বপূর্ণ সাধনা দেশবাসীকে আভিভূত করেছে। তাই নেতাজীকে নিয়ে একের পর এক পালা রচনা করে লোকনাট্যকারগণ জনগণের চাহিদা মিটিয়েছেন।

উনিশ শতকে স্বদেশীভাবের পালা যাত্রায় রচিত হয় নি। বিশ শতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে স্বদেশী ভাবাত্মক কাহিনী নিয়ে যাত্রাপালার রচয়িতা ও প্রয়োগকার ছিলেন মুকুন্দ দাস। আর কোন যাত্রা লেখক স্পষ্টভাবে এই সময়ে এই পথে পদক্ষেপ করেন নি। কুঞ্জ গাঙ্গুলীর মাতৃপূজায়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের রণজিতের জীবন যজ্ঞ এবং ভোলানাথ রায়ের জরাসন্ধ পালার কাহিনীতে প্রচ্ছন্নভাবে স্বদেশানুরাগ পরিবেশিত হয়। স্বদেশী আন্দোলন যখন প্রবল তখন কিন্তু যাত্রার আসরে দেশাত্মবোধ পরিবেশনের প্রতি পালাকারগণের প্রকাশ্য চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় নি। অথচ জনজাগরণের জন্য ঐ সময়ই এর প্রয়োজন ছিল অধিক। এ বিষয়ে মুকুন্দদাস ছিলেন ব্যতিক্রম। যাত্রায় স্বদেশী নাটক প্রযোজনায় মুকুন্দদাস পথিকৃৎ। যাহোক এদিক থেকে যাত্রাপালা থিয়েটারী নাটকের চেয়ে যে পশ্চাতে পড়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

স্বাধীনতা লাভের পরে যাত্রায় যে স্বদেশীভাবাত্মক ও রাজনৈতিক কাহিনী নিয়ে অনেক পালা রচিত হয়েছে তার একটি কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আরএকটি কারণ চলচ্চিত্রের প্রভাব। স্বাধীনতা লাভের সমসাময়িক কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত দেশাত্মভাব-মূলক বিপ্লবী কাহিনী নিয়ে অনেক ছায়াচিত্র রচিত হয়েছে। সুধীরবন্ধুর বন্দেমাতরম্ (১৯৪৬), সতীশ দাসগুপ্তের পথের দাবী, হেমেন দাশগুপ্তের ভুলি নাই, নির্মল চৌধুরীর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, হিরন্ময় সেনের বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, বিমল রায়ের নীলদর্পণ, অমর দত্তের সিরাজদ্দৌলা, বারীন দাসের মহারাজ নন্দকুমার, পীযূষ বসুর সুভাষ চন্দ্র, নির্মল চৌধুরীর চারণকবি মুকুন্দদাস (১৯৬৮)—ছায়াচিত্রগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। এই শ্রেণীর ছায়াচিত্র প্রচলিত হওয়ায় যাত্রাও এই জাতীয় বিষয়বস্তু কাহিনীতে স্থান পেতে শুরু করে। সাময়িক

কালের যুদ্ধ কাহিনীও যাত্রায় বিধৃত হয়েছে। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে জিতেন বসাক রচনা করেন ডাকিনীর চর এবং চৈনিক আক্রমণের পটভূমিকায় ব্রজেন দে লেখেন রক্তের নেশা।

লোকনাট্যে সামাজিক পালা রচনার পথপ্রদর্শক চারণ কবি মুকুন্দ দাস। তিনি সামাজিক যাত্রা গেয়ে চারণ কবির দায়িত্ব পালন করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে শুরু করে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুকুন্দদাস সমগ্র বাংলা দেশকে স্বদেশী যাত্রায় মাতিয়ে তুলেছিলেন। গান ও বক্তৃতা অবলম্বনে সামাজিক স্বদেশী যাত্রা পরিবেশনে তাঁর বিশেষ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই অত্যধিক জনপ্রিয় যাত্রা পরিবেশকরূপে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সামাজিক পালার মধ্য দিয়ে তিনি স্বদেশীভাবের উদ্বোধন করতে চেষ্টা করতেন। যাত্রা গেয়ে তিনি রাজরোষে পতিত হন। মুকুন্দ দাসের পরে যাত্রায় সামাজিক পালা রচিত হতে শুরু করে যুদ্ধোত্তরকালে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই শ্রেণীর প্রথম নাটক কানাইলাল শীলের দেশের দাবী। এই প্রসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র দাসের শৃঙ্খল মোচন, সৌরীন্দ্র মোহনের নূতন জীবন, সত্যপ্রকাশের অঙ্গার, ভৈরব গাঙ্গুলীর একটি পয়সা, পদধ্বনি, শম্ভু বাগের ঘুমভাঙার গান প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। জমিদারী প্রথার বিলুপ্তি, কৃষক-শ্রমিক-মজদুর সমস্যা, মুনাফাখোর, মজুদদার, চোরাকারবারী, কলোবাজারী, শোষণ, নির্যাতন, জীবনের অভাব অভিযোগ প্রভৃতির কথা নিয়ে এই সব পালা রচিত হয়েছে।

সামাজিক পালায় যুদ্ধ ও পোষাক পরিচ্ছদের বিশেষ জাঁকজমক থাকে না বলে এই শ্রেণীর পালা দেখে জনচিত্ত বিশেষ তৃপ্ত হয় না। তাই পূর্বে লোকনাট্যে সামাজিক পালার তেমন প্রচলন হয় নি। যুদ্ধ ও পোষাকের জৌলুষ বজায় রেখে লোকনাট্যকারগণ কাল্পনিক পালা রচনায় মনোনিবেশ করেন। সামাজিক ও কাল্পনিক পালার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সামাজিক কাহিনী পুরাণের অলৌকিক বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাহিনী নয়। এটা কবি কল্পিত অথচ লৌকিক। অর্থাৎ সামাজিক মানুষের সম্ভাব্যতার মাত্রা বজায় রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কাহিনী কবি-কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাই-ই সামাজিক কাহিনীরূপে গৃহীত হতে পারে। এ জাতীয় কাহিনী নিয়ে রচিত নাটককে সামাজিক নাটক বলা যায়। কাল্পনিক নাটকের কাহিনীও কবি কল্পিত। কিন্তু এতে সম্ভাব্যতার মাত্রা সর্বত্র বজায় থাকে না। বাস্তবতা সম্পর্কে Suspense of disbelief দেখা দেয় না বলে চরিত্র ও ঘটনার সংগে জাগতিক সাদৃশ্য সব সময় অনুভূত হয় না। কাল্পনিক নাটকে প্রচলিত ধর্ম ধারণা, ন্যায়-অন্যায়

বোধ ও সামাজিক সমস্যাবলীর অবতারণা করা যেতে পারে। কাল্পনিক যাত্রায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। পালার এ সব অংশে ভাবের দিক থেকে কিছুটা বাস্তবতা অনুভূত হওয়া সত্বেও এই শ্রেণীর নাটককে ঠিক সামাজিক বলা যায় না। সামাজিক নাটকে রূপগত বাস্তবতা ও ভাবগত বাস্তবতা দুইয়েরই প্রয়োজন। এ জাতীয় কাল্পনিক পালায় ঠিক তা থাকে না বলে একে রোমান্টিক পালা বলা যেতে পারে। সামাজিক পালার সঙ্গে যাত্রার কাল্পনিক পালার প্রধান পার্থক্য রাজারাণী, মন্ত্রী-সেনাপতি চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিক পালার মত সামাজিক পালায় এদের স্থান নেই। তাই সামাজিক পালায় যুদ্ধের আকর্ষণ বজায় রাখা সম্ভব হয় না। রাজা, রাণী, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি চরিত্র নিয়ে রাজসিক পরিবেশ সৃষ্টি করে কাল্পনিক পালার মধ্য দিয়ে যাত্রায় যুদ্ধ ও পোষাকের আকর্ষণ বজায় রাখতে চেষ্টা করা হয়। যাত্রায় এই শ্রেণীর রোমান্টিক নাটককে ছদ্ম-ঐতিহাসিক (Pseudo historical) নাটক বলা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পৌরাণিক পালার আকর্ষণ কমতে থাকায় এই শ্রেণীর কাল্পনিক কাহিনীযুক্ত পালার আকর্ষণ বাড়তে থাকে। এই জাতীয় পালার মধ্যে ব্রজেন্দ্রকুমারের যাদের দেখে না কেউ, নন্দগোপালের মিলন সেতু, বিনয়কৃষ্ণের বেইমান, জিতেন্দ্রনাথের জয়যাত্রা, কানাই নাথের কে কাঁদে, দেবেন্দ্র নাথের যাত্রা হল সুরু প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

সাম্প্রতিককালে যাত্রায় জীবনী নাট্য পরিবেশিত হতে শুরু করেছে। বিধায়ক ভট্টাচার্যের মাইকেল মধুসূদন, মহেন্দ্রগুপ্তের দাদাঠাকুর, ব্রজেন্দ্রকুমারের করুণা-সিন্ধু বিদ্যাসাগর, সৌরীন্দ্রমোহনের রাজা রামমোহন প্রভৃতি যাত্রার জীবনী নাট্যের উদাহরণ।

কথা সাহিত্যের যাত্রারূপও এখন আসরে উপস্থিত হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরানীর হাট, শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ, তারাশংকরের সপ্তপদী প্রভৃতির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

যাত্রা পালায় প্রেমমূলক ঘটনা ও হাস্যরসাত্মক পরিবেশ অপরিহার্য। যাত্রার কাহিনীতে তলোয়ার, চাবুক, পিস্তলের ছড়াছড়ি। উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি ও যুদ্ধ যে যাত্রাপালায় একান্ত প্ররোজনীয়। অনেক পালায় আবার একাধিক যুদ্ধও উপস্থাপিত করা হয়। এর কাহিনীতে অতি নাটকীয় পরিস্থিতি, স্থানকাল বিবেচনা না করে পাত্রপাত্রীর উপস্থাপনা, আকস্মিকতা, এবং অবাস্তব পরিকল্পনা প্রায়ই দেখা যায়; পালাকারগণ সম্ভাব্যতার প্রতিও সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখেন না। এ সবের

পশ্চাতে রয়েছে রচয়িতার দুর্বল চিন্তা ও পরিকল্পনা।

লোকনাট্যে চরিত্র সমাবেশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মানসিক দ্বন্দ্বের বাহ্যিক রূপদান করার জন্য অথবা কর্তব্য, ন্যায়ধর্ম ও শ্রেয়ের পথনির্দেশ করার জন্য বিবেক জাতীয় চরিত্র, ফকির, পাগল, চারণ কবি প্রভৃতির ভূমিকা যাত্রা নাট্যে সন্নিবেশিত হয়। পূর্বে আদিরসাত্মক নৃত্যগীতি পরিবেশনের জন্য নর ও নারী চরিত্র পালায় সংযোজিত হত। এসব নরনারী চরিত্রের সঙ্গে মূলকাহিনীর কোন যোগ থাকত না। বর্তমানের পালা থেকে এ জাতীয় চরিত্র বিদায় গ্রহণ করেছে। 'একানেবালক' চরিত্র যাত্রার আর একটি বিশিষ্টতা। এর সঙ্গে কখনো পালার কাহিনী অংশের অবশ্য যোগ থাকে কখনো বা তা থাকেনা। তথাপি গীতি পরিবেশন করে বলে অনেক পালায় এ জাতীয় চরিত্র এখনো দেখা যায়। স্নেহ-পরায়ণা সতী, প্রেমিকা, অত্যাচারী রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণকারিনী, স্বামীর অত্যাচার সহকারিনী, ভক্তিমতী, দেশপ্রেমিকা, নারী চরিত্র যেমন লোকনাট্যে থাকে, তেমনি ক্ষমতালোভী, ঈর্ষাপরায়ণা, সপত্নী বিদ্বেষময়ী স্ত্রীচরিত্রও পালায় সংযোজিত হয়। কামাচারী নারীচরিত্র যাত্রাপালায় কদাচিৎ দেখা যায়।

প্রচ্ছন্ন ভক্তিমান দেব-দ্বেষী দৈত্য বা রাক্ষস, রাজা-মন্ত্রী-সেনাপতি চরিত্র এক সময় লোকনাট্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হত। যাত্রাপালায় বয়স্য চরিত্র কেবল হাস্যরস পরিবেশন করত। পূর্বে এ জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে সাধারণত নাট্য-কাহিনীর বিশেষ সংযোগ থাকত না। বর্তমানে অনেক লেখক হাস্যরসের চরিত্রকে নাট্যকাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত করে দেবার চেষ্টা করছেন। মন্ত্রী সেনাপতি চরিত্র অধিকাংশ স্থলে চক্রান্তকারী রূপে চিহ্নিত হয়। কদাচিৎ এদের কর্তব্যপরায়ণ ও কৃতজ্ঞ বলে মনে হয়। অত্যাচারী রাজা-জমিদার, স্বার্থান্ধ দেওয়ান-নায়েব, সুবিধাবাদী সমাজ-পতি, ভ্রাতৃদ্রোহী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, নারীলোলুপ, কুসীদজীবী, বীভৎসভাবের কাপালিক লোকনাট্যে জায়গা জুড়ে বসে। আবার কর্তব্যপরায়ণ, ভ্রাতৃবৎসল, জনসেবী, স্বার্থত্যাগী, সহনশীল, প্রভুভক্ত চরিত্রাদিও এতে স্থান লাভ করে। দস্যু গুণ্ডা চরিত্র প্রায়ই লোকনাট্যে দৃষ্ট হয়। এ সব চরিত্র অধিকাংশ স্থলে পরোপকার বৃত্তি, শরণাগত রক্ষণ ও সাধারণ মনুষ্যত্ববোধের অধিকারী রূপে চিহ্নিত হয়। শোষণ, পীড়ন, অত্যাচারের কবল থেকে জনগণকে মুক্ত করার জন্যও নাটকে দস্যু চরিত্রের অবতারণা করা হয়। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য দৃঢ় করার জন্য ধর্মদ্বেষহীন মুসলমান শাসক, ধর্মান্ধ হিন্দু-মুসলমান, কালোবাজারী, চোরাকারবারী, মজুদদার, মুনাফাখোর

প্রভৃতি চরিত্র দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালের পালায় দেখা দিয়েছে। সমাজ সংস্কারক ও জনজাগরণের দৃষ্টি নিয়েও লোকনাট্যে কিছু চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে — বিশেষত মুকুন্দদাসের পালায়। পল্লী অঞ্চলের অশিক্ষিত বা শিক্ষিত কল্প সাধারণ জনগণের বোঝার সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে লোকনাট্যে চরিত্র সংযোজন করা হয় বলে এতে জটিলতা কম থাকে। চরিত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকলেও এক একটি চরিত্র এক একমুখী হয়ে ওঠে।

লোকনাট্যের মূল উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা ও আনন্দ পরিবেশন। এ দুটির কোন একটিকে বাদ দিলে লোকনাট্যের স্বধর্মচ্যুতি ঘটে। তাই পালার কাহিনী সন্নিবেশে এ দুয়ের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক যে কোন প্রকার পালাই হোক না কেন এতে লোকশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। তদনুসারেই চরিত্রেরই পরিণতি দেখানো হয়। লোকশিক্ষার জন্য চরিত্রের ভালমন্দ বিচারে সূক্ষ্ম দার্শনিকতা বা ন্যায় শাস্ত্রের গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না; জনগণের সাধারণ ন্যায়-অন্যায় ও মনুষ্যত্ববোধই এই বিচারের মাপ কাঠি।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

শিক্ষা পরিকল্পনায় সঙ্গীত

সঙ্গীত আজকাল কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেয়েছে এটা বোধ করি অনেকের কাছেই আশা এবং আনন্দের বিষয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত তো বলতে গেলে প্রাধান্যই স্থাপন করেছে। তথাপি প্রকৃত সঙ্গীতশিক্ষা কতখানি সার্থক হয়ে উঠেছে সেটি বিচার্য বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতশিক্ষা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করতে গেলে দুটি বিষয় মনে উদিত হয়, একটি — সঙ্গীত এখনও বিদ্যার অপরাপর শাখার মত সম্মানিত নয়; অপরটি — সঙ্গীত শিক্ষার পরিকল্পনাটা কিভাবে কার্যকর হবে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে প্যারেন নি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি মনে করে সঙ্গীতকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন জানি না, কিন্তু বিষয়টির প্রতি আদৌ গুরুত্ব প্রদান করেছেন কিনা সন্দেহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপানো কাগজে প্রশ্নপত্র ছাপা হচ্ছে, পরীক্ষাও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে হচ্ছে; সার্টিফিকেট, ডিগ্রী সবই হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ফর্মে পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু তথাপি যাঁরা এর ভিতরে আছেন তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন যে সঙ্গীত এই স্বীকৃতি সত্বেও অপাংক্তেয় — একটা তুচ্ছ বাড়তি সংখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিভাগের তথাকথিত প্রিন্সিপাল, অধ্যাপকসমূহ খুব ভাল করেই জানেন যে তাঁদের মান মর্যাদা অপরাপর বিভাগীয় প্রধানদের বা অধ্যাপকদের মত নয়। একটা বিভাগ খোলা হয়েছে, রাখতে হবে—এই কারণেই তাঁদের অস্তিত্ব নতুবা তাঁদের গুরুত্ব নেই। ফলে

যা হবার তাই হচ্ছে। লোক দেখানো একটা সঙ্গীত শিক্ষা ছাড়া সেখানে আর কোনও যথার্থ একাডেমিক কাজে সাফল্য অর্জিত হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সঙ্গীত সম্বন্ধে কি ভাবেন সেটা আমাদের গোচরে যে আসে না তা নয়, বহু সংবাদ এমন ব্যক্তিরা আমাদের জানিয়ে আসছেন যাঁরা শ্রদ্ধেয় এবং অভিজ্ঞ। তাঁদের কথাগুলি উড়িয়ে দেবার মত নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যাঁরা কর্ণাধার তাঁদের ধারণা সঙ্গীত বিভাগে যাঁরা আছেন শিক্ষার দিক দিয়ে তাঁদের যোগ্যতা অকিঞ্চৎকর। সঙ্গীত জগতে এম-এ পাশ কজন আছেন? সুতরাং এই সব ব্যক্তি যা করেন তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা বৃথা এবং তাঁদের অধ্যাপকের মর্যাদা দেওয়াটাও বোধ করি বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁরা গান বাজনা জানেন, ওইটুকুই করে যান, আর বেশী চাইতে আসেন কোন সাহসে? অপর পক্ষে ফরেন ডিগ্রী, ডিপ্লোমা নিয়ে কত পণ্ডিত ব্যক্তির চুল পেকে যায় রীডার হতে। তাঁদের কাছে এঁরা? এঁদের সঙ্গে তাঁদের এক করে দেখা কোন মতেই চলতে পারে না। সুতরাং এঁদের মর্যাদা প্রদান করতে গেলে অপর বিভাগগুলির বুকে জ্বালা ধরে, নানারকম আপত্তি ওঠে, ফলে সঙ্গীত বিভাগের উন্নতি আর ঘটে ওঠে না। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সঙ্গীত জগতের এমন সব ব্যক্তিকে সরকারী বড় বড় খেতাব দেওয়া হয়েছে, যাঁদের একমাত্র শিল্পীসুলভ কারিগরী দক্ষতা ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন কিন্তু এসব প্রশ্ন ওঠেনি কারণ সরকার যে সমদর্শী এটা সবাইকে না দেখালে তার মহত্ব অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সঙ্গীত জগতে হয়ত খুব একটা উচ্চশিক্ষিত ডিগ্রীওয়ালা ব্যক্তি নেই, কিন্তু তাঁরা কি দাবী করছেন যে তাঁরা রিটায়ার করবেন না? তাঁরা যে চেষ্টা করছেন তা তো পরের জেনারেশনের জন্যই। উচ্চশিক্ষার একটা সোপানই তো তাঁরা প্রস্তুত করে দিতে চাইছেন যা পরবর্তীকালের আচার্যেরা আরও উঁচু করে গড়ে তুলবেন। আপাততঃ যাঁরা অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন তাঁদের দিয়েই তো সংগঠনের কাজ আরম্ভ করতে হবে। তাঁদের সাহায্য করতে কেউ অগ্রসর না হন তাহলে তাঁরাই বা অগ্রসর হবেন কিভাবে? সঙ্গীত জগতে আশানুরূপ ভাল ছেলেমেয়ে আসেনা,—সেটা হয়তো নৈরাশ্যজনক হতে পারে, কিন্তু এটাও তো ভেবে দেখতে হবে, সঙ্গীতে পাশ করে তারা কোথায় ভাল চাকরি পাবে? সঙ্গীতকে প্রোফেশন করে এখনও তেমন ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায় না। সঙ্গীত বিষয়ে একটা টিচার্স ট্রেনিং বিভাগ ছিল, সেখান থেকে পাশ করে বেরুলে কিছু চাকরি পাওয়া যেত, কয়েক

বৎসর হল সেটাকে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রতিকার করতে না পারলেই কোনও একটি সংস্থাকে উঠিয়ে দিই, কিন্তু প্রবর্তন করবার মত ধৈর্য্, আস্থা, মনোবল ও সামর্থ্য আমাদের নেই। অতএব, ভাল ছেলেমেয়ে সঙ্গীতে ডিগ্রী নিতে আসবে কেন? যদি সেরকম স্কোপ থাকত তাহলে মোটামুটি ভাল ছাত্রছাত্রী সঙ্গীতেও আসত বই কি। সেই স্কোপের ব্যবস্থাটা করবে কে? সঙ্গীত শিক্ষাই তো ইউনিভার্সিটির হাতে মার খেয়ে যাচ্ছে। এই সেদিনের "লাইব্রেরিয়ানশিপ" আজকের উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তু, চেষ্টা করে তাকে গঠন করতে হয়েছে। এগ্রিকালচার-এর জন্য আজ একটা আলাদা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সকলেই এ সব সাবজেক্ট্-এর প্রয়োজনীয়তা বোঝেন; কিন্তু "মিউজিক" আজও অপাংক্তেয়, তার স্বীকৃতি আজও হল না,—কেননা তার "এণ্টারটেনমেণ্ট ভ্যালু" ছাড়া আর কোন ভ্যালু আছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মনে হয় না।

আসলে সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একটা সম্যক ধারণা নেই। সঙ্গীতের পরিধি যে কত ব্যাপক তার একটা উদাহরণ দিই। সামগান সম্বন্ধে আজকে একটা বিরাট গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কিন্তু সেটা করতে গেলে সঙ্গীত শাস্ত্রের জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলি কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারা যাবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতি গান বা গ্রামগেয় গানগুলির স্বরূপ না বোঝা যায়। আসলে এটি সঙ্গীতের আওতায় পড়ে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সাহিত্যকে বুঝতেও সঙ্গীতের দরকার হয়। এ যুগে বাংলায় গজল এবং কাওয়ালী রীতিতে গান গাওয়ার প্রচলন হয়েছে। এটি ভালভাবে আরও করতে গেলে উত্তম ফারসি বা উর্দু গজল এবং কবিতার সুরেলা আবৃত্তি শুনে একটি ধারণা করতে হয়। সঙ্গীত কেবলমাত্র তিন-তাল এক ফাঁকে গাওয়া ছোট খেয়াল বড় খেয়াল নয়, বা কতকগুলি লিরিক-এর সুর কণ্ঠস্থ করা নয়, তার বড় বড় চিন্তার দিক রয়েছে। সেগুলি উদ্ঘাটন করতে পারলে নানা বিষয়ের জটিল সূত্র উন্মুক্ত হতে পারে। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব —এই সব নানা দিক থেকে স্টাডি করবার বস্তু সঙ্গীতে আছে; তাই সঙ্গীতকে একটি বৃহৎ সাবজেক্ট্ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চমানে বিচার করা দরকার।

এ সম্বন্ধে অবশ্য কয়েকটি প্রশ্ন উঠতে পারে যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সঙ্গীতের শিক্ষাসূচী কিভাবে প্রবর্তিত হবে। এর প্রয়োগের দিকটা কতখানি থাকবে আর তত্ত্বের দিকটাই বা কতখানি থাকবে। নিছক সাঙ্গীতিক তত্ত্ব ছাড়াও আরও বহু একাডেমিক তত্ত্ব সঙ্গীতের সঙ্গে জড়িত—সেগুলিই বা কিভাবে এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সঙ্গীতশিক্ষার পূর্বে শিক্ষার্থীর সঙ্গীত ও সাধারণ শিক্ষার একটা ভিত্তি থাকা দরকার। তাকে উচ্চমাধ্যমিকের মান পর্যন্ত পড়াশোনা করতেই হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীতে মোটামুটি জ্ঞান তাকে অর্জন করতেই হবে। এর পরে আসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। এই শিক্ষার মধ্যে প্রযুক্ত বিদ্যার প্রাধান্য থাকবে এটা নিশ্চয় কেননা শিক্ষার্থীর পক্ষে শিল্পে দক্ষতা অর্জন করাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। এ ছাড়া তার সুর-রচনা বা কম্পোজ করবার যোগ্যতা অর্জন করাটাও বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের সঙ্গীতে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষাও খুবই দরকার। ছেলেমেয়েরা যাতে এই সব কাজে প্রবৃত্ত হতে পারে সেই জন্য তাদের চিন্তায় স্বকীয়তা ও স্বাবলম্বিতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই কোর্সকে অযথা প্রলম্বিত করবার প্রয়োজন নেই; কারণ তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে একটা "বেসিক আইডিয়া" নিয়ে। পরের ব্যাপারটা অনেকটা অভ্যাস সাপেক্ষ। একটা রাগ শিখতেই বহু বৎসর কেটে যায় —এই জাতীয় ওস্তাদসুলভ ধারণা পরিহার করাই কর্তব্য।

প্রশ্নটা জটিল হচ্ছে যখন আমরা তত্ত্বের দিকে আসি। সঙ্গীতে বিজ্ঞানের দিকটাও কম প্রধান নয়। সায়েন্সের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীতের একটি কোর্স নির্ধারণ করাও দরকার। আমরা এদিকটায় বিষম পেছিয়ে আছি। যারা বিজ্ঞানে প্রবেশিকা পাশ করেছে এবং সঙ্গীতেও জ্ঞান অর্জন করেছে তারা সাধারণ সঙ্গীতশিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হতে পারে। এতে করে তারা বাদ্যযন্ত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবনার পথ খুঁজে পাবে এবং সঙ্গীতের ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান লাভ করবে যার ফলে আমদের অর্কেস্ট্রা নতুন নতুন রূপ নিতে পারে। এই শিক্ষাক্রম অনুসারে তাদের বি-এস-সি (মিউজ) ডিগ্রী দেওয়া যেতে পারে। সঙ্গীতকলায় যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের সংস্কৃত জানা দরকার। এর কারণ ভারতীয় সাহিত্য বলতে সংস্কৃতকেই বোঝায় এবং পূর্বে যা কিছু চিন্তা হয়েছে তা সংস্কৃত সাহিত্যেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতএব সংস্কৃত সাহিত্যে মিউজিকলজি সম্বন্ধে যে গ্রন্থ আছে তার একটা সিলেকশন প্রণয়ন করা দরকার। আর সেই সঙ্গে বৈদিক সঙ্গীত সম্বন্ধেও অনুরূপ সিলেকশন প্রণয়ন করা কর্তব্য। এর জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে, কারণ বিষয়টি সংস্কৃতজ্ঞে পণ্ডিতদের কাছেও খুব সুগম নয়। বাংলায় বৈদিক সঙ্গীতের কোনও ট্রাডিশন না থাকায় কাজটা আরও কঠিন হয়েছে। এক পক্ষে এটা ভালই হয়েছে কেননা যেখানে ট্রাডিশন আছে সেটা কতখানি শুদ্ধ সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। এই সব তথাকথিত ট্রাডিশন অনেক ক্ষেত্রেই বৈদিক শিক্ষা, ব্রাহ্মণ বা প্রাতিশাখ্যের নির্দেশের

সঙ্গে মেলে না। শাস্ত্রীয় মতে তথাকথিত বৈদিক সঙ্গীতের স্বরূপ কি হওয়া উচিত সেটাই নির্ণয় করা আবশ্যক। সংস্কৃত আমাদের যেরকম জানা দরকার সেই রকম ফারসি সাহিত্যে অধিকার থাকাটাও কর্তব্য মনে করি। শত শত বৎসর ধরে ফারসি ভাষায় ভারতীয় চিন্তা বিধৃত হয়েছে, এর মধ্যে সঙ্গীতেও একটি বড় স্থান দখল করে আছে। অতএব মূল ভারতীয় ফারসি সাহিত্যে সঙ্গীত বিষয়ক যে সব আলোচনা আছে তারও একটি সিলেকশন প্রণয়ন করা আবশ্যক। উদাহরণ স্বরূপ আইনে আকবরী, রাগদর্পণ, তুহ্‌ফাতুল্‌ হিন্দ্‌ প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। সমগ্র মধ্য যুগের ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে যা কিছু জানবার আছে তার অনেকখানি এই সব ফারসি গ্রন্থ থেকে জানা যায়। এটা আমার কাছে অদ্ভূত ঠেকে যে আমরা এত -দিনের পরিচিত ফারসি ভাষা ভুলে গেছি। আমরা ফরাসী, জর্মন, স্প্যানীয় ভাষা সম্বন্ধে বিপুল আগ্রহ পোষণ করি কিন্তু এশিয়ায় আমাদের পরিচিত ভাষা ফারসি সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ পোষণ করি না। আমাদের ঐতিহ্যকে জানতে গেলে বা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গীত সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গেলে ফারসি এবং আরবী ভাষায় জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। ইউরোপ, অ্যামেরিকায় আমাদের সঙ্গীত নিয়ে হৈ চৈ করবার খুব একটা প্রয়োজনীয়তা নেই, কিন্তু সমগ্র মধ্য প্রাচ্যে পরিভ্রমণ করে আমাদের সঙ্গীতের সঙ্গে এই ভূখণ্ডের সঙ্গীতের তুলনাত্মক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। অথচ, এ বিষয়ে আমরা যে তেমন চিন্তা করি তার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বলা বহুল্য, এর সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করাও দরকার তা না হলে সঙ্গীতকে সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যাবে না।

সঙ্গীত বিষয়টি এত ব্যাপক যে এটি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গেও কিছুটা যুক্ত হয়ে গেছে। যেমন, বাংলা সাহিত্যে অনেকে সঙ্গীত সম্বন্ধে কাজ করতে আরম্ভ করেছেন। লোকসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে লোকসঙ্গীত স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। এইভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের স্কলারগণও সঙ্গীতকে তাঁদের বিশেষ আলোচনার বস্তু করতে পারেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দিক থেকে সাঙ্গীতিক আলোচনা উত্থাপন করা যায়। সঙ্গীতের কোর্স-এ এত অধিক বিষয়বস্তু যোগ করা সম্ভব নয়; কিন্তু শিক্ষার্থীরা যাতে এই ব্যাপকতা উপলব্ধি করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। তাহলে যাঁর যেদিকে কৌতূহল সে সেদিকে কাজ করতে পারবে।

অনেক সময় অন্য ডিসিপ্লিন-এ অধ্যয়নকারী কোনও ব্যক্তি এমন কোনও

আলোচনা বা গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন যা প্রধানতঃ সাঙ্গীতিক। সেই সময়, আমার মনে হয়, তাঁরা ইউনিভার্সিটির সাঙ্গীতিক বিভাগ থেকেও সাহায্য নিতে পারেন, কিন্তু তাদের সঙ্গীতে যথেষ্ট জ্ঞান আছে কিনা সেটা যাচাই করে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে তাঁরা সঙ্গীতের একটা বিধিবদ্ধ কোর্সেও ট্রেনিং নিতে পারেন। এই রকম ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই রকম আদান প্রদান না হলে সঙ্গীতের কোর্স ঠিক কি ভাবে প্রবর্তন করা দরকার সেটা বোঝা যাবেনা। আর, সঙ্গীতবিভাগে এইরূপ নানা বিষয়ের উচ্চতর স্টাডির-সুযোগ থাকলে সঙ্গীতও সাবজেক্ট্ হিসাবে গুরুত্ব অর্জন করবে।

সঙ্গীতের মত মিশ্র বিদ্যা সম্পর্কে সিলেবাস নির্ণয় করা খুব কঠিন। এই জাতীয় আরও বহু বিদ্যাতেও এই রকম সমস্যা দেখা দেয়। কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে দেখা যায় অনেক সময় এই বিভাগের অনেক পঠন-পাঠন কেমিস্ট্রি, বটানি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে হচ্ছে। এই সব বিষয় একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এই রকম ঘটে এবং সঙ্গীতবিভাগের অনেক কাজও অন্যবিভাগে হতে দেখা যায়; অথচ তাতে সাবজেক্ট্ হিসাবে সঙ্গীতের গুরুত্ব কমে না। অবশ্য যদি সঙ্গীত সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গবেষণা করবার জন্য কেবলমাত্র বিভিন্ন বিভাগের স্কলারদের নিয়ে কোনও ইনস্টিটিউট স্থাপন করা যায় তাহলে সেখানে এই ধরণের ব্যাপক কাজ চলতে পারে; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যে যার বিষয় নিয়েই কাজ করে যাবেন; এক বিষয়ের শিক্ষার্থী প্রয়োজনবোধে অন্য বিভাগের সাহায্য নিতে পারেন। এইটুকু সুবিধাই সেই ক্ষেত্রে সম্ভব। এই রকম ইনস্টিটিউট যদি স্থাপন করাও যায় তাহলেও সেখানে বিদ্যা অনুসারে নানা বিভাগকে পৃথক্ ভাবে রাখতেই হবে। অর্থাৎ, এই ধরণের ইনস্টিটিউটের মূল বিষয়টি সঙ্গীত হলেও অ্যান্থ্রপলজি, হিস্টরি, সোসিয়লজি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ রাখতেই হবে। এরকম একটি ইনস্টিটিউটের অবশ্য প্রচুর সম্ভাবনা এবং সার্থকতা আছে কিন্তু সেটা কি এদেশে সম্ভব হবে? কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণে গভর্ণরের উপস্থিতিতে একটি আলোচনা সভায় কেবলমাত্র লোকসংস্কৃতি বিষয়ে একটি এই ধরণের ইনস্টিটিউট গঠন করবার প্রস্তাব হচ্ছিল। লোকসংস্কৃতিরও এইরকম বিভিন্ন দিক আছে যার মধ্যে সঙ্গীত একটি। কিন্তু, যদি সঙ্গীতকে অবলম্বন করেই একটি পূর্ণতর ইনস্টিটিউট স্থাপন করা যায় তাহলে লোকসঙ্গীতও তার একটি বিশেষ বিভাগ হিসাবে গণ্য হতে পারে।

যে প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র সঙ্গীতকলাকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থী-

দের প্রধানতঃ সঙ্গীতশিল্পী করে তোলাই উদ্দেশ্য সেখানে থিওরী অংশ নির্ণয় করতে হবে প্রযুক্ত বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে। গান বাজনায় যে সব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলির উত্তম ব্যাখ্যা, সঙ্গীতকলার প্রয়োগে অন্যান্য বিষয় এই তত্ত্বের আওতায় পড়বে। প্রয়োগের পরিকল্পনা অংশটিই হচ্ছে থিওরি। অতএব প্রযুক্ত সঙ্গীতশিক্ষার ক্ষেত্রে এইটিই হবে মুখ্য আলোচ্য বস্তু। বাজারে অনেক টেক্স্‌ট্‌ বুক থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত আলোচনা বা সংজ্ঞা নিরূপণের-চেষ্টা খুব কম গ্রন্থেই দেখা যায়। সঙ্গীত-কলার-ক্রমপরিণতি কোন কোন চিন্তা এবং আদর্শকে অধিকার করে হয়ে এসেছে সে সম্বন্ধে একটি সম্যক এবং পরিপুষ্ট ধারণা করবার মত পুস্তক প্রণয়ন করা আবশ্যক। শিক্ষার্থীরা যে বস্তুটি কার্যতঃ শিখবে তার চিন্তাগত দিকটি যদি সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করতে পারে এবং যেখানে তাদের মনে প্রশ্ন উঠছে বা যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দরকার তার সমাধান যদি তারা পাঠ্যপুস্তকে খুঁজে পায় তাহলে দেখা যাবে থিওরীর দিকটি ক্রমেই পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছে।

এই সব নানা দিক ভেবে সঙ্গীতকে আজ একটি যথার্থ সম্মানিত বিদ্যা হিসাবেই ইউনিভার্সিটিগুলির বিচার করা কর্তব্য। বোধ করি সঙ্গীতশিক্ষা সম্বন্ধে এতটা তলিয়ে দেখবার মত চিন্তা ইউনিভার্সিটির চিন্তানায়কদের মাথায় এ যাবৎ প্রবেশ করেনি।

সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র

নিউক্লীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের রূপরেখা

ভূমিকা

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়টি এতই প্রাচীন যে, কবে তার গোড়াপত্তন হয়েছিল তা বলা শক্ত। প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৪০০০ বছর আগেও চীনা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের কিছু কিছু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ভারত, মেসোপটামিয়া ইজিপ্ট, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশে প্রাচীনকালেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ছিল। চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণই ছিল এই সব গবেষণার একমাত্র উপায়। পরবর্তীকালে গণিত এই সব গবেষণার সহায়তা করেছে। ফলে জ্যোতির্গতিবিদ্যার (astrodynamics) উদ্ভব হ'য়েছে। ১৬০৯ খৃঃ গ্যালিলিও দূরবীণ তৈরী করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে যান্ত্রিক কৌশল প্রয়োগ করেন সর্বপ্রথম। এর ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণজনিত গবেষণার পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে ও জ্যোতির্গতিবিদ্যার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন পর্যন্ত আলোই ছিল গবেষণার একমাত্র মাধ্যম। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে নক্ষত্রজগৎ নির্গত আলোক তরঙ্গের বিশ্লেষণ সম্ভব হ'ল। এই বিশ্লেষণ থেকে নক্ষত্রের উপাদান ও তার ভেতরকার অবস্থা কিছু কিছু জানা গেল। এই সব গবেষণায় পদার্থ বিজ্ঞানের ভূমিকা হল মুখ্য। জ্যোতি পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়টির সুরু তখনই। ১৮ থেকে ২০ শতকের মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞানে বিকিরণের নিয়ম

কানুনগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই সব নিয়মের প্রয়োগ করে নক্ষত্রবর্ণালী থেকে তাদের তাপমাত্রা নির্দ্ধারিত হ'ল। পৃথিবীর গবেষণাগারে পাওয়া মৌলিক পদার্থগুলির নিজস্ব বর্ণালীর সাথে তুলনা করে একটি নক্ষত্রে কী কী মৌলিক পদার্থ আছে তাও বলে দেওয়া সম্ভব হ'ল।

১৯৩১ খৃঃ জান্স্কি নক্ষত্র থেকে বেতার তরঙ্গ ধরতে সক্ষম হন। বহু নক্ষত্রই আলোর সাথে সাথে অদৃশ্য তরঙ্গ যথা বেতার, লাল উজানী, অতি বেগুনি এমন কি রঞ্জনরশ্মিও বিকিরণ করে। পৃথিবীতে এদের সবগুলি ধরা পড়ে না—কারণ পৃথিবী-পৃষ্ঠে পৌঁছার আগে মহাশূন্যে এদের অনেকেই হারিয়ে যায়। ধরা পড়ে শুধু দৃশ্য আলোক তরঙ্গ ও ৮ মিঃ মিঃ থেকে ১৭ মিঃ দৈর্ঘের বেতার তরঙ্গ। জান্স্কির আবিষ্কারের ফলে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের (radio astronomy) সূত্রপাত হ'ল। আলোকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের (optical astronomy) পাশাপাশি এই নূতন পদ্ধতিটিও জ্যোতি পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগামিতায় অভাবনীয় সাহায্য করেছে।

নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান এ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর প্রয়োগের কথা কল্পনাই করা যেত না, যদি না ১৯৩০ খৃঃ এডিংটন্ ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন যে, নক্ষত্র জগতের শক্তির উৎস কোনো নিউক্লীয় ক্রিয়ার ফলেই সম্ভব। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্র জগতের বিপুল শক্তির সন্ধান করতে গিয়ে কোনো হদিসই পাচ্ছিলেন না। আমাদের সূর্যের কথাই ধরা যাক্। এই নক্ষত্রটি সেকেণ্ডে প্রায় ৪×১০^{৩৩} আর্গশক্তি অর্থাৎ ৫×১০^{২৩} অশ্বশক্তি (horse power) বিকিরণ করে। সংখ্যার জটিলতায় না গিয়ে সূর্যের শক্তি সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরুন, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে ১ মাইল পুরু ও ২ মাইল চাওড়া একটি বরফের সেতু আছে। কোনও ক্রমে যদি সূর্যের সমস্ত শক্তি এই সেতু বরাবর কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হয়, তবে সেতুটি এক সেকেণ্ডের মধ্যেই গলে যাবে। এ থেকে সূর্যের শক্তির বহর কিছুটা অনুমান করা যায়। তাছাড়া আবহমানকাল থেকে কোটি কোটি বছর ধরে এই শক্তির কোনো হ্রাস হ'চ্ছে বলেও মনে হয় না। এ রকম বিপুল শক্তির উৎস কোথায়—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে উনিশ শতকের মাঝামাঝি হেল্‌ম্‌হোৎজ্ ও কেল্‌ভিন্ একটি মতবাদ খাড়া করেছিলেন। তাঁদের মতে মহাকর্ষীয় সংকোচনই নক্ষত্র শক্তির উৎস। এই সংকোচনের ফলে মহাকর্ষীয় স্থৈতিক শক্তির (potential energy) কিছু অংশ বিকিরণ শক্তিতে পরিনত হয়।

সৌরশক্তির উৎস

একদা সূর্যের সৃষ্টি হয়েছিল বায়ব অথবা মহাকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা থেকে। এরা ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে যখন সূর্যের গঠন আরম্ভ হ'ল, তখন তার স্থৈতিক শক্তি হ্রাস পেল। এই স্থৈতিক শক্তির কিছুটা নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ তাপ বাড়িয়ে তুললো ও বাকি অংশটুকু বিকিরিত হ'ল। কিন্তু এ রকম সংকোচনের অবিরাম ফল হওয়া উচিত সূর্যের আয়তনের ক্রমিক হ্রাস। হেল্ম্‌হোৎজ্ ও কেলভিনের মতে সূর্যের আয়তন এত বিশাল যে, মৃদু সংকোচনজনিত তার আয়তনের হ্রাস এত স্বল্প যে তা' ধরা পড়ার কথা নয়। কিন্তু আপত্তিটা অন্যত্র। আজ পর্যন্ত সৃষ্টিতত্ত্বের উপর মোটামুটি যে সব মতবাদ চালু আছে তাতে সূর্যের সৃষ্টি যে কয়েক হাজার কোটী বছর আগে আরম্ভ হ'য়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ পর্যন্ত সূর্য মহাকর্ষীয় সংকোচনের ফলে অন্ততঃ ১০৪৯ আর্গ শক্তি বিকিরণ করেছে। সূর্যের বর্তমান ঔজ্জ্বল্য যদি বছরে ১০৪১ আর্গ হয় তাহলে সূর্যের বর্তমান বয়স দাঁড়ায় ১০৮ বছর। আগেই বলেছি —সূর্যের বয়স এর চাইতে অনেকগুণ বেশী। তাই মহাকর্ষীয় সংকোচন যে সূর্যের শক্তির একমাত্র উৎস নয়—তা অনায়াসে বলা যায়।

উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্র শক্তির উৎসের আর কোনো হদিস্ পান নি। বেকেরেল তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করার পর যেন একটু আশার আলো দেখা গেল। রাসায়নিক শক্তির চাইতেও অকল্পনীয় বিপুল শক্তির উৎস পরমাণুর অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াসের (nucleus) মধ্যে নিহিত আছে—আর সেই শক্তি যে মহাকর্ষীয় শক্তির চেয়েও বিপুলতর—এই সম্ভাবনা জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক যুগান্তর নিয়ে এল। ১৯০৫ খৃঃ আইনষ্টাইন্ বস্তুর ভর ও শক্তির তুল্যমূল্যতা আবিষ্কার করলেন ; তাঁর সূত্রটি হল $E=mc^২$, $E=$ শক্তি, $m=$ বস্তুর ভর, $c=$ নির্বাত দেশে আলোর গতিবেগ। এই সূত্র থেকে দেখা যায়, ১ গ্র্যাম্ বস্তুর ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হ'লে ৬৭০০০০ গ্যালন্ পেট্রোল দহনজনিত শক্তির সমান দাঁড়ায়। সাধারণ রাসায়নিক ক্রিয়ায় ভরের ক্ষয় অতি সামান্য। কিন্তু নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় উদ্ভূত শক্তি যেমন বিপুল, ভরের ক্ষয়ও সামান্য নয়। এখন ধরা যাক্ সূর্যের কথা—সূর্যের বর্তমান ঔজ্জ্বল্য থেকে সূর্য যে শক্তি বিকিরণ করে তা নিউক্লীয় হলে প্রতি সেকেণ্ডে তার ভরের ক্ষয় দাঁড়াবে ৪৬০০-০০০টন। এ সংখ্যাটি বেশ বড় হ'লেও সূর্যের বিপুল ভরের তুলনায় তা' যৎসামান্যই।

নিউক্লীয় সংযোজন ক্রিয়া ও সৌরশক্তির উৎস

কোন্ নিউক্লীয় বিক্রিয়া যেখানে ঘটতে পারে তা খতিয়ে দেখার জন্য তার আভ্যন্তরীণ

পরিস্থিতিটা জানা দরকার। প্রথম দৃষ্টিতেই সূর্যের অভ্যন্তরে দেখা যায় সেখানে তাপমাত্রা অত্যধিক। সৌর বর্ণালী থেকে সূর্য-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে ৬০০০° সেন্টিগ্রেড। সূর্যের বিকিরণ অজস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও এই তাপমাত্রা কখনও হ্রাস পায় না। তাহ'লে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, সূর্যের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা আরও প্রচণ্ডতর—প্রায় ২ কোটী ১০ লক্ষ ডিগ্রী সেঃ। ১৯৩০ খৃঃ বেথে ও ওয়াইজ্ স্যাকার যে তত্ত্ব খাড়া করেন তা'তে বলা হয় সূর্যের আভ্যন্তরীণ এই তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস্ অর্থাৎ প্রোটন পরস্পর সংযোজনের দ্বারা (fusion) হিলিয়াম্ নিউক্লিয়াস্ (দুটী নিউট্রন্ ও দুটী প্রোটনের সমবায়) তৈরী করে। ৪টী প্রোটন থেকে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস্ গঠিত হ'লে প্রায় ২৫ মিলিয়ন ইলেক্‌ট্রন্ ভোল্ট (mev) শক্তি মুক্তি লাভ করে। কার্বণ, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন নিউক্লিয়াস্‌গুলি এতে অংশগ্রহণ করে বলে এই প্রক্রিয়া CNO বা কার্বণ, নাইট্রোজেন অক্সিজেন চক্র নামে অভিহিত হয়। নিম্নলিখিত প্রতীক সমীকরণের সাহায্যে এই প্রক্রিয়াটি প্রকাশ করা যায়—

$${}^{12}_{6}C + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{13}_{7}N + \gamma \rightarrow {}^{13}c_{6} + e^{+} + \nu \; (১.২০ \; mev)$$

$${}^{13}_{6}c + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{14}_{7}N + \gamma$$

$${}^{14}_{7}N + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{15}_{8}O + \gamma \rightarrow {}^{15}_{7}N + e^{+} + \nu \; (১.৭৪ \; mev)$$

$${}^{15}_{7}N + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{12}_{6}C + {}^{4}_{2}He$$
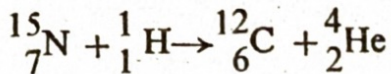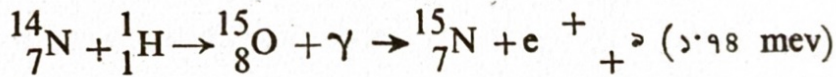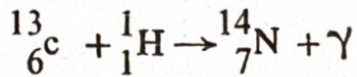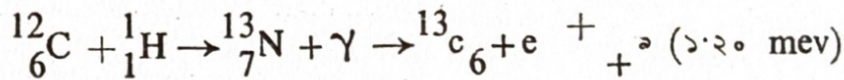
C, N, O যথাক্রমে কার্বণ, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন নিউক্লিয়াস্। e^{+} – পজিট্রন (ইলেক্‌ট্রনের বিপরীত কণা), H—হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস্ অর্থাৎ প্রোটন, He—হিলিয়াম্ নিউক্লিয়াস্, γ – গামারশ্মি, ν — নিউট্রিনো (প্রায় ভরহীন বস্তুকণা)। নিউক্লিয়াসের প্রতীকের বাঁ দিকের উপরের সংখ্যাটি তার ভর সংখ্যা ও নীচের সংখ্যাটি পরমাণু সংখ্যা অর্থাৎ তাতে কয়টী প্রোটন আছে তা প্রকাশ করে। উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় ν, γ, e^{+} এর সাথে শক্তি নির্গত হয়। CNO চক্র ছাড়া আরও কয়েক প্রকার সংযোজন ক্রিয়ায় হিলিয়াম্ তৈরী হ'তে পারে। সংযোজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথিবীতে হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করা গেছে। এই বোমা যে ইউরেনীয়াম বিভাজন জনিত ফিসন্ বোমার চেয়ে অনেক গুণ শক্তিশালী সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নাই।

এবার দেখা যাক্, সৌরশক্তির উৎস যে নিউক্লীয় সংযোজন (nuclear fusion) তা হাতে কলমে প্রমান করার উপায় কি ? আলো বা বেতার তরঙ্গ ,সৌরপৃষ্ঠের বিকিরণ। সূর্যের কেন্দ্রস্থলে কী ঘটছে তা এরা জানাতে অক্ষম। সূর্যের অভ্যন্তর বাইরের শীতলতর আবরণ দিয়ে ঢাকা রয়েছে তাই নিউক্লীয় বিক্রিয়া জনিত γ বা e^+ পৃথিবী পৃষ্ঠে আসতে পারে না। বাকী রইল নিউট্রিনো। তাদের ভরহীনতার জন্য পৃথিবীপৃষ্টে এসে পড়ার কোনো বাধা নেই। বস্তুতঃ সৌর বিকিরণের শতকরা তিন-ভাগ শক্তি নিউট্রিনো বয়ে নিয়ে আসে। পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে প্রায় ১০১১ টি নিউট্রিনো প্রতি সেকেণ্ডে এসে পড়ছে। সংখ্যাটি বিরাট্, কিন্তু যে নিউট্রিনো বিশাল সৌর দেহকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, তারা যে সুবোধ শিশুর মত বিজ্ঞানীদের যন্ত্রে ধরা দেবে তার নিশ্চয়তা কি ? সেজন্য যে বিশাল যান্ত্রিক কৌশলের প্রয়োজন তা জটিল না হলেও ব্যয় সাপেক্ষ।

সৌর নিউট্রিনোর সন্ধানে

পৃথিবীর কয়েকটি গবেষণাগারে সৌর নিউট্রিনোর সন্ধান চলছে। আমেরিকার হোম্-ষ্টেক্ মাইনে এরকম একটি যন্ত্রের কথা বলছি। মূল যন্ত্রটি একটি ৪০ ফুট্ লম্বা ও ২০ ফুট্ ব্যাসের আধার যাতে থাকে টেট্রাক্লোরো এথিলিন্ (C_2Cl_4) প্রায় এক লক্ষ গ্যালন্। C_2Cl_4 ধোপার কাপড় কাচতে লাগে, দামে সস্তা। বিপুল পরিমানে প্রয়োজন হয় বলে এই সস্তা পদার্থটি বেছে নেওয়া হ'য়েছে। এর ক্লোরিন-৩৭ স্থায়ী স্বাভাবিক আইসোটোপই সৌরনিউট্রিনোর সাথে বিক্রিয়ায় আর্গন-৩৭ আইসোটোপ্ তৈরী করে। আর্গন-৩৭ তেজঃক্রিয়, অর্দ্ধায়ু প্রায় ৩৫ দিন। আধারটি থাকে প্রায় ৪৮৫০ ফুট নীচে—তার কারণ হ'ল এত নীচে মাটির তলায় নভোরশ্মি জনিত বিক্রিয়ায় যাতে আর্গন-৩৭ না তৈরী হয়। লক্ষ গ্যালন C_2Cl_4 থেকে আর্গন-৩৭ বায়ব অংশটুকু বের করে নেওয়া সহজ নয়। তবু তা' বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্ভব হ'য়েছে। আর্গন-৩৭ এর পরিমাণ থেকে সৌরনিউট্রিনোর যেটুকু সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় CNO চক্র সামগ্রিক সৌরশক্তির দশ শতাংশের জন্য দায়ী হ'তে পারে। অন্যান্য সংযোজন ক্রিয়ার তত্ত্বের তুলনায় ও পরীক্ষালব্ধ নিউট্রিনো সংখ্যা অনেক কম। সাধারণতঃ তিনটি কারণে এরকম ঘটতে পারে—(১) সূর্যের যে পরিবেশ ধারণা করে নিয়ে তত্ত্বগুলি খাড়া করা হ'য়েছে—সেই পরিবেশ [illegible], (২) সংযোজন ক্রিয়ার তত্ত্বগুলি ত্রুটিপূর্ণ, (৩) পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি বিচ্যুতি। [illegible]

স্থায়ী কণা বলে যে ধারণা আছে তা নাও হ'তে পারে। অস্থায়ী সৌর নিউট্রিনোর কিছু অংশ মাঝপথে হারিয়ে যাওয়া তাহ'লে বিচিত্র নয়। উল্লিখিত সব কারণগুলি-কেই যথাযথ গুরুত্ব দিয়েও আমরা বলতে পারি এই পরীক্ষায় সৌর নিউট্রিনোর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নাই। পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন ও মৌলিক তত্ত্বগুলির পুনর্বিবেচনা করা হ'চ্ছে যাতে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়। সৌরশক্তির উৎস যে নিউক্লীয় সংযোজন-এ ধারণা এখন অভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত। কিন্তু বিশ্বজগতে সূর্যই তো একমাত্র নক্ষত্র নয়। কোটী কোটী নক্ষত্র নিয়ে যে মহাকাশ, তা'তে সূর্য তো সাধারণ পর্যায়ের একটি তরুণ নক্ষত্র মাত্র। নক্ষত্র জগতের সামগ্রিক চিত্র এ থেকে পাওয়া যাবে না। তাই সূর্যকে প্রথম ধাপ ধরে নিয়ে সমস্ত নক্ষত্র জগতের অভিব্যক্তি, জীবন মৃত্যুর খতিয়ান মহাবিশ্বকে জানবার একটি উপায় হ'তে পারে।

নক্ষত্র-জীবনের অভিব্যক্তি

সৃষ্টির আদি থেকে সূর্য বড়জোর ২০ লক্ষ বছর মহাকর্ষীয় সংকোচনের ফলে শক্তি লাভ করেছে। তার পরবর্তী ধাপ হ'ল হাইড্রোজেন সংযোজনে হিলিয়ামে রূপান্তর—এই অবস্থায় সূর্য একটি সাধারণ পর্যায়ের তরুণ নক্ষত্র। সাধারণ পর্যায়ের সব নক্ষত্রের ক্ষেত্রেই একথা খাটে। হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে নক্ষত্রটির দৈহিক প্রসারণ ঘটে, অন্তর্নিহিত তাপমাত্রাও ক্রমশঃ কমতে থাকে, পৃষ্ঠদেশ আরো হাল্কা হয়। সাধারণ পর্যায় থেকে তখন নক্ষত্রটি লাল দানবে (red giant) পরিণত হয়। কিন্তু তার কেন্দ্রে হিলিয়াম জমতে থাকে। কেন্দ্রস্থল সংকুচিত হ'য়ে তাপমাত্রা সেখানে সূর্যের কেন্দ্রের চেয়ে প্রায় দশগুণ বেড়ে যায়। এই তাপমাত্রায় তিনটি হিলিয়াম্ নিউক্লিয়াস্ সংযোজনে কার্বন নিউক্লিয়াস্ তৈরী হয়। এখন আর একবার নক্ষত্রটি যৌবন ফিরে পায়। কিন্তু এই পরবর্তী যৌবন আগের মত উদ্দীপ্ত নয়। কারণ শেষোক্ত সংযোজন ক্রিয়ায় শক্তির পরিমাণ আগেকার মাত্র শতকরা নয়ভাগ। ক্রমশঃ কেন্দ্রের তাপ আরো বাড়ে — ফলে কার্বন থেকে আরো ভারী নিউক্লিয়াস্ তৈরী হ'তে হ'তে লোহার নিউক্লিয়াস্ তৈরী হ'লে সংযোজন ক্রিয়া থেমে যায়। লাল দানবের এই সংযোজ[illegible] ক্রিয়ার আয়ুও অল্প তার জীবন কালের এক পঞ্চমাংশ মাত্র। লোহা[illegible] ক্রিয়া থেমে যায়। ফলে নক্ষত্রটি আরো উত্তপ্ত এবং [illegible] সে তখন মৃত্যুপথযাত্রী শ্বেতবামন (white dwarf) শ্রে[illegible]

[illegible]র অন্তিমদশা

[illegible]ক মহাকর্ষীয় সংকোচনের উপরই নির্ভর [illegible] সেখানে

রাখতে হয়। তার উচ্চতর তাপমাত্রায় সেখানে আর নিরপেক্ষ পরমাণু থাকে না। সব পরমাণুর ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি মুক্ত হয়ে আয়নিত হ'য়ে যায়। পরমাণুর বদ্ধ ইলেক্‌ট্রন্‌ ও নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী জায়গা বিলুপ্ত হয় তাই শ্বেতবামনের আকার এতো ক্ষুদ্র। মহাকর্ষীয় সংকোচনকে ঠেকিয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে যে বিপুল তাপমাত্রার প্রয়োজন তা দুষ্প্রাপ্য হ'লে নক্ষত্রটি বিস্ফোরিত হ'য়ে নবতারা (nova) বা অতিনব-তারা (Super nova) সৃষ্ট হয়। প্রাচীনকালে এই সব বিস্ফোরিত নক্ষত্রকে নূতন নক্ষত্র ভেবে ভুল করে এরকম নামকরণ করা হ'য়েছিল। সেই নামগুলি চালু থাকলেও সে নক্ষত্র শ্বেতবামনত্ব প্রাপ্তির সুযোগ পায় না—তারই ভাগ্যে ঘটে বিস্ফোরণ। নক্ষত্রের ভর অনুযায়ী বিপুলতর হ'লে বিস্ফোরণও হয় প্রচণ্ড—তাদের অতিনবতারা বলা হয়।

অধুনা-আমেরিকাবাসী জনৈক ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর এ সম্পর্কে একটি বিখ্যাত তত্ত্ব খাড়া করেন। তাঁর মতে সূর্যের চেয়ে কোনো নক্ষত্র যদি ১·৪ গুণ ভারী হয় তবে সে শ্বেতবামনত্ব না পেয়ে বিস্ফোরিত হ'বে। তা থেকে তখন খণ্ড খণ্ড জলন্ত বস্তুপুঞ্জ ছিঁড়ে ছিঁড়ে অজস্র শক্তি বিকিরণ করে আকাশে ছড়িয়ে পড়বে;

এই বিস্ফোরণের স্বরূপ কি — যে প্রশ্নের পুরো মীমাংসা হয়নি। কেউ বলেন লোহার নিউক্লিয়াস ভেঙে ছোট ছোট নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়— আবার কেউ বলেন মহাকর্ষীয় সংকোচনকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য নিউট্রিনোর মাধ্যমে বিপুল শক্তির বিকিরণ হয় বলে নক্ষত্রটির বিস্ফোরণ ঘটে।

সৌর ভরের ১·৪ গুণ ভর এর নামকরণ হ'য়েছে 'চন্দ্রশেখরের সীমা' (Chandra Sekhar's Limit).

চন্দ্রশেখর সীমা পেরিয়ে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে যদি নক্ষত্রটির বিস্ফোরণ না হয়— তা হলে তার ভাগ্যে কী ঘটবে? তখন প্রোটনগুলিতে ইলেক্‌ট্রন্‌ সেঁধিয়ে গিয়ে তৈরী হ'বে নিউট্রন। শ্বেতবামনে নিউক্লিয়াসের আয়তনে গড়া তার দেহ, কিন্তু নিউট্রন নক্ষত্রে কোনো নিউক্লিয়াসের অন্তর্বর্তী ফাঁকা জায়গাও না থাকায় নিউট্রন নক্ষত্রের আয়তন ক্ষুদ্রতম, এদের ব্যাস ১০ থেকে ১০০ মাইলের মধ্যে। তুলনা করুন সূর্যের ও পৃথিবীর সঙ্গে: এদের ব্যাস যথাক্রমে ৮৬৪ হাজার মাইল, ৮ হাজার মাইল। শ্বেতবামনের ব্যাস একটি গ্রহের অনুরূপ। নিউট্রন নক্ষত্র ক্ষুদ্রতম হ'লেও তার তাপমাত্রা শ্বেতবামন থেকেও বেশী। তাই এ থেকে প্রধান বিকিরণ যা বেরোয় তা'হল রঞ্জনরশ্মি। রকেটে বাহিত যন্ত্রপাতি দিয়ে অবশ্য মহাকাশে রঞ্জনরশ্মি

পাওয়া গেলেও তা যে নিউট্রন নক্ষত্র থেকে আসছে তা এখনই সঠিক বলা যায় না।

বিপরীত জগৎ

নিউক্লীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিপরীত জগৎ একটি বহুবিতর্কিত বিষয়। প্রোটন-এ্যান্টি প্রোটন, পজিট্রন-ইলেক্ট্রন্. নিউট্রন-এ্যান্টিনিউট্রন এই সব কণা-বিপরীত কণার জুড়ি আবিষ্কারের ফলে একটি প্রশ্ন সোচ্চার তাহ'ল এ্যান্টিপ্রোটন, এ্যান্টিনিউট্রন, পজিট্রন দিয়ে গড়া বিপরীত জগৎও থাকবে না কেন? বিপরীত ভারী হাইড্রোজেন নিউ-ক্লিয়াস্ এ্যান্টিডয়েটরনও আমাদের গবেষণাগারে তৈরী হ'য়েছে। বিপরীত পরমানুও একদিন হয়ত তৈরী হ'বে। অবশ্য আমাদের সাধারন জগতে এই সব বিপরীত বস্তুর স্থায়িত্ব নেই, তৈরীর পর এরা তাদের সাধারণ কণার সাথে মিলে গিয়ে গামা রশ্মির শক্তিতে/পরিনত হয়। পদার্থবিজ্ঞানে বিদ্যুৎ আধানের (Charge) নিত্যতা (Conservation) থেকে একটি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন আসে সমসংখ্যক কণা বিপরীত কণায় যখন শক্তির উদ্ভব আবার শক্তি থেকে সমান সংখ্যার কণা-বিপরীত কণার জন্ম তখন যে প্রক্রিয়ায় সাধারণ জগতের সৃষ্টি, তার সাথে বিপরীত জগতের সৃষ্টিও হওয়া উচিত। অথচ আমাদের পৃথিবী, সৌরজগৎ এসবের কোথাও বিপরীত জগৎ নেই। তা হ'লে বিপরীত জগৎ কোথায়? এমন তো হ'তে পারে সৃষ্টির আদিতে আমাদের জগৎ থেকে বহুদূরের কোনো ছায়াপথ বিপরীত জগৎরূপে জন্ম নিয়েছে। যতদিন না আমাদের মানুষ বা যন্ত্র সৌরজগৎ পেরিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিতে সক্ষম হ বে, ততদিন এরকম বিপরীত জগতের হদিশ পাওয়া সম্ভব নয়। এরকম দুঃসাহসিক মহাকাশ অভিযান এখনও আমাদের চিন্তার বাইরে। তবু দেখা যাক্ জগৎ ও বিপরীত জগতের সীমান্তটি কেমন হ'বে? কণা ও বিপরীত কণার মিলনে যখন শক্তির উদ্ভব, তখন তো এই সিমান্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হ'য়ে দুটি জগৎই লুপ্ত হওয়ার কথা। বিজ্ঞানী আল্ফ্ বেন্ বলেন এই সীমান্তটি গামারশ্মির পুরু স্তরে ঢাকা। এই স্তরই সীমান্তকে অক্ষত রেখেছে। বিজ্ঞানী লীডেন ফ্রষ্টের একটি পুরাতন আবিষ্কারের নজীর টেনে এনেছেন আল্ফ্ বেন্। এই আবিষ্কারের পরীক্ষা রান্নাশালেই করা যায়। গরম কড়াইতে একটি জল বিন্দু চট্ করে বাষ্পীভূত হ'য়ে উঠে যায়। কিন্তু কড়াইর তাপমাত্রা যদি খুব বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে দেখা যাবে যে, জলবিন্দুটি কিছুক্ষণ এদিক ওদিক লাফালাফি করে উবে যেতে সময় নেবে। এর ব্যাখ্যা হ'ল জলবিন্দুর যে দিক্‌টা কড়াইর সংস্পর্শে আছে উচ্চ তাপমাত্রার সেখানে

একটি বাষ্পীয় পাতলা আবরণ তৈরী হ'য়ে বাকী অংশটুকুকে তাপ থেকে কিছুক্ষণ আলাদা করে রাখে। এই আবরন লিডেনফ্রষ্ট্ স্তর নামে খ্যাত। সাধারণ জগৎ ও বিপরীত জগতের সীমান্তের গামারশ্মির অনুরূপ লীডেনফ্রষ্ট্ স্তর দুটী জগৎকে বিলোপের হাত থেকে রক্ষা করে। এক্স প্লোরার-১১ কৃত্রিম উপগ্রহটি এ রকম গামারশ্মির অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। আরও উন্নততর গবেষণায় ভবিষ্যতে এসব জটিল প্রশ্নের সমাধান হ'বে সন্দেহ নাই।

নিউক্লীয় বিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণা এ শতাব্দীর দুটী শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার, যা দিয়ে বিজ্ঞান এক চরম পর্যায়ে উপস্থিত। তার ফলাফল বিশ্বের মানুষের সমাজে যে পরিবর্তন নিয়ে আসবে তা আজ কল্পনার বাইরে। নিউক্লীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের বর্তমান রূপরেখা থেকে সেই ভবিষ্যৎ যুগের আভাসটুকু পাওয়াই সম্ভব।

গোলাম সাক্‌লায়েন

বাউল গান লোকসঙ্গীত, না—তত্ত্বকথা ?

বাংলাদেশ বিশেষত পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গ লোকসাহিত্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল। জারী, সারী, বাউল, ভাটিয়ালী, মুর্শিদী, ভাওয়াইয়া, কবিগান, গাথা, ধাঁধা, ব্রতকথা, পাঁচালী প্রভৃতি কত রকমের অমূল্য সম্পদ্ দেশ-জননীর বুকে এখনও লুকিয়ে আছে সাম্প্রতিক কালে লোক সাহিত্য গবেষক, সংগ্রাহক এবং পণ্ডিতগণের সাধনা ও চেষ্টা-যত্নের ফলে জানতে পারা গেছে। বিগত পনের বছরে ঢাকার বাংলা একাডেমিতে লোক সাহিত্যের বহু মূল্যবান উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। সেগুলির ব্যাপক গবেষণা ও মূল্যায়ন প্রয়োজন।

লোক সাহিত্যের এক বিপুল অংশ বাংলার বাউল গান। এ-গান বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ্। বাউল গানের জনপ্রিয়তা যেমন ব্যাপক তেমনি লোক মনোরঞ্জনের ক্ষমতাও অসীম। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ-গানের প্রতি বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং শিক্ষিতদের মধ্যে রসবোধ জাগ্রত করেন। তিনি বাউল সঙ্গীতকে বিশেষ সমাদর ক'রে সমাজের নীচুতলা থেকে উদ্ধার ক'রে বিশেষ সম্মানের আসন দিয়েছেন।[১] তিনি স্বয়ং বাউল গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। সত্যিকথা বলতে কি, তাঁর জন্যই বাউল গান কেবলমাত্র বাংলাদেশের বিদগ্ধ জনের প্রশংসা-ধন্য হয় নি, বহির্বিশ্বের মনীষীদেরও রস-উপভোগের সামগ্রী হয়েছে। এ-সম্পর্কে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি —

"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স,—শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল,

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।'

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, 'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যু পরিব্যথাঃ'—যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম, তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়—যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা — অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর — তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' ব'লে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেক কাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেচে। লোক সাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় ব'লে বিশ্বাস করি নে"।২

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য থেকে এ-কথাই প্রমাণিত হ'ল যে, বাউল গান এক বিশেষ প্রকরণের লোক সাহিত্য যার অপূর্বতা তিনি আর কোথাও পান নি। রবীন্দ্রনাথের পর বিশ্বভারতীর (শান্তিনিকেতন) গবেষক ও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে লীলা বক্তৃতা দেন তাতে 'বাংলার বাউল'৩ শীর্ষক নিবন্ধে বাউল গান ও বাউল তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বাউল হ'ল বাংলার এক সম্প্রদায়—তাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মানুষ হ'য়েও বাউল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাঁরা অসাম্প্রদায়িক; বাউল গানের রাজা লালন শাহ্ ফকির তাঁর গানে গেয়েছেন :

'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না নজরে।'

অন্যত্র—

'যদি গৌর চাঁদকে পাই,
গেল গেল এ ছার কুল,
তাতে ক্ষতি নাই।
কি ছার কুলের গৌরব করি,
অকূলের কূল গৌর হরি
এ-ভব তরঙ্গে তরি, গৌর গোঁসাই ॥"

সাধারণত তাদের 'নেড়ার ফকির' অথবা 'বে-শরা ফকির', 'মারফতি ফকির' আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। 'নেড়া' অর্থে মুণ্ডিত মস্তক ব্যক্তি। বৌদ্ধ সাধকদের ধর্ম-জীবনে এই বিধি অনুসৃত হ'ত। 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে। ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব গ্রন্থ "চৈতন্য চরিতামৃত"-য়ে ক্ষেপা ও বাহ্যজ্ঞানহীন অর্থে 'বাউল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা :

"বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কামে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥"

'বাউল' শব্দটি বিশৃংখল অর্থেও প্রযোজ্য হয়েছে। কেউ বলেন, 'বাতুল' অথবা 'বাউরা' (পাগল) অর্থে এই শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ফার্সী আত্মসন্ধানী অর্থে পণ্ডিতেরা 'বাউল' কথাটি ব্যবহার করেছেন। একতারা বাজিয়ে যারা গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়ায় তারা পাগল। সম্ভবত এ-অর্থেই 'বাউল' কথাটি প্রযোজ্য। মনে হয় এই শেষের ব্যাখ্যাটিই সন্তোষজনক।

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের মতে, তাঁরা সবাই নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর লোক। কিন্তু দৃষ্টির গভীরতায় ও প্রকাশের অপূর্বতায় অতুলনীয় তাঁদের শক্তি। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের গান শুনে বলেন, "এমন সহজ, এমন গভীর, এমন সোজাসুজি সত্য এত অল্প কথায় এমন অপূর্বভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদেরও নাই। আমার তো ইহা-দের রচনা দেখিয়া রীতিমত হিংসা হয়।"[৪] রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ব-বিশ্রুত কবি ও মনীষীর প্রসংশাধন্য যে বাউল গান তার কোন্ গুণ ও বৈশিষ্ট্য তিনি এর মধ্যে দেখেছেন ? কেন মুগ্ধ হয়েছেন তিনি ? মুগ্ধ হয়েছেন বাউল গানের 'অপূর্বভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি'তে, সহজ, গভীর ও সোজাসুজি সত্য অল্প কথায় এমন ভাবে অন্যত্র তিনি দেখেন নি ব'লে। এ-গুলিই বাউল গানের প্রধান গুণ। কথাটি অন্যান্য

লোক সাহিত্য গবেষক ও পণ্ডিতদের মতামত বিচার সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

বাউলদের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ প্রসংগে লোক সাহিত্য-বিশারদ অধ্যাপক মনসুর উদ্‌দীন বলেন যে, বাউলেরা মনের মানুষের সন্ধানে ঘুরছে। মনকে তাদের পারিভাষিক শব্দে মগজ ব'লে ধারণা করা যায়। ...বাউলরা অধ্যাত্মবাদী। জড় মানবদেহ তাদের প্রধান সাধন লক্ষ্য ও অবলম্বন।৫ তিনি অন্যত্র বলেছেন, যারা সংসারের কাজকর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে একমত হয়ে অজানাকে জানার জন্য উদ্‌গ্রীব তারাই বাউল। ফার্সী শব্দ 'মস্তানা'র অর্থ উন্মাদ, ঐশী প্রেমে উন্মাদ বাউল এবং মস্তানা—উভয়ই এক সাধন পথের পথিক। বাউল কোন শাস্ত্র-পন্থা অবলম্বন ক'রে সাধনা করে না, মস্তানও শরিয়ত অনুযায়ী সাধনা করে না। সমাজ সংসার তাদের কাছে মিথ্যা, অন্তঃসারশূন্য। একমাত্র সত্য হ'ল মনের মানুষ।৬ তিনি আরো বলেন, ধর্মের একটি বিশেষ রূপ আছে, বাউলদের সাধনায় সে সবের বালাই নেই। বাউল সর্বপ্রথম মানুষকে জানতে চায়, সে মানুষকে ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ ব'লে মনে করে, পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক এই মানুষের মধ্যে রয়েছে। তিনটি স্রোত এসে বাউলের মানস-সরোবরে মিলিত হয়েছে—হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম আধ্যাত্মিকতা।৭ অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমের পথে হিন্দু-বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী যে-সব সাধক ও প্রেমিক সাধনা ক'রে থাকেন তাঁদের মতো সাধনায় উত্তরণ বাউলদের মূল লক্ষ্য।৮ অন্য কথায় বলা যায়, বাউলদের সাধনা সহজ সাধনা। সহজ সাধনার চরিত্র কি? ক্ষিতিমোহন সেন সহজ সাধনা সম্বন্ধে বলেছেন যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের কবীর, দাদু, রজ্জব, সুন্দর দাস প্রমুখ ভক্ত সাধকগণের ন্যায় বাউলদের সাধনাও সহজ সাধনা।৯ কবীরের পদে আছে—

> "সন্তো, সহজ সমাধি ভলী।
> সাঁঈ তে মিলন ভয়ো জা দিনতেঁ, সুরত ন অন্ত চলী॥
> আঁখ ন মূঁদঁ কান ন রূঁধুঁ কায়া ন ধারূঁ।
> খুলে নৈন মৈঁ 'হঁস হঁস দেখুঁ', সুন্দর রূপ নিহারূঁ॥
> কহুঁ সো নাম সুনুঁ সো সুমিরন জো কছু, করূঁ সো পূজা।
> গিরহ-উদ্যান এক সম দেখুঁ, ভাব মিটাউঁ দুজা॥
> জহঁ জহঁ জউঁ সোঈ পরিকরমা, জো কুছ করূঁ সো সেবা।
> জব সোউঁ তব করূঁ দণ্ডবত, পুজুঁ ঔর না দেবা॥
> শব্দ নিরন্তর মনুআ রাতা, মলিন বচনকা ত্যাগী।
> উঠত বৈঠত করহুঁ ন বিসরৈ, ঐসী তারী লাগী॥

কহৈঁ কবীর য়হ উন্মুনি রহনী, সো পরগট কর গাঈ।
সুখ দুখকে ইক পরে পরম সুখ, তেহিমেঁ রহা সমাঈ॥"১০

অর্থাৎ

ওহে সন্ত, সহজ সমাধিই ভাল। যেদিন মিলন হয়, স্বামীর সঙ্গে সেদিন অন্ত থাকে না সুরতের। চোখ বন্ধ করি না, কান ঢাকি না, দেহকে দেই না কষ্ট। চোখ মেলে আমি হাসতে হাসতে দেখি, তাঁর সুন্দর রূপ দেখি। যা বলি সে-ই নাম, যা শুনি সে-ই স্মরণ, যা কিছু করি সে-ই পূজা। বাড়ী আর পড়ো-বাড়ী সমান দেখি ; দ্বৈতভাব দেই মিটিয়ে। যেখানে যেখানে যাই, তা-ই হয় পরিক্রমা, যা কিছু করি সেই হয় সেবা। যখন শুই তখন সেইটেই হয় দণ্ডবৎ। অন্য দেবতার আর পূজা করি না। অনাহত শব্দে নিরন্তর মত্ত হয়ে আছে আমার মন, খারাপ কথা বলা সে ছেড়ে দিয়েছে। উঠ্‌তে বসতে কখনে [তাঁকে] ভোলে না। এমনি হয়েছে প্রগাঢ় মিলন। কবীর বল্‌ছে, এমনি ধারা আমার উন্মুনিভাবে অর্থাৎ সমাধির অবস্থা। তাই আমি প্রকাশ ক'রে গান করলাম। সুখ-দুঃখের পরে এক পরম সুখ, তারই মধ্যে প্রবেশ ক'রে থাকি।

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের সিদ্ধান্তকে সম্মান দেখিয়েও বলতে হয় যে, বাংলার বাউলদের সহজ সাধনা উত্তর-পশ্চিম ভারতের সন্ত-সাধকগণের মতো সহজ সাধনা নয়। বাউলদের সহজ সাধনার উৎস খুঁজতে গেলে লক্ষ্য করা যায় যে, বাউলদের সহজিয়া মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া, সূফী-মরমিবাদ এবং বৈষ্ণব-সহজিয়ার এক সংমিশ্রিত রূপ। "Baul literature is reflective of a part of Bengali life and youth, Bengali tradition and culture. Baul literature is simple and lucid. It is lyrical, it is composed of short stanzas. It has a deep undercurrent of spiritual philosophy. Baul lyricism is greatly influenced by the cross currents of Muslim Sufism, Hindu Vaisnavism and Bhaktism and European mysticism. Baulism a product and fruition of the 19th century Bengal mixed with Islam, Hinduism, Buddhism and Christianity is followed and professed by all irrespective of religion and caste."১১

বাউলদের সাধনা 'অধর মানুষ'-কে ধরবার সাধনা। এই 'মনের মানুষ', 'অধর মানুষ', 'অচিন মানুষ', সহজ মানুষ', 'রসের মানুষ', 'সোনার মানুষ', 'আলেক মানুষ', 'ভাবের মানুষ', 'দয়াল-গুরু', 'দয়াল মুরশিদ' হলো মানুষের হৃদয়-বিহারী পরমাত্মা। ···বাউলের প্রেম মানবিক প্রেম এবং 'অধর মানুষ'কে ধরবার সাধনা।১২ বাউল গান তাই রূপকের আবরণে আচ্ছাদিত।

এই 'মনের মানুষের' প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন :

"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম ক'রে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। ....

"মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ; জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে-পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাইরে—বিক্ষিপ্ত আপনহারা মানুষের বিলাপ-গান একদিন শুনেছিলাম পথিক ভিখারির মুখে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলাম—

তোরই ভিতর অতল সাগর।

সেই পাগলই গেয়েছিল—

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।"১৩

মনের মধ্যে মনের মানুষের সন্ধান করা একমাত্র বাউলের পক্ষে, সাধকের পক্ষই সম্ভব। রসের রসিক ছাড়া অন্য কারু পক্ষে এর সন্ধান নিরর্থ। পণ্ডিত ও গবেষক বাউল গানের সংগে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা, বৈষ্ণব-সহজিয়া ও স্থূফীমরমিবাদের যে-যোগসূত্র ওতপ্রোত দেখতে পান তাও তো নিরর্থক নয়। চর্যাগীতিকায় জ্ঞানের কথা, অধ্যাত্মসাধনার কথা বলা হয়েছে, বাউল-গীতিকায় জ্ঞানের কথা, অধ্যাত্ম-প্রেমের আর্তি ফুটেছে। বাউল গান যাকে একবার পেয়ে বসেছে সংসারের আসক্তি তাকে কোনদিন কোথায়ও বেঁধে রাখতে পারে নি। বাউল কবি যখন গেয়ে ওঠেন—

এমন ভাবের নদীতে সই ডুব দিলাম না।
আমি ডুবি ডুবি মনে করি
মরণ ভয়ে ডুবলাম না।
জলের নীচে প্রানপদ্ম,
তাতে আছে মধু কত,

কালো ভ্রমর জানে মধুর মর্ম

অন্যে জানে না।

ডুব দিলাম না॥

তখন মনে হয় বিশ্ব হ'ল একটি মধুভাণ্ড, রহস্যের আবরণ দিয়ে তা আবৃত। কালো ভ্রমরের মতো সন্ধানী হ'লে তবেই তো বিশ্বের রহস্যাবরণ উন্মুক্ত করা সম্ভব। অতএব, সব শক্তির মূলাধার হ'ল মানুষের 'আত্মা'। যে-মানুষ নিজেকে জানতে পেরেছে সে নিজেকে চিনেছে। তার পক্ষে ব্রহ্মলাভ ('নিগুর্ণ পরমাত্মা.' বা 'বিধাতা') সহজ হয়েছে। এই অর্থ থেকেই উপনিষদ বলেছেন, 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ আত্মাকে জানো। হাদিসের কথায়, 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু' অর্থাৎ যে নিজেকে চিনেছে সে আল্লাহ্‌কে চিনেছে। এবং আত্মাকে জানলেই জগতের সব সংশয় থেকে মুক্তি পাবে।[১৪] সেই মুক্তির পিপাসা বাউল গানগুলির মধ্যে যেমন প্রবল তেমনি সত্য প্রকাশের গভীরতায় মর্মস্পর্শী। নিম্নের বাউল পদাবলীর উদ্ধৃতাংশ থেকে এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

ক)

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরসী নগর
(ও) এক পড়শী বসত করে॥
পড়শী যদি আমার ছুঁতো
আমার যম যাতনা সকল যেত দূরে।
(আমার) সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে। (লালন)

খ)

আপনারে আপনি চিনিনে
দীন দ'নের পর যার নাম অধর
তারে চিনবো কেমনে।
আপনারে চিনতাম যদি
হাতে মিলতো অটল-নিধি
মানুষের করণ হতো সিদ্ধি
শুনি আগম পুরাণে॥ (লালন)

গ)

রে নিঠুর গরজী
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি,

সবুর বিহনে ?
দেখ না আমার পরম গুরু সাঁই
সে যুগ-যুগান্তে ফুটায় মুকুল,
তাড়াহুড়া নাই। (মদন)

ঘ)

মন-মানুষ সত্য জান বল যাও কোথায়
হাওয়া রূপে এই দেহে আল্লা আসে আল্লা যায়।
ও মানুষ আরও হাকিম হুকুম দেয়
আল্লা কেবা দেখতে পায়। (লালন)

ঙ)

দেখে আইলাম সোনার মানুষ কোপনী পরা,
সে মানুষ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে
দুই নয়নে বয় হে ধারা।
সে মানুষ ধরতে গেলে না দেয় ধরা
আরও কোন রমণীর মন চোরা। (লালন)

চ)

আছে দীন দুনিয়ার অচিন মানুষ একজনা
কাজের বেলায় পরশ-মনি
অসময়ে কেউ চেনে না। (লালন)

ছ)

আমার দয়ালকে আনিয়া দে রে
আরে সে আমায় দিয়ে গেল ফাঁকি
দয়ালের ঐরূপ যেন দেখি। (লালন)

জ)

সোনার মানুষ ভাসছে রসে
যে দেখছে রসপন্থী
ও তার সেই সে দেখা পায় অনায়াসে।
তিন শ ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি
ও তার মাঝে রূপ নিরবধি,
—সে রূপ ঝলক্ দিচ্ছে এই মানুষে। (লালন)

ঋ)

মুরশিদ আইসে হও কাণ্ডারী
ও দয়াল, জীবন যৌবন সব তোমারই।
দিবানিশি ও তোর জন্যি ফিরি আমি তুষানলে,
ও হারে দিব এ প্রাণ ছারেখারে রে—
ও যদি একবার দেখা না পাই তোরে। (লালন)

প্রখ্যাত বাউল-সাধক লালন ও মদনের উপরি-উদ্ধৃত বাউলগানগুলির অংশ বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এ-কথাটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হবে যে, বাউলরা মানুষকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করে। মানুষকে জানাই তার লক্ষ্য। আপনাকে জানো, কোথায় মনের মানুষ মানুষের মনে বাসা বেঁধেছে দেখ। অতএব, আল্লা নয়, আল্লার সৃষ্টি মানুষ হ'ল বাউলের জীবন-সাধনার অবলম্বন। তা ব'লে বাউলরা মানুষকে পূজা করে না। তারা মানুষের আত্মাকে মনের মানুষের বসতিস্থল ব'লে মনে করে। বাউল কবি গেয়েছেন—

এই মানুষে আছে রে সোনার মানুষ
ডাকলে কথা কয়।

বাউল গানের মূল সুর হ'ল এই সোনার মানুষের সাধনা। যোগ-পন্থা তাদের প্রধান অবলম্বন। এ সম্বন্ধে "মধ্যযুগের বাংলা গীতি কবিতা"র সম্পাদকদ্বয়ের মন্তব্য উল্লেখ-যোগ্য। তাঁরা বলেছেন—

"যোগ ও সাংখ্য—এ দুটো অতি প্রাচীন অনার্য দর্শন। পুরুষ [চৈতন্য স্বরূপ] ও প্রকৃতি [উপাদান] তত্ত্বই সাংখ্য দর্শনের ভিত্তি। আর দেহচর্যার দ্বারা আত্মোপলব্ধির পদ্ধতির নাম যোগ শাস্ত্র। সাংখ্য নিরীশ্বর আর যোগ ঈশ্বরবাদী। ব্রাহ্মণ্য সমাজে যোগ ও সাংখ্য দর্শন জটিল হয়ে উঠে, পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও জৈনদের হাতে যোগ স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ লাভ করে। 'তন্ত্র' ব'লে অপর একটি অনার্য-শাস্ত্রও যোগ এবং সাংখ্যতত্ত্বের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে একটি জটিলতর মিশ্র-তত্ত্বের উদ্ভব ঘটায়। ব্রাহ্মণ্য-শৈবতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের সংমিশ্রণে সম্ভবত সাত শতকের দিকে এক যোগী-তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজ যান নামে তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল। বজ্রযান ও কালচক্রযান ধরে পরবর্তীকালে হিন্দু তান্ত্রিক ধর্মের বিকাশ ঘটে আর সহজযান দুটো উপমার্গ ধরে পরিপুষ্ট হ'তে থাকে: এর একটি বামাচার বা কামাচার ভিত্তিক (মিথুনাত্মক) যোগসাধনা (সহজিয়া), অপরটি প্রকৃতি বর্জিত যোগচর্চা (নাথপন্থ)। প্রথমটি থেকে কালে বৈষ্ণব সহজিয়া মতের উদ্ভব হয়েছে আর দ্বিতীয়টি পরবর্তীকালে বৈরাগ্যবাদী—শৈব ধর্মের ভিত্তি হয়েছে এবং উভয় মতের মিশ্রণেই সম্ভবত বাউল মতের উদ্ভব। ......

এককালে এই নাথপন্থ ও সহজিয়া মতের প্রাদুর্ভাব ছিল বাঙলায়। এ দুটো সম্প্রদায়ের

লোক এক সময়ে ইসলামে ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়, কিন্তু বদ্ধমূল পুরানো বিশ্বাস-সংস্কার বর্জন করা সম্ভব হয় নি ব'লেই ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় থেকেও তারা নিজেদের পুরানো প্রথায় ধর্ম সাধনা ক'রে চলে। তারই ফলে হিন্দু-মুসলমানের সমবায়ে বাউল মতের উদ্ভব হয়েছে।"১৫

বাউল মত মূলত প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও মুসলিম-প্রভাবে তথা সূফী মতের প্রত্যক্ষ সংযোগে এর উৎপত্তি হয়েছে। হিন্দু-ধর্মের মায়া-বাদ ও সেই সূত্রে ভক্তিবাদ এবং মুসলমানদের সূফী-সাধনা এ-সব আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে।১৬ এবং বাউলদের 'মনের মানুষ', 'অধর মানুষ', 'সহজ মানুষে'র সংগে আদি বুদ্ধ, আদি নাথ তত্ত্বের ঐক্য বর্তমান, বৈষ্ণব সহজিয়াদের সংগে হিন্দু বাউল-দের যোগসূত্র রয়েছে। তাই বিভিন্ন গুরুর মত ও নামানুসারে তারা বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায়ে বা সমাজে বিভক্ত। এবং মুসলমান বাউলেরা সাঁই, বেশরা ফকির, বে-দাতী ফকির, মুর্শিদ-পন্থী নামে পরিচিত ও বিভিন্ন গুরু সমাজে বিভক্ত।১৭

বাউল-সাধনায় গুরুর স্থান কতটুকু? গুরু বাউল সাধনায় অপরিহার্য। যারা ধর্মের তত্ত্বজ্ঞ, রসজ্ঞ ও ক্রিয়া বিশারদ তাঁরা অন্যকে ধর্মের পথে পরিচালনার ব্যাপারে পথ-প্রদর্শক। তাই ভারতীয় ধর্ম-সাধনা ও তান্ত্রিক ধর্মে গুরুর প্রয়োজন অত্যধিক। বাংলা দেশে বাউলমাত্রই গুরুকে উচ্চে স্থান দেয়। হিন্দু তান্ত্রিক ধর্ম, বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম, সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম এবং বাউল ধর্ম গূঢ় সাধন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ-তে গুরুর স্থান সর্বোচ্চে, তার সম্মান ও মাহাত্ম্য অপরিসীম।১৮ বাউল ধর্ম গুরু বলতে বিশেষ ভাবে 'পরম-তত্ত্ব' বা 'আত্মা'কে বুঝিয়েছেন। এই আত্মোপলব্ধির পথে যিনি পথ-প্রদর্শক তিনি মানব-গুরু। এবং আত্মোপলব্ধির যেটি মূল-কেন্দ্র 'আত্মা' সেইটি হ'ল তার 'মনের মানুষ'।১৯ আত্মাকে 'মনের মানুষ' বলার তাৎপর্য হ'ল, অন্তরতম আত্মা বাস করছে মানব দেহের মধ্যে, এবং মানব-দেহের সাধনা অর্থাৎ কায়া-সাধনা দ্বারাই মুক্তি লভ্য। সূফী-সাধকগণেরও ঐ একই প্রকারের সাধনা। আত্মাকে মানবাকৃতির রূপ কল্পনা ক'রে বাউল তাকে 'মানুষ' আখ্যায় আখ্যায়িত করেছে।২০

পৃথিবীর যাবতীয় মরমিয়া সাধনাই গুপ্ত এবং দেহকে অবলম্বন ক'রে। বাউল-গুরু গেয়েছেন:

এই মানুষে আছে রে মন,
যারে বলে মানুষ রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন
পারলাম না রে চিনিতে।

অন্যত্র—

এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে ॥

প্রতিভাসের মতো দেখা গেলেও 'মনের মানুষ'কে সহজে ধরা যায় না। অজানা স্থানে তার অবস্থান। দ্বিদল অর্থাৎ আজ্ঞা চক্র তার প্রকাশের স্থান।

তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের (বজ্রযান) পরবর্তীকালে বাংলায় (নদীয়ায়) শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব ঘটে, ফলে রাধা-কৃষ্ণবাদের অত্যধিক প্রচারে শ্রীকৃষ্ণই বৈষ্ণব সহজিয়াদের কাছে পরম তত্ত্ব হিসেবে 'মানুষ', 'সহজ মানুষ', 'মনের মানুষ'-য়ে রূপান্তরিত হন। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ 'মানুষ', 'সহজ মানুষ' বলতে মানুষের অন্তরতম সত্তাকে বুঝেছেন এবং সেই সত্তাকে কল্পনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ ব'লে।[২১] তাই বৈষ্ণব-সাধনা হ'ল প্রেম মূলক সাধনা। কেবল প্রেম-রসিক ভিন্ন সেই সাধন-মার্গে পৌছানো যায় না। নিজের সর্বস্ব, অহমিকা পরিত্যাগ না করতে পারলে শুধু প্রেমসাধনা করা বাতুলতা মাত্র। রাধা-কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি, হ্লাদিনীর সার, মহাভাব স্বরূপ। এখানে রাধা জীবাত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা। পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য জীবাত্মার যে অনুদিন ক্রন্দন, আর্তি তাই সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার মূলকথা। বৈষ্ণব-দর্শনে রাধা-কৃষ্ণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপক হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কবি ওহাব বলেন :

'আমি নারী তুমি রে পতি একই গৃহেতে বসতি
ঘরের গৃহী না পাই ধুড়িয়া।'

এই ঘরের গৃহীর সন্ধান না পেয়েই ভক্তদের এত কষ্ট। এর সন্ধানেই মানুষ তীর্থে ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায়। ভক্ত কবীরের বাণীতে আছে— 'হে সেবক আমাকে কোথায় অনুসন্ধান করছো ? আমি তোমারই পার্শ্বে রয়েছি। আমি কোন মন্দিরে নেই, মসজিদে নেই। কাবাতীর্থে আমি নেই, কৈলাসে আমি নেই। হে ভাই সাধো, আমি সকল নিঃশ্বাসের মধ্যে আছি।

'মো কো কহাঁ ঢূঁড়ো বন্দে, মৈঁ তো তেরে পাস মে।
না মৈঁ দেয়ল না মৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাস মেঁ ॥ ...
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো, সব শ্বাঁসো কী শ্বাঁস মে ॥[২২]

বাংলা দেশে গুরুবাদের কাঠামো ছিলই। অতঃপর পঞ্চদশ শতকে বাংলা-দেশ-পাক-ভারত মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার পর মুসলমান মরমী সূফীবাদের পলিমাটি বাউল সাধনার ক্ষেত্র উর্বর করেছে।

এ-কথা কারো অজানা নেই যে, ইসলামের অঙ্গ থেকেই মরমী সুফীবাদের জন্ম হয়েছে। সুফী ভাবই আরবী ব্যাকরণ মতে 'তসাওও'য়াফ' নামে অভিহিত। এই শব্দ পরে 'তত্ত্বজ্ঞান' বা 'ব্রহ্মজ্ঞান' অথবা ঈশ্বরানুভূতি পর্যায়ের হয়ে পড়ে।[২৩] মুসলমান সাধক গণের অনুভূতি ও সাধনা, দর্শন ও আচরণ ক্রমে রসুলুল্লাহ্‌-প্রচারিত ইসলামের পরিধির বাইরে প্রসারিত হয়ে পড়ে। হজরত মুহম্মদের (দঃ) আবির্ভাবের পূর্বেও একেশ্বরবাদ ছিল, কিন্তু অন্তরঙ্গ ও গভীর ঈশ্বরানুভূতি জীব ও ঈশ্বরের অভেদত্ব ও সংগে সংগে ঈশ্বর অথবা পরব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রেমের সম্বন্ধ — মানবাত্মাকে প্রেমিক ও ঈশ্বরকে প্রেমিকা বা প্রেমাস্পদের রূপকের দ্বারা বর্ণনা,— এইরূপ বোধ ও কল্পনা, ধ্যান ও ধারণা, এবং সাধনা ও আরাধনা নিয়ে, যখন খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মধ্যে সুফীমত নিজস্ব রূপ গ্রহণ করলো, তখন জগতের ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে দেখা দিল এক নতুন অধ্যায়।[২৪] এবং আরব-পারস্যে যে সুফীবাদের জন্ম হ'ল তাই বাংলাদেশ পাক-ভারতের মাটিতে ইসলামের অন্তরঙ্গ সাধনার এক লক্ষণীয় পথ হিসেবে এসে পৌছয়। সুফী ফকির বা যাযাবর পরিব্রাজক, ভারতের নানাস্থানে সুফী-মতের ইসলাম প্রচার করেন, এবং ইহার ফলে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধেরা অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করে। ভারতের ধর্ম-চিন্তা ও সাধনা, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকাশক কবিতায় সুফী-মতবাদ নিজ প্রভাব বিস্তার করে।[২৫]

সুফী-ধর্ম হৃদয়াবেগমূলক ধর্ম। সুফী সাধনায় মানব-সত্তার ধ্বংস এবং ভগবৎ সত্তায় অবস্থিতি। মানব-সত্তার বিলয়কে বলা হয় 'ফানা' এবং ভগবৎ-সত্তায় অবস্থিতিকে বলা হয় 'বাকা'।[২৬] অর্থাৎ সুফীদের মতে, জীবনের শেষ নেই, 'ফানা'র মধ্য দিয়ে মানবীয় গুণাবলীর ধ্বংস সাধন ক'রে নিরূপম আল্লার গুণাবলীতে মিশে অনন্ত জীবনে উত্তরণই সুফীর লক্ষ্য।[২৭] এই সুফী-ধর্ম-চেতনার প্রভাবেই উৎকৃষ্ট পল্লী কবিতা ও সংগীতের সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, স্পেনের লোক-সংগীত ও কবিতার কথা উল্লেখ করা যায়।[২৮]

এখন প্রবন্ধের মূল বক্তব্যে ফিরে আসা যাক্‌। এতক্ষণ অবধি যা বলা হ'ল তার সারকথা এই :

ক ॥ বাউল, বাংলার এক বিশেষ সাধক সম্প্রদায়। গানের মাধ্যমে তারা সাধনা করে।

খ ॥ হিন্দু ও মুসলমান—উভয় ধর্মের মানুষই বাউল সাধনা অবলম্বন করে।

গ ॥ বাউল গানে গুরুর মহিমা কীর্তিত। তারা 'সহজ মানুষ' (পরমাত্মা) -এর সন্ধানী। গুরুর কৃপা ভিন্ন সত্যপথ পাওয়া দুরূহ।

ঘ ॥ বাউলের জীবনে বৌদ্ধপ্রভাব আছে, হিন্দুর ভক্তিবাদের ও সুফীর প্রেম ধর্মের প্রভাবও আছে। কাজেই বাউলেরা কিছুটা বৌদ্ধ তান্ত্রিক, কিছুটা বৈষ্ণব-সহজিয়া এবং কিছুটা সুফী-মরমিবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

অর্থাৎ বাংলার বাউল গান এক প্রকার তত্ত্বকথা বা জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন ভিত্তিক এক নিগূঢ় জীবন-সাধনা।

একেবারে সাদা-মাটা ক'টা কথাই ধরা যাক্ না কেন। যদি বলা যায়—আমি একদিনও না দেখলাম তারে/আমার বাড়ীর কাছে আরশী নগর/এক পড়শী বসত করে, অথবা খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়/ধরতে পারলে মনো বেড়ি দিতাম পাখীর পায়, অথবা ক্ষেপা তুই না জেনে তোর আপন খবর/যাবি কোথায়/আপন ঘর না বুঝে বাহিরে খুঁজে/পড়বি ধাঁধাঁয়/প্রভৃতি আবেগময় বাউল গানগুলির মধ্যে তাত্ত্বিক, পণ্ডিত ও গবেষক খুঁজে পাবেন বাউল সাধনার গূঢ় তত্ত্বকথা।[২৯] এ-দাবি উত্থাপন করলে তাঁদের বড় একটা দোষ দেওয়া যায় না। বাউল গানে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথার বিচার সাপেক্ষেই তো তাঁরা এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এ-সিদ্ধান্তের পরেও কথা থেকে যায়। তাহ'লে বাউল গান কি কেবলমাত্র সাধন মার্গের তত্ত্বকথা অথবা বাউল নামধারী এক বিশেষ সম্প্রদায়ের বিচিত্র গূঢ় অভিজ্ঞতার রূপায়ণ? লোক সাহিত্য হিসেবে, অথবা লোকসঙ্গীত হিসেবে বাউল গানের মূল্য কতখানি সেটাও তো ভেবে দেখা দরকার। নচেৎ রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবি বাউল গানের প্রতি এমন ক'রে প্রশংসার কথা উচ্চারণ করলেন কেন? সে কি শুধু বাউল গানের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকথার জন্য—না,—তার উপরে আরো কিছু ছিল। শুধু তত্ত্বকথা হ'লে কবিকে বোধকরি এমন ক'রে উতলা ক'রে তুলত না। তত্ত্বের উপরে যা আছে সেটি হ'ল বাউল গানের সুর, ভাব ও ভাষা অর্থাৎ সাহিত্যের দিক্, সঙ্গীতের দিক্, রস-উৎসারণের দিক্। তত্ত্বকথা তো আছেই। এই গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে কি বলেন একবার দেখা যাক্। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোক সাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় ব'লে বিশ্বাস করি নে।"[৩০]

কবি-গুরু বাউল গানের চরিত্র বিচারে বলেছেন যে, তিনি লোক সাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পান নি। বাউল গানে জ্ঞানের তত্ত্ব আছে। তবু এটা লোকসাহিত্যই; অন্য কথায় তিনি বাউল-গানকে লোকসঙ্গীতের মর্যাদা দান করেছেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বাউল গানের প্রভাব তাঁর মনের উপর গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল, তার অকাট্য প্রমাণ উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যটি। এ-ছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের নানা জায়গায় এ-ধরণের প্রমান আছে।৩১ বাউল গানের উপর রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন কবি-গুরুর উত্তর-সাধক রসজ্ঞ সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর ঃ

"স্বদেশী যুগের সেই বাংলাদেশ, পদ্মা, ইছামতীর বুকে বোট নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। প্রাণে বন্ধন-মুক্তির ব্যাকুলতা......এই সময়ে বিধাতার আশীর্বাদের মতো অযাচিতভাবে পেলেন গ্রাম্য বাউলের উদাসকরা সুর; ......বাউলের সুরে কথা বসিয়ে স্বদেশীযুগে কত গান তিনি বেঁধেছেন। পরে আবার সেই সুরের অদল বদল ক'রে নিজস্ব ঢঙ্ ফুটিয়েছেন, কিন্তু কান পেতে শুনলেই ধরা যায় ভিতরের লোকসংগীতের নিঃশব্দ ধারাটি। ......নানা রকম পরীক্ষা চলতে লাগ্‌ল বাউল সুর নিয়ে। ......বাউল সুরের সংগে নানা রাগ-রাগিণী মিশিয়ে তিনি সুরের ইন্দ্রজাল বুনে দিলেন, যাতে বাউল সুরের গ্রাম্যতা দূর হয়; সুরের আভিজাত্য বজায় থাকে, আবার ব্যক্তি-সত্তাও থাকে অক্ষুন্ন। 'আমি তারেই জানি', 'এ বেলা ডাক পড়েছে', 'কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি', 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই' প্রভৃতি গানগুলি তাঁর সেই সার্থক প্রয়াসের সাক্ষ্য দেয়।"৩২.

রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে সহজ রূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাউল গানের প্রভাব প্রসঙ্গে সৌমেন্দ্রবাবুর মন্তব্য ঃ

"শিলাইদেহে রবীন্দ্রনাথ শুনলেন প্রাণ মাতানো সহজ সুরের গান, শুনলেন গগন হরকরার সেই বিখ্যাত গান, 'আমি কোথায় পাব তারে' অমনি সেই সুরে সৃষ্টি করলেন 'আমার সোনার বাংলা' গানটি। আরো অনেক গান তৈরী হ'ল বাউলের সুরে। বুঝলেন এই সুরেই তিনি পৌছুতে পারবেন দেশের লোকের মনে।"৩৩

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য স্পষ্ট হ'ল যে, বাংলার বাউল গান কথা, ভাব ও সুরের জন্যই 'পল্লীসঙ্গীত'—তথা লোকসঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে, সবার কাছে পরিচিত হয়েছে। "গ্রাম্য বাউলের উদাস করা সুর"-ই কবিগুরুর হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার তুলেছিল; গগন হরকরার "প্রাণ মাতানো সহজ সুরের গান" শুনে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন 'আমার সোনার বাংলা/আমি তোমায় ভালবাসি'-র মতো অপূর্ব সংগীত।৩৪ রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় যতগুলি স্বদেশী গান রচনা করেছিলেন তার ভেতরে লোকসংগীতের (বাউল গানের) ধারাটি স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। অতএব, রবীন্দ্রনাথ বাউল গানকে মূলত লোকসংগীত-য়ের মর্যাদাই দিয়েছিলেন।

অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থে বাংলার বাউল ও বাউল সাধনার ব্যাপক ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। বাউল গানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রশংসার হেতু বর্ণনা প্রসংগে উপেন্দ্রবাবু বলেছেন,

"তিনিই প্রথম লালন ফকিরের কতকগুলি গান তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে প্রচার করেন। কিন্তু খুব সম্ভব ত'হাদের বিশিষ্ট ধর্ম-মতের জন্য তিনি সেগুলি সংগ্রহ করেন নাই, পল্লী সাহিত্যের উচ্চভাব-সমৃদ্ধ নিদর্শন হিসাবেই সেগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।"৩৫

বাউল গান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ উপেন্দ্রবাবুর এ-মন্তব্য যথার্থ। এ-ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

অন্য এক সমালোচক বলেছেন—

"Essentially, Baulism is a school of music and it has its expressions in poetry and in songs. As most of the Baul Composers and singers originally belong to Kushtia, the language of the Baul Songs is mostly the dialect of the people of Kushtia and also Jessore and Faridpur."৩৬

বাউল গান যে উচ্চস্তরের লোকসংগীত সে বিষয়ে তাঁর মন্তব্য: "Baul music is a rich addition to our folk songs and ballads. Whether you are a Baul or not, you will enjoy the reverberating titles of the Baul music ······The folk composers and singers were devoted to spiritual pursuits in the simple and unsophisticated ways of life."৩৭

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাউল গান তত্ত্বকথা হয়েও লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা কি? লোকসঙ্গীত মানুষ কোনো স্কুলে শিক্ষা করে না, স্মৃতিই হ'ল তাদের বড় যন্ত্র। 'They are learned by ear, and transmitted in this fashion from generation to generation. Nor is there a conscious awareness of form or construction on the part of a folk singer.৩৮ অর্থাৎ বংশানুক্রমে লোকে যা শুনে আসছে তাই কিছুটা ...ন ও পরিবর্ধন ক'রে সে আপন খেয়ালে গেয়ে যায়। এবং যুগে যুগে ে... ম্পরায় এ-গান প্রচারিত হয়।

কিন্তু মাটির অতি নিকট থেকে এদের জন্ম, তাই প্রকৃতির অপার উদার আবহাওয়ায় এরা লালিত ব'লে এদের রচিত সংগীতের মধ্যেও সারল্য আছে। সরলতার আবেদন সর্বত্রই হৃদয় স্পর্শ করে, এই সারল্যপূর্ণ আবেদনের সংগে মাটির

গন্ধ আছে, আমাদের একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে।৩৯

এই যদি লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা হয় তাহ'লে নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, বাংলার বাউল গান উৎকৃষ্ট লোকসঙ্গীতরূপেই গণ্য।৪০ ডক্টর মযহারুল ইসলাম বলেন,

"বাউলদের একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায় না ব'লে আমি তাদেরকে একটি বিশেষ সংগীত-সম্প্রদায় ব'লে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি। একথা স্বীকার করি, বাউল মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশ একটি বিশেষ ধর্মভিত্তিক ছিল এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক অবধি বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিকতার ভগ্নাবশেষকে অবলম্বন ক'রে এদেশে একটি ধর্মসম্প্রদায় হিসেবেই তারা হয়তো পরিচিত ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং শতাব্দীর গোড়ার দিকে উদ্ভূত বাউল সম্প্রদায়কে বিশেষ একটি ধর্ম-সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। কেননা এই সময়ের মধ্যে বাউলদের অধিকাংশই মুসলিম সমাজ থেকে এবং কিছু অংশ হিন্দু সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে একটি সংগীত-সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলেছিল। তাদের সম্মুখে মূল আকর্ষণ ছিল ধর্ম নয়, সংগীত—সংগীতের একটি অনাবিল আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে গানের দল গড়ে তোলে, তাদের মূল লক্ষ্য একটি বিশেষ ঢঙের সংগীত সাধনার মাধ্যমে একটি বিশেষ ভাব-সাধনার প্রকাশ করা। ......

বাউল সম্পর্কে তর্কপূর্ণ মতবাদের কণ্টকে বা নীরস তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনার প্রাঙ্গনে প্রবেশ না ক'রে এক অত্যন্ত সত্য ও সর্বজন-স্বীকৃত কথা জোরালো ভাষায় বলে চলে—সে হোল এই যে, বাংলা লোক সাহিত্যের ভাণ্ডার এই বাউল সংগীত রচয়িতাদের কবিত্বে, ছন্দে ও গানে সমৃদ্ধ এবং মুখর হয়েছে। দীর্ঘ দুই তিন শতাব্দী ধরে বাউলগণ আমাদের লোকসংগীতের ধারাকে যেভাবে অশিক্ষিত গ্রাম্য জনসমাজের সম্মুখে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং যেভাবে গ্রামের মানুষকে নতুন নতুন সুর, ছন্দ ও ভাব প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছিল, তার নজীর যে কোন দেশের ইতিহাসে বিরল। লালন শাহ্‌, সিরাজ সাঁই, গগন হরকরা, মদন বাউল, দুদ্দু শাহ, পাগলা কানাই প্রমুখ গ্রাম্য কবি যে-কোন দেশের পক্ষে গৌরবের পাত্র।"৪১

মযহারুল ইসলাম সাহেবের বক্তব্য স্পষ্ট। তিনি বাউল গানকে মূলত লোক সংগীত ব'লেই মনে করেন। তত্ত্বকথার উর্ধ্বে লোকসংগীতের যে আবেদন রয়েছে যা ঐ গানের সুর, ছন্দ এবং গভীর ভাব-প্রেরণার সাহায্যে চিরদিন মানুষকে বি[illegible]চত হ[illegible], বাংলার লোক-সংগীতের ধারায় তার তুলনা নেই। "বাউল সংগীত এ[illegible]-বাতাস, মাঠ-প্রান্তরকে এক ঐকান্তিক সুরের বাঁধনে আবদ্ধ করেছে। বাউল সং[illegible]াদের লোক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।"৪২

এ-সম্বন্ধে অধ্যাপক মনসুর উদ্‌দীন বলেন, "বাউল ও মুর্শিদী গান আমাদের দেশের লোক সংগীত। এ-লোকসংগীত ধর্মভিত্তিক।"৪৩ তিনি অন্যত্র বাউলগানের মুকুটমণি ও সাধক লালন শাহ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "এই লোক

কবির বাণী আজ আমাদের বড় প্রয়োজন।"[৪৪] লালন যদি 'লোককবি' হন তাহ'লে তাঁর বাউল সংগীত লোক সাহিত্য বা 'লোক সংগীত' নামে আখ্যায়িত না হ'য়ে পারে কি ? "শ্রীহট্টের লোকসংগীত"-এর সম্পাদক ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক মনে করেন যে, "তত্ত্বের কথা ছেড়ে দিলেও নিছক সাহিত্য হিসেবে বা গীতি কবিতা হিসাবে বাউল গান অনেকখানিই উপভোগ্য।······সুর হিসাবে বাউল গান ভাটিয়ালীর তুলনায় অনেক বেশী সরল ও সহজ।[৪৫] নির্মলেন্দু বাবুর মতানুসারে বাউল গান মূলত লোক সংগীতই, ব্যাপক অর্থে লোক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

সর্বশেষে লোক সাহিত্য প্রেমিক মরহুম ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বক্তব্য উপস্থাপন করছি। আচার্য শহীদুল্লাহ্ বাউল গানকে লোক সংগীত (Folk Songs)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। এবং বলেছেন, "মুরশিদী ও মরমী গান আধ্যাত্মিক গান, ফকির ও বাউল গান।······গায়কেরা প্রায় অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। এ-সকল গানে কত প্রেম, কত আনন্দ, কত সৌন্দর্য, কত তত্ত্বজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।"[৪৬] কাজে কাজেই গূঢ় তত্ত্বকথা হয়েও বাংলার বাউল গান লোক সংগীত রূপেই চিরদিন রসজ্ঞ বাঙালির প্রাণকে আনন্দরসে উদ্বেল ক'রে রেখেছে। এই বাউলগান সংগ্রাহক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চেকোস্লাভেকিয়ার অধ্যাপক ডক্টর Dusan Zbavitel যা বলেছেন তাতে বাউল-গান লোক সংগীত রূপেই গণ্য। Dusan Zbavitel বলেছেন:

"Rabindra Nath himself collected poetry first of all 'Chhras' and later on songs of the popular muslim Baul Lalon Fakir from Kushtia (Nadia). He published them in the so-called Haramoni section of the journal 'Prabasi' which they occupies an important place in the history of Bengali folklore studies."[৪৭]

পাদটীকা

১। বাউল গানের সর্বজনীনতা, সহজতা ও অপূর্বতার জন্য লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী বাউল কবি লালন শাহ্‌ ফকিরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক মুহম্মদ আবূতালিব বলেন: "অধুনা সুধী সমাজে লালনের এই পরিচিতির মূলে এ কালের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম করতে হয় সকলের আগে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই লালনকে 'বটতলা' থেকে 'তে-তলা' পর্যন্ত যাতায়াতের সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়—মনে হয়, বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের প্রিয় গীতিকারদের মধ্যেও লালনের স্থান অতি উঁচুতে। 'বৈষ্ণব পদাবলী'র বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস, 'শাক্ত পদাবলী'র রামপ্রসাদের সঙ্গে বাউল তথা মারেফতী গীতিকার লালনের তুলনা সহজেই মনে আসে। বস্তুতঃ চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের মতো তিনিও মহাজন এবং কবি।" (লালন শাহ্‌ ও লালন-গীতিকা, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ১৭৬)

২। মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন কর্তৃক সংগৃহীত এবং সম্পাদিত 'হারামণি' ২য় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪২, পৃঃ ।৶—।।০)

৩। বাংলার বাউল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৫৪।

৪। ক্ষিতিমোহন সেনের 'বাংলার বাউল', থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৫৮

৫। হারামনি, ৭ম খণ্ড, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৩৭১, পৃঃ ৭-৮

৬। পাকিস্তানের লোকগীতি, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৬, পৃঃ ৮

৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০

৮। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন:

বাউলের তত্ত্বের মধ্যে উপনিষদ্‌, সহজিয়াদের 'সহজ' এবং সূফীদের প্রেম-ধর্মের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ হয়েছে।

(Obscure Religious Cults, Calcutta 1962, PP 164-181)

৯। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের "বাংলার বাউল ও বাউল গান।" ১ম প্রকাশ, ১৩৬৪, পৃঃ ৮৮

১০। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮

১১। Z.A. Tofazell, Lalon Shah & Lyrics of the Padma, 1st edition 1968. Page 12.

১২। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯, ৯১

১৩। মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃঃ ৩৭১, ৩৯০

১৪। রণজিৎকুমার সেন, বাঙ্গালী [illegible] স্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য। ১ম প্রকাশ, ১৩৬৬ পৃঃ ১২৮-২৯

১৫। মুহম্মদ আবদুল হাই ও [illegible] শরীফ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৬১, পৃঃ ৭-ত।

১৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ —'থ।

১৭। অধ্যাপক আহমদ শ[illegible] 'বাউল তত্ত্ব' প্রবন্ধ (বাংলা একাডেমি পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৩৭০ মাঘ-চৈত্র সংখ্যা[illegible]।

১৮। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৩

১৯। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২২

২০। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪০

২১। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৩

২২। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি, (কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃঃ ১৮) থেকে উদ্ধৃত।

২৩। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাংস্কৃতিকী, ১ম সংস্করণ ১৩৬৮, পৃঃ ১১৪

২৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১১

২৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২

২৬। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯৬

২৭। মুহম্মদ আবুতালিব, লালন শাহ্ ও লালন-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ১৯৬২, পৃঃ ১৪৩

২৮। R.A. Nicholson, Literary History of the Arabs, PP 416-44.

২৯। বাউল-গান যেহেতু একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতিসূচক ও তত্ত্বমূলক সাধন প্রণালী তাই ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন যে, এর গূঢ়ার্থ একমাত্র সাধকের নিকটই বোধ্য, সাধারণের নিকট বোধগম্য নয়। এ-জন্য বাংলার বাউল গান লোক সাহিত্যের অন্তর্গত নয়; বরং এ-দেশে আধ্যাত্মিক দর্শন-রূপে গ্রহণ-ই বাঞ্ছনীয়। [বাংলার লোক সাহিত্য, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ১৯৫৭, পৃঃ ৫৬-৫৭]

৩০। অধ্যাপক মনসুর উদ্‌দীন-এর 'হারামণি' ২য় খণ্ড, [১৯৪২, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত] পৃঃ ॥০

৩১। ক) 'গোরা' উপন্যাসের সূচনায় লালন শাহের সুবিখ্যাত গানের উদ্ধৃতি কবি ব্যবহার করেছেন:

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
কেমনে আসে যায়।'

খ) রবীন্দ্রনাথ ও বাউল গানের প্রভাব পর্যায়ে দুখানি বই কৌতূহলী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন। ১) আনোয়ারুল করিমের 'বাউল কবি লালন শাহ' এবং
২) Z.A. Tofazell-এর Lalon Shah & Lyrics of the Padma.

৩২। রবীন্দ্রনাথের গান, সংশোধিত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭৩ পৃঃ ৭-৮

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯

৩৪। পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত।

৩৫। বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ ১৩৬৪, পৃঃ ৯৫

৩৭। Z.A. Tofazell, Ibid, p11.

৩৭। Ibid, pp 26-28.

৩৮। A.M, Espinosa, Standard Dictionary of Folklore, Mythology

and Legend, New York, 1949. p 1030.

৩৯। আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৬৩ পৃঃ ৩৩০

৪০। "বাউল গানের প্রচলন আমাদের দেশে চিরকালই ছিল, কিন্তু শিক্ষিত সমাজে এর বিশেষ কোন মর্যাদা ছিল না।......মধ্যযুগের বহু কবি যোগ প্রকরণ ও সূফীতত্ত্ব নিয়ে অনেক কাব্য লিখে গেছেন। কিন্তু সে সব কাব্যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা ঘটেছে। বাউল গানে সে প্রকৃতির কোন তত্ত্ব ব্যাখ্যা নেই। বাউল কবি আপন কবি চিত্তের বেদনা এবং আন্তরিক অনুভূতিকে সহজ সুরে প্রকাশ করেছেন।" [মুহম্মদ আবদুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসানের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, আধুনিক যুগ, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৪, পৃঃ ৩৮]

৪১। পূর্ব পাকিস্তানের লোককৃষ্টি, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৮ জুন, পৃঃ ১০-১১

৪২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২

৪৩। পূর্বোক্ত পৃঃ ৫

৪৪। হারামণি, ২য় খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৪২, পৃঃ ১৯/০

৪৫। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ৯৬

৪৬। পূর্ব-পাকিস্তানের লোককৃষ্টি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২

৪৭। Z,A. Tofazell-এর Lalon Shah & Lyrics of the Padma গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। p 24.

গ্রন্থপঞ্জী

আবু তালিব, লালন শাহ্ ও লালন-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৮।
২য় খণ্ড, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৮।

আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত, মধ্যযুগের গীতি কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১ম প্রকাশ, ১৯৬১।

আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, আধুনিক যুগ, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৪।

আশরাফ সিদ্দিকী, লোক সাহিত্য, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৩।

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বাংলার লোক সাহিত্য, কলিকাতা, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ১৯৫৭।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ১ম সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৬৪।

ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার বাউল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৫৪।

নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত, শ্রীহট্টের লোক সংগীত, কলিকাতা, ১৯৬৬।

পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স, পাকিস্তানের লোকগীতি, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৬।

মনসুর উদ্‌দীন, হারামণি, ২য় খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২।
৭ম খণ্ড, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৩৭১।
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি, কলিকাতা, ১৩৫৬।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২০ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৬৭।
রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা প্রকাশিত, পূর্ব পাকিস্তানের লোক কৃষ্টি, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৮।
রণজিৎ কুমার সেন, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য, ১ম প্রকাশ, ১৩৬৬।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাংস্কৃতিকী, কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৮।
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের গান, কলিকাতা, ১৩৭৩।
A. M. Espinosa, Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, New york, 1949.
R. A. Nicholson, Literary History of the Arabs, Cambridge University, 1930.
Shasibhusan Das Gupta, Obscure Religious Cults, Calcutta. 1962.
Z. A. Tofazell, Lalon Shah & Lyrics of the Padma, 1968.
পত্রিকা :
বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ঢাকা, ১৩৭০ মাঘ-চৈত্র।

সুহৃদকুমার ভৌমিক

বাংলার মৌল সাহিত্য

আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ভালভাবে জানবার জন্য এমন কি বর্তমানে শিক্ষিত ও অনুশীলিত মননের পশ্চাতে যে অশিক্ষিত স্বভাবজ চিন্তা ও রুচির বিরাট অস্তিত্ব রয়েছে সেই লোক-মানসকে জানবার জন্য এই দেশে প্রাপ্য মৌল সাহিত্যগুলিকে দ্রুত সংগ্রহের আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য অনুভব করেছিলেন এবং নিজে সৃষ্টিশীল শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও আগ্রহান্বিত হয়ে বহু ছড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করে তার সুন্দর ব্যাখ্যা করেছিলেন। এখনও নির্ভয়ে বলা যেতে পারে সংগ্রহ ও ব্যাখ্যার আয়তনগত বিচার না করলে লোক সংস্কৃতির গবেষকগণের অর্ধশতাব্দিব্যাপি পথ-যাত্রার পরও রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁদের নিষ্প্রভ মনে হয়। তিনি ছেলেভুলানো ছড়াগুলির মধ্যে একটি শাশ্বত কালের আবেদন দেখেছেন যার ফলে দীর্ঘকালের ব্যবধানেও সেগুলি প্রাণ শক্তি নিয়ে টিকে রয়েছে। কিন্তু এ-কথা আমাদের মনে রাখা দরকার, যে পরিবেশ অনেক সময় মৌল সাহিত্যগুলিকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে— এবং যেহেতু এ গুলি মুখে মুখে রচিত ও কেবল আনন্দ ও রসভোগের জন্য, তাই একবার কোনো কারণে হারিয়ে গেলে তাকে ফিরে পাওয়া কষ্টকর হয়।

এ-ত গেল বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে। কিন্তু বৃহৎ বঙ্গে শুদ্ধ মাত্র বঙ্গ-ভাষাভাষীগণ বসবাস করেন না। প্রাক্-আর্য যুগ থেকে আরও ভিন্ন-ভাষাভাষীরা বসবাস করছেন।

তাদেরও এ রকম মৌল সাহিত্য রয়েছে; আয়তন বাংলা ভাষার তুলনায় ক্ষুদ্র নয় এবং প্রতিক্রিয়ায় বাংলা লোক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপর পরোক্ষভাবে প্রভাবশীল। কারণ বঙ্গ-সভ্যতা তাদেরই বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমচন্দ্রও এই বৈজ্ঞানিক সত্য উপলব্ধি করেছিলেন,—

"প্রথমে কোল বংশীয় অনার্য, তারপর দ্রাবিড় বংশীয় অনার্য তারপর আর্য এই তিনে মিলিয়া আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।......বাঙ্গালী সমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালী অনার্য বা মিশ্রিত আর্য ও বাঙ্গালী মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য। এই জন্য দূর হইতে বাঙ্গালী জাতি অমিশ্রিত আর্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্য বংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়। (কিন্তু ১৮৭১ সালের লোক সংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালার যে অংশে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, তাহাতে ৩০৬০০০০০ লোক বসতি করে, তন্মধ্যে ১১ লক্ষ মাত্র ব্রাহ্মণ)"

এই ভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে বাংলা সংস্কৃতির গোড়ায় রয়েছে অন্-আর্য উপাদান। বিশেষতঃ লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। উচ্চবর্ণের কয়েকটি হিন্দু ছাড়া আর সকলেই প্রাক্-আর্য, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিশাল হিন্দু সমাজে। এখনও অনেক অনার্য জাতি হিন্দু হচ্ছে। অনার্য জাতি আপনাদিগের অনার্য ভাষা পরিত্যাগ করে আর্য ভাষা ও আর্য ধর্ম গ্রহণপূর্বক হিন্দু হয়েছে। অর্থাৎ লোক-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক মানুষেরা মূলতঃ অন্-আর্য রক্ত সম্ভূত। সে-ক্ষেত্রে যে সমস্ত আদিবাসী এখনও তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বসবাস করছে তাদের মৌল সাহিত্যের সঙ্গে বাংলার লৌকিক সাহিত্যের সম্পর্কে থাকা স্বাভাবিক।

বাংলা দেশে যে আদিবাসী জাতিটি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ও তাদের পূর্ণ সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করছে তারা হল সাঁওতাল। সাঁওতালী হল বাঙলার দ্বিতীয় মৌখিক ভাষা। কিন্তু এই জাতি বাঙালিদের মতই আত্মবিস্মৃত জাতি। সম্প্রতি কিছু কিছু শিক্ষিত হড়-বন্ধুর মনে তাদের পুরাতন সংস্কৃতি, ভাষা ও সংস্কারকে জানবার ও জানাবার আগ্রহ দেখা দিলেও তা সীমিত অল্প কয়েকজনের মধ্যেই রয়েছে, এবং দলবদ্ধভাবে কাজে যোগ না দেওয়ায় উৎসাহগুলি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক এই কথা ভেবে 'সার-সাগুন' বলে একটি পত্রিকাতে এক আদিবাসী বন্ধু প্রবন্ধের শেষে দুঃখ করে প্রচলিত একটি ছড়া তুলে বলেছেন—পৃথিবীতে সাপের ভয়ে ব্যাংও ডাকবেনা, বৃষ্টিও হবে না আর সবুজ ঘাসও গজাবে না ফলে সমাজ-জীবন যাবে অচল হয়ে। এই রকম মনোভাব আর কতদিন সঞ্জীবিত হয়ে থাকবে?

দেন যোগো তোওয়া দাকা
বাণু আনআ তওযা দাকা
চেদাঃ বানু তওয়া দাকা ?
মিহুগেচ বায়্ ইতাদ্।
চেদাঃ মিহু বাম ইতাদ্ ?
ইঞ যু গেঢ় বায় তওয়ায়।
চেদাঃ গাই বাম তওয়ায় ?
ঘাস গেচ্ বাংঘাসঃ।
চেদাঃ খাস বাম্ ঘাসং ?
দাঃ গেচ্ বায় দাঃ।
চেদাঃ দাঃ বাম্ দাগ ?
রেট গেচ্ বায় রাগ।
চেদা রেট বাম্ রাগ ?
ডুলু ডুংগেয় উৎআকাদিঞ্ কুরসুং॥

অকর্মণ্য লোক অপরের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে নির্দোষ সাজে সেই নিয়ে ঠিক এই রকম ছড়া বাংলাতেও প্রচলিত আছে। যেমন "কেন রে বৌ ভাত দিসনা, কলাগাছ কেন পাতা দেয় না" ইত্যাদি। এই আদিবাসী বন্ধুর সঙ্গে একত্র হয়ে আমাদেরও বলা উচিত, শুধু হড় সমাজ কেন, বাঙালি সমাজেরও আশু কর্তব্য হবে যত শীঘ্র সম্ভব যে সমস্ত মৌল সাহিত্য ও তার উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে তা সংগ্রহ করা। বর্তমানে এই জাতীয় সাহিত্যের মূল্য কমে আসছে—তারপর সিনেমা, মাইক প্রভৃতির প্রচলন বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ তাদের চিরাচরিত গানগুলিকে ভুলে গিয়ে আধুনিক গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। হয়ত আর দশ বিশ বৎসর পরে এদের অল্পই অবশিষ্ট থাকবে।

সাঁওতালী গান ও ছড়া :—

সাঁওতালী গান ও ছড়া ভারতীয় আদিবাসী মৌল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গানগুলি যেমন ভাব ও সুরের রাজ্যে রোমান্টিক, তেমনি ছড়াগুলি তাল চিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলা ছড়ার মূল উৎস। সাঁওতালী গানের সুরগুলিকে লয় অনুযায়ী তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। লাঁগড়ে, লুহুরি ও ঝিঁঝাঁ। এদের মধ্যে লাঁগড়েই সর্বাধিক জনপ্রিয়। লাঁগড়ে লয়ের গান অর্থাৎ দ্রুত লয়ের গান। না থেমে দ্রুতগতিতে গান পরিবেশন। সম্ভবতঃ বাংলায় বহুল ব্যবহৃত নাগাড় কথাটি লাঁগড়ে থেকে এসেছে। যেমন এক নাগাড়ে কাজ করা।

গানগুলির ভাবগত বিচার বিশেষতঃ বাংলার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের আগে সাঁওতালী ছড়াতে ভাব ও ছন্দের সামান্য আলোচনা করা যাক। বাংলা ছড়ার ছন্দ জন্মসূত্রে সাঁওতালীর সঙ্গে জড়িত; কয়েকটি ছড়ার ছন্দোবৈশিষ্ট্য আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

ছড়ার ছন্দ হল (syllabic metre ; দলবৃত্ত) বাংলার মাটির ছন্দ। বাংলার সাধারণ মানুষ, যারা চাষ করে, ধান বোনে, যে মায়েরা দুপুরে ছেলে ভুলানো ছড়া কাটে তাদের মুখে মুখে তৈরী হল এই ছড়া। এ ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। সাধক রামপ্রসাদ এই ছন্দেই তাঁর গান রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গভীর বিশ্বাস ছিল যে এই ছন্দেই বাংলার যথার্থ সাহিত্য রচনা সম্ভব।

এই ছড়ার ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য হল এর প্রতি পর্বে চারমাত্রা, এবং মাত্রাগুলি দলমাত্রিক (syllabic)। বাংলা ও সাঁওতালীতে দুটি ছড়া পাশাপাশি রেখে ছন্দ-বিচার করা হল।

ওপারেতে । লঙ্কাগাছটি । রাঙা টুক্ টুক্ । করে
গুণবতী । ভাইটি আমার। মনটা কেমন। করে।

আর সাঁওতালীতে

তিহিঞ্ পেড়া। তাহেন সে সে। তিহিঞ্ তোয়া । দাকা
গাপাপেড়া । তাহেন সে সে । গাপা জেল । দাকা
দিন্‌গে পেড়া । তাহেন সে সে । দিন্‌গে রা ণে ॥ উতু

হে কুটুম, আজকে থাকলে দুধভাত খাওয়াব। যদি কাল ফের থাক তবে মাংস ভাত খাওয়াব। আর চিরদিনের মতো থাকলে রোজ রোজ ঝোল ভাত খাওয়াব।)

বর্তমান লেখকের ধারণা বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সাঁওতালী থেকে বাংলায় এসেছে — ভাব ও ছন্দে উভয় ক্ষেত্রেই। অনেক আদিবাসী বন্ধু আছেন যাঁরা বাঙালীদের জন্য বাংলা ও সাঁওতালী মিশিয়ে গান গেয়ে থাকেন। এ রকম একাধিক সাঁওতাল ভিখারী গায়কের দেখা বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। এ ছাড়া অনেক আদিবাসী বাঙালি-পাড়া বা বাঙালি বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে তাদের ভাব ও ছন্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহার করে থাকে। তাদের তৈয়ারী ছড়াতে আবার সাঁওতালী ও বাংলা শব্দের পাশাপাশি ব্যবহার দেখা যায়। মূলতঃ বাঙালি জাতি ও সংস্কৃতির উৎস সন্ধান করলে আমরা কোল-গোষ্ঠীর মানুষের কাছে উপস্থিত হই। সে ক্ষেত্রে বাংলা ছড়ার সঙ্গে সাঁওতালী ছড়ার মিল থাকা স্বাভাবিক।

সাঁওতালী গান ও ছড়াগুলির ভাবগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, আশ্চর্য চিত্রকল্প, ভাবের রাজ্যে বৈপরিত্য, কতকটা হেঁয়ালীর মতো ছিন্ন ছিন্ন ছবি অথচ তার মধ্যে এক সূক্ষ্ম সংযোগ।

এখানে কয়েকটি সাঁওতালী গান ও ছড়া পরিবেশন করা গেল যার মধ্য দিয়ে সাঁওতাল অনাড়ম্বর জীবনের চিত্র। তথাকথিত হিন্দু বাঙালি সমাজ জীবনের মতো আদিবাসী সমাজেও সমস্যা ও দারিদ্র্য পীড়িত ঘরের ছবি পাওয়া যায়। অতি শৈশব থেকে যে গৃহে বড়ো হয়েছে মেয়ে, সে তার সমস্ত স্মৃতি ও মায়া ছিন্ন করে চলে যায় স্বামীর দেশে। সেদিন তার মনে ভীড় করে আসে পুরাতন স্মৃতিগুলি।

এ ফুল রেয়াড়বাহা কাড়াঁ না সাবকাতে
দেলা দাঃলু
মেৎ দাঃ মা ঝর্ঝর্ মনেমা টলমল
জানাম দিশম রেয়াড় বাহাঞ বাগিয়াকান্
চাঁদো মিলন রেয়াড় বাহা জুরিদ
কালি অক্ষরতে অলদঃ মেনাআ
জানাম আতু, রেয়াড় বাহা আলম উই হা'রা

—হে সখি আমার মন জুড়িয়ে দেওয়া ফুল (বন্ধুকে দেওয়া সখের নাম—রেয়াড় বাহা) চল কলসি কাখে জল আনতে যাই। চোখের জল ঝর ঝর করে গড়িয়ে পড়ছে, মনও টল্‌মল্ করছে। যে গ্রামে জন্মেছি সে গ্রাম চিরকালের জন্য ছেড়ে চলে যেতে হবে।

হে বন্ধু রেযাড়বাহা! ভগবানের দেওয়া মিলনই প্রকৃত মিলন, প্রকৃত স্বামী সে কথা কালির অক্ষরে লেখা আছে। সেই কথা ভেবে তুমি জন্মস্থানের জন্য ভেঙে পড়ো না।

আর একটি গানে ফুটে উঠেছে এক অভিমানী মেয়ের কথা—

জানাম আয়োম জানাম লিদিঞ
সারজম সাকাম লেকা রিলা মালদঃ
হিসিদ জিঞি রিলিদ হড়্মঃ
ছঁচলতা গিডি লেকা এটাঃ অড়ারে॥

—মা তুমি আমাকে জন্ম দিলে, সবুজ শালপাতার মতো কোমল অঙ্গে হাসির আনন্দ দিয়েছিলে ছড়িয়ে। আর আজ ঘর নিকনো ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের মতো পরের ঘরে ফেলে দিলে।

—এইখানেই আদিবাসী জীবনের সরলতা প্রস্ফুটিত। সে নিজেকে অবাঞ্ছিত বলতে গিয়ে "ছঁচ্‌লতা" শব্দটি ব্যবহার করেছে। যে মায়ের উপর এত অভিমান সেই মা একদিন মারা যায়। দাদার বাড়িতে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করে 'দাদা গো, তুমি তো বছর পাঁচেক বাদে আমাকে নিয়ে এলে—কিন্তু মাকে তো পাচ্ছি না!—তখন দাদা

বলেন কেঁদোনা বোন্ কেঁদোনা, মা তেলকুপি ঘাট চলে গেছেন (অর্থাৎ মারা গেছেন)।

সাঁওতাল মৌল সাহিত্যের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দিক হল প্রেমের গান বা ছড়া। কত রসিকতা কত হেঁয়ালি, কত ঠাট্টা অথচ বিশুদ্ধ প্রেম ও আন্তরিকতা এর মধ্যে রয়েছে। একজন তার গৃহে আগত কোনো অতিথিকে বলেছেন, "ওগো কুটুম, যদি তুমি আজ আমার বাড়িতে থাক তবে আজ দুধ ভাত খাওয়াব, যদি কালকের জন্য থাক তবে মাংস রান্না করে খাওয়াব। আর যদি তুমি রোজ রোজ আমার বাড়িতে থাক তবে প্রতিদিনই স্নিগ্ধ ঝোল ভাত।" একটি মেয়ে সহজভাবে বলছে,

"জল আনতে গিয়ে আমি তিনটে বহড়া ফুল কুড়িয়ে পেলাম। একটা আমি খেয়েছি—আর দুটো আঁচলে বেঁধে রেখেছিলাম—ওগো আমার মনের মন—এই দুটি তুমিই খাও।"—

দাঃ লোইঞ্ দুকানা
পেয়া লোপং বেলে
ঞাম অনারে।
মিৎটাং ইঞ্ জমকেদা
বারে আইঞ্ গছাকেদা
নে জমমে মনের মন
লোপং বেলে।

নাচগানের আসরে প্রকাশিত হয় তাদের রসিকতা।

"যারা নাচবে, তারা কেমন সারে সারে দাঁড়িয়ে গেছে, আর যারা মাদল বাজাবে তারাও সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এখন এদের কার কী নাম আমি তো জানিনা। তবে যার হাতে সরু শাঁখা রয়েছে, আর যার গলায় কঁইতি বেলের মালা রয়েছে তার নাম কিন্তু রাধাকুমারী।"

বিবাহ বাসরে (দং সেরেঞ) যে সমস্ত গান গাওয়া হয় সেগুলিতে প্রেমের রোমান্টিকতা ও কল্পনার প্রাচুর্য রয়েছে।

"পাহাড়ের ওপর ঝির ঝির করে কী সুন্দর হাওয়া বইছে। আর ঝর্ণাতে থালের মতো ধীরে জল-স্রোত বয়ে চলেছে। গায়ে হলুদ মাখলে শরীরটা কী সুন্দর ফর্সা বাঙালিদের গায়ের রঙের মতো হয়ে যায়। আহা! আমার গায়ে যে সেই বাতাসই লেগেছে!"

বুরু চেতান হয় দ জুরি হালায় হালায়
গাড়া রেণাঃ দাঃ দকা কি লেগেম লিগেম
বেরেল সাসাং হড়ম বাঙ্গালি বর্ণ
ইঞ্ রেগে জুরি হয়দ বাজাঃ।

আর একটি লাঁগড়ে সেরেঞে আছে—

"সরু সরু রাস্তার মোড়ে অনেক মেয়ে জমে গিয়েছে ঝাঁকড়া জিরে গাছের মতো। তাদের মধ্যে যে ভাল নাচ গান জানে তার মনে আনন্দ ধরে না,—তার আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। যদি দুঃখ মনে হয় তখন চোখের জল গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু যদি সুখের কথা মনে হয় তখনও যে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।"

—এই গানটিতে কল্পনা মুক্তি পেয়েছে। অতি অনুশীলিত সাহিত্যেও এই জাতীয় কল্পনা মিলেনা।—

দুঃকিঞ্ উয় হ্‌ার জিরা ডার মেঃ দাঃ গেজরঃ
সুকি কি উয় হার জিরা ডার মেৎ দাঃ গেজরঃ!

দুঃখের দিনের কথায় চোখের জল গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু সুখের দিনের স্মৃতিতে যে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

গানের রোমান্টিক সুর অঞ্চল বিশেষে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন নক্সাল-বাড়ীতে আন্দোলনের সময় চা বাগানের আদিবাসীদের খবর জানবার জন্য গিয়ে যেমনি তাদের অভাব অনটন প্রত্যক্ষ করেছি তেমনি গান ও ছড়ার মধ্যে তার বিকাশ দেখেছি।

"যেতে যেতে রাস্তার মাঝে একটি মিষ্ট তেঁতুল গাছ দেখলাম। মনে হল মিষ্ট তেঁতুলগুলো পেড়ে নিই। আবার মনে হল ছিঁড়ে নিয়ে চলে যাই। যদিও জানি একাজ খুব খারাপ।"

কিংবা—

মারাং বুরুদ নাড়ি গেচঃ টা
দেজ নাড় গনতে ডাড়ায় কেন্
বংশী বাজাররে ঝিলে নাড়্ জমতে
মনে মনেতে দাঃ তে-তাঙ্গা

অর্থাৎ—

মারাং বুরু কিনা শিবের পাহাড়ে উঠতে নামতে কোমরে ব্যথা লাগে। বংশী বাজারের ঝিলে মিষ্টি খেলেই অন্তঃস্থল থেকে তৃষ্ণার উদ্রেক হয়।

টাকার অভাবে ছেলের বিয়ে দিতে পারে না বাবা। এ জন্য ছেলের কি দুঃখ!

মড়ে সেরমা আকাল কেদা
চিকাতে ববুইঞ্ বাহু আমা
অঁড়া আরে জম্ ইউ চিহনহ বনু অ্যা
হাবাই দঁই কোড়াই দঁই
মোচা গচু জানামেন৷
ধরম বোদা দহ কিদিঞ

দেশারে দিশমরে নাঙ্কম মেসে বাবা
লিমো দাঁড়ি আজুস কঁয়ারী
তাহেন তেদ মোকা এ না।

অর্থাৎ—

পর পর পাঁচ বছর অজন্মা। কি করে তোমার বিয়ে দিই। বাড়িতে খাবার কিছু নাই। —বড় হলাম দাঁড়ি গোঁফ্ বেরোল। তবুও তুমি আমাকে ধরম পাঁঠা করে রাখলে।—ইত্যাদি।

ছোটোদের উপযোগী নির্মল হাস্যরসের কি রকম প্রয়াস—

বারাহিতে ছান্দাকাতে
লিমকো দোহাও আকান কারাহিরে

"মোটা কাছিতে একটা মুরগি বেঁধে বিরাট একটা কড়াইতে দুধ দোহানো হচ্ছে।" এই রকম অসম্ভব চিত্রকল্প বাংলায় বিস্তর আছে। হালের গরু বাঘে খেয়েছে বলে যেখানে পিঁপড়েরা মই টানে সেখানে এর অবাধ প্রবেশ রয়েছে। সংগৃহীত সাঁওতালী ছড়াতে প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন পাওয়া যায় বাঙলাতেও—ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে। তখন দারিদ্র্য এত প্রখর হয়ে দেখা দিয়েছিল যে বুলবুলিতে ধান খাওয়ায়—খাজনার টান পড়েছিল। এদেরও একটি ছড়াতে দেখি

„মুরগি রে মুরগি
তুই ডিমটা দিয়ে দেনা,—আমরা নিয়ে পালিয়ে
যাব, বর্গিরা আসছে করতে হানা।

"এ সীম্ সীম্, দেবুনাক মে, বুর্গি কো হিজু কানা, দোড় বাগিয়াম।"
বাঙালীদের জন্য সাঁওতালদের তৈয়ারী ছড়া বাংলাতে বিস্তর পাওয়া গেছে। আবার সাঁওতালী ছড়াতে বাংলা বা ইংরাজী শব্দ ঢুকে মজা সৃষ্টি করেছে আদিবাসী মহলে। যেমন—

ছাটকায়ে নিমগাছ
বাড় গেগের পিপুঁল গাছ
ডোয়েরেনা আলা বালা
পুরব নাথা দোর দাদা মাগমে
বেনাওলাং কাপাটে কুলুম।

প্রাঙ্গনে নিমগাছ, বাড়িতে পিপুলগাছ, ডালপালা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। দাদা পূর্বদিকের ডাল কেটে আমরা চাবির কপাট বানাব।

অথবা—

তালাক্রিদা সেস পহর
ইউ আর নট্ কামিং আই অ্যাম্ সরি
বাড়াগেয়াম গাতে, সাঙ্গে বহয়া
ইউ আর নট্ কামিং আই অ্যাম সরি

এখন মধ্যরাত্রির শেষ প্রহর, তুমি আসছনা বলে আমি দুঃখিত। তুমি তো জান আমরা অনেক ভাই বোন। তুমি আসছনা বলে আমি দুঃখিত।

বাংলার মৌল সাহিত্য প্রসঙ্গে বাংলা ছড়ার উৎস সন্ধানে সাঁওতালী ছড়া ও গানের বিস্তৃত আলোচনার একমাত্র কারণ হল বাংলার সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায় ও কতখানি। শুধু সাঁওতালী ছাড়া বাংলা দেশে মুণ্ডা ও ভিন্ন কোল গোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে। তুলনামূলক বিচারে সাঁওতালী মৌল সাহিত্যই আমাদের কাছাকাছি।

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর যে সমস্ত মানুষরা বাংলা দেশে বসবাস করে তাদের মধ্যে কাকমারা অন্যতম। তারা যাযাবর, একজায়গায় দীর্ঘকাল থাকে না—ফলে সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্বে (culture & personality) সাঁওতালদের তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির। ভিক্ষাই এদের জীবিকা—এবং তা সম্মান-জনক নয় বলে কোথাও কোথাও বাঙালিদের মতো স্থায়ীভাবে বসবাস করার চেষ্টা করছে। এবং আগামী দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে এরা বৃহৎ বাঙালি সমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। সাঁওতালী মৌল সাহিত্যের কিছু কিছু ছাপা হয়েছে কিংবা হচ্ছে তা সে যে হরফেই হোক না কেন। কিন্তু কাকমারা-ভাষায় কিছুই হয়নি। এখানে দুএকটি কাকমারা গান পরিবেশন করা গেল।—

প্রেমিকের আহ্বান

না আণ্টা রায়ে গল পাড়সা।
উন্টি কি রাইথালো ইচ্ছেনু গাণি।
না আণ্টা রায়ে গল পাড়সা।
সে তি কি সুরগুলু ইচ্ছে নু গাণি।
না আণ্টা রায়ে গল পাড়সা।
নেণ্ডিকি সাঁউক ইচ্ছেনু গাণি।
না আণ্টা রায়ে গল পাড়সা।

তোমার জন্যে গায়ের জামা দিচ্ছি তুমি আমার সঙ্গে এসো। তোমার হাতের ব্রোঞ্জ দিচ্ছি আমার সঙ্গে এসো। মাথায় আতর তেল দিচ্ছি আমার সঙ্গে এসো।

প্রেমিকার উত্তর :—

আসমান্টি রাইথালু না থাড়া উণ্ডাই
পারেরি এরিগনা তুম্মা খলু
পারোরি এরিগলা তুম্মা খলু
আসমান্টি কাড়িআলু না থাড়া উণ্ডাই
পারোরি এরিগলা তম্মা খলু
পারোরি এরিগলা তম্মা খলু
আসমান্টি সাউরু না গাড়া উণ্ডাই
পারোরি এরিগলা তম্মা খলু।

ঐ রকম বহু জামা আমার পড়ে আছে, কেন তুমি আমাকে ডাকছ। ঐ রকম ব্রোঞ্জ আমার ঘরে পড়ে আছে—কেন তুমি আমাকে ডাকছ। ঐ রকম আতর তেল আমার ঘরে পড়ে আছে। কেন তুমি আমাকে ডাকছ?

বরকন্যার বিবাহের গান :—

সালুগা রাচ্চায়লু
লাউরাঙ্গা ছুন্নি
এলুগা রাচ্চায়লু
এক রাঙ্গা ছুন্নি
পেল বিচ্ছু মা—সেতা
নাড়াকা সাদামা
পিলপু এমি সাদামা
সেলখা পাল খাল্ল
নাড়খে এমি সুসেউ
আমসা নাড়খালু
ওলি এনতা সাল এনতা
ওপেদ্দা লালা
আরগুনা আর ওয়াই
ওলি ডাব্বাই
আখোনা তটাল্ল
আরাইয়া উন্দি
সেরখুনা তটাল্ল
অয়া আন্নি উন্দি।

অর্থাৎ—

প্রথম বর তরফের লোক এসে কন্যার বাড়িতে উপস্থিত। কন্যার বাবাকে জিজ্ঞাসা করছেন

তোমার মেয়েকে আনাও আমরা দেখি এবং তার কণ্ঠস্বর আমরা শুনব। আর চলবার ঢং-ও আমরা দেখব। তোমার কন্যার পণ কত ?—তোমার পাত্র কী কাজ করে। আমার পুত্র ভিক্ষা করে। তোমার মেয়ের জীবিকা কি ? আমার মেয়ের জীবিকা ভিক্ষা।

এই কোল ও দ্রাবিড়গোষ্ঠী ছাড়া বাংলা দেশে কিছু মঙ্গোলীয়গোষ্ঠীর মৌল সাহিত্যের উপাদান সংগৃহীত হতে পারে—যা বঙ্গ সংস্কৃতির খুব কাছাকাছি। বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীতে রচিত এই সমস্ত গানের উর্দ্ধে বাংলা ভাষায় রচিত লোক সাহিত্য, যেমন পটুয়া সঙ্গীত, ছেলে ভুলানো ছড়া, বাউল ছড়া ও ট্রেনের অল্পদামী কবিতার বই আমাদের মৌল সাহিত্যের অন্যতম উপাদান। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় ভারততত্ত্ববিদ ডেভিড ম্যাকাচ্চনের কর্ম প্রচেষ্টার কথা মনে পড়ে। কেন কি জানি শেষের দিকে তাঁর এই ধারণা হয়েছিল বাংলার লোক সংস্কৃতিজাত সাহিত্যগুলির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। তিনি বর্তমান লেখককে দিয়ে বহু পটুয়া সঙ্গীত সংগ্রহ করে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অল্পপূর্বে ইংরাজীতে পটুয়া সঙ্গীতের পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী হয়ে গিয়েছিল। এর পরের পরিকল্পনা ছিল ট্রেনে যে সস্তায় দশপয়সায় কবিতার বই গান গেয়ে গেয়ে বিক্রয় হয়—যেমন মামা-ভাগ্নের প্রেম, বৌদি-ঠাকুরপো'র ছড়া, শ্বশুরের বাড়িতে জামায়ের ডাকাতি ইত্যাদি—তার সংগ্রহ করে ইংরেজীতে অনুবাদ করা। পাশ্চাত্যে, বিশেষত জর্মানীতে এই জাতীয় সংগ্রহের নানা সংস্থা আছে। তথাকথিত অনুশীলনজাত সাহিত্যের উপর লোক-সাহিত্যেরই প্রভাব বেশি। পৃথিবীতে classic সাহিত্যের মূল বীজ সন্ধান করলে আমরা লোক সাহিত্যের দ্বারে এসে উপস্থিত হই। ফাউষ্ট গ্যেটের পূর্ব থেকেই পাশ্চাত্য লোক-জগতে পরিচিত গল্পের নায়ক—এমনি শেক্সপীয়রের বহু গল্প। আবার তাঁরাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যাদের সাহিত্য লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে —প্রবাদ বাক্যে বা হেঁয়ালীতে। যেমন আমাদের দেশে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ।

বর্তমান লোক সংস্কৃতি সহরমুখী হয়ে পড়ছে। যান-বাহন ও বৈদ্যুতিক আলোর প্রসার, সস্তায় রেডিও এবং মাইকের ব্যবহারে দীর্ঘকালের লোক সংস্কৃতির স্রোতে এক সন্ধিক্ষণ দেখা দিয়েছে। সংস্কৃতি-রসিকরা যদি এই সমস্ত মৌল সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে তৎপর না হন তাহলে বাংলার লোক-সংস্কৃতির আলোচনায় হবে বিরাট ক্ষতি।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

উনিশ শতকের মনন চর্চা ও বঙ্গদর্শন

উনিশের শতকে বাঙালী সমাজে যে প্রবল আলোড়ন জেগেছিল, তাকে পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসের অর্থে রেনেশাঁস বলা যায় না। ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের রেনেশাঁসের ব্যাপকতা ও মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ থেকে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি আমাদের দেশে দেখা যায় নি ঐতিহাসিক কারণেই তা সম্ভব হয়নি। ইংরেজ শাসনের প্রথমেই দেশজোড়া গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামো ভেঙ্গে চূরমার হল। নতুন শিল্পগত অর্থনীতিক ভিত্তি গড়ে উঠতে দেওয়া হল না। অথচ তার ওপর এসে পড়ল বিদেশী পণ্য শিল্পের প্রভাব।

সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থেই অতিশয় সীমাবদ্ধ অর্থে শাসকপক্ষ আধুনিক বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার বিকাশ ঘটাল। কিন্তু তার স্বাভাবিক প্রসারের দরজা বন্ধ করে দিল। সে জন্যই এল জনশিক্ষা নয়, 'ফিলটার ডৌন' হবার শিক্ষাপদ্ধতি।

সতেরশ সাতান্ন থেকে আঠরাশ সাতান্ন সালের মধ্যে ইংরেজ প্রশাসন অনেকবার ধাক্কা খেয়েছে এবং কিছু কিছু নীতি বদলেছে। অবশেষে সিপাহী বিদ্রোহ। তার ধাক্কা সামলাতেই 'দয়াবতী' ভিক্টোরিয়ার ঐতিহাসিক ঘোষণা—ইংরেজ সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা।

এই রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের মধ্যেই সমাজ পটভূমি আমূল পরিবর্তিত হচ্ছিল। এর পূর্বের বহিঃসংঘাত, বিদেশী শক্তির বিজয়ের তুলনায় ইংরেজের বিজয় সম্পূর্ণ ভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথ এই মৌল রূপান্তরকে 'কালান্তর' বলেছেন। বিশ্ব ধনতন্ত্রের ইতিহাসের সঙ্গে আমরাও অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়লাম। অবাধ লুণ্ঠন, নির্মম শোষণ, উদ্বৃত্ত মূল্য অপহরণ—ধনবাদের এই নীতি আমাদের সম্পদ গ্রাস করতে লাগল। তখনো অর্থনৈতিক রাজনৈতিক চেতনা দানা বাঁধেনি।

তবু রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা অংশত এর প্রতিবাদও করেছিলেন। নীলের বহির্বাণিজ্যে ভারত লাভবান হলে ভারতীয় কৃষকও তার অংশ পাবেন এই ধারণাতেই রামমোহন নীল চাষ সমর্থন করেন। চতুর্থ জর্জকে লেখা তাঁর চিঠিতে প্রেসের স্বাধীনতা, রায়তের অধিকার প্রভৃতির উল্লেখ আছে। পঞ্চান্নটি অনুচ্ছেদ সম্বলিত এই চিঠি বিশ্বের মুক্তি চিন্তার ইতিহাসে দ্বিতীয় এ্যারিওপ্যাজিটিকারূপে গণ্য হতে পারে।

রাধাকান্ত দেব ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাচীনপন্থী ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সামাজিক ব্যাপারে নব্যপন্থীরা আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে একমত ছিলেন।

তখনকার সভা সমিতিগুলি সমকালীন ভাব সংঘাতের প্রতিনিধিত্ব করত। আত্মীয় সভা, জ্ঞানোপার্জিকা সভা. জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা, বিদ্যোৎসাহিনী সভা বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা প্রভৃতি নব্যপন্থী প্রগতিশীলদের মেলবার জায়গা ছিল। তেমনি রক্ষণশীলদের মিলন কেন্দ্র ছিল ধর্ম সভা. টাকি সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা, নিত্য ধর্ম রঞ্জিনী সভা প্রভৃতি। এই সব প্রতিষ্ঠানের আলোচনা সমালোচনা ও বিতর্ক কেবল প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণীতে নয়, সাময়িক পত্রেও প্রকাশিত হত এবং ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করত। বেঙ্গল হেরাল্ড বা বঙ্গদূত, বেঙ্গল স্পেকটেটর, জ্ঞানান্বেষণ, তত্ত্ববোধিনী, সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়, সংবাদ প্রভাকর, বিবিধার্থ সংগ্রহ, রহস্য সন্দর্ভ ও বঙ্গদর্শনে ধর্ম, সমাজনীতি রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের বিচিত্র মননচর্চার পরিচয় পাই। বলা বাহুল্য বাঙ্‌লার নব জাগৃতির সীমা এবং কলোনীয় পরিবেশের বাধা সম্পর্কে অনেকেই সচেতন ছিলেন না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যদিও কেউই বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি কিন্তু ভাবুকতা ও মননের ক্ষেত্রে সীমিত অর্থে রেনেশাঁস চেতনার বিকাশ ঘটেছিল।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের উল্লেখ্য দান হলঃ ১) যুক্তি নির্ভর চিন্তাপদ্ধতি ও ঋজুগদ্যরীতি, ২) সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের রস পরিবেশন, ৩) আপ্ত-বাক্য রূপে নয়, লোকহিতের ভিত্তিতে ধর্মের বিচার।

তত্ত্ববোধিনীর চেয়ে প্রভাকরে মননচর্চার গুণগত উৎকর্ষ ঘটেনি, কিন্তু আধুনিক

চিন্তাধারার ফসলকে ব্যাপক পাঠক সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল। বঙ্গদর্শনের পূর্বেই প্রভাকর 'পাঠক পড়ান ব্রত' নিষ্পন্ন করেছিল। প্রভাকরেই প্রথম পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী যুগ্মবেণী রচিত হয়। বঙ্গদর্শনে সেই মিলন সাধনার পরিণতি।

॥ দুই ॥

বিবিধার্থ সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল—'To provide a sound and useful vernacular domestic literature for Bengal.' বঙ্গদর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় পাত্রিকা। পূর্বের পত্রিকা গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার বঙ্গদর্শনে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিক ইতঃপূর্বে সাময়িক পত্র সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেন নি। বঙ্গদর্শন-মাধ্যমে তিনি 'দেশব্যাপী একটি ভাবের আলোড়ন' সৃষ্টি করলেন। বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠী বঙ্কিমের আকাঙ্খাকে সার্থক করে তুলেছিলেন।

১৮৬১ থেকে ১৮৭৪ সালের মধ্যে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, লোহারাম শিরোমণি, রামগতি ন্যায়রত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয় সরকাব, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রেভাঃ লালবিহারী দে, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মনীষীরা মুর্শিদাবাদ-সদর বহরমপুরে মিলিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া মদনমোহন তর্কালঙ্কার, কালীবর বেদান্ত বাগীশ, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন। সর্বোপরি উল্লেখ্য ডঃ রামদাস সেন ও তাঁর গ্রন্থাগারের কথা। এই সারস্বত সম্মিলন থেকেই বঙ্গদর্শন-চিন্তার উদ্ভব। এঁরা সকলেই অধীত বিদ্যার আলোকে স্বদেশ 'ভারত', বিশেষত 'বঙ্গ'কে দর্শন করতে চেয়েছেন। বহরমপুর কাছারি ঘরের 'নবরত্ন-সভা', মুর্শিদাবাদ হিতৈষী সভা ও গ্র্যাণ্টহল ক্লাবের আলোচনাতে সেকালের মনন-চিন্তন প্রতিফলিত হয়েছিল। গ্র্যাণ্টহল ক্লাবে লিখিত প্রস্তাব Indian civilization পড়েন বঙ্কিম, গুরুদাস পড়েন Abused India Vindicated, লালবিহারীর বেঙ্গল ম্যাগাজিন ও বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন একই উদ্দেশ্যের বাহন। বেঙ্গল ম্যাগাজিনের প্রস্পেক্টাসে আছে '—will take up all important questions with Indian Politics and Society. No pains will be spared to make the Magazine worthy of the best educated and most advanced section of the Bengalee Community'. বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনায় আছে: 'আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব।...এই পত্র আমরা

কৃতবিদ্যা) সম্প্রদায়ের হস্তে আরো এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহরূপে ব্যবহার করুন। তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গ মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।' একই উদ্দেশ্যের প্রকাশ বাংলা বঙ্গদর্শনে এবং ইংরেজী বেঙ্গল ম্যাগাজিনে। অনেকে দুটি পত্রেই নিয়মিত লিখেছেন। তত্ত্ববোধিনীর জ্ঞানান্বেষা সাধারণ পাঠকদের উপযোগী ছোট ছোট সচিত্র প্রবন্ধে বিবিধার্থ সংগ্রহ রহস্য সন্দর্ভ আরো সার্থকভাবে পরিতৃপ্ত করেছিল। সেই ধারা বঙ্গদর্শন অক্ষুন্ন রাখে। বঙ্কিমচন্দ্র রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অক্ষয় সরকার চন্দ্রনাথ বসু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় রামদাস সেন প্রমুখের দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস বিষয়ক রচনাগুলি তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু এগুলি যে পূর্ববর্তী লেখকদের তুলনায় উন্নতমানের সে কথা বলাই বাহুল্য। তার সঙ্গে যুক্ত হল নতুন আদর্শ—যা বঙ্গদর্শনের পূর্বে ছিল না। ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে মৌলিকচিন্তা, দেশপ্রেম, ঐতিহ্য গৌরব, সাহিত্য বিচারের আদর্শ, সমকালীন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, ব্যঙ্গমূলক সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে বঙ্গদর্শনেরই দান।

॥ তিন ॥

এখানে স্থানাভাবে আমাদের আলোচ্য কেবল বঙ্গদর্শন লেখকগণের ইতিহাস চিন্তা। পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসের আদর্শে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সময় থেকেই ইতিহাস রচনার উদ্যোগ দেখা গেছে। রামরাম বসু, রাজীবলোচন, তারিণীচরণের প্রয়াস ছাড়াও স্বয়ং বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার অনুবাদমূলক ইতিহাসগ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের পূর্বে আর কেউ বাংলা দেশের ও জাতির বৈশিষ্ট্যকে 'ইতিবৃত্ত' হিসেবে অনুশীলন করেন নি। এর সঙ্গে বঙ্কিমের 'ইতিহাসের ভগ্নাংশ', 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' অবশ্য স্মরণ করতে হয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লালমোহন বিদ্যানিধি ও প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস চর্চায় আগ্রহী হন।

খাঁটি পুরাতাত্ত্বিকের এবং স্মার্ত ভারতীয়ের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি আর্য সভ্যতার ইতিহাস সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। 'ভারতীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা' বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। 'সম্বন্ধ নির্ণয়' লালমোহনের বহু শ্রমসাধ্য কীর্তি। পদ্মপুরাণ, রাঢ়ীয় ঘটক কারিকা, কায়স্থকুল প্রদীপ প্রভৃতি অবলম্বনে এবং প্রবীণ

ব্যক্তিদের স্মৃতি কথা থেকে লালমোহন বাঙালী ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ, সদ্গোপ, কৈবর্ত, সুবর্ণ বণিক, মাহিষ্য, বারুই, তিলি প্রভৃতি জাতির ঐতিহাসিক পরিচয় সংগ্রহ করেছেন। অধুনা সরেজমীন তথ্য সংগ্রহ উন্নত গবেষণা কর্মের মর্যাদা পাচ্ছে। লালমোহনই সম্ভবত এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। একক ব্যক্তির উদ্যমে এমন সুবিশাল কুল-পঞ্জী, জাতিপঞ্জী সংকলন করা দুঃসাধ্য। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে (১২৮২ অগ্রাণ পৃঃ ৩৫২-৫৩) লেখেন : 'এই গ্রন্থখানি ইউরোপে প্রচারিত হইলে একটা কোলাহল বাঁধিয়া উঠিত···কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের দূরদৃষ্ট ক্রমে তিনি বাঙালী, বাঙলা দেশে বসিয়া বাঙালা ভাষায় এই পুস্তক লিখিয়া বাঙালী সমালোচকের হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন।' অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের উক্তিও স্মরণীয় : 'রাজেন্দ্রলাল থেকে আজ পর্যন্ত যে সব ইতিবৃত্ত সাধক আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা সকলেহে ইংরাজী শিক্ষায় কৃতবিদ্য এবং উইলিয়ম জোনস্, কোলব্রুক প্রভৃতি প্রতীচ্য মনীষীদেরই উত্তর-সাধক। যাঁরা একান্তভাবে ভারতীয় শিক্ষায় ও ভারতীয় পদ্ধতির অনুবর্তী, তাঁদের কাউকেই ইতিহাস সাধনার ক্ষেত্রে দেখতে পাইনা। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছেন লালমোহন বিদ্যানিধি।' নব্যভারতে (আশ্বিন ১৩১২) প্রকাশিত 'বঙ্গদেশে ইতিহাস চর্চা' প্রবন্ধেও লালমোহনের প্রাচ্যরীতি প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর 'তিলি জাতির সমন্বয় কারিকা' (প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৫৫) সংগ্রহের রীতি উদ্ধৃত করা হল। 'বর্ধমান জিলার বৈদ্যপুর নিবাসী ৺মধুসূদন নন্দী তিলি জাতির সমন্বয় কার্যে ব্রতী হইয়া ঐ জাতির বিষয় যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার প্রতিলিপি হাসনহাটির কুলাচার্যদিগের মধ্যে কেহ সংকলণ করেন। তাঁহার নাম কালিদাস শর্মা। কাল বশে উহা হস্ত লিখিত কবি কঙ্কন চণ্ডীর অংশবিশেষ বলিয়া তদীয় উত্তরাধিকারীর নিকট প্রতিভাত হয়। কিন্তু দৈবগত্যা উহা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺রামগতি ন্যায়রত্নের হস্তগত হয়। তিনি উহা তাঁহার ছাত্র শান্তিপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পণ্ডিত ৺নিত্যানন্দ গোস্বামীর অনুরোধের বশবর্তী হইয়া শান্তিপুর নিবাসী সুকবি ৺হরিমোহন প্রামাণিকের পুত্র দেশহিতৈষী বিখ্যাত যশোদানন্দন প্রামাণিক এম-এ, বি-এল হাইকোর্টের সুযোগ্য উকীলকে বিশেষ আগ্রহ এবং যত্ন সহকারে প্রতিলিপি করিয়া সম্বন্ধ নির্ণয় ক্রোড়পত্রে সংবদ্ধ করিতে বলেন।···এক্ষণে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইলেও কর্তব্যের অনুরোধে যথাযথরূপে অবিকলভাবে সংগৃহীত বিষয় সন্নিবেশিত করিলাম।' বাঙালীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ছাড়া বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে না। এ কথা লালমোহন বুঝেছিলেন। কিন্তু তাঁর তথ্য

সংগ্রহের রীতি যথার্থ ঐতিহাসিক নয়। অম্বিকা কালনা, বর্ধমানের 'মল্লিক-বসু বংশের এই তালিকা শ্রীশশধর ঘোষ প্রদত্ত। সাং রাজঘাট, জিলা যশোহর' ধরণের উক্তি থেকে কোন কুলপঞ্জীর সত্যতায় নির্ভর করাও কঠিন।

॥ চার ॥

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' একটি আশ্চর্য গ্রন্থ। বারটি 'প্রস্তাবে' রাজধর্ম, রাজন্যবর্গ, ব্রাহ্মণবর্গ, ভূ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি অধ্যায়ে — তিনি রামায়ণ থেকে সামাজিক ভৌগোলিক রাষ্ট্রিক ইতিহাস নিষ্কাশন করেছেন। লেখক পাশ্চাত্য সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে রামায়ণের সামন্ত ব্যবস্থার তুলনা করেছেন। ভরদ্বাজ আশ্রমে রাম-ভরত মিলনের সময় রামের কুশল প্রশ্নে প্রাচীন ভারতের শ্রেণীবিন্যাসের পরিচয় আছে। অন্তঃপুরাধিকারী, দৌবারিক, পুরোহিত, প্রাড়াবিবাক জজপণ্ডিত, ধর্মাসনাধিকারী, আটবিক, দণ্ডাধিকারী, দুর্গপাল, গ্রামপতি, পুরপতি প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয়েছে।

আদর্শ-রাজন্যের সবগুণ রামচন্দ্রে এবং সম্ভাব্য সকলদোষ রাবণে আরোপিত। তবু রাবণ বেদ বিদ্যায় অভ্যস্ত, যুদ্ধবিদ্যায় রামের সমকক্ষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে সু-পণ্ডিত। বাল্মীকির কাল যদিও আর্যদের গৌরবের কাল, তবু বাল্মীকির সময়ে এরূপ পাপের পাপী রাজ পরিবারে বোধ হয় নিতান্ত কম ছিল না, যেহেতু ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতা-পুত্রের বিরোধ বিদ্রোহ তদনুষঙ্গিক ইত্যাদি, পাপময় ব্যাপারের অনেক উল্লেখ দেখা যায়। ভরতকে কেকয় রাজ উপহার দিয়েছেন উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল, বৃহৎ করাল বদন কুকুর, দুই নিষ্ক, ষোল শ অশ্ব। সুতরাং ঐশ্বর্য এবং সামাজিক আদান প্রদানের মাধ্যমরূপে পশু বিনিময় প্রথা ছিল। নিষ্কের উল্লেখে মুদ্রা ব্যবহারের প্রমাণ মেলে। ব্রাহ্মণবর্গের পাণ্ডিত্য, সামাজিক প্রাধান্য, বিবিধ-পেশার কথাও রামায়ণ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের সুবিস্তৃত আলোচনায় হোমারের কাব্য থেকে বাল্মীকি রামায়ণের পার্থক্য, বাল্মীকির কাল, গ্রীক ও ভারতীয় আর্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে। দেশাত্মবোধের সূচনাপর্বে জাতীয় ঐতিহ্যকে জানবার জন্য যে প্রবণতা দেখা যায় তারই অপরিহার্য লক্ষণ এইসব নিবন্ধে প্রতিফলিত। বঙ্গদর্শনের আর একজন লেখক জগদীশনাথ রায়ের আগ্রহে তিনি এই বই লেখেন। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বঙ্কিমের সঙ্গে তিনিই লেখকের পরিচয় করিয়ে

দেন। ছাত্রাবস্থা থেকে লেখক শুনে এসেছেন, 'ভারতের হিন্দু সাময়িক ইতিহাস নাই।' সেই অপবাদ নিরসনের জন্যই তিনি 'সমগ্র রামায়ণ তন্ন তন্ন' করে পড়েন।

'গ্রীক্ ও হিন্দু' প্রফুল্লচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এরসুদীর্ঘ ছটি অধ্যায়ে এবং উপসংহারে (৫৫৭পৃঃ) তিনি হিন্দু ও গ্রীক্ জাতির তত্ত্ব চিন্তা, সুখ দুঃখ সম্বন্ধে ধারণা, আস্তিক্য নাস্তিক্য বুদ্ধি, ঐহিক-ঐশী ব্যাপারে প্রবণতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। লেখকের প্রতিপাদ্য: 'গ্রীক ও হিন্দু এক বংশজ হইলেও কালে কি কি প্রাকৃতিক কারণ যোগে তাহারা কিরূপে বিভিন্ন চরিতাদি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অপরিহার্যভাবে সেই চরিতাদি কতদূর তাহাদের মর্মে বসিয়া তাহাদের কার্য-ক্ষেত্র ও কার্যের কতদূর রূপান্তর সাধন করিয়াছে, তাহার তত্ত্ব আলোচনায় তদুভয় জাতির প্রকৃতি অবধারণ।' এ বইয়ের সব তথ্য, দুই জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐক্য-অনৈক্য নির্ধারণের রীতি হয়ত একালের গবেষণার নিরিখে গ্রহণীয় নয়। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের প্রতি ওয়েবার-মেকলে প্রমুখের উন্নাসিক অবজ্ঞার উত্তরে এ-ধরণের বই লেখার প্রয়োজনীয়তা ছিল। ডাকবিভাগের কর্মীরূপে কলকাতার বাইরে থেকেও প্রফুল্লচন্দ্র যে অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

ইতিহাস সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্রের ধারণা: '১. বিশেষ রাজবংশ বা ঘটনাবলীর নামমালা বা যুদ্ধ কৌশল বর্ণন মাত্র, কতকগুলি অব্যবসায়ীর হস্তে ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যদি মানব জীবন বা তৎ সমষ্টির আবির্ভাব, উন্নতি ও অবনতি এবং তাহার পুনরুদয় ও আনুষঙ্গিক বৃত্তি সমুদয়ের যথার্থ প্রতিকৃতি যদ্বারা প্রদর্শিত হয়, তাহাকে ইতিহাস পদে বাচ্য করা যায়, তবে আমাদের সংস্কার নির্মূল না হইয়া আরও দৃঢ় হইবার কথা। আমাদিগের বিবেচনায় উহাই প্রকৃত ইতিহাস......।' ২. 'ভারতের অতি প্রাচীনকালীয় আখ্যানময় ইতিহাস সর্বাঙ্গীণভাবে নাই। কিন্তু কোন প্রাচীন দেশের সর্বাঙ্গীণভাবে আছে? মিসর দেখ, অতি সামান্য। গ্রীস দেশ। ৭৭৬ খৃঃ পূঃ হইতে আরম্ভ করিয়া পিসিস্ট্রেটসের রাজত্ব পর্যন্ত ইতিহাস দুই একটি সামান্য গল্প মাত্রে নিঃশেষিত হইয়াছে। রোমের দশা প্রায় তাহাই। ...তবে ভারতের কলঙ্ক এই যে, ভারতের অভ্যুদয় যেরূপ প্রাচীন, সে পরিমাণে প্রাচীন-তম আখ্যানময় ইতিহাস রক্ষিত হয় নাই। যাঁহারা তজ্জন্য একান্ত দুঃখিত হয়েন তাঁহাদিগকে এই পরামর্শ দিই যে ইউরোপীয়েরা যেরূপ ট্রয়ের যুদ্ধ প্রভৃতি উপন্যাসকে সত্য ইতিহাসপদে স্থাপিত করিয়া যথাবুদ্ধি তাহার একটা কালনির্ণয়পূর্বক চিত্তের

তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, তাঁহারাও সেইরূপ রামরাবনের যুদ্ধ প্রভৃতিকে সত্য করিতে পারেন। ৩. তাহার পর এক কলংক এই যে অশোকের রাজত্বের পর হইতে যবনাধিকার পর্যন্ত ধারাবাহিক আখ্যানময় ইতিহাস নাই। কিন্তু ৪. সংগ্রহ দ্বারা সে অভাব পূরণ হইতে পারে কি না সে বিষয়ে এখনো আমার সন্দেহ আছে।'

সেজন্যই সারাজীবন তিনি সেই অভাব পূরণে নিজেকে নিয়োজিত করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বাংলা মহাভারত-রামায়ণ পাঠোদ্ধার চেষ্টা, 'বাংলার পুরাবৃত্ত' রচনা এবং জাতিগত ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগ্রহ তারই অভ্রান্ত প্রমাণ। পরবর্তী কালে প্রাচ্য বিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থের বহু উপকরণ প্রফুল্লচন্দ্র দিয়েছিলেন। দেশাত্মবোধ রাজনৈতিক উদ্দীপনা লাভের আগে এ ধরণের ঐতিহ্য গৌরব জাগিয়ে তোলে। (বঙ্গীয় কায়স্থ পত্রিকা: আমার জীবন কথা/নগেন্দ্রনাথ বসু।)

পাঁচ

প্রফুল্লচন্দ্রের পর রামদাস সেনের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁর দুখণ্ড ঐতিহাসিক রহস্য (/) ভারতরহস্য, রত্নরহস্য বুদ্ধদেব বিশেষ ইতিহাস চিন্তার সাক্ষ্য-বহ। তিনি কোন মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করেন নি; লালমোহন বা প্রফুল্লচন্দ্রের মত জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে পুরাবৃত্ত উদ্ধারে ব্রতী হন নি। পূর্ববর্তীদের গবেষণা থেকেই তিনি নিজের মত করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন। তাই ফয়ারবাখের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: 'Not to invent, but to discover has been my sole object, to see correctly my sole endeavour.' যথার্থ বিচার করলে তিনটি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ধারার প্রথম পথিক যিনি শেষ পর্যন্ত গুরুর পথেই চলেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাজেন্দ্র-দর্শিত পথে চলতে চলতে নিজের পথ পেয়ে গেছেন। রামদাস মূলত প্রাচীন সাহিত্য থেকে প্রাচীন ভারতের মানস -পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস, বররুচি, শ্রীহর্ষ, হেমচন্দ্র, বানভট্ট প্রমুখ লেখক প্রসঙ্গ ও বেদ, বৌদ্ধ পালিশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্রানুগত নৃত্য ও অভিনয় তাঁর আলোচ্য বিষয়।

'হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়' ও ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্র' প্রবন্ধ দুটি গভীর অর্থে সেকালের ইতিহাস চিন্তার প্রকাশ। তখন বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে (প্রতিষ্ঠা-

বর্ষ ১৮৫১) যন্ত্র সহযোগে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত গীত ও আলোচিত হত। অথচ শিক্ষিত সমাজে ভারতীয় সঙ্গীত-নাট্য-নৃত্য বিষয়ে জ্ঞান দূরের কথা, আগ্রহও ছিল না। সেজন্য রামদাস আক্ষেপ করেছেন: 'ইয়ুরোপে ফরাশীশ বিজ্ঞানবিদ কোম্‌ত মতাবলম্বীগণ প্রত্যক্ষদর্শনবাদী সভার অধিবেশনের পূর্বে হারমোনিয়ম যন্ত্র সহকারে নানা রস সমাকীর্ণ কবিতাকলাপ গান করিয়া থাকেন। সঙ্গীত সর্বমনোরঞ্জক, এজন্য শাস্ত্রকারেরা কহেন—গানাৎ পরতরং নহি।' ভরত, ধনঞ্জয়, বিশ্বনাথ প্রভৃতি অবলম্বনে আঠার রকম নাটকের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দ্বিতীয় নিবন্ধেও সোমেশ্বর, কল্লিনাথ, হনুমন্ত প্রভৃতি অবলম্বনে বিভিন্নশ্রুতি রাগরাগিণীর পরিচয় আছে। গীত-বাদ্য ও নৃত্য—এই ত্রিতয়ের শাস্ত্রানুযায়ী বর্ণনার সঙ্গে আইন-ই-আকবরী থেকে মধ্যযুগের সঙ্গীত চর্চার ইতিহাস নিষ্কাশনের প্রথম প্রয়াস খুবই প্রশংসনীয়। রামদাসের ঐতিহ্যচর্চার মূলেও দেশাত্মবোধ। "ইংরাজী বিদ্যা উত্তমরূপে অধ্যয়ন আরম্ভ হওয়াতে বাঙালীগণ সুসভ্য হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দেশীয় বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ তাঁহাদিগের নিতান্ত ঘৃণাকর বোধ হইল। ...যাঁহারা সঙ্গীত আলোচনায় প্রবৃত্ত তাঁহারা বিদ্যাহীন মূর্খ এবং অহরহ মাদক সেবনে অনুরক্ত। ইহারা কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াই 'ওস্তাদ'। এ সকল লোককে সাধারণে 'আতাই' কহে, এই শ্রেণীই সঙ্গীতের শত্রু। ...ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ 'নেটিভ মিউজিক' বলিয়া সঙ্গীতের আদর করিলেন না, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরাজগণ যাঁহারা আর্যদিগের শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত তাঁহারা আমাদিগের সঙ্গীতের নিন্দা করা দূরে থাকুক, ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তবে ক্লার্ক সাহেবের কথা স্বতন্ত্র—ভারতবর্ষের কথা কিছুই জানেন না—নাবিকদের শারিগান শুনিয়া প্রকৃত সঙ্গীত মনে করেন।' রামদাস যে-রীতিতে প্রাচীন লেখকদের কাল নির্ণয় ও জীবনবৃত্ত উদ্ধার করেছেন তা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য গবেষকদের মান অনুযায়ী। অথচ তিনি নিয়মিত কলেজী শিক্ষা লাভ করেন নি। (বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং মাত্র অল্পকালের জন্য ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন) মুর্শিদাবাদের প্রাচীন পণ্ডিত সমাজই তাঁর মনোভূমি গঠন করেছিল। তত্ত্ববোধিনী-বিবিধার্থ সংগ্রহের পাঠকরূপে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতির শাস্ত্রব্যাখ্যার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। শাস্ত্রের জন্য শাস্ত্র নয় ইতিহাস সূত্রে শাস্ত্রব্যাখ্যান রামদাসের বৈশিষ্ট্য।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাসচর্চা সবচেয়ে উল্লেখ্য। বঙ্গদর্শনের প্রথম লেখক তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। কিন্তু প্রথম বর্ষ থেকেই বঙ্গদর্শনের সঙ্গে

রাজকৃষ্ণের সংযোগ ছিল নিবিড়। চন্দ্রনাথ বসুর উক্তি : 'বঙ্গদর্শন সম্পাদকের উপর যে তাঁহার (রাজকৃষ্ণ) যথেষ্ট প্রভাব ছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।' 'ঐতিহাসিক ভ্রম' (১২৮১ ভাদ্র) 'ভারত মহিমা' (১২৮১ মাঘ) 'বিদ্যাপতি' (১২৮২ জ্যৈষ্ঠ) 'প্রাচীন ভারতবর্ষ' (১২৮৪ শ্রাবণ) রাজকৃষ্ণের মৌলিক ইতিহাস চিন্তার নিদর্শন। তথ্যানুসন্ধান, ভ্রান্তি নিরসন এবং নতুন সত্যে উত্তরণ তাঁর লক্ষ্য ছিল। ঐতিহাসিক ভ্রমেরই পরিণত রূপ 'বাংলার ইতিহাস।' আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতির ধারণা : (১) বাঙালী কখনো বিদেশ জয় করেন নি ; (২) সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে যেদিন বখতিয়ার খিলজী নবদ্বীপে প্রবেশ করেন, সেদিন থেকেই সেনরাজত্বের শেষ, বাঙালীর স্বাধীনতার শেষ। (৩) মুসলমান আমলে হিন্দু জমিদারগণ করসংগ্রাহক কর্মচারী মাত্র ছিলেন।

প্রচুর তথ্য ও দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি ভ্রম নিরসন করেছেন। মুঙ্গের ও বুন্দালে প্রাপ্ত দুটি অনুশাসনে জানা যায়, দেবপালদেব গঙ্গোত্রী থেকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ, লক্ষ্মীকুল থেকে পশ্চিমসাগর পর্যন্ত তাঁর এলাকাধীন ছিল। উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজারা বাঙালী। দ্বিতীয় ভ্রম প্রসঙ্গে তার বক্তব্য : মিনহাজউদ্দীনের তবকত্-ই-নাসিরী গ্রন্থে বখ্তিয়ারের বঙ্গবিজয় প্রত্যক্ষদর্শীয় রচনা নয়, অপরের মুখে শোনা বিবরণ। ব্লকম্যানও বলেছেন, খিল্জীর বঙ্গবিজয়ের পরেও বহুকাল পূর্ববঙ্গ সেন-বংশীয়দের দখলে ছিল। বিষ্ণুপুরের রাজারা মুসলমান শাসনের অধীন ছিলেন না। আকবরনামায় সুন্দরবনের সন্নিহিত অঞ্চলে জনৈক স্বাধীন হিন্দুরাজা মুকুন্দের কথা আছে। তাঁর মতে, মুসলিম শাসন বিস্তারে ষোড়শ শতক পর্যন্ত সময় লেগেছে।

'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' মাত্র ৯৫ পৃষ্ঠার পুস্তিকা। আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু এর রচনা-পদ্ধতি ও পরিচ্ছেদ-বিভাজন অভিনব। বাংলার হিন্দুযুগের ইতিবৃত্ত পাওয়া দুষ্কর; বাংলার প্রাচীনতম ইতিহাসের সূচনা নির্ণয় করাও কঠিন। 'ঐতিহাসিক ভ্রম' প্রবন্ধের মতই ভৌগোলিক চতুঃসীমার বর্ণনা দিয়ে বাঙ্গালার ইতিহাসের আরম্ভ। উপক্রমণিকায় সুবে বাংলার পরিচয়। তারপরেই 'আর্যশাসন-কাল'। তাঁর সিদ্ধান্ত : 'ইহা একপ্রকার অবধারিত হইয়াছে যে অতি-পূর্বকালে সাঁওতাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি অসভ্যজাতি এদেশে বাস করিত। পরে 'আর্য' নামধারী হিন্দুরা তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া এদেশ অধিকার করেন। পরাজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এতদ্দেশীয় বর্তমান অসভ্য-জাতিগণ এবং নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুগণ তাহাদিগের সন্তান সন্ততি।'

অনুশাসন, তাম্রলিপি, আইন-ই-আকবরী, সয়েরউল মতাক্ষরিণ, মেগাস্থিনিসের বিবরণ, মার্শমান-স্টুয়ার্টের রচনা থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ করে নব্য শিক্ষার্থীদের জন্য বই লিখেছেন। কিন্তু সাধারণ পাঠ্য পুস্তকের সংজ্ঞায় এর বিচার চলে না। তাঁর মণীষা, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, নির্মোহ ইতিহাসবোধ প্রতি অধ্যায়ে প্রস্ফুট। 'দেশের অবস্থা' শীর্ষক সংযোজনী অধ্যায়গুলি বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় প্রথম পদক্ষেপ। যেমন, সেনবংশের শাসনকাল প্রসঙ্গে :

ক. 'সেনবংশের রাজত্বকালে বঙ্গীয় সমাজবন্ধনের সূত্রপাত হয়। সমাজপতি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ আনীত হইলেন। কৌলীন্যপ্রথা সংস্থাপিত হইল ··· কুলীনের যে নয়টি গুণ চাই, সেগুলি সামান্য লোকের থাকে না। কিন্তু কৌলীন্য গুণ সাপেক্ষ না থাকিয়া কেবল বংশগত হওয়াতে অনেক বিষময় ফলোৎপত্তির হেতু হইল।··· একদিকে আবার শ্রীহর্ষ ও ভট্টনারায়ণের গ্রন্থনিচয়ে দর্শন ও কাব্যচর্চার পথ খুলিল ; এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দে বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম তান বাজিল। আদিশূরের আনীত পঞ্চপণ্ডিত এবং তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণের প্রভাবে লোকের ভাষাও কিয়ৎ পরিমাণে সংস্কৃতানুযায়ী হইতে লাগিল।'

রাইয়তদের অবস্থা :

খ. মুসলমান শাসনকালে এদেশে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ক্রমে মুসলমান এবং বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার হইয়াছিল, ইহার অতিরিক্ত তাহাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথাই স্থির করিয়া বলা যায় না। কিন্তু অনুমান হয় যে তাহাদিগের অনাহার কষ্ট ছিল না। নবাব শায়েস্তা খাঁ এবং নবাব সুজাউদ্দীনের সময়ে টাকায় আট মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। এবং সাধারণতঃ বলিতে গেলে তৎকালে খাদ্য-দ্রব্য মাত্রই এখন অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সস্তা ছিল। আইন-ই-আকবরী পাঠ করিয়া বোধ হয় যে এতদ্দেশীয় প্রজাদিগের অর্থসঙ্গতিও কম ছিল না; উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে বাঙ্গালার রাইয়তেরা অবাধ্য বা কর দিতে পরাঙ্মুখ নহে। বৎসরে আটমাস দেয় অর্থ তাহারা কিস্তিতে কিস্তিতে দিয়া থাকে। তাহারা আপনারাই নির্দিষ্ট স্থানে রৌপ্য এবং স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আসে। শস্য প্রদান রীতি নাই। শস্য সর্বদাই সস্তা। ···বেহারেও শস্যবিভাগের রীতি ছিল না। রাইয়তেরা খাজনা স্বরূপ মুদ্রাই দিত, এবং প্রথম কিস্তির খাজনা দিবার সময়ে পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিয়া আসিত।'

তুর্কী বিজয় প্রসঙ্গে :

গ. 'লক্ষ্মণসেনের দুই ছেলে মাধব ও কেশব সেন পর পর সিংহাসনারোহণ

করেন। ১১২৩ খৃঃ সদ্যোজাত লাক্ষ্মণেয় রাজা হন। আশী বৎসর যখন বয়স (?) তখন বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীর আক্রমণ সংবাদ পৌছায়। তখন রাজা নবদ্বীপে, পণ্ডিতেরা বলিলেন যে শাস্ত্রে লেখা আছে, মুসলমানদিগের জয় হইবে। সুতরাং অনেক প্রধান প্রধান আমাত্য আপনাদিগের সম্পত্তি লইয়া পূর্ববাংলায় প্রস্থান করিলেন। পর বৎসর বখ্‌তিয়ার একদল সেনা সজ্জীকৃত করিয়া বেহার হইতে অগ্রসর হইলেন এবং সহসা এরূপ বেগে নবদ্বীপের নিকট উপস্থিত হইলেন যে, কেবল ১৮ জন অশ্বারোহী মাত্র তাঁহার সঙ্গী হইতে পারিল, তদনন্তর অন্য সৈন্যচয় পৌছিল। সমুদায় সেনা উপস্থিত হইলে নবদ্বীপ অধিকৃত হইল, এবং বৃদ্ধ ভূপতি নৌকাপথে পলায়ন করিলেন।' (১২০৩)

বিভিন্ন রাজবংশের শাসনাধীনে 'সাধারণ লোকের অবস্থা' কেমন ছিল তা নিরূপণে রাজকৃষ্ণ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ধনী গৃহস্থের স্বর্ণপাত্র ব্যবহার, গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় ইটের তৈরি বাড়ির বড়ো বড়ো ভগ্নস্তূপ সেকালের ঐশ্বর্যের স্মারক। দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধন, কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্যের বারেন্দ্রবিভাগ (৮টি শাখায়), পুরন্দর বসুর দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থদের সমপর্যায়, পরমানন্দ রায়ের বঙ্গজ কায়স্থ সম্পর্কিত নিয়মেরও উল্লেখ করেন। 'সামাজিক পরিবর্তন' যে রাজনৈতিক ইতিহাসেরই অপরিহার্য অঙ্গ, বাঙালী ঐতিহাসিকদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ সে বিষয়ে প্রথম সচেতন লেখক।

রাজকৃষ্ণের ইতিহাসাশ্রয়ী আখ্যায়িকা 'রাজবালা' উপন্যাস হিসেবে উচ্চাঙ্গের নয়; কিন্তু বক্তিয়ার খিল্‌জীর বঙ্গবিজয় থেকে পাঠান-মোগলের রাজ্য বিস্তার, পর্তুগীজ দস্যু গঞ্জালোর বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ ইতিহাস-সম্মত। উপন্যাসের অষ্টম অধ্যায়টি ইতিহাসের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

বঙ্গদর্শনে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখেছিলেন: 'রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালক শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি।...ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।'

উদ্ধৃত তিনটি অংশ থেকে বোঝা যায়, 'প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস' রচনায় তাঁর স্বভাব নৈপুণ্য ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি ইতিহাস চর্চা থেকে সরে দাঁড়ালেন

কেন? রাজকৃষ্ণ মূলত দর্শনের ছাত্র, সেকালের দার্শনিক সমস্যাগুলি তাঁর মনন-চিন্তাকে অধিকার করেছিল।

চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনে 'জটাধারীর রোজনাম্‌চা' লিখে বিখ্যাত হন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব চর্চাতেও তিনি উৎসাহী ছিলেন। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ক্যালকাটা রিভ্যুয়ে CSB নামে তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ৩৯তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় Primitive races of the Sahabad Platean, ৫৬ তম সংখ্যায় Chronicles of Chandrakona—its Antiquity and Social History. এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বেই দুটি গবেষণা-নিবন্ধ ছাপা হয়। ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয় Notes on the Antiquity of the Nalti, The Assia and the Mahabinayaka Hills of Cuttack, (পৃঃ ১৫৮-১৭১) এবং ১৮৭১ সালে An account of the Antiquity of Jaypur in Orrisa (পৃ ১৫১-১৫৯)। লিপি পাঠের মাধ্যমে চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় অতীত ইতিহাসের ছিন্নগ্রন্থি আবিষ্কার করেছেন। লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমের সীতারাম উপন্যাসে ললিত গিরির গৌরব বর্ণনার পূর্বেই চন্দ্রশেখর এ বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা করেন। চন্দ্রকোণা সম্পর্কিত প্রবন্ধের 'সামাজিক ইতিহাস' অংশ সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

এখানে চন্দ্রশেখরের 'ভারত ভ্রমণ কাব্য' আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ কাব্যও তাঁর ঐতিহ্য গৌরবী মনের পরিচায়ক। ১৭৮৬ শকাব্দে হুগলী থেকে এর 'দ্বিতীয় মুদ্রণ' প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' উদ্ধৃত হয়েছে।

অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির জন্য তিনি অক্ষেপ করেছেন:

আঁধার ভারত এবে, অযোধ্যা হস্তিনা
আঁখিদ্বয় তব স্বাধীনতা-জ্যোতিহীনা।
দেখ পান্থ সরযূর যমুনার তীরে,
স্মরিয়া দাও মহত্ত্ব—ভাস অশ্রুনীরে।

রঘুবংশের মহৎ নৃপতিদের পরিচয়, বশিষ্ঠ ও দধীচির বৃত্তান্তের পর মহাভারত কাহিনীর সার সংক্ষেপ আছে। দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, দুর্যোধন এবং অর্জুনের বীরত্ব তাঁকে স্বাদেশিক বোধে উদ্বুদ্ধ করেছে

'কে জানিত তুমি কভু হবে চিহ্নহীন
কে জানিত ভারত হইবে প্রভাহীন।

আর কি কখন তুমি হইবে উন্নত ?
আর কি উজ্জ্বল কভু হবে গো ভারত ?

হিমালয়, বদরিকাশ্রম, বিন্ধ্যপর্বত, নৈষদ রাজ্যের পর বিক্রমাদিত্যের নবরত্নখচিত-মালব, পাটলিপুত্র, চন্দ্রগুপ্ত-অশোকের মহিমাদীপ্ত মগধ, হিন্দুসভ্যতার উজ্জ্বল তীর্থ বারাণসীধাম প্রভৃতির বর্ণনা আছে।

॥ ছয় ॥

প্রত্ন ইতিহাস চর্চায় বঙ্গদর্শনের লেখকগণের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অগ্রগণ্য। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বঙ্গদর্শনের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীভুক্ত হতে পেরেছিলেন। অজস্র লঘু প্রবন্ধের চাপে তাঁর গবেষণা কৃতিত্ব কিছুটা আচ্ছন্ন হয়েছে। কিন্তু ম্যাক্‌ডোনেল, ম্যাক্সমুলার ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর প্রত্নগবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আনন্দভট্টের বল্লাল চরিত সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, পণ্ডিত অশোক ও রত্নাকর শান্তি রচিত পাঁচখানি বৌদ্ধন্যায়ের পুঁথি. আর্যদেবের চতুঃশতিকা আবিষ্কার ও সম্পাদনার দ্বারা প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের ইতিহাস চর্চার পথ সুগম হয়েছে। তক্ষশিলার খরোষ্ঠি তাম্রলিপি এবং শুঙ্গদের উদ্ভব সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখ্য। জাপানী সূত্র থেকে তিনি ভারতীয় ন্যায় শাস্ত্রের ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। চতুর্থ শতকে সংস্কৃত সাহিত্যের নবজাগরণ বিষয়ক ম্যাক্সমুলারের অভিমত তিনিই প্রথম খণ্ডন করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে তিনি প্রায় হাজার খানেক পুঁথি সংগ্রহ করেন। দশখণ্ড পর্যন্ত এগুলির মুখবন্ধসহ বিবরণী তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। ডঃ সুশীলকুমার দের উক্তি যথার্থ, 'একটি জীবনের পক্ষে এই বৃহৎ প্রচেষ্টাই পর্যাপ্ত।' কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব ও পুঁথি সাহিত্য ছাড়াও বঙ্গদর্শন নারায়ণ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলিতেও ইতিহাস চর্চার পরিচয় আছে। 'আমাদের গৌরবের দুই সময়' (বঙ্গদর্শন ১২৮৪, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) 'ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ' (ঐ, ১২৮৪ শ্রাবণ) প্রভৃতির মধ্যে সরল সরস ভাষায় ইতিহাসের সত্য প্রকাশিত হয়েছে। 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' (১৩০৯) গ্রন্থে তিনি যেমন কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি প্রাচীন ভূগোল ও প্রত্নতত্ত্বের অনেক জটিল কথা আলোচনা করেছেন। এর পেছনে আছে ত্রিশ বছরের প্রস্তুতি। তিনি কালিদাসের কাব্যে বর্ণিত স্থানগুলির ভৌগোলিক পরিচয় দিয়েছেন। এরজন্য তিনি অনেকবার ঐসব অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন।

সেকালে কাশ্মিরী পণ্ডিতেরা কালিদাসকে কাশ্মীরী এবং বাসুদেব বিষ্ণু মিরাশী তাঁকে বিদর্ভবাসী বলেছেন। কোন কোন বাঙালী পণ্ডিত কালিদাসকে বাঙালীরূপে প্রচার করতে চেয়েছেন কিন্তু কালিদাস এই ধরণের বাঙালীয়ানার অনুবর্তী হননি।

ঋতু-সংহার ও মান্দাসোর শিলালেখের সাদৃশ্য আলোচনায় হরপ্রসাদ বিরল ইতিহাসবোধের সাক্ষ্য দিয়েছেন। আভ্যন্তর ও আনুষঙ্গিক তথ্যের দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন, ঋতু-সংহার অভ্রান্তভাবেই কালিদাসের রচনা। রঘুবংশের রচনাকাল নিয়ে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয়েছিল। 'বুড়া বয়সের কথা'-য় (বঙ্গদর্শন বৈশাখ ১২৮৪) বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত বলিতে পারি—কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছেন এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছেন তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—প্রথম অজ-বিলাপে, ইদমুচ্ছ্বসিতালকং···এটি যৌবনের কান্না তারপর রতিবিলাপে, গত এবনতে নিবর্ততে···এটি বুড়ো বয়সের কান্না।' কিন্তু হরপ্রসাদের সিদ্ধান্ত এর বিপরীত। 'রঘু আগে না কুমার আগে (নারায়ণ ১৩২৫ অশ্বিন), রঘু কাব্য বড় কিসে (নারায়ণ, ১৩২৫ অগ্রহায়ণ) প্রভৃতি প্রবন্ধে আভ্যন্তর প্রমাণযোগে হরপ্রসাদ দেখিয়েছেন, রঘুবংশম্ কালিদাসের পরিণত মানসের সৃষ্টি।

সংস্কৃত কলেজের আর একজন ছাত্র প্রাণনাথ পণ্ডিতও কেবল কালিদাসের 'মেঘদূত' সম্পাদন করেন নি, বঙ্গদর্শনে 'কালিদাস' নামে একটি প্রবন্ধও লেখেন। (১২৮০, অঘ্রাণ) তিনি প্রত্নতত্ত্বেও উৎসাহী ছিলেন। ১১৬৫ শকাব্দের চট্টগ্রাম তাম্রলেখ সম্বন্ধে তিনি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি প্রকাশের কাল J.A.S.B., 1874, পৃষ্ঠা ৩১৮-৩২৪ ('Notes on the Chittagong Copper plate') এই তাম্রলেখের পাঠোদ্ধারে প্রাণনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন।

তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সিংহল ভ্রমণে (নবজীবন ১২৯১ শ্রাবণে আরম্ভ) ভারত ও সিংহলের ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনা আছে। সিংহলী ও বাংলা ভাষার সাদৃশ্য-আবিষ্কারও কৌতূহলসঞ্চারী।

যেমন,

বাংলা	সিংহলী
আমি	মম
অশ্ব	অশ্বয়

গ্রাম	গম
গঙ্গা (বিশেষ নদী)	গঙ্গা (নদী)
চাল	হাল
স্ত্রী	স্ত্রী
নাম	নম
বিড়ালী, বেড়ালী	বেলালী

ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকের আগ্রহ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কখনো ইতিহাস চর্চা করেন নি। লালমোহন বিদ্যানিধি অথবা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মত একটি ইতিহাস চর্চার বাঁধা ছকে তিনি কোনো গবেষণা করেন নি। কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে মহাভারত গীতা ও ভাগবতের কাল নির্ণয় চেষ্টা আছে। সেখানেও একটি আদর্শ প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যই মুখ্য। তবু বঙ্কিমের ইতিহাস চেতনা বঙ্গদর্শন লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে আধুনিক। ব্যক্তিকে জাতির পটভূমিকায় এবং বিশেষ জাতিকে বিশ্ব-সভ্যতার পটভূমিকায় দেখাই যথার্থ ঐতিহাসিক বিচার। বাঙালীর উৎপত্তি, বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর আত্মজিজ্ঞাসাকেই ব্যক্ত করেছে। ইউরোপীয় ইতিহাস লেখকদের অবজ্ঞা ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে তীব্র প্রতিবাদ জাগিয়েছিল। দেশাত্মবোধের সঙ্গে মিলেছে আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াস। সেকালের কয়েকটি জ্বলন্ত ঐতিহাসিক প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজেছেন 'শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ' বঙ্কিম। আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প ভিন্ন ধরণের রচনা। শ্যামাচরণ শ্রীমাণির বই সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন: 'বাঙালী নকল নবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাহাদিগের ভাস্কর্য এবং চিত্র সংগ্রহ দেখিলেই বোধহয় যে অনুকরণ স্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে—নচেৎ সৌন্দর্যে তাহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই।' আর্যজাতির শিল্পনৈপুণ্য উপলব্ধির চেষ্টা নেহাৎ গৌণ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা ভারতকলঙ্ক, বাঙ্‌লার কলঙ্ক, বাঙ্‌লার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বাঙ্‌লার ইতিহাসের ভগ্নাংশ এক পর্যায়ের প্রবন্ধ। ভারতবর্ষের কলঙ্ক এই যে, বহিরাগত জাতি ভারতবর্ষকে বার বার পদানত করেছে। কারণ ভারতীয়েরা হীনবল ('Effiminate Hindus')। বঙ্কিম এই মতের অসারতা প্রমাণ করেছেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নেই একথা ঠিক। কিন্তু অতীতে শত শত বৎসর ভারত অজেয় ছিল কেন? এল্‌ফিনস্টোন বলেন, এরজন্য দায়ী হিন্দুর ধর্মানুরাগ। ধর্মানুরাগে যদি কোন জাতি অজেয় হয়, তবে পাঠান মোগল

ইংরেজের ভারত বিজয় সম্ভব হ'ল কেন? বঙ্কিমের মতে, অতীতে 'যোধশক্তি' ছিল, পরে হ্রাস পায়। তা ছাড়া 'আপনার গুণগান আপনি না গায়িলে কে গায়'? গ্রীক রোমক ইংরেজ ও মুসলমান ঐতিহাসিকেরা নিজের গৌরব গাথা সাতকাহন করে বলেছেন। প্রাচীন হিন্দু ঐতিহাসিক থাকলে গৌরবের বিবরণী দিতেন। কারণ এক সময় কাবুল রাজ্যের অধিকাংশ পর্যন্ত হিন্দু রাজ্যভুক্ত ছিল।

স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা আমাদের চিন্তাজগতে ইংরেজের দান। সুতরাং স্বাধীনতা বা জাতীয়তার জন্য বিশেষ প্রবণতা অতীত ভারতে ছিল না। ইংরেজের বিচারে এগুলি ভারতের কলঙ্ক। বঙ্কিমের মতে অভিযোগ অর্ধসত্য এবং কলঙ্ক মোচনে সকলেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা প্রবন্ধেও এই প্রশ্নের মীমাংসা আছে। 'যাহা ভারতের কলঙ্ক বাঙ্‌লারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়।' বীরত্বের অভাব ভারতের কলঙ্ক এবং সতেরজন অশ্বারোহী নিয়ে বক্তিয়ার খিল্‌জির বঙ্গ বিজয় গাঢ় কলঙ্ক। বাঙালীর চিরদুর্বলতা এবং চিরভীরুতার কোন প্রমাণ নাই। মেকলের বাঙালী-নিন্দা বর্তমান সম্পর্কে হয়তো প্রযোজ্য। কিন্তু 'মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়'। চিরকাল সে মরা ছিল না। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পালবংশীয় সেনবংশীয় ইতিবৃত্ত তার প্রমাণ। মেগাস্থিনিসের বিবরণে গঙ্গারিডি (গঙ্গারাঢ়ী?) নামে এক প্রতাপান্বিত রাজ্যের কথা আছে। ম্যাকেঞ্জী সংগ্রহের একটি পুস্তকে গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর অনন্তবর্মা বা কোলাহলের কলিঙ্গ জয় বর্ণিত হয়েছে। উড়িষ্যার গঙ্গাবংশ কোলাহলেরই উত্তর পুরুষ। হাণ্টার সাহেব যে উৎকল সৈন্যদের প্রশংসা করেছেন, বঙ্কিমের মতে গঙ্গারাঢ়ী সৈন্যদেরই তা প্রাপ্য। বলাবাহুল্য এখানে বঙ্কিম মেকলের বিপরীত মেরুবিহারী। দেশাত্মবোধের সততাই এর মূলে। বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই কাছে আবেদন: 'নীতি কথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত, তা হইলে চিত্র ভিন্ন প্রকার হইত। বাঙালীরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙালীর ঐতিহাসিক চিত্রের এই দশা হইয়াছে।...আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙলার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক; ক্ষুদ্রকীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে

হইবে।' জাতির ইতিহাসের জন্য এই আবেগ, এই উদার আহ্বান অন্যের রচনায় দুর্লভ। রামদাস বা প্রফুল্লচন্দ্রের প্রাচ্যমুখিতা, ঐতিহ্য প্রীতি তাঁরও ছিল। কিন্তু অন্ধ প্রাচ্যবুদ্ধি, আর্যামি বা ইউরোপ-বিমুখতা তাঁর দৃষ্টিকে আবিল করেনি। রাজকৃষ্ণ ও রামদাসের ইতিহাস চর্চায় বঙ্কিম প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর প্রেরণাতেই জাতীয় ইতিহাস সন্ধানে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়। প্রাণনাথ পণ্ডিত বা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত ঐতিহাসিক না হলেও সাধ্যমত ইতিহাস তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

একথা স্মরণীয় যে বঙ্গদর্শনের ইতিহাসচর্চার ধারা বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠী রক্ষা করেন নি। তাছাড়া হয়ত তার প্রয়োজনও কমে আসছিল। কারণ যে আত্মবোধের জাগরণ তাঁদের ইতিহাস চর্চার লক্ষ্য ছিল, রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সে স্থান গ্রহণ করল রাষ্ট্রিক অধিকার বোধে উদ্দীপ্ত নানা প্রতিষ্ঠান। নবজীবন ও প্রচারের বঙ্কিম অনুশীলনতত্ত্বে তন্ময়; রাজকৃষ্ণ বিদ্যাপতি-গবেষণার পর মূলতঃ দর্শন বিষয়েই মনোযোগ দিয়েছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের ঐতিহ্য প্রীতি, বঙ্কিমের গীতা ভাষ্য শেষ পর্যন্ত পূর্ণচন্দ্র বসু প্রমুখের রক্ষণশীল হিন্দুত্বের কাছাকাছি পৌচেছিল। তাই ইতিহাসের স্থান নিল ধর্মতত্ত্ব ও পুরাণ; বস্তুবাদী ঝোঁক এবং তথ্যানুসন্ধানের পরিবর্তে সমাজের স্থিতাবস্থাই কাম্য হয়ে উঠল। এ বিষয়ে কোঁতের প্রভাবও কার্যকর হয়েছে। কোঁতের চর্চায় যেমন সমাজবিজ্ঞানে আগ্রহ বেড়েছিল, তেমনি মনুসংহিতার প্রতি কোঁতের সমর্থনে হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ, জাতিভেদ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি আঁকড়ে ধরার প্রবণতা দেখা গেল। 'মণিহারী' গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নব্যপন্থীদের প্রতিভূ বাঞ্ছারামকে প্রচুর তিরস্কার করেছেন। 'সীতারাম' উপন্যাসে বঙ্কিমও গীতা ছেড়ে মিল এবং কুমারসম্ভব ছেড়ে সুইনবার্ণ পড়ার জন্য নব্য বাঙালীদের ধিক্কার দিয়েছেন। ঐতিহাসিক রহস্যের পর রামদাস সেন লিখেছেন 'সংস্কার রহস্য।' স্পষ্টতঃ ঝোঁক স্থিতাবস্থার দিকে। এর সঙ্গে পূর্ণচন্দ্র বসুর ফলশ্রুতি বা চন্দ্রনাথ বসুর 'কঃ পন্থা', 'হিন্দুত্ব' 'সাবিত্রীতত্ত্ব'-এর দূরত্ব বেশী নয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকারও কোঁৎ প্রভাবে সমাজবিজ্ঞান চর্চা সুরু করে পরে তাঁরই সমর্থনে সনাতনপন্থী হন, যার তত্ত্বগত পরিচয় 'সনাতনী'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মূলতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ছাত্র হলেও তাঁর দৃষ্টি কখনই পশ্চাদপসরণ করে নি। রজনীকান্ত গুপ্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্র, চণ্ডীচরণ সেন, নিখিলনাথ রায় প্রমুখ পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা অবশ্য বঙ্গদর্শনের ইতিহাস চিন্তার ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

তারাশিস্ মুখোপাধ্যায়

মেদিনীপুর জেলার শিব-গাজনে বৈচিত্র্য

মেদিনীপুর জেলা পশ্চিমবাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশের একটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক অঞ্চল। শুধু ভৌগোলিক বিশেষত্বেই নয়, সীমান্তসূত্রে এই জেলার আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, উড়িষ্যা এবং পার্শ্ববর্তী জেলা—বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছে। অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানি যে এখানকার আর্য ও প্রাগার্য সংমিশ্রণ-জাত হিন্দুদের নিজ-নিজ দেবদেবী ও প্রতীকধর্মী আচারানুষ্ঠানের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বাস্তবে এই জেলার আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে বিস্তৃত করতেই সহায়তা করেছে। নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে এই সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের বিবর্তন ও সমন্বয় ক্রিয়ারও একটি অনুভূতিপ্রবণ ছন্দ, গতিপ্রকৃতি ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। এই সমন্বয়ের ফলপ্রসূ অবদান নানা লোক-কথা, অতিকথা, ছড়া, ধাঁধাঁ, লোকাচার, স্ত্রীআচার, লোক-উৎসব ও পূজা-পার্বণের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

বস্তুতঃ এই জেলার উপজাতি, বন্যজাতি, কৃষিনির্ভর-আদিবাসী ও তফসিলী-হিন্দুদের ধর্মচর্চায় ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব এখনও অপেক্ষাকৃত মন্থর। শুধু তাই নয়, হিন্দু সমাজ-জীবনে জাতিভেদ-প্রথার পটভূমিকায় এঁদের অনেকেই শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবনত হিন্দুজাতি (তফসিলী) বলেই পরিচিত। মেদিনীপুর জেলার গৌরব বিদ্যাসাগর তাঁর দৃপ্ত পৌরুষ ও কারুণ্যের প্রবাহে নিষ্ঠুর প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেও

এই সকল মানুষের দুঃখমোচন ও সেবার যে মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তার তুলনা বিরল। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে এই জেলায় এই সব শ্রেণীর অনেকে এখনও লৌকিক দেবতার মত নিরাশ্রয়ই নয়, জীবন ধারণের মৌলিক প্রশ্নেও তাঁরা আশ্চর্যজনক ভাবে উদাসীন। এঁদের ইন্দ্রজালভিত্তিক অতিপ্রাকৃত মানসের পরিচয় মেলে নানা উৎসব ও পূজা-পার্বণের সঙ্গে জড়িত লোক-বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতি মোহাচ্ছন্ন আবেগ ও যুক্তিবাদের প্রতি উদাস বৈরাগ্যে। কিন্তু বাস্তবে এঁদের মত অসহায় ও বঞ্চিত মানুষরাই এই জেলার উৎসব-পার্বণগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন নিজেদের উৎসাহ ও ধর্মবিশ্বাসের প্রাবল্যে নিভৃত পল্লীর কোণে-কোণে। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামের শিব-ঠাকুরের গাজন-তলায় দাঁড়িয়ে এই ধরণের চিন্তা-ভাবনা বার-বার মনে দোলা দেয়।

॥ গাজনের তাৎপর্য ॥

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মেদিনীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত শিবের-গাজন উৎসবের বৈচিত্র্য সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করবার চেষ্টা করব। এই আলোচনার প্রথমে 'গাজনের' অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের কিছুটা অবহিত হওয়া দরকার। এই প্রচেষ্টা বাস্তবে 'গাজন' অনুষ্ঠানটির সামগ্রিক ভাবরূপ অনুধাবনে সহায়ক হবে। এই প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সুচিন্তিত বক্তব্য হল,১

> "শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু "গাজন" শব্দ আসিয়াছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সহিত ধর্মের বিবাহ হয়। দুই বিবাহই প্রচ্ছন্ন"

আবার ডঃ সুকুমার সেনের মতে,২

> "শিবের নীলাবতীর সঙ্গে ধর্মের নীল অনিলের এবং অথর্ববেদের ব্রাত্য সূক্তাবলীর নীল-লোহিতের ও মাতারিশ্বা পবমানের তুলনা করা যায়।"

চড়ক-উৎসব সম্পর্কে প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বলেছেন,৩

> "চড়ক বৌদ্ধ-পর্ব বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু চড়কের কোন বৌদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় না। কেবল তিব্বত প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে চৈত্র মাসে দেব-দানব সাজিয়া লোকে নৃত্য, গীত ও কৃত্রিম যুদ্ধ প্রভৃতি করায়, ঐতিহাসিকরা চড়ককে বৌদ্ধ-পর্ব বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে ইহা বাণ রাজার শিব-তপস্যা বলিয়া কথিত হয়।"

হাওড়া জেলার শিবের গাজন উৎসব সম্পর্কে আলোচনায় তারাপদ সাঁতরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে,৪

> "এই গাজন উৎসবের উৎপত্তি কিভাবে এবং কোথায় হয়েছিল—তা ঠিক ক'রে জানা

যায়নি। তবে ময়ুর ভট্টের ধর্মপুরাণে সর্বপ্রথম গাজনের উল্লেখ পাওয়া গেছে।

পূর্বে সত্যকালে ব্রাহ্মণের কুলে
শ্বেতাইয়ের জন্ম হোল
ব্রহ্মাংশ সম্ভূত শ্বেতাই পণ্ডিত
গাজন প্রকাশ কৈল।

তাই ধর্মপূজাকে কেন্দ্র করেই একদিন হয়ত এই গাজন গ'ড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই ধর্ম কে? এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বহু আলোচনা হয়েছে। কেউ বলেছেন বৌদ্ধ আর কেউ ব'লছেন সূর্য।"

এ ছাড়াও ডঃ অমলেন্দু মিত্রের মতে,[৫]

"ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন প্রায় একই রকম। কে যে কার কাছে ঋণী তা সহজা বলা শক্ত। তবে শিব-পূজার ভারতব্যাপী প্রসারতা, প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্য আলোচনা করলে অনুমান করা যায় ধর্মঠাকুরের চেয়ে শিবই প্রাচীন দেবতা। ধর্মঠাকুর অবশ্যই প্রাচীনতর তবে যে রূপে পূজিত হচ্ছেন সে রূপে নয়।"

প্রসঙ্গতঃ ডঃ মিত্র আরও বলেছেন যে,[৬]

"শিবের সঙ্গে ধর্মের গাজনের ভক্ত্যাদের মিল হল কেন, তার সদুত্তর এখনও দেওয়া যায় না। শৈবতান্ত্রিক যুগে ধর্মঠাকুরকে শিবের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল তার প্রমাণ রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। মনে হয় এই কারণেই শিবের গাজনের সঙ্গে ধর্মের মিল পরিদৃষ্ট হয়।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মেদিনীপুর জেলার প্রায় অধিকাংশ বর্ধিষ্ণু গ্রামেই 'গ্রাম-ষোল আনা'র পক্ষ থেকে বছরের প্রথম মাসে (বৈশাখে) অথবা শেষে (চৈত্রে) শিবের-গাজন অনুষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে প্রথমটিকে বলা হয় 'বৈশাখী-গাজন' ও দ্বিতীয়টি 'চৈত্র-গাজন' বা 'চৈতা-গাজন'। কিন্তু শিবের-গাজন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় এই দুটি বিশেষ মাসকে নির্বাচনের তাৎপর্য আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। শুধু তাই নয়, শিবের-গাজন অনুষ্ঠানের সঙ্গে বসন্তকালের কোন যোগাযোগ ছিল কিনা সে সম্পর্কেও আমাদের কোন বিশদ ধারণা নেই। তথাপি আমাদের এই ধারণার স্বপক্ষে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের বক্তব্য ভেবে দেখবার মত।[৭]

"আমরা ১লা বৈশাখ বৎসর ধরিতেছি, কিন্তু এই রীতি বেশী দিনের নয়। মাত্র ১৬২৯ বৎসর পূর্বে, ২৪১ শকে, ইং ৩১৯ সালে ইহার আরম্ভ হইয়াছে; তাহাও ভারতের সর্বত্র নয়। তখন হইতে আমাদের বর্তমান পাঁজির গণনা চলিতেছে। সে সময়ে চৈত্র-বৈশাখ বসন্ত ও আশ্বিন-কার্তিক শরৎ, এইরূপ হইত।"

শিবের-গাজন ছাড়াও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন মহকুমায় ধর্মপূজা ও ধর্মের-মেলা

অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। স্থানবিশেষে ধর্মপূজার জন্য বৈশাখ সংক্রান্তি, ভাদ্র সংক্রান্তি অথবা পৌষ সংক্রান্তির দিনটি উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। তবে ঘাটাল মহকুমা ছাড়া অন্যত্র ধর্মগাজনের ব্যাপকতা চোখে পড়ে না। অবশ্য ব্যাপকতা না থাকলেও এই জেলার ধর্মগাজনে যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ আঞ্চলিক প্রভাব যে বর্তমান, সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গে ডঃ মিত্রের অভিমতের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বস্তুতঃ ডঃ মিত্র রাঢ় অঞ্চলের ধর্মপূজা ও গাজন সম্পর্কে যে ব্যাপক অনুসন্ধানের পরিচয় দিয়েছেন, শিবের-গাজন সম্পর্কে এখনও কোন গবেষক তার সামান্যতম অংশ সংগ্রহ করতে পেরেছেন কিনা জানা নেই। এই কারণে তাঁর আলোচনায় মেদিনীপুর জেলার ধর্মগাজনের[৮] যে বৈচিত্র্য-গুলি ধরা পড়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের আরও তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হতে হবে। যাহাই হউক, ডঃ মিত্রের মতে,[৯]

> "ক্ষিতীশ প্রসাদের বিবরণে মেদিনীপুরের ধর্মগাজনে মেলঘর অঙ্কন, মুক্তাঘর অঙ্কন ও তৎসম্পৃক্ত অনুষ্ঠানের বর্ণনা, পশ্চিমোদয়ের রূপকানুষ্ঠান, লুয়ে ছাগল বধ ও জাগ হাঁড়িতে পুরে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের নিশাযাপনের বিবরণ, গৃহভরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। এগুলি কোনটাই এতদঞ্চলে সংগ্রহ করতে পারিনি। আরও ব্যাপক অনুসন্ধানে হদিশ পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।"

কেবলমাত্র ধর্ম গাজনের ক্ষেত্রেই নয়, মেদিনীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত শিব-ঠাকুরের বৈশাখী ও 'চৈত্র-গাজনে'র মধ্যেও যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে এই অনুষ্ঠানটিকে আমরা 'শিবের গাজন' বলে গণ্য করলেও, বিভিন্ন গ্রামের গাজনে পূজার উপচার দেওয়ার নিয়ম, মাগুর মাছ উৎসর্গ, সন্ন্যাসীদের নাচ, 'সেবাডাকা', গভীর রাত্রে 'ভোগ' নিবেদনের প্রথা, শিব-দুর্গার বিবাহ, 'চড়ক'-গাছে ঘোরা ইত্যাদি প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই নৃতত্ব সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। এর মধ্য দিয়েই প্রতীকধর্মী গাজন উৎসবের লৌকিক তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত হওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়, সামগ্রিকভাবে মেদিনীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত শিবের-গাজনের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার অপরাপর জেলার শিব-গাজনের খুঁটিনাটি তুলনামূলক আলোচনা পরোক্ষভাবে এই গাজনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যবোধে সহায়ক হবে।

। শিব-গাজনের আঞ্চলিক রূপ ।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' গ্রন্থে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন

থানায় অনুষ্ঠিত শিব-গাজনের বৈচিত্র্য সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তা সংক্ষিপ্ত হলেও উল্লেখযোগ্য।১০ এই গ্রন্থে মোটামুটিভাবে যে সকল শিব-গাজনের পরিচয় পাই তার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটি 'চৈত্র-গাজন' ও ত্রিশটি 'বৈশাখী-গাজন।' তবে এই গাজন অনুষ্ঠানের সামগ্রিক রূপটি জেলার সর্বত্র একরকম নয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন থানায় একটি বিশেষ মাসে গাজন উৎসব পালনের প্রতি আকর্ষণ লক্ষণীয়। উদাহরণতঃ 'চৈত্র-গাজনে'র সংখ্যা নারায়ণগড়, তমলুক, এগরা, জাম্বনী, বিনপুর, গোপীবল্লভপুর, চন্দ্রকোণা, গড়বেতা, কেশপুর, কাঁথি, খাজুরি, নয়াগ্রাম ও মোহনপুরেই অধিক। একইভাবে, 'বৈশাখী-গাজন' পিঙ্গলা, পাঁশকুড়া, দাঁতন, শালবনি, কেশিয়াড়ী, পটাশপুর ও সুতাহাটায় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এ-ছাড়াও, এমন কয়েকটি থানা আছে যেখানে চৈত্র ও 'বৈশাখী-গাজন' প্রায় সমান সমান। বিশেষতঃ ঝাড়গ্রাম, খড়্গপুর, ময়না, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর, রামনগর ও সবঙ্গ থানায় এই দুই প্রকারের শিব-গাজনই অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এই কারণে শেষোক্ত থানাগুলিকে আমরা শিব-গাজনের মিশ্র-প্রভাবযুক্ত অঞ্চল বলে চিহ্নিত করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রায় প্রত্যেকটি শিবমন্দির ও গাজন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নানান কাহিনী, কিম্বদন্তী ও স্বপ্নাদেশের কথা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। পরোক্ষভাবে, এই সকল লৌকিক-বিশ্বাস কোন বিশেষ শিব-মন্দিরে চৈত্র অথবা 'বৈশাখী-গাজনে'র প্রবর্তনে প্রভাব বিস্তার করেছে কিনা, সে সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার। এ ছাড়াও, বিভিন্ন শিব মন্দিরের গঠন, চূড়া, শিবলিঙ্গের আকার, গৌরীপট্টের সঙ্গে 'নেতনালা'র যোগ, গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন স্থানে (মাড়োতলা) অপরাপর দেব-দেবীর নিকটে 'সেবাডাকা' 'প্রণাম জানানো' ও 'পূজা দেওয়া' প্রভৃতি আমাদের পর্যালোচনার সহায়ক হবে।

॥ গাজনের সন্ন্যাসী ॥

সাধারণতঃ 'গ্রাম-ষোলআনা'র পক্ষ থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই গাজনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। শিবের গাজনে প্রধান সন্ন্যাসীদের মধ্যে পাট ভক্তা বা শ্যাম সন্ন্যাসী, দেউলা ভক্তা বা দেউল ভক্তা, বাসহরি বা বাসঘরি ও কোটাল ভক্তার নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা গ্রামের-পক্ষ থেকেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এ ছাড়া, কোন একটি গ্রামের শিব-গাজনে তাঁদের প্রথামত যতজন পুরুষ সন্ন্যাসী হওয়ার নিয়ম আছে (যেমন ষোল), তা ঐ গ্রামের জনসমষ্টি থেকেই 'পালা' হিসেবে,

'মজুরী' দিয়ে অথবা বাধ্যতামূলকভাবে পূরণ করা হয়ে থাকে। অবশ্য যেখানে 'পালা' হিসেবে যোগদান করাই নিয়ম, সেখানে কোন বিশেষ কারণে যদি কোন পরিবারের পক্ষে সন্ন্যাসী হওয়া সম্ভব না হয়, তবে সেই পরিবারের পক্ষ থেকে অন্য একজন গ্রামবাসীকে তাঁদের প্রতিভূ-সন্ন্যাসী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। গ্রামের পক্ষ থেকে যোগদানকারী সকল সন্ন্যাসীকে সচরাচর অন্য গ্রামের শিবমন্দিরে 'উত্তরীয়' গ্রহণ করবার অনুমতি দেওয়া হয় না। এখানে উল্লেখ্য যে, কোন-কোন গ্রামে কেবল-মাত্র প্রথম যোগদানকারী সন্ন্যাসীদের কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হয়। যেমন, ধারিন্দা গ্রামে নতুন সন্ন্যাসীর দুই বাহুর উপরে উত্তপ্ত 'ধুনাচুরের' ছেঁকা দেওয়াই নিয়ম। পরে এই ক্ষতস্থানে রক্তচন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রধান সন্ন্যাসীরা ছাড়াও 'মানসিক' বা 'মানত' পূরণের উদ্দেশ্যে একাধিক পুরুষ ও মহিলা সন্ন্যাসী কোন বিশেষ গ্রামের শিবমন্দির বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ শিবমন্দিরে 'উত্তরীয়' গ্রহণ করে শিব-গাজনে অংশগ্রহণ করেন। যে সকল কারণে এঁরা সন্ন্যাসী হয়ে থাকেন, তার মধ্যে কয়েকটি হল— অম্লশূল, পেটশূল, অম্বল রোগ, পেটের যন্ত্রণা, বদহজম, বাত, বেদনা, মাথার যন্ত্রণা, হাঁপানি, ভয় পাওয়া, ফাঁড়া, পুত্র কামনা, ব্যাধিগ্রস্থ বা বিকলাঙ্গ ছেলে হওয়া বন্ধ করা, মৃতবৎসার সন্তান জীবিত থাকা ইত্যাদি। অবশ্য এঁদের ক্ষেত্রে গাজনের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে যোগ-দান করা বাধ্যতামূলক নয়। তথাপি প্রধান সন্ন্যাসীদের মত এঁরাও গভীর রাত্রে নিরামিষ আহার ও দিনে উপবাসী থাকেন— এমন কি জলপানও করেন না। যতদূর জানি, এই জেলার শিব-গাজনে মহিলা সন্ন্যাসীদের কোনও ক্ষেত্রেই 'ঝুলন', 'ঝাঁপ', 'নাচ', 'চড়ক-গাছে ঘোরা' ও 'বেত' ধরবার অনুমতি দেওয়া হয় না। এ ছাড়াও, কোনও গ্রামেই তাঁদের প্রধান সন্ন্যাসীদের ভূমিকায় অংশগ্রহণ চোখে পড়ে না।

॥ শিব-গাজনের অনুষ্ঠান ॥

মেদিনীপুর জেলার শিব-গাজনে প্রধান সন্ন্যাসীদের পক্ষ থেকে যে সকল কৌতূহলো-দ্দীপক কৃচ্ছ্রসাধনের কথা জেনেছি, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল— হিন্দোল পর্ব, আগুন-দোলন, আগুন-ঝাঁপ, বঁটি ঝাঁপ, কাঁটা ঝাঁপ, কাঁটায় গড়ান, কাঁটানাচ, বঁটি নাচ, মাণিকচূরি নাচ, ঝুলন, কাঁটা ভাঙ্গা, দণ্ড ভাঙ্গা, বেত ভাঙ্গা, বেত চালা, মাথা চালা, সেবা ডাকা, ধুনা সেবা, কলা কাটা, মাণিক বেড়, দণ্ড চালান, দণ্ড ডাক, কালিকা

তোলা, হাখণ্ড ঘর পোড়ানো, জিহ্বাবাণ ও পিটফোঁড়া-চড়কের কথা প্রথমেই মনে পড়ে।

॥ শিব-গাজনের লৌকিক তাৎপর্য ॥

বস্তুতঃ, লোক-উৎসবের প্রকৃতিই হল এই যে এখানে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের কচকচি, গ্রামের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করতে সক্ষম হয়নি। ফলে, নানা আনুষ্ঠানিক কৃচ্ছসাধন ছাড়াও 'ভোগ' নিবেদনের পরে আপাত-দুর্বোধ্য কতকগুলি নাম ও 'ছড়া' শোনবার সময় সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে ভক্তি ও তদ্গতভাব চোখে পড়েছে, তার তুলনা বিরল। অপরপক্ষে, গাজন-তলায় উপস্থিত আবালবৃদ্ধবনিতার সকলেই যে শিব-ঠাকুরের কাছে তাঁদের ভক্তি ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণাতেই এসে জড়ো হয়ে থাকেন, তা মনে হয় না। এঁদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে আমোদ-প্রমোদ ও মেলায় কেনা-বেচার আকর্ষণই ওঁদের কাছে অধিক।

শিব-গাজন উপলক্ষে এই জেলার বিভিন্ন থানায় যে সকল আনন্দ-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে, সেগুলির মধ্যে আমরা পাই — সঙ নাচ, বাঈজী নাচ, ঝুমুর নাচ, কাঠি নাচ, মোহড়া নাচ, কালী নাচ, পুতুল নাচ, ছৌ-নাচ বা ছো-নাচ, কবিগান, চণ্ডী-মঙ্গল, তরজা, কীর্তনগান, শিবায়ণ গান, মুখোস পরে কবিগান, নাগরদোলা, খেলা-ধূলা, তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা, যাত্রাভিনয়, সার্কাস, ম্যাজিক, জলসা, লটারী-খেলা, জুয়াখেলা ও বাজি পোড়ান।

॥ শিব-গাজন অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য ॥

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে প্রায় প্রত্যেক গ্রামের শিব-গাজনেই ভিন্ন-ভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানগুলির রীতি চোখে পড়ে। বাস্তবে, এই গাজনের প্রতীকধর্মী অনুষ্ঠানগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে হলে, এই জেলার কোন একটি থানায় অনুষ্ঠিত গাজনের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী থানা বা নিকটবর্তী জেলার শিব-গাজন অনুষ্ঠানের কোন সাদৃশ্য আছে কিনা, তা প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের মাধ্যমেই দেখতে হবে। তমলুক মহকুমার কয়েকটি গ্রামের শিব-গাজন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সময়ে যে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য চোখে পড়েছে, তা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করলে মোটামুটিভাবে আমাদের বক্তব্যের মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

১। পুকুর জাগা

ঘট-ডোবানোর দিন থেকেই গাজনের শুরু। গাজনের ঘট-ডোবানোর পূর্বদিন রাত্রে একটি 'প্রতিষ্ঠা-পুকুর' গ্রামের পক্ষ থেকে নির্বাচিত কয়েকজন লোক পাহারা দিয়ে থাকেন। এঁদের উপস্থিতির ফলে অন্য কোন লোক ঐ বিশেষ পুকুর ব্যবহার করতে পারেন না। বনমালিকালুয়া গ্রামের শিবমন্দিরের কাছে কোন 'প্রতিষ্ঠা-পুকুর' নেই। ফলে, ঘট-ডোবানোর জন্য তাঁদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম মুরারিকালুয়া যেতে হয়। এখানে পরদিন ভোরে ঘট-ডোবানো শেষ হলে, অন্য সকলেই পুকুর ব্যবহার করতে পারেন।

২। বাঁশকাটা ও বাঁশপূজা

গাজনের প্রথমদিন ঘট-ডোবানোর পূর্বে তাঁদের গ্রামের নিয়ম মত এক বা একাধিক 'তলদা' বাঁশ কাটতে হয়। বনমালিকালুয়া গ্রামে কেবলমাত্র ডম জাতীয় লোকই বাঁশটি কাটতে পারেন। তবে, এক বা একাধিক বাঁশ কাটা হলেও ঘট-ডোবানো অনুষ্ঠানের সময়ে এখানের বিভিন্ন গ্রামে ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র একটি বাঁশকেই পূজা করেন। এই বাঁশটির মাথায় একটি লাল অথবা হাল্কা নীল বর্ণের পতাকা বাঁধা থাকে। এঁরা বলেন, 'ধ্বজ-বাঁশ' অথবা 'গাজন-বাঁশ'।

৩। ঘট পূজা

শিব-গাজনের দিন ভোরে যে দুটি ঘট ডোবানো হয়, তমলুক মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে তাদের নামকরণে ভিন্নতা চোখে পড়ে। বনমালিকালুয়া গ্রামে দুটি ঘটের মধ্যে একটি শিবের ও অপরটি দুর্গার। কিন্তু কাঁকট্যা গ্রামে রাজবংশী-পাড়ার গাজনে যে দুটি ঘট থাকে, তার মধ্যে একটি হল গৌরীর ও অপরটি কামাখ্যা-কালীমার। আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘটে জল ভরার পরে দুটি ঘটই শিবমন্দিরের ভেতরে স্থাপন করা হয়। গাজনের শেষে ঘট দুটি পুকুরে বিসর্জন দেওয়া নিয়ম। 'চৈত্র-গাজনে'র ক্ষেত্রে উভয় ঘটই বিসর্জন দেওয়া হয়, আগামী বছরের প্রথম দিন বা ১লা বৈশাখে।

৪। সন্ন্যাসীদের স্নান ও উত্তরীয় নেওয়া

ঘট-ডোবানোর পূর্বে বনমালিকালুয়া গ্রামের পাটভক্তা, দেউলা ভক্তা ও বাসঘরি ভক্তাকে তেল মেখে স্নান করতে হয়। 'প্রতিষ্ঠা-পুকুরে' স্নানের পরে তাঁরা নতুন গামছা পরেন। এঁদের পরণের কাপড়গুলি ঘট বসানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঘাটে প্রথমে গঙ্গার-ঘট পূজার পরে ব্রাহ্মণ একটি মন্ত্র বলে এই তিনজন সন্ন্যাসীর গলায় 'উত্তরীয়' পরিয়ে দেন। এই মন্ত্রটি হল — "আপ্ত গোত্র পরিত্যজ্য,

শিব গোত্র প্রবেশিত।" মন্ত্রটি তিনবার আবৃত্তি করবার সঙ্গে-সঙ্গে সন্ন্যাসীদের গোত্রান্তর হয় এবং তাঁরা নিজেদের পূর্বতন গোত্রের পরিবর্তে 'শিব' গোত্রের অন্তর্ভূত হন। কাঁকট্যা রাজবংশী-পাড়ার শিব-গাজনে বাসঘরিকে 'উত্তরীয়' গ্রহণ করতে হয় না।

৫। উত্তরীয়

মাড় বিহীন সাদা সুতোর (আবাসুতা) গুচ্ছ দিয়েই 'উত্তরীয়' তৈরী হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এক 'ছড়ি' বা সাত 'পণ' সুতোর গুচ্ছ থেকে একটি 'উত্তরীয়' তৈরীর জন্য 'দু-পণ' সুতো আলাদা করে নেওয়া হয়। এই 'দু-পণ' সুতোর গুচ্ছকে সমান অংশে ভাগ করবার পরে ব্রাহ্মণ একগোছা কুশ ঘাস বেঁধে দেন। এই কুশ বাঁধা সুতোকেই 'উত্তরীয়' বলা হয়। বনমালিকালুয়া গ্রামে এই নিয়ম। অপরপক্ষে, ধারিন্দা গ্রামে প্রধান সন্ন্যাসীদের জন্য এক 'ছড়ি' সুতো দিয়েও 'উত্তরীয়' তৈরী হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, অনেকস্থলে 'মানসিক' পূরণের জন্য যোগদানকারী সন্ন্যাসীদের মধ্যেও বেশী সুতোর গুচ্ছ দিয়ে প্রস্তুত 'উত্তরীয়' ধারণের প্রতি আগ্রহ চোখে পড়ে। এখানে উল্লেখ্য যে. পুরুষ ও মহিলা উভয়েই 'উত্তরীয়' ধারণ করে সন্ন্যাসী হয়ে থাকেন। আবার অনেক গ্রামে 'উত্তরীয়' ছাড়াও সন্ন্যাসীদের গলায় নানা রঙের পুঁতির-মালা শোভা পায়।

৬। মাগুর বা মদ্‌গুর মাছ পূজা

গাজনের প্রথমদিন ঘট-ডোবানো ও 'উত্তরীয়' দেওয়ার পরে বনমালিকালুয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ পুকুর ঘাটেই একটি মাগুর-মাছ পূজা করেন। এই সময়ে মাছের মাথায় থাকে সিঁদুর ও গলায় 'কাঁড়োল-মালা'। পূজার শেষে সন্ন্যাসীদের 'সেবা ডাকা' ও ব্রাহ্মণের পক্ষ থেকে মাছের মাথায় অল্প অল্প জল দেওয়া চলে। অবশেষে মাছটি পুকুরে চলে যায়। এই পূজার সময় কেউই 'মাগুর-মাছ' কথাটি উচ্চারণ করেন না— মাছকে বলা হয় 'গাছ'। জয়রামবাটী গ্রামের 'চৈত্র-গাজন' ও উত্তর-সোনামুই গ্রামের 'বৈশাখী-গাজনে' মোটামুটিভাবে এই একই নিয়ম অনুসৃত হয়। অপরপক্ষে, ধারিন্দা, নাইকুড়ি-জগন্নাথচক্‌, মৈশালী-মধ্যপাড়া, কাঁকট্যা রাজবংশী-পাড়া, গড়কিল্লা প্রভৃতি গ্রামে মাগুর-মাছ বলি দেওয়া বা মাছের নাভিস্থলের কিছু অংশ কেটে দেওয়াই নিয়ম। আবার বড়বড়িয়া-শিকারগড় গ্রামে মাছটি বাস্তবে বলি দেওয়া বা কেটে দেওয়ার পরিবর্তে মাছের গায়ে একটি খড়্গ স্পর্শ করানো হয়। এই সকল গ্রামে মাছটি উৎসর্গের পরেই পুকুরে ছেড়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। তুলনামূলকভাবে শালগেছ্যা গ্রামে মাছটি হত্যা করাই নিয়ম। এখানে মাছটি পুকুরে ছাড়বার পরিবর্তে

ডম জাতীয় একজন লোককে দেওয়া হয়। মাছটি বলি দেওয়ার প্রশ্নেও ভিন্নতা উল্লেখযোগ্য। ধারিন্দা গ্রামে মাছটি বলি দেন কোটাল ভক্তা, গড়কিল্লায় ব্রাহ্মণ, কাঁকট্যা রাজবংশী-পাড়ায় দেউলা ভক্তা ও শালগেছ্যা গ্রামে একজন সন্ন্যাসী।

৭। ঘটে রক্ত দেওয়া

যে সকল গ্রামে মাছ বলির নিয়ম আছে, সেখানে ঘটে রক্ত দেওয়ার ঘটনা সহজেই অনুমান করা চলে। তথাপি গ্রাম হিসেবে ঘটে রক্ত দেওয়ার মধ্যেও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ধারিন্দা গ্রামে মাগুর মাছের রক্ত কেবলমাত্র দুর্গার ঘটেই দেওয়া হয়। শিবের ঘটে রক্ত দেওয়া চলে না। শালগেছ্যা গ্রামেও এই নিয়ম। গড়কিল্লা গ্রামে ঘটে রক্ত দেওয়ার পরিবর্তে একটি সদ্যনির্মিত মাটির শিবলিঙ্গের মাথায় রক্ত দিতে হয়। কাঁকট্যা রাজবংশী পাড়ার গাজনে দুর্গার ঘট ছাড়াও কামাখ্যা কালীমার ঘট লাগে—কিন্তু শিবের ঘট থাকে না। শুধু তাই নয়, ঐ গ্রামে দুর্গার ঘটের পরিবর্তে কামাখ্যা কালীমার ঘটে রক্ত দেওয়াই নিয়ম।

৮। জাগপ্রদীপ জ্বালা

ঘট-ডোবানোর দিন ঘাটেই আনুষ্ঠানিকভাবে একটি 'জাগপ্রদীপ' জ্বালতে হয়। বনমালিকালুয়া গ্রামে একটি নতুন মাটির প্রদীপ সরিষার তেল ও তুলোর বাতি দিয়ে ঘাটেই সাজানো হয়। যথাসময়ে প্রদীপ জ্বালা হলে, সেটি একটি নতুন মাটির হাঁড়ির ভেতরে স্থাপন করা হয়ে থাকে। বাস্তবে, বাসঘরি ভক্তাই গাজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই মাঙ্গলিক প্রদীপটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, গাজনের প্রধান সন্ন্যাসী ও পৌরোহিত্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণকেও তিনি নানাভাবে সহায়তা করে থাকেন। এখানে উল্লেখ্য, বনমালিকালুয়া গ্রামে নাপিতই 'জাগপ্রদীপ' জ্বালানোর অধিকারী বলে বিবেচিত হন। অপরাপর গ্রামে এই নিয়মের ব্যতিক্রম চোখে পড়ে।

৯। শিবমন্দিরে প্রত্যাবর্তন ও ঘটস্থাপন

বিভিন্ন গ্রামে ঘট-ডোবানো উপলক্ষে ঘাটে 'জাগপ্রদীপ' জ্বালা, ঢাকপূজা, গঙ্গাপূজা, 'উত্তরীয়' দেওয়া ছাড়াও বেত, মাগুর-মাছ ও 'ধ্বজ-বাঁশ' পূজা হয়ে থাকে। বনমালিকালুয়া গ্রামের 'চৈত্র-গাজন' উপলক্ষে মুরারিকালুয়া গ্রামে ঘট-ডোবানোর পরে তাঁরা শোভাযাত্রা সহকারে বনমালিকালুয়া গ্রামের শিবমন্দিরে ফিরে আসেন। তখন প্রথমে থাকে ঢাক ও কাঁসি। পরে ডানহাতে একটি বেত নিয়ে বাসঘরি ভক্তা বা অন্য কোন সন্ন্যাসী সদ্য পূজা করা 'ধ্বজ-বাঁশ'টি কাঁধের ওপরে রেখে বয়ে আনেন। এরপরে যে কোন একজন গ্রামবাসী একটি বেত মাটিতে টেনে-টেনে চলেন। পরেই

চলেন নাপিত ঘটি থেকে জল ছড়াতে-ছড়াতে। নাপিতের পেছনে দেউলা ভক্তা শিবের-ঘট ও পাটভক্তা দুর্গার-ঘট মাথায় কাপড়ের বিড়ার ওপর বসিয়ে কথা না বলে হাঁটতে থাকেন। উভয়ের ঘটের ওপরেই একটি করে বেত ধরা থাকে। একজন লোক 'জাগপ্রদীপে'র হাঁড়িটি নিয়ে দেউলা ও পাট ভক্তাকে অনুসরণ করেন। শিব-মন্দিরে পৌঁছানোর পরে ধ্বজ-বাঁশ টি মন্দিরের উত্তরে 'নেতনালা'র সামনে রাখা হয়। অপরপক্ষে, শিব ও দুর্গার-ঘট নিয়ে দেউলা ও পাটভক্তা মন্দির প্রদক্ষিণ শেষে 'ঝুলন-খুঁটি'র ভেতর দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন। এই দুটি ঘট মন্দিরের ভেতরে (পূর্বদিকে) সাদা ধানের ওপরে পাশাপাশি বসানো হয়। দুর্গার-ঘট থাকে শিবের-ঘটের বামদিকে (দক্ষিণে)।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে. কাঁকট্যা রাজবংশী-পাড়ার 'চৈত্র-গাজনে' নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠা পুকুরে দুর্গা ও কামাখ্যা-কালীমার ঘট ডোবানো হয়। পরে দুটি ঘট গাজন-তলায় অস্থায়ী বেদীর ওপর রেখে ব্রাহ্মণ পূজা করেন ও দেউলা ভক্তা একটি মাগুর-মাছ বলি দেন। রাজবংশী-পাড়ায় কোন শিবমন্দির নেই। ফলে, গাজন উপলক্ষে ত্রিপলের ছাউনি দিয়ে তাঁদের একটি অস্থায়ী-পূজামণ্ডপ তৈরী করতে হয়। শুধু তাই নয়, প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গের পরিবর্তে মাটির শিবলিঙ্গ পূজার শেষে তাঁরা বিসর্জন দেওয়াই বিধি সম্মত বলে মনে করেন। কোন বিশেষ কারণে ১৩৭৮ সালের গাজনে মাটির শিবলিঙ্গের পরিবর্তে তাঁদের পুরোহিতের ব্যক্তিগত শিবলিঙ্গই গাজনে ব্যবহৃত হয়েছিল। এঁদের পাড়ায় অস্থায়ী বেদীর ওপর পূজা ও ঘটে মাছের রক্ত দেওয়ার পরে, ঘট দুটি ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া পূজামণ্ডপের ভেতরে পাশাপাশি স্থাপন করা হয়। কামাখ্যা-কালীমার ঘট থাকে দুর্গার বামে।

১০। সেবা ডাকা বা প্রণামী

ঘট-স্থাপনের দিন থেকেই সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নানান দেবদেবীকে সমবেত ভাবে আরাধনা করেন। এরই নাম 'সেবা ডাকা'। বনমালিকালুয়া গ্রামে গাজনের প্রথম দিন (প্রথম ভোগের দিন) থেকে পঞ্চম 'ভোগে'র দিন পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুরে প্রথমে 'নেতনালা', পরে 'পাত্রদেবতা' ও শেষে গাজন-তলায় অবস্থিত একটি ব্যক্তিগত ধর্মমন্দিরের সামনে 'সেবা ডাকা' হয়। এই 'সেবা ডাকা'র পূর্বে ব্রাহ্মণ প্রথমে 'সূর্যবেদী,' পরে দুটী কাসমিলা গাছের সঙ্গে বাঁধা 'ঝুলন-খুঁটি' ও শেষে 'পাত্র দেবতা'র উদ্দেশ্যে আতপচাল, ফল, মিষ্টি নিবেদন করেন। পূজার অব্যবহিত পরে 'সূর্যবেদী'র নৈবিদ্য মালাকার, 'ঝুলন-খুঁটী'র নৈবিদ্য নাপিত ও 'পাত্র দেবতা'র

নৈবিদ্য ডম জাতীয় লোকই গ্রহণ করে থাকেন। এখানে 'সেবা ডাকা'র পূর্বে সন্ন্যাসীদের গায়ে 'পঞ্চামৃত' ছড়ান হয়। এ ছাড়া, 'সেবা ডাকা'র সময়ে পাট ও ধুনা সহযোগে যে 'ধুনাচুর' জ্বালবার নিয়ম আছে, তা সাধারণতঃ পাট অথবা দেউলা ভক্তাই জ্বেলে থাকেন। কিন্তু ধারিন্দা ও জয়রামবাটী গ্রামে 'সেবা ডাকা'র পূর্বে 'সূর্যবেদী', 'পাত্র দেবতা' ও 'ঝুলন-খুঁটি' পূজার নিয়ম চোখে পড়ে না। কাঁকট্যা রাজবংশী-পাড়ায় নবনির্মিত মাটির 'সূর্যবেদী', পাথরের বড়াম চণ্ডী (ছোট-বড় চারটি পাথর, কোন সাকার মূর্তি নয়) ও কাঁচা-বাঁশের তৈরী 'ঝুলন-খুঁটি' পূজা করেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু কোন স্থানেই নৈবিদ্য দেওয়া হয় না। শুধু তাই নয়, এখানে 'নেতনালা'র কাছে 'সেবা ডাকা'র কোন নিয়ম নেই। ধারিন্দা গ্রামে 'প্রণামী মন্ত্র' বলা হয় শিবমন্দিরের সম্মুখে। ঐ সময়ে প্রত্যেক নাম আবৃত্তির শেষে ঢাক বাজান হয়। 'সেবা ডাকা'র সময়ে যে সকল দেবদেবীর নাম নেওয়া হয়, সে সম্পর্কে উদাহরণ হিসেবে বনমালিকালুয়া ও ধারিন্দা গ্রামের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষণীয়।

ক) বনমালিকালুয়া গ্রামে 'সেবা ডাকা' উপলক্ষে দেবদেবীর নাম—

রুদ্রেশ্বর, তারকেশ্বর, বাণেশ্বর, ঝগড়েশ্বর, চন্দনেশ্বর, ফুলেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর, কাশীশ্বর, অম্বিকেশ্বর, ভূবনেশ্বর, কনকেশ্বর, কলকেশ্বর, চম্পকেশ্বর, বাঘেশ্বর. নকুলেশ্বর, জলেশ্বর, চক্রেশ্বর বক্রেশ্বর, রণেশ্বর, খগেশ্বর, ঘণ্টেশ্বর, শঙ্খেশ্বর, কোকিলেশ্বর, কল্যাণেশ্বর, ভূতনাথ, শম্ভূনাথ. লোকনাথ, ভানুর বৈদ্যনাথ, আলুর বৈদ্যনাথ, হরশঙ্কর নাথ, সোনার শঙ্কর নাথ, বৈদ্যনাথ, মাহান্দাতা, ভূড়ভূড়ি কেদার, ত্রিশূলধারী, চক্রধারী, জটাধারী, বর্গভীমা, কালীঘাটের কালী, বল্লুক চণ্ডী, আমতার মেলাই চণ্ডী, খেজুরী চণ্ডী, অলাই চণ্ডী, কলাই চণ্ডী, লড়াই চণ্ডী, কল্যাণেশ্বরী, মনসাকুমারী, শীতলা মা, সর্বদেবদেবী ও হরিবোলা-হরিবোল চার বার। রুদ্রেশ্বরের (বনমালিকালুয়া গ্রামের শিবের নাম) নাম উল্লেখ করে 'সেবা ডাকা' বা 'সোয়া' জানানো আরম্ভ হয়। এই 'সেবা ডাকা'র মন্ত্রটি হল—

"রুদ্রেশ্বরের চরণে সোবা সে, সোবা কইলে সোবাসে
তোমার ওনাত ভক্ত ডাকে, তবুনাত প্রভুর ধ্যান ভাঙ্গে
শিবো-দুগ্‌গা মুনি মহাদেব মহাদেব, হরিহরি বোলা হরিবোল।"

একইভাবে, রুদ্রেশ্বরের পরিবর্তে অন্য সকল দেবদেবীর নাম নিতে হয়।

খ) ধারিন্দা গ্রামে প্রণামীর মন্ত্র ও দেবদেবীর নাম—

"আদিকাটি ভকতাপূর্ণ শীতসাপূর্ণ আর পূর্ণ ষষ্টি কান

ডাইনে ঠাকুর বামে হনুমান, অম্বিকেশ্বরের চরণে পঞ্চপ্রণাম"।

এইভাবে ধারিন্দা গ্রামের শিব অম্বিকেশ্বরের নাম স্মরণ করে প্রণাম জানানোর পরে অন্য দেবদেবীর নাম নেওয়া হয়। এই নামগুলির মধ্যে আমরা পাই—তারকেশ্বর, বাণেশ্বর, ফুলেশ্বর, ঝড়েশ্বর, চন্দনেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর, চক্রেশ্বর, ভূতনাথেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, গ্রাম্যশীতলামাতা, কালীঘাটার কালীমাতা, মৈশালী শীতলামাতা, পিয়াজবেড়্যা শীতলা মাতা, বর্গভীমা, সীতারাম, বেতালদীঘির পঞ্চানন্দ, হরি মহারাজ, মহাপ্রভু, লক্ষ্মীনারায়ণ, জগন্নাথ, বলরামজী, সকল ব্রাহ্মণ, সকল বৈষ্ণব, সকল সন্ন্যাসী, পিতামাতা', দেশবর্গ-গুণীজ্ঞানী—ছোট-বড়—সকলের চরণে পঞ্চপ্রণাম।

সবশেষে বলা হয়—

"আমি কি বর্ণিতে পারি মল মূত্র দেহ ধরি
অপরাধ ক্ষমা কর প্রভু মৃত্যুঞ্জয়"।

১১। সূর্যার্ঘ দেওয়া

সন্ন্যাসীরা 'সেবা ডাকা'র পরে 'সূর্যবেদী'তে অর্ঘ্য দেওয়ার জন্য সমবেত হলে বনমালিকালুয়া গ্রামে তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে কলামোচার খোলা দেওয়া হয়। ঐ মোচা খোলায় থাকে কাঁচা-খেজুর, জবাফুলের পাপড়ি ও সামান্য 'পঞ্চামৃত'। তবে কোন সন্ন্যাসী ইচ্ছা করলে, তিনি কাঁচা-খেজুরের পরিবর্তে বেল, হরীতকী বা কাঁচা-আমও দিতে পারেন। এখানে লক্ষণীয়, বনমালিকালুয়া গ্রামে ব্যাসোক্তশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং জয়রামবাটী ও বড়বড়িয়া-শিকারগড় গ্রামে আচার্য্য ব্রাহ্মণ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

১২। ঝুলন

সূর্যার্ঘ দেওয়ার পরে 'ঝুলন' অনুষ্ঠানের জন্য পুরুষ সন্ন্যাসীরা দুটি 'ঝুলন-খুঁটি'র নিকটে সমবেত হন। ঝুলন-খুঁটি'র নীচে একটি গর্তে পাট, আমকাঠ ও ধুনা দিয়ে আগুন জ্বালান হয়। 'ঝুলন-খুঁটি'র সঙ্গে বাঁধা বাঁশে ঝোলানো পাটের-দড়ির ফাঁসে প্রথমে ডান-পা গলিয়ে তার ওপর বাম-পা আটকে একে-একে প্রত্যেক সন্ন্যাসী আগুনের ওপর মাথা রেখে ঝুলতে থাকেন। অপর দুজন সন্ন্যাসী সংক্ষিপ্ত 'সেবা ডাকা'র মধ্য দিয়ে ঝুলন্ত-সন্ন্যাসীকে পূর্ব-পশ্চিমে দোলাতে থাকেন। এই সময়ে নীচের আগুনে ধুনা ছিটিয়ে দেওয়ার ফলে, আগুনের শিখা ঝুলন্ত-সন্ন্যাসীর চোখে মুখে লাগে। তখন সমবেত সন্ন্যাসী ও দর্শকদের মধ্যে ঐ সন্ন্যাসীর মুক্তি কামনায় ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়।

১৩। ভোগ দেওয়া

শুধু অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যেই নয়, বিভিন্ন গ্রামের শিব-গাজনে বিজোড় সংখ্যায় 'ভোগ' দেওয়ার নিয়মটিও লক্ষণীয়। কারণ, এই নিয়মকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রামে গাজনের পৃথক-পৃথক নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন—'তিন-ভোগের গাজন', 'পাঁচ-ভোগের গাজন', 'সাত-ভোগের গাজন', 'নয়-ভোগের গাজন', 'এগারো-ভোগের গাজন' ইত্যাদি। প্রতিদিন একটি করে 'ভোগ' দেওয়াই নিয়ম। নীলপূজার আগের দিন পর্যন্ত 'ভোগ' দেওয়া চলে এবং এই সময়ের মধ্যেই নির্দিষ্ট 'ভোগ'গুলি দেওয়া শেষ হয়।

গাজনের বিভিন্ন দিনে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে যে আনুষ্ঠানিক 'ভোগ' দেওয়ার নিয়ম আছে, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল—ব্রাহ্মণ ভোগ, দেশ ভোগ, মুখ্যার ভোগ, মন্নুই ভোগ, পাট ভোগ, শ্যামসন্ন্যাসী ভোগ, দেউল ভোগ, গুড়ান ভোগ, হনমন্তী ভোগ, আঁশপুড়ান ভোগ ও রাজভোগ। এই সকল 'ভোগে'র পরিমাণ ও উপকরণেও বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়ে। কোন-কোন গ্রামে গাজনের 'প্রথম ভোগে'র দিন যে সকল দ্রব্য দেওয়া হয় তা, 'দ্বিতীয় ভোগে'র দিন কিছুটা (তাঁদের নিয়মমত) বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে গাজনের বিভিন্ন দিনে 'ভোগে'র পরিমাণও বাড়তে থাকে। গাজনের সর্বশেষ 'ভোগে'র নাম 'রাজভোগ'। অধিকাংশ গ্রামেই কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে 'রাজভোগ' নেওয়া হয়। অন্যত্র এই নিয়মের পরিবর্তে কোন বিশেষ বংশের পক্ষ থেকে 'রাজভোগ' দেওয়ার ব্যবস্থা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে।

'ভোগ' দেওয়ার নিয়মেও ব্যতিক্রম আছে। বনমালিকালুয়া গ্রামে 'রান্না ভোগ' দেওয়া হয়। কিন্তু ধারিন্দা ও কাঁকট্যা রাজবংশী-পাড়ার গাজনে 'রান্না ভোগে'র পরিবর্তে কাঁচা চালই নিবেদন করা হয়ে থাকে। অবশ্য সকল স্থানেই 'ভোগ' নিবেদনের পরে, তা ডম জাতীয় লোককে দিতে হয়। এ ছাড়া সামান্য কিছু 'ভোগ' গভীর রাত্রে পুকুরে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'ভোগ-ভাসান'।

১৪। ভোগ ডাকা

'ভোগ' নিবেদনের পরে শিব-গাজনের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণকে একটি হাতে-লেখা খাতা পড়ে শোনাতে হয়। এই সময়ে সন্ন্যাসীরা উপস্থিত থাকেন। এঁদের যে খাতাটি পড়ে শোনাতে হয়, তার বক্তব্য ও আলোচিত বিষয়বস্তুর বর্ণনা, অন্য কোন গ্রামের সঙ্গে হুবহু মেলে না। এই মহকুমার কয়েকটি গ্রামের খাতা থেকে চার যুগের ভক্তাদের যে নামগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলির বানান সংশোধন

মা করেই উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হল।

ক) সত্যযুগের ভক্তা

আদিভক্তা উল্লুক, দেবী বামেশ্বরী, বসুন্ধরা, শ্বেত কাকঃ, শ্বেত বনক, কশ্যপরাজ, নিলাম্বর, যুনবক, উচ্ছর, বৃষব, জনক ঋষি, সম্ভমুক্ত শম্ভু, পঞ্চ রাজন, বছিদেবঃ, পরমেশ্বর, নিলাম্বর ঝাগঃ, শচি দেবী, কংস, লোকেশ্বর, মহর্ষি, উর্জ্জন ঋষি, উল্লুক মহামুনি, চতুর্ভুজ নারায়ণ, কুবেরাজ ও যুধিষ্ঠির।

খ) ত্রেতাযুগের ভক্তা

আদিভক্তা নৃসিংহ, শ্রীকণ্ঠ, পুণ্ডরাকাশী, ব্রাহ্মণ গোঁসাই, পুণ্ডরীকাক্ষ ডাহাল, শুকদেব, বসুদেব, অহিরাবণ, মহিরাবণ, ত্রিজটা ঈশ্বর, পরাসর, সীতাপতি, জনার্দ্দন, ত্রিজটাম্বর, মহাঋষি, কচ্ছপ, নারদ কচ্ছপ, গয়াসুর, পূর্ণকামী, মহন্তহাল, ভাগিরথী, জয়ামানী, বীর নাঙ্গুরী, বীর মাধুলি, শীবাহারি, নিশাহাড়ি, মনোমথ, মনোহর, শারিশুক ও হনুমন্ত ডাহাল।

গ) দ্বাপরযুগের ভক্তা

আদিভক্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু পাট ভগতা, ইন্দ্র, পবন, ধূল সানট্‌, জল সানট্‌, চন্দ্রাড়ি, মাতুলী সন্ন্যাসী, নালুয়া সন্ন্যাসী, দামোদর সন্ন্যাসী, ঝুথ ঝাপই, চন্দ্র দেবতা, হেম কেদার, উষাহাড়ি, জীরামালি, সূর্য্য, বরুণ, যম, নবগ্রহ, দশ দিকপাল, বলরাম, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, উগ্রেশ্বর রুদ্রেশ্বর, মহেশ্বর, ভগীরথ, উল্লুক, চীনামালি, সামাট্‌, পড়িহর, পড়াসামাই, সাঙ্গ সামাই ও আলো সামাই।

ঘ) কলিযুগের ভক্তা

অমল সামাই, দণ্ড সামাই, জল সামাই, দেউলা, পাটভক্তা, নগর খুটিয়া, মাংস উপবাসি, মৎস উপবাসি হবিষ্য উপবাসি, আশানি পাহাড়ি, হনুমান, পাতালের মাগলোক, গায়েন, সূর্য্যতাত বরুণ, ধর্ম, ধামাই অধিকারী, লাউসেন, আমূল আহারি, তাম্বুল আহারি, জলসাপট্‌, খুল ঝাপট, বাইতি, কাবা ঠোঁটী, রঞ্জাবতী, মান্ধাতা, মাণিক চোর, পুরোরবা ষট্‌ চক্রবর্তী, ঘোড়ামুই, শঙ্খ, বায়ু, বাসকরি ভাড়ারি, হনুমন্ত কট্যাল, নল কুবের, শ্রীহরঙ্কর তালবেতাল ও বিচিত্র-ডাহল।

১৫। গাছ চিয়ানো

নীল পূজার দিন রাত্রে ব্রাহ্মন মাথায় সিঁদুর মাখানো একটি মাগুর মাছ (গাছ) উৎসর্গ করে মন্দিরে শিবলিঙ্গের নিকটে অস্থিত 'নীলঘরে' ছেড়ে দেন। মাছটির মাথায় প্রথমে 'পঞ্চামৃত' ও পরে জল ঢালার ফলে মাছটি ধীরে ধীরে 'নীলঘর' ও

শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ শেষে 'নেতনালা' দিয়ে মন্দিরের বাইরে চলে আসে। অধিকাংশ গ্রামেই এই মাছটি পুকুরে ছাড়া হয়। কিন্তু গড়কিল্লা গ্রামে মাছটি 'নেতনালা' দিয়ে মন্দিরের বাইরে আসবার পূর্বেই ব্রাহ্মণ সেটিকে ধরে নিজেই পুকুরে ছেড়ে দেন।

১৬। হাখণ্ড ঘর পোড়ানো বা গেড়েমুড়া

নীলপূজার পরদিন (চৈত্র সংক্রান্তি) সকালে বনমালিকালুয়া গ্রামে তিনটি 'বেঁড়ে-বাঁশ,' একটি মোচাসহ কাঁঠালি কলার গাছ, তালপাতা ও খড় দিয়ে 'হাখণ্ড ঘর' তৈরী করে তার মধ্যে শিব-দুর্গার বিবাহের অনুষ্ঠানটি হয়। দেউলা ভক্তা শিব ও পাটভক্তা লাল-পাড় শাড়ী পরে দুর্গার বেশ ধারণ করেন। বিবাহের সময় একটি মাগুর-মাছ পূজা করে পুকুরে ছাড়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষে দেউলা ভক্তা 'হাখণ্ড ঘরে' আগুন দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটি তলোয়ার (নিংচা) দিয়ে কলাগাছটি এককোপে দ্বিখণ্ডিত করেন। অপরপক্ষে, ধারিন্দা, মৈশালী উত্তরপাড়া, মৈশালী মধ্যপাড়া ও নাইকুড়ি জগন্নাথচক্ গ্রামে ভগবতীর নামে মাছটি উৎসর্গ করে কিঞ্চিৎ কেটে পুকুরে ছেড়ে দেওয়াই নিয়ম। শালগেছ্যা গ্রামে মাছটি কাটা অথবা পুকুরে ছাড়া হয় না। তাঁরা পূজার পরে মাছটি ডেমাকে দেওয়াই বিধিসম্মত বলে মনে করেন। শিব-দুর্গার বিবাহ অনুষ্ঠানটিও এখানে একইভাবে পালিত হয় না। এইদিন বিকেলে চড়ক হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ধূরপা গ্রামে 'বৈশাখী গাজনে'র চড়ক অনুষ্ঠানটি, ১৩৭৬ সালে বৈশাখ সংক্রান্তির দিনই হয়েছিল। তবে ময়না গড়ের 'এগারো ভোগে'র 'বৈশাখী গাজনে' অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই চড়ক হওয়া নিয়ম বলে জেনেছি।

১৭। উত্রি খোলা

১লা বৈশাখ সকালে বনমালিকালুয়া গ্রামে যোগদানকারী সন্ন্যাসীরা (পুরুষ ও মহিলা) শিবমন্দিরে সমবেত হন। ঐ সময়ে নাপিত পুরুষদের চুল, দাড়ি ও নখ কেটে দেন। মহিলাদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নখ কাটাই নিয়ম। এর পরে সকলে সরিষার তেল ও হলুদ মেখে পুকুরে স্নান করেন। স্নানের শেষে ব্রাহ্মণ একে-একে প্রত্যেকের 'উত্তরীয়' বা 'উত্রি' খুলে দেন। তবে পাট ভক্তা, দেউলাভক্তা ও বাসঘরি ভক্তাই সর্ব প্রথমে 'উত্রি' খোলার সুযোগ পান। এই সময়ে গোত্র পরিবর্তনের জন্য ব্রাহ্মণ তাঁদের একটি মন্ত্র বলান— "শিবগোত্র পরিত্যাজ্য, আপ্ত গোত্র প্রবেশিত।"

এতদঞ্চলে অনুষ্ঠিত শিব গাজনের বৈচিত্র্য যা আমার চোখে পড়েছে, মোটা-মুটিভাবে এখানে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করলাম। এই জেলার গাজন সম্পর্কে আরো বিস্তৃত অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

পাদটীকা

১। পূজা-পার্বণ—শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পৃঃ ৫৬। বিশ্বভারতী, কলিকাতা। ১৩৫৮ আশ্বিন।

২। রূপরামের ধর্মমঙ্গল—ডঃ সুকুমার সেন, রূপরামের ভূমিকা, ১৯৫৭। (রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর গ্রন্থে ডঃ অমলেন্দু মিত্রের ধর্মঠাকুর ও শিব সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

৩। বাঙ্গালীর পূজা-পার্বণ—চড়ক উৎসব, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, পৃঃ ৮৭। শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৫৬।

৪। হাওড়া জেলার লোক-উৎসব—তারাপদ সাঁতরা, পৃঃ ৭৩। পাণিত্রাস : হাওড়া। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

৫। রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর—ডঃ অমলেন্দু মিত্র, পৃঃ ৬৭। ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১২। ১৯৭২।

৬। রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর—পৃঃ ১০৮

৭। পূজা-পার্বণ—পৃঃ ১৮।

৮। Dharma Worship—K. P. Chattopadhyay, pp. 99—135. Journal Royal Asiatic Society of Bengal. Letters. Volume VIII, Article No, 4, 1942.

৯। রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর—পৃঃ ২৪৬।

১০। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা—সম্পাদক, অশোক মিত্র, পৃঃ ২৭৫-৪৭৩; ৪৯৫-৫২৪। তৃতীয় খণ্ড। দিল্লী, ১৯৭১।

কৃতী সোম

বাংলা কবিতায় প্রেমবোধের রূপান্তর

বাংলা সাহিত্যের বহতা ধারায় সুদূর চণ্ডীদাসের কাল থেকেই প্রেমের কবিতা, গান ও পদাবলীর প্রাচুর্য দেখা যায়। লৌকিক সংসারের নানা সম্পর্কে যে মমতা ও সমবেদনার অভিব্যক্তি সুপরিচিত, কবিতায় নরনারীর প্রণয় বর্ণনা তারই অন্যতম দিক। প্রেম আসক্তি ও নিরাসক্তি — উভয় দিকেই অগ্রসর। বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্য ধারায় প্রেমানুভূতির এই উভয়প্রবণতাই সুপরিচিত এবং বাংলা প্রেমের কবিতাও এদিক থেকে বিচ্ছিন্ন কোন স্বতন্ত্রতার উদাহরণ নয়।

আধুনিক কালের বাংলা কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির যে বিশেষ প্রয়োগ ও নিরীক্ষা দেখা যায়, তা মধ্যযুগের পুনরাবৃত্তি নয়। জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রেম ও প্রকৃতি সম্পর্কিত কবিতাগুলিতেও কবিদের নতুন মানসিকতা আত্ম-প্রকাশ করেছে। এই নতুন চিন্তা এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে এবং আমাদের দেশ কালের উত্তরোত্তর পরিবর্তিত অবস্থার চাপে।

মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কাব্যের প্রেমার্তি যা এসেছে ধর্ম-চেতনার সঙ্গে বা ধর্মসম্প্রদায়-বন্ধনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তারই প্রায় সমসাময়িক কালে আবার তথাকথিত ধর্মচেতনামুক্ত সাধারণ মানুষের লৌকিক প্রেমের পরিচয় পাই পূর্ববঙ্গগীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকার মধ্যে। এই কাব্যগুলিতে দ্বন্দ্বমুখর স্বাধীন প্রেমের স্বাক্ষর চিহ্নিত। রক্তমাংসে-গড়া মানুষের চিরন্তন হৃদয়-বৃত্তির দিক দিয়ে বৈষ্ণব কাব্যের রাধার সঙ্গে এই কাব্যগুলির

নায়িকাদের সাদৃশ্য থাকলেও সাধারণ মানুষের সহজ স্বাধীন মনোবাসনার রূপায়ণে মৈমনসিংহ গীতিকা তথা পূর্ববঙ্গগীতিকা ভিন্নতর প্রেমের পরিচয় বহন করে।

মৈমনসিংহ-গীতিকায় প্রেমের মধ্যে যে মানবিক আর্তি ফুটে উঠেছিল, কবিগান ও টপ্পার মধ্যে তার ধারা অব্যাহত থকে। ভারতচন্দ্রের তিরোধান কাল অর্থাৎ ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত গেছে কবিগানের স্বর্ণযুগ—ডঃ সুশীলকুমার দে'র এ-অভিমত যথার্থ। বিদ্যাসুন্দরের রতিবিলাসের উচ্ছলতা, সে-কাব্যের অলঙ্কার বাহুল্য ও গঠন-পরিপাট্য অতিক্রম করে যে অন্তর্মুখী প্রণয় চেতনা এবং সহজসুন্দর মানবিক প্রেমের আস্বাদ কবিগানের মধ্যে দেখা গিয়েছে, তা আধুনিক প্রেম-কবিতার ভূমিকা স্বরূপ। কবিওয়ালাদের মধ্যে নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৮), নিধুবাবুর সমসাময়িক শ্রীধর কথক, লালু ও নন্দলাল, রামবসু (১৭৮৫-১৮২৮), দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৭) প্রভৃতির কবিগানে বিরহ-বেদনা ও মিলনাকাঙ্ক্ষা অকপটভাবে বিবৃত হয়েছে। শুধু ভাবের ক্ষেত্রেই নয়, কোন কোন দৃষ্টান্তে কবিগানের ভাষায় আড়ম্বরহীনতাও লক্ষণীয়। অবশ্য কৃত্রিমতা ও লঘুতা কখনো কখনো এই গীতিকাগুলির উৎকর্ষ নষ্ট করেছে।

বাংলার আদি গীত রচয়িতাদের অন্যতম এই নিধিবাবুই হিন্দুস্থানী প্রেমগীতি বাংলা গানে রূপান্তরিত করেন। তাঁর রচনায় সংক্ষিপ্ততা এবং গভীরতা সমকালীন বাংলা কাব্য সাহিত্যের ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, যা আধুনিক গীতি-কবিতার গতি প্রভাবিত করেছে। নিধুবাবুর ভাষায় পরিমার্জনা, সারল্য ও মাধুর্য স্মরণীয়। শোনা যায়, শ্রীমতী নামে এক রমণীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় ছিল। এই প্রেমের প্রেরণায় তিনি বহু উচ্চাঙ্গের গান রচনা করেন। নিধুবাবুর একটি প্রসিদ্ধ গান এই রমণীর অভিযোগেরই জবাব—

> "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে
> আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে
> বিধুমুখে মধুর হাসি দেখতে বড় ভালবাসি
> তাই তোমারে দেখতে আসি দেখা দিতে আসিনে।"

গীতিকাটির মধ্যে ভালবাসার আন্তরিকতা এবং কল্পনা মাধুর্য বিদ্যমান।

কবিয়াল রামবসুর কবিগানের মধ্যেও গভীর ব্যক্তি-অনুভূতি বিদ্যমান, যেমন তাঁর রচনায় নায়িকার নিম্নোক্ত উক্তি—

> "তোমায় ভালবাসি তাই, চোখের দেখা দেখতে চাই
> কিছু থাক থাক বোলে থোরে রাখবো না।"

কবি গায়িকা অক্ষয় বাইতিনীর প্রণয়ে আবদ্ধ পাঁচালীকার দাশরথি রায় তারই দলের গাঁথনদার ছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। দাশরথি রায়ের গানের ললিত-ভঙ্গি ও সরসতা সুপরিচিত। ছড়ার রীতি থেকে তিনি বাংলা গানকে কাব্যসঙ্গীতে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। দাশুরায় বিরহবেদনা প্রকাশের প্রেরণায় কখনো কখনো প্রকৃতিকে অবলম্বন করেছেন। কবি মানসের নিজস্ব অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রাকৃতিক পটভূমিকা গভীর আবেদন সৃষ্টি করেছে।

"সই বসন্তে বর্ষা আমার জ্ঞান হয় মনে।
হল উদয় বিরহ মেঘ হৃদয়-গগনে॥
দুর্যোগ যেন সজনী অন্ধকার দিনে রজনী,
তাহে বজ্রাঘাত সম কাল কোকিলের ধ্বনি।
আশা তরুবর ভাঙ্গিছে ঝড়ে মলয়া পবনে॥"

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাধামোহন সেনের 'সঙ্গীত তরঙ্গ' (১৮১৮) প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে। গ্রন্থটি শতাধিক সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। কালীপ্রসাদ ঘোষ রাধামোহনকে একজন প্রসিদ্ধ কবি বলে চিহ্নিত করে তাঁর কয়েকটি গানের অনুবাদ করেন। বিরহ-বেদনা ও মিলন ব্যাকুলতার কল্পনা এই সব রচনায় অনবদ্যভাবে রূপায়িত—

"বিরহ অনলে তনু হল ত ভস্মের রাশি।
তাই আরাধনা রূপে সমীরণে সম্ভাষি॥
যদি বায়ু সখা হয়্যা, এ ভস্ম ফিঞ্চিৎলয়্যা,
দেয় শ্যামের শরীরে এই মনে অভিলাষী॥"

কবিগানের সুবর্ণযুগ যখন শেষ হয়, উপস্থিত আলোচনায় সেই সূচনাপ্রান্তে, ঈশ্বর গুপ্তের অভ্যুদয় কাল থেকে মধুসূদনের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত বাংলা প্রেম কবিতার বিশেষ কোন নতুনত্ব দেখা যায় না। কবিয়ালদের শেষ শক্তিশালী প্রতিনিধি হলেও গুপ্তকবির প্রেমের কবিতায় গভীর অনুভূতি বা আন্তরিকতার অভাব লক্ষণীয়। অন্যান্য বিষয়ে কিছু কিছু নতুনত্বের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও তাঁর কবিতায় প্রেমবিষয়ক নবভাবনার অনুপস্থিতিই চোখে পড়ে। আসল কথা, তিনি প্রেমের কবি নন। ব্যক্তিগত জীবনে মাতৃস্নেহ ও দাম্পত্য সুখের অপূর্ণতা তাঁকে নারী ও প্রেম বিষয়ে বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণ করে তোলে। স্নেহ প্রেমের মাধুর্য আস্বাদনে ব্যর্থ গুপ্ত কবির রচনায় নারী অনেক ক্ষেত্রেই কেবল লঘু রঙ্গ-কৌতুকেরই প্রতিভূ। ভাষার মধ্যে যেমন তিনি কবিয়ালদের মত অনুপ্রাস-যমকের বাহুল্য দেখিয়েছেন, তেমনি আবার সংস্কৃতানুগ বা বিদেশি শব্দ পরিহার করেছেন। দেশি শব্দের সহজ

প্রয়োগে ও খণ্ডরীতির কবিতা রচনায় তাঁর বিশিষ্টতা স্বীকার্য।

গুপ্তকবির সমকাল থেকেই বাংলায় ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরের' প্রভাব পুষ্ট কয়েকটি প্রণয়মূলক আখ্যান-কাব্যের আদিরস ও স্থুলতারই প্রাবল্য। ভাষার আড়ম্বর এবং অলঙ্কার প্রাচুর্য্যগত কৃত্রিমতা এই কাব্যগুলিতে আধুনিকতা প্রবেশের সুযোগ দেয়নি। এই জাতীয় কাব্যগুলির মধ্যে মদন মোহন তর্কালঙ্কারের 'রসতরঙ্গিনী' (১৮৩৩) ও 'বাসবদত্তা' (১৮৩৬—৩৭), কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'নবরসসিন্ধু' (১৮৪১), কালীকৃষ্ণ দাসের 'কামিনীকুমার' (১৮৫০) এবং রসিকচন্দ্র রায়ের 'জীবন তারা' (১৮৬৯) উল্লেখযোগ্য।

বাংলা কবিতায় আধুনিকতা বরণের প্রথম সাধকদের মধ্যে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয়তা স্মরণীয়। স্বদেশীয় সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও তিনি নতুন ভাবধারায় কবিতা রচনার চেষ্টা করেন। বিদ্যাসুন্দরের কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে 'ভেনাস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস'—এর লেখক শেকৃসপীয়রের তুলনা করে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের প্রতি সমর্থন জানালেও ভারতচন্দ্র থেকে বাংলা কাব্যধারায় যে আদি ও লঘু রস অনুশীলনের আধিক্য দেখা গিয়েছিল, রঙ্গলালই প্রথম তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমের সূচনা করেন। নতুন দৃষ্টিতে নতুন ধরণের আখ্যান কাব্য রচনার পথিকৃৎ হিসাবে রঙ্গলালের উদ্যম স্বীকার্য। বস্তুত রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে প্রণয়চিত্র যথার্থ কাব্যাবেগের উত্তাপ-বর্জিত বটে, তবে 'বিশুদ্ধ'। যেমন—

'তুমি হে আমার প্রাণের আধার
প্রাণ দিব তব লাগি।
যাক্ রাজ্য ধন নাহি প্রয়োজন
হই হব দুঃখ ভাগী॥

(রাজ দম্পতির কথোপকথন, পদ্মিনী উপাখ্যান)

রঙ্গলালের আমলেই আমাদের কবিতার ধারায় যুগ পরিবর্তনের আভাস দেখা যায়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গুপ্তকবি ভারতচন্দ্রের অসাধারণ কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি উল্লেখ করার ফলে রাখালদাস হালদার গুপ্তকবির এই মতের সমালোচনা করেন। রাখালদাসের মতে—'ঘৃণা ব্যতিরেকে বিদ্যাসুন্দরের এক এক অংশ পাঠ করা যায় না। সাহিত্যে নরনারীর প্রণয়বোধের অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে এই রুচি বিচারের ফলে তখন প্রাচীন ও নবীনের ঘাত-প্রতিঘাত চলতে থাকে। কিন্তু প্রবল সামর্থ্য ব্যতিরেকে

যথার্থ সৃষ্টির সাহায্যে কোন নতুন ভাবনাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না। রঙ্গলালের সে রকম সৃষ্টিশক্তি ছিল না। অতঃপর মধুসূদন আবির্ভূত হন।

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' নাট্যকাব্যের নায়িকারা স্বাভাবিক নারী-মহিমাকে অসংকোচে প্রকাশ করেছেন। নারী দেখা দিয়েছেন পুরুষের সহধর্মিণী ও মর্মের গেহিনী রূপে। দ্রৌপদী, শকুন্তলা, জনা, তারা প্রভৃতি চরিত্রে নতুন যুগের নতুন দৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে,—রোমান্টিসিজমের সঙ্গে এসেছে গভীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। বৈষ্ণব-কাব্যের লীলাময়ী রাধার প্রেমের সঙ্গে বীরাঙ্গনার নায়িকাদের প্রেমানুভূতির ব্যবধান সুপ্রতিষ্ঠিত। মনের কামনার অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি ও অকৃত্রিম প্রকাশ মধুসূদনের আগে বাংলা কাব্যে এমনভাবে দেখা যায় নি। প্রেমের মহত্তম শক্তিকে উদ্বোধিত হয়ে গুরু পত্নী তারা শিষ্য সোমদেবকে অনায়াসে বলতে পেরেছে—

"এস তুমি এস শীঘ্র। যাব কুঞ্জবনে
তুমি হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে।
দেহ পদাশ্রয় আসি, প্রেম উদাসিনী
আমি! যথা যাও যাব, করিব যা কর—
বিকাইব কায়মন তব রাঙ্গা গায়ে॥

এই কাব্যের কাহিনী নির্বাচনে মধুসূদনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিও বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় স্পষ্ট। মেঘনাথবধ-কাব্যের প্রমীলা একাধারে বীরাঙ্গনা ও কুলবধূ। যে নারী অশ্বপৃষ্ঠে রণসজ্জায় সজ্জিতা, সেই নারীই আবার বীরভূষণ ত্যাগ করে—'পরিলা দুকূলে রতনময়, আঁটিয়া কাঁচলি পীনস্তনী'। প্রেমের মুক্তদৃষ্টির ফলেই প্রয়োজনে সে কখনো বীর রমণী, কখনো বা—কুলরমণী। প্রেম তাকে দুর্জয় শক্তি, বাধাবন্ধহীন গতি এবং আত্মদানের অকুণ্ঠ প্রেরণা দিয়েছে।

মধুসূদনের কাল থেকে বাংলা কবিতায় অজ্ঞাতপূর্ব ব্যক্তিত্বে মর্যাদা মণ্ডিতা নারীকে ঘিরে পুরুষহৃদয়ে প্রেমানুভূতি আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রচিত বলদেব পালিতের কাব্যমালার অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি প্রবল ইন্দ্রিয়চেতনা ও সৌন্দর্যের পরিচয় বহন করে। এই গ্রন্থে কবিগান ও টপ্পা যুগের লালসা বা অসংযম নেই। সমকালীন কবি বিহারীলাল দেহগত ভোগবাসনার উর্দ্ধে একপ্রকার সৌন্দর্যময় অতীন্দ্রিয় প্রেমের কথা ঘোষণা করেন। তাঁর মতে কামনা ও আসক্তি থেকে উর্দ্ধায়নই প্রকৃত প্রেম—

"ফুটিলে প্রেমের ফুল
ঘুমে মন ঢুলঢুল

আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল।
সেই স্বর্গসুধা গানে
কত যে আনন্দ প্রাণে
অমায়িক প্রেমিকে তা জানেন কেবল॥"

(সারদামঙ্গল : বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী)

বিহারীলালের প্রকাশরীতিতে গীতিকবিতার অভূতপূর্ব কোমলতা লক্ষ্য করা যায়। এই সময় থেকে বাংলা কাব্যে অন্তর্মুখী সৌন্দর্যদর্শনের সূত্রপাত ঘটে। প্রাগাধুনিক কালে কবিদের দৃষ্টিতে বস্তুর বাহ্যিক রূপ ধরা দিত এবং সেই বহিরঙ্গ রূপায়নেই তাঁদের নজর ছিল অত্যধিক। হৃদয়ভাবনার রহস্য উদ্‌ঘাটনে আধুনিক কালের কবি বিহারীলালের আগে ততটা প্রচেষ্টা দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, এই রহস্যের প্রকাশরূপে ও শিল্প চেতনায় বিহারীলাল থেকে বাংলা কাব্যধারার রূপান্তর স্পষ্টতর।

মধুসূদনের মধ্যে যে নারী বন্দনার ধারা সূচিত হয়েছে, বিহারীলালের মধ্যেও তার ঢেউ প্রবাহিত। এই ঢেউ আরো তীব্রভাবে দেখা গেছে বিহারীলালেরই সমকালীন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি কবিদের রচনায়।

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকের প্রেম-কবিতার মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রূপ পায়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' থেকে 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত কবিতার ধারাটি সুপরিচিত। দেহ সর্বস্বতা বা দেহরাগের স্থূলতা থেকে রোমান্টিক প্রেমের গভীরতায় ক্রমশঃ বাংলা প্রেম কবিতার বিবর্তন ঘটে। ভারতচন্দ্র থেকে গোবিন্দ দাস পর্যন্ত, এবং গোবিন্দ দাস থেকে রবীন্দ্রনাথের এই কৈশোর যৌবন অবধি প্রেম-কবিতার দিকে নজর দিলে এ সত্য প্রমাণিত হবে। আধুনিক যুগের প্রাক্কালে কবি প্রসিদ্ধি অবলম্বন করে গতানুগতিক ধারায় ভারতচন্দ্রের মধ্যে যে শরীর কেন্দ্রিকতা ও স্থূলতা দেখা দিয়েছিল, গোবিন্দ দাসের মধ্যে সেই ধারাই অনুবর্তিত হয়। তুলনীয়—

'চুম্বণ চুচুকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ
কোকিল কুহরে পলায়ে।
সম অবলম্বন বালিল আলিল
মুদ্রিত নয়ন ছলায়ে। (অন্নদামঙ্গল)

অনুভূতি ও আন্তরিকতায় ভারতচন্দ্রের সঙ্গে গোবিন্দ দাসের পার্থক্য আবিষ্কার করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়। ভারতচন্দ্রের দেহ-সর্বস্বতার তুলনায় গোবিন্দ দাসের রচনার ইন্দ্রিয়াবেগে কাব্যোৎকর্ষ বর্তমান,—যদিও তা দেহাশ্রয়ী। ভারতচন্দ্র অবশ্য

গোবিন্দ দাসের তুলনায় অনেক বেশী পাণ্ডিত্যের অধিকারী,—তাঁর রচনা অনেক বেশী অলঙ্কৃত। গোবিন্দ দাস আটপৌরে ভাষায় অসংস্কৃত আবেগ অনুভূতির রূপকার। তিনি যখন এই সব কবিতা রচনা করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ সুপ্রতিষ্ঠিত কবি। রবীন্দ্রনাথের রচনায় নর-নারীর প্রণয় যে সূক্ষ্ম ধ্যানের বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়, গোবিন্দ দাসের রচনায় তার বিপরীত অভিব্যক্তিই বরং বেশি অনুভব করা যায়। গোবিন্দদাসের প্রেমবোধ কতকটা রবীন্দ্র-ভাবনার তীব্র প্রতিবাদ বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলিতে প্রেমের শারীর আকর্ষণের স্বীকৃতি এবং তদ্বিমুখতা, দুইই বিদ্যমান। প্রেমের ঐকান্তিক সমর্পণের ভাবটিই তাঁর মুখ্য প্রেমভাব। প্রাচীন বৈষ্ণব কাব্যের সঙ্গে তাই গভীর হৃদয়গত যোগ-অনুভব করা যায়। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

'লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে,
লও লজ্জা লও বস্ত্র লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে।'
(পূর্ণ মিলন : রবীন্দ্রনাথ)

এই সমর্পণের মধ্যে কবিচেতনার যে দেহমনস্কতা বিদ্যমান, তা যে স্থূল নয়, শরীর প্রধান নয়, সে কথা বলা বাহুল্য। বরং বিদ্যাপতির বর্ণনায় নায়িকার রূপ চিত্রণে যে রূপবিলাস অনুভব করা যায়, এখানে সে রকম বিলাসের দিক সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বিদ্যাপতির একটি প্রসিদ্ধ পদে দেখা যায়—

"জোড়ি ভুজ যুগ মোড়ি বেঢ়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ।"

এই পদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের একটি সুপরিচিত কবিতার তুলনাসূত্রে রমণীদেহে সচেতনায় রবীন্দ্রনাথের রূপোপাসনার আধ্যাত্মিকতাই বরং বেশি চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"কমলফুল বিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা।
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে
বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা।
মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাশি

শিথান ঢাকি গড়েছে ভারে ভারে।
একটি বাহু বক্ষ পরে পড়ি,
একটি বাহু লুটায় একধারে।
(নিদ্রিতা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বাংলা কবিতার ধারায়, প্রেমের উপলব্ধির নিবিড় আনন্দ-বেদনা গীতি-কবিতার মাধ্যমেই বেশি উচ্চারিত হয়েছে। প্রেমানুভূতি প্রধানতঃ আবেগধর্মী কবিতার প্রেরণা হয়ে উঠেছে। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা'য় বা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'-তে কাব্যরূপের যে পরিণত উৎকর্ষ দেখা যায়, সেরকম কবিদক্ষতা প্রতিভারই দান। কিন্তু অপেক্ষাকৃত গৌণ কবিরাও আবেগমুখ্য অজস্র গীতি কবিতায় নর-নারীর প্রেমানুভূতির যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে রক্ত মাংসের দেহের আকর্ষণ এবং গভীর আধ্যাত্মিক ভাব দুইই অল্পবিস্তর ব্যক্ত হয়েছে।

গীতিকবিতার বিভিন্ন শ্রেণীর চিন্তার কথা সূত্রে কেউ কেউ চিন্তা প্রধান, আবেগপ্রধান, নীতিপ্রধান ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পৃথক পৃথক শ্রেণীর অস্তিত্ব অনুভব করে থাকেন। প্রেমের কবিতায় চিন্তা, আবেগ নীতি নির্দেশ সবই থাকতে পারে। বিদ্যাপতির পূর্বোক্ত বর্ণনায় বা রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে অবশ্য বিশেষ রূপানুরাগ বা সৌন্দর্যবোধই প্রধান হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব এবং ভাষা উভয় ক্ষেত্রেরই অনুকরণ প্রয়াস দেখা গেছে বিভিন্ন কবির রচনায়। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' বা রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী-ই এ-দিকটির বহুশ্রুত উদাহরণ। এছাড়া আরো উদাহরণ আছে, যেমন রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর 'অবসর সরোজিনী'তে লিখেছেন—

নূতন পীরিতি মোর নূতন কুসুম সম
মাধব মধুকর তায় ;
নূতন সুরয মধু উছলয়ে অনুগম
অব কঁহা নাগর বায় ;
(পূর্বরাগ ঃ অবসর সরোজিনী)

ঊনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধ-সূচনায় রঙ্গলাল, মধুসূদন প্রভৃতি কবিদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা প্রেমের কবিতা নতুন সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়। শুধুই বৈষ্ণব কাব্য বা কবিগান প্রভৃতির চর্বিত-চর্বণ নয়, নতুন কালের কবি-মনের নিজস্ব আস্বাদনও ব্যক্ত হতে থাকে।

'ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন' নামে সংগ্রহ গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯ ; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৪) এই সময়ের বাংলা প্রেমের কবিতার অনেকগুলি

দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। বলদেব পালিত, রাজকৃষ্ণ রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি কবিদের রচনায় নিঃসন্দেহে এই মৌলিকতার চিহ্ন বিদ্যমান। পূর্বোক্ত সংকলনের সম্পাদকগণ (ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়) এই সংগ্রহে যেসব কবিতা প্রকাশ করেছেন, সেগুলি ছাড়াও আরো অনেক কবিতায় প্রেমানুভূতির রূপবিলাস, স্বপ্নানুধ্যান, বিষাদ ইত্যাদি ভাব নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। গোবিন্দচন্দ্র দাস, স্বর্ণকুমারী দেবী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজকুমারী দেবী ইত্যাদি কবির অনেকগুলি প্রেমের কবিতা এই সংগ্রহে জায়গা পেয়েছে। সে তুলনায় রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতার সংখ্যা খুবই কম—মাত্র একটি (অদর্শনে) এতে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু কবি মনের স্বকীয়তার উদাহরণ হিসাবে তাঁর আরো কোন কোন রচনায় প্রেম বা রূপানুরাগের অভিব্যক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যেমন 'তাঁর প্রিয়তমা হাসিল' রচনাটিতে—

"সঙ্গে লয়ে প্রেয়সীরে বসিনু সরসী-তীরে
নোঙায়ে বদন প্রিয়া সরোনীর দেখিল ;
সুবিমল জলোপরি, মনোহর রূপধরি'
প্রেয়সীর আঁখি-ছায়া দুলি দুলি ভাসিল।"

শুধু রূপ ধ্যানই নয়, বাংলার আধুনিক প্রেম কবিতায় কবি মনের বিভিন্ন দ্বন্দ্ববোধও বিদ্যমান। এ দিকের কয়েক উদাহরণের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়ালের এই কবিতাটি উল্লেখ করা যায়—

এই ত প্রেমের বন্ধ
বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব
কবিতার চিরানন্দ, সশঙ্ক-দুরাশা।
(কনকাঞ্জলি ঃ অক্ষয়কুমার বড়াল)

এ কথা সব কালের এবং সকল দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য যে কবিদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁদের প্রেম কবিতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আধুনিক কালে এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য আগেকার তুলনায় বেড়েছে বলতে বাধা নেই। ব্যক্তিমানসের প্রেম বিষয়ক ভাবাবেগ কল্পনার ঐশ্বর্যে, গভীরতায় এবং নিগূঢ়তর ব্যঞ্জনায় রূপায়িত হয়েছে, কোন কোন কবির রচনায়। রবীন্দ্রনাথের একটি লেখায় দেখা যায়—

"দেখ এই ফুটিয়াছে ফুল,
বসন্তেরে করিছে আকুল,
পুরাণ সুখের স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি

কত স্নেহভাবে,
হায় কোথা যাবে।"
(কোথায় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এই সময়ের অনেক মহিলা-কবির রচনায় পতি-প্রেমের স্মৃতিগুঞ্জন খুবই আন্তরিক-ভাবে ধ্বনিত হয়েছে। যেমন গিরিন্দ্রমোহিনী লিখেছেন—

'প্রেম যবে মূর্তিমান ছিলেন আমার
পূজেছি তাঁহায় দিয়ে প্রীতি-ফুলহার।'
(অশ্রু : গিরিন্দ্র মোহিনী দাসী)

ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে ব্যক্তি-অনুভূতি প্রকাশের যে নতুন উৎসাহ সূচিত হয়েছিল, কবিতায় প্রেমের বিভিন্ন প্রসঙ্গ সেই ধারাতেই বিদ্যমান। দাম্পত্য-প্রেমের অসংখ্য কবিতা দেখা দিয়েছিল এই ধারাতেই।

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে দাম্পত্য প্রেমের জয়গানে বাংলা কবিতা মুখর হয়ে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতি কবির রচনায় রূপ-চেতনার উল্লাস দেখা যায়। আবার আবেগ বিরলতা দেখা যায় প্রমথ চৌধুরীর প্রেম-কবিতায়। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রণয় সম্পর্কিত কবিতায় আবার পরিহাসেরও অভাব নেই; যেমন—

'দেখলাম পরে চাঁদের করে নেহাৎই প্রিয়া তৈরী নন,
বচন সুধায় যায় না ক্ষুধা, বরং শেষে জ্বালাতন,'
(প্রণয়ের ইতিহাস)

এটির নাম 'প্রণয়ের ইতিহাস' বটে, কিন্তু এ ইতিহাসে প্রেমের মগ্নতার চিহ্ন নেই, পরিহাসেরই প্রাচুর্য বিদ্যমান।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'প্রেম ও ফুল' তাঁর স্বর্গতা পত্নী ও কন্যার স্মৃতি-সম্পর্কিত রচনা। পত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যুতে তিনি যে সব কবিতা লেখেন, সে গুলিতে আন্তরিক শোকের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। দিজেন্দ্রলালের 'প্রণয়ের ইতিহাস'-এর সঙ্গে তার কোন মিল নেই। বরং গিরীন্দ্রমোহিনী বা অন্যান্য মহিলা-কবির প্রিয় বিয়োগ-সম্পর্কিত কবিতাগুলির সঙ্গে তাঁর ভাবের যোগ অনুভব করা যায় এসব ক্ষেত্রে। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য প্রবাহ' বইখানিতে 'গোবিন্দচন্দ্র দাস' প্রবন্ধে এই রকম একটি কবিতার উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন—

"আজো তার ভস্ম ছাই—
বুকে রেখে চুমা খাই
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ"।

এইভাবে ব্যক্তিগত জীবনের নানা প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে বিভিন্ন কবির প্রণয়-সম্পর্কিত অজস্র কবিতায়। বিভিন্ন তত্ত্বচিন্তার মিশ্রণ দেখা গেছে সেইসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন নানা পর্বের কবিদের রচনায় এর কত যে বৈচিত্র্য দেখা গেছে! বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—

'আছে ক্রূর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় স্বার্থপর লোভ
হিরন্ময় প্রেম পাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে,
আনন্দ নন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দর্শন
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রিতা। (বন্দীর বন্দনা : বুদ্ধদেব বসু)

বিগত শতকে জীববিজ্ঞানী ডারউইনের 'অভিব্যক্তিবাদ' চিন্তাজগতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। হার্বাট স্পেনসার জীববিজ্ঞানের এই অভিব্যক্তির তত্ত্বটিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তাঁর মতে বাহ্যিক শক্তির প্রভাব বংশ পরম্পরায় পিতা থেকে পুত্রে প্রবাহিত হয়। বের্গস´ ডারউনের মতবাদের যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর ধারণা বিবর্তনের মধ্যে একটি সৃজনশীল উদ্দেশ্য নিহিত। জীবনের প্রবহমানতা চিরন্তন সত্য এবং এই সত্যকে বোধি দিয়ে অনুভব করা সম্ভব। জীববিদ্যার ক্ষেত্রে উল্লিখিত মতবাদের বিভিন্নতা চিন্তাজগতে যথেষ্ট সংশয় সৃষ্টি করে এবং কাব্য কবিতায় তার আভাষ দেখা যায়। মনে পড়ে মোহিতলালের চিন্তা—

কোটিজ-জীব কল্লোলিত—দাঁড়াইয়া, এ জীবন বারিধি বেলায়
মোর চক্ষে অশ্রু উথলায়।
এই চির সুন্দরের রূপ-হর্ম্মে ফিরিব আবার,
কক্ষে কক্ষে সবিস্ময়ে খুলিব কি ইন্দ্রিয় দুয়ার?
নিরালম্ব বায়ুভূত ছায়ার শরীর
ত্যজিবে কি পুনরায় অনাদি তিমির?"
(মোহমুদ্গর : মোহিতলাল মজুমদার)

ঈশ্বর গুপ্ত বা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগে বাংলা প্রণয়ানুভূতির কবিতায় এই মননগুণের বিকাশ ঘটেনি। ব্যক্তিজীবন ও সমাজ পরিবেশের অন্বয়ে কবিমানসের

আবেগ ও মনন ক্রমেই সার্থকতর প্রকাশকলায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। প্রথমে মধুসূদন,—পরে রবীন্দ্রনাথ এই ধারায় উজ্জ্বল আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। অন্যান্য কবিরা নিজের নিজের সামর্থ্য অনুসারে এঁদেরই অনুসরণ করেছেন এবং অল্পবিস্তর মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা প্রেমকবিতায় অনুভূতির আধুনিক রূপ এইভাবেই অভিব্যক্ত হয়েছে।

বিষ্ণু বসু

সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক ও বাঙলা নাটক : ১৮৭২-১৯১২

নাট্যরচনায় দর্শকের প্রভাব অপরিসীম। নাট্যকার, প্রযোজক ও দর্শক— তিনের আনুপাতিক সম্পর্কে গড়ে ওঠে নাটক। কাজেই নাট্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্বতঃই দর্শকের কথা এসে পড়ে। কোনো বিশেষ যুগের নাটকের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য নির্ণয়ে সে যুগের দর্শকরুচি অন্যতম স্থান গ্রহণ করে থাকে। Drama's laws the drama's patrons give - জনসনের এ উক্তিতে অতিশয়োক্তি থাকলেও মূলের সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। তাই উনিশ শতকের বাঙলা নাটকের উদ্ভব বিকাশ ও প্রবণতার জন্য দর্শকমনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

উনিশ শতকীয় দর্শক সম্পর্কে নানা বিভিন্ন ও বিচিত্র মন্তব্য ইতস্ততঃ লক্ষ্য করা যায়। বাঙলা নাটকের দুই প্রধান নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক দর্শক সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাতে যে শুধু তাদের মানসিক বিভিন্নতা ব্যক্ত হয়েছে তা নয়, তার মাধ্যমে দুটো পৃথক নাট্যান্দোলনের স্বরূপও প্রকাশিত হয়েছে বলা যায়। "Audience যখন নিতে পারে না, তখন বুঝি audience য়ের মত করে ঠিক বলা হয় নি"[১] এবং "আমার দেশের আপামর সাধারণ লোক আমাকে ভালোবাসে, তাদের ভালোবাসাই আমার গৌরব করবার বস্তু। রঙ্গালয়ের পরিপোষক তারা— আমার নাটক গ্রহণ করেছে তারা। ...যদি তারা কোনও বই না নেয়—তখন আমি ভাবি—প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করি—তাদের কি করে বোঝাব—কি করলে আমার বক্তব্য তাদের বোধগম্য হবে।"[২] সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের সশ্রদ্ধ

উক্তির বিপরীত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য। সাধারণের আনন্দবিধানের জন্য ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও, অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ বলছেন— "কবিদলের গানে যে প্রকার উচ্চ আদর্শের শৈথিল্য এবং সুলভ অলঙ্কারের বাহুল্য দেখা গিয়াছে, আধুনিক সংবাদ পত্রে এবং অভিনয়ার্থ নাটকগুলিতে কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে তাহাই দেখা যায়। এই সকল ক্ষণকাল জাত ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের ইতরতা, সত্য ও সাহিত্য নীতির ব্যভিচার এবং সর্ববিষয়েই রূঢ়তা ও অসংযম দেখা যায়।"৩ বাঙলা নাটকের বিশেষ প্রকৃতি ও প্রবণতা নির্ধারণে এ উক্তিগুলোর তাৎপর্য অনুধাবনের প্রয়োজন আছে।

বাঙলা নাটকের সৃষ্টিলগ্নে পেশাদার রঙ্গালয় ছিলো অনুপস্থিত। এমন কি তখন নাট্য প্রযোজনা ব্যাপারটিও ছিলো অত্যন্ত অনিয়মিত। তাই প্রথম পর্বে নাট্যকারদের নাট্য রচনার মূল প্রেরণা ছিলো প্রধানতঃ সামাজিক ও সাহিত্যিক। মধুসূদন অবশ্য একটি সৌখীন নাট্যদলের আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কিন্তু দীনবন্ধুর কোনো ধনী পৃষ্ঠপোষক জোটে নি। এবং তাঁরা উভয়েই যে নাটক রচনা করেছিলেন তাতে বৃহৎ দর্শক শ্রেণীর কথা তাঁরা কতটা চিন্তা করেছিলেন এবং আদৌ করেছিলেন কি না বলা কঠিন। বরং বিপরীতটাই সত্য হতে পারে।

এই ধনী আশ্রিত সৌখীন থিয়েটারের দুর্দশা দেখে 'নব প্রবন্ধ' পত্রিকা (শ্রাবণ ১২৭৪, আগষ্ট ১৮৬৭) যে মন্তব্য করেছিলো তা তখনকার সাধারণ মানুষের মনের কথা সন্দেহ নেই। সৌখীন অভিনেতাদের আদর্শহীনতা ও আন্তরিকতার অভাব দেখে ঐ পত্রিকাতে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপনার জন্য 'অভিনয়ের অধ্যক্ষদের' কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা নাট্য আন্দোলনের দুটো বিভিন্ন ধারার সূত্রপাত হলো। প্রদর্শনীমূল্যের ওপর পাবলিক থিয়েটরের অস্তিত্ব নির্ভর বাধ্যতামূলক হবার ফলে এ সকল রঙ্গমঞ্চের নাট্যকার দর্শকরুচি সম্পর্কে সচেতন হলেন অধিক এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের উক্তিতে এ সত্যই প্রমাণিত। আবার পাবলিক থিয়েটরের সমান্তরালে প্রধানত জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে যে সৌখীন নাট্যমঞ্চ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত ছিলো তাতে সাধারণ দর্শকের উপস্থিতি অনিবার্য ছিলো না। তাই ওই নাট্যমঞ্চের প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত লোকরুচিকে অস্বীকার করেছিলেন। এবং তারই ফলে গিরিশচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র closet drama-র লেখক বলে সমকালে পরিচিত হয়েছিলেন কি না বিচার্য।

॥ দুই ॥

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে বাঙলা নাটক সৌখীন ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে মুক্ত হলো। সুরু হলো মধ্যবিত্তের থিয়েটর। "রামনারায়ণ ও মধুসূদন যখন ধনীর প্রাসাদে উপচার সংগ্রহ করিতেছিলেন, দীনের বন্ধুর দীনবন্ধু তখন নিঃসহায় মধ্যবিত্ত যুবক-বৃন্দের মহাসাধনায় রসদ জোগাইতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্রের ন্যায় খাটি বাঙালী ব্যতিরেকে দরদ লইয়া মধ্যবিত্তের জন্য এই আয়োজন করা সম্ভব হইত না।"৪ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের এই মন্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় বাঙলা রঙ্গমঞ্চ ও তার জন্য রচিত বাঙলা নাটক মধ্যবিত্ত মানসিকতাকেই প্রকাশ ও পুষ্ট করেছে। তখনকার কোলকাতার কত পার্সেণ্ট লোক প্রতি সপ্তাহে নাটক দেখতেন তা জানা যায় না। কিন্তু থিয়েটরের টিকিটের যে দাম ছিলো তাতে 'আপামর সাধারণ'—গিরিশচন্দ্রের ভাষায়—নাটক দেখতে সক্ষম হতেন কিনা সন্দেহ। কিছু মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের পক্ষেই সে মূল্য দেওয়া সম্ভব হতো। ন্যাশনাল থিয়েটরের টিকেটের হার ছিলো যথাক্রমে দুটাকা, এক টাকা ও আট আনা। পরে মূল্য আরো বর্ধিত হয়। গ্র্যাণ্ড অপেরা ভাড়া নিয়ে 'হিন্দু ন্যাশনাল' যে অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন তাতে টিকেটের হার অনেক বেশি দেখা যায়।৫ অবশ্য তা একটি Charity Show ছিলো। এমন কি ভিড় বেশি হলে চারটাকার টিকেট আট টাকাতেও পাওয়া যেত না (কালো-বাজারী!), এমন তথ্যও নথিবদ্ধ আছে।৬ যেখানে ভারতবাসীর মাথা পিছু দৈনিক আয় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে দু'আনা থেকে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ছ'পয়সায় পরিণত হয় এবং বৃটিশ ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী প্রদেশ বঙ্গদেশের অধিবাসীদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় পনেরো টাকা তিন আনা ৭, সেখানে টিকেটের অত উচ্চ মূল্য দিয়ে নাটক দেখা সমাজের মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানের পক্ষেই সম্ভব হতো মনে হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে কোলকাতা শহরের কয়েকটি অঞ্চলের মোট লোক সংখ্যার কতজন ও কত অংশ কোন্ বৃত্তিজীবি তা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁদের বার্ষিক আয় সম্পর্কে একটি রেখাচিত্র গড়ে তোলা চলে। কলুটোলা অঞ্চলের লোকসংখ্যার মধ্যে মোট শিল্পজীবি ছিলেন ২৫,০৫২ (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৯·৭%), বাণিজ্যজীবি ৬১৩৬ জন (অর্থাৎ জনসংখ্যার ৯·৭%) এবং উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি বৃত্তিধারী লোকসংখ্যা ৩০৩৫ (জনসংখ্যার ৫·৮%)। জোড়াসাঁকো অঞ্চলে শিল্পজীবি লোকসংখ্যা ১৮,৮২৬ (মোট জনসংখার ৩৫·৫%), বাণিজ্যজীবি ৮০৪৪ (জনসংখ্যার ১৫·১%) এবং উকিল ডাক্তার ইত্যাদি বৃত্তিজীবি ৩৩৯৫ (মোট জন-

সংখ্যার ৬.৪%)।৮ সামান্য তারতম্য থাকলেও কোলকাতা শহরের বৃত্তিবিন্যাসের একটি স্পষ্ট চিত্র এ সংখ্যাতত্ত্ব থেকে অনুধাবন করা যায়। এঁদের মধ্যে যাঁরা শিল্পজীবি অর্থাৎ জনসংখ্যার গরিষ্ঠতম অংশ তাঁদের মাসিক আয় পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকার বেশি হতো না। বরং তার চাইতে কমও হতো। কাজেই অর্থনৈতিক কারণেই তাঁদের পক্ষে বঙ্গীয় নাট্যশালায় দর্শকরূপে উপস্থিত থাকা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ: "আজিও বাঙ্গালীদিগের সেরূপ ধনবৃদ্ধি হয় নাই যে আমোদার্থে মাসে এত ব্যয় করিতে পারেন"।—(সোমপ্রকাশ ১৯ ফাল্গুন, ১২৮০)৯ চাকুরীজীবিদের ক্ষেত্রেও আয় বিন্যাসের একটি রেখাচিত্র এঁকেছেন সমাজতাত্ত্বিক। "অধিকাংশ সরকারী চাকরীতে বাঙালী হিন্দুরই আধিপত্য...এই আধিপত্য সরকারী চাকরীর নিম্নস্তরেই বেশি, বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা সেখানে প্রায় শতকরা ৯০ জন, এবং বেতন গড়ে ৬০৲ টাকা থেকে ২৫৲-৩০৲ টাকা। ১০৲ টাকা থেকে ২০৲ টাকার কর্মচারীর সংখ্যাও কম নয়। মধ্যস্তরের সংখ্যা (১০০৲-১৫০৲ টাকা বেতনের) তেমন বেশি নয়, উচ্চস্তরের সংখ্যা (২০০৲, ৪০০৲—৫০০৲) খুবই অল্প।...মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুর (নাগরিক) কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে প্রধানত এই নিম্নস্তরের চাকরী সম্বল করে।"১০ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একান্নবর্তী পরিবার প্রতিপালন করে শতকরা কতজনের নাট্যগৃহে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হতো, সন্দেহের বিষয়। "সে সময়ে থিয়েটরের দর্শক সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিলো।"১১ অথচ প্রেক্ষাগৃহে 'বাদুর ঝুললে' দৈনিক টিকেট বিক্রয় ১৮০০ টাকা কিংবা ততোধিক হতো এমন তথ্যও পাওয়া যায়। কাজেই নাট্যগৃহে নিয়মিত দর্শক হিসেবে উপস্থিত ভদ্রজনের অধিকাংশই যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে আসতেন, তাঁরা হলেন উচ্চস্তরের কেরানী, উকিল, ডাক্তার প্রমুখ অন্যান্য বৃত্তিধারী এবং জমির উপসত্বভোগী ইংরেজসৃষ্ট নতুন জমিদার শ্রেণী। বাংলা নাটকের গতিপ্রকৃতি মূলত এঁদের রুচি, মেজাজ ও চাহিদা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়।

॥ তিন ॥

মধ্যবিত্ত কারা? আধুনিক কালে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিপুল জটিলতা অনুধাবন করে সমাজতাত্ত্বিকগণ মধ্যবিত্তদের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু আধুনিক কালের ইতিহাসে মধ্যবিত্তের ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ সচেতন। সামন্ততান্ত্রিক যুগ থেকে আধুনিক যুগকে পৃথক করেছে মূলতঃ নবোদ্ভূত নগরবাসী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। শিল্প ও বাণিজ্য ব্যতিরেকে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এবং যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে নি, সেখানে

রেনেসাঁ ও রেফরমেশন সূচিত হতে পারে না।১২ কাজেই রেনেসাঁর ধারক ও বাহক হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও গুরুত্ব অপরিসীম। উনিশ শতকীয় বাঙলা রেনেসাঁ বা নবজাগৃতি নবোদ্ভূত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনন প্রক্রিয়ার ফলে সম্ভব হয়েছিলো—এ সিদ্ধান্তও ঐতিহাসিক সত্য।

কিন্তু এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনার অবকাশ আছে। আমরা সচরাচর বাঙলা নবজাগৃতিকে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে ভালবাসি এবং বাঙলার নবজাগৃতি যে ইউরোপীয় রেনেসাঁর কনিষ্ঠতম ফসল এমন সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু ইউরোপীয় রেনেসাঁর কতগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিলো—তা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক (সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলা প্রভৃতি) নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিলো। ইউরোপীয় রেনেসাঁর মূলকথাই হলো সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা ও নানা গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার প্রবর্তন। সমাজে নতুনতর শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে। পুরোনো শ্রেণীবিন্যাসকে পরিবর্তিত করে এই নতুন শ্রেণীবিন্যাস সহজে হয় নি। কোনো দেশেই অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন এবং ক্রমাগত অর্থনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী। ইউরোপীয় রেনেসাঁর ইতিহাস এই ত্রিবিধ আন্দোলনের কাহিনীতে পূর্ণ এবং সে কাহিনীর নায়ক ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

পক্ষান্তরে, ইংরেজ ভারতে এসে এদেশের মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক কাঠামোটিকেই গ্রহণ করেছে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছে। ফলে, সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের পরিবর্তে একটি নতুন ধরণের সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের এই প্রচেষ্টার ফলে বাঙলা বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে উঠতে পারে নি। অবশ্য উনিশ শতকীয় বাঙলী মধ্যবিত্ত ও উচ্চসম্প্রদায়কে আমরা 'বুর্জোয়া শ্রেণী' বলে উল্লেখ করি বটে, কিন্তু 'বুর্জোয়া' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মনে রাখলে তাকে ওই অভিধায় অভিহিত করা চলে না। উনিশ শতকীয় বাঙলী মধ্যবিত্ত ছিলেন মূলত চাকুরীজীবি ও জমির উপসত্বভোগী। শাসক ইংরেজ ও তাঁদের শ্রেণীস্বার্থে বিশেষ দ্বন্দ্ব ছিলো না।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় রেনেসাঁ এসেছিলো জ্ঞানে ও কর্মে মুক্তি—যার উভয়মুখী

সংযোগে শিল্পসাহিত্য ও বিজ্ঞানে হয়েছিলো বিরাট অগ্রগতি। নবজাগৃতিযুগে বাঙালীর কর্মে অধিকার ছিলো না,—আগেই বলা হয়েছে—তাঁরা ছিলেন প্রধানত চাকুরিজীবি ও জমির উপসত্ত্বভোগী,—তাই কর্মে মুক্তি বাঙালীর আসে নি। ফলে জ্ঞানের মুক্তিও সর্বাঙ্গীণ হতে পারে নি। তাই ইউরোপীয় রেনেসাঁ যুগের বুর্জোয়া মধ্যবিত্তের সঙ্গে তাঁদের ছিলো গুণগত পার্থক্য। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, ভৌগোলিক নব নব আবিষ্কার, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের বিস্তার, যন্ত্রশিল্পের অভূতপূর্ব অগ্রগতি প্রভৃতি বিষয় মানুষের মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে তাকে বৃহৎ বিশ্বের মুখোমুখি এনে হাজির করেছিলো। তার ফলে যে বিপুল কর্মোদ্দীপনা ইউরোপীয় রেনেসাঁর মানুষ প্রতি তন্ত্রীতে অনুভব করেছিলো, তার সার্থকতম প্রতিফলন ঘটেছে এলিজাবেথীয় নাট্যসাহিত্যে। ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বই যে নাটকের প্রাণ—এই মূল সূত্র তাই এলিজাবেথীয় নাট্যসাহিত্যই সর্বাপেক্ষা বেশি করে প্রমাণ করেছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁর উপরোক্ত বিশেষত্বগুলো নব জাগৃতিযুগের বাঙালীর পক্ষে সম্পূর্ণ করায়ত্ব করা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। জাতীয় সম্পদ বিকাশের বৃহৎ কর্মযজ্ঞশালায় বাঙালীর শ্রম নিয়োজিত হতে পারে নি. ফলে তাদের জীবনপ্রবাহ হয়েছে নিস্তরঙ্গ, নিস্তেজ। যথার্থ প্রগতির জন্য প্রয়োজন ত্রিবিধ আন্দোলন—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক। এ ত্রিবিধ আন্দোলনের মেলবন্ধনে রচিত হয় বিপ্লব। ইউরোপীয় রেনেসাঁ এই বিপ্লবের প্রকাশ মাত্র। কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোনো আন্দোলনে নামেন নি, দেশের গণজাগরণ সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন আশ্চর্যরকম নিস্পৃহ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধী। কদাচিৎ কখনো—যেমন নীল বিদ্রোহের সময়—তাঁরা নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে আসতে সক্ষম হয়েছেন বটে, তবু তাঁদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অধিকাংশই ছিলো কিছু মানবিক অধিকারের দাবী-দাওয়া—যেমন, ইংরেজের সমতুল্য রাজপদ বা বিচারবিভাগীয় সমতা এবং সেটুকু দাবী মেনে নেওয়াও ইংরেজের পক্ষে ছিলো অসম্ভব। ফলে, নবজাগৃতিযুগের বাঙালীর চিন্তা ও উদ্যমের প্রায় সমস্তটাই ব্যয় হয়েছে সমাজ সংস্কার ধর্মান্দোলন ও শিক্ষা-বিস্তারের প্রচেষ্টায়। আর, সে শিক্ষার স্বরূপও মূলত শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনে প্রযুক্ত শিক্ষা এবং দেশের অধিকাংশ লোকের কাছেই তা ছিলো অনধিগম্য। অর্থাৎ বাঙলার নবজাগৃতিযুগের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবির শ্রেণীবিন্যাস যা ছিলো তাতে সমাজ সংস্কার ও ধর্মান্দোলনের গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসা তাঁদের পক্ষে বিশেষ সম্ভব ছিলো না। বাঙলা নাট্যসাহিত্যও এই মানস প্রবণতার সাক্ষ্য বহন করে।

তবে কি তথাকথিত নবজাগৃতি একেবারেই অর্থহীন ও অফলপ্রসূ? উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ ধরণের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ উচিত হবে না। বাঙলার নবজাগৃতি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন এনেছিলো, সন্দেহ নেই। মানবতাবোধ, স্বাধীন চিন্তার আকাঙ্খা, স্ত্রীজাতির সামাজিক বন্ধন মোচন প্রচেষ্টা, প্রাচীন প্রথানুগত অপেক্ষা উদার ধর্মবোধের উদ্বোধন প্রমুখ বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালী রচিত সাহিত্য তথা নাট্যসাহিত্য এ বিশেষত্বগুলোর স্বাক্ষরবাহী।

উনিশ শতকীয় বাঙলার যুগ পরিবেশ তাই বাঙলা নাটকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। এক, জাতীয় জীবনে কর্মোদ্দীপনার অভাব, তাই নাটকে ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের ন্যূনতা। উদ্দীপনা ছিলো মূলতঃ মস্তিষ্ক সঞ্জাত, তাই নাট্যকারদের রচনায় যে ক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব পরিবেষিত হয়েছে তা অধিকাংশ স্থলেই আরোপিত। বাঙলা নাট্যসাহিত্যে যাঁর রচনা সর্বাপেক্ষা বেশি দ্বন্দ্বসমন্বিত বলে কথিত, সেই দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বিশ্লেষণে এ মন্তব্য যথার্থ প্রমাণিত হবে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃজনে তিনি দূর অতীতের ঐতিহাসিক কাহিনীতে—অর্থাৎ যেখানে সহজেই কল্পনার আধিপত্য দেখানো চলে—যতটা সার্থক হয়েছেন, সমসাময়িক সামাজিক জীবন অবলম্বিত নাটকে সেই দ্বন্দ্ব হয়েছে কুণ্ঠিত এবং উভয় ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব যেন অনেকাংশে কৃত্রিম ও আরোপিত। নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃজনে এ বিশেষত্ব অকারণ নয়, তা যুগ পরিবেশের গভীরে নিহিত। তাই নাটকীয় দ্বন্দ্ব সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের ধারণা যতই স্বচ্ছ হোক না কেন, নাটকে তার প্রয়োগে তিনি সর্বদা সার্থক হন নি।

এখানে একটি কথা উঠতে পারে। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, বাঙলা নাটক বাঙালীর জাতীয় ভাবধারার অভিব্যক্তি এবং তাতে বাঙালীর মানস প্রবণতা প্রকাশিত, কাজেই ইউরোপীয় বিশেষ করে সেক্সপীরীয় নাটকের মানদণ্ডে এ নাটকের বিচার অন্যায় ও অযৌক্তিক। ইউরোপীয় চিত্ত তমঃ ও রজঃ গুণ সমন্বিত তাই তাঁদের নাটক দ্বন্দ্ব নাটক।" কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার "গিরিশচন্দ্র ভারতীয় আদর্শ সত্ত্বগুণের প্রকাশ," তাই তাঁর রচনা বিচারের মাপকাঠি হওয়া উচিত পৃথক। জাতীয় জীবনের প্রবণতার জন্য নাট্যসাহিত্য পৃথক হতে পারে। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ও জাপানের 'নোহ্' নাটক পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ অবহেলা করেও নাটক হিসেবে অতুলনীয় বলে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে সম্ভবত তা প্রয়োগ করা চলে না। গিরিশচন্দ্রকে শেক্সপীয়র অভিধায় অভিহিত করে যে শুধু তাঁকে পাশ্চাত্য নাটকের সঙ্গে সমসূত্রে বিচার করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে তা নয়,

তিনি নিজেও আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"Dramatist কে সীমাবদ্ধ কয়েকটি দৃশ্যপটের ভিতর through action কথাবার্তায় সমুদয় রস ও ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রত্যেক চরিত্রটিকে পরিস্ফুট করে সত্যকে প্রচার করতে হয়,"১৩ আবার "ঘটনার পারম্পার্যে, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে, অন্তর সংগ্রামে মানুষের যে চরিত্র ফুটিয় উঠে, সেটি নিপুণভাবে স্তরে স্তরে দেখানোই প্রকৃত নাট্যকারের কলাকৌশল।"১৪ এবং সেইসঙ্গে জানিয়েছেন—"আমি সেক্সপীয়রের আদর্শের অনুকরণে নাটক রচনা করেছি। তিনিই আমার আদর্শ।"১৫ অর্থাৎ তাঁর নাটক সম্পর্কিত ধারণা প্রধানতঃ শেক্সপীরীয় নাট্যাদর্শ অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল, এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। অথচ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ও অন্যান্য নাট্যকার বাঙলা নাটকে পাশ্চাত্য ক্রিয়া ও ঘাতপ্রতিঘাত পরিবেষণে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁদের প্রতিভাহীনতার জন্য নয় বরং প্রধানত সমকালীন পরিবেশ ও সমাজ মানসের বৈশিষ্ট্যের জন্য।

দ্বিতীয়ত, আমাদের জাতীয় জীবনে যত না ছিলো কর্মপ্রচেষ্টা, তার চাইতে বেশি ছিলো উচ্ছ্বাস প্রবণতা। এই উচ্ছ্বাস প্রবণতা আধুনিক কালেও অন্যতম জাতীয় লক্ষণ। জাতীয় জীবনের এই উচ্ছ্বাসের আধিক্য নাট্যসাহিত্যের অন্তর সত্তায় গভীর স্বাক্ষর রেখেছে। তাই বাঙলা নাটকে লক্ষিত হয় যুক্তিপরম্পরার অভাব, ফলে নাটকীয় কার্যকারণ (Cause and effect) প্রায়শই হয়েছে অবহেলিত। গিরিশচন্দ্রের নাটকে এই কার্যকারণের সমন্বয়হীনতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ রঙ্গালয়ের আশ্রিত নাট্যকারদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ও জনপ্রিয়। অর্থাৎ দর্শক প্রশংসাধন্য।

।চার।

এই সাধারণ দর্শক—যাঁদের জন্য গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ লেখনী চালনা করেছিলেন—তাঁদের রুচি কেমন ছিলো? সমকালীন পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন মন্তব্য ও সমালোচকদের রচনায় যা প্রকাশিত তা বিশেষ উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। অবশ্য সাধারণ দর্শক সম্পর্কে কোনো দেশেই খুব একটা উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায় না। এলিজাবেথীয় দর্শকের স্বাভাবিক প্রবণতা ও চাহিদা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যে মন্তব্য করেছেন এ প্রসঙ্গে তা স্মর্তব্য। ব্রাডলের মতে, শেক্সপীরীয় দর্শক ছিলেন প্রধানত অজ্ঞ, হৈহল্লাকারী নাচগান ও কুৎসিত রসিকতাপ্রিয়, সৈন্য ভেরীবাদন ও কামান গর্জনের পক্ষপাতী এবং যে নাটক তাঁদের পছন্দসই নয় তার প্রযোজনা স্বভাবসুলভ হিংস্র উপায়ে তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিলো না১৬, কিন্তু সমালোচকের ভাষায় তাঁরা loved poetry এবং

তাঁদের ছাড়া the Elizabethan drama could never have been the thing it was।[১৭] শেক্সপীয়র তাঁদের রুচিকে স্বীকার করে নিয়েই কালজয়ী নাট্য সাহিত্য রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ এলিজাবেথীয় ইংরেজ রেনেসাঁ যুগের প্রাণ চাঞ্চল্যে সর্বদা ছিলেন তরঙ্গিত এবং তাঁদের সেই অদম্য জীবনীশক্তি বা vitality শেক্সপীয়রের নাটকে প্রকাশিত হয়েছে। হিসেবে দেখা যায় ১৫৮৯ থেকে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লণ্ডন শহরের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩ ভাগ—অর্থাৎ প্রতি পনের জনে দুজন—প্রতি সপ্তাহে থিয়েটারে যেতেন এবং the large majority of these were craftsmen, tradesmen, and laborers, while a small minority were professionals and the gentry।[১৮] কিন্তু উনিশ শতকীয় বাঙলা থিয়েটরের দর্শকবৃন্দ ছিলেন মোটামুটিভাবে বিপরীত। তাঁরা মূলত ভদ্রলোক। আগেই বলা হয়েছে, তাঁদের জীবনপ্রবাহ ছিলো নিস্তরঙ্গ, নিস্তেজ, দ্বন্দ্ব সংঘাত বিহীন। এই ভদ্রলোকদের থিয়েটর প্রীতির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গে[১৯] যতই রহস্যপ্রিয়তা থাক, তার মূলের সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। বাঙালী দর্শক সম্পর্কে লেবেদভের উক্তিকে[২০] হয়তো প্রাচীন বা একপেশে বলে অবহেলা করা চলতো, যদি না পরবর্তীকালে বহু রচনায় তার সমর্থনযোগ্য প্রচুর নজির না পাওয়া যেতো। বাঙালীর প্রিয় আমোদ প্রমোদ 'সমাচার দর্পণে'র মতে—চুঁচুড়ার সং, হাজিসাহেবের সং, নূতন যাত্রা, সকের কবিতা, "গোলোকমণি ও দয়ামণি এবং রত্নমণি প্রভৃতি তিনদল নেড়ি কবির গান," মল্লযুদ্ধ বা কুস্তির লড়াই, ঘুড়িওড়ানো ও ঘোড় দৌড়।[২১] তাছাড়া, নাচ গান, যাত্রা, উড়িষ্যা মুলুক হইতে উপস্থিত রামলীলা, আখড়া সঙ্গীত, কবির লড়াই, বুলবুলাক্ষ্য পক্ষীর যুদ্ধ এবং নাটক।[২২] এ হলো বাংলা নাটক ও সাধারণ রঙ্গালয় সৃষ্ট হবার পূর্ববর্তীকালের চিত্র। পরেও যে তা পরিবর্তিত হয়েছিলো তার বিশেষ প্রমাণ সমকালীন বাঙলা দেশের সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্য পতন কালীন দুরবস্থার তুলনা করে সোমপ্রকাশ লিখছেন "আজিকালি বাঙ্গলা দেশেও ঐরূপ ব্যসনের এক বিপত্য। অধিকাংশ লোকের আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ গানবাদ্য যাত্রা অভিনয় লইয়াই অনেকে ব্যতিব্যস্ত।...সামান্য চাকুরীর বাহুল্য ও বাণিজ্যপ্রভাবে অধিকাংশ লোকের স্বচ্ছল হইয়াছে। অর্থসঙ্গতি না থাকিলে ব্যসন বাসনা চরিতার্থ করিবার যে ব্যাঘাত জন্মে এখন সে ব্যাঘাত নাই।.... বাঙ্গালিদিগের বাণিজ্যে প্রবৃত্তি নাই, সংগ্রামে গতি নাই, আয়াসকর কার্যে মতি নাই, ভোজ্য ও শয়ন অতি কোমল, সুতরাং বিলাসেই গাঢ়তর জন্মিয়াছে"। (১লা শ্রাবণ, ১২৭৯)[২৩] ন্যাশনাল থিয়েটর প্রতিষ্ঠার সামান্যকিছু

পূর্বে সোমপ্রকাশের এই বাঙালী চরিত্র বিশ্লেষণ গভীর অর্থবহ। কর্মদ্বন্দ্বহীন নিস্তরঙ্গতাই যে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের বৈশিষ্ট্য তা সেকালেও আলোচনার বিষয় ছিলো। অবশ্য সোমপ্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মূলত নীতিবাদী। তবু উদ্ধৃত অংশের সত্যতা অনস্বীকার্য। তাই ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য যখন লেখেন[২৪]—"অর্থকরী নাট্যশালা হইলেই নাটক রচনা সর্বসাধারণের রুচির অনুগামী হয়। এ দেশের সর্বসাধারণ বলিতে কি প্রকার পদার্থ বুঝায় তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেরই জানা আছে আমাদের মধ্যে অসাধু রুচির প্রবলতা যথেষ্টই আছে"—তখন তাকে বুদ্ধিজীবি উন্নাসিকতা বলে নিতান্ত লঘু করে দেখলে চলে না। সমকালীন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের কুরুচি দূর করবার জন্যই নাকি দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন।[২৫] সমালোচকের ভাষায়[২৬]—"এমন এক সময় ছিলো যে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের দুই একখানি নাটক ছাড়া, বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ এমন কুরুচিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে ভদ্রব্যক্তিরা সেখানে যাইতে সঙ্কোচবোধ করিতেন।" দ্বিজেন্দ্রলাল নাকি রঙ্গমঞ্চের এ হাওয়া অনেকটা পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কুমুদবন্ধু সেনের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের কথোপকথনেও জানা যায় যে অমৃতলাল বসু নাকি তৎকালীন রঙ্গালয়ের দুরবস্থা দেখে আক্ষেপ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র নিজেও বলেছেন[২৭]—"বেশির ভাগ লোক যায় নাচ দেখতে আর গান শুনতে। থিয়েটারে নাটক দেখতে খুব কম লোকই যায়।" ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন [২৮]—আমাদের দেশে দর্শকের রুচি বলিয়া একটা পদার্থ নাই বলা যায়। নাট্যশালার কর্তৃপক্ষরা নিজ নিজ রুচি অনুসারে যখন যাহা কিছু দেখাইতেছেন, দর্শকেরা বাঙ নিষ্পত্তি না করিয়া তাহাই দেখিয়া যাইতেছে। নাট্যশালা হইতেই যে রুচি গড়িয়া দেওয়া হয়, দর্শকেরা কেবল তাহারই অনুসরণ করে মাত্র।" এবং এই কুরুচি বিস্তারে অন্যান্য নাট্যকারসহ স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের প্রচুর অবদান আছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। অবশ্য দর্শকের রুচি সর্বাংশে নাট্যশালা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়—ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের এ অভিমত খানিক চরমপন্থী। কেননা যে কোনো যুগেই দর্শক সাধারণের চাহিদা ও প্রবণতা এবং রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও জীবনাদর্শ পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ নাট্যান্দোলন গড়ে ওঠে। "গোগোলকে দর্শকের স্তরে নামিয়ে এনো না বরং দর্শককেই গোগোলের স্তরে উন্নীত করো"—চেকভের এই বক্তব্য যেমন সত্য, তেমনি সত্য গোগোল যাঁদের পক্ষে অনধিগম্য তাঁদের কাছে তাঁকে হাজির করা পণ্ডশ্রম মাত্র। বিদগ্ধজন প্রশংসিত হলেও গিরিশচন্দ্র প্রযোজিত 'ম্যাকবেথ' দশ রাত্রির বেশি চলে নি, এ টনাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

। পাঁচ ।

সোমপ্রকাশ পত্রিকায় ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ সালে অর্থাৎ পাবলিক থিয়েটর প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় দশবছর পরে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিলো।২৯ চিঠিটি নানাদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। বিস্তৃত আলোচনায় পাবলিক থিয়েটরের নানা দোষ বর্ণনা করে পত্র লেখক লিখছেন—"বর্তমান রঙ্গভূমি বঙ্গের বিন্দুমাত্র হিতসাধন না করিয়া বরং সহস্র প্রকার বিষময় ফল উৎপাদন করিতেছে।" অবশ্য পত্রলেখক অতিরিক্ত নীতি-বাদী, রঙ্গমঞ্চে বারবণিতা সহযোগে অভিনয় বিষয়ে অত্যন্ত ছুঁৎমার্গী, যেখানে অনুরূপ স্ত্রীলোক নিয়ে নাট্য প্রযোজনা হয়—এমন কি—তার বিলোপ তিনি কামনা করেছেন। তবু তাঁর দীর্ঘপত্রের মাধ্যমে তৎকালীন বাঙালীর একটি বিশেষ মানসিকতা অভিব্যক্ত হয়েছে বলা যায়। মনোমোহন বসু পরিচালিত 'মধ্যস্থ' পত্রিকা ১২৮০ সালেই সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেতাদের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন৩০—"তাঁহারা যত আমোদ করুন; যত দৃশ্য কাব্যের অভিনয় প্রদর্শন দ্বারা সাধারণের যত অনুরাগভাজন হউন; ধনে মানে ও নামে পূর্বাপেক্ষা পুনর্বার শতগুণে কৃতকার্য হউন; কিন্তু যেন তাঁহাদের আত্মাবস্থার প্রতিজ্ঞা ও উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হয়েন—যেন জাতীয় নাট্যসমাজরূপ মহোচ্চ উপাধির কার্য করিতে ত্রুটি না করেন—যেন স্বদেশের কুরীতি, কুনীতি, কুপ্রথা, কুব্যবহারের সংশোধনে তিলমাত্র শিথিল যত্ন না হয়েন।" সোমপ্রকাশও লিখছেন৩১—"এখন সাধারণত আমাদের সমাজের যেমন অবস্থা তদনুসারে আমরা চাই যে, আমাদের নাট্যশালাগুলি বিশেষরূপে সংস্কৃত ও নৈতিক অনুশাসনে পরিচালিত হইয়া পরিমার্জিত রুচিবান ব্যক্তিবৃন্দের দর্শনোপযোগী হউক।" অর্থাৎ 'সমাজ সংস্কার', 'দেশের হিত-সাধন' ও 'নৈতিক অনুশাসন'—বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের কাছে এই ছিলো সেকালীন শিক্ষিত থিয়েটর প্রেমিক বাঙালীর দাবী।

উদ্ধৃত অংশগুলোর সময়সীমা ১২৮০ সাল থেকে ১২৮৯ সাল অর্থাৎ ১৮৭৩ খৃঃ থেকে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ—প্রায় দশবছর। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জনক গিরিশচন্দ্র তখন অদ্বিতীয় অভিনেতা হিসেবে 'গ্যারিক' আখ্যা লাভ করলেও নাট্যকাররূপে খ্যাতিলাভ করেন নি, আত্মপ্রকাশ করেছেন মাত্র। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা গুটি-সাতেক এবং সেগুলো সবই পৌরাণিক। তখনো বাঙলা নাট্য সাহিত্যের ক্ল্যাসি-ফিকেসন সুস্থির হয় নি। পাবলিক থিয়েটর আশ্রিত নাটকাবলী অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আমাদের প্রায় পুরো নাট্যসাহিত্যকে মোটামুটি ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক তথা পারিবারিক, রোমান্স, গীতিনৃত্যনাট্য ও

প্রহসন। বহুকাল পর্যন্ত বাঙলা নাটক রচনা এই শ্রেণীবিভাগ মেনে চলেছে। গিরিশ-চন্দ্রের রচনাতেই এই শ্রেণীবিভাগ পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে —এ ছয় বিভাগের বাইরে নাটক আর কোন্ রকমেরই বা হবে। কাজেই এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের বিশেষত্বগুলো বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। পুরাণাশ্রিত নাটক মধুসূদনও লিখেছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের হাতে পুরাণাশ্রিত নাটক ভক্তিরস-জারিত হয়ে 'পৌরাণিক' হয়ে উঠলো। তার অন্বিষ্ট হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন—শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্তিত সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রচলিত প্রায় সবগুলো ভারতীয় ও ধর্মমত প্রচারকদের জীবনী তাই গিরিশচন্দ্রের অবলম্বন। বৌদ্ধ শাক্ত বৈষ্ণব পৌরাণিক ও সনাতন ধর্ম—যাদের মধ্যে হয়তো দর্শনতত্ত্বগত মিল সামান্যই—তাদের সবগুলোকেই গিরিশচন্দ্র এক মনোভূমিতে মিলিয়েছিলেন এবং সেই মনো-রাজ্যের সাধারণ দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ। এমন কি প্রচলিত ধর্মমতের আধুনিক যুগোপ-যোগী নবীকরণও গিরিশচন্দ্র করেন নি, যা করেছিলেন রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব তখন স্তিমিত প্রায়, বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মমুখর নবহিন্দুত্ব সাধারণের কাছে অতিরিক্ত ইনটেলেকচুয়াল অতএব অগম্য, তাই আধুনিক যুগে থেকেও মধ্যযুগে প্রস্থানকারী গিরিশচন্দ্রের ভাবাতিরেক ও আবেগপ্লাবী নাটকে 'আপামর সাধারণ' স্বস্তি পেয়েছে। এবং গিরিশচন্দ্র সেজন্যেই 'জাতীয়' নাট্যকার। প্রধানত পৌরাণিক নাটক রচনার মাধ্যমেই এ অভিধা তিনি অর্জন করেছিলেন।

আধুনিক অর্থে ঐতিহাসিক নাটক বলতে যা বোঝায়, বাঙলা ঐতিহাসিক নাটক তার সমীপবর্তী কিনা সন্দেহ। আমাদের ঐতিহাসিক নাটক অধিকাংশই দেশপ্রেম প্রচারের মাধ্যম। ঐতিহাসিক নাটকে দেশপ্রেম থাকতে পারে এবং থাকেও, কিন্তু সেটাই তার একমাত্র উপজীব্য হতে পারে না। অবলম্বিত যুগের দ্বন্দ্বের গভীরে অবগাহন করে নাট্যকার যদি তার প্রাণসত্তাটিকে—হতে পারে তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীগত —প্রস্ফুটিত করতে না পারেন, তবে তা আর যাই হোক ঐতিহাসিক নাটক নয়। এবং তখনকার দেশপ্রেমে যেহেতু রাজনীতি সচেতনতা নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের আর তা-ও অদ্ভুত শ্রেণীস্বার্থের দ্বিধায় অবগুন্ঠিত, তাই তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ও বক্তৃতার প্রাধান্য। কিন্তু সেকালে এ নাটকগুলোর জনপ্রিয়তা ছিলো অপরিসীম। কারণ স্পষ্ট।

বাঙলা সামাজিক নাটক ও প্রহসন একই উপলব্ধির ভিন্ন-রসাশ্রয়ী প্রকাশ মাত্র। পুরোণো মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য নাট্যকারদের সামাজিক

নাটক লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তার থেকে সামান্য বিচ্যুতি তাঁদের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপকে উদ্যত করেছে। এ যুগের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গনের চিত্র এবং সে ভাঙ্গন প্রধানত পুরাণো ধর্মাদর্শ থেকে স্খলনের ফল। গৌণ চরিত্র প্রফুল্লের নামে নাটকের নামকরণ নাট্যকারের এক বিশেষ মানসিকতার অভিব্যক্তি। রমেশের ধর্মহীনতার পাশে প্রফুল্লের ধর্মবোধ ও আত্মত্যাগ নাট্যকার উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন যাতে নাটকের মূল উদ্দেশ্য অনুধাবনে দর্শক ব্যর্থ না হন এবং সেজন্যেই নাটকের নামকরণও অনুরূপ হয়েছে। অথচ কোন্ সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে এ ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হচ্ছে তার কারণ নির্ণয়ে নাট্যকার পরাঙ্মুখ। ফলে নাটকে ব্যক্তিগত বিয়োগব্যথা পারিবারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহৎ তাৎপর্য লাভ করে সামাজিক হয়ে উঠতে পারে নি। অতি উৎসাহী কোনো সমালোচক অবশ্য গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক-গুলোকে ইবসেনের নাটকের সমশ্রেণীতে স্থাপন করে তার অর্থ নির্ণয় করতে আহ্বান জানিয়েছেন কিন্তু তাতে যতটা উৎসাহের আধিক্য প্রকাশ পেয়েছে, যুক্তি ততটা নেই। রামনারায়ণ বা মধুসূদন দীনবন্ধুর প্রহসনে যে অন্তর্থক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত, গিরিশচন্দ্র অমৃতলালের যুগে তার ব্যতিক্রম গভীর অর্থবহ। রামনারায়ণ মধুসূদন প্রভৃতি পূর্ববর্তীরা যেখানে অন্ধসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দৃপ্ত মানবতাবোধের উদ্বোধন করেছিলেন, পরবর্তীদের প্রহসনে সেখানে প্রথানুগত্য ও তথাকথিত ধার্মিকতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পাবলিক থিয়েটরের জন্য রচিত বাঙলা সামাজিক নাটকে প্রধানত নারীর পাতিব্রত্য, সনাতন হিন্দু আদর্শের প্রচার ও সংস্কারের বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়েছে এবং তা প্রচলিত ধর্মবোধ দ্বারা জারিত। এবং যেখানেই এ বিশেষত্ব থেকে বাঙালী স্খলিত হচ্ছে বলে নাট্যকারের মনে হয়েছে, তিনি প্রহসনের তীব্র বিদ্রূপাঘাতে তাকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। সে জন্যেই বাঙলা প্রহসনের প্রিয় বিষয়বস্তু হলো স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা। কদাচিৎ প্রহসনে—যেমন জ্যোতিরিন্দ্রনাথে--এর থেকে ভিন্ন রস পরিবেষিত হয়েছে। এবং সম্ভবত সেজন্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনগুলো অধিকাংশই সাধারণ রঙ্গালয় কর্তৃক অবহেলিত হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠতম প্রহসন 'অলীকবাবু' সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হতে দেখি না। যেখানি সর্বাপেক্ষা বেশি অভিনীত হয়েছে—কিঞ্চিৎ জলযোগ—তাতেও স্ত্রী শিক্ষা ও স্বাধীনতাকে বেশ ব্যঙ্গ করা হয়েছিলো। এ যুগের প্রধানতম প্রহসনকার অমৃতলাল বসু স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতাকে বিদ্রূপবিদ্ধ করেই 'রসরাজ' আখ্যা লাভ করেছিলেন—এ বিষয়টি

অনুধাবন যোগ্য।

গীতি নৃত্যনাট্যগুলোতে প্রধানত উৎকট কাল্পনিকতা, অবাস্তব দৃশ্যবিন্যাস ও অদ্ভুত রসবিকারের সমারোহ লক্ষ্য করা যায়। এ ধরণের নাটকের বিষয়বস্তু অধিকাংশ সময়ে আরব্যোপন্যাসের অন্তর্গত এবং কখনো কখনো নাট্যকারের স্বকপোল কল্পিত কিন্তু তাও আরব্যোপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় আবুহোসেন আলিবাবা শিরী ফরহাদ বা হিন্দা হাফেজ তার প্রমাণ। যে রোমান্স প্রিয়তা মানুষকে প্রাত্যহিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে কল্পনার ঊর্দ্ধলোকে প্রেরণ করে বিস্তৃত করে তোলে এগুলোতে তার নিতান্ত অভাব সহজেই চোখে পড়ে। এ নাটকগুলোই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদের অর্থ দিয়েছে সর্বাধিক।৩২ গিরিশচন্দ্র স্বীকার করেছেন৩৩—"থিয়েটার জমাতে হবে বলে কতকগুলো কুরুচিপূর্ণ নাচগানের অবতারণা করলে দর্শকদের রুচি আপনি খারাপ হয়ে যায়।" কিন্তু তিনিও এ আবেষ্টনী অতিক্রম করতে পারেন নি। তুলনামূলকভাবে বাঙলা সাহিত্যে এ শ্রেণীর নাটক রচিত হয়েছে বেশি। বাঙলা রঙ্গালয়ের জীবন ধারণের জন্য তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

রোমান্স বা রোমান্টিক নাটক প্রযোজিত হয়েছে খুব কম তাতেও সনাতন হিন্দু-ধর্মের বিজয় ঘোষণা প্রকাশ পেয়েছে। 'শর্মিষ্ঠা' বা 'পদ্মাবতী'র মাধ্যমে যে জগত মধুসূদন বাঙলা সাহিত্যে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর উত্তরসূরী গিরিশচন্দ্র ও অনুগামীরা তাকে সম্প্রসারিত ও সার্থক করতে সক্ষম হন নি। শেকৃসপীয়রের রোমান্সগুলো বিশ্লেষণ করে সমালোচক মন্তব্য করেছেন ৩৪—The first and fundamental article of the romantic doctrine is clearly proclaimed in Shakespeare's comedies, where love is commonly represented as a trancendant experience, an actual re-creation of being that sets the imagination aflame, stimulates sensibility, reveals the exhilarating poetry of life, and brings to perfection the fine flower of almost every virtue. বাঙলা রোমান্স নাটকের সঙ্গে পার্থক্য লক্ষণীয়। শেকৃসপীয়রে যেখানে জীবনধর্মের অপ্রতিহত জয়যাত্রা, বাঙলা নাটকে সেখানে প্রচলিত ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য: তাই এলিজাবেথীয় নাটক reflex of the turbulent, creative age ৩৫, আর বাঙলা নাটক মধ্যবিত্ত মানসিকতার ভদ্র খণ্ডিত নিরাপদ অভিব্যক্তি।

বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়াশ্রয়ী নাটকের এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে অপেশাদার

মঞ্চের নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোর তুলনা করলে এ বৈশিষ্ট্য আরো স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ সময়—জীবনের ষাট বছরের অধিকাংশ—নাট্যরচনায় ব্রতী ছিলেন। তাই নাট্যরচনা বা নাট্যান্দোলন—অনেক সমালোচক যা মনে করেন—তাঁর নিতান্ত সখের সামগ্রী ছিলো না। কিন্তু তাঁর নাটকগুলোকে কোনোক্রমেই উদ্ধৃত ছ'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে না। কেবলমাত্র গীতিনৃত্যনাট্য ও প্রহসন ব্যতীত, এমন কি, তাঁর অন্যান্য নাটকগুলোর বাহ্য লক্ষণও পাবলিক থিয়েটর আশ্রিত নাটকের সঙ্গে মেলে না। এবং উপলব্ধি ও রস প্রতীতির দিক দিয়ে রবীন্দ্র প্রহসন ও গীতিনৃত্য-নাট্য তাদের বিপরীত বলা যায়। আবুহোসেন বা আলিবাবা এবং বাল্মীকি প্রতিভা ও মায়ার খেলার জগৎ দুই প্রতীপ মেরু প্রান্তবাসী। প্রহসনেও রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন রসাশ্রয়ী। পাবলিক থিয়েটরের প্রহসন প্রধানত স্যাটায়ার, কিন্তু রবীন্দ্র প্রহসনে উইট ও হিউমারের প্রাধান্য।

এ পার্থক্য গভীর অর্থবহ। এর মধ্যে পাবলিক থিয়েটর ও অপেশাদার মঞ্চাশ্রিত নাট্যান্দোলনের চারিত্রধর্ম প্রকাশিত। পাবলিক থিয়েটর যে সাধারণ দর্শক তৈরী করেছিলো এবং যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় পাবলিক থিয়েটর অস্তিত্ব বজায় রেখে ব্যবসা চালাতে সক্ষম হয়েছিলো, রবীন্দ্র-নাটকের সঙ্গে তাঁদের রুচির ছিলো দুরাতিক্রম্য ব্যবধান। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ, বলা যায়, বিশেষ কোনো দর্শক শ্রেণী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। তাই রবীন্দ্রনাট্যধারা তৎকালীন বঙ্গ নাট্য সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন একক ও স্বকীয় মহিমায় নির্বাসিত।

।ছয়।

পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং প্রহসন পঞ্চরং গীতিনৃত্যনাট্য—সাধারণ রঙ্গালয়ের এই হলো নাটক বৈচিত্র্য। তুলনায় রোমান্স অনেক কম রচিত ও প্রযোজিত হতে দেখি। এদের মধ্যে জনপ্রিয়তায় ও প্রাচুর্যে প্রহসন গীতি নৃত্য নাট্য প্রধান স্থান অধিকার করে আছে এবং তা মূলত অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনে। সমকালীন অনেক সমালোচক এগুলোর রুচিহীনতার প্রতি তীব্র মন্তব্য করেছেন সত্য, কিন্তু রঙ্গালয়ের জীবনধারণের জন্য প্রত্যেক দেশেই এ ধরণের নাটক প্রচুর প্রযোজিত হতে দেখা যায়। শুদ্ধ শিল্প বিশিষ্ট দর্শক মঞ্চে যা চান—পরিবেষিত করতে গেলে অভিনেতাদের অনাহারে মরতে হতো, নাট্যকারদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

কিন্তু পৌরাণিক ঐতিহাসিক সামাজিক ও কিছু প্রহসন বাঙালী নাট্যকারদের সাহিত্য প্রতিভার বিজয় বৈজয়ন্তী বলে স্বীকৃত। গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল অমৃতলাল

বাঙলা নাটকের অবিসংবাদী প্রতিনিধি। এইসঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদকেও অন্তর্ভুক্ত করা চলে। ওপরে বর্ণিত সকল শ্রেণীর নাটক প্রত্যেকে লিখিলেও, গিরিশচন্দ্র যেমন পৌরাণিক, সামাজিক, দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক ও অমৃতলাল প্রহসনে আধিপত্য দেখিয়েছেন, ক্ষীরোদপ্রসাদে তেমনি কোনো বিশেষ শ্রেণীর প্রতি অনুগত্য অনুপস্থিত। অবশ্য সামাজিক ব্যতীত সর্বশ্রেণীর রচনায় তিনি কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন এবং আলিবাবা আলমগীর বা নরনারায়ণ লিখে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এ কথা অনস্বীকার্য।

এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, দর্শক সাধারণের রুচি মেজাজ ও চাহিদা এবং নাট্যকারদের শ্রেণী চরিত্র ও প্রতিভা কোন্ কেন্দ্রবিন্দুতে মিলে উপরোক্ত রসাশ্রয়ী নাট্যরচনা সম্ভব করেছিলো। আগেই বলেছি, গত শতকের যুগ পরিবেশের প্রভাবে বাঙালী বুর্জোয়ার ধর্মান্দোলন, সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে পদচারণা বিশেষ সম্ভব ছিলো না। পরে জাতীয় ভাব উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেম প্রাধান্য লাভ করেছিল বটে, কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিয়ে তা নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের এবং দেশের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা ঘোষণা বা সংগ্রাম তখনো তাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত হয়নি। এর মধ্যে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে নাট্য প্রযোজনা পাবলিক থিয়েটরে একেবারেই অনুপস্থিত। বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ইংরেজের প্রচুর প্রচার সত্ত্বেও—দেশের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের কাছে পৌছুঁতে সক্ষম হয়েছিলো। "মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত বিচার করলে উনিশ শতকের শেষে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ত্রিশ হাজারের মতো। গ্রাজুয়েটদের যদি উচ্চশিক্ষিত ধরা যায়, তাহলে ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত চব্বিশ বছরে ১৭১২ জন বি. এ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তী ১৯ বছরে এই হারে গ্রাজুয়েটের সংখ্যা যোগ করলে ১৯০০ সাল পর্যন্ত মোট গ্রাজুয়েটের সংখ্যা হয় ৩০০০ এর কিছু বেশি"।[৩৬] প্রায় সাত কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত বঙ্গদেশে শিক্ষার এই হার অত্যন্ত শোচনীয়। অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনে অত্যুৎসাহী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতের সনাতন শিক্ষাদান পদ্ধতিকে বিপর্যস্ত করেছিলো বলা যায়। ফলে শিক্ষিত জনসাধারণের হারবৃদ্ধি মধ্যযুগ থেকে ইংরেজ যুগে এমন কিছু উৎসাহব্যঞ্জক নয়। শিক্ষাজগতের এই বিরাট সমস্যাটি সমকালীন নাট্যকারদের নজর এড়িয়ে গিয়েছিলো। কাজেই ধর্ম, সমাজ ও দেশপ্রেম ব্যতীত নাট্যকারদের অবলম্বিত বিষয় অন্য কিছু হতে সম্ভব হলো না। ন্যাশনাল থিয়েটরের জয়যাত্রা নীলদর্পণ প্রযোজনার মাধ্যমে সূচিত

হয়েছিল বটে কিন্তু তা সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকারদের নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করে নি। তাই লক্ষ্য করি, নীলদর্পণের সামাজিক বিপর্যয়ের চিত্র প্রফুল্লের অন্তঃপুরে আবদ্ধ হয়ে ব্যক্তিগত হাহাকারে পর্যবসিত হয়েছে। প্রচণ্ড সম্ভাবনা সত্ত্বেও 'নীলদর্পণ' তাই কোনো ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয় নি। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে 'নীলদর্পণ' নিঃসঙ্গ নক্ষত্র। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর অর্থ-রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে যে সকল নাটক প্রকাশিত হয়েছে—যথা 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩) বা 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫), তা পাবলিক থিয়েটরের কর্মকর্তাদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে। নাটক দুটোর পাশে প্রকাশকালের উল্লেখ করা হলো এই কারণে যে নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল' (Dramatic Performance Act 1876) যা বাংলা নাট্যরচনাকে কঠোর ভাবে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিলো, তা তখনো ছিলো ভবিষ্যতের গর্ভে। তাছাড়া 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল' উপেক্ষা করে বহুনাটক উত্তরকালে প্রযোজিত হয়েছে ও রাজরোষ বরণ করেছে—এটা ঐতিহাসিক সত্য। তাই এ শ্রেণীর নাটকের প্রতি মঞ্চের অধ্যক্ষদের অনীহা বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ।

ধর্ম, দেশপ্রেম ও সমাজ সম্পর্কে নাট্যকারদের চিন্তা পৌরানিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকে অভিব্যক্ত হয়েছে। এর মধ্যে আবার ধর্ম প্রধান হয়ে সকল শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কেন না, গিরিশচন্দ্রের ভাষায়—৩৭ "হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।" রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালী মনীষীদের কর্মপ্রচেষ্টা অনুধাবন করলে গিরিশচন্দ্রের এ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে। এঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর সম্ভবত বিরল ব্যতিক্রম। কিন্তু আগেই বলেছি,বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ ধর্মের যে যুগোপযোগী নবীকরণ করে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্রে তা ছিলো অনুপস্থিত। তাছাড়া ধর্মদৃষ্টি গিরিশচন্দ্রের মতো কখনোই তাদের শিল্পসৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে নি। এবং গিরিশচন্দ্রই বাঙলা নাটকের প্রধানতম পুরুষ বলে সমকালে অভিনন্দিত। অর্থাৎ বাঙলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে বাঙলানাটকের যে মেলবন্ধন আধুনিক সাহিত্যের প্রথম পুরুষ মধুসূদন গড়ে তুলেছিলেন, গিরিশচন্দ্র তাঁকে পৃথক করলেন। বাঙলাসাহিত্যে নাটক কি সেজন্যেই গল্পকবিতা ইত্যাদির তুলনায় দুর্বল বলে পরিগণিত? কিন্তু গিরিশচন্দ্রের উপায় ছিলো না। তার যুগপরিবেশ ও শ্রেনী বৈশিষ্ট্য তাঁকে প্রচলিত আন্দোলন ও দর্শক সমাজকে অনুসরণ করতে বাধ্য করেছিলো। পুরাণের ধর্ম ধারণার পরিপন্থী 'পাষাণী' রচনা করে দ্বিজেন্দ্রলাল সে যুগে

ধিক্কৃত হয়েছিলেন। ষ্টার থিয়েটরের তৎকালীন অধ্যক্ষ অমৃতলাল বসু সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রধান পুরুষ ও গিরিশচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য—দ্বিজেন্দ্রলালকে জানিয়েছিলেন[৩৮]— "ঐ নাটকের (পাষাণীর) পাত্র পাত্রীদের নাম পরিবর্তন করিয়া কাল্পনিক নাম দিলে তিনি ঐ নাটকের অভিনয় করিতে পারেন—নতুবা নহে।" আশ্চর্যের বিষয়, মাত্র কয়েক বছর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় অনুরূপ কারণেই রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছিলেন। 'পাষাণী' রচনাকালে দ্বিজেন্দ্রলাল সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার নন, কিন্তু 'চিত্রাঙ্গদা' সমালোচনাকালে তাঁর নাম গিরিশচন্দ্রের পাশেই উচ্চারিত। তবে কি সাধারণ রঙ্গালয় অনুসৃত মনোভঙ্গী ও ধর্মাদর্শ দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রভাবিত করে চিত্রাঙ্গদা সমালোচনায় প্রবৃত্ত করেছিলো?

পূর্বেই বলা হয়েছে, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের কাছে বাঙালী দর্শকের দাবী ছিলো নৈতিক অনুশাসন, সমাজ সংস্কার ও দেশের হিতসাধন। সোমপ্রকাশ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটক দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন[৩৯]— "এরূপ রচনাপূর্ণ গ্রন্থ দ্বারা সমাজের উপকার না হইয়া রুচি বিকাররূপ অপকার ঘটিবারই সমূহ সম্ভাবনা," এবং আশা প্রকাশ করেছিলেন[৪০]— "রঙ্গভূমির পুনরুজ্জীবনে আনুষঙ্গিক দেশের অনেক উন্নতি হইবে।...লোকের রুচি পরিষ্কৃত হইবে এবং ভালো ভালো নাটকের অভিনয় হইলে দেশের ধর্মনীতিরও উন্নতি হইতে পারে।" ভালো নাটকের একমাত্র লক্ষণ হলো ধর্মনীতির প্রচার—এটাই লক্ষণীয়। তাই ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটরের 'সীতার বনবাস' অভিনয় দেখে 'সোমপ্রকাশ' যখন লেখেন[৪১] —"অতি সুন্দর অভিনয় দর্শনে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে এই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ অন্তরের সহিত যত্ন পাইলে ইহাকে অচির কালের মধ্যেই বিশেষ উন্নতিশালী করিতে পারেন," —তখন তৎকালীন বাঙলা নাট্যান্দোলনের পটভূমি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে এটাও লক্ষণীয়, পূর্ণাঙ্গ নাটক রচয়িতা হিসেবে গিরিশচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এবং সেবছর তাঁর রচিত ছয়খানি নাটকের মধ্যে চারখানিই পৌরাণিক অর্থাৎ 'ধর্মনীতি'র প্রকাশক। ধর্মনৈতিক অনুশাসন শুধু যে পৌরাণিক নাটকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তা নয়, সামাজিক ঐতিহাসিক নাটকও এ অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমেই গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যকারবৃন্দ 'সমাজ সংস্কার' ও 'দেশের হিতসাধন' করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে যে সকল ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছিলো তারও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো 'দেশের হিতসাধন'। অর্থাৎ দর্শক সাধারণের রুচি ও চাহিদা এবং নাট্যকারদের প্রবণতা

ও প্রতিভা এক কেন্দ্রবিন্দুতে মিলে এক বিশেষ নাট্যান্দোলন সম্ভব করেছিলো —যার ফসল বাঙলা নাট্য সাহিত্য।

একথা ঠিক, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তাঁর সমকালীন দর্শককে তৃপ্ত করেই কালজয়ী নাটক রচনা করে থাকেন। এলিজাবেথীয় দর্শক যা ভালোবাসতেন শেকস-পীয়র তাঁর নাটকে তা প্রচুর পরিমাণে পরিবেষণ করেছিলেন। হ্যামলেট নাটকটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়—প্রেতাত্মা, হত্যা, আত্মহত্যা, তলোয়ার খেলা, মড়ার মাথা, কামান গর্জন, প্রতিশোধ, জিঘাংসা, বিষপ্রয়োগ অর্থাৎ এলিজাবেথীয় দর্শকের যা কিছু বিষয় প্রিয় তার প্রচুর সমাবেশ, কিন্তু তার মধ্যেই শেকসপীরীয় প্রতিভা মানব চরিত্রের জটিল দ্বন্দ্ব, অনন্ত জিজ্ঞাসা, অসীম উপলব্ধি ও অনন্য সাধারণ কবিত্ব সহযোগে তাকে বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময় করে তুলেছে। কেবলমাত্র বাহ্য আড়ম্বর বা দৃশ্যময়তা শেকসপীয়রের নাটককে য়ুনিভার্সাল করে তোলে নি, বরং সমকালকে তৃপ্ত করেও তিনি শ্রেণী সীমানা বা Class line অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তিনি কালোত্তীর্ণ ও য়ুনির্ভার্সাল।[৪২] পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ লেখক শ্রেণী সীমানা অতিক্রম করেই কালোত্তীর্ণ ও য়ুনিভার্সাল হতে পারেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র প্রমুখ বঙ্গ রঙ্গালয়ের নাট্যকারগণ সমকালীন দর্শক রুচির কাছে শুধু আত্মসমর্পণই করেছেন, শ্রেণী সীমানা পেরিয়ে যাবার কোনো প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। তাই তাঁদের রচনা য়ুনিভার্সাল হতে পারে নি। কালোত্তীর্ণও হতে পেরেছে কি? মধুসূদনের নাটক এখনো যে অর্থে আধুনিক, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল অমৃতলালের রচনা সে অর্থে আধুনিকতা বহন করে কি? গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সশ্রদ্ধ ভক্তি ও বহু ভাষাবিদ হরিনাথ দে'র উৎসাহী মন্তব্য সত্বেও এ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হবে সন্দেহ নেই।

তথ্যপঞ্জী

১। কুমুদবন্ধু সেন : গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য (রসচক্র সাহিত্য সংসদ, দক্ষিণ কলিকাতা, পৌষ ১৩৪২) পৃঃ ৭১

২। তদেব, পৃষ্ঠা ৭০

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড (বিশ্বভারতী, ১৩৬৩) পৃঃ ৬৩৮

৪। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ভারতীয় নাট্যমঞ্চ ২য় খণ্ড (গিরিশ নাট্য-সংসদ, ১৯৪৭) পৃঃ ৪৬

৫। H. N. Dasgupta : Indian Stage, Vol II, (1938) Page 210

৬। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ভারতীয় নাট্যমঞ্চ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭১

৭। Wm Digby : Prosperous British India (T. Fisher Unwin, 1901) P. 534 and Page 553

৮। বিনয় ঘোষ : বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (পাঠভবন, নভেম্বর ১৯৬৮) পৃঃ ৯০–৯১

৯। বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাঙলার সমাজচিত্র (পাঠভবন, ১৯৬৬) পৃঃ ৬৮৭

১০। বিনয় ঘোষ : বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা পৃঃ ১৮৭–১৮৮

১১। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : গিরিশচন্দ্র (১৩৩৪ সাল) পৃঃ ২৫৮

১২। A. E. Pollard : Factors in Modern History (London, 1932) P. 43-44

১৩। কুমুদবন্ধু সেন : তদেব, পৃষ্ঠা ১৯

১৪। তদেব : পৃঃ ২১

১৫। তদেব : পৃঃ ৫১

১৬। A. C. Bradley : Oxford Lectures on Poetry (Macmillan & Co 1965) P. 392

১৭। Ibid : P. 392

১৮। Louis Harap : Social Roots of the Arts (International Publishers, 1949) P. 42

১৯। বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড (সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬)—"তীর্থ ন্যাশনাল থিয়েটর তিনিই বাবু।"

২০। হেরাসিম লেবেদভ : ব্রজেন্দ্রনাথের বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে উদ্ধৃত পৃঃ ৩-৪

২১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৬) পৃঃ ১৪০–১৪৭

২২। ঐ : ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৯–২৮৭

২৩। বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাঙলার সমাজচিত্র পৃঃ ২৬৩

২৪। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য : নাটক ও নাটকের অভিনয় (১৯২০) পৃঃ ৭২

২৫। নবকৃষ্ণ ঘোষ : দ্বিজেন্দ্রলাল (ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স, ১৩৩৬ দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃঃ ১৩৮

২৬। প্রফুল্লকুমার সরকার : বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ (নবকৃষ্ণ ঘোষের পুস্তকে উদ্ধৃত)

২৭। কুমুদবন্ধু সেন : তদেব, পৃঃ ৩১

২৮। ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালা (১৩১৬) পৃঃ ৬

২৯। বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, পৃঃ ৬১৭–৬২২

৩০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৮, চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ১৪১

৩১। বিনয় ঘোষ : তদেব পৃঃ ৬৯৩

৩২। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : তদেব, পৃঃ ১৯৭। "হিন্দুহাফেজ ও তুফানীর প্রথম রাত্রেই বিক্রী হয় ১২২৮৲। হাজারের কম বড় হইত না⋯।"

৩৩। কুমুদবন্ধু সেন : তদেব, পৃঃ ৭২

৩৪। E. C. Pettet : Shakespeare and the Romance Tradition (Staples Press, 1949) P. 91-92

৩৫। তদেব : পৃঃ ১১

৩৬। বিনয় ঘোষ : বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পৃঃ ২১১

৩৭। গিরিশচন্দ্র : গিরিশ রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯), পৃঃ ৭৩২

৩৮। নবকৃষ্ণ ঘোষ : তদেব, পৃঃ ১০০

৩৯। বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাঙলার সমাজচিত্র, পৃঃ ৬৮৫

৪০। তদেব, পৃঃ ৬৮৮

৪১। তদেব, পৃঃ ৬৯৩

৪২। Louis Harap : Social Roots of the Arts, Page 43-44

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন ?

বিদ্যাসাগরের তিরোধানের প্রায় আশী বৎসর পরে তাঁর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জল্পনার হেতু ও তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। মানবপ্রেমে আকণ্ঠমগ্ন দেশহিতব্রতী বিদ্যাসাগর আজ দেবমূর্তিতে পরিণত হয়েছেন। একাধিক স্থলে তাঁর মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর আসল অধিষ্ঠান মানুষের চিত্তলোকে। জ্ঞান, কর্ম, প্রেম পৌরুষের এমন সমন্বয় একব্যক্তির মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। প্রাচীন রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, গ্রামীণ সংস্কারবিজড়িত পটভূমিকায় লালিত হয়ে এবং সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী শিক্ষাদীক্ষার অনুশীলন করে তিনি যে কীভাবে বিশুদ্ধ মানবপ্রেম, লোকহিতৈষণা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় মানবতাবাদের অনুরূপ মানুষের কল্যাণচিন্তা নিজের অন্তর্লোকে স্থাপন করলেন, সে এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

সেযুগে বিদ্যাসাগরকে কী দৃষ্টিতে দেখা হত, তার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে। তাঁর জীবিতকালেই তাঁর ছবি ছাপিয়ে বিক্রয় করা হত, এবং তা বাঙালীর ঘরে ঘরে স্থানলাভ করেছিল—সে-যুগে আর কোনও বাঙালী জননায়কের এ সৌভাগ্য ঘটেনি। তাঁর অসাধারণ কর্মনৈপুণ্য, করুণাঘন মানবকল্যাণব্রত এবং অনমনীয় পৌরুষ সে যুগেই তাঁকে বাঙালী ও শ্বেতাঙ্গ সমাজে বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। তাঁর সম্বন্ধে কত গল্পকাহিনী কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও অনুরাগীরা

তাঁর সম্বন্ধে পরবর্তীকালে অনেক ছোট-বড়ো স্মৃতিকথা লিখে গেছেন। তা থেকে তাঁর একটি দিক সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক নতুন দৃষ্টিলাভ করতে পারেন। সেটি হল তাঁর ধর্মমত' ঈশ্বরসত্তা ও পারমার্থিক চেতনা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান-বিশ্বাস।

তাঁর জীবিতকালে যেমন তাঁর ভক্তসংখ্যার সীমা ছিল না, তেমনি আবার কেউ কেউ অন্তরালে তাঁর সমাজসংস্কার-সংক্রান্ত মতামত নিয়ে কিছু কিছু সমালোচনাও করতেন। হিন্দুর অনেকগুলি সযত্নলালিত সামাজিক আচার-আচরণকে বিদ্যাসাগর মানবপ্রেম ও করুণার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং বিধবাবিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহের বিরোধিতা দ্বারা নিজ অন্তরশায়ী অগ্নিগর্ভ পৌরুষের দিব্যালোকে অর্থহীন, মূঢ় ও নির্মম সমাজ-প্রকরণকে অযৌক্তিক, ঘৃণার্হ ও বিনাশযোগ্য প্রমাণ করেছেন। সংস্কার এমন গভীরভাবে যুগযুগান্ত ধরে আমাদের সত্তাকে আচ্ছন্ন করে থাকে যে, প্রাজ্ঞজনও সেই সমস্ত অভ্যস্ত আচার-আচরণের নাগপাশে জড়িত হয়ে কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হন। বিদ্যাসাগর তারই বিরুদ্ধে যে-অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, তা শুধু 'ইয়ং বেঙ্গল' বা নব্য শিক্ষিতজনের পশ্চিমঘেঁষা 'রিফর্মেশন' নয়। তিনি যুক্তির চেয়ে মানবপ্রেমের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়ে এবং নারীর অশ্রুমোচনের সংকল্পে অটল থেকে মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো বীরবিক্রমে অগ্রসর হয়েছেন। প্রেম ও করুণাই তাঁর সমগ্র চেতনাকে অধিকার করেছিল বলে তিনি অতি সহজেই সংস্কার ত্যাগ করে নিরঞ্জন সত্যকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন—যেরকম অনুরাগ ও মমতার সঙ্গে জননী তাঁর সন্তানকে অঙ্কে ধারণ করেন।

তবু প্রশ্ন উঠেছে, সে-যুগেও উঠেছিল। বিদ্যাসাগর কি প্রচলিত হিন্দু-মতাদর্শানুসারে ঈশ্বরবিশ্বাসী আস্তিক্যবাদী পুরুষ ছিলেন? বাহ্যতঃ তিনি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কোন কোন আচার-আচরণ সম্বন্ধে কিছু উদাসীন ছিলেন; উপরন্তু যে-সমস্ত পুরাতন সংস্কারের উপর আঘাত হেনেছিলেন সেগুলি ছিল সনাতনপন্থী হিন্দু-সমাজের প্রাণের সামগ্রী। সুতরাং তাঁর জীবিতকালেই তাঁর ধর্মমত নিয়ে আড়ালে-আবডালে অনেক আলোচনা হত। ছদ্মনামে লেখা তাঁর 'ব্রজবিলাস'-এ তিনি বলেছেন যে, সেযুগের সমাজপতিরা তাঁকে গোপনে খ্রীষ্টান অপনাম দিয়ে নিন্দা করতেন। কারণ তিনি হিন্দুর সামাজিক সংস্কারগুলিকে সর্বদা শিরোধার্য করতেন না।[১]

বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলে প্রথম প্রচার করেন তাঁর শিষ্য ও অনুরাগী আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। বিদ্যাসাগরের তিরোধানের বহুকাল পরে কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেন:

"বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না ; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারাও কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। ··· পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাব বন্যায় এদেশের ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল, চিরকাল পোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?"২

বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার ('বিদ্যাসাগর') এবং সুবলচন্দ্র মিত্র (Iswar Chandra Vidyasagar — Story of his life and works). রক্ষণশীল মনোবৃত্তিবশতঃ তাঁদের গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের কোন কোন সমাজসংস্কারেচ্ছার প্রশংসা করতে পারেন নি। তাঁদের ধারণা, বিদ্যাসাগর প্রবৃত্তিমুখী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে হিন্দুর নিবৃত্তিমুখী সনাতন সংস্কারে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। বিহারীলাল তো মুক্ত-কণ্ঠেই বলেছেন. "অধ্যাপকের বংশে জন্ম লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইয়া, হৃদয়ে অসাধারণ দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি, হিন্দুধর্মের প্রতি তিনি আন্তরিক দৃষ্টি রাখিলেন না কেন ? ···বিদ্যাসাগর কালের লোক।৩ কালধর্মই তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট হইয়াছে; হিন্দুধর্মে আঘাত লাগিয়াছে।···নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশধর বিদ্যাসাগর, উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবনসর্বস্ব গায়ত্রী পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন।"৪ বিদ্যাসাগর দয়া ও করুণার বশে হিন্দুর সনাতন ধর্মের অন্যথাচরণ করেছিলেন, এমন কি উপনয়নের পর সন্ধ্যাবন্দনাদির মন্ত্রও ভুলে গিয়েছিলেন।৫ এর থেকে বিহারীলাল অনুমান করেছেন যে, বাল্যকাল থেকেই হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস কিছু শিথিল হয়ে গিয়েছিল। উত্তরকালে শ্বেতাঙ্গ-সান্নিধ্যে এসে তিনি হিন্দুর নিত্যকর্মের প্রতি কিছু উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন, এবং সেজন্য বিহারীলাল অনুযোগ করেছিলেন।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতে ('বিদ্যাসাগর' ১৮৯৫) এ-বিষয়ে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরের অতিশয় স্নেহভাজন ছিলেন। সুতরাং তাঁর মতামত তথ্যসঙ্গত বলে গৃহীত হতে পারে। তাঁর মতে—

"তাঁহার (বিদ্যাসাগর) আচার-আচরণ হইতে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এইরূপ বোধ হয় যে, তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক ছিলেন। তবে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস, সাধারণ লোকের অনুষ্ঠিত কোন-এক পদ্ধতির অধীন ছিল না। সূক্ষ্মতররূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে, তাঁহার নিত্য-জীবনের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপর দিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের লক্ষণের পরিচয়ও কখনও পাওয়া যায় নাই।" ('বিদ্যাসাগর', পৃঃ ৫২০)

অর্থাৎ চণ্ডীচরণের মতে, বিদ্যাসাগর ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে বোধ হয় সম্প্রদায় চিহ্ন-হীন মধ্যপথ ধরেছিলেন। নৈষ্ঠিক হিন্দুর আচার-বিচারের প্রতি তাঁর যেমন খুব একটা আস্থা ছিল না, তেমনি অন্যদিকে 'রিফর্মড্ হিন্দু' অথবা প্রগতিশীল ব্রাহ্মমতের প্রতিও তাঁর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না।[৬]

স্বল্পকথায় বলতে গেলে বলতে হয়, হিন্দুধর্মের লোকাচারের প্রতি তাঁর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না, এমন কি স্মার্ত আচারের প্রতি প্রত্যক্ষতঃ, প্রতিকূলতা না করলেও এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁর পুরো বিশ্বাস ছিল না। মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের ধর্মীয় কৃত্যের প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণ না থাকাই স্বাভাবিক। একবার তিনি কৌতুকের বশে ভাটপাড়া-নিবাসী তাঁর কায়স্থ-বন্ধু অমৃতলাল মিত্রের অন্নের থালা থেকে কাড়াকড়ি করে মাছের মুড়ো খেয়েছিলেন; এজন্য ভট্টপল্লীর ভট্টাচার্যগণ তাঁর উপর বিরূপ হয়েছিলেন বলে শোনা যায়।[৭] এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও স্মৃতিসংহিতার আলোচনার মধ্যে ডুবে থাকলেও দৈনন্দিন আচার-বিচারে ঠিক স্মার্ত পণ্ডিত বা শাস্ত্রযাজী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না। ধর্মকর্ম সংস্কার প্রভৃতিকে তিনি মানব কল্যাণের বাতায়ন থেকে দর্শন করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাই বলে তিনি ডিরোজিওর মন্ত্রশিষ্যগণের মতো হিন্দুধর্ম ও আচারের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ান নি। ব্রাহ্মণ সন্তানের যে সমস্ত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান মানা কর্তব্য, তিনি মনে মনে তার পোষাকতা করুন আর নাই করুন, বাইরের দিকে তার অন্যথাচরণ করেন নি—জনন-মরণাদি স্মার্ত ক্রিয়াকর্মেরও তিনি যথাবিধি অনুষ্ঠান করতেন; আজীবন উপবীতধারী ব্রাহ্মণই ছিলেন। চিঠিপত্রাদির শিরোদেশে শ্রীহরির নাম স্মরণ করতেন, জনকজননীর দেহান্ত হলে বিদ্যাসাগর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসন্তানের মতোই ঔর্ধ্বদৈহিক অনুষ্ঠান ও কৃচ্ছ্র-শৌচকর্মাদি নির্বাহ করেছিলেন। সুতরাং তিনি যে তৎকালীন ধর্মসংস্কারকদের মতো হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে-ছিলেন তা মনে হয় না। অভ্যাস ও সংস্কারের বশে তিনি বাহ্যতঃ হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান মানতেন, কিন্তু লোকাচার দেশাচারের সঙ্গে মানবধর্ম ও হৃদয়ধর্মের বিরোধ বাধলে মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর স্বচ্ছন্দে লোকাচারকে নস্যাৎ করতে পারতেন।

তাঁর জীবনীকার ও অনুরাগী অন্তরঙ্গেরা তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে এমন দু-একটি মন্তব্য করেছেন যে, বাহ্যতঃ তাঁকে পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী বলতে দ্বিধা হয়। তাই কেউ কেউ মনে করেন যে, তাঁকে নাস্তিক বলা না গেলেও সংশয়বাদী বললে

সত্যের অপলাপ হবে না। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্টতঃ কোন মতামত প্রকাশ করে যান নি। তাঁর আত্মচরিত অসম্পূর্ণ রচনা। এটি সম্পূর্ণ হলে তাঁর অন্তর্জীবনের ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হতে পারত। শোনা যায়, দুই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, ধর্ম, পরলোক, ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গূঢ় অভিমত তিনি প্রকাশ করতে আগ্রহী নন। একবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সেই সময়ে এ-বিষয়ে দুজনের মধ্যে কিছু আলাপ ও মতবিনিময় হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্মযোগী ও করুণাময় বিদ্যাসাগরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন। উভয়ের সাক্ষাৎকার ও আলাপের কিছু নমুনা 'শ্রীম' "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে" (৩য়) লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে নানা তত্ত্বকথার আলোচনা করে সর্বশেষে একটি গূঢ় প্রশ্ন করলেনঃ

> (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)—"আচ্ছা তোমার কি ভাব? বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন, "আচ্ছা সেকথা আপনাকে একলা একদিন বলব।" (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য়, পৃঃ ১২, ১৩৭৪ সালের সং)

এই উক্তি থেকে মনে হচ্ছে, সকলের সম্মুখে বিদ্যাসাগর নিজের মনোগত গূঢ় কথা খুলে বলতে চান নি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্নটি অতি সহজ, সরল। তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যাখ্যা করছিলেনঃ

> "তুমি যেসব কর্ম করছো এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।" (ঐ, পৃঃ ১৫)

তারপর তিনি বিদ্যাসাগরকে উপদেশ দিলেনঃ

> "অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। আরো এগিয়ে যাও।" (ঐ, পৃঃ ১৫)

একথা বলার তাৎপর্য, নিষ্কাম কর্মযোগী বিদ্যাসাগর যেন উপায়কে লক্ষ্য ভেবে থেমে না যান। নিষ্কাম কর্ম হল উপায়, ঈশ্বরলাভই জীবের লক্ষ্য। আধারকে আধেয় ভাবলে সত্যদৃষ্টি স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে। শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য বিদ্যাসাগরকে বোধ হয় ক্ষণকালের জন্য চিন্তিত করে তুলেছিল। বোধ হয় তিনি নিজের মানসসাগরতলে ক্ষণিকের জন্য ডুব দিয়েছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কথাটি ভাবতে শুরু করেছিলেন। তাই সকলের সামনে নিজের চিত্তপট মেলে ধরতে চাননি।

আর একবার নিজের গভীর প্রত্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন এইভাবেই এড়িয়ে গিয়েছিলেন। একদা কাশীধামে উপস্থিত হলে কোন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে এসে

বলেন, "ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল।" তার উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন, "আমার মত কাহাকে কখনও বলি নাই, তবে এই কথা বলি, গঙ্গাজলে যদি আপনার দেহ পবিত্র মনে করেন, শিবপূজায় যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন তাহা হইলে তাহাই আপনার ধর্ম।"[৮] এখানে লক্ষণীয় যে, বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ ব্যক্তিগত মানসিকতার উপর জোর দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত প্রবণতার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ যে যে-ভাবে খুসি আচার-আচরণ গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক প্রতীকতা বা ঈশ্বর-সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় নয়—তার উক্ত উপদেশের এই হল তাৎপর্য। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর-সংক্রান্ত তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা ও নিজস্ব বিশ্বাস প্রকাশে তিনি বিরত হয়েছেন। বিশুদ্ধভাবে নাস্তিক্যবাদী হলে বা ঈশ্বরচেতনায় তাঁর পুরোপুরি অনীহা থাকলে নিজস্ব ধারণা ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হবার পাত্র তিনি ছিলেন না। বস্তুতঃ ঈশ্বরচেতনা ও পারমার্থিকতা সম্বন্ধে তাঁর লেখনী-নিঃসৃত কোন ব্যক্তিগত অভিমত পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে তিনি অন্তরঙ্গদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যে সমস্ত আলোচনা করতেন এবং এখানে-সেখানে সে-সম্পর্কে যা বলতেন, তা থেকে তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটু আভাষ পাওয়া যেতে পারে।

তাঁর 'বোধোদয়' সম্পর্কে একটা গল্প প্রচলিত আছে। জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তা প্রচার করেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিতের পরিশিষ্টে উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক তা স্বীকারও করেছেন। 'বোধোদয়'-এর প্রথম সংস্করণে নানা পার্থিব জ্ঞানের পরিচয় থাকলেও ঈশ্বর-সংক্রান্ত কোন কথাই নেই। থাকবার কথাও নয়; এখন যিনি পদার্থবিজ্ঞানে বা অন্য কোন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ লেখেন, তাতে কি তিনি পরম কারুণিক শ্রীভগবানের জয়ধ্বনি করেন? কিন্তু 'বোধোদয়ে' ঈশ্বরের উল্লেখ নেই দেখে বিদ্যাসাগরের অনুরাগী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রশ্ন তুললেন, "মহাশয় ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোন কথা নাই কেন?"[৯] তার উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন, "যাঁহারা তোমার কাছে ঐরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে বলিও, এইবার যে বোধোদয় ছাপা হইবে, তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবেক।"[১০]

পরবর্তী সংস্করণে বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়ে' ঈশ্বরবিষয়ক ক্ষুদ্র নিবন্ধ যোগ করে দেন।[১১] হয়তো তিনি বিজয়কৃষ্ণের কথায় মনে করেছিলেন, ঈশ্বর-বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত যাই হোক না কেন, পাঠ্যপুস্তক যথাসম্ভব নিঃস্পৃহভাবে রচনা

করা উচিত। সাধারণ বালক-বালিকারা যেমন পদার্থজগৎ থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করবে, তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধেও তারা কিছু কিছু জানবে, পাঠ্য পুস্তকের সেই রকম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই ভেবেই বোধ হয় তিনি বিজয়কৃষ্ণের মন্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর কোন অনমনীয় প্রতিকূল ধারণা থাকলে তিনি বিজয়কৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করে ঈশ্বর-প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন না। কারণ যুক্তিবিরোধী বা তাঁর অভিমতের বিরুদ্ধ কোন কথা তিনি কিছুতেই মানতে পারতেন না, অন্তরঙ্গ জনের জন্যও না।

ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সম্পর্কে অনেকে অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু এক-কথায় এর মীমাংসা করা দুরূহ। নির্মম দেশাচারের তিনি ঘোর শত্রু ছিলেন। মানুষের দুঃখ দূরীকরণের জন্য তিনি অযৌক্তিক শাস্ত্রবচনকে তুচ্ছ করতে পারতেন, সেরকম দৃঢ় মনোবলের তিনি ছিলেন অমিত অধিকারী। মানব-প্রেম তাঁকে চিরাচরিত সংস্কারের প্রতি উদাসীন করে তুললে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকবে না। নিজের উইলে বিদ্যাসাগর নানা হিতকর কর্মে অর্থ বরাদ্দ করে গেছেন বটে, কিন্তু দেবসেবা, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্মে এক কপর্দকও ব্যয়ের নির্দেশ দেন নি।[১২] পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী হলে এবং এতৎ-সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ পথের অনুবর্তন করলে, এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত বা নির্দেশ দিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে তিনি ভক্ত ও অনুচরদের সঙ্গে এ বিষয়ে যা দু'চার কথা আলোচনা করতেন এখানে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা যাচ্ছে :

> "এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি, তবে ঐ পথে না চলিলে, নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করিও না। লোককে বুঝিয়ে শেষটা কি ফ্যাসাদে পড়ে যাব? এক্‌তো নিজে কতশত অন্যায় কাজ করিয়া নিজের পাপের বোঝা ভারী করিয়া রাখিতেছি, আবার অন্যকে পথ দেখাতে গিয়া, তাহাকে বিপাকে চালাইয়া কি শেষটা পরের জন্য বেত খাইয়া মরিব? নিজের জন্য যাই হোক পরের জন্য বেত খেতে পারবো না বাপু। এ-কার্য আমাকে দিয়ে হবে না। নিজে যেমন বুঝি, সেই পথে চলতে চেষ্টা করি, পীড়া-পীড়ি দেখিলে বলিব এর বেশী বুঝিতে পারি নাই।"[১৩]

এই মন্তব্য থেকে বিদ্যাসাগরের পারমার্থিক তত্ত্ব সম্পর্কে মতামত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাতে তাঁর বিশেষ আস্থা নেই। ঈশ্বর-অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী, কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ক সাম্প্রদায়িক রীতিনীতিতে তাঁর বিশ্বাস নেই। এ বিষয়ে গুরু সেজে ধর্মপ্রচারের বা অপর কাউকে উপদেশ দানের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন।

এদিক থেকে মনে হচ্ছে, কীভাবে ঈশ্বর লাভ করা যায়, অথবা আদৌ লাভ করা যায় কি না, সে বিষয়ে তিনি কোনদিনই সংশয়াতীত হতে পারেন নি। তিনি যে ধর্ম-সংক্রান্ত প্রচারকর্মের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভক্তি পথে গিয়ে ধর্ম প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করলে বিদ্যাসাগর পরিহাস করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি নাকি কী একটা হয়েছ?"[১৪] কিন্তু এ সব উক্তি থেকে তাঁকে কোনমতেই নাস্তিক বলা যাবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরবিষয়ক তত্ত্বকথা এমনভাবে সংগুপ্ত যে, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে তার নাগাল পাওয়া যাবে না। অতএব অপরকে উপদেশ দেওয়াও অযৌক্তিক। তিনি যুক্তির আনুগত্যকে সার বলে মেনেছিলেন, তদতিরিক্ত পারমার্থিক চিন্তায় তাঁর আসক্তি ছিল না। বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম প্রচারণাকে তিনি পরিহাস করেছিলেন। তার কারণ, তাঁর মতে ঈশ্বর সাধনা একান্তভাবে ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার বস্তু—প্রচার বা বিতর্কের বিষয় নয়। হিন্দুদর্শনের তাত্ত্বিক দিকটি তাঁর নখদর্পণে ছিল, কিন্তু তার সাধনার দিক তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে নি। অর্থাৎ ধর্ম ও দর্শনে তিনি নিঃস্পৃহ, বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন তাত্ত্বিক মাত্র ছিলেন, উক্ত বিষয়কে বুদ্ধির খোলামাঠ থেকে তুলে নিয়ে রহস্যানুগ সাধ্যসাধনার সুড়ঙ্গপথে প্রেরণে বিশেষ উৎসাহী হন নি। এ বিষয়ে একবার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ("শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত"-এর সঙ্কলক 'শ্রীম') তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার হিন্দুদর্শন কেমন লাগে?" উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন, "আমার ত বোধ হয়, ওরা যা বুঝাতে গেছে বুঝাতে পারে নাই।"[১৫] পরে মহেন্দ্রনাথ তাঁকে ঈশ্বর বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন, "তাঁকে ত জানবার জো নেই। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত, যাতে জগতের মঙ্গল হয়।" এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর খুব গভীর চিন্তার কথা স্বল্পাক্ষরে বলেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বর বাক্‌পথাতীত, বাক্য ও মনের অগোচর। সুতরাং দর্শন গ্রন্থে ও তত্ত্বালোচনায় তাঁকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? তিনি যদি বাক্য-মনের অগোচর হন, তা হলে জীবের করণীয় কি? তার উত্তরে বিদ্যাসাগর বলবেন, জীবকেই ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করতে হবে, জীবহিতব্রতই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তাই বিদ্যাসাগর নরসেবাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য নরের মধ্য দিয়ে নরোত্তমে যাওয়া যায় কিনা, অথবা তার প্রয়োজন আছে কিনা এ বিষয়ে তিনি অতিশয় মিতবাক্।

ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথের কাছে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য থেকে মনে হচ্ছে, তিনি হিন্দুদর্শনের সীমা সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ছিলেন।[১৬] দর্শন মূলতঃ

বুদ্ধি-আশ্রয়ী। সুতরাং ঈশ্বরানুভূতি বলে যদি কিছু থাকে, তবে সে বিষয়ে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা ও তত্ত্বদর্শন কতটুকু সাহায্য করতে পারে? এই বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তিনি বেদান্ত ও সাংখ্যকে ভ্রান্তদর্শন বলতেও কুণ্ঠিত হয় নি।[১৭]

একবার পুরীর সমুদ্রে স্টীমার ডুবির ফলে প্রায় সাত-আটশ' নরনারী বাল-বৃদ্ধ মারা যায়। এ সংবাদে মুহ্যমান হয়ে তিনি সক্ষোভে মন্তব্য করেছিলেন: "দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর যে, নানাদেশের নানা স্থানের অসংখ্য লোককে একত্রে ডুবাইলেন! আমি যাহা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হইয়া কেমন করিয়া ৭০০-৮০০ লোককে একত্রে ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বালিয়া দেন। দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ? এই সকল দেখিলে কেহ মালিক আছেন বলিয়া সহসা বোধ হয় না।"[১৮] এখানে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর হৃদয় মানবপ্রেমে এতই পূর্ণ ছিল যে, করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে ঐ জাতীয় নির্মম ঘটনার কার্যকারণত্ব খুঁজে পেতেন না। প্রত্যক্ষ জীবনবাদী বিদ্যাসাগরের পক্ষে এরকম অভিমত প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। তবে মাঝে মাঝে ঈশ্বর বিষয়ে নানা প্রসঙ্গে তাঁর মনে সংশয় জাগলেও[১৯] জনক-জননীকে তিনি দেবতা বলে গ্রহণ করেছিলেন, অন্ততঃ কাশীধামে পাণ্ডা-পুরোহিতের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডার সময়ে সেই অভিমতই ব্যক্ত করেছিলেন।[২০] তাঁর অভিমত থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ধর্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা সাধারণের নিকট প্রকাশে ইচ্ছুক ছিলেন না, অর্থাৎ তাঁর ধারণা আর সাধারণের প্রচলিত ধারণা সম্ভবতঃ এক ছিল না বলেই তিনি নিজস্ব মতামত সম্বন্ধে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছিলেন। তবে কি তিনি পারমার্থিকতা সম্পর্কে সংশয়বাদী ছিলেন? এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন উত্তর পাওয়া কঠিন। ধর্মসাধনাকে তিনি নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রবণতার ব্যাপার বলে দেখেছিলেন, এবং চিত্ত প্রণালীর বাইরে পারমার্থিকতার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন। গঙ্গাস্নান, শিবপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কেউ যদি মনে করেন, এই-ই তাঁর ধর্ম সাধনা, তা হলে তাতেও বিদ্যাসাগরের আপত্তি নেই। ধর্মের 'সাধারণীকরণ' নয়, 'বিশেষীকরণে' তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

বিদ্যাসাগর পরলোক ও জন্মান্তর ব্যাপারেও সন্দিহান ছিলেন। ঈশ্বরতত্ত্বের সম্পর্কে তাঁর মনে মাঝে মাঝে সংশয় দেখা দিত, তিনি পরলোকতত্ত্বে যে ঘোর সংশয়ী হবেন তাতে আর সন্দেহ কি? একবার রাধাপ্রসাদ রায়ের (রামপ্রসাদের পুত্র) দৌহিত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর কিছু পরিহাস মিশ্রিত আলোচনা হয়েছিল। ললিতমোহন পরলোকতত্ত্বে বিশেষ আসক্ত ছিলেন, তাই

নিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে কৌতুক পরিহাস করতেন। ললিতমোহন যোগমার্গেও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। একদা বিদ্যাসাগর ললিতমোহনকে স-পরিহাসে জিজ্ঞাসা করেন, "হাঁরে ললিত, আমারও পরকাল আছে নাকি?" ললিতমোহন বললেন, "আছে বৈকি, আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকিবে না ত' থাকিবে কার?"[২১] এই আলাপ থেকে মনে হচ্ছে, লোকান্তর সম্পর্কে তিনি কখনও গভীরভাবে চিন্তাই করেন নি, উক্ত ব্যাপার তাঁর কাছে হাসির ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। বাস্তব জীবনের দুঃখবেদনা নিয়ে তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, পরলোকের আশ্বাস তাঁর কাছে কোনও সান্ত্বনার বাণী বহন করে আনে নি।

বিধবাবিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁকে পরবর্তীকালে অনেক মানসিক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। এমন কি এই ব্যাপারে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনও তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। ফলে শেষজীবনে মানসিক আঘাতে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। দেহে-মনে ক্লান্ত হয়ে তিনি মাঝে মাঝে কার্মাটারে গিয়ে সরলপ্রাণ সাঁওতালদের সাহচর্যে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করতেন। কারণ শিক্ষিত সভ্যতাভিমানী শহুরে বাঙালীর অকৃতজ্ঞতা এবং নিকটআত্মীয়ের নষ্টামির ফলে তিনি অতিশয় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এমন কি, একসময়ে তিনি সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বনেও প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং সেকথা পিতা, মাতা, ভ্রাতৃগণ ও সহধর্মিণীকে জানিয়ে পত্রযোগে লিখেছিলেন: "নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। এ-জন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব।" (পিতার নিকট লিখিত পত্র)[২২] এখানে লক্ষণীয়—মানসিক বিপর্যয়ের সময়েও ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি কোন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন নি। এই রকম মনের অবস্থায় অনেকে গীতার 'যথা নিযুক্তোহস্মি' বাণী অথবা রবীন্দ্রনাথের "সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা, নিজের মনে না জানি মানি ক্ষয়"—উক্তি অবলম্বনে জীবন রণাঙ্গনে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে শান্তি প্রলেপ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাধারণ ধাতুপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন না; তাই সে সান্ত্বনাও তাঁর ছিল না। তাঁর এই সময়ের চিঠিপত্রাদি থেকে দেখা যাচ্ছে, তাঁর দেহ ও মন ভেঙে পড়েছিল; পুত্র ও ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্য তাঁর মনঃকষ্টকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। কিন্তু পত্রাদির কোথাও তিনি ঈশ্বর-করুণার উল্লেখ করে মানসিক প্রদাহ নিবৃত্ত করতে চান নি।

সর্বশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। এইরূপ মানসিক যন্ত্রণার সময়ে তিনি অখিল উদ্দীন নামে এক অন্ধ বাউলের দেহতত্ত্ববিষয়ক গান শুনতে ভালবাসতেন। এখানে তার দু'একটি উল্লেখ করি:

১। কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন করবে রে কে,
তুমি কোন্‌খানে খাও কোথায় থাকো রে মন অটল হয়ে,
কোথায় ভুলে রয়েছে।

২। তুমি আপ্‌নি নৌকা, আপ্‌নি নদী, আপ্‌নি দাঁড়ি,
আপ্‌নি মাঝি,
আপ্‌নি হও যে করণধারজী, আপ্‌নি হও যে নায়ের কাছি,
আপ্‌নি হও রে হাইল-বৈঠা।

৩। তুমি আপ্‌নি মাতা, আপ্‌নি পিতা,
আপ্‌নার নামটি রাখবো কোথা, সে নাম হৃদয়ে গাঁথা
আমার গোঁসাইচাঁদ বাউলে বলে, সে নাম ভুলবো না রে
প্রাণ গেলে।

৪। তুমি আপ্‌নি অসার, আপ্‌নি হও সার,
আপ্‌নি হও সে নদীর দু'ধার, আপ্‌নি হও নদীর কিনার,
আমি অগাধ জলে ডুব দিতে যাই, সে নাম ভুলবো
নারে প্রাণ গেলে।

৫। আপ্‌নি তরো, আপ্‌নি আরা, আপ্‌নি জরা, আপ্‌নি মরা,
আপ্‌নি হও যে নদীর পাড়া, আবার আপ্‌নি হও সে
শ্মশানকর্তা গো,
আপ্‌নি হও সে জলের মীন, ও নিরঞ্জন, তোর
কোথায় সাকিম গো,
আমি ভেবে চিন্তে হলেম ক্ষীণ।২৩

শেষজীবনে বিদ্যাসাগর সত্যই কি পারের কাণ্ডারী নিরঞ্জনের ডাক শুনতে পেয়েছিলেন? গোঁসাইচাঁদ বাউলের মতো তিনিও কি আকুল আর্তনাদে জীবনের সায়াহ্ন-আকাশতলে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, "ও নিরঞ্জন, তোর কোথায় গো সাকিম!" রামেন্দ্রসুন্দরের কথা উল্লেখ করে বলতে পারি, এ-বিষয়ে চূড়ান্ত "মীমাংসা হইল না" ('জিজ্ঞাসা')। বিদ্যাসাগরের অন্তর্লোকে প্রবেশ করে তাঁর চিত্তধাতুর গূঢ় রহস্য সন্ধান করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে, তাঁর হৃদয় মানবপ্রেমে কানায় কানায় ভরে উঠলে তিনি জীবের দুঃখ দেখে ভাবাবেগের বশে পরম কারুণিক

ঈশ্বরের অস্তিত্বে ক্ষণিকের জন্য সন্দিহান হয়ে পড়তেন, হৃদয়ই তখন তাঁর সমস্ত চিত্তপ্রবৃত্তি ও কর্মপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করত। কিন্তু পরে ভাবাবেগ প্রশমিত হলে তিনি শান্তচিত্তে যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে এ বিষয়ের যাথার্থ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করতেন। কিন্তু অগুয়েস্ত্ কঁতের মতো তিনি নিছক তত্ত্ববাদী ছিলেন না, রামমোহনের মতো তাঁকে বলা চলবে না—"His cardinal principle was that service of man is the service of God."[২৪] মানব-সেবাই তার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল কিন্তু তাকেই সোপান করে ঈশ্বর-সান্নিধ্যে পৌঁছাবার সূক্ষ্মতম পন্থা আবিষ্কারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহনকে 'Theo-philanthropist' বলেছিলেন।[২৫] কিন্তু বিদ্যাসাগরের Philanthropy-তে কোন theos-এর সম্পর্ক ছিল না। মানুষের দুঃখ দূর করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তদতিরিক্ত কোন পুণ্যফল তিনি কামনা করতেন না। মানব-প্রেমই ঈশ্বরপ্রেমে উদ্বর্তিত হয়, একথা ভক্তিশাস্ত্র বলে। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহী বা কৌতূহলী ছিলেন না। তাঁর মতাদর্শ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন: "বিদ্যাসাগর সেই শাক্যমুনি-প্রদর্শিত বৈরাগ্য মার্গের ও কর্ম মার্গের পথিক ছিলেন।……তিনি যে মার্গে চলিতেন, তাহা আর্যশাস্ত্রসম্মত, মানবশাস্ত্রসম্মত সনাতন ধর্মমার্গ।" ('ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর') বিদ্যাসাগরের পন্থা বিশেষ কোন শাস্ত্রসম্মত অথবা বৈরাগ্য ধর্মাবলম্বী কিনা তাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম, মানববেদনার প্রতি অগাধ সহানুভূতি এবং মানবদুঃখ দূর করবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ তাঁকে বৈরাগ্যধর্মী করে নি, বরং তাঁর মানসশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি নাস্তিক ছিলেন কিনা তার যথার্থ উত্তর দেওয়া দুরূহ। কিন্তু তাঁকে নিশ্চয় বলা চলবে," হে নাস্তিক, আস্তিকের গুরু।" মানুষই তাঁর ধর্ম, মানুষই তাঁর সাধনা, মানুষ তাঁর আধার এবং আধেয়। পাশ্চাত্য positivist দার্শনিকের মতো মানবতত্ত্বের নির্যাস নয়, মানুষের দুঃখদুর্দশাপূর্ণ কবোষ্ণ স্পর্শই তাঁর কাম্য ছিল। নরের মধ্যে নরোত্তম ও নারায়ণকে তিনি দর্শন করেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু নরদেহই তাঁর কাছে দেবমন্দির; নরদুঃখ লাঘবের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ তাঁর যজ্ঞহবিঃ। বিদ্যাসাগর পরম আস্তিক্যবাদী, কারণ তিনি মানববাদী। মানুষের চেয়ে অধিকতর অস্তিত্ববান্ আর কে?

পাদটীকা

১। "এমন কি পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয়, বহুদর্শী, বিচক্ষণ চাঁই মহোদয়েরা তাঁহাকে (অর্থাৎ বিদ্যাসাগরকে) খৃষ্টান বলিয়া থাকেন।"—ব্রজবিলাস (দেবকুমার বসু সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৯৩)

২। বিপিনবিহারী গুপ্ত সংকলিত 'পুরাতন প্রসঙ্গ', পৃঃ ১৩১-১৩২, (বিদ্যাভারতী প্রকাশিত নতুন সংস্করণ)

৩। সুবলচন্দ্র মিত্রও এই মতের প্রতিধ্বনি বরে বলেছেন, "Vidyasagar was a man of the age ; he followed the course indicated by it. No doubt this course has brought on a greater mischief to the real Hindu has materially injured Hindu Religion, has propelled the Hindu Society with great force in the direction of disorganisation ; but Vidyasagar ought not to be blassed for it. God alone, who made him with such materials, knows why he did so."—Iswar Chandra Vidyasagar—Story of his life and works, P. 275

৪। এই প্রসঙ্গ তিনি আর একবার উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫। চণ্ডীচরণ ('বিদ্যাসাগর', ১ম সং, পৃঃ ৪৮) এবং শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ('বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত', বুকল্যাণ্ড প্রকাশিত নতুন সংস্করণ, পৃঃ ৩০) এ বিষয়ে একই কথা বলেছেন।

৬। চণ্ডীচরণের মতে প্রথমদিকে বিদ্যাসাগর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, "কিন্তু নানাপ্রকার মতভেদনিবন্ধন যখন অপ্রিয় সঙ্ঘটন হইতে লাগিল, তখন আর সেই সকল গোলযোগের মধ্যে থাকিয়া অশান্ত বৃদ্ধি করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। ব্যক্তিগত মতবিভিন্নতার অত্যধিক প্রবলতা দেখিয়া আস্তে আস্তে বিদায় হইলাম" (বিদ্যাসাগরের উক্তি)।—বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৫২০

৭। দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা, পৃঃ ১৯

৮। বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর। ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৮৬

৯। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৫২১

১০। ঐ, পৃঃ ৫২১

১১। বিদ্যাসাগর উক্ত অনুচ্ছেদে "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" এই মন্তব্য যোগ করেন। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর সম্পাদকের মতে, ১৮৪১ সালের এক বক্তৃতায় মহর্ষি ঈশ্বরবিষয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁর 'বোধোদয়ে' সেটি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর 'বোধোদয়'-এর নানা সংস্করণে ঠিক এই ধরণের মন্তব্য নেই। মনে হয়, গ্রন্থ সম্পাদনা কালে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র কিছু কিছু পাঠ সংস্কার করেন। অবশ্য ঐটি ছাড়াও

'বোধোদয়' ও 'আখ্যান মঞ্জরী'-র (৪র্থ) একাধিক স্থলে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে। সুতরাং নাস্তিকের মতো ঈশ্বরের নাম শুনলেই তিনি 'উদ্যত মুষল' হতেন না এ একপ্রকার সুনিশ্চিত।

১২। চণ্ডীচরণের ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৪৩৫-৪৩৭

১৩। ঐ, পৃঃ ৫২০-৫২১

১৪। চণ্ডীচরণ, ঐ, পৃঃ ৫২৩

১৫। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয়

১৬। ১৮৫০ সালে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক থাকাকালীন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন সম্পর্কে শিক্ষাবিভাগের সম্পাদক মেইয়াট সাহেবকে যে রিপোর্ট পাঠান, তাতে স্পষ্টতঃ স্বীকার করেছিলেন' "True it is that the most part of the Hindu system in philosophy do not tally with the advanced idea of modern times," তাঁর মতে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা ইংরেজী শিখলে হিন্দুদর্শনের ভুলত্রুটিগুলি লক্ষ্য করতে পারবে, "Young men thus educated will be better able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy." পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনায় প্রাচীন হিন্দুদর্শন যে আধুনিক ভাবধারার ততটা উপযোগী নয় এবং এতে অনেক ভুলত্রুটি আছে এ বিষয়ে স্বাধীন মত প্রকাশ করতে বিদ্যাসাগর কুণ্ঠিত হন নি।

১৭। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে ব্যালাণ্টাইনের সংস্কৃত কলেজের পাঠসংস্কার সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর লেখেন যে, কতকগুলি বিশেষ কারণে তিনি সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন পড়াচ্ছেন বটে, কিন্তু এই দুই দর্শন-প্রস্থান সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন আস্থা নেই— "For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. That the Vedanta and Sankhya are false system of philosophy is no more a matter of dispute."

১৮। চণ্ডীচরণের ঐ, পৃঃ ৫২২

১৯। এ-বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মন্তব্য স্মরণীয়ঃ "স্বর্গের দেবতায় তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল জানি না; কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান জীবন্ত দেবের তুষ্টির জন্য আপনার ধর্মবুদ্ধিকে পর্যন্ত বলিদান দেওয়া সময়বিশেষে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন।" —'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', পৃঃ ১৮-১৯

২০। একবার বিদ্যাসাগর কাশীধামে গিয়ে মন্দিরের পুরোহিত-পাণ্ডাদের মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের কাশী বা বিশ্বেশ্বর মানি না।" ব্রাহ্মণেরা সক্রোধে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি মানেন?" তার উত্তরে তিনি সম্মুখে উপবিষ্ট জনকজননীকে দেখিয়ে বলেন,

"আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।"—বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৪৮৬

২১। পুরাতন প্রসঙ্গ (বিপিনবিহারী গুপ্ত সঙ্কলিত, কৃষ্ণলালের উক্তি), বিদ্যাভারতী প্রকাশিত নতুন সংস্করণ, পৃঃ ১৩১

২২। চণ্ডীচরণের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫২৪

২৩। চণ্ডীচরণের প্রাগুক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৫২৪

২৪. Sibnath Sastri—History of Brahmo Samaj, Vol. 1. P. 79

২৫. Calcutta Review, 1845

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

প্রথমভাগের নবরূপায়ণ : একটি প্রস্তাব

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা ওরফে বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ প্রথম প্রচারিত হয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙালী শিশুকে তার মাতৃভাষার বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অসংযুক্তবর্ণের বানান শেখানো ও সেই সঙ্গে গদ্যরচনা পড়তে শেখানোর উদ্দেশ্যে প্রারম্ভিক পুস্তিকা হিসেবেই এই বই পরিকল্পিত। শতাধিক বছর ধরে এই বই বাঙলায় শিশুশিক্ষার প্রথম পাঠের দায়িত্ব বহন করে চলেছে। বইটি লোক মুখে 'প্রথমভাগ' নামেই বিশেষভাবে পরিচিত।

প্রথমভাগ প্রকাশের কুড়ি বছর পরে যে ৬০ তম মুদ্রণ হয় সেই পুস্তিকাই সম্ভবত বিদ্যাসাগর কর্তৃক সর্বশেষবার পরিমার্জিত। এই সংস্করণে সংযুক্তবর্ণের বানান শেখাতে উদাহরণরূপে প্রযুক্ত হয়েছিল মোট ৩৯৬টি শব্দ। তারও বছরকুড়ি পরে বিদ্যাসাগরপুত্র পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন বইটির যেখানে যেরকম আবশ্যক বোধ করেছিলেন সেইমত নানাবিধ পরিবর্তন পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করেন। তখন বর্ণসংযোগের দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্যে সংগৃহীত শব্দের সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৫৩টি। এখন যে রিসিভারের সংস্করণ প্রচলিত তা প্রকৃতপক্ষে ঐ আদ্যোপান্ত সংশোধিত পুস্তিকারই অনুরূপ।

বিদ্যাসাগর মশায়ের আগে মদনমোহন তর্কালংকার ও আরও কেউ কেউ শিশুশিক্ষার্থীদের উপযোগী উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক পুস্তক লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের

সহজপাঠ প্রথমভাগ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে, বিদ্যাসাগরের বই প্রথম প্রকাশের পঁচাত্তর বছর পরে। সহজ পাঠের আগেই বেরিয়েছিল যোগীন্দ্রনাথ সরকারের হাসি-খুসি এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সচিত্র বর্ণপরিচয়। পরেও অনেক বই বেরিয়েছে। শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর পদ্ধতি নিয়ে ইতিমধ্যে প্রচুর গবেষণা পর্যালোচনা পরীক্ষানিরীক্ষাও হয়েছে। তার ফলে এখন রকমারি বই পাওয়া যায়।

তবু শিশুশিক্ষার্থীর পক্ষে মাতৃভাষা আয়ত্ত করার উপযোগী প্রাথমিক পুস্তক হিসেবে আজও বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগের পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলাকে কেউই অতিক্রম করতে পারেন নি ; শিশুদরদি ও কবিসুলভ মনের অধিকারী এক মার্জিত ব্যক্তিত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে-দুটি ক্ষুদ্রকায় পুস্তক রচনা করলেন এতকাল পরেও তা আদর্শস্থানীয় এবং সামগ্রিকভাবে অনুসরণযোগ্য। তবে ইতিমধ্যে কালব্যবধান অনেকটা হয়ে যাওয়ায় এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে ভাষাব্যবহারে বানানে ও লিপিতে প্রভূত পরিবর্তন ঘটার ফলে বিদ্যাসাগরের বই কিছুটা কালোপযোগীতা হারিয়েছে। আর তাই পিতৃঋণ স্বীকার করে তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুসারে বর্ণ-পরিচয় পুস্তকের নবরূপায়ণের আবশ্যক রয়েছে। বর্তমান আলোচনা শুধু বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ।

বিদ্যাসাগরের পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিত্ব ও কবি প্রতিভার পক্ষেই শিশুশিক্ষার উপযোগী অন্যতর সার্থক পুস্তক রচনা করা সম্ভব হয়েছিল। তবে শিশুকে সহজপাঠ প্রথমভাগ পড়ানোর আগে বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগ পড়িয়ে নেওয়া ভাল। বানান শেখার ব্যাপারে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার্থীর পক্ষে খুবই কাজের হবে। বর্ণগুলি চেনার পর বানানের ব্যাপারে বোধটুকু তৈরি হয়ে গেলেই সহজপাঠ প্রথমভাগ পঠনীয়। সহজ পাঠের চিত্রভূষিত পাঠগুলির, এবং সংলগ্ন কবিতাগুলির ত বটেই, ছন্দোময়তা শিশুশিক্ষার্থীর মনে আশ্চর্য আনন্দের সঞ্চার করে। ফলে মন সহজে আকৃষ্ট হয়, পড়া শিখতে স্বতই আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়।

অবশ্য সহজপাঠ প্রকাশের অনেক আগেই যদিও বিদ্যাসাগর প্রথমভাগকে সংযুক্তবর্ণ মুক্ত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অনবধানতায় 'ক্ষ' (= ক + ষ) এই যুক্তবর্ণ টিকে তাঁর বই-এ ঠাঁই দিয়েছেন। তাছাড়া ঐ বই-এ অষ্টমপাঠের সঙ্গে কবিতার মধ্যে 'স্বপন' শব্দে এবং দশমপাঠের সঙ্গে কবিতার মধ্যে 'প্রজাপতি' ও 'প্রদীপ' এই দুটি শব্দে যুক্তবর্ণ রয়ে গেছে।

বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের বই দুখানি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ভাষার

ভঙ্গিতে ও বানানে বাঙলাভাষার কেমন পরিবর্তন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবিত-কালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাঙলা বানানের সংস্কার করা হয়। চলতিভাষা বা প্রাকৃত বাঙলার আত্মার স্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ মেলে ধরেন তাঁর 'বাঙলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে। রাজশেখর বসু সংকলন করেন চলতিভাষার অভিধান। গত পঞ্চাশ বছর ধরে সাহিত্যে প্রকাশ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতিভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এখন সাধুভাষার ব্যবহার সংকুচিত হতে হতে প্রায় অন্তর্হিত। এক দশকের মত সংবাদ পত্রেও চলতি ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়েছে। লাইনো হরফের কল্যাণে লিপিসংস্কারকে ত বৈপ্লবিক বলা চলে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমভাগের নবরূপায়ণের প্রস্তাব।

প্রসঙ্গের শুরুতেই বর্ণমালার সামান্য সংস্কারের প্রয়োজন সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। বাঙলা স্বরবর্ণে 'ঌ' বর্ণ টি অকারণে জায়গা জুড়ে আছে বলে সেটি অবশ্যই পরিত্যক্ত হওয়ার যোগ্য। 'এ' বর্ণের বিকৃতি 'অ্যা'-র জন্যে হয়ত কালক্রমে নতুন স্বরবর্ণলিপি উদ্‌ভাবিত হবে।

ব্যঞ্জনবর্ণমালার বিন্যাসকে আর একটু বৈজ্ঞানিক রূপ দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। বর্গীয় বর্ণ ক থেকে ম উচ্চারণস্থান অনুযায়ী পাঁচটি সারিতে সাজানোর পর চারটি অন্তঃস্থ বর্ণ য র ল ব (যদিও বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব-র জন্যে বাঙলায় পৃথক পৃথক লিপির ব্যবস্থা নেই) একটি সারিতে, তারপর চারিটি উষ্মবর্ণ শ ষ স হ পৃথক সারিতে, বাঙলায় স্বতন্ত্র বর্ণ বলে স্বীকৃত ড় ঢ় য় ৎ এই চারটিকে পরবর্তী সারিতে এবং সবশেষে অযোগবাহ দুই বর্ণ ং ঃ এবং ঁ কে স্থান দেওয়া যেতে পারে।

আকারাদি যোগের ব্যাপারে এখন যেভাবে যেসমস্ত চিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে ভবিষ্যতে সেগুলিকে সংস্কার করে নেওয়ার প্রয়োজন হবে। কেবল আকার ঈকার উকার ঊকার ও ঋকার যোগের ক্ষেত্রে মূলবর্ণ টি লেখার পরই বিশেষ চিহ্নটি প্রযুক্ত হয়। অন্যক্ষেত্রে এই চিহ্ন প্রয়োগ বিধি অবৈজ্ঞানিক। 'কি' বলতে বোঝায় ক্ + ই, কিন্তু লেখার বেলায় ক-এর আগেই ইকার বসে যায়। ইকারের মত একার ঐকারেও একই ব্যাপার ঘটে। আর ওকার ঔকারে ত দুদিকে চিহ্নযোগের ব্যবস্থা। অনাগতকালে নতুন চিহ্ন নির্দিষ্ট করে সেগুলিকে মূলবর্ণের পাশে বা নিচে বা ওপরে বসানোর বিধান হবে নিশ্চয়। তখন শিক্ষার্থীর—বাঙালি ও অবাঙালি —সুবিধে ত হবেই, মুদ্রণের কাজও হবে সহজতর।

শিশুশিক্ষার্থীকে বানান শেখানোর জন্যে বিদ্যাসাগরের শব্দচয়নে ও বিন্যাসে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল। এমনকি শব্দগুলির স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণের তফাৎ বোঝাবার ব্যবস্থাও তিনি দিয়েছিলেন। তবে অনেকেই তাঁর বই-এ বিজ্ঞাপনটুকু পড়ে দেখার শ্রমস্বীকার করেন না বলে স্বরান্ত 'অজ' শব্দের সাদৃশ্যে সন্নিহিত হলন্তশব্দ 'আম' 'ইট' প্রভৃতি অকারান্তভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। শিশু প্রায়শ বিকৃত উচ্চারণ শিখতে বাধ্য হয় ভুলভাবে শিক্ষা পাওয়ার দরুণ।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ বিকৃত একার বা অ্যাকারের জন্যে আঁকড়িযুক্ত একার ('ে') প্রবর্তন করলেও তা অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার ফলে 'খেলা' 'যেমন' এইসব কথার প্রথম অক্ষর অ্যাকার হিসেবে উচ্চারিত না হয়ে অনেক সময় অশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তবে লাইনো হরফে সব একারই আঁকড়িযুক্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের বিধান মানার ব্যাপারে অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষার্থী যাতে বাঙলা ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারে তাই স্বরান্ত উচ্চারণের শব্দগুলিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার যে-পদ্ধতি বিদ্যাসাগরের বই-এ আছে তা অবশ্যই বজায় রাখা উচিত। যেমন, অত বড় বিবিধ কমনীয়—এই-সব স্বরান্ত শব্দের উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে প্রথমভাগে বিশেষ নির্দেশ অপরিহার্য।

আবার কিছু শব্দ আছে যেগুলির আদিবর্ণের উচ্চারণে অর্ধ ও-কারের ঝোঁক আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : অতি বই রবি করুণ পরিবেষণ। এ ধরণের শব্দগুলিকে উপযুক্তভাবে চিহ্নিত করতে পারলে ভাল হয়।

আর বিকৃত একার বা অ্যাকারযুক্ত শব্দগুলিকে যথাস্থানে পৃথক একটি গুচ্ছে সাজানো হলে এগুলি চিনে নিতে শিক্ষার্থীর সুবিধে হবে।

বানানশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর প্রথমভাগে যেসব শব্দ উদ্ধার করেছেন তা প্রায় সবই হয় তৎসম না হয় তদ্ভব। খাঁটি বাঙলা শব্দ যা মূলত সংস্কৃত নয় কিংবা সংস্কৃতমূল থেকে অনেক দূরে সরে আসায় রূপগত পরিবর্তন হয়ে গেছে এমন শব্দ (অমন আড়ি কাজ চোখ ডুব হইচই হাত) তিনি গ্রহণ করেননি বললেই হয়। 'জানালা' 'ঠিকানা' এইরকম কয়েকটি বিদেশি শব্দ আছে বটে, তবে ইংরেজি থেকে আগত কোনও শব্দ তিনি নেন নি। অথচ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এমন ধরণের শব্দ বই-এ থাকলে শিক্ষার্থী তা দেখে যেমন আত্মীয়তা অনুভব করবে তেমনি পড়া শিখতেও তার ভাল লাগবে। অবশ্য সুপ্রচলিত শব্দের পাশাপাশি কিছু অল্প

পরিচিত শব্দ যেগুলির বানান- বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা দুরূহ তাও থাকা চাই। তাহলে একদিকে শিশুর কল্পনাশক্তি অন্যদিকে তার মানসিক পরিণতিতে সহায়তা করা হবে।

যেসব শব্দ বাঙলায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় তার বেশির ভাগই দুই বা তিন অক্ষরবিশিষ্ট। স্বভাবতই বানান শেখানোর ব্যাপারে এই দুই ও তিন অক্ষরের শব্দই বেশি আসবে। তাই বিদ্যাসাগরের আদর্শে বানানের বিন্যাসে দুই ও তিন অক্ষরের শব্দগুচ্ছ বজায় রাখা উচিত। তবে চার ও পাঁচ অক্ষরের শব্দের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সেগুলিরও কিছু উদাহরণ সাজানো ভাল। ফলে মাতৃভাষার বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে ধারণাও শিশুর গড়ে উঠতে পারবে।

বিদ্যাসাগরের আদর্শ অনুসরণ করে ক্রমিকভাবে আকার ইকারাদি বানান শেখানোর পদ্ধতিই গ্রহণীয়। তবে আকারাদি যোগ শেখানোর সময় প্রতিক্ষেত্রে নির্বাচিত শব্দগুলিকে যদি বর্ণমালার ক্রম রক্ষা করে বিন্যাস করা হয় তাহলে শিশুর মনে বর্ণমালা সম্পর্কে বোধটি আপনা থেকেই সুগ্রথিত হয়ে যাওয়ার সুবিধে হবে। প্রতিবার এটি ফিরে ফিরে আসার ফলে চোখ ও মন অজানিতে একটি শৃঙ্খলা আয়ত্ত করে ফেলবে।

দুই তিন চার ও পাঁচ অক্ষরের শব্দগুলি আলাদা আলাদা গুচ্ছে বিন্যস্ত করে প্রতিটি গুচ্ছে বর্ণানুক্রম মানা ভাল। তাছাড়া, দু-অক্ষরের শব্দে আকারাদি যোগ করার সময় প্রথমে শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে, তারপরে শব্দের প্রথম বর্ণে এবং তারও পরে শব্দের দুটি বর্ণেই আকারাদি যুক্ত হলে বানান শেখার সুবিধে হতে পারে। উদাহরণ দিয়ে বলা চলে, দুই অক্ষরবিশিষ্ট আকারযুক্ত শব্দগুলি 'কলা' 'কাল' 'কালা' এইভাবে তিনটি আলাদা আলাদা পর্বে বিন্যাস করা সম্ভব। দু-এর বেশি অক্ষরসমন্বিত শব্দের বেলায়ও এই বিধি প্রযোজ্য হতে পারে।

বাঙলায় কিছু সংখ্যক একাক্ষর শব্দের ব্যবহার আছে। সেগুলির জন্যে বিশেষ একটি গুচ্ছ রাখলে মন্দ হয় না।

এখন লাইনো হরফ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে গৃহীত হওয়ায়, উকার ঊকার ও ঋকার যোগে গ র শ হ বর্ণের বিশিষ্ট রূপ শেখাবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলা চলে। তবে আকারাদি স্বরবর্ণের চিহ্ন যোগ করার ফলে ব্যঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন অক্ষর যে-রূপ পেয়ে থাকে তার একটি পরিপূর্ণ তালিকা বই-এ থাকলে শিশুশিক্ষার্থীর ভাল হবে।

বাঙলা বানানের অনেক বিবর্তন রূপান্তর ও সংস্কার হয়েছে। নানা কারণে বেশ কিছু বানানের দ্বৈতরূপ প্রচলিত থাকায় শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর যেখানে 'বাড়ী' বানান করেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে লেখেন 'বাড়ি'। বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগে 'ঊষা', রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠে 'উষা'। তাছাড়া কুম্ভীর/কুমির ছুটী/ছুটি পাখী/পাখি ভীড়/ভিড় এধরণের অনেক উদাহরণ আছে। যেহেতু বাঙলায় স্বতই হ্রস্ব উচ্চারণের দিকে প্রবণতা তাই যেসব ক্ষেত্রে দুরকম বানানই সিদ্ধ সেখানে হ্রস্ব বানানকে গ্রহণ করাটাই বিধেয়।

পূজা পূর্ব ধূলা প্রভৃতি শব্দ খাঁটি বাঙলায় রূপান্তরিত হয়েছে পুজো পুব ধুলো। এই ধরণের শব্দেরও প্রথমভাগে জায়গা হওয়া চাই।

ঔষধ তৈল তৈয়ারী নূতন এইসব শব্দ চলতি ভাষায় উচ্চারিত ও লিখিত হয় ওষুধ তেল তৈরি নতুন। কাজেই শব্দগুলিকে শেষোক্ত রূপেই প্রথমভাগে নেওয়া চলে। তেমনি আল্পনা পেন্সিল পর্দা ভর্তি হাল্কা শব্দগুলি আলপনা পেনসিল পরদা ভরতি হালকা এইভাবে লেখা হয় বলে সেগুলিও অযুক্তবর্ণের বানান হিসেবে প্রবেশাধিকার পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে মূলানুগ বানান (যেমন, ইশারা জিনিস মুশকিল সাদা) শেখানো উচিত।

বর্ণের সঙ্গে অনুস্বার ও বিসর্গ যোগ হলে প্রকৃতপক্ষে সংযুক্তবর্ণের উদ্ভব হয় এবং তখন সেই বর্ণের প্রথমভাগে অর্থাৎ অসংযুক্তবর্ণের পুস্তকে বর্জিত হওয়ার কথা। বিদ্যাসাগর যদিও প্রাচীন স্বরবর্ণমালা থেকে অং অঃ উচ্ছেদ করে ব্যঞ্জনবর্ণ-মালায় যথাস্থানে তাদের আসন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ং-যোগ বা ঃ-যোগকে প্রথমভাগ থেকে বাদ দেন নি। হয়ত এদের ব্যঞ্জনস্বভাবটা বর্ণের রূপে প্রকট নয় বলেই এই ব্যবস্থা এতকাল টিকে আছে। প্রচলিত রীতির দোহাই পেড়ে প্রথমভাগে এদের অধিকার এখনও কায়েম থাকতে পারে, তবে সুযোগমত এগুলিকে স্বজাতীয়দের মধ্যে পুনর্বাসিত করাটা সংগত হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে, ঋকার যদিও স্বরবর্ণযোগেরই উদাহরণ বাঙালির উচ্চারণে তা বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনাত্মক। ম্রিয়মান ও মৃত শব্দ দুটির আদ্যক্ষরের উচ্চারণে কোনও তফাৎ বোঝার উপায় নেই। একারণেই পৈতৃক শব্দটির পৈত্রিক রূপ অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।

সম্ভবত এইসব লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহজপাঠ প্রথমভাগে অনুস্বার বিসর্গ ও ঋকার সংযোগে কোনও শব্দ ব্যবহার করেন নি। সহজপাঠ প্রথমভাগের শেষ পাঠটিতে শুধু চন্দ্রবিন্দুযোগের প্রয়োগ আছে। অনুস্বারযোগের উদাহরণ দিয়েই সহজপাঠ দ্বিতীয়ভাগের শুরু।

বাঙলায় অনুস্বারের ব্যবহার খুবই গোলমেলে। সংস্কৃতে যদিও পদমধ্যস্থ 'ম্'-এর বিকল্প 'ং', বাঙলায় তা হয়ে গেছে 'ঙ'-র বিকল্প। রং/রঙ বাংলা/বাঙলা এই সব শব্দ লেখা হয়। কেউ কেউ আবার ভুল করে 'আশঙ্কা' 'ইঙ্গিত' প্রভৃতি বানানকে ভেঙে 'আশংকা' 'ইংগিত' এভাবে অশুদ্ধরূপে লিখে থাকেন। হিন্দিভাষায় অবশ্য এ ধরণের প্রয়োগ যথেচ্ছ। হিন্দিতে 'মঞ্চ' 'মণ্ডপ' শব্দেরও বানান লেখা হচ্ছে 'মংচ' 'মংডপ'। তবে বাঙলায় যেহেতু ং-এর সঙ্গে আকার ইকার প্রভৃতি জুড়তে গেলে ং-কে হটিয়ে ঙ-র শরণ নিতেই হয় (রঙের রঙিন বাঙালি) তাই খাঁটি বাঙলায় বরং প্রচলিত শব্দগুলিতে ং-এর জায়গায় 'ঙ' ব্যবহার করাই বিধেয়।

অলংকার সংগীত সংঘ প্রভৃতি শুদ্ধশব্দকে অবশ্য অনুস্বারযোগের উদাহরণরূপে প্রথমভাগে নেওয়া চলতে পারে।

তেমনি, উদ্‌বেগ উদ্‌বোধন এই ধরণের শব্দে আপাতভাবে সংযুক্তবর্ণ অনুপস্থিত বলে এইসব শব্দও প্রথমভাগে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

বর্ণসংযোগের বিবিধ রূপ ও বিন্যাসকৌশল শেখানোর জন্যে শব্দের সংখ্যা যথাসম্ভব সীমিত করে ধ্বনিসৌকর্যের দিকে নজর রেখে শব্দ সাজাতে পারলেই ভাল হয়। তবে বানান ঠিকমত শিখতে গেলে তা আবৃত্তি করার চেয়ে লিখে অনুশীলন করাই উচিত। তবেই স্মৃতি নির্ভুল ও দীর্ঘ স্থায়ী হতে পারবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে বর্ণযোজনা পুস্তকের পরিশিষ্টে কিছু অতিরিক্ত সুনির্বাচিত শব্দ সংকলন করে দেওয়া যেতে পারে।

ভাষা ও বানান শেখার ভিত্তি তৈরি হবে যে প্রারম্ভিক পুস্তকে তা রচনা করতে কতটা যত্ন ও চিন্তা লাগে তার পরিচয় বর্ণে বর্ণে রয়ে গেছে বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগে। তাঁর বই-এ সন্নিবেশিত পাঠগুলিও বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য। প্রথমে শুধু বিশেষ্য-বিশেষণ দিয়ে দু-অক্ষরের দুটি করে শব্দের ছোট ছোট বাক্য,

তারপর ক্রিয়ার ব্যবহার, পরে আসতে আসতে ছোট থেকে বড় বড় বাক্যে বিভিন্ন ক্রিয়ার কালের বাক্যগঠন প্রণালীর বিন্যাস এবং পরে ক্রমশ মস্ত মস্ত বাক্যের উদাহরণ তিনি সযত্নে সাজিয়ে দিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর জীবিতকালে প্রথমভাগের যথোচিত পরিমার্জনা করেছিলেন। আজ বেঁচে থাকলে প্রথমভাগের নবরূপ দিতে তিনি নিশ্চয়ই প্রয়াসী হতেন। সেটা ছিল একান্তভাবে তাঁরই অধিকার।

প্রথমভাগ বিদ্যাসাগরের অনন্য কীর্তি এবং বাঙালি জাতির স্থায়ী সম্পদ। সেখানে হস্তক্ষেপ করার ধৃষ্টতা কারও থাকা উচিত নয়। তবে তাঁর আদর্শের অনুসরণ করে কালোপযোগী নতুন বই-এর পরিকল্পনা আজ করা যেতে পারে।

এতক্ষণ সেই প্রস্তাবেরই আলোচনা হল। শব্দসংকলন ও বিন্যাসের ব্যাপারে অবলম্বনযোগ্য পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

এই প্রস্তাবের অঙ্গস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শুধু বর্ণমালা শেখানোর জন্যে পৃথক একটি রঙিন ছবিওয়ালা বই থাকলে ভাল হয়। এরপর হবে বর্ণযোজনা শিক্ষা। অপর একটি খণ্ডে কিছু পাঠ, গদ্য পদ্য দুইই, থাকতে পারে। এই অংশে নিতান্ত উপদেশমূলক রচনার বদলে অযুক্তবর্ণের কিছু নির্বাচিত ছড়া এবং কথামালার মত বই থেকে কয়েকটি গল্প চলতি ভাষায় ও অযুক্তবর্ণে উপযুক্তভাবে রূপান্তর করে দেওয়া যেতে পারে। লৌকিক ছড়ার মধ্যে বাঙালির মেজাজ ও খাঁটি বাঙলাভাষার স্বাদ পাওয়া যেমন শিশুর পক্ষে সম্ভব হবে তেমনি সহজ ছন্দের দোলা ও চিত্রকল্প তার মানসিক খোরাক জোগাবে। পশুপাখি নিয়ে লেখা নিটোল গল্পও শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শেখানোর অভীষ্টলাভে সহায়ক হবে।

প্রস্তাবিত নবরূপ প্রথমভাগের বর্ণসংযোগ অংশের একটি খসড়া এর পরে যোজিত হল।

সরল বর্ণযোজনা

অত* আজ আর কই জল ঝড় পথ ফল, বই মন বড়* হয়

অমন আদর ঈষৎ উদয় কলম খবর গগন জগৎ বয়স মগজ লবণ সহজ

উৎসব কলরব জনগণ হইচই

অনবরত॰ সরগরম

(*স্বরান্ত উচ্চারণ, †আদিবর্ণের উচ্চারণে অর্ধ ও-কারের ঝোঁক)

আকারযোগ

আশা উষা কণা কথা ছড়া পড়া মজা সভা

কাজ গাছ ডাক নাম পাঠ মাঠ রাত হাত

ছাতা ঢাকা পাকা মাথা

উতলা একদা সহসা

আকাশ উদার সবাই †সমান

কাগজ কাপড় নাটক ভাষণ

ইশারা ধারণা বাঙলা

বাগান বানান 'যাচাই সানাই

জানালা পাহারা

আলপনা আবদার উপহার ঐকতান

আশকারা সাবধান

খাপছাড়া পাঠশালা

ধারাপাত ঝালাপালা

চমৎকার মানানসই

ইকারযোগ

†অতি আড়ি আমি ইতি ঋষি †গতি †ছবি †মণি, †গদি †রবি

ঠিক দিক ভিড় মিল

চিঠি তিথি

আশিস উচিত †শরিক

কিরণ নিয়ম †সমিতি

জিনিস শিবির

অগণিত॰ পরিচয়

নিরবধি বিকশিত॰

ছিনিমিনি নিরিবিলি

অবিচলিত॰ চিকিৎসক

ঈকারযোগ

†জয়ী †ধনী †নদী

তীর দীপ ধীর নীড় বীর শীত

অধীর †গভীর †নবীন

জীবন নীরব শীতল

উপনীত∘ কমনীয়∘

আদরণীয়∘

উকারযোগ

†অণু ঋজু †তনু †লঘু

খুব গুণ চুপ ডুব পুব যুগ

গুরু শুরু

অবুঝ আগুন ওষুধ †চতুর †নতুন

মুখর

দুপুর পুতুল মুকুল

উৎসুক করপুট ভরপুর

ঝুমঝুম হুড়মুড়

রুণুঝুণু

অণুরণন

ঊকারযোগ

কূল দূর মূঢ়∘ রূঢ়∘

ধূসর ভূষণ

অপরূপ

ঋকারযোগ

তৃণ* দৃঢ়* ধৃত*

অমৃত* আদৃত*

বৃহৎ হৃদয়

উপকৃত*

একারযোগ

তবে বটে

খেত জেদ চের তেজ তেল বেশ মেঘ শেষ

ছেলে মেয়ে

অনেক আয়েশ কলেজ

কেবল চেতন লেখক

উদ্বেগ হেরফের

রঙবেরঙ

বিকৃত একার (অ্যাকার) যোগ

কেন॰ যেন॰ হেন॰

খেলা ঠেলা বেলা মেলা

কেমন তেমন যেমন

ঐকারযোগ

জৈব॰ নৈশ॰ শৈল॰

বৈঠক শৈশব সৈকত

ওকারযোগ

আলো চোখ জোর ভোর রোদ লোক

অশোক আমোদ কঠোর কোমল গোপন

দোসর মোহন লোচন

আয়োজন মনোরম

তোড়জোড় শোরগোল

উদ্‌বোধন

ঔকারযোগ

আদৌ গৌর দৌড় ফৌজ মৌন* সৌর*

কৌশল গৌরব দৌলত যৌবন সৌরভ

ং-যোগ

এবং বরং

অংশ* বংশ* হংস*

সংকট সংযম

সংকলন

ঃ-যোগ

দুঃখ* দুঃসহ* দুঃসাহস

দুঃশীল নিঃসহায়

ঁ-যোগ

চাঁদ বাঁক বাঁশ শাঁখ

আঁচল আঁধার

আঁখি কুঁড়ি ছোঁয়া

এক অক্ষরের শব্দ

গা চা তা না পা বা মা যা

কি ঘি ছি ঝি

কে যে সে হে

মিশ্র

গাড়ি পাখি বাড়ি মাটি হাসি

বাণী শিশু

নাতি রীতি

ছুটি পুজো

দেরি নৌকো

আকৃতি ইংরেজি কাহিনী

কুটির কৌতুক চৌচির নিপুণ পৃথিবী পৈতৃক বাঙালি †মনীষা

†অনুকূল ইদানীং কৌতূহল খেলাধুলো চিৎকার পূজনীয়॰ বিবেচনা ভারতীয়॰

মাতৃভাষা রূপকথা লেখাপড়া শারীরিক হাতিয়ার হিতৈষণা †অনুশীলন নিরুদ্বেগ

†পরিবেষণ সাহসিকতা

অপস্রিয়মান পারমাণবিক

অনুকরণীয়॰

গৌর পাল

আমাদের নবজাগৃতি ও বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি

প্রস্তবনা ॥ ১

আমাদের নবজাগৃতি আন্দোলনের এক বিশিষ্টতম স্থান অধিকার ক'রে আছেন মহামানব বিদ্যাসাগর। তাঁর আবির্ভাবের দেড়শো বছর অতিক্রান্ত। এই সময়ের মধ্যে, তাঁর সম্পর্কে প্রচুর তথ্য ছাড়া, তাঁর গুণগুলির একটিও আমাদের সমাজ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতে সমর্থ হয় নি। আমরা সভাসমিতিতে তাঁর সম্পর্কে গতানুগতিক বিশেষণ প্রয়োগ করে বড়জোর ভাঙা মূর্তি নতুন করবার জন্যে কিছু চাঁদা দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছি মাত্র, সামাজিক বা ব্যক্তিগত জীবনাচরনে তাঁকে স্বীকার ক'রতে অপারগ হয়েছি। কি সংস্কার কর্মের, কি অদম্য পৌরুষের, সর্বোপরি কি মনুষ্যত্ব-বোধের অনন্য আদর্শ হয়ে আছেন তিনি। আমাদের সমাজে যতটুকু প্রগতি সম্ভব হয়েছে তার পিছনে রয়েছেন বিদ্যাসাগর। একালের কবি দিনেশ দাস গান্ধীজী সম্বন্ধে বলেছিলেন : 'তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা—কোনখানে রাখবো প্রণাম ?' বিদ্যাসাগরের সর্বত্র চারিতা সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য নয় কি ?

বিদ্যাসাগর অবশ্যই দেবতা নন। এই পৃথিবীর এক মহৎ সন্তান। জন্মসূত্রে আমাদের পিছিয়ে পড়া মধ্যযুগীয় সমাজের একজন প্রকৃত মুক্তি যোদ্ধা। একালের মতো মুক্তি যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ নামকরা অভিনেতা মাত্র নন। শিশু রবীন্দ্র-নাথের কল্পজগতে তিনিই আদি কবি। 'বর্ণ পরিচয়ে'র 'জল পড়ে-পাতা নড়ে'-যার

মধ্যে কারো কারো মতে প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় প্রথম আধুনিক কবিতার রূপ লুকিয়ে আছে, তা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরেরই,—না তাঁর অন্তরঙ্গ কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কারে রচনা? —এ সমস্যা নিয়ে বর্তমানে গবেষক মহলে যতই তর্ক-বিতর্ক চলুক, তাতে বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথের আপাতত কোন ক্ষতি বৃদ্ধির আশঙ্কা নেই। তবে বিদ্যাসাগর যে যুগপৎ বাঙলা গদ্য ভাষার এবং সামাজিক গতি পথ নির্দ্ধারণে 'বিপ্লবী ছন্দের' আদি কবি, তদ্বিষয়ে দ্বিমত পোষণের অবকাশ কই? একথা সঠিক যে তিনি কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক ছাড়া আদৌ বাঙলা ভাষায় পদ্য রচনা করেন নি। কিন্তু অধুনা সার্বজনীন মত হ'ল পদ্য লেখক মাত্রই কবি নন এবং পদ্য ছন্দই একমাত্র ভাব প্রকাশোপযোগী ছন্দ নয়। পরন্তু তাঁর গদ্যে 'অনতিলক্ষ্য ছন্দঃ স্রোত' আবিষ্কৃত হওয়াতেই কিংবা সেই গদ্য ভাষায় প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ সঞ্চারিত হওয়াতেই যে তিনি কবি আখ্যা পাওয়ার অধিকারী হয়েছেন, তাও নয়। তিনি এযুগের দৃষ্টিতে সংস্কারান্দোলন তথা তদানীন্তন বিপ্লবী কর্ম সাধনার মারফৎ আমাদের বদ্ধ-জীবন-জলাশয়ে যে নব ছন্দের তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি ক'রতে চেয়েছিলেন তা ই তাঁকে কবি আখ্যার অধিকারী ক'রেছে। তাঁর বিপ্লব সাধনা কদাচ সোচ্চারিত অনৃত-ভাষণে অপবিত্র বা অকারণ হত্যাকাণ্ডে রক্তাক্ত নয়। তাঁর বিপ্লব সাধনা আমাদের ভণ্ড সমাজ-মানসে গুণগত পরিবর্তন ঘটানোর অদম্য প্রয়াসের নামান্তর। কিন্তু স্বীকৃত সত্য এই যে, এই অর্থে তিনি অদ্যাবধি যৎপরোনাস্তি ব্যর্থতার বোঝা বহনকারী মাত্র। প্রত্যেক মহৎ কবির যেমন জীবন-সমীক্ষক বাণী থাকে মানব সমাজের প্রতি; তেমনি এই মহা-জীবন-কবির, আমাদের ভণ্ড সমাজের প্রতি, শ্রেষ্ঠ দান এই যে,—জাড্য এবং শাঠ্য পরিত্যাগ পূর্বক কর্মে এবং বাক্যে ঐক্য যতনে লব্ধ হয় মনুষ্যত্বের মাণিক্য রতন।

যিনি প্রকৃত বিপ্লবী, তাঁর কর্মধারা কখনোই একটি মাত্র উৎসুক প্রয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অসম্ভব। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। তাঁর প্রথম আবির্ভাব মাতৃভাষার মুক্তি দাতা রূপে। সংস্কৃত এবং ফার্সীর অকারণ পল্লব-গ্রাহিতা থেকে কিশোর বাঙলা গদ্যকে বাঁচিয়ে তিনিই প্রথম যৌবনে উত্তীর্ণ হবার প্রকৃত পথ নির্দ্ধারণ ক'রে দিয়ে গেলেন। তাঁর রচনাতেই সর্বপ্রথম একেবারে সুস্পষ্ট-ভাবে যুগপৎ তরঙ্গ সঙ্কুল যুগধর্ম এবং অদম্য যোদ্ধ-বেশী ব্যক্তিমানদের পরিচয় পাওয়া গেল। শ্রদ্ধেয় সমালোচকদের এই সিদ্ধান্ত সঠিক যে বিদ্যাসাগরই প্রথম সাহিত্যিক যিনি নিছক সারস্বত প্রেরণায় কলম ধরেন নি,[১] অথচ তাঁর পৌরুষ দৃপ্ত সুকঠিন ব্যক্তিত্বের অন্তরালে নিয়ত সঞ্চরণশীল দয়ার্দ্র-চিত্ত শিল্পী-মনটি, সুবিস্তৃত কর্মযজ্ঞের

একমুখী উদ্দেশ্যকে অতিক্রম ক'রে স্রষ্টার অজ্ঞাতেই প্রকাশিত হ'য়ে পড়েছে।

সেকালে 'বিদ্যাসাগরী ভাষা' বলে একটা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত জনসমাজে প্রচলিত ছিল। স্বভাবতই বিদ্যাসাগরের ভাষারীতির সম্যক পরিচয় এর মধ্যে অনুপস্থিত। কেন না, মানবতাবাদী দ্রোহ বুদ্ধির প্রতি এই মন্তব্য অক্ষম বৈনাশিকী বুদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিহাস মাত্র। মৃত্যুঞ্জয় অনুসারী পণ্ডিতদের দ্বারা এর প্রথম প্রচলন ঘটলেও সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সংক্রান্ত আলোচনাকে কেন্দ্র করেই এই ধারণার ব্যাপক প্রচার ঘটে। দৃশ্যতঃ মৃত্যুঞ্জয়-পন্থী পণ্ডিতমণ্ডলী বিদ্যাসাগরের ভাষা সংস্কারকে আত্মস্থ ক'রতে পরাঙ্মুখ হ'লেও তাঁদের প্রভাব সমসাময়িক ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে ছিল না ব'ল্লেই চলে। বিকল্পে, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের আধিপত্য অবিসংবাদিত। এ যুগের শ্রদ্ধেয় সমালোচকবৃন্দ বিশ্লেষণান্তে প্রমাণ ক'রেছেন—সীতার বনবাসের সঙ্গে শকুন্তলার বেনামী রচনার সঙ্গে আত্মচরিতের, প্রভাবতী সম্ভাষণের সঙ্গে ভ্রান্তি বিলাসের এবং বর্ণ পরিচয়ের সঙ্গে বেতাল পঞ্চবিংশতির ভাষারীতির আসমান-জমিন ফারাক, এবং সেই সূত্রে 'বিদ্যাসাগরী ভাষারীতি'র ক্রমপরিণতি। প্রকৃত প্রস্তাবে, বঙ্কিমকথিত 'বিষয়ের অনুরোধে', প্রয়োজন সাপেক্ষে নানা শৈলী সোপানে আরোহণ-অবরোহণে তিনি সার্থক রূপদক্ষ। ফলতঃ কোথাও তাঁর ভাষা সংগ্রামী চেতনা-স্পর্শে তীব্র দ্যুতিময়, কোথাও আদিকবির নিবিড় বিষাদে নিরন্তর ছায়াছন্ন, কোথাও ব্যঙ্গ-পরিহাসে অনায়াস সরস অথচ অব্যর্থ লক্ষ্য ভেদী এবং সচেতন মানবপ্রেমে বিচলিত স্বচ্ছসলিলা। সমাজ সংস্কারের ভাষ্যরূপ তাঁর ভাষা পরীক্ষা-নিরীক্ষার টানা পোড়েনে সতত সঞ্চরমাণ,—কোথাও স্থাণু নয়। প্রকৃত বিপ্লবীর ধর্মই হল কোনো কিছু গ্রহণ-বর্জনে একমাত্র অবলম্বনীয় বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা বিচার বিশ্লেষণ। এটি নবজাগৃতিরও সর্বস্বীকৃত সর্বপ্রধান লক্ষণ বটে। এমত, অনস্বীকার্য যে, বিদ্যাসাগরের ভাষারীতির মধ্যে, ক্লাসিক্যাল পরিবেশোপযোগী বাক্য গাম্ভীর্য সহ ধ্বনি মাধুর্যের প্রাধান্য বিস্তৃত।

মার্কসের অবতারণা ব্যতিরেকে যথা লেনিনের ইতিহাস, কিংবা গান্ধীজীর অনুল্লেখে যেমন নেহরুজীর ইতিহাস অসম্পূর্ণ তদনুরূপ রামমোহনের অনুপস্থিতি বিদ্যাসাগরের পরিচয় দানে অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক। বীরসিংহ সন্তান রেনেসাঁরও মহত্তম দান। রামমোহনের একমাত্র যোগ্য উত্তর সাধক। ইউরোপীয় রেনেসাঁর ইতিহাসকর J. A. Simsons উবাচ, "It was scholarship first and last,

which revealed to man the wealth of their own minds, the dignity of human thought, the value of human speculation, the importance of human life regarded as a thing apart from religious rules and dogmas."—রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কর্মের মধ্যে ধ্রুবপদ স্বরূপ এই কথায় বারংবার প্রতিধ্বনিত। পূর্বসূরী রামমোহন এশিয়া খণ্ডের প্রথম আধুনিক মানুষ,—বাহ্যিক পারিপাট্যে নন, মানসিক গঠনের বিন্যাসেই। তিনি কেবল স্বসমাজের সংস্কার-মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত নন, সেই সঙ্গে সারা দুনিয়ার বঞ্চিত এবং পরাধীন মানবাত্মার তাবৎ মুক্তিসংগ্রামের বিশ্বস্ত সহযাত্রীও বটেন। নেপল্‌সের মুক্তিযুদ্ধের ব্যর্থতায় ব্যথিত রামমোহন নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেন যে নেপেল্‌সের জনযুদ্ধ তাঁরও ব্যক্তিগত যুদ্ধ, তাদের পরাক্রান্ত শত্রু তাঁরও শত্রু, তাদের পরাজয় তাঁরও পরাজয়। তুরস্কের অধীনতা পাশ থেকে মুক্তি প্রয়াসী গ্রীসের যুদ্ধে, ঔপনিবেশিক স্পেনের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকার গণ-অভ্যুত্থানে এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রের জন্য ফরাসী নাগরিকদের সঙ্গত সংগ্রামে তিনি মুক্ত-কণ্ঠ-সমর্থক। তিনি ঘোষণা করতে সঙ্কুচিত হ'ন নি যে মুক্তকামী-জনগণের সুখে দুঃখে তিনি কদাচ নির্বিকার থাকতে পারেন না পরন্তু মুক্তি পিয়াসী জনগণের (জনতা দৈত্যের নয়) জয় অবশ্যম্ভাবী। রামমোহনের এই মানবিক আন্তর্জাতিকতাবাদের স্বীকৃতি ব্রেজিলের স্বাধীন মানুষ দিয়েছিলেন তাঁদের সংবিধানকে রামমোহনের নামে উৎসর্গ করে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় যে তখনও 'বৈজ্ঞানিক' আন্তর্জাতিকতাবাদের পথিকৃৎ 'সাম্যবাদী ইশ্‌তাহার' অপ্রকাশিত। এই সূত্রে আরও কথিত যে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদকল্পে আমেরিকায় যে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল তার আহ্বায়কদের তালিকায় রামমোহনের নাম সগৌরবে শোভা পেয়েছে।

রামমোহনের জন্ম দু'শো বছর আগে, যখন পরবর্তীকালের বহু বিপ্লব-বিলাসীর প্রপিতামহগণ মাতৃজঠরে ভূমিষ্ঠ লগ্নার্থ অপেক্ষামান। ইদানীং এই মহাপুরুষবৃন্দ রামমোহনকে 'প্রগতির দুষমণ' ও সামন্ততন্ত্রের 'তল্পীবাহক' হিসেবে চিত্রিত করার খোশ্‌-খেউড়ে মত্ত হয়েছেন। অন্যদিক থেকে একদল পণ্ডিতম্মন্যব্যক্তি গবেষণার নামে প্রচার করতে চাইছেন যে 'সতীদাহ'র মতো হিন্দু ঐতিহ্য বিরোধী সংস্কার কর্মে রামমোহনের কোনো আন্তরিক প্রয়াস সংযুক্ত ছিল না। এ ব্যাপারে প্রকৃত উদ্যোগী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে, তিনি, বাধ্য হয়ে কিংবা ব্যক্তিগত কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশায়, সহযোগিতা করেছিলেন মাত্র। এই সূত্রে কেউ কেউ তাঁর উপার্জন সূত্রের

প্রতিও কটাক্ষ করেছেন। কারো মতে রামমোহনের তুলনায় ডিরোজিও শিষ্যকুল অধিকতর প্রগতিশীল। কেননা রামমোহন তাঁর সংস্কার কর্মকে ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। ধর্মের আশ্রয়, কখনও পরিত্যাগের চিন্তা করেন নি। কিন্তু একথা কি অস্বীকার করা যায় যে যুক্তিবাদী ডিরোজিও-শিষ্যদের অনেক আগেই রামমোহন মানবতাবাদের যে পতাকাকে উচ্চে তুলে ধরেছিলেন তা যুক্তির সূক্ষ্ম বুনোটে টেকসই। কেউ ভাবেন, রামমোহনকে ইংরেজ উপনিবেশিকদের সহযোগী হিসেবে অপপ্রমাণ করতে পারলে নতুন কথা বলা হবে বুঝি। কিঞ্চিৎ কাণ্ড-জ্ঞান সম্পন্ন নিতান্ত বালখিল্যেরাও জানে যে রামমোহন এদেশে ইংরেজ শাসনের সহায়তা করে ছিলেন মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী আঁধার থেকে আলোয় আসার তাগিদে, সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের হাত থেকে চাষীদের মুক্তিলাভের আশায়।২ তাছাড়া একথা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের জ্ঞাত যে রামমোহনের কালে জার্মান এবং ফরাসীদের বাদ দিয়ে একমাত্র ইংরেজরাই ফিউডাল-রোগ মুক্ত এক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করতে পেরেছিলেন। দূরদর্শী রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন যে সামন্ততান্ত্রিক স্পেনের উপনিবেশিকতা নির্ভেজাল শোষণ ছাড়া আর কিছু দিতে সমর্থ নয়, কিন্তু গণতান্ত্রিক ইংরেজ শোষণ করলেও তাদের অজান্তে তারা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ব্রহ্মাস্ত্র (যুক্তিগামিতা এবং সংহতিবোধ) চিনে নিতে সাহায্য করবে। এই দিক থেকেই তিনি প্রতিপদে ইংরেজ শাসনের প্রতিকূলতা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু অন্যায় কর্মের নির্ভীক সমালোচনায় কুত্রাপি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তিনি 'মুদ্রাযন্ত্র' আইনের প্রতিবাদ কল্পে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তৎ-সম্পাদিত ফার্সী সংবাদপত্র 'মিরাৎ-উল-আখবার' এর প্রকাশ স্থগিত রাখেন। এছাড়া ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ যে দুজন বাঙালী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সচেতনভাবে জোরালো প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিলেন তাঁদের একজন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ডিরোজিও শিষ্য হলেও অন্যজন, তাঁরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ছিলেন রামমোহনের অনুগামী। রামমোহন সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পরিবর্দ্ধিত হয়েছিলেন, তাই, বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বুঝেছিলেন যে, আমাদের সমাজ বিকাশের ধারায় প্রগতিশীল পদক্ষেপের আদিতেই ধর্মবর্জনের আহ্বান, হঠকারী এবং নিস্ফলা ইউটোপীয়ান তত্ত্বে পর্যবসিত হতে বাধ্য। সুতরাং তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হল ধর্মকে লোকাচারের বা কুসংস্কারের হাত থেকে রক্ষা করা এবং তাকে প্রগতি আন্দোলনের প্রাথমিক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা। ধর্মভীরু জাতিকে ধর্ম-সংস্কারের মারফৎ সচেতন করে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং বাস্তব। সুতরাং বলা চলে

তাঁর ধর্মসংস্কারান্দোলন সমাজ সংস্কারেরই পরিপূরক, যার ফলে এতদ্দেশীয় প্রজাসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ত্বরান্বিত হবে। একটু ভিন্নভাবে হলেও, উত্তরাধিকার সূত্রে এ উপলব্ধি ঈশ্বরচন্দ্রেরও। রেনেসাঁর জনক রামমোহনের হাত থেকে আমরা অকৃতজ্ঞ চিত্তে যে সব দান গ্রহণ করেছি তার অন্যতম হল ব্রাহ্মসমাজ যার মাধ্যমে তিনি হিন্দু-মুসলিম-খৃষ্টানের সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধির মূল শিকড়টি সমাজগর্ভ থেকে উপড়ে ফেলে সেখানে এক স্থায়ী মিলনের বনেদ গড়তে চেয়েছিলেন। এই সমন্বয়-চেতনা বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদী কর্ম ও জীবনাচারণের মধ্যে আরো ব্যাপকতা সহকারে প্রতিফলিত। নিরীশ্বরবাদী হোন বা না হোন, যথার্থ ধর্ম নিরপেক্ষ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ব্রহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এই সমন্বয়ী-মানবিকতা। রামমোহনকে রেনেসাঁর জনক এবং বিদ্যাসাগরকে রেনেসাঁর সন্তান বলা হলেও, অনস্বীকার্য যে, হৃদয়াবেগের দিক থেকে, কর্মযজ্ঞের বিপুলতা ও বৈচিত্র্যে তিনি পূর্বাপর সকলকেই অতিক্রম করে 'অজেয় পৌরুষ' এবং 'অক্ষয় মনুষ্যত্বে'র কালজয়ী মিনার স্থাপন করে গিয়েছেন। ফলকথা, রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর দুজনেই 'ফাইটার ফর রাইটস অব ম্যান অ্যাণ্ড হিউম্যানিজম্' কিন্তু রামমোহন 'ইন্টেলেকচুয়াল হিউম্যানিষ্ট' যতখানি, ততখানি 'হিউমেন হিউম্যানিষ্ট' নন। অন্যদিকে বিদ্যাসাগর যতখানি 'হিউমেন হিউম্যানিষ্ট' ততখানি 'ইনটেলেকচুয়াল হিউম্যানিষ্ট' নন।

উনিশ শতকীয় নবজাগৃতি আন্দোলনের অন্যতম শরিক ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি মাইকেল, যিনি সাহিত্যের আন্তর্জাতিক মহাসঙ্গমে জাতীয়তার প্রবাহকে অনন্য সাধনায় মিলিত করেছিলেন। ধ্রুপদী রূপকল্পের অটল স্থাপত্যের অন্তরালে প্রায় অননুভব্য রোমান্টিক চেতনার অন্তসলিলায় অবগাহন ক'রেছিলেন বাঙলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক এবং একমাত্র ক্লাসিক কবি। মধুসূদন কবিতায় যা করেছেন বিদ্যাসাগরও তাই করেছেন স্বক্ষেত্রে।৩ দু'জনেই সহযোদ্ধার মতো শৃঙ্খল ভেঙেছেন, একজন কাব্য সংস্কারের অন্যজন সামাজিক সংস্কারের। উভয়েই শেষ-পর্যন্ত বিষাদগ্রস্ত। তবে, একজনের বিষাদ কল্পস্বর্গচ্যুতি সঞ্জাত, অন্যজনের, সেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠার নিরলস সংগ্রামে পরাজিত অদম্য নায়কের খেদোক্তিতে :—"আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ, নিতান্ত অপদার্থ; আমাদের হতভাগ্য সমাজ অতি কুৎসিত দোষ পরম্পরায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ।" বিপ্লবী কর্মের স্থপতির প্রতি বিদ্রোহী স্বপ্নের কবির কণ্ঠেই একমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছিল। 'Not only Vidyasagar but also Karuna-sagara' কিংবা "He is the first man among us'—মন্তব্যগুলি

কেবল কথার কথা নয়; স্বনিষ্ঠ কবির যথাযথ উপলব্ধি। তৎবশবর্ত্তী হ'য়ে তিনি তাঁর 'বীরাঙ্গনা'কে উপযুক্ত বীরের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বাধীন-নারী-সত্তার মূল্য বিদ্যাসাগর ব্যতীত আমাদের সমাজে, রামমোহনের পরবর্তীকালে, তেমন ক'রে কে কবে বুঝেছেন ?

বিদ্যাসাগর চরিত্র মূল্যায়নে নিবিষ্ট রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে ক্ষোভ এবং বিস্ময় প্রকাশ ক'রে লিখেছিলেন,—"মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চারকোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দু'একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন ?"—সম্ভবতঃ 'দগ্ধাস্থি পিঞ্জরময় এই মহাশ্মশানে এই মৃত জাতির শবদেহে নূতন জীবন' সঞ্চার মানসে। যদিচ, সেই উদ্দেশ্য আজো অসার্থকতায় মলিন। আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর বলেছেন,—"রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণের অধিকার ছিল না।...ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম কীর্ত্তনে...আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কিনা এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।" —এ মন্তব্যের যুক্তিসিদ্ধতা তর্কাতীত। তথাপি, সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত এবং বিবেকবর্জিত নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি তাড়িত আমাদের বাঙালি সমাজকে, 'রত্নাকর' আখ্যা দেওয়া চলে কিনা,—তা তর্কসাপেক্ষ।

আমাদের নবজাগরণের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র কর্মযোগী বিবেকানন্দ যে বিদ্যাসাগরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করতেন. তা সর্বজন বিদিত। তিনি একদা বলেছিলেন,—"রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরের অনুবর্তী।...উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন কেউ নেই, যার উপরে বিদ্যাসাগরের প্রভাব পড়েনি।"[৪] রেনেসাঁর অন্যতম দান অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। এই অদ্বৈতবাদী হিন্দু সন্ন্যাসী লক্ষ্য ক'রেছিলেন, "কর্মে পরিণত বেদান্ত (প্রাকটিক্যাল অদ্বৈতইজম্) যাহা সমগ্র মানব জাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দু-গণের মধ্যে—সার্বজনীন ভাবে এখনও পুষ্টি লাভ করে নাই। পক্ষান্তরে যদি কোনও ধর্মাবলম্বীগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া থাকে, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণই আসিয়াছে।...আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণ রূপে নিরর্থক।...আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা। আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি ... ভবিষ্যত ভারত বৈদান্তিক

মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।"৫ বিদ্যাসাগরের মধ্যে সেবাব্রতী বিবেকানন্দ এই অসাম্প্রদায়িক—সর্বমানব কল্যাণকামী—চেতনার সম্প্রসারণ সুনিশ্চিতভাবে লক্ষ্য ক'রে থাকবেন এবং এ সংবাদও তাঁর অগোচরে ছিলনা যে বিপ্লবী বিদ্যাসাগর কলেরা রোগী এক অন্ত্যজ রমণীকে সেবা করে প্রমাণ করেছিলেন—সেবাধর্ম আর বিপ্লব সাধনা বিপরীতগামী নয়—পরস্পরের পরিপূরক। আমাদের সমাজের হালচাল সম্পর্কে তিনি বিদ্যাসাগরের মতো উপলব্ধি করেছিলেন,—"আমাদের জাতের কোন ভরসা নাই। কোন একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসেনা—সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে পরে টানাটানি।" কেবল স্বাধীন চিন্তা নয়, কেবল সেবা নয়, নিরলস সংগ্রামের জন্য দেহকে প্রস্তুত রাখার জন্য বিদ্যাসাগরকে পথ হাঁটতে এবং কুস্তির মাধ্যমে নিয়মিত শরীর-চর্চা করতেও দেখা যায়।৬ জীবনের যে দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে সেই দিকেই বিদ্যাসাগরের ছন্দিত পদচিহ্ন। তাই তাঁকে মহাজীবন কবি আখ্যা না দিয়ে থাকা যায় না। এই কবির সমগ্র কর্মের মধ্যেই ধ্বনিত হ'চ্ছে এক সংগ্রামী ছন্দোস্পন্দ। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নির্ভীক সংগ্রামে এবং এই সঙ্গে মানবিক মমত্ববোধে এই ছন্দের সৃষ্টি। এ ছন্দ ঘুম পাড়াতে জানে না, জাতিকে ঘুমের অধিকার থেকে ছিনিয়ে এনে সজাগ ক'রতে চায়।

বৃত্ত ॥ ২

এ পর্যন্ত আলোচনার নবজাগৃতি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া এবং সেই আন্দোলনের অংশভাগীদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সূত্রের আংশিক পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ভূমিকাংশের মূল বক্তব্য যদি কিছু থাকে তবে তা হচ্ছে এই যে বিদ্যাসাগর কাব্যের রূপকল্পে আত্মপ্রকাশ না ক'রলেও তাঁর মানবিক চেতনা ও সমগ্র কর্মের মধ্য দিয়ে সার্থক রূপদক্ষের মতো এক মহা-জীবন-কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে নবজাগৃতির অন্যতম নায়ক এবং বাঙলা উপন্যাসের সর্বপ্রথম রূপদক্ষ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত এবং মনোভাবগত সম্পর্ক নির্ণয়ই আমাদের এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রেম ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি আমাদের দেশের প্রথম বিপ্লবী শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে ষোড়শশতকের যে রেনেসাঁর তাতে আমাদের সাহিত্য লাভ ক'রেছিল বৈষ্ণব পদাবলী এবং সাহিত্যে মানবাধিকার। উনিশশতকের রেনেসাঁয় বাঙলা সাহিত্য লাভ ক'রলো উপন্যাসের শিল্পরূপ। উপন্যাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে সমালোচক

মন্তব্য ক'রেছেন:—"The Novel deals with the individual, it is the epic of the struggle of the individual against society"—বিদ্যাসাগরের জীবনী, সমাজের বিরুদ্ধে অনমনীয় এক ব্যক্তিত্বের নিরলস সংগ্রামের দৃপ্ত ইতিহাস। যা উপন্যাসের মৌল প্রেরণা রূপে কাজ ক'রতে পারে। আর, বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারাই বাঙ্‌লা উপন্যাসের স্বর্যোদয় ঘটেছে। যে কোনও কারণেই হোক, করুণাসাগরের সঙ্গে আঠারো বছরের কনিষ্ঠ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারিক সম্পর্কটি আপাতদৃষ্টিতে নেহাৎ মধুর ছিলনা। বরং কখনো কখনো তিক্ত-কটু হয়ে উঠেছে। অবশ্য বরাবর যে এরকমটি ছিল তা-ও নয়। যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে তেমন পরিচিত নন তাদের কাছেও বঙ্কিমচন্দ্র পূজিত হয়েছেন ঋষি হিসেবে, যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে হিন্দু ঐতিহ্যমুখী জাতীয়তাবাদের জনক। কর্মে না হোন তত্ত্বে তো বটেই। যাঁরা নির্ভেজাল রাজনৈতিক জগতের অধিবাসী তাঁদের অনেকের ক্ষেত্রে অনেক সময় জাতীয়তা সংকীর্ণ গোঁড়ামীতে পর্যবসিত হবার আশঙ্কা থাকে। সৌভাগ্যের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকটাই শিল্পজগতের বাসিন্দা। সুতরাং বিদ্যাসাগরের সংস্কার কর্মোদ্যোগের দরুনই যে 'গোঁড়া হিন্দু জাতীয়তাবাদী' বঙ্কিমচন্দ্র স্বাভাবিক ভাবে তাঁর প্রতি বিরূপতা পোষণ ক'রবেন—এ জাতীয় ধারণা অযথার্থ। শিল্পী বঙ্কিম আত্ম সমালোচনায়, তথা স্ব-সমাজের তীব্র সমালোচনায়, যে অনীহ ছিলেন না, তার প্রমাণ কমলাকান্তের দপ্তর, যাকে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা-কর্ম হিসেবে অভিহিত করেছেন। গোঁড়ামীর প্রকট লক্ষণ আত্মসমালোচনায় অস্বীকৃতি। যাই হোক, ভৃঙ্গরাজের ব' কলমে তিনি আমাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রেছেন,—"তোমায় সত্য বলিতেছি কমলাকান্ত তোমার জাতির ঘ্যান ঘ্যানানি আর ভালো লাগে না।"

হিন্দু ঐতিহ্যমুখী ব'লে অনেকেই ধরে নিয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষণশীল এবং যাবতীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনেরই জবরদস্ত বিরোধী। কিন্তু একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে তিনি সীমাবদ্ধতা নিয়েও আমাদের অতি পিছিয়ে পড়া সমাজের অগ্রগামী চিন্তানায়কদের অন্যতম। গোঁড়ামীর অপ্রকট লক্ষণ চিন্তা শক্তিকে বিকিয়ে দেওয়া। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের স্থান হ'ল পৃথিবীর অতি অগ্রগামী সমাজের অগ্রনী মানুষদের মধ্যে, আমাদের সমাজে তাঁদের আবির্ভাব একেবারেই আকস্মিক। সেদিক থেকে চৈতন্যদেবের মতো বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব (বিধাতার আশীর্বাদের মতো) ইতিহাস ধারার স্বাভাবিক বিকাশে সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কারান্দোলনের প্রতি নিতান্ত বিমুখ হ'লে তিনি রামমোহন সম্পর্কে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা

পোষণ ক'রতেন না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য ক'রেছিলেন,—"মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্‌লা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।" এখানে সম্ভবতঃ 'দেশবাৎসল্য' শব্দটি রাজনৈতিক চেতনার দ্যোতক,—সমাজ সংস্কারান্দোলনের নয়। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের যোগাযোগ থাকলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নামও উল্লেখ ক'রতে দ্বিধাগ্রস্ত হ'তেন না। বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষতঃ কোনো রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগদানে অনিচ্ছুক থাকলেও 'বিধবা বিবাহে'র উদ্যোগী হওয়ায় পরোক্ষভাবে সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ হ'য়ে উঠে নিজের অজান্তে রাষ্ট্রীয় অভিঘাতের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমের মন্তব্যে বিদ্যাসাগরের অনুল্লেখ কোনমতেই অসূয়া প্রযুক্ত নয়।

অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রও জাতীয়তাবাদী তত্ত্বের প্রবক্তা হলেও কোনো রাজনৈতিক সভা-সমিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। শিল্পী মনের নিরাসক্তি এর কারণ? 'সম্প্রদায়-অতীত-বৃহত্তর জন গোষ্ঠী যারা ধর্ম ঐতিহ্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক বন্ধনে বদ্ধ সেই জনগোষ্ঠীকে বঙ্কিমচন্দ্র জাতি বলে নতুন অভিধা'[৭] দিতে চাইলেও হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কোথাও স্পষ্ট নয়। বরং "হিন্দুর বর্ণনার স্থানে যে খ্রীষ্টীয়ানের বর্ণনা করিতে হইবে তাহাও স্বীকার করি না" কিংবা "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে" —ইত্যাদি কোনো কোনো মন্তব্য তাঁর প্রতি বিচার বিভ্রম ঘটাতে পারে। স্থূলকথা, উনিশ শতকে আমাদের সমাজে যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল ঋষি রাজনারায়ণ (হিন্দুজাতির কীর্তি হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে), বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষিদের প্রভাবে, তা হিন্দু জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামীতে পরিণত হবার সুযোগ পেয়েছিল পরবর্তী কালে। সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে অদম্য যোদ্ধা বিদ্যাসাগর সম্ভবতঃ সেই কারণে তদসম্পর্কিত কোনো উদ্যোগের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করতে আগ্রহ বোধ করেন নি। 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' এর লেখক শ্রীবিনয় ঘোষ এর মধ্যে বিদ্যাসাগরের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু, মনে হয় মানুষ হিসেবে বিদ্যাসাগরের ত্রুটি অন্যত্র পরিদৃষ্ট হলেও এক্ষেত্রে তিনি আপন চরিত্রের যথার্থ পরিচয় রেখেছেন।

বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বিষ্ট ছিলেন না, তা গুটিকয়েক ঘটনা থেকে বোঝা যায়। একবার এক ব্যক্তি বিদ্যাসাগর সমীপে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করলে বিদ্যাসাগর বেশ বিরক্ত হয়ে তাকে বলেছিলেন,

—'ওহে, তোমার কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।' প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর বাঙালির পরম গুণ—পরনিন্দা, পরচর্চা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ভিন্ন ক্ষেত্রে, বঙ্কিমচন্দ্র 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রকাশোপলক্ষ্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে বলেছিলেন,—'সে কি? দেশের লোক তাঁর (বিদ্যাসাগরের) পরামর্শ নিয়ে কাজ করে আর তুমি তাঁকে না বলে কাগজ বের ক'রে ফেললে?' খুব সম্ভবতঃ এই মন্তব্যে বিদ্যাসাগরের প্রতি কোনো বঙ্কিম কটাক্ষ ছিল না। আরেকটি ঘটনা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। তারকনাথ বিশ্বাস নামে জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটি ভোজ সভায় বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। রান্না করেছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। ঘটনাচক্রে তিনি এ ব্যাপারে ছেলেবেলা থেকেই বেশ পোক্ত ছিলেন। ভোজন রসিক কমলাকান্তের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র সরেস রান্নার অকুণ্ঠ প্রশংসা করে বলেছিলেন যে, অমন সুস্বাদু রান্না কখনো খান নি। সঞ্জীবচন্দ্র সায় দিয়ে বল্লেন,—'হবে না কেন? রান্নাটা কার জান তো, বিদ্যাসাগরের?' বিদ্যাসাগর সরস জবাব দিলেন,—'না হে, না, বঙ্কিমের সূর্যমুখী আমার মতো মূর্খ দ্যাখেনি।'৮ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পরবর্তী সময়ের এই ঘটনাটি রস ও রসনার সংযোগে বিশেষ উপাদেয় হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্ম না হলেও ব্রাহ্মদের মতো সূক্ষ্ম ও মার্জিত রুচির মানুষ ছিলেন। অট্টহাস্যে নয়, গম্ভীর হাকিমের চাপা হাসিতেই বোধ করি তাঁর পরিশীলিত মানসের যথাযোগ্য প্রকাশ ঘটতো। ঘরোয়া পরিবেশের মজলিশী আলাপচারিতায় ও ভাষা প্রয়োগে তিনি সদা সতর্ক। কিন্তু বিদ্যাসাগর ক্ষণিক অবসরের উচ্চহাস্যে আপন ব্যক্তিত্বকে উচ্ছলতায় প্রকাশ ক'রে দিতেন। তাঁর পৌরুষ-দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের অন্তরালে পরিহাস প্রিয়তার যে প্রবাহটি নিয়ত সঞ্চরণশীল ছিল, অনেক ক্ষেত্রে তা প্রায় আদি রসের (গ্রাম্যতাযুক্ত নয়) সামীপ্যলাভ করতো। বৈঠকী সংলাপে তিনি পারত পক্ষে ঘরোয়া এবং পরিচিত শব্দকে অতিক্রম করতে চাইতেন না। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মতো বিদ্যাসাগরের রুচিবোধ বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না।" বেতাল পঞ্চবিংশতির নির্বাচিত অংশের স্বাধীন অনুবাদ তার প্রমাণ।৯ বিদ্যাসাগরও সংযত রুচির মানুষ কিন্তু তাই বলে রুচি-বায়ু-গ্রস্ত নন।

'বিধবা বিবাহ' আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় পক্ষে-বিপক্ষে নানা ছড়া, মন্তব্য প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছিল, এদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বিষবৃক্ষে' সূর্যমুখী একটা চিঠিতে লিখে-

ছিলেন :— 'ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বই বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?' সূর্যমুখীর এই মনোভাব অনেকেরই ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু একে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব মন্তব্য বলে গ্রহণ করলে লেখকের প্রতি অবিচার করা হয়। স্বয়ং বিদ্যাসাগরও যে একে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত উক্তি বলে গ্রহণ করেন নি, তার প্রমাণ পূর্বোল্লিখ বিশ্বাস বাড়ীর ঘটনাটি। তাছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব মন্তব্যকে কদাচ ভাষার অসঙ্গতিতে প্রকাশ করতেন না। 'তিনি'র সঙ্গে 'সে' সূর্যমুখীর মতো সে যুগের গৃহাঙ্গনার পক্ষে ব্যবহার করা একেবারে অসম্ভব ছিল না, কিন্তু ভাষা শিল্পীর পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং, বিতর্কিত মন্তব্যটিকে একটি চরিত্রের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য বলেই গ্রহণ করা বিধেয়। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ, তাঁর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরগুপ্তের মতো 'বিধবা বিবাহ'কে খুব সুনজরে দ্যাখেন নি। তার কারণ, এই নয় যে, তিনি সংরক্ষণশীলদের অন্ধ অনুগামী কিংবা রাতারাতি মত-পরিবর্তন-পটু, অর্থগৃধ্নু 'টুলো পণ্ডিত'দের মতো সুযোগ সন্ধানী ছিলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দ্বিধাগ্রস্ত মানসিক গঠন এবং হিন্দু-ঐতিহ্য মুখী চিন্তার পরিমিতি তাঁকে 'বিধবা বিবাহে'র প্রতি ব্যক্তি হিসেবে অনীহায় প্রণোদিত ক'রেছিল। তাছাড়া, মনে রাখা প্রয়োজন, তিনি কোঁতের অনুরাগী ছিলেন। 'ধর্ম বিবাহে'র প্রবক্তা কোঁতের মতে—যদি পতি পত্নীর স্বভাবের সঙ্গে একবার উভয়ের কিছুমাত্র পরিচয় ঘটে তবে, একের অবর্তমানে অপরজন তার স্বভাবের ধ্যানে আনন্দময় জীবন অতিবাহিত করতে পারে। সে কারণ বশতঃ কোঁতে-শিষ্যগণ মনে করতেন যে, ধর্মবিবাহ সমাজে চালু হলে পরিণামে 'বহু বিবাহ' নিষিদ্ধ করণ এবং 'বিধবা বিবাহ' প্রবর্তন অপ্রয়োজনীয় হতে বাধ্য। সমদর্শী বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত হল—আমাদের সমাজে পুরুষরা এ ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা যেহেতু ভোগ করেন, সেই হেতু নারীরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবেন কোন যুক্তিতে!

জনবল্লভ উপন্যাসের রচয়িতা এবং জনশিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধাবলীর গ্রন্থক শিল্পী ও চিন্তাবিদ বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতোই সমাজের হিতাকাঙ্খী। তবে বিদ্যাসাগর যেখানে আপোষহীন সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র উপযোগ তত্ত্বাদর্শে আস্থাশীল। 'বিধবা বিবাহ' আন্দোলনের পরিপূরক 'বহু বিবাহ' নিরোধক আন্দোলনের প্রতি তাঁর অভিপ্রায় উপযোগ তত্ত্বাদর্শে বিধৃত। তাঁরমতে,—"বহু বিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জনীয় এবং স্বাভাবিক নীতি বিরুদ্ধ, তাহা বোধহয় এদেশের

জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত, এদেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে যে বলিবে, 'বহু বিবাহ অতি সুপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।'... বহু বিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন।... বহু বিবাহ এদেশে স্বতই নিবারিত হইয়া আসিতেছে..., সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।... (সুতরাং) বহু বিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই।' শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের আঁতের কথা উপলব্ধি করার ব্যাপারে সন্দেহাতীতভাবে সফল হলেও চিন্তাবিদ বঙ্কিমচন্দ্র তখনো পর্যন্ত এদেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের পূর্ণ পরিচয় লাভে সক্ষম হয়েছিলেন কি না সন্দেহ। বর্তমান কালেও দেখা যায় যে সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক বা ভাষাগত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তথাকথিত ডিগ্রীধারী 'শিক্ষিতরা'ই সগৌরবে নেতৃত্বে বিরাজমান। অথচ এরা সকলেই জানেন এবম্বিধ লঙ্কাকাণ্ডে কোনো সমস্যার সুরাহা হয় না, পরন্তু 'দাঙ্গা' অতি আদিম প্রথা ও কুকর্ম। তথাপি শিক্ষিত সমাজ প্রতিরোধে অগ্রসর না হয়ে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এর সহায়তা করে থাকেন। সুতরাং যে সমাজের মানসিকতা এই প্রকারের, সেখানে প্রয়োজন মতো আইনের সাহায্য নিতেই হয়। সেজন্য বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রেও কঠোর আইন প্রয়োগের আবশ্যকতা দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ সুশিক্ষার ফলস্বরূপ এবং কালের কুটিল গতিতে সমাজের প্রাচীন কুপ্রথাগুলি আত্মগোপনে বাধ্য হলেও প্রকৃত বিপ্লবের কোনো অবকাশ নেই। তিনি পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার মানসে সম্ভব অসম্ভব নানা প্রকারের পথ অবলম্বন করে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভেবেছিলেন আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন যথার্থ শিক্ষা। শিক্ষানুশীলনের ফলে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে নীতিবাদী এবং রুচিশীল হয়ে উঠলে সমগ্র সমাজ অচিরেই আলোক প্রাপ্ত হ'য়ে উঠবে। তারই ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিক ভাবেই কুপ্রথাগুলি সমাজ বক্ষ থেকে চিরতরে অবলুপ্ত হবে। তৎস্থলে আইনের সাহায্যে কোনো পরিবর্তন সুদূর প্রসারী হবে না। বিদ্যাসাগরেরও যে একথা অবিদিত ছিল, এমত মনে হয় না। তাঁর ধারণায়, আইনের মাধ্যমে সংস্কারান্দোলন রাজশক্তির সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাবে। ফলে ইংরেজ মুখাপেক্ষী নাগরিক সমাজ ও আইন-ভীরু গ্রাম্য সমাজ সংস্কারকে মেনে নিতে প্রথম প্রথম বাধ্য হয়ে ক্রমশঃ তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। যাইহোক, বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কারান্দোলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও 'আইন প্রণয়নের' উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলেন। এক্ষেত্রে 'বিদ্যাসাগর-ভাষা'-পন্থী সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে সেই ভাষামার্গের জবরদস্ত প্রতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের ঐক্যমত কৌতূহলের সৃষ্টি করে।

এ পর্যন্ত পাওয়া সংবাদ-অনুযায়ী মাত্র একবারই বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কপটাচারের বঙ্কিমী রুচি-বিরুদ্ধ অভিযোগ এনেছিলেন। ক্রুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, বিদ্যাসাগর হুগলী জেলা অন্তঃপাতী জনাই গ্রামের বহু বিবাহ পরায়ণ ব্রাহ্মণদের যে তালিকা প্রস্তুত ক'রেছিলেন তা. প্রমাদশূন্য ছিলনা। পরন্তু, 'মৃতব্যক্তির নাম সন্নিবেশের দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে।'[১০] প্রসঙ্গতঃ বঙ্কিমচন্দ্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ক'রে বলেছিলেন,—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহাবীরকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডন্ কুইক্সোট কে মনে পড়িবে।...আমরা দেখিয়াছি এক একজন মহাপুরুষ বীরপুরুষ মৃতসর্প বা মৃতকুক্কুর দেখিলেই তাহার উপর দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যান,...আমাদের বিবেচনায় ইঁহারা বড় সাবধান এবং পরোপকারী।" এই ব্যঙ্গের প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত ব্যঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। এ রকম কাজ তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তবে বিদ্যাসাগরের সমর্থকদের কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ ক'রে লিখেছিলেন :—

এ আস্পর্দ্ধা ক'ব কা'রে
গোস্পদ বলে না যা'রে
ডাগর সাগরে খোঁচা দিতে ভয় হ'ল না তা'র ?[১১]

(ধীরাজ ওরফে প্যারী কবিরত্ন)

বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত কুপ্রথাকে 'মৃতসর্প' বা 'মৃতকুক্কুর' ঠাওর ক'রেছিলেন, আদৌ সেগুলি মৃত বা নির্বিষ কিংবা নিস্তেজ ছিলনা। এবং 'সুশিক্ষিত' বা অল্প-শিক্ষিত ব্যক্তিদের অধিকাংশের কাছেই সেগুলো কুপ্রথা ব'লে চিহ্নিতও ছিল না। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রও পরবর্তীসময়ে এ সত্য উপলব্ধি ক'রে থাকবেন। তাই বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে 'বহুবিবাহ' সংক্রান্ত পূর্বোক্ত আলোচনার বেশ কিছু অংশ তিনি বর্জন ক'রেছিলেন। এখানে বিদ্যাসাগরের প্রতি একদা নির্মম ব্যঙ্গের জন্য আন্তরিক অনুশোচনা প্রকাশ ক'রে লিখেছেন :—"তাঁহার জীবদ্দশায় কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহার গ্রন্থ যেরূপ তীব্রতার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম এখন আর তাহা পারা যায় না। কেন না, এখন তাঁহার শোকে আমরা সকলেই কাতর।...দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে এবং আমিও আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য এক্ষণে পুনর্মু-দ্রিত করার ঔচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি।"

সাহিত্য সমালোচক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করেন না। শিল্পী বা ব্যক্তি থেকে স্বাভাবিক ভাবেই সমালোচক কিছু ভিন্ন। সমালোচক বঙ্কিম

চন্দ্রের মতে 'শিশুপাঠ্য' গদ্যের রচয়িতা বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ ক'রে 'বাঙলা ভাষার ধাতটা গোড়াতেই খারাপ' করে দিয়ে গেছেন। বাঙালা সাহিত্যিক গদ্যের প্রথম নিদর্শন সীতার বনবাস' বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'কান্নার জোলাপ' ভিন্ন কিছু নয়। অথচ পরবর্তী কালে প্যারীচাঁদ মিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষাকে ঠিক আদর্শ ব'লে গ্রহণ না ক'রেও মন্তব্য ক'রেছিলেন,—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর গদ্য লিখিতে পারেন নাই।" প্রকৃতপক্ষে, মনোহর ও সুমধুর বিদ্যাসাগরী ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ যাকে পৃথিবীর শোক দুঃখের মধ্যে এক নতুন সান্ত্বনাস্থল আখ্যা দিয়েছেন, তাঁর উপযোগ তত্ত্বাশ্রিত মনোভাব, লোক ব্যবহারোপযোগী বলে গ্রহণ ক'রতে পারেনি। তবে, পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী রচয়িতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার ক'রেছিলেন—'বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত ও গঠিত বাঙলা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁহারই উপার্জিত সম্পত্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি।' বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের মধ্যগা-রীতি আশ্রিত ভাষাকেই আপন প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন।[১২]

বিদ্যাসাগর প্রয়াণে, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকা, তাঁর কীর্তি স্মরণে লিখেছিল:—'Vidyasagar will be remembered more for his charity, his educational work, his literary work and his reforming spirit than for the single legislative measure he succeeded in getting passed'—কিন্তু বিদ্যাসাগর নিজে মনে ক'রতেন,—'বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। ...আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, ...সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক তাহা করিব। লোকের...ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।' এই সম্পর্কে চিন্তাবিদ বঙ্কিমচন্দ্র নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা ক'রেছেন। তাঁর মতে,—'বিধবা বিবাহ ভালও নহে মন্দও নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভালো।' এখানে তিনি নারীর স্বতন্ত্র সত্তাকে নিঃসন্দেহে সম্মান দিতে চেয়েছেন। সমাজতন্ত্রী বঙ্কিম স্পষ্ট ঘোষণা ক'রেছিলেন, "সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি।" তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন,—"বঙ্গ সংসার রূপ পশুশালায়...যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরোধে ইহা (বিধবাবিবাহ) স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্যে পরিণত করেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মূল সংস্কারনীতির

প্রতি তাঁর অনাস্থা নেই, অনাস্থা ছিল আন্দোলনের কর্মপদ্ধতিতে। আর এই অনাস্থার জন্মভূমি হ'ল আমাদের 'কুৎসিত সমাজ' যাকে তিনি 'পশুশালা'র অধিক কিছু বলতে গররাজী। সেই জন্যই তিনি প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত অনুশীলনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। যার মধ্য দিয়ে সংস্কার কর্ম গ্রহণ ক্ষম মানসিকতা গড়ে উঠবে। সুতরাং, এমত সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্ত বোধ হয় না, যদি বলা হয়, সূর্যমুখীর চিঠি বা তথাকথিত রিফর্মার দেবেন্দ্রের স্বল্প চরিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিধবাবিবাহ' বা 'ব্রাহ্মসমাজ' আন্দোলনের প্রতি কোনোরূপ বিরূপতা প্রকাশ ক'রতে চান নি। বস্তুতঃ এ সংবাদও অবিদিত নয় যে, সে যুগেও আজকের মতো নব্যাদর্শের বিকৃতি বা আতিশয্যের অসদ্ভাব ছিল না। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার কালে জনৈক উৎসাহী ব্যক্তি নবজাত সন্তানের 'সাধারণ চন্দ্র' নাম রাখতে কুণ্ঠিত হন নি। এ ঘটনাটি অবশ্য সমাজের পক্ষে ততখানি ক্ষতিকারক নয়, যতখানি হাস্যকর। ইংরেজি শিক্ষার উষালগ্নে আলালের ঘরের বখাটে দুলালদের কিংবা উন-পাজুরে নববাবুদের উন্মত্ততা কম্‌তি ছিল না। এই বিকৃতির সৎ-সমালোচনার ফলশ্রুতি টেকঁচাদের মতিলাল, মধুসূদনের নব, দীনবন্ধুর নিমচাঁদ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দেবেন্দ্র। পরবর্তীকালে রচিত রবীন্দ্রনাথের পানুবাবু এবং শরৎচন্দ্রের নতুনদা বা রাসবিহারী এদেরই বংশধর। পাশাপাশি নামোল্লেখ করলেও একমাত্র নিমচাঁদকে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ আখ্যা দিতে হয়। আসল কথা মতাদর্শের বাড়াবাড়ি বা বিকৃতি নিয়ে একই আদর্শানুরাগীরা বিরূপ মন্তব্য ক'রে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটি মন্তব্যের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'তাঁহারাও বিধবা বিবাহকে কার্যে পরিণত করেন না'—এই উক্তির বিশেষ আত্মীয়তা প্রতিভাত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' গ্রামাঞ্চলে 'বিধবা বিবাহ' অনুষ্ঠানের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিল :—"এক্ষণে এতন্নগরে অনেকেই সুশিক্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে সেই শিক্ষা সম্যক ফলদায়িনী হইয়া উঠে নাই। ঐ শিক্ষার এইমাত্র ফল লক্ষিত হইতেছে যে অনেকেই স্বদেশীয় আচার ব্যবহার জঘন্যবোধে পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু যেসমস্ত গুণ থাকাতে ইউরোপীয় লোকেরা প্রশংসনীয় হইয়াছেন তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, অকিঞ্চিৎকর আচার ব্যবহারের অনুকরণে কোন বিশেষ ফল নাই, যদি এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিতেরা সাহস, দেশ হিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুকরণ শিক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এতদ্দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত বলা যায় না।"[১৩] বঙ্কিমচন্দ্র শূন্য গর্ভ অনুকরণকে

'হনুকরণ' ব'লে ব্যঙ্গ ক'রেছিলেন। আর 'ইংরেজ চরিত্র' সদৃশ সৎসাহসের অধিকারী বিদ্যাসাগর এই শূন্যগর্ভতায় বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে মন্তব্য ক'রেছিলেন,—'ছেলেপুলেকে আর যা করি আর না করি, ইংরাজি ত কখনও শেখাবো না, অসার ও ডেঁপো হবার এমন পথ আর নাই।'১৪ এযুগেও বিপ্লবের নামে অসার আস্ফালন এবং গান্ধী-মার্ক্সের দোহাই পেড়ে বিকৃত-'বিধঘুটে' চিন্তার তাণ্ডব 'বাহবা' লুঠছে। 'দেবেন্দ্র' এই অসার বিকৃতদের একজন। সমাজে এরাই গরিষ্ঠ। এদ্দের সম্পর্কে বন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন,—"আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।'১৫

'বিধবা বিবাহ' আন্দোলন বিদ্যাসাগরের সমাজ বিপ্লব প্রয়াসের নান্দীপাঠ নয়, পূর্ণ সংকট কাল। একটা জাতির সার্বিক উন্নতির প্রথম সোপান তার শিক্ষা, কিন্তু চূড়ান্তভাবে তা নারী সমাজের বন্ধন মুক্তির উপর নির্ভরশীল। উন্নতশীল জাতির গঠন অনেকটাই নারীপুরুষের উপযুক্ত মিলনের ফলশ্রুতি। বিশুদ্ধবিবাহ'এর প্রবক্তা কোঁতের মতে স্ত্রীপুরুষের যে সমস্ত বৈলক্ষণ্য এবং প্রকর্ষ আছে সেগুলির পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে পরস্পর পরস্পরের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। বিদ্যাসাগর একদিকে পুরুষের একাধিক বিবাহের বিরোধিতা ক'রলেন, অন্যদিকে উপযুক্ত বিধবার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হলেন। এই ভাবে সবল ও দুর্বলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কোঁতের ব্যক্তিগত সামঞ্জস্য বিধান বিদ্যাসাগরে সমধিগত বা সামাজিক সামঞ্জস্য বিধান প্রয়াসে পরিণত। 'এ যেন ছন্দের খাতিরে 'গুরু'র একমাত্রা কমিয়ে 'লঘু'র একমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া। বিপ্লবীর উপযুক্ত ছন্দ বটে। গতানুগতিক ছন্দে কিন্তু এর বিপরীত ব্যাপারটাই ঘটে। মূলতঃ তাঁর 'বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন নিছক নারী জাতির প্রতি করুণা প্রদর্শন নয়—জাতি গঠনের জন্য বুনিয়াদী পরিবর্তন সাধন।' যদি তিনি সামাজিক দিক থেকে বিবাহ-সংক্রান্ত প্রাথমিক সংস্কারান্দোলনে সাফল্য লাভ ক'রতেন এবং আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ সম্পর্কে নৈরাশ্য পীড়িত না হ'তেন কিংবা সময় ও ক্ষেত্রের উপযুক্ততা সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চিত হ'তে পারতেন, তাহ'লে তিনি ইয়ংবেঙ্গল বা ব্রাহ্ম সমাজ এর বিবাহ সংক্রান্ত অন্যান্য আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন না থেকে তাঁদের পুরোভাগেই থাকতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর মতো বিপ্লবী ব্যক্তির পক্ষে অসবর্ণ এমন কি আন্তধর্মীয় বিবাহের প্রবক্তা হ'তে বাধা ছিল না। তাঁর সংস্কারান্দোলনের মূলে ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির উর্দ্ধে স্থায়ী মানবিক

মূল্য থাকার দরুণ, আন্দোলনের ঢেউ বাঙলা দেশের সীমানা অতিক্রম করে সুদূর পশ্চিমে বিস্তৃত হ'য়েছিল। বিদ্যাসাগরের অনুরাগী পণ্ডিত বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী যিনি মহারাষ্ট্রের বিদ্যাসাগর নামে খ্যাত, তিনি কেবল বিদ্যাসাগরের গ্রন্থগুলির অনুবাদ ক'রেই ক্ষান্ত থাকেন নি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং বিধবা বিবাহ ক'রে মহারাষ্ট্রে এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।১৬

ঐতিহ্যের প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল 'নব্যহিন্দু' বঙ্কিমচন্দ্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বিধা-সংশয় একই সঙ্গে তাঁকে উদারতার ফুল এবং সঙ্কীর্ণতার কণ্টকাধিকারী করেছে। ফলে তাঁর সম্পর্কে মুসলমান সমাজের ঔদাসীন্যের অভিযোগ বেমালুম উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকে কখনোই বিদ্যাসাগর-বিদ্বেষী বলা যায় না। বরং বিষবৃক্ষের মাধ্যমে তাঁকে বিদ্যাসাগরের পরোক্ষ অনুবর্ত্তী ব'লে প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। বস্তুতঃ আমাদের মনে হয় 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে একদিকে বিধবা বিবাহের সামাজিক উপযোগিতা অন্যদিকে বহু বিবাহের ক্ষতকারিতা নির্দেশিত হয়েছে। বিধবা 'কুন্দনন্দিনী' নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েও সুখী হতে পারেন নি, ঠিক কথা। পরন্তু এই বিবাহ সমগ্র পরিবারের কারো পক্ষেই স্বস্তিকর হয় নি। তবে কি তিনি এটাই চিত্রিত করতে চেয়েছেন যে বিধবা বিবাহ কি ব্যষ্টির পক্ষে, কি সমষ্টির ক্ষেত্রে অনিবার্য ভাবেই অমঙ্গলজনক ? না, শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ করেছেন যে 'কুন্দ'র মৃত্যু বা নগেন্দ্র-পরিবারের অশান্তি ভোগের জন্য দায়ি বিধবা বিবাহ কদাচ নয়—কিছুটা নগেন্দ্রনাথের কর্মফল এবং সর্বোপরি নিয়তি। শিল্পী এখানে পরীক্ষামূলক ত্রিভুজ ছকের কাহিনীবৃত্তে সুকৌশলে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গটিকে অনিবার্য করে তুলেছেন। তাঁর শিল্প-দৃষ্টির গভীরে বোধ করি ভবিষ্যত সমাজ বিবর্ত্তনের ছবিটি, শিল্পীর অজ্ঞাতেই, অঙ্কিত হ'য়ে গিয়েছিল। সময় ও সুযোগ সাপেক্ষে সমাজে বিধবা বিবাহ গৃহীত হবে এবং সূর্যমুখী-নগেন্দ্রর বিচ্ছেদ আপোষে 'লিগ্যাল সেপারেশনে'র রূপ পরিগ্রহ করবে। এটা সুনিশ্চিত যে এই উপন্যাসে 'কুন্দনন্দিনী' বিধবা না হয়ে অনূঢ়া হিসেবে নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পত্নী হ'তেন, তাহলেও বিষবৃক্ষের উপসংহার ভিন্নরূপ ধারণ করতো না। 'কুন্দ-নগেন্দ্র'র পরিণয়ে, প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক দুঃখভোগ অনিবার্য হয়ে উঠেছে তার জন্য মূলতঃ দায়ি তৃষিত পুরুষের ভোগেচ্ছা। আমাদের সমাজে বহু বিবাহ পরায়ণতার এটাই প্রধান কারণ। অন্যদিক থেকে, এ কথাটাও সুস্পষ্টভাবে এই উপন্যাস থেকে বের হতে চাইছে যে, বিধবা কুন্দনন্দিনীরা পুনগৃহীতা না হলে ক্ষেত্র বিশেষে 'রোহিনী'

-তে হতে পারেন। বিষবৃক্ষের পূর্ণাঙ্গরূপ 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বিধবা 'রোহিনী'র পরিণাম তাই ভয়ঙ্কর অপবিত্র—কুন্দনন্দিনীর মতো শোক-মহিমায় পবিত্র নয়। অতৃপ্ত রোহিনী কৃষ্ণপক্ষের ব্যাভিচারিনী। তাই সে আমাদের কাছে মানুষ হিসেবে সহানুভূতির ভিখারিণী মাত্র, স্নিগ্ধ শুভ্র কুন্দের মতো যোগ্য অধিকারিণী নয়। 'রোহিনী'র শোচনীয় পরিণামের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র দায়ি নয় মোটেই। দায় ভাগের অনেকটাই আমাদের 'পশুশালা' রূপ অসার সমাজের। ব্যাভিচারের দিকে ঠেলে দেওয়া রোহিনীদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনমুখী করে তোলাই বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের উদ্দেশ্য। আমাদের সমাজে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার মতো নারী প্রায় পণ্যরূপে ব্যবহৃত। সেই ব্যবস্থাটাকে শিকড়-সুদ্ধ সমাজের বুক থে'ক উপড়ে ফেলে দেবার জন্যে বিদ্যাসাগরের কর্ম প্রয়াস। এ কথাটা সে যুগের মুষ্টিমেয় যথার্থ চিন্তাবিদ্‌দের সঙ্গে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা। কুপ্রথা রূপ সমাজের সঙ্গে বিপ্লবী বিদ্যাসাগরের এই সংগ্রাম বঙ্কিমচন্দ্রে অংশত শিল্প-প্রেরণার কেন্দ্রে আসীন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন একদিকে বিবাহ সংস্কার আন্দোলনের প্রতি শিল্পের জবরদস্ত সমর্থন জানিয়ে গেছেন, তেমনই, অন্যদিকে আন্দোলনের প্রকৃতি ও স্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য আপত্তি বিদ্যাসাগরও শেষ পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম ক'রেছিলেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, যে 'সমাজের বাস্তব অবস্থা এবং দেশবাসীর মনোভাব অনুকূল না হলে সমাজ কল্যাণের জন্য কোন কাজ সফল হয় না।'[১৭]

উপসংহৃতি ॥ ৩

'দেশবাসীর মনোভাব' পরিবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনের পক্ষপাতী। কঠোর শারীরিক এবং মানসিক অনুশীলন ব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য। এই অনুশীলনের মূলে নিষ্কাম কল্যাণ তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। অনুশীলনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের নিয়েই পরিবর্তিত সমাজের কাঠামো তৈরী হবে। আদর্শ মানুষ অধ্যুষিত আদর্শ সমাজ। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অতীত ইতিহাস থেকে আদর্শ মানুষকে আবিষ্কার করেছিলেন। তারই আপাতঃ ফল কৃষ্ণ চরিত্র। এই চরিত্র রূপায়ণে কেবল হিন্দু ঐতিহ্যমুখী ধারণা কিংবা 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপান্তরিত idea'[১৫] মাত্র কার্যকর নয়। সেই সঙ্গে নরসিংহ বিদ্যাসাগরের—যাঁর যাত্রা পথ দ্যুতিময়, যিনি সত্যে বৃহৎ, যিনি সত্যের আলোক নিয়ে আসেন—সেই সত্য শ্রেষ্ঠের প্রেরণাও। 'কৃষ্ণ চরিত্র' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য

করেছিলেন :— "আমাদের মতে কৃষ্ণ চরিত্র গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি। প্রথমতঃ বঙ্কিম বুঝাইয়াছেন জড়ভাবে শাস্ত্রের অথবা লোকাচারের অনুবর্তী হইয়া আমরা পূজা করিব না সতর্কতার সহিত আমাদের মনের উচ্চতম আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা পূজা করিব। তাহার পরে দেখাইয়াছেন যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহা শাস্ত্র।' শাস্ত্র শাসন ও লোকাচার মুক্ত স্বাধীন বুদ্ধির ও সচেষ্ট চিত্তবৃত্তির অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে একমাত্র বিদ্যাসাগরই ছিলেন। মানব কল্যাণে উপযোগী কর্মই একমাত্র বিশ্বাস্য শাস্ত্র—এ উপলব্ধিও বিদ্যাসাগরের। সুতরাং 'কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম স্বাধীন মনুষ্য বুদ্ধির যে জয় পতাকা' উড়িয়েছিলেন তাতে বিদ্যাসাগরেরই স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বিদ্যাসাগরের প্রতিপক্ষ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছুতেই খাড়া করা যায় না। উভয়েই আমাদের সুপ্রাচীন সমাজের সুবিশাল অচলায়তন সম্বন্ধে সচেতন। বিদ্যাসাগর আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী—বঙ্কিমচন্দ্র কালোপযোগী সহনশীল সংস্কারের। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরও এই উপযোগিতাকে আংশিক্ ভাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। বিদ্যাসাগর নিরলস কর্ম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আপন ধ্যান-ধারণাকে রূপায়িত করতে বদ্ধপরিকর। অন্যদিকে বঙ্কিম চিন্তাযোগী হলেও শিল্পীর নিরাসক্তিতে কর্মযোগী নন। উভয়েই শিল্পী। মানুষ হিসেবে উভয়েই মানবিক দুর্বলতার অধিকারী। বিদ্যাসাগরের সব থেকে বড় ব্যর্থতা সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিশালী কলমকে তাঁর বিপ্লবকর্মের অনুকূলে খোলাখুলি ও পূর্ণাঙ্গ ভাবে না পাওয়া। আর শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সব থেকে বড় ব্যর্থতা তাঁর কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের মানবকল্যাণমূলক বিপ্লবী মতবাদকে স্থান ও কালগত উপ-যোগিতার মাপে যথাযথভাবে ব্যবহার করে, বিবেকানন্দের মতো, হিন্দু ঐতিহ্যের চেয়েও উঁচু, নির্বিশেষ মানবতাবাদী দেশপ্রেমকে সম্প্রসারিত ক'রতে না পারা। আমাদের সমাজে উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল বড়। কবি বিষ্ণু দে একবার তাঁর একটি কবিতায় লিখেছিলেন, 'শিশুর সাহস চাই বয়স্ক মননে।' কিন্তু, কি ছিল বিধাতার মনে? কেন যে 'শিশুর সাহসে'র সঙ্গে 'বয়স্ক মননে'র মিলন হ'ল না, তা কে জানে?

॥ সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকৃতি ও তথ্য সূত্র নির্দেশিকা ॥

১। বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীবিজিতকুমার দত্ত

২। সমকালীন, আশ্বিন-১৩৬৪—শ্রীযোগানন্দ দাস
৩। বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীবিজিতকুমার দত্ত
৪। লোকমাতা নিবেদিতা—শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু
৫। মুহম্মদ সরফরাজ হুসেন কে লিখিত পত্র (১০।৬।১৮৯৮)—স্বামী বিবেকানন্দ
৬। পুরাতন প্রসঙ্গ—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত
৭। আনন্দবাজার পত্রিকা (১৬।১।৭২)—শ্রীভবতোষ দত্ত
৮। করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—শ্রীইন্দ্র মিত্র
৯। বিদ্যাসাগর রচনাবলীর ভূমিকা—শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১০। ঐ — ঐ
১১। পুরাতন প্রসঙ্গ—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত
১২। বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীবিজিতকুমার দত্ত
১৩। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—শ্রীবিনয় ঘোষ
১৪। পুরাতন প্রসঙ্গ—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত
১৫। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—শ্রীবিনয় ঘোষ
১৬। আনন্দবাজার পত্রিকা (৭।১।৭২)—শ্রীঅরুণ সান্যাল
১৭। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—শ্রীবিনয় ঘোষ

সহায়ক গ্রন্থ ও রচনা

ক) বঙ্কিম সাহিত্যপাঠ—শ্রী হরপ্রসাদ মিত্র
খ) সাহিত্য বিচিত্রা—রথীন্দ্রনাথ রায়
গ) বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহের ভূমিকা—শ্রীগোপাল হালদার
ঘ) মুক্তিযুদ্ধ ও রামমোহন (আনন্দবাজার পত্রিকা)—শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত
ঙ) উপন্যাস প্রসঙ্গে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং 'পরিচয়' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা

ভবতোষ দত্ত

বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বাংলার এই দুই মনীষী উনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় একই সময়ে বর্তমান ছিলেন। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে বয়সে বড়ো ছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত সমাজে পরিচিত হবার আগেই তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। ঔপন্যাসিক এবং বঙ্গদর্শন-সম্পাদক রূপে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাংলা সাহিত্য সমাজে পুরোধা, বিদ্যাসাগর তখন সমাজ-সংস্কারমূলক কাজ থেকে অপেক্ষাকৃত অন্তরালে চলে গিয়ে মেট্রোপলিটান কলেজ নিয়ে ব্যাপৃত হয়েছেন। বিদ্যাসাগরের সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারমূলক নানাবিধ উদ্যম দেশের শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন নিয়ে এসেছিল। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব হিমালয় চূড়ার মতো উন্নত। তিনি কর্মী পুরুষ, কর্মের মধ্যে দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করে গিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা বাংলাদেশে অন্য রকম। তিনি মননশীল ভাবুক এবং রসস্রষ্টা। তাঁর মননপূর্ণ প্রবন্ধ নিরবয়ব কল্পনা-সর্বস্ব লেখা নয়। বাংলার ইতিহাস, বাঙালির সমাজ ন্যায় নীতি কর্তব্য-অকর্তব্য নিয়ে ছিল তাঁর ভাবনা। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের মধ্যে বিদ্যাসাগরের সংস্কারকর্মও প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র আর কোথাও বিদ্যাসাগরের কাজের প্রত্যক্ষ আলোচনা করেছেন বলে জানি না। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রায়শঃই বিদ্যাসাগরের বিরোধী বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত বলেই পশুপতি ভিন্ন উপায়ে শাস্ত্রাধিপতি হওয়ার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করেছে! উপন্যাসের প্লট ও চরিত্রে দ্বন্দ্ব দেখানোর এটা সফল পরিকল্পনা বটে, কিন্তু তা লেখকের ব্যক্তিগত মনোভাব বোঝবার সহায়তা করে না।

বঙ্কিম-সাহিত্যে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যাসাগরের উল্লেখ আছে। থাকাই স্বাভাবিক। তথাপি দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল এমন নিদর্শন মেলে না। ১২৮৯ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সারস্বত সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, তাতে সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সহযোগী সভাপতিদের অন্যতম ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে এই সভায় যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন।

> 'তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমি পরামর্শ দিতেছি আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো—হোমরা চোমরাদের লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও মতে মিলিবে না। এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজি হইলেন না।'১

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার মনে করেন২

> 'হোমরা চোমরা অর্থে বিদ্যাসাগর বোধহয় বঙ্কিম প্রমুখ ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করিয়াছিলেন।...পাঁচজনকে লইয়া কাজ করিবার শক্তি ও সময় বঙ্কিমের ছিল না জানিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্বাহ্নে জ্যোতিরিন্দ্রনাথদের সতর্ক করিয়া দেন।'

সময় বঙ্কিমের ছিল না, কথাটা সত্য। কারণ বঙ্কিম সরকারী চাকুরি করতেন এবং তাঁর কর্মস্থল প্রায় সব সময়েই ছিল কলকাতার বাইরে। কিন্তু তাঁর শক্তি ছিল না—এ কথাটার অর্থ কী? বঙ্কিমের স্বভাবের মধ্যেই এমন কিছু ছিল কি যা সমবেত ভাবে কাজ করবার বাধা? রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের রাশভারি স্বভাবের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু সারস্বত সমাজের৩ কাজের পক্ষে সে-স্বভাব নিশ্চয় প্রতিবন্ধ নয়। প্রভাতবাবুর এ-ব্যাখ্যাকে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা বলেই মনে হয়। কারণ বিদ্যাসাগর স্পষ্টই বলেছেন 'আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো।' হোমরা-চোমরাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনি নিজেও তো ছিলেন, তেমনি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

আসলে মিলে মিশে কাজ করার স্বভাব বিদ্যাসাগরের নিজেরই ছিল না। বিদ্যাসাগরের সারা জীবনই এর দৃষ্টান্ত। মতপার্থক্যও তাঁর জীবনে অসংখ্যবার ঘটেছে, অনেকবার চাকরি ছেড়েছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ অনুভূতি অনমনীয় দৃঢ়তা কোনো বাধাকেই সহ্য করত না, ভিন্ন মতকেও মেনে নিতে পারে নি। তাঁর চরিত্রবিশ্লেষণ করতে গিয়ে একালের একজন বিদ্যাসাগর-ভক্ত—যিনি নিজে বিদ্যাসাগরের অন্যতম

বংশধর (বিদ্যাসাগরের দৌহিত্রের পুত্র) লিখেছেন৪—

'বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে তিনি আস্তে আস্তে দূরে সরে গেছেন। এর দায়িত্ব হয়ত সবটুকু বন্ধুবান্ধবের নয়। অর্থাৎ বাইরের জগতে তিনি অবিচল বিপ্লবী, বন্ধু ও স্বজনের জগতেও তিনি অসহিষ্ণু ব্যক্তিত্ববাদী।'

বঙ্কিমচন্দ্র-চরিত্রের প্রতি একালের একশ্রেণীর লেখকের মনোভাব অনুকূল নয়। বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার সীমা নেই। বিদ্যাসাগর সর্বকালের শ্রদ্ধেয় পুরুষ। তাঁর কর্মকীর্তি প্রগতিবাদের মান হিসাবে গণ্য। সেই সূত্রে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কারও মতভেদ হলে অথবা বিদ্যাসাগরের কাজকে কেউ সমালোচনা করলে তাঁকেই সংকীর্ণ বলে দোষারোপ করা হয়। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করে গিয়েছেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন৫—

'গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য গুণের আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে দুটিমাত্র ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। কুলমর্যাদাসম্পন্ন উচ্চব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এবং বৈদ্যকুলোদ্ভব কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহার সমাজ ধর্মের আদর্শ কত উচ্চ গ্রামে উঠিয়াছিল। অধুনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ধর্মতত্ত্বে কেশবচন্দ্রের নামটি উঠাইয়া দিয়া তাঁহার ভক্তেরা হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতেছেন।'

বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন 'সাহিত্য' পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে। বঙ্কিম জানতে চাইলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁদের সংকল্পের কথা জানেন কিনা। তাঁকে তারা সে সম্বন্ধে কিছু জানান নি, এ কথা জেনে বঙ্কিম বললেন, 'সে কি? দেশের লোক তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করে আর তুমি তাঁকে না বলে কাগজ বার করে ফেললে।'

দুই

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য ক্ষেত্রে দেখা দিলেন উপন্যাসকার রূপে। ইংরেজি সাহিত্যে সুশিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাস যখন লিখতে আরম্ভ করলেন তিনি তখন হাতে পেয়েছিলেন দু'টি ভাষাদর্শ। একটি প্যারীচাঁদের সরল ভাষা আর একটি বিদ্যাসাগরের তৎসম সমৃদ্ধ সাধুভাষা। প্যারীচাঁদের বিশেষ একটি বই ভাষারীতির জন্য সুপরিচিত। তার নাম আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)। ১৮৬৫ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের যে সব বই বেরিয়েছে তার মধ্যে বেতাল পঞ্চবিংশতি, জীবনচরিত, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, শকুন্তলা, বিধবা বিবাহ প্রচলিত

হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, কথামালা, মহাভারত, সীতার বনবাস ও আখ্যানমঞ্জরী গদ্যভাষার দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৮৫০ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত এই পনের বৎসর বাংলা গদ্য সাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর ছিল। এই সময়েই বাংলা গদ্যভাষার কাঠামো তৈরি হয়ে যায়। পরবর্তী বাংলা গদ্য সাহিত্য এই সময়ের ভাষা-পরীক্ষার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। সেই গড়বার মুখে মহৎ শিল্পীরূপে দেখা দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর মতো আত্মপ্রত্যয়বান্ সচেতন মনীষী বাংলা গদ্যভাষার সমস্যাকে গভীর ভাবেই বিশ্লেষণ ও চিন্তা করে দেখেছেন। এ রকম ধারণাও সুলভ যে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষার বিরোধী ছিলেন। এ কথার বস্তুতই কোনো অর্থ নেই। এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে যে বিদ্যাসাগরের ভাষা বহু বিচিত্র ভাববাহী বাংলা ভাষার একমাত্র আদর্শ কখনোই হতে পারত না। বিষয়টা বিস্তৃত আলোচনা করেই দেখা উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়ে বাংলা ভাষা সমস্যার স্বরূপ অতি পরিষ্কার করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাষা আলোচনা উপলক্ষে তিনি লিখেছেন—

> 'বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। এক-দিগে সংস্কৃতের স্রোতে মরা গাঙ্গে উজান বহিতেছে—কত ধৃষ্ট দ্যুম্ন প্রাড়বিবাক্ খলিম্লুচ "গুণ ধরিয়া সেকেলে ঝোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর একদিগে ইংরেজির ভরা গাঙ্গে, বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষারজান, ইবোলিউশন, ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজরা, ক্ষুদে লঞ্চের জ্বালায় দেশ উৎপীড়িত; মাঝে স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোতঃ বড় ক্ষীণ বহিতেছে।'

বাংলা গদ্যভাষা ত্রিপথ গামিনী—সংস্কৃত মূলক, ইংরেজি প্রভাবিত এবং দেশীয়। ভাষার এই বিভিন্ন আদর্শের কথা তিনি অন্যত্রও বলেছেন। প্যারীচাঁদের ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি—

> প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধু ভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে।

'বাংলা ভাষা' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছেন—

'এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল খাঁটি সংস্কৃতবাদী – যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে। উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত। যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্যসকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা—তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

আশ্চর্যভাবে বঙ্কিমের এই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ১৩৩৮ সালের পরিচয় পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

এর [সবুজপত্রের] পূর্বে সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রবেশ একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু সে ছিল খিড়কির রাস্তায় অন্দরমহলে।...একবার যেমনি একে আত্মপ্রমাণের অবকাশ দেওয়া গেছে, অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাঁধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার কারণ এটা জবর দখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তার নিজের স্বভাবের মধ্যেই, ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বেড়া তুলে দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।'

রবীন্দ্রনাথ এখানে সংস্কৃতবাদীদের মুখপাত্র স্বরূপ বলেছেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কথা। বিদ্যাসাগরের সুপরিচিত তৎসম বহুল গদ্য সত্ত্বেও তাঁকে এই সম্প্রদায়ের প্রতিভূ বলে মনে করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রও এই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রূপে গণ্য করেছিলেন রামগতি ন্যায়রত্নকে। এ সম্পর্কে তাঁর যুক্তি —

'বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদীদিগের প্রতি কিছু অবিচার হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ইংরেজি জানেন না–পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন। আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত।'

ভাষা সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মন্তব্য আছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কোনো মন্তব্য কোথাও নেই। সংস্কৃতবাদীর যুক্তি পেতে হলে ন্যায়রত্নের কাছেই পেতে হবে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কারণ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত মূলক বাংলা লিখলেও তাঁর রচনার সৌন্দর্য বঙ্কিমচন্দ্র গভীর ভাবে অনুধাবন করেছিলেন। সংস্কৃতমূলক শব্দ আশ্রয় করেও যে রসসৃষ্টি করা যায়, বিদ্যাসাগরের রচনায় বঙ্কিম তার চমৎকার

প্রমাণ পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের ভাষাসৌন্দর্য বিষয়ে বঙ্কিম কখনই বিরূপ মন্তব্য করেন নি। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা নিযুক্ত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বাংলা গদ্য সংকলন প্রকাশ করেন। তাতে তিনি—**Pandit Iswar Chandra Vidyasagar's beautiful renderings from Kalidasa**-এর বিশেষ উল্লেখ করেন। প্যারীচাঁদের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় সংস্কৃত মূলক ভাষাধারার ইতিহাস দিতে গিয়ে বললেন—

> 'এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোরম। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙালা গদ্য লিখিতে পারেন নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজনবোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল।'

বিদ্যাসাগরের ভাষা সৌন্দর্য সম্বন্ধে বঙ্কিমের এই অভিমত আজ পর্যন্ত স্বীকার্য। অবশ্য বঙ্কিম নিজেকেও প্রকারান্তরে এবং কার্যত এই গদ্যে অক্ষম বললে-ও রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের গদ্যও তখনও লিখিত হয় নি। আর কেউ কেউ যে সংস্কৃতমূলক গদ্য লেখেন নি, তা নয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত (মাধবী-কঙ্কণ ও বঙ্গবিজেতা স্মরণীয়) প্রভৃতি সকলের উপরেই গদ্যরচনা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের স্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের গদ্যের ছন্দঃস্পন্দ সম্বন্ধে যে সূক্ষ্ম মন্তব্য করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা করতে পারেননি, কিন্তু যে মাধুর্য রবীন্দ্রনাথের কানে ধরা দিয়েছিল বঙ্কিমের কানেও তা ধরা দিয়েছিল। তার প্রমাণ বঙ্কিমের মন্তব্যেই আছে। বিদ্যাসাগরের এই মধুর ভাষা যে রামগতি প্রমুখ সংস্কৃতবাদীদের ভাষা থেকে সাহিত্যিক গুণে উৎকৃষ্ট, বঙ্কিমের এই সুস্পষ্ট অভ্রান্ত উক্তি তাঁর ভাষারহস্য চিন্তার পরিচয় দেয়।

বিদ্যাসাগরের ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যে সমালোচনা করেছিলেন তাতে কিছু তীব্রতা ছিল। ১৮৭১-এ Bengali Literature নামে তিনি ক্যালকাটা রিভিউয়ে বাংলা সাহিত্যের এক বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বিদ্যাসাগরকে প্রধানত অনুবাদক ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থের রচয়িতা বলে উল্লেখ করেন।—

He has a great literary reputation; so had Iswar Chandra Gupta; but reputations are undeserved and that of Vidyasagar scarcely less so than that of Gupta. If successful translations from

other languages constitute any claim to a high place as an author we admit them in Vidyasagar's case; and if the compilation of very good primers for infants can in any way strengthen his claim, his claim is strong. But we deny that either translating or Primer-making evinces a high order of genius : and beyond translating and primer making Vidyasagar had done nothing.

এখানে স্মরনীয় যৌবনে (তখন বঙ্কিমের বয়স তেত্রিশ) বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত ছিল তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট কখনও কখনও অপ্রিয়ও বটে। যে ঈশ্বর গুপ্তের কাছে তিনি বাল্যে শিক্ষানবিশি করেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে এই প্রবন্ধেই তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা তো কঠোর বটেই, রূঢ়ও। আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংকলন উপলক্ষেই তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লিখলেন তাঁর জীবনী ও কাব্য সমালোচনা। যদিও মূল বক্তব্যে পরিবর্তন কিছু হয় নি, তথাপি তাঁর ভাষা হয়েছিল সমবেদনাপূর্ণ সংযত ও রসগ্রাহী। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের দোষত্রুটির পারিপার্শ্বিক কারণ নির্ণয়ে যথেষ্ট সহিষ্ণু উদার চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্র যে কথাগুলি ইংরেজি প্রবন্ধে লিখেছেন মূল মতের পরিবর্তন না ঘটলেও প্যারীচাঁদের রচনা সমালোচনা (১৮৯২) উপলক্ষে তার কঠোরতা ও রূঢ়তা আর ছিল না। বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষার যথার্থ মাধুর্যের উল্লেখ বিস্তৃত ভাবেই করেছেন। বিশ বৎসর আগে ইংরেজি প্রবন্ধে 'পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা' এবং 'অনুবাদক' মাত্র বলে তাঁকে যে উপেক্ষা দেখিয়েছিলেন, এখানে তার কোন চিহ্ন নেই।

সাহিত্যাদর্শে অবিচল বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু তার মূল বক্তব্য থেকে স্খলিত হন নি। স্থির ভাবে চিন্তা করে দেখলে বঙ্কিমের অভিমত আজ সত্য বলেই মনে হবে। প্যারীচাঁদ-রচনার আলোচনা সূত্রে তিনি লিখেছেন—

> সকল প্রকার কথা এ ভাষায় [বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত ভাষায়] ব্যবহার হইত না বলিয়া ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্রের অভাব হইলে ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না'।

শুধু ভাষারীতি নয়; ভাষারীতির সঙ্গে বিষয়বস্তুর সম্বন্ধও অচ্ছেদ্য। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য খুব স্পষ্ট। ভাষার মতো সাহিত্যের বিষয়ও সংকীর্ণ ছিল তখন। ভাষা ছিল সংস্কৃতের ছায়ামাত্র, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনি সংস্কৃতের—কখনও ইংরেজির ছায়ামাত্র। সংস্কৃত বা ইংরেজি গ্রন্থের সার সংকলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাংলা ভাষায়

আর বিশেষ কিছু হত না। —

> 'বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল।'

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ব্যক্তি হিসাবে কারো আলোচনা করেন নি। ইতিহাসের পটভূমিতে ব্যক্তির কৃতিত্ব বিচার করেছেন। এবং সে দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি প্রতিবাদের অতীত। বাংলা সাহিত্যে মৌলিক রচনার কাল মোটামুটি ১৮৫৫র পরে। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর বিষয়বস্তু লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা লব্ধ, সমাজ থেকে আহৃত। তারপরে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই পরিপ্রেক্ষিকা আমাদের কারো কাছেই অজানা নয়। শিল্পীর স্বাধীন ও মৌলিক কল্পনাকে বাণীরূপ দানেই প্রতিভার সর্বোত্তম প্রমাণ। স্বাধীন কল্পনার উপযোগী ভাষা সৃষ্টি সেই কারণেই যে কোন সাহিত্যের পক্ষে স্মরণীয় ঘটনা। কবিওয়ালাদের ভাষা আধুনিক জীবন ভাবনাকে রূপ দিতে একেবারেই অক্ষম। তার জন্য শব্দ সম্পদ যেমন চাই, তেমনি চাই বাক্যগঠনবৈচিত্র্য, বাগ্‌ভঙ্গিমা ইত্যাদি। আধুনিক চিন্তা, নবজীবনানুভূতি, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানব-চারিত্র্যবৈচিত্র্য, রুক্ষ কর্কশ গদ্যময় অথবা ভাবনাবিহ্বল আবেগপূর্ণ অতীত জীবন কাহিনী, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ—একালের অভিজ্ঞতার অপরিমেয় বিস্তারকে ধরে দেবার মতো উদার গ্রহণক্ষম এক গদ্যভাষার দরকার হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধে এই নতুন ভাষাসৃষ্টির সমস্যা বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করেছিলেন। বঙ্কিম আমাদের বাংলা সাহিত্যের চিন্তা করেছিলেন। ইতিহাসের দিক দিয়ে আমরা তার গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,৬

> 'যে-গদ্য ভাষারীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন তার ছাঁদটি বাংলা ভাষায় সাহিত্যরচনা কার্যের ভূমিকা নির্মাণ করে দিয়েছে।'

এ প্রশস্তি একদিক দিয়ে নিশ্চয়ই যথার্থ। কারণ বিদ্যাসাগর উদাত্ত স্নিগ্ধ গম্ভীর গদ্যের সৃষ্টি করেছেন সংস্কৃত ক্ল্যাসিক্যাল রচনার মার্জিত ও শব্দ ব্যবহার দ্বারা। বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কৃত পণ্ডিতের শব্দ ভাণ্ডারই বাংলা সাহিত্যকে গ্রাম্যতা থেকে উদ্ধার করেছে। কৌতুকের বিষয় এই যে চলতি ভাষার সমর্থন করতে গিয়ে একদিন রবীন্দ্রনাথই সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের নিন্দা করেছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ভাষারীতির ছাঁদের কথা'। এ ছাঁদটি পরবর্তী কালে

রক্ষিত হতে পেরেছে কি না সন্দেহ। প্রমথ চৌধুরী চলতি রীতির সমর্থনে যে যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এবং আমরা তার দ্বারা প্রভাবিত। তখন কিন্তু বিদ্যাসাগরের ছাঁদের কথা মনে পড়ে না। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং যুক্তি বিস্তার করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতকেই উদ্ধৃত করেছিলেন। তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বঙ্কিম প্রবর্তিত ও সমর্থিত মধ্যগা ভাষাই বিদ্যাসাগরের পরে বাংলা ভাষার ছাঁদ বলে গৃহীত হয়েছে। এর দ্বারা বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বের ম্লানতা ঘটে না। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র ভাষা অনুসৃত হয় নি বলে কি তার সৌন্দর্য কোনো দিক দিয়ে অস্বীকার্য? বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের কীর্তিকে দু দিক দিয়ে যদি দেখি—বিষয়বস্তু ও ভাষারীতি—তবে ভাষা গঠনে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বকে কেউ তুচ্ছ করে দেখতে পারবে না। ভাষাগঠনের কয়েকটি মৌলিক ভিত্তি—যেমন যতিবিভক্ত বাক্যগঠন, তরঙ্গায়িত শব্দপ্রবাহ—দীর্ঘকাল বাংলা গদ্যের আদর্শরূপে বিরাজিত ছিল। বঙ্কিম নিজেও কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর পর্যন্ত বিদ্যাসাগরী আদর্শকে অনুসরণ করে ভাষামাধুর্য রচনা করেছেন। কিন্তু বিষবৃক্ষ, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইলের ভাষাগুণ ভিন্ন প্রকৃতির। হ্রস্বকায় বাক্যগঠন, মিশ্র শব্দ ব্যবহার ভাবানুগত শব্দ ও বাক্যখণ্ড প্রয়োগ—এ সবের ফলে ভাষায় যে নাটকীয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে, বিদ্যাসাগরের ভাষায় তার অভাব ছিল। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের সাহিত্য রূপে গণ্য ভাষা বিশেষ এক প্রকৃতির। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বিদ্যাসগরের জগৎ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যেরই জগৎ। বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়বস্তুর এই সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেই বলেছিলেন অভিজ্ঞতা যদি বাস্তব জীবন্ত ও ব্যাপক হয় তবে ভাষা-রীতিতেও অভিনবত্ব অবশ্যম্ভাবী, তাতে ভাষার স্থিতিস্থাপকতাই বাড়ে। বিদ্যাসাগর বিষয়বিন্যাসের সঙ্গে ভাষারীতির যোগাযোগ সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিলেন বলা কঠিন। তিনি নাকি বঙ্কিমকে অর্থাৎ বঙ্কিমের ভাষাকে পছন্দ করতেন না। বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি ছিল না কিন্তু প্রয়োগরীতি 'manner সম্বন্ধে style সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল'। এই সংবাদ থেকে বিদ্যাসাগরের শিল্পী মনের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সংবাদ দিয়ে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন৭ —

> 'বঙ্কিমও বিচলিত হইলেন না। তিনি বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'কে বলিতেন 'কান্নার জোলাপ'।

এই ধরণের মন্তব্য ব্যঙ্গাত্মক, মৌখিক সংলাপে করুণ রসের আতিশয্যের জন্যই করা হয়েছিল। সীতার বনবাস যে মূলত এবং প্রধানত করুণরসাত্মক, বিষণ্ন

বিরহবেদনারই কাহিনী তাতে তো দ্বিমত নেই। সহৃদয় দয়ার্দ্রচিত্ত লেখক সীতার বনবাসদুঃখকে স্বভাবতই অশ্রুবাষ্পোচ্ছ্বাসে আবেগবিহ্বল করে তুলেছেন। মৌখিক সংলাপে বঙ্কিম যাকে বলেছেন 'কান্নার জোলাপ' লিখিত সমালোচনায় তাকে বর্ণনা করেছেন এই ভাবে—

> 'ইহার অনেকগুলিন কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্য্যবীর্য প্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইলে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। তিনি স্বপ্রণীত বাঙালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।

এতে ব্যঙ্গের আভাস আছে। ব্যঙ্গের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন আছে কিনা, সে-প্রসঙ্গ থাক। কারণ সেটা সাহিত্যবিচারভঙ্গির সীমায় এসে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র এ-অধিকার নিয়েছিলেন—সমালোচকের এ-অধিকার অশালীন না হলে গ্রাহ্য। এ অধিকার তিনি যে বিদ্বেষ প্রণোদিত হয়ে বিদ্যাসাগর সম্পর্কেই প্রয়োগ করেছেন তা অবশ্যই সত্য নয়। ভবভূতির উত্তরচরিতের প্রতি সপ্রশংস মনোভাব নিয়ে সমালোচনা করতে বসেও দেখা যাচ্ছে স্থানাবিশেষে তাঁকেও ব্যঙ্গ করেছেন। উপরের উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ। আবার বিদ্যাসাগরের সমালোচনা-বুদ্ধির সমর্থন নিয়ে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—

> "শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে ভবভূতির কাব্যের "মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এমত দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা আছে, তাহাতে অর্থবোধ ও রসগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে।" ভবভূতির অসাধারণ দোষ নির্বাচনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা বলিয়াছেন। আমরা পূর্বে যাহা উত্তরচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে এইরূপ দীর্ঘ সমাসের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে।...ঈদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনা-দোষমধ্যে গণ্য তাহা আমরা স্বীকার করি।...ঈদৃশ সমাসে অর্থবোধের হানি, সুতরাং ইহা দোষ।"

দেখা যাচ্ছে সাহিত্য প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের কীর্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র যথোপযুক্ত সম্মান দিয়েছেন। সে-বিষয়ে বঙ্কিম অতিভাষণ একেবারেই করেন নি। তেমনি তাঁর যথার্থ দানের মহত্ত্ব যেখানে, সেখানেও তিনি অকুণ্ঠিত। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করি। এই ঘটনাটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন। তিনি লিখেছেন—

'সমাজ সংস্কারেরর প্রতি বঙ্কিমের বিরূপতার একটি কারণ মনে হয় বিদ্যাসাগরের প্রতি অবচেতন ঈর্ষ্যা।...

এই মন্তব্যের পাদটীকায় আছে—

'বাঙালা গদ্যের প্রধান লেখক বলিয়া সর্বস্বীকৃত বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠায় বাঙ্কম বহুবার সবলে এমন কি উষ্মার সহিত প্রতিবাদ' করিয়াছেন। দ্বিতীয় বর্ষের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বহুবিবাহ প্রবন্ধ এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য। "শ্রীঅঃ" অর্থাৎ অক্ষয় চন্দ্র সরকার লিখিত 'তুলনায় সমালোচনা' প্রবন্ধটির মূলেও বঙ্কিমের প্রেরণা আছে।'

প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকার আলোচনা আমরা বিস্তৃতভাবেই করেছি। কোথাও উষ্মা আছে বলে সন্দেহ-মাত্র হয় নি। 'বহুবিবাহ' প্রসঙ্গের আলোচনা যথাস্থানে করব। 'তুলনায় সমালোচনা' প্রবন্ধের মূলেও বঙ্কিমের প্রেরণা আছে। এটা তিনি অনুমান করেন না, বিশ্বাস করেন। কারণ অনুমান দ্যোতক 'মনে হয়' শব্দও তিনি এখানে প্রয়োগ করেন নি। তবে এটা অস্বীকার করবার নেই যে এতে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ; লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন ছিলেন সেটাও সত্য। এই লেখাটিতে বিদ্যাপতি কবিকঙ্কণ দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আছে। আজকাল যাকে রম্যরচনা বলে এই 'রূপক ও রহস্য' নামে বইয়ের রচনাগুলি তাই—কৌতুকভঙ্গিতে লঘুভাবে রচিত। বিদ্যাসাগর অংশটির কিছু অংশ—।

'বিদ্যাসাগর মহাশয় টাঁকশাল এবং তাঁহার গ্রন্থগুলি দুআনি, সিকি,, আধুলি ও টাকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাগরী টাঁকশালে রূপা ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই; টঙ্কযন্ত্রাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্যস্থানে রূপা ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসায় করিতেছেন। খণ্ড রূপা যেমন একটু পরিষ্কার করিয়া চারিদিকে গোলাকার করিয়া কিরণ দিয়া উপরে **Queen Victoria** (কুইন ভিকটোরিযা) ছাপিয়া দিলেই মুদ্রা হয়, সেইরূপ অন্যের রূপা একটু বাঙালা রসান চড়াইয়া চতুষ্কোণ করিয়া চারিদিক ছাঁটিয়া উপরে শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত ছাপিয়া দিলেই সাগরিক গ্রন্থ হয়। বর্ণপরিচয় দু আনি; ক্ষুদ্র বালকের জন্য প্রয়োজনীয় শীঘ্র নষ্ট হয় বা হারাইয়া যায়। 'এইরূপ তাঁহার কোন গ্রন্থ সিকি, কোন গ্রন্থ আধুলি ও কোন গ্রন্থ টাকা।'

কৌতুক রহস্যের আবরণ তুলে নিলে এতে যে বক্তব্যটি পাওয়া যায় সে-বক্তব্য বঙ্কিমের অনুরূপ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা মৌলিক নয়, অনুবাদ। বঙ্কিমগোষ্ঠীর অন্তর্গত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্কিমের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন কিন্তু রহস্যচ্ছলে সে কথা বলায় বিদ্যাসাগরের প্রতি উষ্মা বা বিদ্বেষ প্রকাশ পায় কিনা, সে কথাই চিন্তনীয়! এই রচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লেখকের রহস্য—

'বঙ্কিমবাবু মিষ্ট লঙ্কার আচার আর বঙ্গ দর্শন সেই আচারের হাঁড়ি। খানিক মিষ্ট লাগিবে, খানিক অম্লরসময়; অম্ল—শুধু খেতে ভাল লাগে না', কিন্তু ভাল খাইবার সময় অম্ল না হলে চলে না। কিন্তু ঝালের ভাগটা যাহার অদৃষ্টে পড়িবে, তাহার হাড়ে হাড়ে জ্ব-জ্ব করিবে।'

এটা অস্বীকার্য অবশ্যই নয় যে বঙ্কিম সম্বন্ধে লেখকের কণ্ঠভঙ্গিমা প্রশংসার সুরে ধ্বনিত। সেটার কারণ বঙ্কিমের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠতা ছাড়াও সাহিত্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর নিজের প্রত্যয়। কমলাকান্তের লেখাগুলি (ভাদ্র, ১২৮০ থেকে প্রকাশিত —তুলনায় সমালোচনা, বৈশাখ ১২৮০) তখনও প্রকাশিত হয় নি। লোকরহস্যের অন্তর্গত ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল (বৈশাখ শ্রাবণ ১২৭৯) ইংরাজস্তোত্র (অগ্রহায়ণ ১২৭৯) বাবু (ফাল্গুন ১২৭৯) আগেই বেরিয়েছে। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসৃষ্টিকে অক্ষয়চন্দ্র কী চোখে দেখতেন, তার পরিচয় আছে 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে।

তিন

বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক স্থলে সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দুটি দলে ভাগ করে দেখেছেন, ইংরেজি শিক্ষিতের দল এবং সংস্কৃত শিক্ষিতের দল। তাঁর সম্পাদিত গীতার ভূমিকায় তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত এবং নবাশিক্ষিতের চিন্তাপ্রণালীর ব্যবধানের উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজে ছিলেন ইংরেজিশিক্ষিত তাঁর সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতিতেই তিনি লাভ করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষানীতি ইংরেজি চিন্তাভঙ্গি যে আধুনিক যুগের প্রধান অনুসরণীয়। এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। সংস্কৃতবাদী এবং ইংরেজিবাদীর দ্বন্দ্ব সরকারীভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই নিরসন হয়েছিল। সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান পীঠস্থানরূপে সংস্কৃত কলেজ গণ্য ছিল। হিন্দু কলেজ ও তারপরে হুগলি ও সংস্কৃত কলেজ ইংরেজি শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এসব কলেজ সংস্কৃত পড়ানো হত না। অবশ্য টোলে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়ার সুযোগ ছিল। এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত সংস্কৃতজ্ঞগণ অনেকদিন পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষিতদের সঙ্গে সমাজে সম্মানিত হয়েছেন। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রবন্ধে নানা স্থানেই সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রাসঙ্গিক অবতারণা আছে। কিন্তু তাঁদের প্রতিপত্তিও ক্ষয়িষ্ণু। ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—জীবিকার জন্য এবং বিশুদ্ধ আধুনিক জ্ঞানের জন্য—স্বীকৃত হতে চলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই দলভুক্ত, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ'।

বিদ্যাসাগর শিক্ষা লাভ করেছিলেন সংস্কৃত কলেজে। কর্মসূত্রে এই কলেজের সঙ্গেই ছিল তাঁর যোগ। সকলেই জানেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েও বিদ্যাসাগর রক্ষণশীলতার পরিপোষক তো ছিলেনই না বরং শিক্ষাপদ্ধতিতে আধুনিক লক্ষ্য নিয়ে আসবার জন্য কী সংগ্রাম তিনি করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত পড়ানো হত, হিন্দু দর্শন ব্যাকরণ সাহিত্য স্মৃতি এমন কী লীলাবতীও পড়ানো হত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ধারণা ছিল হিন্দুর সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন ভ্রান্ত। পড়াতে হয় বটে, তবে তার প্রতিষেধক হিসেবে য়ুরোপীয় দর্শন (বার্কলের ভাবমূলক দর্শন বাদ দিয়ে) বিশেষত মিলের মূল লজিক পড়ানো দরকার। এ কথা তিনি ব্যালেনটাইনের রিপোর্টের উত্তরে স্পষ্ট ভাবেই লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতও ছিল প্রায়ই একই রকম। বঙ্কিম বলছেন৯ —

It will be generally admitted that at the present day in the full blaze of the light which the science and the philosophy of Europe pours upon us, the value of the Hindu Philosophy for the sake of the knowledge of Nature which it can impart is insignificant.

বিদ্যাসাগর স্কুল কলেজে মিলের লজিক পড়েন নি। পাশ্চাত্য দর্শন সম্ভবত তিনি নিজের চেষ্টাতেই আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু শুধু পড়া মাত্র নয়, এই দর্শনের প্রকৃতি তিনি উত্তমরূপেই বুঝেছিলেন: ব্যালেনটাইন প্রস্তাব করেছিলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয়বিধ দর্শন পড়ানো হক যাতে ছাত্রেরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে উভয় দর্শনের অন্তর্নিহিত মিলটিকে দেখতে পারে। বিদ্যাসাগর দেশীয় পণ্ডিতদের সম্পর্কে সমস্ত আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিজেদের শাস্ত্রে এবং পাশ্চাত্য বইতে মিল দেখতে পেলে নিজেদের শাস্ত্র সম্বন্ধে অন্ধতাই বেড়ে যায় ফলে কুসংস্কারগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে আগ্রহ বোধ করে। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থেকেও ইংরেজি ভাষা শেখানো এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য একান্ত উদ্যোগ করেছিলেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের যে সব রিপোর্ট ইত্যাদি আছে, তার থেকেই তাঁর চিন্তাপদ্ধতির আভাস পাওয়া যায়। তা না হলে আলাদা ভাবে নিজের জীবন-দর্শন তিনি কোথাও লিপিবদ্ধ করেন নি। নিজের কথা তিনি বলতে ভালবাসতেন না। যা সমাজের কল্যাণে নিয়োজিতব্য শুধু তাই তার প্রকাশ্য আলোচনার পরিধিতে

এসেছে। ১৮৫০-এর ১৬ই ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন বিষয়ে যে রিপোর্ট রচনা করেছিলেন এবং বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর ব্যালেন-টাইনের কলকাতা সংস্কৃত কলেজের সংস্কার সম্বন্ধে রিপোর্টের উত্তরে লেখা বিদ্যাসাগরের দীর্ঘ মন্তব্য—এই দুটি রিপোর্টেরই এ বিষয়ে গভীর প্রনিধানযোগ্যতা আছে। এ ছাড়া সংস্কৃত কলেজের হাতে-লেখা অপ্রকাশিত নথিপত্রের মধ্যে Notes on the Sanskrit College নামে একটি দীর্ঘ রচনা আছে।[১০] এটির রচয়িতাও বিদ্যাসাগর; এর তারিখ ২২ই এপ্রিল ১৮৫২। এটিকেও অন্য দুটি রচনার সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। এ গুলি ভালভাবে পড়লে বিদ্যাসাগরের চিন্তাপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সেকালের সর্বাতিশায়ী প্রত্যক্ষতাবাদ এবং উপযোগবাদের দ্বারা তিনিও প্রভাবিত ছিলেন। বিদ্যা বা জ্ঞানকে তিনি চেয়েছেন জীবনলগ্ন করতে, বস্তুহীন নির্বিকল্প জ্ঞানচর্চায় তাঁর অনুকূলতা ছিল না। 'কতকগুলি নাস্তিক ধর্মাধ্যক্ষ হইয়াছে'—দেবেন্দ্রনাথের এই ক্ষুব্ধ উক্তি অলৌকিক ধর্মবিশ্বাসে অবিশ্বাসী সমাজ কল্যাণকামী বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হয়েছিল। আমাদের সমাজ ও চারিত্র্যনীতিকে উন্নততর করবার জন্য মানবিক মূল্যমানকেই আধ্যাত্মিক মূল্যমানের পরিবর্তে স্থাপন করতে হবে—এ বিশ্বাস বিদ্যাসাগরের যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রেরও তেমনি। বিদ্যাসাগর ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব। বঙ্কিমচন্দ্র নীরব ছিলেন না, কিন্তু তাঁর আলোচনায় মানুষই মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। একটি নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের আদর্শ রচনার প্রয়োজনেই ঈশ্বরকে প্রীতিমূল করে ধর্মতত্ত্ব রচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, বহির্বিষয়ক জ্ঞান আমাদের আহরণ করতে হবে ইংরেজদের থেকে আর আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমরা নেব ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে। সংস্কৃত কলেজে যদি ফিজিকস কেমিস্ট্রি পড়ানো যেত তবে বিদ্যাসাগর বোধহয় তার সমর্থন করতেন প্রবল ভাবেই। তিনি সংস্কৃত তুলে দিয়ে আধুনিক গণিত পড়ানোর প্রস্তাব করেছিলেন। সংস্কৃত দর্শন পড়াতে তিনি বলেছেন, কিন্তু তার আগে ইংরেজি ভাষায় উত্তমরূপে আয়ত্ত করেই দর্শনশ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পাবে। তাতে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, এ দেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে।'[১১] প্রয়োজনীয় বিদ্যানু-শীলনের কথা আমাদের দেশে প্রথম বলেছিলেন রামমোহন। তিনি বেকনের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে বিশেষ করে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রতিক্রিয়ায়। পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পরে সংস্কৃত

কলেজের অধ্যক্ষ রূপে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাও সেই দিকেই ধাবিত।—'ডাঃ ব্যালেনটাইন কৃত সংক্ষিপ্তসার ও গ্রন্থের যেগুলি আমি অনুমোদন করিতে পারি যেমন Novum organum-এর সুন্দর ইংরেজী সংস্করণ, তাহা আনন্দসহকারে সত্বর বিদ্যালয়ে চালাইব।১২ মিলের লজিক এবং বেকনের নোবাম অরগানাম—দুইয়ের প্রতি বিদ্যাসাগরের আগ্রহ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর মিলের প্রভাব সুজ্ঞাত। বেকনের নবযুক্তিবাদে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ তাঁর প্রবন্ধগুলিতে সুস্পষ্ট। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিম লিখেছেন১৩—

An intense theological spirit rarely leads to anything but the deductive method and the Hindu method was almost solely and purely deductive. Observation and experiment were considered beneath the dignity of Philosophy and Science.

এই যুক্তিবাদী ইহকেন্দ্রিক শিক্ষাকে যদি মানুষের প্রত্যক্ষ কাজে লাগানো না যায়, তবে সে-শিক্ষা নিষ্ফল। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েরই মতামত খুব স্পষ্ট। কতকগুলি পুঁথিগত তথ্য ও তত্ত্ব অধিগত করিয়ে ছাত্রদের ইস্কুল-কলেজের বাইরে ছেড়ে দিয়ে কী লাভ যদি না তারা সে-শিক্ষাকে সর্বসাধারণের কাজে লাগাতে পারল। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করেছিলেন বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করবার জন্য। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাতেও ইংরেজি শিক্ষালাভের লক্ষ্য ছিল তাই। দুজনের ক্ষেত্রেই অর্জিত বিদ্যাকে মাতৃভাষার চরণে অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয়। বিদ্যাসাগর তাঁর রিপোর্টে সংস্কৃত শিক্ষার এই উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন—

> আমাকে যদি আমার নিজের পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়া হয় তাহলে সংসদের কাছে এইটুকু আমি বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে সংস্কৃত কলেজ কেবল যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষার আদর্শ পীঠস্থান হবে তাই নয়, মাতৃভাষাচর্চারও প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এমন একদল ভবিষ্যতের শিক্ষক তৈরী হবে এখান থেকে যাঁরা দেশের জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের পথ সুগম করবেন।

মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাবিস্তারের আদর্শ নিয়ে তিনি বাংলা পাঠশালা এবং মডেল ইস্কুল স্থাপনে যে বিরাট কর্মব্রতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার মধ্যে এই কর্মী পুরুষের দীর্ঘ সঞ্চিত ভাবনা রূপ পেতে গিয়েছিল। যদিও সরকারী আনুকূল্যের অভাবে সেটা সার্থক হতে পারে নি। কিন্তু এরই মধ্যে মনীষী বিদ্যাসাগরের মনীষার

বৈশিষ্ট্য নিহিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো কর্মী পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ও সাধ বিদ্যাসাগরের মতোই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্য অভিপ্রেত সার্থকতা অর্জন করতে পারল না। দেশের লোকের সঙ্গে বরং একটা নতুন জাতিগত ব্যবধান গড়ে তুলল। বঙ্গদর্শন পত্রিকার পত্রসূচনাটি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় নির্দেশক। এখানে বঙ্কিম পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পরে বাঙালি সমাজের নবজাগরণের প্রচ্ছন্ন ত্রুটির কথা বলে তার সংশোধনের প্রস্তাব করেছেন। ইংরেজি-শেখা সমাজের সঙ্গে দেশের লোকের সহৃদয় যোগ স্থাপিত হল না। সেদিক থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার মানবিক দান জাতির ক্ষেত্রে ব্যর্থ হবার উপক্রম। এই ব্যর্থতা থেকে বাঁচাবার জন্যে বিদ্যাসাগর যেমন বাংলা শিক্ষার উপর জোর দিতে চেয়েছেন সংস্কৃত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের দ্বারাই জাতীয় জীবনে ইংরেজি শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে চেয়েছেন। এ দিক দিয়ে বাঙালির জাগরণ দুই মনীষীর চিত্তক্ষেত্রে বহন করে এনেছিল একই সম্ভাবনা আর একই আশঙ্কা। তার মীমাংসাও দুয়েরই ভাবনায় দেখা দিয়েছে একই রূপে—মাতৃভাষার ব্যাপক চর্চা।

চার

বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা-কল্পনার সবচেয়ে সুবিধাজনক ক্ষেত্র হচ্ছে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ। তা ছাড়া বহুবিবাহরোধের চেষ্টাতেও নাকি বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেন নি। রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের জন্য সমাজকল্যাণমূলক আন্দোলন করেছিলেন নিঃসন্দেহ তা বাঙালির প্রগতিশীল মানবিক চিন্তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই চিন্তাধারাই পরবর্তী নিদর্শন ছিল বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রচলনের প্রয়াস; অসংখ্য জাতিভেদবিভক্ত হিন্দুসমাজে কৌলীন্য প্রথার প্রতাপে বর্ষীয়ান্ কুলীনের সঙ্গে সমাজরক্ষার জন্য বালিকা ও কিশোরী কন্যার বিবাহ দেবার প্রথা প্রবর্তিত থাকাতে সমাজে বিধবার সংখ্যা স্ফীত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহ আন্দোলন আরম্ভ করলেন, তার কয়েক বছরের মধ্যেই কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক ও বিধবাবিবাহ নাটক রচনার দ্বারা অন্যায় সমাজনীতির মূল কেন্দ্রে একালের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বিদ্যাসাগর যে আন্দোলন করলেন সেটা একটা আকস্মিক চিন্তা নয়। বিধবা-বিবাহ প্রচলন করা যায় কিনা এ বিষয়ে নব্যবঙ্গেরা তাদের স্পেকটেটর পত্রিকায় আলোচনা আরম্ভ করে দিয়েছিল। এই পত্রিকাতে বিধবাবিবাহ পক্ষের ও বিপক্ষের

যুক্তি যাজ্ঞবল্ক্য ও মনু থেকেই উদ্ধৃত হয়েছে। ১৮৪২ এর এপরিল মাসে বেরোয় 'কোন পত্রপ্রেরক হইতে প্রাপ্ত'। ওই বছরের জুলাই মাসে এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা হয়। এই নিবন্ধে প্রকাশিত মনোভাব এই প্রসঙ্গে আলোচনার যোগ্য।[১৪]

বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকা নব্যবঙ্গ দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা। নূতন ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত, নূতন নীতিবোধে উদ্‌বুদ্ধ তরুণ সমাজের এই পত্রিকা রক্ষণশীল সমাজের বিরোধী। কিন্তু এতেও এমন একটি সংযত মনোভাব অবলম্বন করা হয়েছে যাতে বিদ্যাসাগরের আইন প্রবর্তন প্রয়াসের বিরোধিতা করলেই তাকে প্রগতিবিরোধী বলা চলে কিনা সন্দেহ। পূর্বোক্ত পত্রপ্রেরকের সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নিয়ে সম্পাদক বলছেন—

> 'আমরাও সম্প্রতি কষ্টচিত্তে দেখিতেছি যে উক্ত নিষেধ স্মৃতিশাস্ত্রের বিপরীত।'

পুনর্বিবাহিতার সন্তানের ধনাধিকারী হওয়ার জন্য সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করার কথা কেউ কেউ বলছেন। সে-সম্বন্ধে বক্তব্য—

> 'অতএব পুনর্ভূ বিবাহ পুনঃস্থাপিত হইলে তৎপুত্রের ধনাধিকারার্থ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনীয়; তাহাতে আমারদিগের বিবেচনায় এই বোধ হয় যে এতদ্রূপ প্রার্থনা অস্মদাদির পক্ষে শ্রেয়স্করী নহে। যেহেতু তাহা হইলে আমাদিগের ধর্মাধর্ম বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে তাহাও এই দৃষ্টান্ত বলে ক্রমশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক উচ্ছিন্ন হইবেক।'

তা হলে কীভাবে এই প্রথা প্রবর্তিত হইতে পারে?

> 'তাহাতে আমরা এই মাত্র কহিতে পারি যে অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা ও যুবাদিগের কর্তব্যকর্মে সাহসাবলম্বনের উপদেশ ব্যতিরেকে এতদ্বিষয় ক্রমশঃ সিদ্ধ হইবার আর সদুপায় নাই।'

বেঙ্গল স্পেকটেটরে নব্যবঙ্গেরা যখন এসব আলোচনা করছে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন চার বৎসরের শিশু। হুগলি-প্রেসিডেন্সি কলেজের আধুনিকতার আবহাওয়ায় মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রের মুক্ত ও উদ্ধত চিন্তার পরিচয় আছে বঙ্গদর্শনের পূর্বে প্রকাশিত ইংরেজি রচনাগুলিতে। নব্যবঙ্গীয় চিন্তারীতিতে তিনি অভ্যস্ত। বিধবার বিবাহ-প্রথা বিদ্যাসাগর ও নব্য-শিক্ষিত সমাজ-সংস্কারকদের অভিপ্রেত। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে কি অভিমত পোষণ করেছেন?

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকেই বিষবৃক্ষ উপন্যাসটি ধারাবাহিকক্রমে বেরোতে থাকে। এই উপন্যাস থেকেই একটা বড়ো প্রমাণ পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কতখানি ব্যঙ্গ করেছেন বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য। বিধবা কুন্দের প্রতি নগেন্দ্র-

নাথের অনুরাগের আভাস পেয়ে সূর্যমুখী উদবিগ্ন হয়ে কমলমণিকে চিঠিতে সব কথা জানায়—

> 'আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে?

বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাবিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি সমাজসংস্কারের বিরোধী ছিলেন এবং যিনি এই সংস্কার-আন্দোলনের নেতা তাঁর প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন—এই তথ্যের প্রমাণ হিসাবে বিষবৃক্ষের নায়িকা সূর্যমুখীর এই উক্তিটি প্রায় সর্বত্র উদ্‌ধৃত হয়ে থাকে। বিষবৃক্ষ রচনার দু বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমের বিখ্যাত প্রবন্ধ সাম্য বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। সাম্যের একটি অধ্যায় স্ত্রীজাতির অধিকার বিষয়ে। সেখানে বঙ্কিম স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। আলোচনা বিশুদ্ধ যুক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এবং সেখানে ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের কোনো চিহ্নই নেই। বঙ্কিমের যুক্তি সমানাধিকারের পক্ষে। পুরুষের যদি একাধিক বিবাহের অধিকার থাকে তবে স্ত্রীরও সেই অধিকার থাকা উচিত। তবে সে-প্রসঙ্গে বঙ্কিম স্পষ্টতই একথা বলেছেন, পুরুষের বহুবিবাহের অধিকার থাকতে পারে। কিন্তু বহুবিবাহ অবশ্যই ভালো নয়। স্ত্রীর অধিকার থাকতে পারে অবশ্যই, কিন্তু বিধবার বিবাহেরও প্রয়োজন নেই যেমন পুরুষের একাধিক বিবাহের প্রয়োজন নেই। বঙ্কিমচন্দ্র আর-এক জায়গায় বিধবাবিবাহের উল্লেখ করেছেন। লোকরহস্যের ইংরাজ স্তোত্রে ব্যঙ্গচ্ছলে বলেছেন—

> 'আমি বিধবার বিবাহ দিব, কুলীনের জাতি মারিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব—কেন না তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে।'

এই তিনটি উল্লেখ তিনটি ভিন্ন প্রসঙ্গে স্ব স্ব অর্থ পরিধিতেই বিবেচ্য। সূর্যমুখী তখন স্বামীর ভালোবাসায় বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় বিহ্বল। স্বামী নগেন্দ্রনাথ বিধবা কুন্দকে বিবাহ করতে উদ্যত। এমনি আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-ব্যবস্থার প্রতিকূলে তার তীব্র ব্যঙ্গ উচ্চাচরণ করেছে। উপন্যাসের নায়িকার এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছু হতে পারে না। আমরা কি আশা করতে পারি এই মুহূর্তেও সূর্যমুখী স্থির ভাবে যুক্তিবিচার সহ নিরপেক্ষ মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে। সূর্যমুখী যদি তাই করত তবে নায়িকা হিসাবে সে হত অত্যন্ত কৃত্রিম। সূর্যমুখীর এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত মনোভাবের কোনো সাক্ষ্য দেয় না, সাক্ষ্য দেয় অভিমান ক্ষুব্ধ মর্মজ্বালাপীড়িতা এক ব্যর্থ নারীর। লোকরহস্যের উল্লেখটি বিদ্রূপাত্মক

(satirical) রচনায় নিবন্ধ। বিদ্রূপ কার প্রতি? বিদ্যাসাগরের প্রতি না উচ্ছৃঙ্খল বাবুসমাজের প্রতি? ইংরাজের বাহবা পাওয়ার লোভে স্বসমাজের সংস্কার করতে নব্যশিক্ষিতরা সোরগোল করেছে। যদি সংস্কারান্দোলনের পশ্চাৎপটে ইংরাজের বাহবা পাওয়ার হীনম্মন্যতা না থাকত, যদি সে-আন্দোলন স্বাভাবিক লোকহিতৈষা থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকে তবে সে আন্দোলনের সাধু উদ্দেশ্য সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। কিন্তু সেটা কতখানি সত্য? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্দোলন ইংরাজের প্রসাদলোলুপতার ফলে প্রবর্তিত এ রকম কোনো ইঙ্গিত কি তাঁর এই বিদ্রূপ রচনায় আছে? কোনো সমাজে যখন পুরনো নীতিকে ভেঙে নতুন রীতির প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলতে থাকে, অসৎ লঘুচিত্ত লোকেরা সেই পরিবর্তনের সুযোগ নেয়। তারা এই সুযোগে নিজেদের অসৎ অভিপ্রায় চরিতার্থ করে। তার দৃষ্টান্ত বঙ্কিমের উপন্যাসেই আছে। রজনীর হীরালাল এই রকম একটি দুর্বৃত্ত বাবু। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের তারাচরণও সামাজিক প্রগতির সুযোগ নিয়ে ভণ্ড প্রগতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। যে-চরিত্রবল রামমোহন-বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন, আদর্শবাদের যে-প্রেরণা তাঁদের কর্মধারাকে বেগবতী করেছিল ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে তার চিহ্নমাত্র থাকে না বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি রচনাতে এবং অন্যত্র বিদ্যাসাগরের সমাজকল্যাণমূলক কাজের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। ইংরেজের কাছে আলোকপ্রাপ্ত রূপে পরিচিত হবার বাসনা যদি ক্ষুদ্রচেতাদের মধ্যে প্রবল থাকে তবে আত্মোৎসর্গকারী মহাপুরুষের আত্মদান কোনো দিক দিয়ে ক্ষুণ্ণ হয় না।

উপন্যাস এবং ব্যঙ্গরচনা ছাড়া বঙ্কিম তৃতীয় আর একটি প্রসঙ্গে বিধবা-বিবাহের বিষয় আলোচনা করেছেন—সাম্যে। এখানে বঙ্কিমের মতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। ব্যক্তিগত রাগদ্বেষকে মূল্য না দিয়ে মানবিক যুক্তিতে বিধবার স্বামিগ্রহণের অধিকারকে তিনি স্বীকার করেছেন। সামাজিক ঘটনা হিসাবে এর গুরুত্ব নানা দিক দিয়ে। যে সমাজে কৌলীন্যপ্রথা প্রবল সেখানে অভিভাবক দায়মুক্ত হবার জন্য বৃদ্ধ জামাতাকে কন্যা দান করে মেয়ের বৈধব্য ডেকে আনেন। এরই সঙ্গে জড়িত বাল্যবিবাহ প্রথা। বিধবাবিবাহ প্রচলনের সঙ্গে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সমস্যাও জড়িত। বিধবাবিবাহের প্রবর্তন তাই সমাজের প্রকৃতিকে বদলে দিতে পারে। এইজন্যই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র এটিকে নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার যে-পরিকল্পনা করেছিলেন, তার একটি অধ্যায় ছিল বিধবাবিবাহ-প্রথা। সমাজদার্শনিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে সমাজের

অর্থনৈতিক বাস্তব তথ্যকে যথাযথ বিচার করে দেখতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পদ্ধতিগত পার্থক্য ছিল এখানেই। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রাচার এবং দেশাচার মাত্র বিবেচনা করেছেন। শাস্ত্রের অনুশাসনবিধি উদ্‌ধৃত ও আলোচিত করে স্ত্রীজাতির প্রতি অসীম করুণাবশত এর সমর্থন করেছেন।১৫

> 'বিধবাবিবাহ কর্তব্য কর্ম কি না অগ্রে ইহার মীমাংসা করা অতি আবশ্যক। যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এ দেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্রসম্মত কর্ম সর্বতোভাবে কর্তব্য কর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।'

বহুবিবাহ প্রথা দূর করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের যুক্তিও ছিল শাস্ত্রনির্ভর। অবশ্য বহুবিবাহ সমাজে যে কুফল নিয়ে এসেছে, বিদ্যাসাগরের কোমল এবং দয়ার্দ্র হৃদয় তাতে বিচলিত হয়েই এর নিরাকরণে উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু সে জন্য তিনি শাস্ত্রের যুক্তিই সন্ধান করেছেন। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় এই প্রথার উপযোগিতা কতদূর সে দিক তিনি আলোচনা করেন নি। তবে বিদ্যাসাগর এ সম্পর্কে লিখেছেন১৬—

> 'বহুকাল ইঙ্গরেজী বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজ জাতির সহিত ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ দ্বারা, কলিকাতায় ও কলিকাতার অব্যবহিত সন্নিহিত স্থানে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের অনেক অংশে নিবৃত্তি হইয়াছে; কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যার তাদৃশ অনুশীলন হইতেছে না; ও ইঙ্গরেজ জাতির সহিত তদ্রূপ ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ ঘটিতেছে না; সুতরাং তত্তৎ স্থানে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব তদবস্থই রহিয়াছে।'

ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার দ্বারা উন্নততর নীতিবোধের ফলে বহু বিবাহ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা বহুদূর গ্রামে এখনও প্রসারিত হয় নি। সেক্ষেত্রে এই প্রথা রহিত করতে হলে আইন প্রণয়ন ছাড়া গতি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র আইন প্রণয়নের পক্ষপাতী ছিলেন না। বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ ১৮৭১-এ প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র এই বইয়ের সমালোচনা (১২৮০) করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, বহুবিবাহ এমনিতেই লুপ্ত হওয়ার মুখে। শিক্ষার বিস্তার ছাড়াও অর্থনৈতিক কারণেও এই প্রথা টিঁকে থাকতে পারবে না। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে এই প্রথা রোধ করা যায় না, কারণ লোকাচার শাস্ত্রের চেয়েও প্রবল। আবার আইন করে এই প্রথা বন্ধ করতে গেলে শাস্ত্রের যুক্তি দেওয়াও অপ্রয়োজন। রাজব্যবস্থার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র

একটা অর্থপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। আইন যদি করতে হয়, তবে সে-আইন শুধু হিন্দুর জন্য নয়, মুসলমানেদের জন্যও প্রযোজ্য করতে হবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মিলেই ভারতীয় প্রজা। এই যুক্তির উত্তর বিদ্যাসাগর পূর্বেই দিয়েছিলেন এই বলে[১৭]

> 'বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে, বাঙ্গালা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যত দোষ ও যত অনিষ্ট ঘটিতেছে ; বোধহয় ভারতবর্ষে অন্য অন্য অংশে তত নহে এবং বাঙ্গালা দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেরূপ দোষ বা সেরূপ অনিষ্ঠ শুনিতে পাওয়া যায় না।... এদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকে বহুবিবাহ করিয়া থাকেন ; তাঁহারা চিরকাল সেরূপ করুন ; তাহাতে আবেদনকারীদিগের কোন আপত্তি নাই এবং তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছাও নহে, এবং প্রার্থনাও নহে যে গবর্ণমেন্ট এই উপলক্ষে তাঁহাদেরও বহুবিবাহের পথ রুদ্ধ করিয়া দেন ; অথবা গবর্ণমেন্ট এক উদ্যমে ভারতবর্ষের সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে বিবাহ বিষয়ে ব্যবস্থা করুণ, ইহাও তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে।'

যুক্তির দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রই যে ঠিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বহুবিবাহ যে কুপ্রথা বঙ্কিমচন্দ্র বারবারই বলেছেন। কিন্তু এই প্রথা নিবারনের জন্য বিদ্যাসাগর যে পথ অবলম্বন করেছেন, তার যথার্থতা সম্বন্ধেই তাঁর বক্তব্য। এ বিষয়ে বঙ্কিমের বাস্তব-সচেতনতার প্রমাণ হিসাবে আর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়। প্রজাবৃদ্ধি যে আমাদের দেশের এবং সমাজের দারিদ্রের একটি প্রধান কারণ—এ বিষয়ে 'রামধন পোদ' প্রবন্ধটি স্মরনীয়। উপার্জনহীন ব্যক্তির বিবাহ আমাদের সমাজে প্রচলিত সংস্কারের দ্বারা সমর্থিত। বঙ্কিমের সতর্ক চিন্তা অর্থনৈতিক কারণটির বাস্তবতা প্রমাণিত করেছে। সুতরাং যিনি প্রজাবৃদ্ধির জন্য উদ্বিগ্ন বহুবিবাহ সমর্থন তাঁর দ্বারা নিঃসন্দেহে সম্ভব নয়।

বিধবাবিবাহ পুস্তিকা যখন প্রকাশিত হল তখন বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে তার সমালোচনা করা সম্ভব ছিল না কারণ তখন তিনি কলেজের ছাত্র মাত্র। বহুবিবাহ গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হল তখন বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূচনা হয়েছে। এর দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হলে বঙ্গদর্শনে (১২৮০ আষাঢ়) বঙ্কিম এর সমালোচনা করলেন। সেই সময়ে বিদ্যাসাগরের যুক্তিপ্রণালী সম্পর্কে তিনি কিছু কঠোর মন্তব্য করেন, যে মন্তব্যগুলি তিনি বিবিধ প্রবন্ধে এই প্রবন্ধটি সংকলনের সময়ে বর্জন করেছিলেন।[১৮] বিদ্যাসাগর তখন পরলোকগত। বর্জিত অংশে বা অন্যত্র কোথাও বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহত্বকে ছোট করেছেন এমন প্রমাণ নেই। ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতামতের বিস্তৃত আলোচনা করেছি। মতভেদের ফলে সমালোচনা করতে বাধ্য

হলেও বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা রক্ষা করেই সসম্ভ্রমে কথা বলেছেন। বঙ্কিমের সমালোচনার নিদর্শন দেওয়ার জন্য বর্জিত অংশ থেকে কঠোর উক্তি কয়েকটি উদ্ধৃত করছি।

> 'আমাদের নিতান্ত বাসনা ছিল যে আমরা ঐ পণ্ডিতদিগকে বলিব যে মহাশয়েরা কোন সাহসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তিনি ধর্মশাস্ত্রে অভ্রান্ত, আপনারা কিন্তু জানেন না আমাদিগের আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে সে কথা বলিতে অবকাশ দিলেন না. আপনি সকল কথা বলিয়াছেন।

এবং

> 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা চিরকাল ভদ্রের ব্যবহার্য ভাষারই প্রত্যাশা করি। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও দূষনীয়া ভাষা ব্যবহার করেন নাই—এ সম্বন্ধে তাঁহার ভাষা পূর্বাবধি কলঙ্কশূন্য। কিন্তু এই পুস্তকে দেখিলাম যে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। সভারূঢ় বিচারমত্ত তৈলোজ্জ্বল ললাটবিশিষ্ট নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় তিনি প্রতিবাদিগণকে গালি দিয়াছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র যে গালি দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরকে সমালোচনা করেছেন সেই গালি দেওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই শুভকর্মের বিরোধিতার জন্য বিদ্যাসাগরের অধীরতা ছিল। কিন্তু গালি দেওয়াকে আমরাই সমর্থন করি না বলে রামমোহনের সংযমকে প্রশংসা করে থাকি এবং বিরোধী পক্ষ কটু ভাষা ব্যবহার করেছেন বলে নিন্দা করে থাকি। বিদ্যাসাগরের বিরোধী পণ্ডিতেরাও মহাশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, তথাপি বিদ্যাসাগর তাঁদের শাস্ত্রজ্ঞানহীনতায় কটাক্ষ করে যে সব মন্তব্য করেছেন বঙ্কিম সে-মন্তব্য কিছু কিছু উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন। বিদ্যাসাগর ভাষায় কতখানি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন। একটি অশ্লীল উপাখ্যান ব্যবহার করেছেন বলেও বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষোভ করেছেন। সেই সঙ্গে বলেছেন—

> বিদ্যাসাগর মহাশয় সদনুষ্ঠানপ্রিয়তা গুণে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।…তাঁহারাও বিদ্যাসাগরকে কটু বলিতে ত্রুটি করেন নাই। গালি খাইয়া বিদ্যাসাগর গালি দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা লিপিকার্যের সুসভ্য প্রণালী তাদৃশ অবগত নহেন, বিদ্যাসাগর যে তাঁহাদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহারই জন্য এত কথা বলিলাম।'

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দুর্বলতাগুলি দেখে দুঃখ প্রকাশ করে এই প্রবন্ধটি লিখেছেন। তিনি তো তারানাথ তর্ক বাচস্পতির পুস্তিকার সমালোচনা করে কোনো প্রবন্ধ লেখেন নি। দ্রোণকে অন্যায় পক্ষ সমর্থন করতে দেখে অর্জুন যে ক্ষোভ করেছিলেন, তাতে দুঃখ ছিল কিন্তু অশ্রদ্ধা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত' বা 'রাজসিংহের' সমালোচনায় প্রয়োজনে যে স্পষ্ট ভাষণ করেছিলেন তাতেও অশ্রদ্ধা ছিল না। তুলনার জন্য কৃষ্ণচরিত্র প্রবন্ধ থেকে স্থান বিশেষ উদ্ধৃত করি—

> বঙ্কিম যদি তুচ্ছ বিরোধ এবং অন্নদার সমালোচনার অবতারণাপূর্বক চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন তবে সেই চাঞ্চল্য তাঁহার আদর্শের নিত্যনির্বিকারতা দূর করিয়া ফেলে। অনেক ঝগড়া আছে যাহা সাপ্তাহিক পত্রের বাদপ্রতিবাদেই শোভা পায়। যাহা কোনো চিরস্মরণীয় গ্রন্থে স্থান পাইবার একেবারে অযোগ্য।

বক্তব্য ও রীতির উভয় দিক দিয়েই বঙ্কিমের বিদ্যাসাগর সমালোচনা এবং রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম-সমালোচনা প্রায় এক।

পাদটীকা

১। জীবনস্মৃতি।

২। রবীন্দ্রজীবনী।

৩। সারস্বত সমাজ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১৭৮-১৮২ এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, ১২৭, ২২০

৪। সন্তোষকুমার অধিকারী, বিদ্যাসাগর ১৯৭০, নিঃসঙ্গ জীবন-অধ্যায়, পৃঃ ১০৭

৫। বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৩০৪-৩০৫। প্রচলিত সংস্করণ ধর্মতত্ত্বে বিদ্যাসাগরের নাম নেই, কেশবচন্দ্রের নাম আছে। লেখক চণ্ডীচরণ লিখতে ভুল করে থাকতে পারেন। কেশবচন্দ্র বৈদ্য বলেই নামটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে থাকা দরকার ছিল। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধার উল্লেখ চণ্ডীচরণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্জাত।

৬। বিদ্যাসাগরস্মৃতি, ১৩৪৬

৭। পুরাতন প্রসঙ্গ (বিদ্যাভারতী) পৃঃ ৪৫

৮। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নানা উল্লেখ অন্যত্রও পাওয়া যায়। তার মধ্যে তাল তলার চটি (সাধারণী, ২৯ আষাঢ় ১২৮১) এবং বঙ্গভাষার লেখকে 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধটি উল্লেখ-যোগ্য। দুজায়গাতেই বিদ্যাসাগরের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা প্রশ্নাতীত।

৯। The study of Hindu Philosophy.

১০। বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ৩য় খণ্ড, ১৯৫৯, পৃঃ ৪৫

১১। বিনয় ঘোষের অনুবাদ, ঐ, পৃ ৪৭

১২। সাহিত্যসাধক চরিত, বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৪২

১৩। The Study of Hindu Philosophy.

১৪। সংবাদপত্রে সেকালের সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ডে সংকলিত।

১৫। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, ১৮৭২ সং। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, সমাজ, পৃঃ ২৪। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

১৬। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, ১৮৭১, ৪র্থ আপত্তি। ঐ পৃষ্ঠা ২৪১

১৭। ঐ সপ্তম আপত্তি।

১৮। বর্জিত অংশ সম্প্রতি শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন' গ্রন্থে (পৃঃ৫৮-৬৪) উদ্ধৃত করেছেন। লেখকের উদ্দেশ্য বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি বিদ্যাসাগর-বিদ্বেষ প্রণোদিত তাই দেখানো।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

শিক্ষায় শিক্ষাধ্যায়ের স্থান

মহামতি বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' লিখিয়াছেন। যিনি 'সঙ্কীর্ণ বাঙ্গালীত্বের সীমার মধ্যে প্রকাণ্ড মানবতা' (রামেন্দ্রসুন্দর), যিনি 'নীহারিকা চক্র হইতে বিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্কের মতো আপন বেগে বাহিরে বিক্ষিপ্ত' (রবীন্দ্রনাথ), সেই বিদ্যাসাগর শিশুশিক্ষার জন্য প্রথমভাগ বর্ণপরিচয় রচনা করিলেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয়।

কিন্তু বিষয়টি বিস্ময়েরও নহে। প্রজ্ঞা প্রবীণ ব্যক্তি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের স্কাই-লার্কের মত যেমন ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করেন, তেমনই ক্ষুদ্র নীড়টির প্রতিও লক্ষ্য রাখেন। এদেশের পরমতত্ত্ব 'মহতো মহীয়ান' হইয়াও 'অণোরনীয়ান'। যাঁহার ব্যাপ্তি বিশ্বরূপে, তিনিই আবার অণুপরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট। কাজেই যে বিদ্যাসাগর সমাজের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে বহুব্যাপ্ত, তিনি যে শিশুশিক্ষার বিষয়ও ভুলিবেন না, ইহাই স্বাভাবিক।

তাহা ছাড়া বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনটাই শিক্ষা-কেন্দ্রিক। শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাদান ও শিক্ষাবিস্তার—ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে এই তিনটি ভূমিকাই মুখ্য। তাঁহার জীবনের অন্যান্য কীর্তি এই ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত। একটি উপপাদ্যের প্রতিজ্ঞা হইতে যেমন নানা অনুসিদ্ধান্ত গড়িয়া উঠে, তেমনই বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার বা সাহিত্য সাধনা—এই শিক্ষা চিন্তাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর বনস্পতির মূল কাণ্ড শিক্ষা, তাহার পুষ্পফলও শিক্ষা। তাই শিক্ষার প্রথম সোপান তাঁহার

দৃষ্টির বহির্ভূত থাকে নাই।

শিক্ষা শব্দটি নীনার্থবোধক। শব্দার্থের উন্নয়ন-প্রসার পদ্ধতিতে যুগে যুগে এই শব্দটির অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সাধারণতঃ শিক্ষা বলিতে বোঝায় বিদ্যা-ভ্যাস। গীতায় ইহাকেই বলা হইয়াছে 'স্বাধ্যায়াভ্যসনম'; উহা বাঙ্ময় তপস্যার অন্তর্ভুক্ত (গীজা ১৭,১৫)। বেদাধ্যয়নই স্বাধ্যায়। অতএব শিক্ষার গোড়ার কথা পঠন বা অধ্যয়ন। চিন্তা নায়ক বেকন এই অর্থেই শিক্ষাকে বলিয়াছেন—মানবজীবনের আনন্দ ও অলঙ্কার; অধ্যয়ন কর্মক্ষেত্রে কর্মদক্ষতারও হেতু।

কিন্তু শিক্ষা শুধু বিদ্যার অনুশীলন নহে, শিক্ষা অনুশীলিত বিদ্যা। ইহা শুধু উপায় নহে উপেয়। বৈষ্ণব ধর্মে যেমন সাধ্য প্রেম, সাধনও প্রেম—শিক্ষাজগতেও তেমনই সাধ্য সাধন রূপ শিক্ষা একাকার। বস্তুতঃ অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা অর্জিত হয়, তাহাই শিক্ষা। 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষিত' শব্দ দুইটি শিক্ষার এই ব্যাপকার্থেরই সঙ্কেত।

বৈদিক যুগে 'শিক্ষা' শব্দটি আর একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হইত। আলোচ্য প্রবন্ধে 'শিক্ষাধ্যায়' পদটি সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'শিক্ষাধ্যায়' ব্যাখ্যায় শিক্ষার সেই বিশেষ অর্থ বিশদ করিয়া বলিয়াছেন, 'শিক্ষা শিক্ষ্যতেহনয়েতি বর্ণাদ্যুচ্চারণলক্ষণম্'—যাহা দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ লক্ষণ শেখানো হয়, তাহাই শিক্ষা। এই অর্থেই ছয়টি বেদাঙ্গের প্রথম অঙ্গ 'শিক্ষা'।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাশাস্ত্র ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান। কার্ণাদ দর্শন বলে, বস্তুকে বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় কতকগুলি এস-রেণু (তিনটি দ্ব্যনুকের সমষ্টি); আবার এস-রেণুকে বিশ্লেষণ করিলে মিলে অবিভাজ্য পরমাণু। তেমনই ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, ভাষার মূল কতকগুলি শব্দ, আর শব্দের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ অংশ কতকগুলি শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনি। শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির কোন আকৃতি নাই। তাহা কানে শোনা যায়, কিন্তু কথায় ধরিয়া রাখা যায় না। তাই কালক্রমে ধ্বনিকে লিখিয়া রাখিবার জন্য এক একটি ধ্বনির এক একটি চিহ্ন বা প্রতীক কল্পিত হইল। ভাষার বর্ণ ধ্বনির সেই চিত্র-প্রতীক। এই ধ্বনি বা বর্ণের সন্নিকর্ষে অর্থবহ শব্দের সৃষ্টি হয়। বাগর্থময় সেই শব্দসমষ্টিই ভাষা। কাজেই যে-কোন ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি বা বর্ণ। 'শিক্ষা'র আলোচ্য বিষয় এই ধ্বনি বা বর্ণসমূহের উচ্চারণবিধি—'বাচ উচ্চারণে বিধিম্।

বেদের মন্ত্রগুলিকে শ্রুতিতে শুনিয়া স্মৃতিতে ধারণ করা হইত। শুধু তাহাই

নহে, যজ্ঞকর্মে মন্ত্রপ্রয়োগ করা ছিল প্রধান ক্রিয়া। ঋষিরা জানিতেন, ধ্বনির উচ্চারণ সুস্পষ্ট ও যথাবিহিত না হইলে মন্ত্র ফলপ্রসূ হয় না। উপরন্তু উচ্চারণ অশুদ্ধ হইলে তাহা অনর্থ সৃষ্টি করে। অশুদ্ধ বাগ্‌বজ্র যজমানকেই আঘাত করে। তাই বেদাধ্যয়-নের প্রথম অঙ্গরূপে তাঁহারা শিক্ষাশাস্ত্রের স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন! শিক্ষাকে তাঁহারা বলিয়াছেন বেদ-পুরুষের ঘ্রাণ বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়—'শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য'। ঘ্রাণেন্দ্রিয় ব্যতীত যেমন প্রাণ ধারণ করা যায় না, তেমনই শিক্ষা ব্যতীত বেদ ধারণ করা অসম্ভব। বেদ জ্ঞানের প্রথম সোপান শিক্ষা, ভাষাজ্ঞানেরও প্রথম সোপান শিক্ষা।

বেদাধ্যয়নে শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হইলেও, বৈদিক শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থের স্বল্পতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঋক্ প্রাতিশাখ্যে আচার্য শৌনক সংক্ষেপে 'শৌদ্ধাক্ষরোচ্চারণঞ্চ প্রতৃণম্'—শুদ্ধ অক্ষর উচ্চারণের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'শীক্ষাধ্যায়ে'[১] আরও সংক্ষেপে শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়গুলি নির্দেশিত হইয়াছে :

ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণ স্বরঃ। মাত্রা
বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ॥ (তৈ, উ, ১/২)

—শিক্ষা ব্যাখ্যা করিব। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম ও সন্তান (এইগুলি শিক্ষার বিষয়)। এইরূপে শিক্ষাধ্যায় উক্ত হইল। এখানে ঋষির বাক্ সংযম লক্ষণীয়। বোধ হয়, ঋষির মুখ্য লক্ষ্য আত্মতত্ত্ব উপদেশ করা। সে তত্ত্ব গভীর গম্ভীর। সে তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত করিতে 'শিক্ষা' অপরিহার্য হইলেও, তত্ত্বের তুলনায় শিক্ষার গুরুত্ব গৌণ। তাই সংহত বাক্যে ঋষি শিক্ষার দিঙ্‌নির্দেশ করিলেন মাত্র।

পরবর্তীকালে বৈয়াকরণ পাণিনি এই প্রাচীন শিক্ষাশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষাসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ধীমান্ দাক্ষীপুত্রের এই কীর্তিই প্রাচীন ধ্বনি বিজ্ঞানের আকর গ্রন্থরূপে স্বীকৃত। কিন্তু পাণিনীয় শিক্ষা সূত্রাকারে গ্রথিত। এই সূত্র সংক্ষিপ্ত, গূঢ়ার্থ বোধক ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। তাই আরও পরবর্তীকালে পাণিনির সূত্রের বহু বৃত্তি ও ভাষ্য রচিত হইয়াছে। পাণিনির সুযোগ্য কোন শিষ্য 'অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পাণিনীয়ং মতং যথা' বলিয়া সংক্ষেপে মাত্র ৫৯টি শ্লোকে পাণিনীয় শিক্ষার মূল বক্তব্য বিবৃত করিয়াছেন। অগ্নি পুরাণের শিক্ষাধ্যায়ে (৩৩৬ অধ্যায়) যে বর্ণোচ্চারণের বিধি বিবৃত হইয়াছে, তাহাও প্রকারান্তরে পাণিনীয় শিক্ষারই প্রতিধ্বনি। সাধারণতঃ বর্ণশিক্ষাকে শিশুশাস্ত্রের অন্তর্গত মনে করিয়া যেন তেন প্রকারেণ বর্ণপরিচয় সমাপ্ত করা হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে বর্ণশিক্ষার বিষয়কে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা

হয় নাই। তন্ত্রশাস্ত্রে ধ্বনি বিজ্ঞান শক্তিতত্ত্বের অঙ্গীভূত। পরা নাদ পরমা শক্তি। জীবদেহে এই শক্তিই 'শব্দব্রহ্মস্বরূপিনী কুণ্ডলিনী'। 'পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিনী' বাগ্ বৈখরী ইঁহারাই অভিব্যক্তি।২ শিক্ষাশাস্ত্রেরও প্রথম আলোচ্য বিষয় এই বর্ণ বা ধ্বনি। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রথমেই বিচার করা হইয়াছে ধ্বনি সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলি মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট হইয়া থকে। জলতরঙ্গের ধ্বনিও ধ্বনি, বায়ু প্রতিহত আন্দোলিত বৃক্ষপত্রের ধ্বনিও ধ্বনি। সে ধ্বন্যাত্মক হইলেও অর্থবহ নহে। কিন্তু মানুষের ভাষাকে নিরর্থক হইলে চলে না। কারণ 'বিবক্ষা' অর্থাৎ কিছু বলার ইচ্ছাই বাচক ধ্বনির মূল প্রেরণা। তাই তাহাতে থাকে বিশেষ সঙ্কেত, বিশেষ অর্থ। সে ধ্বনিকে উৎপন্ন করিতে প্রয়োজন বিশেষ প্রযত্ন। প্রাচীনেরা বলেন, বিবক্ষু আত্মার ইচ্ছাতেই সে প্রযত্ন সিদ্ধ হয়। মন অর্থাৎ বিবক্ষু আত্মা দেহস্থ অগ্নিকে আঘাত করে। সেই আঘাতে বায়ু উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন বায়ু শ্বাসযন্ত্র হইতে বাগ্‌যন্ত্রে আসামাত্রই বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে কোন-না-কোন স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইহার ফলেই অনাহত নাদ বৈখরী নাদে রূপান্তরিত হইয়া অভিপ্রেত ধ্বনি সৃষ্টি করে। এই ধ্বনিই অর্থময় ভাষার মূল উপাদান। এই প্রক্রিয়া-কেই ছন্দোবদ্ধ করিয়া ঋষি বলিলেন,

'আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নি মাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্।
মারুতস্তূরসি চরন্ মন্ত্রং জনয়তি স্বরম্॥ (পাণিনীয় শিক্ষা, ৬ ; অগ্নি, ৩৩৬)

—আত্মা বুদ্ধি দ্বারা কিছু বলিবার ইচ্ছা করিলে তদর্থে মনকে নিযুক্ত করে। মন কায়াস্থ অগ্নিকে আঘাত করিলে, অগ্নি বায়ুকে চালনা করে। সেই বায়ু উরঃস্থলে সঞ্চরণ করিয়া ধ্বনিস্বর উৎপন্ন করে। মুখবিবরে অভিহত এই ধ্বনিই মানুষের ভাষাধ্বনি 'বা বর্ণমালার বর্ণ। এই ধ্বনি বা বর্ণ দুই প্রকার—স্বর ও ব্যঞ্জন. ব্যাকরণের পরি-ভাষায় সমগ্র স্বরবর্ণকে বলা হয় 'অচ্' এবং ব্যঞ্জনবর্ণ মালাকে বলা হয় 'হল্' বা 'হস্'। অ-কারাদি ষোড়শ বর্ণ স্বর, আর ক-কারাদি চৌত্রিশটি বর্ণ ব্যঞ্জন। মোট বর্ণ সংখ্যা পঞ্চাশৎ। তাই তন্ত্রে প্রপঞ্চজননী কুণ্ডলিনীকে বলা হয় 'পঞ্চাশৎবর্ণময়ী'। তন্মধ্যে স্বর স্পষ্ট উচ্চারিত বা সুস্পষ্টরূপে ধ্বনিত হয়। এই জন্য ঋক প্রাতিশাখ্যের ভাষ্যকার উব্‌বট বলেন, 'স্বর্যন্তে পঠ্যন্তে ইতি স্বরাঃ' স্বর নিজেই শব্দিত হয়, উহা কাহারও অধীন নয়। স্বর স্বতন্ত্র, স্বরাট্। কিন্তু ব্যঞ্জনের সে শক্তি নাই। ব্যঞ্জন নিজে নিজে

স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে পারে না। স্বরের সহায়তায় স্পষ্ট ব্যক্ত হয় বলিয়া তাহার নাম ব্যঞ্জন—'তৈধ্যঙ্গ্যাদ্ ব্যঞ্জনং ভবেৎ' (উব্‌বট)।৩

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণ ব্যতীত স্বর, মাত্রা, বল (প্রযত্ন), সাম (বর্ণের মধ্যমবৃত্ত উচ্চারণ) এবং সন্তান (ক্রমবদ্ধ বর্ণোচ্চারণের ফল) প্রভৃতি শিক্ষা-বিষয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে। বস্তুতঃ স্বর, মাত্রা, বল প্রভৃতি উৎপাদিত ধ্বনি বা বর্ণের উচ্চারণের বিশেষ বিশেষ কৌশল মাত্র। পরবর্তীকালের বৈয়াকরণগণ উহাদিগকে উচ্চারণ-কৌশলের মধ্যে গণনা করিয়াই বর্ণোচ্চারণের পাঁচটি প্রকারভেদের কথা বলিয়াছেন,—

বর্ণান্ জনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধা স্মৃতঃ।
স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্নানুপ্রদানতঃ॥ (অগ্নি ৩৩৬ অধ্যায়)

—স্বর, কাল, স্থান, প্রযত্ন ও অর্থ প্রদান অনুসারে বর্ণের (বর্ণোচ্চারণের) বিভাগ পাঁচ প্রকার।

প্রথমেই স্বরের বিচার। স্বর নাদধর্ম। উহা অনুরণিত স্বরধ্বনি বিশেষ। ধ্বনির উঠা-নামায় উহাতে একটি সুর সৃষ্টি হয়। বৈদিক উচ্চারণে স্বরের প্রাধান্য ছিল। অনুরণনের উচ্চতা-নীচতা সমানতা ভেদে স্বর তিন প্রকার—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। পাণিনীয় সূত্রে বলা হইয়াছে—'উচ্চৈরুদাত্তঃ। নীচৈরনুদাত্তঃ। সমাহারঃ স্বরিতঃ।' উদাত্ত-অনুদাত্ত দ্বারা কিন্তু তার স্বর বা মিন্‌মিনে ধ্বনি বোঝায় না। নাদের গাম্ভীর্যই উদাত্ত, তাহার হ্রাস অনুদাত্ত, স্বরিত এই উভয়ের সমাহার বা মেলন। তালুর উর্ধ্বে স্বর উচ্চারিত হইলে স্বর উদাত্ত, তালুর নিম্নভাগে উচ্চারিত হইলে উহা হয় অনুদাত্ত; আবার কোন স্বরে উদাত্ত-অনুদাত্ত ধর্মের মিলন ঘটিলে হয় স্বরিত। বস্তুতঃ স্বর শব্দের অভিব্যঞ্জক নাদের ধর্মবিশেষ। উহা দ্বারা কণ্ঠকম্পন জনিত সুরের রেশ জাগে। বৈদিক ভাষাতেই স্বরের উত্থান পতনের গুরুত্ব ছিল। তাহার ফলে বেদমন্ত্র উচ্চারণে সুরের অনুরণন জাগিত। স্বরের স্থান পরিবর্তনে অর্থেরও পরিবর্তন ঘটিত। পরবর্তীকালে বর্ণোচ্চারণে এই নাদবৈচিত্র্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বর্ণোচ্চারণের অপর নিয়ম কালগত। এক এক প্রকার ধ্বনি এক এক প্রকার কালপরিমাণ ভোগ করে। কোন ধ্বনির উচ্চারণকাল হ্রস্ব, কোনটির বা দীর্ঘতর। উচ্চারণের এই কালপরিমাণকে বলা হয় মাত্রা। বস্তুতঃ মাত্রা ধ্বনির দৈর্ঘ্য বিচারের মানদণ্ড: মাত্রা অনুসারে ধ্বনির তিনটি প্রধান ভাগ—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। হ্রস্বধ্বনি এক মাত্রা, দীর্ঘ ধ্বনি দুই মাত্রা এবং প্লুত দুইয়ের অধিক মাত্রা ভোগ করে। প্রকৃত

পক্ষে মাত্রার ভোক্তা স্বরধ্বনি। এই জন্য স্বরবর্ণের উচ্চারণেই হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ, হ্রস্ব উ, দীর্ঘ ঊ প্রভৃতি উচ্চারণ করা হয়। স্বরধ্বনিগুলির ভিতর অ, ই, উ, ঋ প্রভৃতি হ্রস্ব এবং আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ দীর্ঘ। আবার এই ধ্বনিগুলির মধ্যে অ, ই, উ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ দূরাহ্বানে, গানে বা রোদনকালে দুইয়ের অধিক দীর্ঘতর মাত্রায় উচ্চারিত হয়। এই প্রকারে উচ্চারিত স্বর প্লুত স্বর। কেহ কেহ প্লুত স্বরকে স্বতন্ত্র স্বর বলিয়া গণনা করিয়া বলেন, 'স্বরা বিংশতিরেকশ্চ'—স্বরবর্ণের সংখ্যা একবিংশতি। স্বরের সহায়তা ব্যতীত হল্ বা ব্যঞ্জন বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না বলিয়া এককভাবে ব্যঞ্জনের কোন মাত্রা ধরা হয় না। কিন্তু কোন কোন বৈয়াকরণ ব্যঞ্জনকে বলেন 'অর্ধ মাত্রা'—'ব্যঞ্জনং চার্ধ মাত্রকম্' (দুর্গাদাস)। শাক্ত তন্ত্রেও, যে ব্যঞ্জন বিশেষভাবে অনুচ্চার্য, তাহাকে অর্ধমাত্রা বলা হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে,—

অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা...... (১/৭৪-৭৫)

—যাহা বিশেষরূপে উচ্চার্য নহে বলিয়া অর্ধমাত্রারূপে স্থিতা, তাহাও তুমি। উচ্চারণ-স্থান অনুসারে বর্ণের বিভাগটি সুপরিচিত। বাগ্‌যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ স্থানগুলিই ধ্বনি বা বর্ণের উচ্চারণ-স্থান। ওই সকল স্থানে শ্বাস বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার ধ্বনি উৎপন্ন করে। প্রাচীন বৈয়াকরণেরা বর্ণোচ্চারণের আটটি স্থান নির্দেশ করিয়া থাকেন,—

অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা।
জিহ্বা মূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ॥ (শিক্ষা, ১৩; অগ্নি, ৩৩৬)

—উরঃ (বক্ষঃ), কণ্ঠ, শিরঃ (মূর্ধা), জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু—এই আটটি বর্ণমালার উচ্চারণ স্থান।

প্রাচীন বিভাগ অনুসারে—অ, আ, হ্ কণ্ঠ্যবর্ণ; ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ জিহ্বামূলীয়; ই, ঈ, চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্, য্, শ্ তালব্য; ঋ, ৠ, ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্ র্ ষ্ মূর্ধন্য; ৯, ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্, ল্ স্ দন্ত্য উ, ঊ, প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ ওষ্ঠ্য বর্ণ; অন্তঃস্থ ব দন্তৌষ্ঠ্য, এ ঐ কণ্ঠ তালব্য, ও ঔ কণ্ঠৌষ্ঠ্য, ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ অনুনাসিক এবং ং ঃ অযোগবাহ বা আশ্রয়স্থানভাগী। ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে আবার স্পর্শ, অন্তঃস্থ ও উষ্ম ভেদে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। জিহ্বাগ্র দ্বারা কোন-না-কোন উচ্চারণ স্থানকে স্পর্শ করিয়াই ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপন্ন হয়। স্বরবর্ণ উচ্চারণে জিহ্বা মুখবিবরে নানাস্থানে সঞ্চালিত হয়, কিন্তু কোন স্থান স্পর্শ করে না। ক্ হইতে ম্ পর্যন্ত ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বাগ্র সম্যগ্‌ভাবে কোন-না-কোন

স্থান স্পর্শ করে—এই জন্য উহাদিগকে স্পর্শবর্ণ বলে। অন্তঃস্থ বর্ণের (য্, র্, ল্, ব) উচ্চারণে ঈষৎ স্পর্শ হয়। উষ্ম বর্ণাদির (শ্, ষ্,স্, হ্) উচ্চারণে জিহ্বা দূরে অবস্থান করে। আধুনিক ধ্বনি-বিজ্ঞানীরা 'উরঃ' স্থানকে উচ্চারণস্থান বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ বক্ষোদেশ বা শ্বাসযন্ত্র উচ্চারণের স্থান নহে। কিন্তু আধুনিকেরা একথা স্বীকার করেন। শ্, ষ্, স্-এর উচচারণে শ্বাসবায়ু মুখ গহ্বরে অল্প বাধা প্রাপ্ত হয় এবং হ্-এর উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য থাকে। এই সকল বর্ণের উচ্চারণে শ্বাসবায়ু অধিক ক্রিয়াশীল এবং শ্বাসবায়ুর সঞ্চালন স্থান প্রধানতঃ 'উরঃ' বা বক্ষোদেশ। এই কারণেই প্রাচীনেরা উষ্মধ্বনির উচ্চারণ স্থানরূপে 'উরঃ'-কে উচ্চারণ-স্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কণ্ঠ ও জিহ্বামূলকেও কেহ কেহ স্বতন্ত্র উচ্চারণ-স্থান বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু শিক্ষাশাস্ত্রে কণ্ঠ্য ও জিহ্বামূলীয় বর্ণকে পৃথকরূপেই গণ্য করা হইয়াছে। কারণ, কণ্ঠ্য ও জিহ্বামূলীয় বর্ণের উচ্চারণে বৈলক্ষণ্য আছে।

উচ্চারণে 'প্রযত্ন' বলিয়া আর একটি ভাগ স্বীকার করা হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ইহাকে বলা হইয়াছে 'বল'। শাঙ্কর ভাষ্যে বলই যে প্রযত্ন—'বলং প্রযত্ন-বিশেষঃ'—তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভাষাধ্বনি সৃষ্টির সমগ্র ব্যাপারটাই প্রযত্নসিদ্ধ। কিছু বলিবার ইচ্ছা বলে মানুষ চেষ্টা করিয়া ধ্বনি উৎপন্ন করে। প্রযত্নপ্রেরিত হইয়াই নাভিস্থান হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়া ঊর্ধ্ব দিকে গমন করে। আবার মুখবিবরে আহত হইয়া শ্বাসবায়ু যে বৈখরী ধ্বনিতে পরিণত হয়, তাহাও প্রযত্নসাপেক্ষ। এই দিক হইতে স্বর-কাল-স্থানগত বর্ণোচ্চারণ প্রযত্নেরই ফল। নাদের উদাত্তাদি অভিব্যক্তি, বর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘাদি উচ্চারণ এবং কণ্ঠ-তালাদি-স্থান হইতে ধ্বনির অভিব্যঞ্জন—সব কিছুই প্রযত্নসিদ্ধ। বৈয়াকরণগণ আভ্যন্তর ও বাহ্য ভেদে প্রযত্নের যে দুইটি ভাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে উচ্চারণের সকল প্রক্রিয়াকেই প্রযত্নের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। স্পৃষ্ট, অস্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত উচ্চারণ আভ্যন্তর প্রযত্নের ফল এবং ঘোষ-অঘোষ, অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ ও শ্বাসাদি-ভেদে বর্ণোচ্চারণ বাহ্য প্রযত্নের ফল। বিবৃত উচ্চারণে আস্যভাগ খোলা থাকে, যেমন আ-এর উচ্চারণ; সংবৃত উচ্চারণে আস্য সংরুদ্ধ হয়,—যেমন ই, উ-এর উচ্চারণ। হ-কারকে বলা হয় প্রাণ বর্ণ, উহার উচ্চারণে বেশি শ্বাসবায়ুর প্রয়োজন হয়। যে সকল বর্ণের উচ্চারণে হ সংযুক্ত থাকে, তাহা মহাপ্রাণ বর্ণ—যেমন খ্, ছ্, ঠ্, থ্, ফ্ এবং ঘ্, ঝ্, ঢ্, ধ্, ভ্। যাহাতে হ-অর্থাৎ প্রাণবর্ণের সংযোগ থাকে না, সেগুলি অল্পপ্রাণ বর্ণ—যেমন ক্ চ্ ট্ ত্ প্ এবং গ্ জ্ ড্ দ্ ব্। ঘোষবর্ণ বলিতে বোঝায়

নাদ-প্রধান বর্ণ; উহাতে কণ্ঠতন্ত্রীর কম্পনে ধ্বনি গাম্ভীর্যপূর্ণ হয়। বর্গের তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম বর্ণগুলি (গ্ জ্ ড্ দ্ ব্, ঘ্ ঝ্ ঢ্ ধ্ ভ্ এবং ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্) ঘোষবর্ণ। আর বর্গের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণগুলি (ক্ চ্ ট্ ত্ প্ এবং খ্ ছ্ ঠ্ থ্ ফ্) অঘোষ বর্ণ। শিক্ষাশাস্ত্রে বর্ণোচ্চারণের এই সকল প্রয়াসকেই বলা হইয়াছে 'প্রযত্ন'।

শিক্ষাশাস্ত্রের শেষ ভাগ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ মতে 'সন্তান', পরবর্তী বৈয়াকরণদের মতে 'অনুপ্রদান'। ইহা প্রকৃতপক্ষে বর্ণের ক্রমিক সংস্থানের ফলে একটি অর্থময় পদের প্রতীতি। বর্ণ সংযোগের ফলে যদি কোন অর্থবোধ না হইত, তবে বর্ণশিক্ষার কোন প্রয়োজনই থাকিত না। আচার্য শঙ্কর শিক্ষাধ্যায়ের প্রয়োজন বিচার করিতে গিয়া এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, ধ্বনি বা বর্ণশিক্ষার আসল লক্ষ্য অর্থবোধ। বর্ণসংস্থানের পারম্পর্য সেই উদ্দেশ্যেই সিদ্ধ করে। ক্রমান্বয়ে বর্ণ সন্নি-বেশের বিধানটিই 'সন্তান' বা বর্ণের অর্থ প্রাদনের শক্তি। পরবর্তীকালে বর্ণোচ্চারণের এই বিভাগটি অবলম্বন করিয়া ব্যাকরণের 'স্ফোটবাদ' গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভর্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয় গ্রন্থে স্ফোটবাদ সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন।

সু-মুখে সু-স্বরে সুস্পষ্ট যথাস্থানোচিত উচ্চারণই শুভকর উচ্চারণ। বর্ণোচ্চা-রণের অশুদ্ধি শুধু নিন্দিত নয়, অনর্থবহ। অগ্নি পুরাণে তাই বলা হইল,—

ন করালো ন লম্বোষ্ঠো না ব্যক্তো না নুনাসিকঃ।

গদ্‌গদো বহুজিহ্বশ্চ ন বর্ণান্ বক্তুমর্হতি॥ (অগ্নি শিক্ষাধ্যায়)

—করাল অর্থাৎ তীক্ষ্ণভাষী বা দেঁতো, লম্বোষ্ঠ, অস্পষ্ট বক্তা, নাকা, গদগদবাক্ ও বহুজিহ্ব (অতিবাদী বা দ্রুতভাষী) ব্যক্তি বর্ণের সঠিক উচ্চারণ করিতে পারে না। সেখানে আরও বলা হইয়াছে, এমনভাবে বর্ণ উচ্চারণ করিতে হইবে। যাহাতে ধ্বনি অস্পষ্ট বা পীড়িত না হয়—'এবং বর্ণাঃ প্রযোক্তব্যা না ব্যক্তা ন চ পীড়িতাঃ।'

শিক্ষা-ব্যাকরণ শাস্ত্রকে অনেকেই শিশু-শাস্ত্র বলিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ণোচ্চা-রনের এই বিধি-বিধানগুলির কথা স্মরণ করিলে শিশুশিক্ষার্থীর প্রথম শিক্ষনীয় বিষয় যে মোটেই সহজ ছিল না, তাহা অনুমান করা যায়। পঞ্চতন্ত্রের সূচনায় একজন সভাপণ্ডিত বলিয়াছিলেন, 'দ্বাদশভির্বর্ষৈর্ব্যাকরণং শ্রূয়তে'—ব্যাকরণ শিক্ষা করিতেই বার বছর লাগে। তাহার পর ধর্মকামার্থ শাস্ত্রের অধ্যয়ন। শিক্ষাশাস্ত্রই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার ভিত্তি গড়িয়া দেয়। তাই শিক্ষাশাস্ত্রের বোধ বিষয়ে প্রাচীনদের এত প্রযত্ন ও সতর্কতা। শিশুশিক্ষায় সেইজন্য সময়ও দেওয়া হইত বেশী। যাহাতে ভিতটি মজবুত হয়।

কিন্তু নিয়ম যাহাই থাকুক, শিশুশিক্ষার এই প্রথম স্তরটি চিরকালই অবহেলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'প্রভূত কালজ্ঞেয়ানি শব্দশাস্ত্রাণি' অথচ 'অশাশ্বতোহয়ং জীবিতব্য বিষয়ঃ'। কাজেই শব্দশাস্ত্রের অনন্তপারত্ব এবং আয়ুর স্বল্পতা বিচার করিয়া বরাবরই এই শাস্ত্রের সারগ্রহণের চেষ্টা করা হইয়াছে। কলাবোধনে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিও অবলম্বন করা হইয়াছে। শিক্ষাশাস্ত্র, এইভাবেই কালক্রমে স্বাতন্ত্র্যবর্জিত হইয়া ব্যাকরণের প্রথম পাঠরূপে গৃহীত হইয়াছে। হয়তো শ্রুতি-সাহিত্য অধ্যয়নে শিক্ষাশাস্ত্রের যে গুরুত্ব ছিল, লিখিত আকারে পুঁথি সাহিত্য পঠনে তাহার গুরুত্ব কমিয়া গিয়া থাকিবে।

শিক্ষা শাস্ত্রের শিক্ষাবিধি বিশেষভাবে লঙ্ঘিত হইয়াছে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে—মগধে-বঙ্গে-রাঢ়ে। এই সকল দেশ প্রথমে ছিল মৃধবাক্ দস্যুদের দেশ, পরবর্তীকালে বাগদুষ্ট ব্রাত্যদের। কাজেই এ সকল দেশের উচ্চারণ রীতি ছিল অত্যন্ত শিথিল। 'শতায়ুর্ভব' স্থলে 'হতায়ুর্ভব' বলিয়া পাছে আশীর্বাদ করে, এই ভয়ে বৈদিক যুগের লোকেরা এদেশের লোকের কাছে আশীর্বাদও কামনা করিতেন না। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগেও দেখা যায়, মাগধী প্রাকৃতে 'র' স্থলে 'ল' উচ্চারিত হইত। তিনটি শ-কারের (শ, ষ, স) স্থলে কেবল 'শ' এর উচ্চারণ প্রচলিত ছিল। আচার্য দণ্ডী গৌড়ী রীতির প্রশংসা করেন নাই। উপরন্তু শ্রুত্যনু প্রাণের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া তিনি এদেশের ধ্বনি-কাণত্বের প্রতি কটাক্ষই করিয়াছেন। একই উচ্চারণ স্থান সম্ভূত ধ্বনিসাম্যে যে অনুপ্রাণ হয়, তাহাই শ্রুত্যনুপ্রাণ। যথা, 'এষ রাজা যদা লক্ষ্মীং, বাক্যাংশে ষ-র, জ-য, দ-ল প্রভৃতি বর্ণযুগ্ম যথাক্রমে মূর্ধন্য, তালব্য ও দন্ত্য বর্ণবর্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহাদের পুনরাবৃত্তিতে অনুপ্রাণ হইয়াছে। দণ্ডী বলেন, 'ইতীদং নাদৃতং গৌড়ে' (কাব্যাদর্শ ১'৫৪) —অর্থাৎ গৌড়ীয়েরা এই ধরনের অনুপ্রাসের সমাদর করে না। অর্থাৎ তিনি যেন বলিতে চান, গৌড়দেশে উচ্চারণগত সূক্ষ্ম বোধের অভাব আছে। মন্তব্যটি একেবারে অসত্যও নহে। রাঢ়দেশে অন্ত্য ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনির উচ্চারণ একরূপ হয়, যেমন কাক=কাগ্, মধু=মদু. আদি স্বরধ্বনি 'র' এ রূপান্তরিত হয়, যেমন উপেন= রুপেন। বঙ্গালবাণীতে মহাপ্রাণধ্বনি অল্পপ্রাণ হইয়া যায়, যথা, ঘা=গা হয়= অয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বঙ্গদেশীয় এই উচ্চারণ রীতি লইয়া ব্যঙ্গ করিতে কসুর করেন নাই।

বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।

বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥ (চৈতন্য ভাবগত আদি ১০)

রাঢ়ে গৌড়ে বঙ্গে উচ্চারণ বিশুদ্ধির উপর কোন কালেই তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। এদেশের যজ্ঞকর্মে বিশুদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে কনৌজ কাশী হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করা হইয়াছে। শিক্ষাশাস্ত্রের চর্চা টোলে চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত থাকিলেও, বর্ণোচ্চারণ পদ্ধতি সূত্র মুখস্থ করাইয়া সমাপ্ত করা হইত। বিশেষতঃ বাংলা বর্ণশিক্ষার ব্যাপারে প্রথম শিক্ষার্থীকে খড়ি দিয়া মাটিতে অথবা কলাপাতে কিংবা তালপাতায় লিখিয়া দৃষ্টিগ্রাহ্য বর্ণগুলির সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইত। এদেশে বর্ণশিক্ষার অর্থ বর্ণের আকৃতির সহিত পরিচয়, উচ্চারণ বিধির সহিত নহে।

প্রাচীনতম বাংলা গ্রন্থ চর্যাগীতিতে 'আলি' (অ-কারাদি স্বর, এবং 'কালি' (ক-কারাদি ব্যঞ্জন) বর্ণমালার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরানো বাংলার জীবনী সাহিত্যে এবং মঙ্গল কাব্যে শিশুশিক্ষার যে বর্ণনগুলি পাওয়া যায়, তাহাতে 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। 'হাতেখড়ি' বাক্যাংশটি লিখন প্রণালীর ইঙ্গিতবহ। বর্ণ চিত্রগুলি লিখিয়া পাঠ করানো হইত। যেমন, মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের বর্ণশিক্ষার এই বর্ণনা,—

শুভদিনে শুভক্ষণে মিশ্র পুরন্দর।
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর॥ ···
দৃষ্টি মাত্র সকল অক্ষর লিখে যায়।
পরম বিস্মিত হই সর্বগণে চায়॥···
কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ বোলে।
তাহা শুনিতেই মাত্র সর্বজীব ভোলে॥

(চৈতন্য ভাগবত : আদি : ৪)

এখানে দেখা যায়, প্রথমেই লেখার কাজ, তাহার পরে ক খ গ ঘ পঠন। মনে হয়, শ্রবণ, গঠন ও লিখন ক্রিয়া এক সঙ্গেই চলিত। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম শ্রীমন্তের শিক্ষাবর্ণনায় বলিতেছেন,—

গুরুবাক্যে দিয়া কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ
পড়িল শুনিল সুলক্ষণ॥

সপ্তদশ শতাব্দীর চট্টগ্রামের কবি দ্বিজ রামদেবও শ্রীমন্তের শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রায় অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন।

লিখএ কঠিনি দিয়া পাণি।
ক-বর্গাদি লিখে যত বিশেষ চিনএ কত
ফিরি ফিরি পঠে খানি খানি॥

সপ্তদশ শতাব্দের রাঢ় অঞ্চলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেন-কর্পূরের যে বাল্যশিক্ষা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেও একই সঙ্গে পড়া ও লেখার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

লাউসেন কর্পূর পড়ে গুরুর ভুবনে।
ক খ আদি বর্ণ ভেদ হইল একদিনে॥
পড়িল আঠার ফলা গুরুর নিয়ড়ে।
তালপত্রে লিখিতে সকল মনে পড়ে॥

অষ্টাদশ শতাব্দের কবি মানিক গাঙ্গুলিও লাউসেনের বর্ণ পরিচয়ের অনুরূপ বর্ণনাই দিয়াছেন।

অকারাদি ক্ষকারান্ত যে যে বর্ণগুলি।
ক্রমিক হইতে ভূমে লেখাইল সকলি॥

ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা কাব্যে শিশুশিক্ষার যে চিত্রগুলি পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে লেখা-পড়ার প্রথম অঙ্গ বর্ণচিত্র অর্থাৎ বর্ণের আকৃতির সঙ্গে পরিচয়। তাহার পর ফলা-যোগ ও বানান শিক্ষা। এই শিক্ষায় প্রাথমিক পাঠে বর্ণোচ্চারণ শিক্ষা ছিল গৌণ।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে ইংরাজ সিবিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। দেশীয় পণ্ডিত ও মুন্সীরাই ছিলেন শিক্ষক। তাঁহারা কিভাবে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করাইতেন, তাহার একটি চিত্র পাওয়া যায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থে। মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন 'one of the most profound scholars of the age'; তিনি 'উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে' প্রবোধচন্দ্রিকা রচনা করেন। গ্রন্থখানি ছয়টি কুসুমে বিভক্ত। এই গ্রন্থের তৃতীয় কুসুমে তিনি কাল্পনিক বৈজপাল ভূপতির পুত্র শ্রীধরাধরের বিদ্যারম্ভের বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় আচার্য প্রভাকর বিদ্যারম্ভ করাইতে গিয়া প্রথমেই শিক্ষাশাস্ত্রোক্ত উচ্চারণ-কৌশলের বিষয়ই উপদেশ করিতেছেন,

'হে রাজপুত্র শুন বর্ণ শব্দে স্বর ও হল ও বিসর্গ ও অনুস্বারকে

> কহে। অকারাদি ষোড়শ বর্ণকে স্বর শব্দে কহে। ককারাদি ক্ষকারান্ত চতুস্ত্রিংশদ্বর্ণকে হল ও ব্যঞ্জন ও হস্ শব্দে কহে। এ সমুদায়ে বর্ণ পঞ্চাশৎ।'

শুধু তাহাই নহে, ক্রমে ক্রমে গুরু শিক্ষাধ্যায়ের হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত উচ্চারণের বিষয়, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত ভেদে ত্রিবিধ উচ্চারণের বিষয়, স্পর্শ, অন্তাস্থ, উষ্ম বর্ণের বিষয় বলিয়া অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ বর্ণের ভাগ দেখাইয়া উচ্চারণ স্থান অনুসারে বর্ণ বিভাগের কথা বলিলেন। এই প্রসঙ্গে স্ফোটবাদের কথাও বাদ যায় নাই। তবে কি সেকালে বর্ণশিক্ষার সঙ্গে উচ্চারণবিধিও শিক্ষা দেওয়া হইত?

মনে হয়, বর্ণশিক্ষার প্রথম অঙ্গ ছিল বর্ণ বা বর্ণের আকৃতির সঙ্গে পরিচয়। এই গুলি সমাপ্ত হইবার পরে ব্যাকরণ-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। এই ব্যাকরণ শিক্ষার প্রথম পাঠ ছিল 'শিক্ষাধ্যায়' অর্থাৎ স্বর, মাত্রা, স্থান ও প্রযত্নভেদে বর্ণোচ্চারণের প্রণালী। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় এখানে ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়াই বিদ্যাভ্যাসের সূচনা করিয়াছেন।

শিশুশিক্ষায় 'শিক্ষাধ্যায়' যে ব্যাকরণ শিক্ষারই অঙ্গীভূত ছিল, তাহা আর একটি দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট হয়। বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'চরিতমালা' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে রঘুনাথ শিরোমণির বিদ্যারম্ভের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'বর্ণমালা শিক্ষা' এবং বর্ণের উচ্চারণ বিষয়ে 'ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিচার' যে পৃথকভাবে শিক্ষনীয় ছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। রঘুনাথ

> "ক', 'খ', পড়িতে আরম্ভ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন 'খ' আগে না হইয়া 'ক' আগে হইল কেন? সুতরাং বর্ণমালা শিক্ষা আরম্ভ করিবার সময়েই তাঁহাকে কি রীতিতে বর্ণমালার অক্ষরগুলি সাজানো হইয়াছে প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাকরণ শাস্ত্রের কতকগুলি বিচার, অধ্যাপককে বুঝাইয়া দিতে হইল। বাঙ্গালা বর্ণমালায় দুইটি 'ন' দুইটি 'ব', দুইটি 'ষ', তিনটি 'শ' কেন আছে, রঘুনাথের হাতে-খড়ির সময়েই বাসুদেবকে সে সকল কথা বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল।"

কাজেই দেখা যাইতেছে যে শিক্ষাধ্যায় বৈদিক যুগে ছিল বিদ্যারম্ভের প্রথম পাঠ, কালক্রমে তাহা ব্যাকরণ-শাস্ত্রের প্রথম পাঠের অঙ্গীভূত হইয়াছে। ব্যাকরণ শাস্ত্রের ধ্বনি প্রকরণ শিক্ষাও সূত্রাধ্যয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং চতুষ্পাঠীতে সেই সূত্র মুখস্থ করানো হইত মাত্র, প্রযত্নসিদ্ধ উচ্চারণের দিকে তেমন লক্ষ্য দেওয়া হইত না। বাংলা

ভাষাশিক্ষায় উচ্চারণ বিধি সর্বাপেক্ষা বেশী অবহেলিত হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীর বর্ণশিক্ষা বর্ণের আকৃতি পরিচয় মাত্র। তাই এই শিক্ষায় প্রথমাবধি লিখন অর্থাৎ বর্ণচিত্র অঙ্কনের দিকেই ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। এ দেশের শিশুশিক্ষায় 'পাততাড়ি'র (তাল পত্রের আটি বা গোছা) ব্যবস্থা বর্ণচিত্র অঙ্কনেরই স্মারক। কৌতুককর হইলেও 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে মতিলালের প্রথমশিক্ষার যে ছবি আঁকা হইয়াছে, তাহাই এদেশের বর্ণশিক্ষার চিরাচরিত চিত্র:

> 'গুরুমহাশয় পায়ের উপর পা, বেত হাতে, দিয়ালে
> ঠেসান দিয়া ঢুলছেন ও বলছেন, 'ল্যাখ রে ল্যাখ'।...
> মতিলাল আপন পাততাড়ির নিকট বসিয়া কাগের ছা বগের ছা লিখিত।'

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও 'বর্ণপরিচয়' প্রথমভাগ লিখিতে গিয়া বর্ণপরিচয়ের উপরই গুরুত্ব দিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের বর্ণপ্রকরণে বর্ণোচ্চারণ বিষয়ে শিক্ষাশাস্ত্রোক্ত যে নিয়ম প্রচলিত আছে, সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি তাহার সার সঙ্কলন করিয়া 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতেও উচ্চারণগত জটিলতাকে তিনি যথাসম্ভব সহজ-সরল করিয়াই পরিবেশন করিয়াছেন। বাংলা বর্ণ শিক্ষাতেও উচ্চারণ-বিধি অপেক্ষা বর্ণের আকৃতি ও সংখ্যার সঙ্গে প্রথম শিক্ষার্থীকে পরিচিত করাইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এইজন্য পুস্তকের নাম নির্বাচনেও তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া প্রথম ভাগের নাম দিয়াছেন 'বর্ণপরিচয়'। তাঁহার পূর্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুন স্কুলের ছাত্রীদের জন্য 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ভাগ রচনা করেন (১৮৪৯)। ইহার ছয় বৎসর পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশিত হয় (১৮৫৫)। এই পুস্তকে তিনি 'শিক্ষা' নামটিকেই বর্জন করিয়াছেন। দ্বিতীয়ভাগের বিজ্ঞাপনে তিনি একটি মূল্যবান উক্তি করিয়াছিলেন,

> 'ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে।'

বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ রচনাতেও 'শব্দের উচ্চারণ' যে নীরস ও বিরক্তিকর, তাহা তিনি বিস্মৃত হন নাই। কাজেই তাহাতেও বর্ণপরিচয়ের পরেই কতকগুলি পাঠ সংযোজিত হইয়াছে। এমন কি বর্ণপরিচয় প্রসঙ্গেও তিনি সেই বর্ণকে আদ্যবর্ণ করিয়া এমন কতকগুলি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা ছবির মত অল্পবয়স্ক বালকদিগের মানসপটে মুদ্রিত হইয়া যায়। বিদ্যাসাগরের সমগ্র বর্ণপরিচয় গ্রন্থখানিই যেন চিত্র-

ধর্মী রচনা। শুধু 'অ অজগর', 'ক কোকিল' এই চিত্রই নহে, চিত্রাত্মক বর্ণ 'সন্তান' রূপ সংহিতাও চিত্র :

পাখী উড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে।
জল পড়িতেছে। ফুল ঝুলিতেছে। (৮ পাঠ)

এই চিত্র পরিচয়ই বঙ্গের বালকদের খাঁটি বর্ণপরিচয়। শিক্ষার মূল লক্ষ্য উচ্চারণ-কুশলতা এ দেশে অবহেলিত।

পাদটীকা

১। আচার্য শঙ্কর বলেন 'শীক্ষা' শব্দটি শিক্ষাশব্দেরই ছান্দস প্রয়োগ : 'শিক্ষৈব শিক্ষা দৈর্ঘ্যং ছান্দসং' (তৈত্তিরীয় উপনিষদের শঙ্কর ভাষ্য)

২। দ্রষ্টব্য শারদাতিলক, প্রথম ও দ্বিতীয় পটল।

৩। 'যৎ স্বয়ং রাজতে তৎ তু স্বরমাহ পতঞ্জলিঃ। উপরিস্থায়িনা তেন ব্যঙ্গং ব্যঞ্জন মুচ্যতে।'

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্ব

সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্লটিনাস ও অ্যাকুইনাস :

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে প্লেটোর ভাবশিষ্য প্লটিনাস (২০৪ বা ২০৫-২৭০) গুরুর দর্শনকে শুধু পুনরুদ্ধার করেন নি, সৌন্দর্যদর্শনেরও নূতন ব্যাখ্যা দেন। 'এনিড্‌স' (Enneads) নামক গ্রন্থে তিনি এই সৌন্দর্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। গ্রীক ভাষায় সৌন্দর্যকে বলা হত Kalon। প্লটিনাস এই Kalon-এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। তিনি ছিলেন সত্য শিব ও সুন্দরের উপাসক।

প্লটিনাস-এর সৌন্দর্যদর্শন খুবই ব্যাপক এবং গভীর। প্রকৃতিতে সৃষ্ট বস্তুপুঞ্জের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্যের সুষমা।

প্লেটো তাঁর বিশিষ্ট যুক্তিতর্কের সাহায্যে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে আর্ট সত্যের জগৎ থেকে বিচ্যুত, যেহেতু আর্ট অনুকরণ নির্ভর। সে জায়গায় প্লটিনাস মনে করেছেন, প্রকৃতির জড়বস্তুকে অনুকরণ করলেও আর্টকে সত্যভ্রষ্ট বলা চলে না। কারণ আর্ট শুধু প্রকৃতির জড়বস্তুকে অনুকরণ করে না, বরং যে ভাব-বস্তু বা আইডিয়া থেকে প্রকৃতির সৃষ্টি, প্রকৃত আর্ট বা শিল্পসৃষ্টিতে সে আইডিয়ারই প্রতিফলন হয়। আর্ট সৃষ্টিতে বাস্তবের অনুকৃতির চাইতে কল্পনা শক্তির ওপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন প্লটিনাস। পরবর্তীকালের রোমান্টিক লেখকদের সৌন্দর্যভূতির মূলেও সুদূরপ্রসারী কল্পনা। এ দিক থেকে দেখলে প্লটিনাসকে রোমান্টিক আন্দোলনের

প্রথম দিশারী বলা চলে।

প্লটিনাসের সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাখ্যার পুনরুজ্জীবন ঘটে তাঁর মৃত্যুর নয়শত বৎসর পরে টমাস অ্যাকুইনাসের (Thomas Acquinas) হাতে। তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কীয় গ্রন্থের নাম সুম্মা থিওলজি (Summa Theologiae)। তাঁর মতে সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য তিনটি: পূর্ণতা, সামঞ্জস্য এবং প্রাজ্জলতা। অ্যাকুইনাস সৌন্দর্যকে জ্ঞানের দ্বারা লভ্য না বলে একমাত্র অনুভূতিগ্রাহ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন।

দান্তে এলিঘিয়েরি (১২৬৫-১৩২১)

রেনেসাঁস-পূর্ব কবি-সমালোচকদের মধ্যে ইতালীয় মহাকবি দান্তে সাহিত্য-তত্ত্বের একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা। ডি-ভালগারি এলোকুয়ি (De Vulgari Eloquio) গ্রন্থে কবি-ভাষা সম্পর্কে তিনি মতামত প্রকাশ করেছেন। তার মতে মানুষ মায়ের ঘুমপাড়ানি গানের মাধ্যমে যে ভাষা শেখে সে ভাষাতেই কাব্য লেখা উচিত। তাঁর মতে কবি-ভাষা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু যে আঞ্চলিক ভাষা দেশের সর্বজনের গ্রহণীয় সেটাই হবে কবিতা বা সাহিত্যের আদর্শ ভাষারূপ। রবীন্দ্রনাথও শান্তিপুরের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে গ্রহণের জন্য মত প্রকাশ করেছিলেন। দান্তে মনে করতেন, গ্রামের অমার্জিত অসংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে অচ্ছুৎ। কবিতার ভাষা হবে বহু আয়াস বা অনুশীলন-সাপেক্ষ।

তিনি মনে করতেন কাব্যকে গৌরবমণ্ডিত করতে পারে একমাত্র বিষয়-বস্তুর মহিমা। তিন প্রকারের বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন দান্তে: Salus, Venus এবং Virtus. Salus অর্থে নিরাপত্তা অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বোঝায়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন শৌর্য, বীর্য এবং দেশপ্রেম। Venus রতির দেবী হলেও প্রেম অর্থেই তিনি শব্দটি গ্রহণ করছেন। আর Virtus-এর অর্থ সাধারণ-ভাবে উৎকর্ষ বোঝালেও তিনি সাহিত্যের সমুন্নতির জন্য নৈতিক উৎকর্ষ বৃদ্ধিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। দেশপ্রেম, নারীপ্রেম এবং ঈশ্বরপ্রেম—যে ধরণের প্রেমকে নিয়েই কাব্য রচিত হোক না কেন, বিষয়কে ঐশ্বর্য এবং গৌরবান্বিত করাই হবে কবির লক্ষ্য।

সাহিত্য ভাবনায় বেন জনসন (১৫৭৩-১৬৩৭)

বেন জনসন শেক্সপীয়রের সমসাময়িক এবং বিশিষ্ট বন্ধু হলেও সাহিত্য-ভাবনায় তিনি ছিলেন তাঁর বিপরীতপন্থী—ক্লাসিক্যাল আদর্শে বিশ্বাসী। সেই উদ্দাম কল্পনার যুগে বেন জনসনের প্রয়াস হল সাহিত্যে ক্লাসিক্যাল আদর্শের

শৃঙ্খলা, পরিমিতিবোধ এবং নিয়মানুবর্তিতা ফিরিয়ে আনা। তাঁর সাহিত্য ভাবনার পরিচয় বিধৃত রয়েছে স্ব-লিখিত নাটকের ভূমিকায়—টিম্বার বা ডিসকাভারি (Timber or Discovery) গ্রন্থে, এবং বিশিষ্ট বন্ধু হথর্ণডন-এর (Drummond of Howthorndon) সঙ্গে আলাপচারীতে।

কমেডি সমালোচনায় তিনি বলেন, কমেডি হবে মানুষের বাস্তব কর্ম এবং কথার প্রতিচ্ছবি। শেক্সপীয়র মানুষের দোষ দুর্বলতাকে দেখেছিলেন সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে, আর বেন জনসন চেয়েছিলেন তার সংস্কার—মানুষের প্রতি দুই বন্ধুর দৃষ্টি দুই বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। রোমান্টিক লেখকদের রচনায় সস্তা রোমান্স এবং অতিপ্রাকৃতের আতিশয্য দেখে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন সাহিত্য হবে একান্তভাবে বাস্তববাদী এবং জীবনধর্মী। বেন জনসন ছিলেন ভাষায় বাগাড়ম্বরপূর্ণ রীতির একান্তভাবে বিরোধী।

রচনায় উৎকর্ষ বাড়াবার উপায় হিসেবে তিনি লেখকদের তিনটি পরামর্শ দিয়েছেন: লেখকদের উচিত শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা পাঠ করা, দ্বিতীয়ত, শ্রেষ্ঠ বক্তাদের বক্তৃতা শোনা; তৃতীয়ত, নিজের ভাষারীতির উৎকর্ষের জন্য অনুশীলন করা।

ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০)

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ড্রাইডেন ইংরাজী সাহিত্যচিন্তার জগতে নতুন ভাবনার সূত্রপাত করেন। তাঁর বিখ্যাত 'এসে অন ড্রামাটিক পোয়েজি' (Essay on Dramatic Poesy) গ্রন্থে তিনি সাহিত্য সম্পর্কীয় অনেক উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের উত্থাপন করেন: নিও-ক্লাসিক্যাল যুগের লেখকদের মত তিনি এরিষ্টটল এবং হোরেসকে দেবতার আসনে বসাতে রাজী ছিলেন না। যে নাটক এবং রঙ্গমঞ্চের কথা মনে রেখে এরিষ্টটল তাঁর বিখ্যাত Poetics গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সে নাটকের প্রকৃতি এ যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং এরিষ্টটলের নাটক সম্পর্কীয় সকল সমালোচনা এ যুগে প্রযোজ্য নয়। বস্তুতপক্ষে ড্রাইডেনই ইংরেজী সাহিত্যে চিন্তা বিচারে স্বাধীনতার প্রবর্তক। তাঁর মতে সাহিত্যের উৎকর্ষের প্রধান পরিচয় নির্ভরশীল সে সাহিত্য পাঠক মনে কি পরিমাণে আনন্দ দিয়েছে তার ওপর।

ভল্‌টেয়ার (১৬৯৪-১৭৮)

ফরাসী সমালোচনা জগতে বোয়ালোর মত ভল্‌টেয়ারেরও একটি সুনির্দিষ্ট স্থান আছে। তিনি ছিলেন সাহিত্যে সমসাময়িক ক্লাসিক্যাল আদর্শবিরোধী।

Essay upon the Epic Poetry of the European Nations from Homer down to Milton গ্রন্থে তিনি ক্লাসিক্যাল নিয়মশৃঙ্খলার বন্ধন থেকে লেখকদের জন্য অবাধ মুক্তির দাবী করেন। উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টির জন্য তিনি রুচির অনুশীলনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। উন্নত রুচির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় ভল্টেয়ার বলেছেন,—"Fine taste consists in a prompt feeling for beauty among faults and faults among beauties"—তাঁর মতে ত্রুটির মধ্যে সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যের মধ্যে ত্রুটি আবিষ্কারই উন্নত রুচির লক্ষণ। উৎকৃষ্ট আর্ট সৃষ্টির সহায়ক হিসেবে উন্নত রুচিকে সম্পূর্ণতা দান করে প্রাঞ্জলতা বা clarity.

জার্মানীতে রোমান্টিকতার সুর :

গ্যেটের মত মহাকবি এবং সাহিত্য চিন্তাবিদের আবির্ভাবের পূর্বেও জার্মান সাহিত্যে আর কয়েকজন সমালোচকের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁদের আলোচনায় রোমান্টিকতার সুর প্রথমে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। জোহান জর্জ হামানের শিষ্য জোহান গট্‌ফ্রিড্‌ হার্ডার সাহিত্যে রোমান্টিকতার সক্রিয় সমর্থক। গুরু হামানের মত কবিতার উৎসে ঈশ্বর ও ধর্মের প্রেরণা আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি বললেন, অনুভূতিময় মনের উৎস থেকে কবিতার জন্ম। কাব্যের উৎস সম্পর্কে এ মতবাদের ওপর রোমান্টিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। বস্তুতপক্ষে ইংরেজ রোমান্টিকদের দ্বারা তিনি কিছুটা প্রভাবিতও হয়েছিলেন। তবে ক্লাসিসিজমের আদর্শ অস্বীকারে এবং রোমান্টিকতার পরিপূর্ণ সমর্থনে পূর্বসূরীদের মত তাঁর মনে কোন সংশয় ছিল না।

হার্ডার সৃষ্টিকর্মে ইন্দ্রিয়নির্ভরতাকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি বলতেন কবি এবং সমালোচক উভয়কে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সব কিছু অনুভব ক'রে তারপর সাহিত্যে রূপ দিতে হবে। তাঁর মতে কবিতা হৃদয়ের আর্ট, কল্পনার আর্ট। হার্ডার কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের মিলনকে অপরিহার্য বলে মনে করতেন।

গোটে (১৭৪৯-১৮৩২)

জার্মানির মহাকবি গ্যেটে সাহিত্যতত্ত্বেরও একজন বড় ব্যাখ্যাতা। সাহিত্যে তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্ববাদী। ব্যক্তিত্বের সাধনা শিল্পী এবং কবির সব চাইতে বড় সাধনা, যেহেতু শিল্পীর ব্যক্তিত্বই প্রতিবিম্বিত হয় শিল্পে এবং কাব্যে। আর্ট অশ্লীল বা অশালীন হতে পারে—এ কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। শিল্পীর প্রয়াস হবে অনুশীলনের সাহায্যে আর্টের উন্নতি সাধন করা। তাঁর মতে কবি হলেন "a teacher, prophet, friend of Gods and men." সাহিত্যে

দ্বীপমগ্নতা বা Insularity-র তিনি বিরোধী ছিলেন।

জীবনে যেমন সাহিত্যেও তেমনি বিশ্বচেতনার সুরটি প্রবাহিত করে দিয়ে পৃথিবীর সাহিত্যস্রষ্টাদের সামনে তিনি নতুন আদর্শ স্থাপন করেছেন। সাহিত্য এবং শিল্পে তিনি ছিলেন সত্য এবং সুন্দরের উপাসক। ভালো মন্দ, সুন্দর কুৎসিতের প্রভেদ বিস্মৃত হয়ে তিনি জীবন-সত্যকে সবার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। সাহিত্য সমালোচনায়ও তিনি সত্যকেই খুঁজেছেন।

সাহিত্য ভাবনায় কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) এবং শীলার (১৭৫৯-১৮০৫)

কাণ্ট-এর সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা বিধৃত হয়েছে তাঁর Critique of Judgement (1790) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। এ গ্রন্থে কাণ্ট বলেছেন, সৌন্দর্য স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটি সত্তা। বিজ্ঞান, নীতি এবং প্রয়োজনবোধের সঙ্গে সৌন্দর্য সম্পর্কহীন। সৌন্দর্য দেখে দর্শক-মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয় তাকে বলা যায় Disinterested satisfaction। অর্থাৎ আর্টের সৌন্দর্য স্বয়ং-বিকশিত, কোন কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং আর্টকে ভালবাসতে হবে বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে—যে সত্তা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। সৌন্দর্য-তত্ত্ব সম্পর্কে কাণ্ট-এর এই ধারণা পরবর্তীকালে art for art's sake-তত্ত্বে পরিণতি লাভ করে। এ দিক থেকে কাণ্ট বোদলেয়ার, থিওফিল গোতিয়ে প্রভৃতির পূর্বসূরী।

গ্রীক সমালোচক লঞ্জাইনাস sublimity বা উদাত্তভাবের ব্যাখ্যা দিলেও কাণ্ট এ প্রবৃত্তির একটি নতুন ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন। তাঁর মতে যা অন্তরে ভীতির উদ্রেক করে অথচ যার প্রভাব অতিক্রম করা যায় না তাকেই বলা যায় sublimity বা উদাত্তভাব।

শীলার (১৭৫৯-১৮০৫)

আর্ট এবং নীতি সম্পর্কে যে সমস্ত জিজ্ঞাসা ইতিপূর্বে মনস্তাত্ত্বিকদের মনকে আলোড়িত করেছিল তাদের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিয়েছেন শীলার। আর্ট সম্পর্কে শীলারের ধারণায় বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আর্টকে প্রথমে তিনি নীতি প্রচারের বাহন মনে করলেও পরবর্তীকালে আর্টতত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা করে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি বলেন, আর্টের জগৎ খেলার জগতের মত। আর্টের ভূমিকা প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিকট-সম্পর্ক স্থাপন করে চিত্তের প্রসার বাড়ায়।

কবিতার প্রকৃতি এবং শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে শীলার মূল্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন—On Naive and Sentimental Poetry গ্রন্থে। Naive কবিতায় কবির আত্মসচেতনতা নেই, প্রকৃতিতে তিনি যা দেখেন তা সহজ সরলভাবে আঁকেন।

এ কারণে Naive কবিতায় বাস্তবের সুর প্রাধান্য লাভ করে। শীলারের মতে আধুনিক কবিতায় Naive এবং Sentimental—দুই আদর্শের সংমিশ্রণ প্রয়োজন। এ ভিন্ন প্রকৃতির আদর্শের সংমিশ্রণে যে কবিতার সৃষ্টি হবে তাকে তিনি বলেছেন —Synthetic Poetry।

ট্র্যাজেডিতত্ত্ব সম্পর্কে শীলারের আলোচনাও খুবই উল্লেখযোগ্য। ট্র্যাজেডি পাঠে বা রঙ্গমঞ্চে ট্র্যাজেডি দর্শনে মনে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি হয় কেন তার উত্তর দিয়েছেন শীলার 'On the cause of pleasure in Tragic subjects' এবং 'On Tragic Art' নামক দুখানি গ্রন্থে। প্রথম গ্রন্থে তিনি বলেছেন—নৈতিক জয় ট্র্যাজেডির ফলশ্রুতি বলে তা আনন্দদায়ক। দ্বিতীয় গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য, অহেতুক দুঃখ ভোগ করে ট্র্যাজেডির নায়ক পাঠক বা দর্শকের সমবেদনা আকর্ষণ করে—Tragic pleasure-এর মূলে রয়েছে দর্শক বা পাঠক মনের এই করুণা বা সমবেদনা। এই ট্র্যাজিক আনন্দ চরমে ওঠে যখন দ্বন্দ্বরত চরিত্রের মধ্যে বিজয়ী এবং বিজিত উভয়ের প্রতিই আমরা সমবেদনাসম্পন্ন হই।

ডঃ জনসন (১৭০৯-১৭৮৪)

ডঃ জনসন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের অন্যতম সাহিত্যতাত্ত্বিক। নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে তিনি সাহিত্যসম্পর্কীয় কতগুলি আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন। স্ব-যুগের বিখ্যাত দার্শনিক কান্ট-এর আর্ট-তত্ত্বকে খণ্ডন করে তিনি নতুন আর্ট সম্পর্কীয় মতবাদ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আর্ট জীবন-বিচ্ছিন্ন নয়, জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। সমালোচনা সাহিত্যে ঐতিহাসিক পদ্ধতির সমালোচনায় (Historical method) ধারা আবিষ্কার জনসনের অন্যতম কীর্তি। তিনি বললেন, স্রষ্টার সৃষ্টি বিচার করতে হবে তাঁর কালের পরিপ্রেক্ষিতে। পরবর্তীকালের দৃষ্টিতে যদি পূর্ববর্তী স্রষ্টার সৃষ্টি বিচার করা হয় তাহলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়।

সাহিত্যে রোমান্টিক ভাবনাঃ জার্মানীতে

জার্মানীতে রোমান্টিক আন্দোলনের রূপদান করেন শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়—অগাষ্ট উইলহেল্‌ম শ্লেগেল (August Wilhelm Schlegel : 1767-1845) এবং ফ্রেডারিক শ্লেগেল (Friedric Schlegel : 1772-1829)।

কবিতার উৎস এবং উপকরণ সম্পর্কে অগাষ্ট শ্লেগেল এমন অনেক কথা বলেছেন যা নতুনত্বের দাবী রাখে। তাঁর মতে কবিতা এবং ভাষা সৃষ্টি হয় সমসাময়িক কালে। ভাষার মত কবিতারও উপকরণ ধ্বনি ও শব্দ। উৎপ্রেক্ষা

(Metaphor) পুরাণ (Myth) এবং প্রতীক (symbol)—কবিতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। গভীর অর্থপূর্ণ সাংকেতিকতা অথবা প্রতীকধর্মী চিত্রময়তাকে কবিতার প্রধান উপাদান বলে অগাষ্ট্ বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে আধুনিক কবিদের সঙ্গে অগাষ্টের মতের মিল রয়েছে। প্রতীকের সাহায্যে গভীর ভাবচিন্তা বা Idea-কে রূপদান সম্ভব বলে তিনি কবিতায় প্রতীক ব্যবহারের ওপর এত গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। সৌন্দর্যের প্রসার এবং গভীরতা প্রতীকের সাহায্যে সুন্দরভাবে বিবৃত করা যায়। Myth বা পুরাণও প্রতীকধর্মী। সেজন্য কাব্যরচনায় Myth-এর প্রয়োজনীয়তাকে তিনি স্বীকার করেন।

Lectures on Dramatic Art and Literature গ্রন্থে ট্র্যাজেডি সম্পর্কেও নতুন আলোকপাত করেছেন অগাষ্ট শ্লেগেল। তিনি অনুভব করতেন একটি অদৃশ্য শক্তি মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। সেজন্য জীবন সুখের বা দুঃখের হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এ নিশ্চয়তার অভাব মানুষের মনে গভীর বিষাদ সৃষ্টি করে। অগাষ্ট মনে করেন অদৃষ্টের সঙ্গে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম যখন সুসংহত রূপ লাভ করে তখনি হয় ট্র্যাজেডির সৃষ্টি।

রোমান্সের প্রকৃতি বিশ্লেষণেও অগাষ্ট শ্লেগেল নতুন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। ক্ল্যাসিকাল প্রকৃতির সঙ্গে তুলনায় তিনি রোমান্টিক প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্যটুকু ধরবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যে একই সুরের ধ্বনি এবং রোমান্টিক সাহিত্যে বহু সুরের অনুরণন। ক্ল্যাসিকাল কল্পনা সীমাবদ্ধ এবং রোমান্টিক কল্পনা সীমার কোন বন্ধন স্বীকার করে না। ক্ল্যাসিকাল কবিতায় ভাস্কর্যের সামঞ্জস্য এবং সংহতি, আর চিত্রধর্মিতা রোমান্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্য। সংহতি এবং সামঞ্জস্যের জন্য ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য পাঠকের প্রশংসা আকর্ষণ করে কিন্তু কল্পনার অবাধ মুক্তির জন্য রোমান্টিক সাহিত্য প্রাণের উজ্জীবন ঘটায়। তবে অগাষ্ট শ্লেগেল এ-ও অনুভব করেছেন, রোমান্টিক এবং ক্ল্যাসিক প্রবৃত্তি পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোন সাহিত্যিক প্রবণতা নয়। সৃষ্টিকর্মে এই দুই প্রবৃত্তির সহাবস্থান খুবই সম্ভব।

ফ্রেডারিক শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯)

শীলারের প্রভাবে কাব্যানুভূতিতে বস্তু প্রাধান্যের স্বীকৃতি দিলেও কালক্রমে ফ্রেডারিক শ্লেগেল ভাবপ্রধান অতৃপ্তিময় কবিতার (Poetry of Yearning)খুবই অনুরাগী হয়ে পড়েন। এ ধরণের রোমান্টিক প্রকৃতির নাম দিলেন তিনি—Progressive Universal Poetry। তাঁর মতে রোমান্টিক কবিতার ধারণক্ষমতা খুব

বেশী—বিভিন্ন পর্যায়ের কবিতার সমন্বয় সম্ভব রোমান্টিক কবিতায়। কাব্যের ব্যাপকতা এবং মূল্য বৃদ্ধির জন্য তিনি একদিকে যেমন কবিতার সঙ্গে দর্শন এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের মিলনের কথা বলেছেন তেমনি বলেছেন কবিতার সঙ্গে গদ্যেরও মিলনের কথা।

সৌন্দর্যের শ্রেণীবিভাগ করেছেন তিনি বৈচিত্র্য, ঐক্য এবং পূর্ণতার মধ্যে। যাকে অনন্ত বলা হয় তাই পূর্ণ। সে হিসেবে পূর্ণ সত্তা ভগবান ছাড়া আর কেউ নন। পূর্ণতা সম্পর্কে উপনিষদেরও একই ধারণা।

প্রকৃতি অনুযায়ী ট্র্যাজেডিকে ফ্রেডারিক তিন ভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। ট্র্যাজেডির ফলশ্রুতিও তিন প্রকারের বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। এক শ্রেণীর ট্র্যাজেডির পরিণতি ধ্বংস (যেমন ম্যাকবেথ), দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্র্যাজেডিতে পুনর্মিলন সম্ভব (যেমন অরিসিস), আর তৃতীয় পর্যায়ের ট্র্যাজেডিতে নায়কের সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিবর্তন দেখানোই নাট্যকারের লক্ষ্য। এ ধরণের মহৎ ট্র্যাজেডির স্রষ্টা তাঁর মতে কল্ডেরন (Calderon)।

আর্থার শোপেনহাওয়ার (**Arther Schopenhauer**) (১৭৮৮-১৮৬০)

শোপেনহাওয়ারের মতে will বা ইচ্ছা থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি। এই will-ই ধীরে ধীরে বস্তুর রূপে প্রকাশমান। Will-এর অনতিক্রমনীয় প্রভাব অস্বীকার করে সৃষ্টি হয়েছে আর্ট। শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পী স্বাধীন। মানসিক মুক্তির জগতে সৃষ্ট বলে কোন কিছুতে আর্টের কোন আসক্তি নেই। আর্টে ব্যক্তিগত অনুভূতির কোন স্থান নেই। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুও আর্টের কোন কাজে লাগে না। আর্টের জগৎ নৈর্ব্যক্তিক, বস্তুলীন।

শোপেনহাওয়ারের ট্র্যাজেডি আলোচনায় অভিনবত্ব আছে। জীবনচিন্তার দিক থেকে শোপেনহাওয়ার ছিলেন নৈরাশ্যবাদী। তাঁর মতে মৃত্যুপ্রবণতা মানুষের স্বভাবধর্ম। ট্র্যাজেডি মানুষের মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে, সেজন্য ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠত্ব। শোপেনহাওয়ারের মতে জীবন ঘৃণ্য, মৃত্যুই কামনার।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০)

ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর বন্ধু কোলরিজের সহায়তায় ১৭৯৮ সনে সংকলিত Lyrical Ballads-এর ভূমিকায় এবং গ্রন্থশেষের আলোচনায় [Appendix-এ] কাব্যের নতুন আদর্শের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ক্লাসিক সংযমের নিয়মবন্ধন কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পরিপন্থী। কাব্যের বিকাশের জন্য চাই আবেগ এবং কল্পনার অবাধ মুক্তি। এমনকি কাব্যকে তিনি বিজ্ঞানের আবেগময় রূপ বলতেও

দ্বিধা করেন নি।

সাহিত্যে Fancy এবং Imagination সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ধারণাও খুবই উল্লেখযোগ্য। লঘুকল্পনার সাহায্যে চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিকে কোলরিজ বলেছেন Fancy, আর সৃষ্টিধর্মী কল্পনাকে বলেছেন Imagination। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিন্তু মনে করেন Imagination-এর মত Fancy-ও সৃষ্টিধর্মী। তবে গুণগত পার্থক্য আছে। যে কল্পনার সাহায্যে ক্ষুদ্র বস্তুকে সুন্দর করে তোলা হয় তাকে বলা যায় Fancy, আর Imagination হল সে ধরনের কল্পনা যার সাহায্যে বৃহৎ এবং মহৎ বস্তুকে শিল্পসমন্বিত রূপ দেওয়া সম্ভব।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিশ্বাস ক'রতেন আধুনিক সভ্যতা মানুষকে সংস্কারাচ্ছন্ন করে আদিম সরলতার স্বর্গ থেকে বিচ্যুত করেছে। সুতরাং কাব্যের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত সংস্কারবর্জিত সাধারণ মানুষ। স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিমান আবেগ এবং কল্পনাকে তিনি কাব্য রচনার উৎস বলে ঘোষণা করেছেন। কবিচিত্ত যখন সমাহিত হয়ে ওঠে তখনই স্মৃতির সরণি বেয়ে সে আবেগ ও অনুভূতি কবিপ্রাণের স্পর্শে রূপে-রঙে রসে পরিপূর্ণ হয়ে মহৎ প্রকাশ লাভ করে (Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings ; it takes its origin from emotion recollected in tranquility.)

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮০২)

ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে নতুন কাব্যান্দোলনে অংশ গ্রহণ করেও কোলরিজ তাঁর কাব্যতত্ত্বকে সমালোচনা করে স্বতন্ত্র চিন্তার পরিচয় দেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমালোচনায় তিনি বলেন, কবিতা মুখ্যত জনগণের ভাষাভিত্তিক হলেও সর্বত্র এ নিয়ম খাটে না। যেহেতু ভাষা ব্যবহারে এ ধরাবাঁধা নিয়ম কবিতায় বৈচিত্র্যের হানি ঘটাবে। দ্বিতীয়ত, সংস্কারবর্জিত প্রাকৃত মানুষ কাব্যের নায়ক হিসেবে পাঠকের মনোযোগ তেমন আকর্ষণ করে না। তৃতীয়ত, গ্রাম্য মানুষের ভাষা যদি একটু সংস্কৃত আকারে কাব্যে রূপ পায় তার মধ্যে আর স্বাভাবিকতা থাকে না। চতুর্থতঃ গ্রাম্য মানুষের ভাব এবং ভাষার দৈন্য এত বেশী যে তা উৎকৃষ্ট কাব্যের বাহন হতে পারে না।

তাঁর মতে Imagination-এর রূপ দুই রকম—Primary এবং Secondary। কল্পনার প্রাথমিক স্তরে Primary Imagination এবং দ্বিতীয় স্তরে Secondary Imagination। Primary Imagination ইচ্ছাশক্তির ওপর নির্ভরশীল

নয়, আর Secondary Imagination ইচ্ছাশক্তির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো Fancy-নির্ভর কবিতাকে তিনি বাস্তবর্জিত বলেন নি, বলেছেন আনন্দপ্রদায়িনী। আর Imagination-এর আশ্রয়ে যে কবিতা রচিত হয় তা সত্যকে ফুটিয়ে তোলে।

কোলরিজ কবিতার যে কয়টি অপরিহার্য গুণের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল : প্রথম, সঙ্গীতময়তা। কবিরও সঙ্গীতের মাধুর্য উপলব্ধি করবার ক্ষমতা থাকা দরকার। দ্বিতীয়, কবিতার বিষয়বস্তু হবে জীবনের অভিজ্ঞতা নির্ভর—অবশ্য সে অভিজ্ঞতা হওয়া চাই নৈর্ব্যক্তিক। তৃতীয়ত, কবির তীব্র আবেগপ্রবণতা। চতুর্থত, কবিতা দর্শনের সমধর্মী।

সাহিত্য বিচারে হৃদয়-রাগ :

উইলিঅম হ্যাজলিট (১৭৭৮-১৮৩০)

ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Impressionist সমালোচনা সেই ব্যক্তিগত ভালো লাগা নির্ভর সমালোচনা পদ্ধতি আবিষ্কার করে হ্যাজলিট এবং ল্যাম সাহিত্যতত্ত্বের একটি নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত করেন। হ্যাজলিট বলেছেন, সমালোচনা দোষ-দর্শন নয়, ভালোবাসারই প্রকাশ। তাঁর মতে প্রকৃত সমালোচনার কাজ হলো শিল্পকর্মের বর্ণান্বিত লীলা, আলোছায়া, এবং দেহ-আত্মার স্বরূপকে ব্যঞ্জিত করে তোলা।

চার্লস ল্যাম (Charles Lamb) (১৭৭৫-১৮৩৪)

হ্যাজলিটের মত ল্যামও সমালোচনায় Impressionist। সেই কারণে তাঁর সাহিত্য এবং শিল্প সমালোচনার মাপকাঠি ছিল নিজের সহৃদয় অন্তর। ল্যামের নিজের জীবন দুঃখ ঝঞ্ঝায় তাড়িত হলেও অন্তর্নিহিত আনন্দের অনুভূতিতে তাঁর হৃদয় ছিল পূর্ণ। সে আনন্দের আলোকে তিনি বিচার করেছেন সাহিত্য ও শিল্পকে।

শেলী এবং কীট্‌স-এর কাব্যতত্ত্ব :

শেলী (১৭৯২-১৮২২)

কাব্যবিচারে শেলী দার্শনিক চিন্তার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন বলে তাঁর কাব্যতত্ত্ব খুবই মূল্য সমৃদ্ধ। মুখ্যত বন্ধু টমাস লাভ পীককের The Four Ages of Poetry গ্রন্থে বর্ণিত কাব্যবিষয়ক মতের সমালোচনা করতে গিয়ে শেলীর কাব্যতত্ত্ব বিকাশ লাভ করে। পীককের মতে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে কবিতা পূর্ব গৌরব হারিয়েছে, কবিতার মৃত্যু হয়েছে। কবিদের উচিত কাব্যরচনা ছেড়ে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করা। হ্যাজলিট এবং মেকলেও পীককের এ মত সমর্থন ক'রে আধুনিক

যুগে কবিতাকে অবক্ষয়িত শিল্প বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। পীককের অভিযোগের উত্তরে কবিতার গৌরব ঘোষণার উদ্দেশ্যে শেলী রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত Defence of Poetry।

শেলীর মতে কল্পনার পূর্ণ জাগরণ কবিমনে সৃষ্টি করে সুন্দর এবং বলিষ্ঠ আদর্শ। সৃষ্টিকর্মে কবি স্বভাবের অনুকরণ করেন-এটা সত্য, কিন্তু কল্পনার সাহায্যে অনুকৃত বস্তুকে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারেন। অনুকরণের মধ্য দিয়েই আর্ট সৃষ্টির শুরু, কিন্তু যাঁরা অনুকরণকে অতিক্রম করে নতুন সৃষ্টি করতে পারেন তাঁরাই প্রকৃত কবি বা শিল্পী।

চমৎকার প্রকাশরীতির মাধ্যমে ভাবসত্য কাব্যে শিল্পরূপ পেলে তা মানব-মনকে উর্ধ্বায়িত করতে সক্ষম।

কাব্যবস্তু সম্পর্কে পীকক এবং শেলীর মতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পীককের মতে কাব্য কাহিনী নির্ভর, আর শেলীর মতে কাব্যের মূল ভিত্তি আইডিয়া। প্রত্যক্ষ বাস্তব জগতের উর্ধ্বে যে অপ্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় ভাবজগৎ বিদ্যমান সে জগতের স্পর্শলাভের জন্য মানবমন চিরচঞ্চল। কবিতা যাদুদণ্ডের স্পর্শে সে রহস্যময় জগতের দ্বার উন্মুক্ত করে মানুষের সামনে।

প্লেটোর মতো শেলীও বিশ্বাস করতেন একমাত্র কল্পনা শক্তির সাহায্যেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ জগৎ এবং অপ্রত্যক্ষ আদর্শ লোকের সমন্বয়সাধন সম্ভব। শেলীর মতে কবির লক্ষ্য চিরন্তনের উপলব্ধি। দার্শনিক যাকে বলেন 'অনন্ত' এবং 'এক'—শেলী তার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পাননি।

জন কীট্স (১৭৯৫-১৮২১)

শেলীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও কীট্স্-এর কাব্য সম্পর্কীয় ধারণা শেলীর প্রায় বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। কাব্য রচনায় শেলীর আদর্শবাদ তাঁকে আকর্ষণ করেনি। তিনি ছিলেন একান্তভাবে সৌন্দর্যবাদী। শেলীর মতো তিনি মানব প্রেমের আদর্শ প্রচার করতে চাননি। তাঁর লক্ষ্য, কাব্যের মধ্যে সৌন্দর্য এবং সুরের জগৎ সৃষ্টি করা। কাব্যসৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ততায় তিনি ছিলেন একান্ত বিশ্বাসী। কীট্স্ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন— সৌন্দর্য এবং সত্য সমার্থক।

আপন মনের মাধুরীর সমন্বয়ে সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তন্ময় হওয়ার মতো নৈর্ব্যক্তিকতার অনুশীলনও কবির একান্ত কর্তব্য বলে কীট্সের ধারণা। সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার ক্ষমতাকে কীট্স্ বলেছেন Negative Capability.

এ শক্তির সাহায্যেই শিল্পী প্রবেশ করতে সক্ষম সত্যাশ্রিত সৌন্দর্যজগতের কেন্দ্রস্থলে।

টমাস ডি কুইন্সি (১৭৮৫-১৮৯৫)

ডি কুইন্সি সাহিত্যের দু'টি রূপ কল্পনা করেছিলেন: Literature of Knowledge এবং Literature of Power. সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে ডি কুইন্সি দ্বিধাহীন।

স্টাইল সম্পর্কে নতুন চিন্তার জন্য ডি কুইন্সি স্মরণীয়। গদ্য রচনায় কী বলা হল সে নিয়ে তিনি বেশী মাথা ঘামান নি। কেমন করে বলা হল সেদিকেই ডি কুইন্সি বেশী আগ্রহী।

সেইন্ট্ বাউভ (Saint Bauve : ১৮০৪-১৮৬৯)

ফরাসী সাহিত্যিক সেইন্ট্ বাউভ কথিত সমালোচনা পদ্ধতি Naturalistic method of criticism বলে অভিহিত।

সমালোচনায় naturalistic method এর ব্যাখ্যায় সেইন্ট্ বাউভ বলেন, একটি গাছকে ভাল করে জানলে যেমন ফলের স্বাদ সহজে বোঝা যায় তেমনি শিল্প-কৃতির সম্পূর্ণ আস্বাদনের জন্য শিল্পিজীবন এবং মনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচিতি আবশ্যক।

টেইন:

সেইন্ট্ বাউভের সমালোচনার সঙ্গে ফরাসী সমালোচক টেইনের সমালোচনার অনেক সাদৃশ্য আছে। টেইনও বিশ্বাস করতেন সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ সামাজিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল।

ম্যাথু আর্নল্ড্ (১৮২২-১৮৮৮)

ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্য সমালোচনায় রোমান্টিক আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ক্লাসিক আদর্শের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেন কবি-সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড। কাব্য রচনায় ভাষার মার প্যাঁচ বা ভঙ্গিসর্বস্বতা তাঁর নিকট অবাঞ্ছিত মনে হয়েছিল।

'On the modern element in literature' নামক অক্সফোর্ড বক্তৃতায় ম্যাথু আর্নল্ড্ এরিস্টটল, সফোক্লিস প্রভৃতি অতীত যুগের সাহিত্যরথীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। সফোক্লিসের অনুসরণে ক্লাসিক ভঙ্গীতে নাটক রচনায়ও তিনি সক্রিয়তার পরিচয় দেন। এ নাটকের ভূমিকাতেও তিনি ক্লাসিক আদর্শের মাহাত্ম্য কীর্তনে মুখর। 'On Translating Homer' গ্রন্থে হোমারের কাব্যসৌন্দর্যের জগতে অবগাহন করে তিনি Grand style-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

তাঁর Essays in Criticismর দুই খণ্ডই সেইন্ট বাউভের সমালোচনার আদর্শে রচিত। তবে একটু পার্থক্য আছে। সেইন্ট্ বাউভ জীবনকে দেখেছিলেন সমালোচকের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে, আর ম্যাথু আর্নল্ডের জীবনদৃষ্টিতে ছিল নীতিবাদীর একদেশদর্শিতা।

The Study of Poetry প্রবন্ধে আর্নল্ড্ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ মত প্রচার করেছেন যে ভাবীকালে ধর্ম এবং দর্শনের স্থান অধিকার করবে নৈতিক আবেদনসমৃদ্ধ কাব্য-কবিতা। তাঁর মতে উৎকৃষ্ট কাব্য হবে সত্য নির্ভর, গভীর সুরময় (High seriousness) এবং ভাষাগৌরবে গৌরবান্বিত (Grand style)। নাগরিক বৈদগ্ধ্য বা urbanity-কে তিনি স্টাইলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন।

ভঙ্গী অনুযায়ী গদ্যসাহিত্যকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করে দেখবার চেষ্টা করেছেন আর্নল্ড্ : Asiatic, Corinthian, এবং Attic। জাঁকজমক পূর্ণ গদ্যকে এশিয়াটিক ও সাংবাদিকতাসুলভ গদ্যকে তিনি বলেছেন করিনথিয়ান। গদ্য রচনায় এ্যাটিক রীতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন আর্নল্ড্, যেহেতু এ পর্যায়ের গদ্যকে সাবলীলতা এবং আনন্দময় গতি দান করে প্রাঞ্জলতা, সংহতি এবং শালীনতা।

সাহিত্যে আদর্শবিরোধ—আর্ট না নীতি ?

শিল্প রাজ্যে নীতির স্থান নির্ণয়ে সকলের উৎসাহকে ছাড়িয়ে গেছেন জন রাসকিন। তাঁর প্রত্যয় ছিল, আর্টের স্রষ্টা ভগবান বা ভগবৎশক্তি। প্লেটোর মতে আর্ট নীতিবিরোধী বলে সমাজের পক্ষে অশুভ শক্তি আর রাসকিন বলেছেন, যেহেতু আর্ট নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে কারণে আর্টের উচিত জনসাধারণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করা।

Modern Painters গ্রন্থে রাসকিন ঘোষণা করেছেন, আর্টে যা কিছু মহৎ তার ভিত্তিতে রয়েছে নীতি। নিজের প্রত্যয় অনুযায়ী আর্ট-এর যে তিনটি উদ্দেশ্যের কথা তিনি Lectures on Art গ্রন্থে বলেছেন সেগুলি হল : মানুষের ধর্মবোধ জাগ্রত করা, মানুষের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষবিধান, এবং সর্বশেষে মানুষের এমন কাজে আসা যা বাস্তবিকপক্ষে মানুষের উপকারী।

আর্ট সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে তিন ধরনের কল্পনার কথা বলেছেন রাসকিন : এক ধরণের কল্পনার দ্বারা বিভিন্ন চিত্রের সমাবেশ করা যায় (Imagination Asso-eiative); দ্বিতীয় শ্রেণীর কল্পনা দ্বারা চিত্রগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে (Imagination Contemplative) ; তৃতীয় পর্যায়ের কল্পনা শক্তি নিয়োজিত হয়

সত্যের বিশ্লেষণে, সত্যের মর্ম উদ্ধারে এবং সত্যের স্বরূপ উপলব্ধিতে (Imagination Penetrative)। রাসকিনের মতে সত্যের সন্নিকটবর্তী হওয়া আর্টের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কোনো মত, আদর্শ বা সত্য প্রচারের জন্য নয়, আর্টের সৃষ্টি আর্টের জন্য—শিল্প সমালোচনায় এভাবে নতুন মতবাদের সৃষ্টি হল। এ মতবাদকে বলা হয় কলাকৈবল্যবাদ বা art for art's sake। কাণ্টের শিল্প সমালোচনায় এ মতের প্রথম আভাস পাওয়া গেলেও ফরাসী দেশে এ মতবাদ নিয়ে রীতিমত আন্দোলন গড়ে তোলেন থিয়েফিল গোতিয়ের। ফরাসী কবি-সমালোচক বোদলেয়ারও এ মতবাদের একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা।

কীট্স, টেনিসন এবং রসেটি আর্টের গৌরব উপলব্ধি এবং ঘোষণায় সক্রিয় হলেও তাঁদের চাইতে বেশী কলাকৈবল্যবাদী ছিলেন বোদলেয়ারের ভাবধারা-প্রভাবিত সুইনবার্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কলাকৈবল্যবাদীদের বলিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন অস্কার ওয়াইল্ড্ (Oscar Wilde : ১৮৫৬-১৯০০)। আর্টকে তিনি জীবনবিচ্ছিন্ন সর্বোচ্চ বাস্তবসত্তা বলে অভিহিত করেছেন। (There is no such thing as a moral or an unmoral book. Books are well-written or badly written. That is all ··· No artist has ethical sympathies. An ethical sympathy in an artist is an unpardonable mannerism of style)।

ওয়াল্টার পেটার (১৮৩৯-১৮৯৪)

ওয়াল্টার পেটার অস্কার ওয়াইল্ড্ এবং হুইসলারের মতো নীতিবোধহীন সৌন্দর্যের সাধক ছিলেন না।

শিল্প-চিন্তায় পেটার ছিলেন সুখবাদী বা Hedonist. একটি বিশেষ মুহূর্তে মানুষের যে সুখানুভূতি ঘটে তারই প্রকাশ আর্ট। জীবন কর্মময়, আর আর্টের সৃষ্টি কর্মবিমুখ অবসরের মুহূর্তে।

পেটার আর্টকে গুণানুযায়ী দুই পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন : Good Art এবং Great Art। Form এবং matter-এর যেখানে সাঙ্গীকরণ ঘটে অর্থাৎ হরিহরাত্মার মত মিশে যায় সেখানে হয় Good Art বা উত্তম শিল্পের সৃষ্টি। কিন্তু মহৎ আর্ট বা Great Art নির্ভরশীল বিষয়বস্তুর গুরুত্বের ওপর।

শিল্প ও সাহিত্য সমালোচনার জগতে পেটার বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন স্টাইল সম্পর্কীয় মূল্যসমৃদ্ধ আলোচনার জন্য। পেটারের মতে উত্তম স্টাইলের জন্য

একদিকে যেমন প্রয়োজন অলংকার প্রয়োগের সৌন্দর্য তেমনি দরকার অলংকারহীন শান্ত সংযত ভাষার প্রয়োগ।

ক্ল্যাসিকাল এবং রোমান্টিকের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণেও পেটার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে ক্ল্যাসিক এবং রোমান্টিক উভয় শ্রেণীর কবিই সৌন্দর্যবিলাসী। তবে ক্ল্যাসিক কবির ব্যবসায় সুপরিচিত বিষয় নিয়ে। সে সুপরিচিত বিষয়ের মধ্যে যখন অপরিচিতের স্পর্শ লাগে তখনি তা হয় রোমান্টিক আর্টের সৃষ্টি (It is the addition of strangeness to beauty that constitutes the romantic character in art)। সৌন্দর্যের স্বাভাবিক পিপাসার সঙ্গে কৌতূহলবোধ জাগ্রত হলেই শিল্প জগতে রোমান্টিকতার মোহময় সুর জেগে ওঠে।

পেটারের আর্টসম্পর্কীয় আলোচনা Renaissance গ্রন্থে বিধৃত। মুখ্যত রসবাদী ছিলেন বলে সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাখ্যায় তিনি দার্শনিক তত্ত্বকে প্রাধান্য দেননি, —যেমন দিয়েছেন আর্ট সমালোচকের সংবেদনশীলতাকে।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যতত্ত্ব

বেনেদেত্তো ক্রোচে (১৮৬৬-১৯৫২)

বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যতত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ইতালীয় সমালোচক ক্রোচে অন্যতম। তাঁর শিল্পতত্ত্বব্যাখ্যা বহুজননন্দিত। প্রথমে কার্ল মার্ক্স-এর বস্তুবাদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও ক্রমশঃ ভাববাদ তাঁকে আকৃষ্ট করে। ক্রোচে শিল্পতত্ত্ব বিচারে Intuitionism বা প্রতিভানবাদ এবং Expressionism বা রূপায়নবাদের প্রবক্তা।

তাঁর বিশ্বাস, Intuition ছাড়া Impression হতে পারে না। Impression ব্যক্তিঅনুভূতি প্রধান, অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে Impression-এর পার্থক্য ঘটে। সে কারণে Impression মাত্রই শিল্পে রূপলাভ করে না। Impression যখন Intuition-এর গভীরতর স্তরে পৌঁছায় একমাত্র তখনই শিল্পদেহ রূপ লাভ করে।

শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে ক্রোচের মননশীল আলোচনা Fundamental Theses as Science of Expression and General Linguistic এবং Essence of Aesthetics-এ দু'খানি গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে।

ক্রোচের মতে সৃষ্টির লীলা চলছে মনের জগতে। Intuition-Expression -এর সাহায্যে মনের জগতে জেগে উঠছে ছবি, সৃষ্টি হচ্ছে সঙ্গীত এবং শিল্পের বিভিন্ন

রূপমূর্তি। মনের গভীরে সৌন্দর্যের অনুভূতি না ঘটলে বস্তু জগতে তার প্রকাশ কখনও সম্ভব হত না।

ক্রোচে আর্টে অবাধ আবেগ প্রদর্শনের বিরোধী। আবেগের প্রকাশ থাকবে না—এ কথা তিনি বলেন নি। তবে সে শিল্পকেই তিনি শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের বলেছেন যার মধ্যে আবেগের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মনন-উদ্ভূত সংযমের সমন্বয় ঘটেছে।

স্বল্প প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই সাধারণত অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ। এই ভাব-প্রবণতার আতিশয্যই সৃষ্টি করে রোমান্টিকতার। অপর পক্ষে যে সমস্ত লেখক বা শিল্পী মুখ্যত যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত তাঁদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে ক্ল্যাসিকাল দৃষ্টিভঙ্গী।

আর্ট বিচারের পদ্ধতি আলোচনায়ও ক্রোচে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। ক্রোচে বলেন, আর্ট সমালোচকের কাজ আর্টকে নতুন করে সৃষ্টি করা। আর্ট সমালোচক শিল্পীর সঙ্গে যদি একাত্মতা অনুভব করেন তবেই এই প্রতিসৃষ্টি সম্ভব।

আর্ট সমালোচনায় ক্রোচে Historical interpretation বা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের পক্ষপাতী। অর্থাৎ শিল্পসমালোচনায় সমালোচককে ফিরে যেতে হবে সে যুগে এবং সেকালে যখন শিল্পীর হাতে শিল্পটির সৃষ্টি হয়েছিল। শিল্প সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার জন্য সমালোচকের পক্ষে ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের অনুসরণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। সঙ্গে সঙ্গে সমালোচককে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় উত্তম রুচি এবং কল্পনার।

সাহিত্যে প্রতীকতা :

কাব্য সৃষ্টি এবং সমালোচনায় স্পষ্টতাকে অতিক্রম করে প্রতীকতার আশ্রয় গ্রহণ আধুনিক কাব্যের একটি প্রবণতা। প্রতীকতাবাদী কবি সাহিত্যিকেরা বলেন যে কাব্য-ভাষা হবে প্রতীকধর্মী বা Suggestive। প্রতীকধর্মী ভাষা স্বপ্নময়, সঙ্গীতের অনুরণনও শোনা যায় সে ভাষায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে মালার্মে ফরাসী দেশে প্রতীকী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। প্রতীকী কবিতার সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যায় মালার্মে লিখেছেন : প্রতীক কাব্যজগতে মায়াসৃষ্টিকারী শক্তি। স্পষ্টতা কবিতার রহস্যঘনতাকে বিনষ্ট করে। অথচ কবিতার ধর্মই হল রহস্যময়তার সৃষ্টি। প্রতীকী কবিতা আস্তে আস্তে সে রহস্যাবৃত সত্যের উদ্‌ঘাটন করে।

পল ভারলেইন এবং পল ভালেরি (Paul Valery) কাব্যকে সঙ্গীতময় করে তুলবার পক্ষপাতী ছিলেন। র‍্যাঁবো (Rimbaud) কবিকে ঋষির মত সত্যদ্রষ্টা বলে বিশ্বাস করতেন।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যতত্ত্ব :

আধুনিক সমালোচক কাব্যের স্বতস্ফূর্ততা কিংবা দৈবী প্রেরণায় বিশ্বাসী নন। তাঁদের মতে কবিতা অন্যান্য শিল্পকর্মের মত শিল্পকর্ম (Craft) ছাড়া কিছুই নয়। সচেতনভাবে চিত্র (Image) উৎপ্রেক্ষা (metaphor) প্রভৃতির সমন্বিত প্রয়োগের দ্বারা কাব্যসৃষ্টি সম্ভব। সমালোচনায়ও ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগার চাইতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপর তাঁরা বেশী নির্ভর করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য জগতে আধুনিক চিন্তার যাঁরা সূত্রপাত করেন তাঁদের মধ্যে টি. ই. হিউমের (T. E. Hulme) নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। রোমান্টিক কবিদের কল্পনাবিলাসকে তিনি ছিচকাঁদুনেপনা বলে আঘাত করেন। প্রকৃতির প্রসাদপুষ্ট মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী—রুশোর এ মত হিউম গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মতে মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ—যেহেতু সামাজিক—রাজনৈতিক বহু শৃঙ্খলে মানুষ আবদ্ধ। জীবন এবং সাহিত্য সম্পর্কে হিউমের মতামতগুলি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সাহিত্যে ক্লাসিক প্রবৃত্তিকে রোমান্টিক প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন হিউম। তাঁর মতে কল্পনার শৃঙ্খলা, সংযম এবং কাঠিন্য আবেগাতুর স্বপ্নচারিতা থেকে শ্রেয়বস্তু। আঙ্গিক নিয়মে সৃষ্ট আর্টকে স্বাভাবিক বা naturalistic art-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন তিনি। ঈশ্বর প্রত্যয়হীন মানবতাবাদের চাইতে ধর্মীয় উপলব্ধি তাঁর মতে আকাঙ্ক্ষিত।

টি এস. এলিয়ট সাহিত্যের প্রেরণা হিসেবে আবেগের কার্যকারিতা একেবারে অস্বীকার না করলেও বুদ্ধিকে আবেগের ওপর স্থান দিয়েছেন। তাঁর Objective Co-relative এবং tenification of sensibility কাব্যতত্ত্ব হিসেবে এ যুগে খ্যাতি অর্জন করেছে।

নতুন এক ধরণের সমালোচনা রীতির উদ্ভাবক এ যুগে আই. এ. রিচার্ড্স্ (I. A. Richards) এবং তৎশিষ্য উইলিয়ম এম্পসন (William Empson)। সমালোচনায় তাঁদের অনুসরণকারীদের বলা হয় Semantics-গোষ্ঠী। শব্দার্থতত্ত্ব এবং শব্দের তাৎপর্যের সাহায্যে এঁরা সমালোচনার নতুন দিগ্দর্শন করেন। এঁদের মতে শব্দমাত্রই চিত্রের প্রতীক। এই গোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক এজরা পাউণ্ড্ মহৎ সাহিত্যকে গভীর অর্থপূর্ণ ভাষার সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন। কবিতার উৎস নির্ণয়েও তাঁদের দৃষ্টি বাস্তবধর্মী। তাঁদের মতে কবিতা সৃষ্টি লেখকের স্নায়বিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল। যাঁর স্নায়ু শক্ত, মন সবল একমাত্র তিনিই সুন্দর কবিতা

লিখতে সক্ষম।

ফ্রয়েড এবং ইয়ুং (Jung)-এর মনস্তাত্ত্বিক আলোচনাও আধুনিক সমালোচনার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফ্রয়েড সব শ্রেণীর আর্টকে যৌনকামনার ঊর্ধ্বায়িত প্রকাশ (sublimation) বলে ঘোষণা করেছেন তাঁর মতে যৌন কামনা চরিতার্থ না হলে মানুষ যুক্তিহীন নিষ্ক্রিয় বা নিউরটিক হয়ে যায়। এ দুর্বলতামুক্ত হতে পারে মানুষ যদি তাঁর যৌন কামনা ঊর্ধ্বায়িত হয়ে আর্টের সীমানায় পৌছায়। ইয়ুং-এর মতে মানুষের মনে যে অবচেতন চিন্তাধারা রয়েছে তার প্রকাশ হয় শিল্পে। এ দিক থেকেও আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক সমালোচকের ওপর ইয়ুং-এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

হার্বার্ট রীড্ সমালোচনায় নতুন বৈশিষ্ট্যের স্রষ্টা। মনস্তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ ছাড়াও হার্বার্ট রীড্ নতুন শৈল্পিক আদর্শ স্যুররিয়ালিজমের আশ্রয় নিয়েছেন। স্যুররিয়ালিস্ট্ শিল্পীরা মনস্তত্ত্ব, স্বপ্নতত্ত্ব এবং মনের অচেতন স্তরের রচনাকে শিল্প সৃষ্টির উপায় বলে মনে করেন।

টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৮ ১৯৬৫)

আধুনিক কাব্যতত্ত্বে এলিয়টের দান সুচিহ্নিত। কবিতার প্রেরণা সম্পর্কে আর্নল্ড্ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতের বিরোধিতা করে তিনি বলেন—কবিতা রচনা পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। তার জন্য প্রেরণার কোন প্রয়োজন নেই। কবিতা হবে গদ্যধর্মী। কবিতা বিভিন্ন উপাদানে রচিত শিল্পকর্ম বা Craft ছাড়া কিছু নয়।

সমালোচনায় তিনি ঐতিহ্যবাদী। তাঁর মতে কাব্য বা শিল্পের উৎকর্ষ নির্ণীত হবে কি পরিমাণে তা ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছে তা দেখে। ট্র্যাডিশান ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, কোন দেশের বা পৃথিবীর সাহিত্য ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনার সমাবেশ নয়,—তার মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্নতা বা অখণ্ডতা আছে। শিল্পীর মত সমালোচককেও যুক্ত হতে হবে এই ট্র্যাডিশনের সঙ্গে। শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি অর্জনের জন্য শিল্পীকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বর্জন করে নিরাসক্ত দৃষ্টির অধিকারী হতে হবে।

তাঁর মতে কবি হবেন আবেগবর্জিত এবং ব্যক্তিত্ববোধ নিরপেক্ষ। সেইন্ট্ বাউভের মতের বিরোধিতা করে তিনি বলেছেন, কবিতার উৎকৃষ্ট বিচারে সমালোচককে কবির কথা চিন্তা না করে কবিতার বিশ্লেষণ করতে হবে।

কবিতা রচনার ক্ষেত্রে দুইটি বৈশিষ্ট্য এলিয়টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—একটি Unification of sensibility, আর একটি Dis-association of sensibility।

আর্টের সার্থকতা বিচারে এলিয়টের Objective Correlative-তত্ত্বও খুবই উল্লেখযোগ্য। এলিয়ট বলেছেন, শিল্পী বা কবির আবেগ subjective বা ব্যক্তিহীন। তার ব্যবহারিক জগতে যে সমস্ত ঘটনা তাকে বলা যেতে পারে ব্যক্তিনিরপেক্ষ-Objective বা বস্তুহীন। এলিয়ট বলেছেন, শিল্পসৃষ্টিতে ব্যক্তিগত আবেগ এবং বাইরের ঘটনার পরিমাণ অনুপাতে সমান. সমান হলে তবেই সে শিল্প সার্থকতা-মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মিলটনের Samson Agonistes তাঁর মতে একটি মহৎ শিল্প কর্ম। যেহেতু মিল্টন স্ব-জীবনে অনুভূত গভীর বেদনাবোধকে (subjective suffer -ing and emotion) মূর্ত করে তুলেছিলেন বাইবেল-বর্ণিত স্যামসনের চরিত্রের মধ্যে।

আই. এ. রিচার্ড্স (১৮৯৩—)

New Critics-এরা কাব্যকে দুদিক থেকে বিচার করতে চেয়েছিলেন। প্রথম, শব্দের গভীর তাৎপর্য উপলব্ধির মাধ্যমে কবিতার মূল্য বিচার। দ্বিতীয়, শব্দপ্রয়োগের জটিলতার উর্ধ্বে যে সাহিত্যরস আছে তার আস্বাদন এবং প্রকাশ। শিল্পসৃষ্টির নৈতিক বা আধ্যাত্মিক কোন উদ্দেশ্য আছে বলেও তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। Form এবং Content-এর স্বাতন্ত্র্যও এঁরা স্বীকার করেন নি। এঁদের মতে শিল্প সৃষ্টি অখণ্ড।

রিচার্ড্স এ যুগে Practical criticism-এর পথপ্রদর্শক। প্রত্যেকটি কবিতার বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের সাহায্যে কবিকৃতির বিচার Practical criticism-এর লক্ষ্য। সৌন্দর্যের কমপক্ষে ষোল রকমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি The Foundation of Aestheties গ্রন্থে।

The Meaning of Meaning গ্রন্থে রিচার্ড্স সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শব্দের দ্বিবিধ অর্থের কথা আলোচনা করেছেন রিচার্ড্স উক্ত গ্রন্থে : Direct meaning এবং Oblique অথবা Indirect meaning। শব্দটি শোনা মাত্র যে অর্থ মনে আসে তা Direct meaning। তার মধ্যে কোন ব্যঞ্জনা নেই। Oblique বা Indirect meaning ব্যঞ্জনাময়। সে অর্থ চিন্তার সাহায্যে লাভ। প্রায় বারোশো বৎসর পূর্বে ভারতীয় আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন শব্দের ব্যঞ্জনা সম্পকে উল্লেখ-যোগ্য আলোচনা করেছেন।

The Principles of Literary Criticism গ্রন্থে রিচার্ড্স সমালোচনা-তত্ত্বের যে দুইটি অপরিহার্য গুণের কথা উল্লেখ করেছেন সে হল Value এবং Com-

munication। তিনি বলেন, মানুষের মনে যে বিভিন্নমুখী আবেগ এবং ভাবের সংঘাত চলছে তাকে শান্ত করবার ব্যাপারে আর্টের ভূমিকাও একই। যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে আর্ট মনের বিশ্বমুখী গতিকে সংযত এবং শান্ত করে তাকে বলা হয় Synaesthesis।

রিচার্ড্স পূর্বসূরী কোন কোন সমালোচকের মত আর্টকে শুধুমাত্র প্রকাশ বা Expression বলে ভাবতে পারেন নি। তাঁর মতে আর্টের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল Communication, অর্থাৎ কবি যা অনুভব করবেন পাঠক-অন্তরে তা পৌঁছে দেবেন।

Practical Criticism গ্রন্থে তিনি ভাষার চার ধরণের অর্থের কথা বলেছেন : বোধ বা sense; আবেগ বা feeling; সুর বা tone; অভিপ্রায় বা Intention। রিচার্ড্স-এর মতে বোধ বা sense সৃষ্টির জন্য আবেগ এবং আবেগ সৃষ্টিকারী বস্তুর সংযোগ দরকার। আবেগের অবতারণার সাহায্যে ভাষার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি সম্ভব। পাঠক বা শ্রোতাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয় বলে কবি বা শিল্পীর সুর ওঠানামা করে। এ ছাড়া সৃষ্টিকর্মে লেখক বা শিল্পীর যে অভিপ্রায় থাকে সে অনুযায়ী ভাষার তারতম্য ঘটবে—এ তো খুবই স্বাভাবিক।

সাহিত্যবোধের জন্য দুই ধরনের বিশ্বাসের কথাও বলেছেন রিচার্ড্স—Intellectual belief এবং Emotional belief। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ বুঝবার জন্য যে ধরনের বিশ্বাসের প্রয়োজন তা Intellectual belief। কবিতা যেহেতু স্থান-কাল-নিরপেক্ষ সে কারণে যে আবেগের সাহায্যে কাব্যের সৃষ্টি হয় তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

উইলিয়ম এম্পসন :

রিচার্ড্স-এর সংস্পর্শে এসে সাহিত্য সমালোচনা শুরু করলেও এম্পসন কাব্যের দুর্বোধ্যতা সমর্থন করে আধুনিক সমালোচনা জগতে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেন, বলেন কাঠিন্য ও দুর্বোধ্যতা কবিতার প্রকৃত রসসৃষ্টির সহায়ক। Seven Types of Ambiguity গ্রন্থে তিনি সাত রকমের ambiguity বা দুর্বোধ্যতার কথা বলেছেন। প্রথমত, একটি শব্দ বা বাক্য যখন একটি কথা প্রকাশ করে, দ্বিতীয়ত, যখন লেখক শব্দকে একটি অর্থে প্রকাশ করেন। যদিও সে শব্দ একাধিক অর্থদ্যোতক হতে পারে; তৃতীয়ত, যখন একটি শব্দ দু'টি idea বা ভাব প্রকাশ করতে পারে, চতুর্থত, দুই বা বেশী অর্থ যখন একটি বাক্যকে পরস্পরবিরোধী ও

জটিল করে তখন তা লেখকের জটিল মানসিকতার পরিচায়ক বলে মনে হয়; পঞ্চমত, রচনার সময় কোন ভাব বা idea-কে আবিষ্কার করে যখন সে ভাবকে লেখক স্থিরভাবে অনুসরণ করতে পারেন না, ষষ্ঠত, লেখকের কোন উক্তি দুর্বোধ্য মনে হলে যখন পাঠক নিজেদের মন্তব্য দিতে বাধ্য হন; এবং সপ্তমত, যখন কোন শব্দ দ্ব্যর্থক হয় এবং এই দ্বিধাবিভক্ত অর্থ লেখক মনের মৌলিক দ্বিধা প্রকাশ করে।

এফ আর লীভিস :

এফ, আর, লীভিস রিচার্ডস-এর বিশ্লেষণপ্রবণতা এবং এলিয়টের নীতিবাদ ও ঐতিহ্যপ্রীতির দ্বারা প্রভাবিত হলেও সাহিত্যে নতুন মূল্যবোধের কথা বলেছেন। তাঁর মতে সে সাহিত্য মহৎ যার ওপর নীতি এবং সুস্থ জীবনের সুস্পষ্ট ছাপ পড়ে।

আধুনিকতম শিল্পতত্ত্ব : Surrealism ও Existentialism :

এর জন্মস্থান ফরাসী দেশে। Surrealism-এর প্রধান কথা হল মনের পূর্ণ স্বাধীনতা। স্যুররিয়ালিজমের প্রবক্তারা তাই আধুনিক সভ্যতার ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করে প্রাচীন যুগের সরল সুন্দর জীবনচেতনায় ফিরে যেতে চেয়েছেন।

স্যুররিয়ালিষ্ট আন্দোলনের দুটো সুস্পষ্ট পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ের নাম Dadaism। Dada শব্দের অর্থ শিশুর প্রথম কাকলি। স্যুররিয়ালিষ্টেরা বললেন, কবিতার ভাষা হবে শিশুর ভাষার মত অর্থহীন। সভ্যমানুষের যুক্তি এবং ব্যকরণসম্মত ভাষাকে কবিতার জগৎ থেকে বিদায় দিতে হবে। যা মনে আসে তাকেই ফুটিয়ে তুলতে হবে কবিতায়। স্যুররিয়ালিজমের একটি গোষ্ঠীর নেতা রুমানিয়া দেশের অধিবাসী ট্রিষ্টান জারা (Tristan Tzara)।

স্যুররিয়ালিষ্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সভ্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন নার্ভাস, র‍্যাঁবো, এবং গিওম অ্যাপলিনেয়ার (Guillaume Appollinaire)। তবে এ পর্যায়ের স্যুররিয়ালিস্ট্‌দের সব চাইতে বেশী প্রভাবিত করেছিল ফ্রয়েড উদ্‌ভাবিত-অবচেতন মনের তত্ত্ব। শিল্পরচনায় অবচেতন মনকে তাঁরা সব চাইতে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সাধনায় বাহ্যজ্ঞানহীনতা বা সমাধি (Trance) স্বপ্ন, দুর্ঘটনা, অবচেতন অবস্থায় লেখা প্রভৃতিকে নতুন ব্যাখ্যা দিতে চাইলেন তাঁরা। এঁদের প্রভাবে চিত্রশিল্পী পিকাসো (Picasso) চিরাচরিত শিল্পরীতিকে অস্বীকার করে মানবমনকে মুক্তি দিতে প্রয়াসী হলেন নবতর পদ্ধতিতে

শিল্প রচনা করে। পিয়েরে রেভার্দি (Pierre Reverdy), রেনে চার (Rene Char) এবং পল এলুয়ার (Paul Eluard) স্যুররিয়ালিজমের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা। স্যুররিয়ালিষ্ট তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে খ্যাতি অর্জন করেন আন্দ্রে ব্রেতোঁ (Andre Breton)।

Existentialism বা অস্তিত্ববাদ :

Existentialism বা অস্তিত্ববাদী তত্ত্ব মননশীল মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। দার্শনিকেরা যাকে বলেছেন বস্তুর স্বরূপ বা Essence, অস্তিত্ববাদীরা তাকে বলেছেন অস্তিত্ব। বস্তুর স্বরূপ বোঝা যেমন আয়াসসাধ্য ব্যাপার তেমনি অস্তিত্ববাদও (Existentialism)। অস্তিত্ববাদীদের মূল লক্ষ্য সকল প্রকার বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি ঘোষণা। এ অস্তিত্ববাদী তত্ত্বকে উপন্যাসে রূপ দিয়ে খ্যাতিলাভ করেছেন জাঁ পল সার্ত্রে, কাফ্‌কা, আলবার্ট কাম্যু প্রভৃতি ঔপন্যাসিক।

এ পৃথিবীতে মানুষ একান্তভাবে নিঃসঙ্গ, যন্ত্রণাকাতর, এবং মৃত্যু নিত্য-নিয়ত আকর্ষণ করছে মানুষকে—এ ধরণের বিষণ্ণ জীবদৃষ্টি অস্তিবাদী জীবনদর্শনের মূল কথা। বিরুদ্ধবাদী দার্শনিকেরা কালক্রমে এ মতবাদের ভিতর সত্য আবিষ্কার করে শেষ পর্যন্ত এর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠেন।

এ যুগের সমাজে মানুষের কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নেই। গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিসত্তা বিলীন হয়ে গেছে। স্বাতন্ত্র্যবর্জিত মানুষের বর্তমান অবস্থাকে প্রথমে তত্ত্বাকারে উপস্থিত করেন কির্কেগার্ড (Kierkeguard)। এলেন হোয়াইট (Whyte), রীসম্যান (Reisman), গ্যাসেট (Gaset), জ্যাসপারস (Jashpers), মার্সেল (Marcel), বুবার (Buber) প্রভৃতি এ তত্ত্বের বিস্তৃততর বিশ্লেষণ করেন।

মানুষের গৌরব ঘোষণায় Existentialist-এরা পঞ্চমুখ। তাঁরা বলেছেন, সাধারণ মানুষ ঈশ্বর বা দেবতাদের চাইতে বড়। তবে আধুনিক মানুষের সীমাবদ্ধতা তাঁদের পীড়িত করেছে। তাঁরা অনুভব করেছেন, আধুনিক মানুষ বিরাট সমাজের একটি অঙ্গমাত্র। সে বৈশিষ্ট্যহীন, সত্তার জগতে তাকে চেনা যায় না। এ যুগের বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ যেমন Facism, Communism, Capitalism বা Imperialism—কোনটির কাছেই মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত নয়। কার্ল মার্কস-এর মত বিপ্লবী চিন্তাবিদ্‌ও মানুষকে ধনিক এবং শ্রমিক—এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। মানুষের ব্যক্তি সত্তা সর্বত্রই

অস্বীকৃত।

জ্যাসপারস তাকেই বলেছেন স্বাধীনতা যেখানে ব্যক্তি নিজের কাছে আনুগত্য স্বীকারে দ্বিধাহীন।

ফরাসী Existentialist সার্ত্রে দাবী করেছেন মানুষের পূর্ণস্বাধীনতা। পূর্ণ শান্তি লাভের একমাত্র পথ মৃত্যু। এই Existentialist মতবাদের সার্থক রূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে সার্ত্রের The Ways of Freedom এবং কাফ্কার The Trial ও The Castle উপন্যাসে। এ নৈরাশ্যবাদী জীবনদর্শনকে ভাল, মন্দ বা অসুস্থ মনের পরিচায়ক যাই বলা হোক না কেন, আধুনিক সাহিত্যের ওপর এর অনতিক্রমণীয় প্রভাব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

বীতশোক ভট্টাচার্য

সে : রাবীন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব

তৈলাক্ত প্যাস্টেলের সঙ্গে বর্ণিল জল মেশানোর চেষ্টা চলছে সেদিন তাঁর, কালি-কলমের সঙ্গে পোস্টার রং মিলে গিয়ে গ'ড়ে উঠছে কিম্ভূত সৃষ্টি, এমন সময় পা দাপিয়ে শোভন নাগরিক প্রত্যাহারের-ঘরে ঢুকে পড়লো কিমাকার 'সে', চারিদিক দেখে দেখে মুক্তপ্রাণ কেশর ঝাঁকালো ঘাড় বাঁকালো, কেননা বাইরের তাকে পাতা-না-কাটা আশবাব তাঁর রচনাবলি, কারণ, তাকের উপর, বাঁকুড়ার স্থাণু লাল ঘোড়ার পাশে, স্থবির রবীন্দ্রনাথের মূর্তি, পাথরের, আর শান্ত, চক্ষুতারাহীন এবং সুষমাময়। 'সে' তার বিশেষ ভার এবং ঘনত্বের আয়তনটুকু নিয়ে তাঁর কাছে আসতে চাইলো, অপরি-মেয় প্রাণ-পিণ্ডের রূঢ়তা নিয়ে তাঁর কাছ থেকে ভিক্ষে ক'রে নিলো স্নেহ, আকাঙ্ক্ষা করলো এমন এক ধরনের রাবীন্দ্রিক আলোক-সম্পাতের, যার ফলে, জিয়াকমেতি যাকে বলেছিলেন, 'কুঁজ ও কোটরগুলির মধ্যে পর্যাপ্ত প্রাতিস্বিকতা' তা-ই ভ'রে দেওয়া সম্ভব। একটি পটভূমি নির্মাণের প্রয়োজন ছিলো তার জন্য, আর তা হ'লে যথেচ্ছ পরিপ্রেক্ষিতে এনে স্থাপন করতে হয় 'সে'-কে, তাই রবীন্দ্রনাথ সেদিন এক সমোত্তল স্থানে এনে স্তূপ করলেন শুদ্ধ শিল্পের চিন্তা ও রাজনীতির সমস্যা, কৌতুকের কৌতূহল আর আঙ্গিকের ধারণা, যোগাযোগের প্রশ্ন এবং বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা : জরুরি ছিলো এই স্তর স্তর গাঢ় বর্ণ-লেপন, সংলগ্ন ও শোষক, চিত্রের চারিত্রটিকে এক দৃঢ়-সংবদ্ধতা দেবার জন্যই যেন ছিলো এই নানা-ব্যবহার, কখনো সে উপরিতলে বিচ্ছুরিত

অন্ধকারের আভা, কখনো তা ভিতর থেকে ফেটে-বেরোনো আলো, বেদনার, তা আবার এই আলো-ছায়ার পারস্পরিক পাষাণ ভেঙে-ভেঙেও কোথাও কোনোখানে পৌঁছে যাওয়া ; অথবা বস্তুটিকে তার গতি-জাড্যের মধ্যেই পাবেন, পাবেন ব'লে তার ভারসমতাকে এমন বিপর্যস্ত ক'রে দেওয়া, যাতে রেমব্রাণ্টের ছবির মতন পা-টিপে এগিয়ে আসে তাঁর বাঘ, হিংস্র এবং হাস্যময়, ক্ষিপ্র আর গম্ভীর। অস্থির অশান্তির এই দীপ্তি এসে লেগেছে তাঁর নিসর্গচিত্রকল্পেও, 'সে'র আবির্ভাবকালের 'পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ ; যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ ওৎ পেতে আছে, কখন একলাফে মাঝআকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে থাবার ঘা।

অদ্ভুত একটি ভাবপ্রতীকের মতো সম্ভাবনাময় এই দিগন্তে বাঘের উদয় : অস্মিতার স্বার্থপরতার প্রশ্নটি আপাতত অবান্তর সেখানে, ভীতিগ্রস্ততার সুযোগও কিছু দূরপরাহত ; কেননা, ব্লেকের কোনো উজ্জ্বলন্ত বাঘকে তো শিশু পুপে চায় না, বরং 'শুকসপ্ততি'র এক ব্যাঘ্রমারী রমণীর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম ক'রে দেখতে পারলে ও বেঁচে যায়। তাই 'বাঘ' নামক একটি প্রচলিত কাব্য-বিষয়কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন রীতিমতো তৎসম শব্দের ঘোর বাহুল্যে উচ্ছ্বসিত হন, তখন পুপে কুণ্ঠিত হ'য়ে ব'লে বসে : 'না না, ভালো লাগবে না কেন ; কিন্তু এর মধ্যে বাঘটা কোথায়।' সেই সপ্রাণ অস্তিত্বের সন্ধানে তাঁকে ফিরে আসতে হয় প্রায়-রূপকথায়, হাস্যময় শিশু-আখ্যানে, ছড়ার ছদ্ম-অসংলগ্নতায় : কারণ পুপের কাছে যে ওই শাবান-খোঁজা বাঘ-টিই সবচেয়ে সত্য, বাস্তব সব চাইতে, তার কাছে ওই 'বাঘের ছড়া'র চাইতে ভালো আর কিছু হয় না, এমনকি, কিছু 'প্রখরনখর বিভীষিকা যুক্ত কোনো সারস্বত প্রয়াসও, না। আরো আশ্চর্য হ'য়ে লক্ষ করতে হয় ওই বিশেষ 'বাঘের ছড়া'টি, এক ছোটো মেয়ের অনুষঙ্গ নিয়ে, কীভাবে ফিরে এসেছে তার 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে, একই অবিকল সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর প্রয়োজনে : "ছোটো মেয়ে চোখ দুটো মস্ত করে হাঁ করে শোনে। আমি বলি, 'আজ এই পর্যন্ত।' সে অস্থির হয়ে বলে, 'না বলো, তার পরে।' সে নিশ্চিত জানে, সাবানের চেয়ে, যারা সাবান মাখে বাঘের লোভ তাদেরি' পরে বেশি। তবু এই সম্পূর্ণ আজগুবি গল্প তার কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব, প্রাণী বৃত্তান্তের বাঘ তার কাছে কিছুই না। ওই আয়না-দেখা-খেপা বাঘকে তার সমস্ত মনপ্রাণ একান্ত অনুভব করাতেই সে খুশি হয়ে উঠছে। একেই বলি মনের লীলা, কিছুই না নিয়ে, তার সৃষ্টি, তার আনন্দ।"

এই নিঃসংশয় প্রকাশকেই তার অস্তিত্বের চরম ছাড়-পত্র হিশেবে ব্যবহার

ক'রে এসেছে 'সে', এক পেশল প্রত্যক্ষগোচরতার গুণে অন্বিত হ'য়ে উঠেছে তার উপস্থিতি। 'গল্পের মূল অবলম্বন হচ্ছে একটি সর্বনামধারী সে' : নির্দেশের স্পষ্টতা থেকে দূরে, অথচ প্রত্যাশার স্বচ্ছতায় আকীর্ণ তার চরিত্র. লুই ক্যারল থেকে জেম্‌স্ জয়স পর্যন্ত যে অসঙ্গত সঙ্গতির পথ, সে রাস্তাতেই তার নিত্য আনাগোনা। উনামুনো যেমন তাঁর উপন্যাসের 'নিভোলা' নামটিকে হিস্পানি 'নোভেলা'র সংজ্ঞা থেকে সামান্য সরিয়ে এনে 'নিয়েব্লা'র আচ্ছন্ন নীহারিকায় মূর্ছিত ক'রে দিয়েছিলেন, এও সেরকম একজীবনের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠবার চেষ্টা হয়তো ; আর একই কারণে বোধহয় বহুত্ববাচক বিশেষ্যের সাধারণ প্রয়োগ অনেক কমেডির সামান্য ব্যাপার ; অথবা সূত্রটিকে বিস্তৃত ক'রে নিয়ে যাওয়া যায় তাঁর অন্য একটি শিল্পায়াসের ক্ষেত্র পর্যন্ত, ছবির নামহীনতার কারণ নির্দেশ ক'রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে সেখানে তিনি লেখেন : 'একটিমাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল, বিশেষতঃ সে নাম যখন বিষয়সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি, তারা অনাহূত এসে হাজির, রেজিষ্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন উপায়ে।' এবং 'দাদামশায়'ও এখানে কেবল 'দাদামশায়' এজন্য, বের্গসঁ যেমন দেখিয়েছিলেন ধ্রুপদী কমেডির নাম কোনো এক শ্রেণির প্রতিভূ, বিশেষ্য হ'লেও তা একান্ত নির্দিষ্ট বাচকতাকে অতিক্রম ক'রে সাধারণ নামপদরূপেই গণিত হ'তে ইচ্ছুক, সেরকমই কোনো প্রাতিস্বিক সামাজিক সম্ভাবনায় 'সে' এ কাহিনীর নায়ক, খামখেয়াল থেকে পাগলামিতে উত্তরণের হাজার-দুয়ারি তাই তাকে ঘিরে ঘিরে খুলে যায়, যেন কোনো ভুল-ভুলাইয়াতে নিতে যেতে চায় সে এভাবে, বোধহয় ভুলক্রমেই।

বিশুদ্ধ নন্দন-তত্ত্ব বা শিল্পিজনোচিত অনাসক্তিকে অতিক্রম ক'রে সামাজিক বাসনায় ওতপ্রোত হবার এই প্রণালীটি তাঁর কাছেও নতুন, দর্শনের ধবল মিনার থেকে একটি আপাতলঘু আবহমণ্ডলে পদক্ষেপের এই সচেতন সামাজিক ভঙ্গিটি তাঁর চরিত্রের কাছেও নবীনতর। অথচ সামাজিক জীবনের সম্পর্কে বিবর্ধমান অনাগ্রহ থেকে যে শীতল হাসির উৎপত্তি তা নিয়েও তো আজ তাঁর শ্বেত শ্মশ্রুর উড়াল। ফলে এ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রতিমান মনে হয় এক ক্লিষ্ট ও হাস্যময় সান্টা ক্লজ, যাঁর অদহায় সপ্রতিভতায় এখন কোটের কোটর থেকে বেরিয়ে আসে আশ্চর্য সব উপহার সামগ্রী, অদ্ভুত জিনিশ সমস্ত ; আর স্বাভাবিকভাবে ঈষৎ পাল্‌টে যান দাদা-মশায়ও, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে দৃশ্য হ'য়ে ছিলো ঠাকুরদাদার যে স্নিগ্ধ প্রসন্ন আর্কেটাইপটি সেই আচার্যের প্রজ্ঞা ও সন্ন্যাসীর শান্তি থেকে সামান্য স্খলিত

হ'য়ে আসতে হয় তাঁকে, তাঁকেও, কাহিনীর শেষ পংক্তিতে এসে হ'লেও অন্তত একবার তাঁকে, প্রত্যক্ষভাবে, 'চশমাটা মুছে ফেলে' 'সুকুমারদের বাড়ির ছাদে' উঠে যেতে হয়।

আর 'সে'ও কী পালটে যায় না শেষপর্যন্ত, এই 'গল্পের বহুরূপী'রও প্রয়োজন হয় না বদল, পরিবর্তন! তাই ছদ্মবেশের পর ছদ্মবেশ ত্যাগ ক'রে আসে সে, কখনো হয় পঞ্চানন, কখনো পাঁচকড়ি, পীতাম্বর হয় কখনো; কখনো মাথাঘষা গলিতে থাকে সে. কখনো কোন্নগরে; বর হয় কখনো, কখনো হয় বর্বর; পাতু গেঁজেলের গা প'রে নেয় কোনোদিন, আবার এক সময় নিজের ভিতরই বনমানুষের মগজ পুরে ফেলে। আর এক মৌল বিদূষক, ডিলান টমাস, 'দুই পথ' নামে একটি নাটকের আয়োজন করেন: সেখানে এক শিল্প-নগরীতে পাশাপাশি দু'টি পরিবার থাকে, তারা কেউ কাউকে চেনে না; দুটি পরিবারে একটি ছেলের ও একটি মেয়ের জন্ম থেকে এ কাহিনীর শুরু, নাচ-ঘরে তাদের প্রথম পরিচয়ে এ রচনার সমাপ্তি; সেই ছেলেও মেয়েটিকে দেখা যায় পুপে আর সুকুমারে, জীবনের দু'নৌকোয় প্রথম পা দিয়ে যারা বিপন্ন, বিস্মিত; আর তারই মধ্যে, সেই নাটকের মাঝখানে আছে এক ডিলানেস্ক চারিত্র, তা হ'লো উপত্যকার কণ্ঠস্বর, যা একই-সঙ্গে ধর্মযাজক ও রাজনীতিবিদের, কবি আর দোকানদারের, সার্জেন্ট এবং ফুটবল-সমর্থকের: 'সে'ও তেমনিভাবে পর্যাপ্তরূপে প্রাতিস্বিক, একান্তভাবে নিজস্ব। অথচ, তবুও, উপকরণের এই অতিমিতি নিয়েও বেঁচে থাকা হ'লো না তার, প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো জীবনের দৃশ্য থেকে ক্রমশ স'রে যেতে হ'লো, ঝরাতে হ'লো তার বাক্যপিণ্ড তার মেদভার, শুধু পুপে-সুকুমারের মুখ তার আলোতে, কোনো 'বেগনি-পেরোনো আলোতে'ই হয়তো, পরস্পরের কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠবে ব'লে।

২.

আর তা-ই বিমূর্ত চিত্রকলার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেও যেমন জেগে থাকে তাঁর বস্তুনির্ভরতা, তেমনি 'সে' ও তাঁকে নির্বিশেষ মানবের ভাব থেকে বিশিষ্ট মানুষ-মানুষীর ভাবনারূপে বিচ্যুত ক'রে নিয়ে আসে; ওই পরস্পর-সম্পর্কিত বিষয়াশ্রয় হিশেবেও 'সে'-র ভূমিকা এখানে গ্রাহ্য: পিকাসো একদিন জিশুর প্যারাবলের প্রতিতুলনায় গ্রহণ করেছিলেন স্বকীয় শিল্পের ভাব-প্রতীতিকে, রায় দিয়েছিলেন বস্তুব্যাবহারের স্বপক্ষে;

কেননা অবিকল একই জিনিশের পুনরুৎপাদনে প্রকৃতির অনীহা, আর প্রত্যেকেই তো তার নিজস্ব ধরনে, অনন্য : এই নিবিড় একতম স্বভাবের বিশিষ্টতা নিয়ে 'সে' দিনে দিনে প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে, 'বেসুরতত্ত্ব'-এর দিকে এমন প্রবণতা দেখা যায় তার ; তা ছাড়া, আর্কেটাইপের গঠনের দিকে চোখ রেখেও কৌতুকস্রষ্টা যে প্রয়োজন অনুসারে নতুন টাইপ তৈরী ক'রে নেন, তার ন্যূনতম লক্ষণ নিয়েও 'সে' হ'য়ে ওঠে সর্বাঙ্গিকে প্রমাণিতভাবে আলাদা ; পাস্কাল, অদ্ভুত সমাধান দিয়ে, বলেছিলেন : দুটি অবিকল এক মুখ আলাদাভাবে হয়তো হাস্যোদ্রেকে অসমর্থ, তবু একত্রে, তাদের অন্তর্নিহিত সঙ্গতির কারণেই, তারা কৌতুক উৎপাদনে সক্ষম। এ জন্য এ লেখার জল-স্থল, গদ্য-পদ্য নারী-পুরুষ ও শুক-শারির বহমান রাবীন্দ্রিক বিতর্ককে লহমায় স্তব্ধ ক'রে বুঝিয়ে দেয় 'সে', বোঝায় কোনো চ্যাপলিনের চিত্রার্পণের যোগ্য এই অসম্ভব সঙ্গতির জগৎ, অথবা, লোকে যাকে 'বাস্তবতা' বলে জানে তারই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে প্লেটো যেমন গুহাহিত মানুষদের সামনের দেওয়ালে প্রতিফলিত ও চলন্ত ছায়া-পুতুলের তুলনা দিয়েছিলেন, 'সে'র ছায়াগুলিতেও তেমনি পিছন-থেকে আলো-ফেলা. তার ছবিগুলিও কিছু নিহিত অন্ধকারের বিচ্ছুরণ। তাঁর গদ্য-কবিতার কুটিল কাটাকুটিগুলিও তাই এখানে একযোগে একরকম কালো সুষমার ক্যালিগ্রাফি চায়, আর তাই হয়তো ভুরু কুঁচকোয় না 'সে', তার কপালে বুঝি ভাঁজ পড়ে না, তবু যেন তার আস্যহীন মুখের মধ্যে কিছু থাকে, থাকে কোনো অভিনব ব্যঞ্জনা, অভিব্যক্তির এক নিজস্ব গুণ, যা সেই মুহূর্তে তাকে প্রয়োজনীয় সংকেতবহ করে তোলে : এই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট চারিত্র নিয়ে 'সে' সমাহিত ভারতীয় শৈলীর থেকে আলাদা হ'য়ে যেতে চায়. বন্য রুচিতে যেন অস্বীকার করবে ভাবে বনেদি ঐতিহ্যকে।

কেননা যে অপরিণত অবস্থায় 'সৌন্দর্য-বিকাশের ক্ষমতা ও চরিত্রের অসংযম একত্রই' থাকতে পারে, 'সে' হলো তার প্রাথমিক স্তর। খেলাচ্ছলে কশার অমোঘ আমোদ স্বীকার ক'রে নেওয়া যায় এখানে, এবং বিস্মৃত না হ'লেও চলে যে এ হ'লো একধরনের স্পর্ধা, এ 'একঘেয়ে বিধানের সৃষ্টিকর্তা পিতামহকে এমন ক্ষেত্রে ঠাট্টা, যেখানে শাস্তির ভয় নেই'। কিন্তু শিল্প যখন শিশুর ঐ সংরক্ষিত এলাকা থেকে ছিটকে আসে, তখনই তা দাম্ভিক স্ফুলিঙ্গের রূপ নেয়, ক্ষণস্থায়ী ক্রোধের উজ্জ্বল সৃষ্টি হয় বুঝি বা। সাহিত্যতত্ত্বে এই 'ক্রোধের সৃষ্টি দম্ভের সৃষ্টি'র আলোচনায় তাই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বামিত্রের সমান্তর জগৎ-সর্জনা ও তার করুণ পরিণতির উল্লিখন টানেন : সুতরাং সেই জগৎ বিধাতার জগতের সঙ্গে মিশ খাইল না, তাহাকে স্পর্ধা

করিয়া আঘাত করিতে লাগিল, খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া হইয়া রহিল, চরাচরের সঙ্গে সুর মিলাইতে পারিল না, অবশেষে পীড়া দিয়া পীড়া খাইয়া সেটা মরিল।'

কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হ'তে দিলেন না রবীন্দ্রনাথ, তাঁর মনীষার অনুভব, অভিজ্ঞতার যোগফল ও তাঁর মানসিক নির্ধারণ তাঁকে যে বস্তুজীবনেরও বোধ দিয়েছিলো, সাহায্য করেছিলো এই নবীনতর ঐক্যসূত্রের ভিন্নধরনের নিরূপণে, তাই তাঁকে সহসা খেয়ালখুশির ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত ক'রে দিলো, আকল্পনা থেকে 'সে' উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলো ভাবপ্রতিভায়; লেসিঙের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলা যায়, অর্থপূর্ণ সক্রিয়তা 'সে'কে যেমন পাশব জান্তব অবস্থার উচ্চে তোলে, তেমনি এক তাৎপর্যের আবিষ্কার, সেরকমই কিছু লক্ষের অনুসরণ, তাকে ভাবপ্রতিভার লোকে নিয়ে যায়; অথবা ঈষৎ অন্যভাবে বলতে গেলে, 'সে' যেমন এই রাবীন্দ্রিকতায় ভারসাম্য আনতে চায় তেমনি রবীন্দ্রনাথও এখানে 'সে'-র প্রতিষেধকরূপে সক্রিয় হ'য়ে ওঠেন। সমগ্র কাহিনীটিকে কথোপকথার ভঙ্গিতে উপস্থাপনের উদ্দেশ্য তো তা-ই, এক অন্তর্গূঢ় ভাবদ্বন্দ্বকে শূন্য প্রান্তরের শব্দের বিদ্যুৎচ্ছটায় স্ফুটতম ক'রে তোলা, একটি সামগ্রিক কমেডি-নাট্যের মর্যাদা দেওয়া কাহিনীটিকে, ল্যাণ্ডরের সৌম্য রোম্যান্টিকতা থেকে স'রে এসে আরেক অনুলোম-প্রতিলোম দর্শন।

সেজন্য কাহিনীটির আদ্যন্ত রক্ষিত হয় একটি মানবিক সংযোগের সূত্র, বাস্তব ও কল্পনাকে টানটান ভারসমতায় রাখতে চেয়ে তলায় তলায় বুনে যেতে হয় এক মানুষিক সঙ্গতির জাল। এমনকি, বস্তু কেবল জীবন্ত কোনো কিছুর প্রতিরূপ হিশেবে যে হাস্যকর, বের্গসঁ-র এ তত্ত্বটিরও প্রয়োগ ঘটে এক্ষেত্রে, সেখানে 'তার তালি দেওয়া আঁশ-বের করা সবুজ রঙের একপাটি পশমের মোজা কাদাসুদ্ধ শুকিয়ে গিয়ে মরা কাঠবেড়ালি'র কাটা লেজের মতো' মনে হয়, মেরিঅ্যান মুরের একটি সপ্রতিভ উপমা বোধ হয় যেন। আরো রক্ষিত হয় চিরকালীন লোক-আখ্যানের একটি রীতি, সর্বদেশিক রূপকথার অপূর্ব স্বস্তিবাচন থেকে যায় প্রারম্ভে : 'আমি আরম্ভ করে দিলুম, এক যে আছে মানুষ।' রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যার মতন সে মানুষ নামহীন, 'শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল'-এর মর্যাদায় আমূল সমর্পিত; কেন না, 'ওরা নামজাদা নয়, অথচ ঘরে ঘরে ওদের খ্যাতি।' এবং সেজন্য শিশু পুপে সুন্দর একটি অনুমানের-খেলা খেলে তাকে নিয়ে, তার নাম নিয়ে : 'বলো দেখি, প দিয়ে আরম্ভ'; সেখানে তো পরেশ, পীটার্স, প্রেস্কট একাকার হ'য়ে যায়, তার সঙ্গে মিলেমিশে যায় পুপেও। এ শুধু 'দেখা-বিনতি খেলার মতো সবার সব জেনে

লোকব্যবহার' নয়, খেলার ছলে রবীন্দ্রনাথের 'আঁতের কথা' টেনে বার করাও না, এ অস্ত্রের ঈষৎ উপরে সহৃদয়ের হৃদয়সংবাদ, পুপের অভিপ্রায় মতো সাহিত্যের এমন একটা বিদ্যুতের খেলা যে ইচ্ছে করলে একজন আর একজনের মধ্যে মিলে যেতে পারবে।'

আপাতত মনে হ'তে পারে প্রতিটি কমেডির মধ্যেই যে সুযোগ থাকে তাকে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণের ফলে নিছক শব্দক্রীড়ায় পর্যবসিত হবার ভীতিকর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে রচনাটিতে : 'ঐ হাঙ্গামগুলো জোড়া দিয়েই তো যত গল্প। গায়ের উপর সওয়ার হয়ে গল্প ছুটছে চারদিকে। কোনো গা গল্পের গাধা, কোনো গা গল্পের রাজহস্তী।' মন্তব্যটি কাহিনীর আপেক্ষিক গঠনের ইঙ্গিত দেয় নিঃসন্দেহে, তবু, মনে রাখতে হয়, সে বক্তব্য বিশেষভাবে শব্দবাহিত, নির্দিষ্টরূপে আলংকারিক। কিন্তু, না, 'ডাণ্ডা/ধপাৎ/ঠাণ্ডা/ কম্পাউণ্ড-ফ্রাকচার'-এর হাইকু-সুলভ অসংলগ্নতাও তাঁর শেষ সঞ্চয় নয়, বরং এই অসংবদ্ধ উল্লম্ফনের ঊর্ধ্বে তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞ প্রতিষ্ঠা, যেখানে 'শব্দের ভাষা নিছক ভাবের ভাষায় গিয়ে পৌঁছবে', যেখানে 'গান হবে রঙের সংগত': আধুনিক শিল্পকে তার বিশুদ্ধ ভাবরূপে স্থিত করানোর ঘোর চেষ্টা চলছে যখন চারদিকে, নিরীক্ষার ইচ্ছানুক্রমে একাকার হ'য়ে যাচ্ছে ধ্বনি এবং বর্ণিলতা, তখন রবীন্দ্রনাথের এ উক্তিও একটি স্মিত সংযোজন, হয়তো স্নিগ্ধ কটাক্ষ একটুখানি বর্তমান কাব্যকলা নিয়ে। কেননা, যে স্বচ্ছতার চেয়ে রহস্যময় আর কিছু নেই, তারই ভিতর চলে যেতে যেতে তিনি অনুভব করেছিলেন, বিমূর্তভাবনার অলক্ষ মেঘস্তরে এই উজ্জ্বল বীজগণিতের সপ্রতিভ সঞ্চরণ হয়তো সুচারু, তবু অব্যবহিত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ভাষার সেই শব্দহীন পদসঞ্চার অনর্থক, মানুষের অভ্যস্ত ও আবশ্যিক জীবনযাত্রায় সেই ছায়াপাত নগণ্য। তাই কোনো সুর্-রিয়ালিজমের সুলভ উক্তি নিয়ে গা দাগায় না 'সে', বরং ছড়ার সন্ধ্যাভাষার সঙ্গে মিলিয়ে নেয় ছবিগুলির প্রদোষকালীন বর্ণবিচ্ছুরণ। হেগেলের মতোই বিষয়কে শৈলী থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে দেখতে পারেন ব'লে এখানে এ জিনিশ সম্ভব হয়, ভাবকে তিনি ব্যাহত ক'রে নিয়ে আসেন রূপ থেকে, উপায়ের চাইতে উপেয়র দিকে, একটি সামাজিক/নৈতিক তাৎপর্যের দিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চান তাঁর ইঙ্গিত। এই সূত্র ধরে গদ্যকাব্যের আলোচনা আসে এখানে, এ লেখায় দেখা দেয় রূপ ও রীতিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক'রে তারপর আবার একত্র করার সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা। বস্তুত, সংগতি এবং প্রাচুর্য, রাবীন্দ্রিক শ্রীতত্ত্বের দু'টি মূলমন্ত্রই তলে-তলে কাজ করে এখানে, এক আভ্যন্তরীণ

আর্দ্রতায় ডানার শিকড় গজায়।

কিন্তু মানবিক মানসিকতার আঙ্গিকে যেমন ভাষার নির্মাণ, তেমনি কৌতুক-সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতটিও পর্যাপ্তভাবে নীতিসচেতন ; ইংরেজি 'উইট' সংস্কৃত 'বিদ্'-এর সঙ্গে সেক্ষেত্রে ধাতুগত মিল খুঁজে পায়, বোঝে হাসি এই সামগ্রিক জীবনের প্রতিভাস, বিরক্তিকর ও পুঙ্খাতিপুঙ্খ যান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বচ্ছ প্রতিবেদন। অন্যভাবে বলা যায়, শূন্য দিয়ে শূন্যতার গহ্বর পূরণের প্রতিফল যেহেতু সারস্বত অসামর্থ্য, ব্যর্থতা, তাই, ক্যাণ্ট বা হর্বর্ট স্পেনসরের মতো, তিনিও চান কৌতুকহাস্য, শূন্যতার সম্মুখীন হওয়ার, 'দীপ্ত গীতে ব্যথাময়' হ'য়ে ওঠার সেই সাহসিক প্রণালী। অনাসক্তি হয়তো তার প্রাকৃতিক আবহ, বোধের অসাড়তা যেন তার স্বভাবে ; কেননা, সমানুভূতি ও সহমর্মিতা যে কোনো তুচ্ছানুতুচ্ছকে মুহূর্তে ঘন বিষাদবর্ণিল ক'রে তোলে, আর সেখানে হাস্যরস বুদ্ধিজীবিতার কাছে আবেদন জানায়, দূরে থেকে আকাঙ্ক্ষা করে প্রতিধ্বনির। নিজের সঙ্গে যেমন, তেমনি অপরের সান্নিধ্যে এসেও এরকম একটি নিপুণ কৌশল করেন লেখক, অনুভবের শতরঞ্চ খেলায় এবার বুদ্ধিকেও আহ্বান করেন। 'বিছে কামড়েছিল, তাই ঘুমচ্ছিলুম', এমন নিরীহ আপাতনির্বোধ উক্তির ত্বক ভেদ ক'রে তখন হাসির হুল ফুটে যায়, মুহূর্তে বৃশ্চিক দংশনজাত শারীরিক যন্ত্রণাজয়ের রাবীন্দ্রিক অভিজ্ঞতার দিকে তা বিবৃতিটিকে বহন ক'রে নিয়ে আসে, অসাড় ও অসহায়ভাবে।

৩.

কিন্তু ওই নির্বোধ উক্তিগুলির জন্যও না, হাসি আরো এই কারণে যে, মঁতেন যেমন বলেছিলেন, 'আমাদের নির্বুদ্ধিতা নয়, আমাদের বিজ্ঞতাই আমাকে হাসায়।' কিন্তু কেন একজন শীলভদ্র মানুষেরও এই উদ্দাম হাস্যপ্রণোদনা, একটি স্থিত প্রকৃতিস্থ ওষ্ঠেই এমন তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বক্রতা? পেশাদার সন্তের সুষমা থেকে দূরে স'রে এসে ক্রূরকরুণ মানবিক সৌন্দর্য দেখার এই এক আয়োজন এখানে, জীবন-পরিধির সর্বব্যাপ্ত কেন্দ্রবিন্দুটিকে লক্ষ করার অদ্ভুত প্রচেষ্টা। আর সেজন্যই 'সে' অপর্যাপ্ত বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলার প্রয়াস ; তাই যে গাণিতিক যাথার্থ্য পাগলামির স্মিত আবহাওয়া তৈরি করার পক্ষে যথেষ্ট, তা কেবল ঝুরি নামায় খোলা-মেলা 'মাষ্টারমশায়'-এর স্বভাবে, কিন্তু কৌতুকের মদির উপঢৌকন পেতে হ'লে পুপে-সুকুমারকে 'দাদামশায়'এর স্মৃতিময় হৃদয়ে নেমে যেতে হয়, যেতে হয় সেই শীতল

ভাণ্ডারে ; সেখানে স্বপ্ন হ'য়ে ওঠে এক সামগ্রিক সামাজিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি, উদ্দণ্ড পাগলামিও নিয়ন্ত্রিত হয় এক রকম অতর্কিত রীতিতে, আশ্চর্য নিয়মতান্ত্রিকতায়।

অবশ্য সহজ হয় না এই উত্তরণ, তিনটি, অন্ততপক্ষে তিনটি, হৃদয়ের স্তর খুঁড়ে নিয়ে আসতে হয় যেন স্বতোৎসারিত বেদনার এই জলধার; একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের মধ্যে অল্ডস হক্সলি একদিন যে ত্রিতল দেখেছিলেন, তারই উপর যেন এক রাবীন্দ্রিক অধি-সৌধ নির্মাণের এই স্বাধীন সাবলীল প্রয়াস, মুক্ত অনুষঙ্গগুলিকে একটি একরত্ন চূড়ায় মিলিয়ে দেবার ক্ষমতা : সেখানে থাকে প্রাতিস্বিক ভাবনা ও আত্মজৈবনিক উপাদানের ধূপবাসিত ও আধো-অন্ধকার গর্ভগৃহ, বাস্তবিক চেতনা ও তন্ময় চিন্তার পাষাণ-সোপান, আর তার উপর বিমূর্ত আল্পনাময় নিরবয়ব ভাবসমূহের আচ্ছন্নতা ; ফলে শিল্পিত বিনিময়ের প্রসঙ্গও এসে পড়ে এখানে, বস্তুত যেন কোনো পারস্পরিক আদানপ্রদানে সংলগ্ন ও নিমজ্জিত স্তরগুলি উল্টেপাল্টে যায় : 'জীবনে কোনোদিন নাচি নি, হঠাৎ নাচ পেয়ে গেল', বা 'বললে, দাদা, তোমাকে একটা গান শোনাব/কী করি, ছবি আঁকা বন্ধ করতে হল' : এমন সব পংক্তি তাই এখানে অবিরল, যা এই রচনাটিকেও ওই চূড়ান্ত ও সুডৌল রাবীন্দ্রিক নিষ্পত্তিতে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসী; হয়তো সেজন্যই সুকুমারের শেষ শওগাত একটি ছবি, 'জল-স্থল-আকাশের একতান সংগত নিয়ে।'

প্লেটোও একদা লক্ষ করেছিলেন ঈশ্বর, সূত্রধার এবং চিত্রকরের তত্ত্বাবধানে শয্যার তিনটি অবস্থান্তর এবং ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এই ক্ষতিকর স্বীকৃতি যে শিল্পী ক্রমে সত্য থেকে দু'ধাপ স'রে এসেছেন ; 'সে'তে যদিও 'দেবতার সজীব পুতুল', 'মানুষের আপন-গড়া মানুষ' ও 'ভাষার-গড়া মানুষ' এই তিনটি পরম্পরা লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তবু তাঁকে অনুরূপ কোনো স্খলন বা বিচ্যুতির পর্যায় পার হতে হয় নি, তিনি সেখানে বিবৃতি দিতে পেরেছেন নিজস্ব ধরনে : 'নিছক খেলার মানুষ, সত্যমিথ্যের কোনো জবাবদিহি নেই।' সরলতম এই স্বীকারোক্তি, এবং লীলাবাদের সারস্বত সূত্রটিই যেন এখানে সহজ বিস্তার চায়, স্তরগুলি চায় এক পূর্বপরিকল্পিত রীতিতে বিন্যস্ত হ'তে : 'জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।'

তবু বিমূঢ় ম'তেন যে প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর প্রবন্ধাবলি সম্পর্কে, সেই জিজ্ঞাসাই শানিত শস্ত্রের মতো এই রবীন্দ্র-রচনা ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দেয় পাঠকের দিকে : 'অসংলগ্ন এর প্রত্যঙ্গগুলি, উদ্দেশ্যহীন আয়তনহীন এই সমস্ত অংশ, কোন্ সমাপতন

সংযুক্ত করে তাদের, করেই বা কীভাবে!' অথচ আরো বিচলিত হ'য়ে দেখে যেতে হয় তাঁর মায়াবী আঙুলের খেলা, যাতে পুরাণপ্রোথিত দৈত্যের মতো উঠে আসতে পারে 'সে', যাতে বেরিয়ে আসে ডানাঅলা মহিষাসুর, মাছ পরিণতবক্ষ কামাখ্যা-কন্যা হ'য়ে ওঠে, এবং সে যেন কেমনভাবে হস্তান্তরিত হ'তে থাকে চাবিগুলি, হ'তে থাকে, শুধু একটি সাংগীতিক থীমকে সুষমাময় পূর্ণতার আশ্চর্য ঝংকার দিতে হবে ব'লে।

তাই 'হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস' লিখেই ক্ষান্তি দিলে চলে না তাঁর, 'হুঁহাউ' মানুষদের মাথার উপর দাঁড় করিয়ে দিলে যদি 'ইয়াহু' হয়ে যায়, তবুও না; বস্তুত, কেনই বা সুইফটের সিনিসিজমের ধার ঘেঁষে যাবে তাঁর ধারালো রচনা, বিশ্লিষ্ট বিদ্বেষের অঘোরপন্থা থেকে যে তাঁকে ফিরে আসতে হবে, আবারও, রাবীন্দ্রিকতায়! সেমুহূর্তে 'সে'-র শালিশি মানতে হয় তাঁকে : 'বৈজ্ঞানিক রসিকতা ছেড়ে দিয়ে ছেলেমানুষি করো যতটা পারো।' অথচ তবু 'শিবা-শোধন সমিতি'র বিবরণীর পিছনেও 'শ্বেত মানুষের দায়িত্ব'-এর উপর একটি অনতিপ্রচ্ছন্ন বয়স্ক ব্যঙ্গ থেকে যায়, থাকে সেই শানিত ও শীতল বুদ্ধিজীবিতা, যা হ'লে হতে পারতো কোনো অল্ডস হক্সলির বা সার্ত্র-র উপজীব্য, কিন্তু যা কখনোই রবীন্দ্রনাথের শেষ শস্ত্রাবচারণ নয়। 'শিবুরাম' প্রসঙ্গে আরও মনে আসে বের্গসঁ-র কথা, যিনি কালোমানুষকে উপহাসের কারণ খুঁজতে গিয়ে 'অস্নাত' শব্দটির মূল ধ'রে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে, এক ছদ্মবেশের হাস্যকর কল্পনা আছে আমাদের মনে, যা আসলে ছদ্ম-ছদ্মবেশ মাত্র। তখনও 'সে' শলা শোনায় তাঁকে : 'বুদ্ধির মাত্রাটা একটু কমাতে যদি না পার তা হলে গল্প বলা ছেড়ে দাও।' পাতুগেঁজেলের গা-পরার প্রসঙ্গ তাই সাবলীলভাবে চ'লে আসে এই ছদ্মবেশের সূত্র ধ'রে, কিন্তু এখনো অবিকল রবীন্দ্রনাথের হ'তে পারে না ওই কৌতুক, পাতুর 'বঙ্কিমচন্দুরে নাকটি' থেকে শুরু ক'রে গাঁজার বরাদ্দ পর্যন্ত অনুষঙ্গগুলি কেবলই 'কমলাকান্তের জবানবন্দী'র দিকে তর্জনী বাড়িয়ে দেয়।

এবং এক চক্ষু হরিণের দিকে সরল ও শব্দভেদী বিপদ ছুটে আসে। 'গেছো-বাবা'-র কথাবার্তা তখন তাঁর সমকালীন প্রতীক-নাট্যের জনতা-অংশ থেকে উদ্ধৃত পংক্তিবাহুল্য বোধ হয় না, বরং এ যেন কোনো অবনীন্দ্রনাথের তূলি-ঝরা ছেলে-মানুষির সামান্য সঞ্চয় আনে। সেক্ষেত্রে 'সে'ও বুঝে-শুঝে নেয় : 'যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়।' আর এ কারণেই আবার শিল্পিকে নতুন নিরীক্ষায় নামতে হয়, দেখে নিতে হয় পরীক্ষা ক'রে : 'বিশ্বাস না করিয়েও মজা লাগাতে পারা যায় কিনা।' এবং এ পর্যায়ে 'আধুনিকতা

'বাস্তবতা' প্রভৃতি শব্দের প্রতিবেশে রাবীন্দ্রিক আবহমণ্ডলটির নবীনতম নির্ধারণের সুযোগ আসে ; শব্দে শব্দে বিকীর্ণ হ'য়ে যায় উজ্জ্বল কৌতুক, 'তাসের দেশ'-এর সংলাপ এখানে চয়ন ক'রে দেওয়া হয়েছে ব'লে ভ্রম হয় : 'অহো, দাদা, তোমার কথায় গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। / সাব্লাইম যাকে বলো।' কিংবা, 'ওটা বঙ্গভাষায়, যাকে হাল আমলের পণ্ডিতেরা বলেছে, 'অবদান।' কিন্তু তবুও টেবিলের উপর সব তাস ফেলা হয় না, একটি সংগোপন হাতের পাঁচ থেকে যায়, যা থেকে থেকে কমিক ঋজুতার কাঠামোটিকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে দেয়, তারপর কী এক অন্তর্গূঢ় কান্নায় কিরকম কম্পিত হ'য়ে ওঠে। অদ্ভুত কথার মধ্যে কারিগরি প্রয়োজন মনে হয় সে মুহূর্তে, কেননা, 'এলোমেলো অসম্ভব তো যে সে বানাতে পারে।' মোটা-শোটা গণেশের শুঁড় দিয়ে লম্বা চালের লেখা তখন আর পছন্দ হয় না, ফিরে ফিরে আসতে হয় শীর্ণ আঙুলের ছন্দের কাছে। 'নেহাত বাজারে-চলতি ছেলে-ভোলাবার সস্তা অত্যুক্তি'র উপর অপরিসীম অবজ্ঞা নিয়ে এবার উঠে দাঁড়ায় 'সে', কেননা, শিশুসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ জানেন ; 'বিশ্বাস করবার অতীত যা তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পার যদি, তাহলেই অদ্ভুত রসের গল্প জমে।'

৪.

সেই ভরসাতেই শক্ত ছাঁদে গল্প জা'ম ওঠে এবার, কাহিনীকে চর্ব্য-পদার্থ হিশেবে উপস্থাপনের চেষ্টা চলে; 'ছেলেবয়সের ভিতরে ভিতরে বড়ো বয়সের মিশল' একরকম রঙিন কারুণ্য এনে দেয় রচনাটিতে ; তখন দাদামশায় মনে করিয়ে দেন পুপেদিদিকে, 'বুদ্ধি তোমার অত্যন্ত পেকে উঠেছে, তাই মনে করছি আজ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব, একদিন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে'ঃ প্রয়োজনীয় ছিলো কাহিনীতে এই শৈশবরসের সন্ধান, তাঁকে নিজেকেও তাঁর মধ্যে জারিত হ'য়ে উঠতে হবে ব'লে জরুরি ছিলো। তাই যে খরগোশে ক'রে ঘুমন্ত পুপেদিদি উড়ে চ'লে যায়, তা হান্স আণ্ডেরসেনের উড়ন্ত ভালুক হওয়ার কোনো বাধা থাকে না, আর চাঁদের মধ্যেকার খরগোশ ইচ্ছে করলেই হ'তে পারে কিছু চিনে-শিশুর খেলনা ; কিন্তু তবু, 'ঘণ্টা-কর্ণদের পাড়া-র সন্ধান কোনো সুকুমার রায়ের গ্রন্থে নেই, যদি থাকে তো আছে [illegible]মাত্র রবীন্দ্রনাথের নির্মম নির্মাণেই ; এবং সেখান থেকেও পুপেদিদিকে সুকুমার [illegible]'রে আনতে রাজি না হ'তেই পারে, কেননা 'ওর একজামিনের পড়া আছে ; সুযোগটুকু পুরোমাত্রায় নিয়ে পুপেদিদিকে ইশ্‌কুলে ফিরিয়ে দিয়ে যায়

আরেক হিংস্র জাতের ঘণ্টাকর্ণ, ঢং ঢং ক'রে নটা দেয় বাজিয়ে। বস্তুত, হিংস্র এই দাঁতের স্পর্শ, বাঙালির শিশু-আখ্যানের সীমান্তে সে এক আশ্চর্য ড্রাকুলার আক্রমণ আর তাকে নম্রতমভাবে প্রতিহত করার সংরক্ত ভঙ্গিটিও তাই থেকে যায় তার আঙ্গিকে : 'এসে পড়তে তিরপুর্ণির ঘাটে, তখন ধামাভরা বিন্নি ধানের খই নিয়ে ডাক দিতুম গঙ্গামায়ের শুঁড়তোলা মকরকে, তোমাকে চড়িয়ে দিতেম তার পিঠে': ছড়া-র অসংলগ্ন ছিন্নাংশ দিয়ে বর্ণিল হাওয়ার একটি হাওদা তৈরি ক'রে দেওয়া গেলো হয়তো, কিন্তু তবু এ গা-ব্যথা মিলিয়ে গেল না তখনি তখনি, শুধু দোলা-লাগা আচ্ছন্নতার একরকম স্মৃতি একধরনের স্বপ্ন লেগে রইল চোখে : 'আমি যেমনি বলতুম, 'কিচ্ছু না', অমনি দেখতে দেখতে সব খেত মিলিয়ে—তুমি জেগে উঠতে তোমার বিছানায়।

গতিয়ের বিশ্বাস ছিলো চূড়ান্ত অবস্থায় কৌতুকহাস্য হলো এক অসম্ভবের বিধান, যা দ্বন্দ্বমুখর, যা স্বপ্নের স্বভাবগ্রস্ত। সেজন্য বরযাত্রিকের হাস্যময় পালার শুরুতে তাঁকে ব'লে নিতে হলো : স্বপ্ন দেখছি কি জেগে আছি বলতে পারি নে ; অথচ একই সঙ্গে, ঘরজোড়া অ-তো কাণ্ডকারখানার পর ট্রামের শব্দে জেগে উঠে তাঁকে আবিষ্কার করতে হলো, ঘরে ঢুকেছিলো 'দিদিমণির বেড়ালটা'। এই দ্বিমাত্রিকতার মাঝখানেও আছে আবার পাল্লারামের ভীম আবির্ভাব, এবং তার ফলে 'কলমের খোঁচায় খনিকটা কাগজ ছিঁড়ে গেলে' সন্দেহ থাকে না প্রশ্নটি মূলত সেই শিল্পসম্পর্কিতই, এবং এই কারণে শেষ পর্যন্ত পুপের কাছে শামাল দিতে হয় কবিকে : 'আর একটু হলেই বুদ্ধিমানের মতো বলতে যাচ্ছিলুম, আগাগোড়া স্বপ্ন। সব মাটি হত।' তাই স্বপ্ন বাঁচিয়ে-রাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁকে তুলে নিতে হয় তাঁর নিজের হাতেই, ছেঁড়া-ছাতাকে আরেকবার মিলিয়ে দিতে হয় রাজছত্রের সঙ্গে; রাজপুত্র সুকুমার সেই ভাঙা 'ছত্রপতি'তে আশোআর হ'য়ে যে 'কিছুই না'-র দেশে চ'লে যায় তা আসলে 'সব পেয়েছির দেশ'। এ জন্য ভাঙা-ছাতার হ'য়ে কথা ব'লেও পার পান না কবি, তাঁকে আরো আশ্‌কারা দিতে হয় সুকুমারের মর্মরিত পুষ্পিত শালগাছ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় : কারণ, কতো যে হওয়া এখানো বাকি আছে মানুষের, সে কী ক'রে জেনেছে মানুষ হওয়াটাই আর একমাত্র স্বপ্ন, শালগাছ হওয়াটা কিছু নয়! বস্তুত, 'ইতিহাসের সেই বেগনি পেরোনো আলোতেই মানুষের সত্যযুগের সৃষ্টি', যেখানে দৃশ্যস্পর্শের জ্ঞাতব্যকে ভেদ ক'রে স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে আরেক রকম 'হওয়ার জানা', সহৃদয়ের অন্তরে অনুরঞ্জিত হ'য়ে প্রবেশ করে সেই আপেক্ষিক অস্তিত্বের

জ্ঞান, যা পুপেকে 'পুপে' ব'লে তো জানেই, আবার 'বেরাল' ব'লেও মানে তাকেই।

ক্রমশ বোঝা যায়, যে সামাজিক জগৎ তাদের রূপহীনতার কুহেলিতে 'ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা আচ্ছন্ন ক'রে রাখে', তারই অনাবরণ উন্মোচনের জন্য 'সে'-র এমন অবতারণা; উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট হয় সুকুমারের প্রসঙ্গ শুরু হ'লে, দাদামশায় তখন তার ভিতর দিয়ে নিজের শৈশবে ফিরে যান, ফিরে আসেন তাঁর স্বাস্থ্যকর চিরহরিৎ অস্তিত্বে, সেই বৃক্ষ ইব প্রতীক্ষায়, যা নিজের কর্মকাণ্ডে জীর্ণতার বাৎসরিক দাগগুলি বড়ো নির্মমভাবে স্পষ্ট ক'রে তোলে, নিজে থেকেই, শুধু বয়েসের গাছ-পাথরের কোনো প্রকৃত হিশেব নেই জেনেই, বলে: 'জম্বুদ্বীপে বকিয়ে মারল আমাকে, আর পেরে উঠছি নে'। বা, 'বয়স হয়ে গেছে, কলমটাকে যেন বাতে ধরল'। কিংবা, 'বাংলা দেশে সরকারি সভাপতি হ'য়ে দাঁড়ালেম।' এরকম আত্ম-উদ্ঘাটন তখনই হাস্যজনক যখন অহং-এর একটি দিক অনাসক্ত, আর সেজন্যই মুখের অন্যপাশে নিজের স্বাভাবিক দুর্বলতাগুলি দেখতে ও নিরলংকারভাবে তুলে দেখাতে সক্ষম। এবং তাঁর হাস্যরসেরও মধ্যে আছে এক ধরনের অ্যাম্‌বিভালেন্স, দ্বিধাসমতা, যা তাঁকে শিল্প বা জীবনের কোনো মেরুতে একেবারে স্থির থাকতে দেবে না।

এবং এ পরিচিতি সাহিত্য-ব্যতিরিক্ত শিল্প-অতিক্রান্ত কোনো সত্তার নয়, বরং এই শোষক অহং এখন সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই প্রবেশ-প্রবণ, আর তাই একটি সামগ্রিক ভূদৃশ্য হয়ে ওঠার এমন আকাঙ্ক্ষা তাঁর: 'আমি হ'তে চেয়েছিলুম একখানা দৃশ্য অনেকখানি জায়গা জুড়ে': সৃষ্টিছাড়া এই বিস্তারের আশা, সুকুমারের 'কিছুই না-র দেশ' পেরিয়েও তাঁর শান্ত মেঘমালা, সুকুমারের শালগাছের অনেক উচ্চে তাঁর মর্মরিত লাবণ্যসাগর। শিল্পেরও প্রয়োজন তাঁর কাছে সেজন্যই, সে ওই অন্তহীন হরিতের সংবাদটি নিয়ে আসায় শরণি, 'আপনাকে ভুলে-গিয়ে আর-কিছু হ'য়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা'। শিল্পের এই রাজপথ ধ'রে যান তিনি, গল্পের আঙ্গিকটি তাঁকে পুপের সঙ্গে প্রিয় ও প্রত্যক্ষ সহিতত্ব এনে দেয়। কোলরিজের মতো তিনিও ভাব-প্রতিভাকে একটি 'জীবন্ত শক্তি' ব'লে ভাবেন এখানে, যা চূর্ণ করে, বিক্ষিপ্ত করে, শুধু পুনর্গ্রন্থন, কেবল ঐক্যবিন্যাস করতে হবে ব'লে। 'সে'র পৃথিবী তাই তাঁর মধ্যে প্রবেশ ক'রে এক দ্বিতীয় ভুবন হয়ে ওঠে এখন, মানুষ তার অনুভব, চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার সারাৎসারে পরিণত হয়। কেননা, আত্ম-সমালোচনার সঙ্গে স্বয়ং-সম্পূর্ণতাও এ সাহিত্যের লক্ষ, মুহূর্তের অভিব্যক্তি নয় তা, বরং

ধারাবাহিক জীবনভাষ্য, লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই। ফলে 'নাতনির ফরমাশে' তাঁর গল্পরচনার বিবৃতিটি সুকৌশলে নিয়ে যায় সারস্বত সমস্যার এক প্রতিধ্বনিময় মহালে, ভাবও রূপের দুটি আলাদা কক্ষ পার ক'রে নিয়ে যায়, যেখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে প্রাচ্যের সহৃদয়হৃদয়সংবাদ, পাশ্চাত্ত্যের কমিউনিকেট করার দায়িত্ব। কিন্তু ন'বছরের পুপের কাছে ঠিক কীভাবে গিয়ে পৌছোবে সত্তর বছরের দাদামশায়ের বাণী, পৌছোবে কোন্ অনতিনির্ধারিত উপায়ে? সুকুমারের শৈশবকে কী তা-ই তিনি প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করেন, পুপেকে মনে করিয়ে দেন তার ছেলেবয়েসের কথা, শুধু নিজেকে নিজের মধ্যে কেন্দ্রিত বিস্তার দিতে হবে ব'লে! এই রবীন্দ্রনাথ তো ক্রোচের ছোটো-আমির অন্তর্মুখ অভিজ্ঞতাকে কোনো নান্দনিক ব্যবহার দিতে চান না, অন্য দিকে সার্বজনীনতার অনুরোধে এলিয়ট-সুলভ আত্ম-অবলোপেও তাঁর ঘোরতর অনিচ্ছা, কারণ, কিটসের নৈরাত্ম্যসিদ্ধিও যে তাঁর জন্য নয়। আশ্চর্য এই, তবু ঘটক হিশেবে রবীন্দ্রনাথ সফল, সময়ের মুখপাত্র হিশেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ তাঁরই সামাজিক সত্তার একরকম উদ্ঘাটন।

'সে'-কে ঘিরে ঘুরে যায় এই সচেতন বিস্তারের বলয়; রীতিমতো ধরা দিতে চান না এখানে রবীন্দ্রনাথ, অথচ সমৃদ্ধ মানবতা ও গভীর সহানুভূতির যোগে তিনি এই কাঠামোজোড়া ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েন। ক্রমশ বোঝা শক্ত হ'য়ে ওঠে বস্তু এই বিশাল ব্যক্তিত্বের কোন্ অংশে কতোখানি অনুপ্রবিষ্ট, অথবা ব্যক্তির কিরকম সংক্রমণ এই তথ্যপুঞ্জে! বোঝা যায় না কেন তিনি এই চরিত্র-গুলির পিতামহ, জনকের চাইতে আরো কিছু বেশি! আর তা-ই শিল্পী রবীন্দ্রনাথের কাহিনীতে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের চরিত্র কতোদূর বিধৃত হ'তে পারে—এই সম্পূর্ণ অভারতীয় সমস্যাটিরও সমাধান করতে হয় তাঁকে, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে : যে অন্তর্গূঢ় স্বভাব তাঁর চারিত্রে, তা সেখানে কোনোকিছুই বিকীর্ণ প্রক্ষিপ্ত রাখে না, দৃশ্যমান অংশটি যদিও বিজ্ঞান গঠন করে, এবং জ্ঞানী অংশটি প্রয়াস পায় দর্শনের, তবু সামগ্রিক সত্তারই সৃষ্টিরূপে গণ্য হয় তাঁর সাহিত্য। তাঁর পরিচয় তাঁর ঐতিহাসিক প্রকাশকে ছাপিয়ে ওঠে সে মুহূর্তে, মঁতেনের রচনাংশ 'হিউম্যান কমেডি'র প্রতিমান হ'য়ে ওঠে তখন, পুপকে সেদিন বুঝিয়ে বলতে হয় : 'সত্যির চেয়ে অনেক বেশি—গল্প'।

'মেঘ-দেখা' সুকুমারও এই মানুষের আর্কেটাইপ যার মধ্যে আছে সৃষ্টি-কর্তৃত্বের সেই বৈশিষ্ট্য; সে নিজে মুক্ত, কোনো 'বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ'

নয় : অন্য সকলের থেকে অত্যন্ত ঔৎসুক্যে বিচ্ছিন্ন এই কবিসত্তার আমর্ম উন্মোচন আছে তাঁর 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' প্রবন্ধে : 'স্কুল থেকে এসেছি সাড়ে চার-টের সময়। এসেই দেখে'ছি আমাদের বাড়ির তেতলার উর্দ্ধে ঘননীল মেঘপুঞ্জ, সে যে কী আশ্চর্য দেখা। সে একদিনের কথা আমার আজও মনে আছে, কিন্তু সেদিনকার ইতিহাসে আমি ছাড়া কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মেঘ সেই চক্ষে দেখেনি'; 'এই ঘনাঢ্য একাকিত্বে সুকুমারকে-রবীন্দ্রনাথকে স্খলিত ক'রে দিয়ে 'সে'-র কাজ বোধহয় শেষ, কমেডির উষ্ণমণ্ডলে ঘন মেঘের স্নিগ্ধ সঞ্চার যেন তার শেষতম কৃত্য; কিন্তু, তবু, জল তো থাকে : জল অশ্রুর, যা উদ্ভিন্ন পুপের চোখে ঘনিয়ে আসে; জল অব্যয় পারানি যা নিয়ে জীবন সুকুমারকে শেষ অবধি সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে এক নিষ্ঠুর বিলেতে পৌছে দেয়, কাহিনীটিকে উত্তীর্ণ ক'রে দেয় ট্র্যাজেডির শীতকালীন আবহে। 'সাহিত্যের স্বরূপ' খুঁজতে গিয়ে একদিন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তিন-টুকরো জাপানি কবিতার মতো তলানি-তেলের শিশি, দাঁত-ভাঙা চিরুনি ও ক্ষয়ে-যাওয়া শাবানের যৌথ যাত্রা, খোয়ানো জগতের উদ্দেশে সে সে এক আধুনিক অনুসন্ধান; আর অনুসন্ধানের জন্যই হয়তো সাশ্রু স্মৃতিভার নিয়ে 'সুকুমারদের বাড়ির ছাদে' উঠে যান দাদামশায়, সুকুমারের আঁকা ছবি দেরাজে বন্ধ রাখতে চায় পুপেদিদি, তবু সেই 'ভাঙ্গা ছাতাটা' আর 'আতশবাজির আধপোড়া কাঠি' ভারমুক্ত হয়ে উড়ে যায়, তার অনির্বাণ বীণা আর ফুরোয় না; তাই কাহিনীর শেষে বিবর্ণ মুখ পুপেদিদি 'আস্তে আস্তে উঠে ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়'; এবং এ সমাপ্তিও আধুনিক রূপকথায় মনে হয় প্রত্যাশিত, নতুন বাড়ির সঙ্গে ভাঙা দরজাকে এরকম মেলানোতেও 'সে'-র সঙ্গতি।

মনিরুজ্জামান
ঢাকাই উপভাষা : আদিয়াবাদ প্রত্যঞ্চল

বাংলা ভাষার উপভাষা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার একান্তই অভাব রয়েছে। সুতরাং এর সূক্ষ্মভেদগুলি নিঃসংশয়ে নির্দেশ করা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি উপভাষা সম্পর্কে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ এবং বাংলাদেশের উপভাষা নিয়ে প্রধানভাবে মুহম্মদ আবদুল হাই-এর আলোচনাই মাত্র সুলভ। মুহম্মদ আবদুল হাই চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের উপভাষা নিয়ে বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত করে গেছেন। তবে সাধারণভাবে অন্যান্য অঞ্চলের ভাষা নিয়ে অল্পবিস্তর আরো কারো কারো আলোচনা এখানে ওখানে মুদ্রিত হয়েছে, তাদের মধ্যে দেশ বিভাগের আগে নোয়াখালির ভাষা নিয়ে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার, চট্টগ্রাম জেলার উপভাষা নিয়ে ডক্টর কৃষ্ণপদ গোস্বামী,, ডক্টর এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, বিক্রমপুরের ভাষা নিয়ে নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী, রংপুরের ভাষা নিয়ে যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী ও কবিশেখর প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির আলোচনা এবং দেশবিভাগের পর কয়েকটি উপভাষা নিয়ে প্রদীপবিকাশ চৌধুরী, অধ্যাপক ফয়েজ আহমদ চৌধুরী, আবদুস সাত্তার, শ্রীঅক্রুর চন্দ্র ধর, আলমগীর জলীল, মোহাম্মদ সোলায়মান, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী প্রভৃতির আলোচনা উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ মুজতবা আলী 'পঞ্চতন্ত্র'-র বাইরেও সিলেটের উপভাষার কয়েকটি মূল্যবান দিক উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন এবং তাঁর সে আলোচনা মুহম্মদ আবদুল হাই উচ্চপ্রশংসা করেন।[১]

বিদেশে জর্মনে হাইডেলবার্গ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নরিহিকো উচিদা চট্টগ্রামী উপভাষার ওপর গবেষণা করে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তাঁর গ্রন্থের নাম Descriptive Account of Chittagong form Bengali.। সম্প্রতি মনজুর মোরশেদ SCB ও নোয়াখালি উপভাষার প্রতিতুলনামূলক অভিসন্দর্ভ রচনা শেষে কানাডা থেকে দেশে ফিরে এসেছেন।

১৯৫৭ সালে (১৩৬৪ বাং) 'সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাসে এ পত্রিকার অবদান অসামান্য। তন্মধ্যে মুনীর চৌধুরীর 'দি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রব্লেম অব ইষ্ট পাকিস্তান' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি উত্তর ও পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলির স্থান নির্ণয় করতে প্রয়াস পান। এ ছাড়া ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ দৈনিক পয়গাম পত্রিকার 'ঢাকা শহর' বিশেষ সংখ্যায় ঢাকার স্থানীয় আদি-বাসীদের ভাষা নিয়ে একটি অনতিদীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করেন। মনসুর মুসা তাঁর গবেষণার ফল এখনও প্রকাশ করেন নি; তিনি চট্টগ্রামের উপভাষা নিয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই-এর অধীনে গবেষণা নিরত ছিলেন, পরে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী তাঁর গাইড হন। মনজুর মোরশেদের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

ঢাকার উপভাষা প্রসঙ্গে এ সত্য আরো দুঃখবহ। তবে আবদুল হাই পথ প্রদর্শক হিসেবে যে সামান্য আলোকপাত করে গেছেন, তার মূল্যও খুব কম নয়। সম্প্রতি ঢাকার উপভাষা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ অনিমেষ পাল ডক্টরেট লাভ করেছেন। তিনি প্রধানভাবে নারায়ণগঞ্জের দিকে প্রচলিত উপভাষারই বর্ণনামূলক আলোচনা প্রকাশ করেছেন।

ঢাকাই উপভাষার পরিচয় ও তার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই যে কথা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

> 'ঢাকাশহরে বাংলাভাষার প্রধানতঃ তিনটি উপভাষা প্রচলিত রয়েছে। ষ্টাণ্ডার্ড কলোকুয়েল বা চলিত কথ্যভাষা। ঢাকাই কুট্টিদের উপভাষা এবং ঢাকা এবং ঢাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রচলিত উপভাষা। ...ঢাকা জেলার এবং ঢাকাশহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের মুখে বাংলা ভাষার ধ্বনি, শব্দ ও পদ গঠনের মধ্যে কিছুটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। এ অঞ্চলের উপভাষাটি ধ্বনি ও গঠনগত দিক থেকে চলিত উপভাষার খুব নিকট-বর্তী হলেও এর পার্থক্যটুকুই একে একটি স্বতন্ত্র উপভাষার মর্যাদা দিয়েছে। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি ও মৈমনসিংহের নিতান্ত আঞ্চলিক রূপের খুঁটিনাটি বাদ দিলে বাংলার ঢাকাই উপভাষার রূপটিকে পূর্ববাংলার অন্যান্য উপভাষার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।'[২]

বলাবাহুল্য আবদুল হাই সাহেব ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন নি, ঢাকায় তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন মাত্র। এ প্রবন্ধে উদাহৃত বিষয় ও তথ্যসমূহ সবই তাঁর ক্ষেত্রজ সংগ্রহ নয়, বহু ক্ষেত্রে অন্যেরা (Informant) যেমন যেমন ভাবে তাঁকে বলেছেন, তার থেকেই তাঁকে বুঝে নিতে হয়েছে। হয়ত সময় পেলে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে আরো গভীরভাবে আলোচনা করতেন কখনো। সে সময় তাঁর হয়নি। সে বিশ্লেষণ তাঁর হাতে পাইনি—সে দায়িত্ব এখন পরবর্তী গবেষকগণের। সম্ভবতঃ এ বিষয়ে তিনি মুনীর চৌধুরী সাহেবের ওপরও কিছুটা নির্ভর করেছিলেন, কিন্তু মুনীর চৌধুরী উপভাষা বিষয়ে পরে আর কখনো উৎসাহ দেখান নি।

প্রায় সকল ভাষাতাত্ত্বিকই বাংলার উপভাষা নির্ণয় ক্ষেত্রে ঢাকা-কেন্দ্রিক যে উপভাষার উল্লেখ করেছেন তার ব্যস-বৃত্ত নিয়ে গোটা মধ্য-বাংলাই পড়ে যায়। অনেকে এ সীমা আরো বৃদ্ধি করে প্রাচ্য-উপভাষা (বঙ্গালী) হিসাবে প্রায় দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত নামিয়ে এনেছেন। এর হেতু স্পষ্ট। তাঁদের মতে এ সীমার অন্তর্গত ও লক্ষ্যযোগ্য বৈচিত্র্যাদিতে উপভাষা-অঞ্চল নির্দিষ্ট হয় না; শ্রীগোপাল হালদারের মতে 'ক্রোশে ক্রোশে ভাষা ভিন্ন হয়ে পড়ে, আবার জাতেজাতেও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিন্তু তা নিতান্তই ভঙ্গি বা প্রকারভেদ।'৩ শ্রীগোপাল হালদারের এমতও একটি প্রতিষ্ঠিত মত বটে : তথাপি বলতেই হয়, এখানে উপভাষার বৃদ্ধি বা ক্ষয়কে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। উপভাষা এ ভাবে কখনই পরিচয় গ্রহণ করে না। গোপাল হালদারবাবু যখন বলেন :

> "বাইরে থেকে দেখতে বা শুনতে যত বিভিন্ন শোনায় আসলে কিন্তু বাঙলার বিভিন্ন ডায়েলেক্ট বা প্রাদেশিক ভাষা পরস্পরের থেকে তত সুদূরও নয়। ···ধ্বনিগত পার্থক্যই তাঁদের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান কারণ, ব্যাকরণগত পার্থক্য তত বেশি নয়।"৪

তখন সাধারণ বঙ্গভাষা হিসাবে এ উক্তিতে কোনও দ্বিমত প্রকাশের কথাই উঠতে পারে না বটে, তৎসত্ত্বে আমার মনে হয়, উপভাষা বিচারে এটি একটি স্থূল দিক মাত্র, এর সূক্ষ্মতর দিক থাকাও সম্ভব। শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের অভিমত সত্য হলেও আমরা দেখি উপভাষাদি বিভিন্ন হয় এবং যে কারণটি তিনি উল্লেখ করেছেন সেই কারণেই হয়। ভাষায় 'ব্যাকরণগত পার্থক্য' এলে এবং সে ভাষা 'Intelligibleness' অতিক্রম করলে নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়ে পড়ে, তখন আর তার পূর্বতন বাঁধন এবং গঠনরূপ থাকে না—কেবল ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুর প্রভাব প্রভৃতির কারণে ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতি পৃথক হয়েই উপভাষা গঠিত হতে

পারে, ব্যাকরণগত অপরাপর পার্থক্য জরুরী নয়।

১. আদিয়াবাদ ও ভাষা অঞ্চল প্রভৃতি

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত রায়পুরা থানার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম এই আদিয়াবাদ। রায়পুরা থেকে নরসিংদি যতখানি পশ্চিমে ভৈরব তার চেয়ে সামান্য পূর্বে; আদিয়াবাদ রায়পুরা থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে এবং নরসিংদি থেকে ৬ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে ঢাকা থেকে ৪০ মাইল দূরে যে খানাবাড়ী ষ্টেশন, তার থেকে অর্দ্ধ মাইল দূরে উত্তর দিকে এই গ্রাম। পুরাতন মেঘনার চর পড়ে এ অঞ্চল গড়ে উঠেছিল অতীতে; নীলকর-সাহেবদের কুঠি আছে আড়িয়াল খাঁ নদীর পাড়ে, তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল কুঠির বাজার, সে বাজার আজো আছে। আড়িয়াল খাঁ নদী এই গ্রামকে প্রায় তিনদিকে বেড়ির মত ধরে রেখেছে, তাতে একসময় নৌকা বাইচ হতো। এ গ্রাম খুবই ঘনবসতিপূর্ণ। স্থানীয় অধিবাসীদের ব্যবসা কৃষি। একসময় তাঁতের ব্যবসা খুব প্রচলিত ছিল, পাকআমলের মাঝামাঝি দিকে বহু তাঁতী সর্বস্বান্ত হয়। সে সময় এ অঞ্চলের তাঁতীরা নরসিংদিতে তাদের বাজার করা বন্ধ করে আড়িয়ালখাঁর পূর্বপারে নতুন বাজার সৃষ্টি করে; সেই থেকে এদের নাম জয় পূব্যা।

আমি এ অঞ্চলটিকে রায়পুরা এবং ভৈরবের সাথেরই একটি অঞ্চল ভাবতে অভ্যস্ত, এবং আমার মত এখানে সকলেই। সম্ভবতঃ একটা 'পূব্যা' বোধের প্রতিক্রিয়া আছে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে। এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান-টিই এর জন্য দায়ী। আড়িয়াল খাঁ নদী ভৈরবের কাছে মেঘনা থেকে বেরিয়ে ধনুকের মত বেঁকে নরসিংদির কাছে আবার মেঘনার সাথে মিলে চারদিক থেকে এঁকে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত করে রেখেছে। রায়পুরার একদিকে ত্রিপুরা, অন্যদিকে ময়মনসিংহ। এবং আমার গৃহীত এলাকাটি হচ্ছে তার চতুর্দিক-সংযোগী মধ্যবর্তী একটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। এই অঞ্চল পা'র (পাহাড় বা লালমাটি অঞ্চল) এবং চরের মধ্যে, এবং নারায়ণগঞ্জের যে কোন চর এলাকা ও ঢাকা ও ভাওয়ালের পা'র (লালমাটি) অঞ্চল থেকে একেবারে ভিন্ন। ভৌগোলিক এই অবস্থান ও অবস্থানঘটিত মানসবৈচিত্র্যটি এখানে অবশ্যই লক্ষণীয়। ভাষাতাত্ত্বিক Pei বলেন, 'The natural tendency of language is centrifugal, not centripetal; and this means

that language tends to break up into local varieties whenever contacts are lost and political unity ceases to exert its pull towards the center।'৫ এ ক্ষেত্রে কার্যত হয়েছেও তাই। এখানে আসতে পারাটা সাধারণ চাষীদের জন্য একটা গর্বের বিষয় ছিল—নরসিংদিকেই তারা ঢাকা মনে করতো। 'Exchange of population' এখানে মাত্র সাম্প্রতিক ঘটনা।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা দরকার: নরসিংদি থেকে রেল ও সড়কপথে ঢাকা কাছে হলেও নারায়ণগঞ্জই ছিল মামলা মোকদ্দমা এবং প্রশাসনিক অন্যান্য কাজের কেন্দ্র; সাধারণ মানুষের সাথে ঢাকার যোগাযোগ ছিল অল্পই এবং নারায়ণগঞ্জও ছিল নিতান্ত কাজের স্থান,—নিত্য আনাগোনা এপার ওপারে অল্পই হয়েছে, এটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু নরসিংদি-বাবুরহাট-নারায়ণগঞ্জের মধ্যে সে সম্পর্ক ছিল। এটাই হচ্ছে ডঃ পাল বর্ণিত 'Exchange of Population' এর এলাকা।

এ ইতিহাস কতদিনের তার সঠিক তথ্য জানা সম্ভব নয়, তবে নরসিংদি নারায়ণগঞ্জের ব্যস্ততা, নগরমুখী ভাব বা (আধা)নাগরিকতা বা নাগরিক চেতনা পশ্চিম নারায়ণগঞ্জে যত বিস্তৃত, ব্যাপক, ক্রমপ্রসারী, পূর্বনারায়ণগঞ্জে তত হয়নি—যেদিন থেকে এমনি ভৌগোলিক সংস্থানে প্রশাসনিক এলাকা ভাগ হয়েছে সেদিন থেকেই। মূলতঃ নারায়ণগঞ্জে দুটো পৃথক অঞ্চলকেই একত্র করা হয়েছে; একটি অঞ্চল সম্পূর্ণতঃ কৃষি কেন্দ্রিক, অপরটি ব্যবসাকেন্দ্রিক অথবা অন্ততঃ বিখ্যাত দুটি গঞ্জের পশ্চাদভূমি। পূর্ব-নারায়ণগঞ্জের লোক কিছুটা অলস প্রকৃতিরও বটে সেজন্য আপনার মধ্যেই সীমিত। এবং মধ্যে আড়িলখাঁ—মেঘনাবর্তী অঞ্চলকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য, আদিয়াবাদ প্রথমে শিবপুর থানার অধীন ছিল বহুকাল। সেদিক থেকে তার ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের অন্তর্গত ও বহিঃসীমান্তিক রেখা রয়েছে, যদিও তা বৃটিশ শাসনকালের ঘটনা মাত্র।

কথায় বলে 'যোজনান্ত ভাষা'। পাশ্চাত্য মনীষীগণ তাই সূত্র স্থাপন করেছেন এই বলে 'Language is geographically localised : তবে আমরা জানি যে, ভৌগোলিক ব্যবধানটুকুই একমাত্র হেতু নয়, ভাষা উৎপত্তিমূলে সামাজিক ও ব্যবসায়িক বৃত্তিনির্ভর মানসিকতা ও সুযোগ-সুবিধাও ক্রিয়াশীল থাকে; আবার বন-নদী-পাহাড় প্রভৃতির অবস্থানও কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও ব্যবধানই সৃষ্টি

করে না। সেজন্য একই শহরে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বা উপভাষা থাকে, অথচ দেশগত ভাবে হয়ত সেরূপ ভাষা-ব্যবধান খুজে পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের মহাশয়ের উক্তিটি এ দৃষ্টিকোণে বিচার্য। তিনি বলেন 'ক্রোশে ক্রোশে ভাষা ভিন্ন হয়' কিন্তু তা 'নিতান্তই ভঙ্গী'। ভাষা ও ভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য টেনে তিনি উপভাষার অন্তর্পার্থক্যগুলিকে আরো নৈকট্যে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু ভাষা তার স্থানিক বৈশিষ্ট্যকেই রূপদান করে বা গ্রহণ করে এবং এই বৈশিষ্ট্যেই পারস্পরিক পার্থক্য সূচিত হয় :

> 'The geographical difference can be recorded, and when enough of them accumulate, we are justified in speaking of seperate dialects.'৬

সুতরাং আমেরিকায় ইংরেজী ভাষায় যে পার্থক্য এসেছে, তা অস্বীকার্য নয় ; এবং এই ভাষা মূল ভাষারই স্বতন্ত্র উপভাষা মাত্র। বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ লক্ষণ পাই ; পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বাংলা-ভাষার পার্থক্য এসেছে অনেক আগেই : পশ্চিমবঙ্গ তার নিজস্ব উপভাষাগুলিসহ সমৃদ্ধ, আবার তেমনি বাংলা দেশেও তার প্রতি অঞ্চলেই একটি উপভাষা আছে—এই উপভাষাগুলি কেবল যে ভঙ্গীপ্রধান তাই নয়, মৌলিক উপাদানেও পৃথক। চট্টগ্রামের কথা ফেনী নদীর ওপারেই দুর্বোধ্য, রংপুরের (অংপুর') ভাষা ঢাকায় হাস্যোদ্রেক ঘটায়।

এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা গেলেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে, স্বরগত পার্থক্যে, ধ্বনিতে শব্দে-বাক্যে বিশিষ্টার্থক প্রয়োগে এই সত্য প্রতিপদে উপলব্ধি করা যায়। এই পার্থক্যেই প্রতিটি উপভাষা যার যার সীমান্ত রক্ষায় ব্যস্ত, যদিও তার সাধারণ শব্দ রেখ মণ্ডল ভিন্ন রেখেও এই পার্থক্যের সাধারণ গড় নির্ণয় সম্ভব। এক উপভাষা থেকে অন্য উপভাষার দূরত্ব গভীরও নয়, ব্যাপকও নয়, তবু, বৈচিত্র্যগত সহজ পৃথকতায় এবং আঞ্চলিক উচ্চারণধর্ম শব্দব্যবহারকৌশল, শব্দাবলীর গ্রহণবর্জন ও পদক্রম সংরচনায় বিপুল প্রভেদ ঘটে। ইতালীয় উপভাষাগুলিতে যা স্বরিত পার্থক্য মাত্র, চীনে উপভাষাগুলিতে আবার তাই ব্যাকরণগত স্থায়ী পার্থক্য ঘটিয়েছে; সে পার্থক্য দুটি পৃথক ভাষার পার্থক্যের সামিল। সুতরাং উপভাষার গুরুত্ব দুভাবেই বিবেচ্য : তার স্থূলতর পার্থক্যে এবং সূক্ষ্মতর পার্থক্য থাকলে তাতেও। প্রত্যেক মানুষেরই ভাষা আলাদা এবং শুধু তাই নয়, এক মানুষের ভাষাতেও হরেক বৈচিত্র্য থাকে, কাল ব্যবধানেও এ বৈচিত্র্য পরিমাপ্য মনে হয়।

ভাষাগত এই পার্থক্যটা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রযোজ্য, গোষ্ঠী বিশেষের ক্ষেত্রেই সেভাবেই প্রযোজ্য। ভাষার রীতি হচ্ছে 'বৈচিত্র্যেই বন্ধন'; পার্থক্য থাকলেও তা বোধ্যমানতার সীমা অতিক্রম করে না, এবং অনেক সময় পার্থক্যগুলি বিশেষজ্ঞদ্বারা জরীপকৃত হলেই তবে বোধগম্য হয়. অন্যথায় তাকে এড়িয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া আগেই বলেছি সূক্ষ্ম ও স্থূল পার্থক্যেই তা বিবেচ্য। এ প্রসঙ্গে আমি আরো যোগ করতে চাই যে, ভাষার পার্থক্যটা স্পষ্ট রূপ নেবার সময় তা মানসিক ভাবেও বিভক্ত, বা বিযুক্ত হয়ে পড়ে; বিভাজনটি অনেক ক্ষেত্রেই মনোবিকলনজাত। সুতরাং ভাষা ভৌগোলিক সীমা ('Geographically localised') গ্রহণ করুক আর নাই করুক, মানসিক সীমাও গ্রহণ করে এবং তার মাঝেই তার কেন্দ্রাভিগ এবং কেন্দ্রাতিগ কার্যকারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উপভাষা বিচারে আমি এই তিনটি সর্ত মানারই পক্ষপাতী।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা পরিষ্কার হওয়া ভালো। উপভাষার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণটাই বড় নয়, উপভাষার যাথার্থও আবিষ্কার হওয়া চাই। 'উপভাষা' শব্দটি পূর্বে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, উপরোক্ত কারণে তার অর্থবিস্তৃতি বাঞ্ছনীয়। পশ্চিমে অবশ্য এখন আর কেবল আঞ্চলিক ভাষা অর্থেই এর প্রয়োগ সীমিত থাকছে না। এই কারণে যখন বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ইংরেজী ও আমেরিকার ইংরেজীকে একই ভাষার দুটি পৃথক 'উপভাষা' বলে চিহ্নিত করা হয়, তখন স্বভাবতই স্ব স্ব উপভাষার অধীন বিপুল আঞ্চলিক উপভাষারাশিকে লক্ষ রেখেই সেকথা বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য নিরূপণ অসম্ভব প্রায়। উপভাষার এই দ্বিমাত্রিক ধর্মকে লক্ষ্য রেখে W. J. Entwistle বলেন :[৭]

'a dialect is wont to show a geographical centre of radiation and to be associated with some social organism; but a dialect is, at the same time, in evident dependence on some greater linguistic centre.'

ভাষাভাষীদের যেমন নানাভাবে ছোটখাট দলে বিভক্ত করা যায়, উপভাষাকেও তেমনি পারা যায় এবং করতে হয়। এতে কোন উপভাষাকে অন্যটি অপেক্ষা ছোট ভাষার বা একটি অন্যটির অন্তর্গত সে রকম কিছু ভাবার ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নেই। এই দিক থেকে ভাষার যে কোন ভাগ বা উপবিভাগকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রশ্ন ব্যতিরিকে, বলা যেতে পারে 'উপভাষা'। ভাষাতাত্ত্বিক Brook এর মতে :

I have preferred to regard a dialect as any subdivition of a language that can be associated with a particular group of speakers smaller than the group who share the common language ৮

এই অর্থে আদিয়াবাদ অঞ্চলে ঢাকাই ভাষার এবং আরো স্পষ্টতঃ নারায়ণগঞ্জের ভাষার যে উপবিভাগটি লক্ষ্য করেছি, তার স্বতন্ত্র মর্যাদা সম্পর্কে আমাকে বিশেষ ভাবে দেখতে হয়েছে এবং উপভাষার পার্থক্য ও তার সংজ্ঞা[১] প্রসঙ্গে আমি সে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করেছি। আমার সিদ্ধান্ত এই রূপ :

ক. আদিয়াবাদ একটি পৃথক উপভাষা অঞ্চলের কেন্দ্র; আড়িয়ল খাঁকে কেন্দ্র করে তার পূর্বপাড়ে এই উপভাষার প্রসার—আড়িয়লখাঁর একটি বিস্তৃত অঞ্চল আদিয়াবাদের অধীন, ভাষাতাত্ত্বিক পরিমণ্ডল আগে বর্ণিত হয়েছে;

খ. আদিয়াবাদ রায়পুর থানার অধীন (এক সময় ষিবপুর থানার) হয়েও স্বাতন্ত্রের অধিকারী অধিকন্তু রায়পুরার ভাষা ভিন্ন কিছু বোঝায় যা স্থানীয় ভাবেও ভিন্নার্থক ও বিচিত্র। রায়পুরার চরভাষা এবং টানভাষা এক নয়, রায়পুরার স্থানীয় ভাষায়ও মিশ্রণ আছে, তার মধ্যে রায়পুরার এই দক্ষিণপশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের দ্বৈত ধারাই রক্ষিত। রায়পুরার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কুলিয়ার চর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার টান দেখা যায়।

গ. আদিয়াবাদের ভাষা বলতে রায়পুরার সমগ্র দঃপশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানের ভাষা বোঝাতে চাই ; এ ক্ষেত্রে রায়পুরার ২৪টি ইউনিয়নের ১০টি ইউনিয়নের মধ্যে এ ভাষা স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যায়। বাকী ১৪টি ইউনিয়ন কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও মৈমনসিংহের সীমান্তবর্তী হওয়ায়, সেগুলি ত্রিধাবিভক্ত। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ভাওয়ালের ভাষাও আছে সুতরাং আদিয়াবাদ অঞ্চলকে স্বচ্ছন্দে একটি স্বতন্ত্র এলাকা হিসাবে ভাবলে সত্যের অপলাপ হবে মনে করি না।

ঘ আড়িয়ল খাঁর পশ্চিম পাড়ের ভাষার সাথেও এর মিল নেই। এমনকি আড়িয়ল খাঁর পশ্চিমে আদিয়াবাদ ইউনিয়নের যে কয়টি গ্রাম আছে, তার ভাষাও আদিয়াবাদ থেকে ভিন্ন। পশ্চিম পারে দুই ধরণের ভাষা দেখা যায় : নারায়ণগঞ্জের দিকে ডেমরা পর্যন্ত (নরসিংদি—বাবুর হাট—মাধবদী—বোলতা--পাঁচরোহী—তারা-ব) একটি ধারা ; আর একটি ধারা আছে সোজা উত্তরে উত্তরপশ্চিমে

এবং নরসিংদির উত্তরে বাঘ্যার চর, গাগৈটগ্যা, পুইটগ্যা (পুঁটিয়া), খইরা, মজলিসপুর, শিবপুর এবং আরো পশ্চিমে চরসিন্দুর, মনোহরদি হয়ে শীতলক্ষ্যা পর্যন্ত এর বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায় ; আদিয়াবাদ অঞ্চলে এর কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। সেদিক থেকেও এ উপভাষার অস্তিত্বে রক্ষণশীলতার ধরণটি উপলব্ধি করা সহজ হয়।

ঙ সামগ্রিক ভাবে নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় তিনটি ভাষাঅঞ্চল বর্তমান :

১। নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ থেকে ডেমরায় ওপার ফতুল্লা অবধি,—এ ভাষার সাধারণ ধর্ম স্থানীয় ভাবে বললে, তার 'শহুরে ভাবে' রক্ষীত ;

২। লক্ষ্যা নদীর এপার থেকে আড়াই হাজার রূপগঞ্জ ও নরসিংদির ভাষা—এ অঞ্চলে চরভাগের ভাষা ত্রিপুরা ঘেঁষা, অন্যদিকে কালিগঞ্জ ও সামান্য ভাবে ভাওয়ালী ভাষায় টান আছে, যদিও শব্দাবলীতে এই ভাবটা সামান্য পাওয়া যায় ; এ ভাষা প্রধানতঃ স্বরফলিত ও স্বরবর্ধিত।

৩। রায়পুরা অঞ্চল—এ অঞ্চলের প্রধান চারটি ভাগ নিম্নরূপ ঃ

অ) চর ঃ ছাইদাবাদ, পাওড়াতুলী, শ্রীনগর, বাঁশগাড়ী, চরমধ্যা। (এ অঞ্চলের ভাষায় কুমিল্লা, নবীনগর ও মুরাদপুরের টান আছে ; অন্যত্র তা' বিরল)।

আ) টান ঃ এর দুই ভাগ, ভাওয়ালের গড়অঞ্চল বা লালমাটির পাহাড় অঞ্চল এবং ময়মনসিংহ সীমান্তে কুলিয়ার চর প্রভৃতি স্থান ঘেঁষা অঞ্চল। প্রথম ভাগে মর্ধাল, বেলা-ব, আমলা-ব এবং উত্তর পলাশতলা ইউনিয়ন এবং দ্বিতীয় ভাগে ছ'ল্যাবাদ গোকুলনগর, নারায়নপুর, রাধানগর, সারার চর। স্পষ্ট কারণেই উভয় বিভাগে পৃথক উপভাষা নির্দশন মেলে।

ই) দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল ঃ বেল্যার চর, বাঁশগাড়ী, হাইরমারা, পূর্বপলাশতলা ও মেথিকান্দা। এ সব ইউনিয়নের অধীন গ্রামে স্বচ্ছল ও শিক্ষিত মানুষ অধিক ; এদের ভাষায়ও টানে পার্থক্য আছে, তবে অপরাপর নিদর্শনে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সাথে যুক্ত করারই আমি পক্ষপাতী।

ঈ) দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল ঃ আদিয়াবাদ, মীর্জানগর, আমীরগঞ্জ, রহিমাবাদ, ডেউকার চর, করিমগঞ্জ ইউনিয়ন এবং পলাশতলার পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশের গ্রামসমূহ। [১৯৬১ সালের লোকগণনানুযায়ী কেবল আদিয়াবাদ গ্রামের লোক সংখ্যাই ১৫,০০০।]

উপরে আমি ঢাকার উপভাষাগত যে বিভাগটি পরিকল্পনা করেছি, তারই প্রেক্ষিতে ঢাকার অপর একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের উপভাষার পরিচয় দেওয়াই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। উপরের পটভূমিকাটি সেজন্যও অত্যাবশ্যক। আমি উপরে এ উপভাষাটিকেই আদিয়াবাদের ভাষা বলতে চেয়েছি। বলাবাহুল্য রায়পুরার সমগ্র অঞ্চলের ভাষাও আমি নিইনি, তৎসত্ত্বে আমি একে নারায়ণগঞ্জের উপভাষাগুলি থেকে পৃথক বলতে চেয়েছি। আমার উপরের আলোচনা থেকে আরো বোঝা যাবে যে রায়পুরার অপর অঞ্চলগুলির

ভাষা অপেক্ষা 'আদিয়াবাদের' ভাষা বহুলাংশে 'ভব্য' অর্থাৎ, বিছুটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণে সচেষ্ট, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা প্রভাবাধীন নয়। উৎসাহী পাঠক এই ভাষার সাহিত্যিক রূপ আলাউদ্দিন আলআজাদের 'ধানকন্যা' 'ক্ষুধা ও আশা' প্রভৃতি উপন্যাসে, শামসুর রহমানের বিচ্ছিন্ন কিছু কবিতার দেশজ আসক্তিতে এবং এই লেখকের 'পুরুষপরম্পরা' নামক গল্পগ্রন্থে লক্ষ্য করতে পারেন।

আদিয়াবাদ অঞ্চলের ভাষার সাথে রায়পুরার বিভিন্ন অঞ্চলের এবং অন্য সীমান্তবর্তী নরসিংদি ও ভাওয়ালের ভাষার প্রভেদ শুধু ধ্বনিগত বা বাক্যগত এবং শব্দগত নয় উচ্চারণ ভঙ্গী ও কণ্ঠকর্মের মধ্যেও! এই পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম, এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিচার্য। উদাহরণ সকল ক্ষেত্রে যথার্থ পরিচয় বহন করে না, অন্তর্গত পার্থক্যসূচক সমস্যার নিরূপণে সে সব উদাহরণ কোন সাহায্যে আসে না। যেমন ⱡ/খাইছো/শব্দটি নরসিংদিতে যিনি শুনেছেন, আদিয়াবাদ অঞ্চলে সে টানের অভাব প্রথমেই তার লক্ষ্য গোচর হবে। শব্দটি শুদ্ধ ভাষায়ও আছে, কিন্তু বরিশালের ⱡ]xaisə̃/কোনও ভাবেই একজন শুদ্ধভাষী যেমন গ্রহণ করতে পারেন না, এও তেমনি। এই ধরণের পার্থক্যসূচ প্রকৃতি নানাভাবে বিচার্য :

শব্দগতগতভাবে ঃ যেমন,

আমার (বা আমাগো) > আঙ্গ =[নর/কালি অঞ্চল]
তুমাগার (তোমাগো) > তোঙ্গ =[ঐ]
আই, কৈত্তে > কত্থেন গে =[ভাওয়াল]
অই মন্তু, মন্তুয়ো > মমতাজ গো =[ঐ]
আইয়ো > আহ =[ঐ]

আবার এই পার্থক্য রায়পুরার ভেতরেও দেখা যায় ঃ

ক. [চর] ঃ 'আমাগো'

খ. [টান] ঃ কি করতাম তে ; খদা (xoda'; হাইছি (খাইছি)

আদিয়াবাদ অঞ্চলে [আমাগো] শব্দটি দুর্লভ, বলে/'আমারার'/, টানের ভাষার মত টেনে ['তে'] এই অতিরিক্ত ধ্বনি যুক্ত করে না ; 'খুদা' এবং 'খাইছি' শব্দে ধ্বনি বিকৃতি হয়নি। রায়পুরায় কোথাও কোথাও/আম্‌গো/আছে। 'খোদা' শব্দে কথচিৎ/ হদা/উচ্চারণও মেলে ঃ 'হদায় ঠ্যাহাইছে'। এখানে শুদ্ধ/হ/ধ্বনির উচ্চারণ স্পষ্টভাবেই লভ্য।

রায়পুরার উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে ও 'পা'ড়' অঞ্চলে সামাজিক সৌজন্য প্রকাশের ধরণে অপিনিহিত প্রবণতা স্বরসন্ধি ঃ

ক 'আছে' অর্থে = অ'াছুইন ; খাওইন (= খেয়ে নিন, খান)

খ কোন সময়া:ছুইন.

গ. খদায় রাহ্‌লে বালই আ'সি।

বলাবাহুল্য [ছ] ধ্বনির উষ্মাভবনতার সাথে অন্যান্য পরিবর্তনও তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বস্বর বিবৃত ও ঈষৎ দীর্ঘ এবং পরবর্তী অক্ষরে Haitus ঘটিত ফাঁকপূরণ অর্থাৎ /ই/আগম এবং এই মধ্যস্বরাগমে দ্বৈতস্বরের সৃষ্টি :

আদিয়াবাদে অধিকতর সরলভাবেই বলা হবে :

ক. '—আসেন্'/'খাইন'

খ. 'কুমুবালা আইছেন'।

এই দুই উদাহরণে প্রভেদ স্পষ্ট ; দ্বৈতস্বর এখানে প্রলম্বিত (Long Vowel) ধ্বনিরূপ নিয়েছে (ক)। অপর উদাহরণে (খ) বাক্যের গঠনরূপে বা কাঠামোতে ব্যাকরণিক প্রত্যক্ষতা তথা পরিবর্তন ঘটেছে ; এবং

গ. 'খুদায় বালুবালায়অই রার্ক'ছে'।

এই তৃতীয় বাক্যে অনুকারক শব্দান্তে E স্বর যৌগিকতা কেবল 'জোর' দেওয়ার জন্যেই নয় রীতিগতও এবং বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ হিসাবেই তাই (ই)এর উচ্চারণ বাহুল্য এবং সেক্ষেত্রে/অ/-আগম। ক্রিয়ার/খ/ > /ক/ধ্বনির অল্পপ্রাণিত উচ্চারণ সন্ধি বা সামগ্রিকতা ঘটিত।

আদিয়াবাদে শুদ্ধ বা তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ আছে প্রচলিত ছড়ায় :

ধানের মধ্যে থামা
ইষ্টির মধ্যে মামা।

অনেক শব্দের গ্রাম্য প্রয়োগ নেই কিন্তু ছেলেমেয়েদের খেলাধূলায় পাওয়া যায়:

ডুকু ডুকু কানাইয়া
নৌকা ছিম বানাইয়া
যদি নৌকা উরে
বিয়া দিস দূরে।

['নৌকা'] এবং ['দিস্'] কথাটি অপ্রচলিত ; বলা হয়/দিমু/এবং নাউ/।

মন্ত্রপাঠে শব্দ বিকৃতি পাই, কিন্তু ব্যবহারে ভিন্ন :

অন কালে দল কালে
কালে উরদুর তারা
আশমানেতে পরদীপ জলে

উপুরে বোমরা, মাগো
না এলাহা ইলাহা।

[উরদুর] এবং [উপুরে] দুটো শব্দই এখানে/উফ্‌রে [-র]/এবং [বোমরা] (ভোমরা) শব্দে/ব/ধ্বনিটিতে সিকিসংবৃত অর্ধঅনুনাসিক স্বরের প্রতিবেষ্টন লক্ষণীয়।

অক্করে, বেইন্যালা, মুরুণ্‌ডী, দে-হা-র´ (dεharə), হতু, মুগা, চৈক,থোয়াস্‌, তু'য়াল এবং ক্রিয়াপদসহ ফরগ্‌যা, হেফিয়া, হুইওা প্রভৃতি শব্দ আদিয়াবাদের স্থানীয় লোকের ব্যবহারে পাওয়া যায়। পরে আরো বিস্তৃত শব্দ তালিকা উদ্ধৃত হবে।

'হতু'-র /h/ উচ্চারণে—[f] দূরানুরণিত হয়; তেমনি 'ফয়গ্‌ যা'-র/f/→[h] ধ্বনির অপশ্রুতিজনিত ক্ষতিপূরণাত্মক ধৃষ্টতা আনে।

সাধারণ কথ্য ভাষার সাথে এর শব্দগত ও ধ্বনিগত আর্থক্য এভাবে দেখানো যেতে পারে :

SCB	→Ad	→Naray
বিকেল	/বাইট্টালা/	/বৈহাল/ : /boixal/
চাকনি.	/ডাইনি/	: /daxni/
খোঁপা	/খুফা : /xufa/	: /khofa/
টেঁকুর	:/ Deeyx/	/ডেখুর/
ঠাকুর	/ঠাহুর/	: / Thaxur/

নারায়ণগঞ্জ ভাগে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে লেখা শব্দগুলি ডঃ অনিমেষ পালের বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। শব্দ ব্যবহারজনিত পার্থক্যটি ব্যাপক জরীপ ভিত্তিক কাজ এবং তা এখানে অসম্ভব; তার প্রয়োজনও বোধহয় খুব বেশী নয়। মুনীর চৌধুরী বাংলার প্রধান উপভাষাগুলি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন,

> 'It has not been possible to make a systemetic investigation of the lexical difference among the dialects, but it is the author's feeling that this will not prove as important as morphological variation.'৮

আমাদের গৃহীত ভাষাতেও তার কমবেশী প্রতিফলন পাই; রূপতাত্ত্বিক বা শব্দ মূলগত প্রভেদ কোথাও কোথাও খুবই বিস্তৃত।

'অপিনিহিতি' (বাংলাদেশের সাধারণ ভাষাগুণ) ও স্বরগ্রাসিক মাত্রা (ধ্বনির বিচিত্র প্রসারণ তথা ধ্বনিবাস্তবতা) বাংলাদেশের উপভাষাগুলিকে সাধারণ বৈচিত্র্যের

মূলে সংস্থাপন করেছে। এ দুটি প্রশ্নের সাথে আঞ্চলিক ধ্বনিরূপ নির্ধারণের সম্পর্ক আছে। প্রথমে স্বরভেদের উল্লেখ করা যাক।

ডঃ অনিমেষ পাল যে Rising Tone তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারও মূলকথা স্বরিক বৈচিত্রি। তাঁর মতে—

"It is little known that in some Eastern Bengali Dialects, tone is a very significant element of speech."[৯]

তিনি এই তত্ত্বে ধ্বনিকে স্বরগুণ ও ক্ষতিপূরক ধর্মে বিচার করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত যে, এই স্বরিক বৈচিত্রি অর্থমানে তাৎপর্য সৃষ্টি করে। স্বর উদাত্ত হয়ে সে অর্থ রূপান্তর আনে, তা শব্দের রূপান্তরও ঘটায় এটা তার 'compensatory nature' এর অন্তর্ভুক্ত। শব্দে অল্পপ্রাণতা মহাপ্রাণতা ভিত্তিক ধ্বনি ঘোষ ও অঘোষ পর্যায়ে স্বরধ্বনির অবস্থান সাপেক্ষে বৈচিত্র্য দান করে—এবং স্বর সঙ্গতি ও স্বর সাম্যতায় শব্দের অন্তপরিবর্তন দেখা দেয়। অঞ্চলভিত্তিতে আলোচনাকালে আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, এক এক অঞ্চল এক এক পরিবর্তনে অভ্যস্ত; এই পরিবর্তন ধ্বনি উচ্চারণের প্রক্রিয়ায় প্রভেদাত্মক সে কথা ওপরে বলা হয়েছে। ধ্বনির বিভিন্ন অবস্থান জাত ধর্মে, ও স্বরাগমে তা প্রসৃত।

এই ধ্বনি বাস্তবতায় উপভাষার সাধারণ বৈচিত্র্য সম্ভব হয়েছে। এ ভাবে স্বরগ্রামিক প্রয়োগে ও স্বর বিপর্যস্ত শব্দের ধ্বনি সংরক্ষণমূলক প্রকৃতিতেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং তার প্রকারভেদ সূচক তত্ত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে। নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন উপঅঞ্চলে এই দুই রীতি যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়। আদিয়াবাদ অঞ্চলে এটি যে ভাবে উপলব্ধি করেছি, নিম্নের বর্ণনায় তার আভাস পাওয়া যেতে পারে। লক্ষ্যাপারের ভাষার টান ('হ্যারার/হেফিলের কতার টান আলাদা') এখানে অনুপস্থিত, যদিচ উভয় অঞ্চলে আগুণ fire, আ-গুন মাস, বাত্তি lamp. বাত্তি ripe প্রভৃতি প্রয়োগে সমতা লক্ষ্য করা যায়। 'টান' এনেই batti, bavtti প্রভৃতি শব্দে উচ্চারণ ভিন্নতা ও ধ্বনি প্রতিবেশ রচনায় পার্থক্য সৃষ্টি হয়,[১০] অর্থ প্রভেদ হয় না। তবে ডঃ পাল /bavtti/ পাকা ripe অর্থে প্রয়োগ করেছেন, এখানে তা 'বাড়' অর্থে প্রযুক্ত, দ্বিতীয়ত /আ/ ধ্বনির স্বরোদাত্ততা [v] ছাড়াও অন্ত/ই/ : (-i)-তে সামান্য পার্থক্য মানতে হয়। এই উভয় ধ্বনির পারস্পরিক অবস্থান উভয়ের গুণগত পার্থক্য রচনায় সহায়তা করেছে এই উদাত্ত বা বৃদ্ধিস্বরকে Rising Tone বলা হয়েছে। এতে প্রসৃত ধ্বনির নির্দিষ্ট ধ্বনিগুণ নির্ণায়ক সামগ্রিক

বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় এবং স্বরের গ্রামিক পরিবর্তন ও অনবস্থিত স্বর কল্প ধ্বনির তথা বিকল্প ধ্বনির অবস্থা-টুকুও নিঃসংশয়ে জানা সম্ভব হয়। সুতরাং অর্থ-প্রভেদাত্মক অপর পার্থক্যে এইরূপ প্রস্থত ধ্বনির গ্রামিক মান নির্ণয়যোগ্য এবং সেটুকু আঞ্চলিক অবদান মাত্র :

যেমন— AD—D | N—D

AD—D	N—D
৩ চারা (চারিয়ে দে)	১ গাছের চারা—২. কলসিকানা
৩. বাত্তি (মাছ মারা বা আলোয় মাছ মারা)	১. আলো — ২. পাকা
২. হ রি ('ওহ্ হো')	১ বিষ্ণু — ২. শাশুড়ি

এই উদাহরণ সমূহে শেষ মুক্তধ্বনি পূর্বধ্বনিকে ও অন্তস্বরিক মুক্তধ্বনি শেষ ধ্বনিকে প্রভাবিত করে থাকবে।

এছাড়া অনুমান হয় যে 'বাত্তি' (৩) শব্দে (ও) ধ্বনিটিতে দ্বিত্বতা অপেক্ষা দৈর্ঘ্যগুণ (long consonant) বর্তমান ; এ ভাবে এ অঞ্চলে 'পাতলা' শব্দেরও দুই উচ্চারণ বৈচিত্রে ব্যঞ্জনাত্মক সামান্য প্রভেদ (surd) পাওয়া যায় ঃ

১ পাতলা = [পাৎলা]
২, পাতলা = [ফাতলা]

অপিনিহিত প্রবণতা 'Eastern Dialect' গুলির প্রায় সবগুলিতেই বিদ্যমান। প্রধান উপবিভাগগুলিতে যেমন এই একই রীতির বিদ্যমানতা স্বাতন্ত্র্য-মণ্ডিত, ঢাকাই ভাষাগুলির উপবিভাগগুলির মধ্যেও তেমনি অপিনিহিতি শব্দের ব্যবহারিক পার্থক্য আছে। আদিয়াবাদের অপিনিহিতি শব্দগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য তার স্পষ্ট স্বরপূর্বিতা। অপিনিহিত সকল শব্দে আগমস্বর দ্বৈতস্বর বৈচিত্র্যে উচ্চারিত। পার্থক্যটুকুও কেবল শব্দ গঠনজাত বা শব্দজ ধ্বনি পরিবেশজাত এবং দ্বৈতস্বরের প্রভাবে টানগত মিল সত্ত্বে ব্যবহারিক ভেদ আছে বলে ঃ

বি আইদ্দাবাজ, হাউদ্‌মারা = (আদিয়াবাদ, সাধুমারা)
বিণ. ফইখ্‌রা, বাইট্টা, পইত্যা = (ফকির, বেঁটে, পোহানিয়া বা শিথানের বা পতিত)
অস-ক্রি. আইট্টা, রাইনদা, = (হেঁটে, রেঁধে)
বিবিধ. পইতা, নেইগ্যা; বইন্ধা হাইর(সারি); ষাইড (ষাট; কিন্তু ষাইট্যাহা); হুইন্যা (শুনে);

মাইনি (মানে), কইচ্যা (কচুরি), বইলা (খড়মের ব'ল), প্রভৃতি। কতগুলি শব্দ এখানে যথা আড়ষ্টতায় উচ্চারিত হয়, যেমন [সইত্য], প্রচলিত— /হাছা/। তেমনি [চাইর] কোন শব্দের সাথে বহির্সন্ধি ঘটিত অন্ত ব্যঞ্জনলোপে ব্যবহার পাই

মাত্র ; চাইট্যাহা, চাইট্টা, চাইজ্জন (চারজন)। তবে /'চাইর কুতুব'/ প্রভৃতি ব্যবহারে অর্থসীমা স্পষ্ট নির্দিষ্ট। 'বাইত্' (বাড়ীতে), রাইত্ (রাত্রে) প্রভৃতি শব্দে বিভক্তি বিহীনতায় ঝোঁক স্পষ্ট ; 'রাইতে' ব্যবহারও পাওয়া যায় (ক্বচিৎ 'রাইতের বেলা')। নাসিক্যধ্বনির বিকল্পে কাইন্দা, কাইনদা এবং স্বরাগমে দ্বিত্বতায় খাইট্যা (খেটে), লাইত্যা (লাথিমার) প্রভৃতি বহুল প্রচল। দ্বিত্বঘটিত শব্দের হলান্তিক অপিনিহিতি গঠন দেখি বাইগ্ (যথা 'বাইগ্ নাই কপালে…') >ভাগ্য, মইদ্>মধ্য শব্দে। বইস্ প্রভৃতিতে নাসিক্যব্যঞ্জনের স্পর্শীভবন এবং ভেড়া-সুলভ অর্থে 'মেই্রা' (বিণ) শব্দে স্পর্শব্যঞ্জনের নাসিক্যভবনতা ঘটেছে। নামশব্দ বিকৃতিতে অপিনিহিতি প্রকৃতি অতিসাধারণভাবে আসে : সইক্যা (শহীদ), মইন্যা (মনি), কুইদ্যা (কুদ্দুস)। নদীয়-নাম আইড়ল (আড়িয়াল)। আদিয়াবাদে অপিনিহিতি শব্দ শুদ্ধ করে বলার প্রবণতা আছে ; আইদ্যাবাজ — সাদিয়াবাদ ; ষাইতের পাড়া— সাটের-পাড়া ; বাইরচর— বাহেরচর। অপিনিহিতি শব্দে দ্বৈতস্বরের গঠন নিয়মিত, তবে হোউরি, কইগো প্রভৃতি শব্দে দ্বৈতস্বরের দ্বিতীয় এককের স্বর-সংকোচন দেখা দেয়, ফলে তার উচ্চারণ একক স্বরের পর্যায়ে পড়ে, যথা হো'রি, কো'গো : /hə́ri/, /kə́go/ প্রভৃতি। বাক্যশব্দে অপিনিহিতি : কোথা থেকে— কইত্যে, কিজন্যে— ক্যায়ে, এভাবে যাই্ ইচ্ছা তাই, প্রভৃতিতে প্রলম্বিত বা দীর্ঘ /ই/ও আসে।

ভিন্ন বুৎপত্তিজাত শব্দের অপিনিহিতি ধর্মিতায় অর্থান্তর পাওয়া যায় ঃ

| পইত্যা = পোহানিয়া 'পইত্যা তারা' বা মাথার তারা
| পই-ত্যা পতিত বা খালি জায়গা ঃ 'পইত্যা রাখছে।'

| আইদ্যা = আদি
| আই-দ্যা = অর্ধেক

| হাইর = সারি
| হাই-র = (উপ) পতির

উপরের উদাহরণগুলি প্রধানত: /ই/ স্বরের আগমঘটিত। সাধারণত /অ/-/আ/-/ও'/--/উ/ প্রভৃতি ধ্বনি অন্তে বিপর্যস্ত /ই/-র আগম ঘটেছে এবং ফলে দ্বৈতস্বর হয়ে প্রথম অক্ষর সৃষ্টি হয়েছে। পরের অক্ষর প্রায়শঃ দ্বিত্বঘটিতএবং বিকৃতধ্বনি সংযুক্ত ক্বচিৎ সম্বৃতধ্বনি সহযোগ ঘটেছে। অন্যক্ষেত্রে অন্তব্যঞ্জন হলন্ত হয়েছে ('হাইর' 'বাইগ', 'মইদ' 'সইদ' —শহীদ প্রভৃতি)। কিন্তু সর্বত্র এটা প্রধানভাবে লক্ষণীয় যে, মূল শব্দে যে স্বর রক্ষিত ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রধ্বনির উদ্ভাসন পেয়েছে

এই নবশব্দাবলী এবং মূলস্বর রক্ষার প্রবণতা তথা রক্ষণশীলতা অপেক্ষা স্বগমনে (innovations)-ই পূর্ব কথিত স্বরতাত্ত্বিক প্রভেদগুণ সুলক্ষিত হয়েছে। কোথাও কোথাও দ্বৈতস্বর স্থলে বিকল্পে দীর্ঘস্বরের উৎপত্তি লক্ষ্য এড়ায় না, /hɔ́ri/প্রভৃতিতে যেমন। এই স্বর অঞ্চলভেদে /hu:ri/ শব্দে (RT) পাওয়া সম্ভব। সেখানেও অসাবধনতায় সন্ধিস্বরের প্রভাবই রক্ষা পায়, নচেৎ 'শুঁড়ি'র অর্থ আনে।

২. স্বরধ্বনি

বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনি ৮টি উপভাষায় তার ব্যতিক্রম বড় দেখা যায় না। ঢাকাই উপভাষায় ৭টি ধ্বনির স্পষ্ট ব্যবহার আছে কেবল একটি ধ্বনি /আ/ কখনো কখনো সম্মুখ প্রসৃত বা yotized রূপ উচ্চারিত হয়।১১ এ উপভাষায় অপিনিহিতি /ই/ ধ্বনির ব্যবহার প্রচুর এবং চলতি (SCB)-র মূলস্বরধ্বনির সব কয়টিরই যে স্বতন্ত্র অনুনাসিক ধ্বনি পাওয়া যায়, এখানে তার প্রয়োগ একেবারেই নেই। আবার নারায়ণগঞ্জ উপভাষায়ও দুটো সংস্কৃত, দুটো অর্ধসংস্কৃত, দুটো অর্ধ বিকৃত এবং একটি বিকৃত মধ্যস্থানীয় স্বরধ্বনি পাওয়া যায় এবং এদের প্রকৃতি ঢাকাই ভাষার মতই :

> 'These seven vowel phonemes are mostly like those of the standard colloquial Bengali, except that they are never nasalized and that they are lengthened not only by means of stress but also by means of a rising tone which is observable mostly in the first syllables.১২

এই সাতটির ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণ হয়েছে নিম্নরূপে : /u/, /i/ ; /E/, /O/ ; A/, /O ; /ɑ/. এইসব ধ্বনি এ উপভাষায় শব্দে বিভিন্ন স্থানে কিভাবে উৎপত্তি হয় নিম্ন উদাহরণে দেখানো হয়েছে।

এক্ষেত্রে [SCB]-র সাথে [Ng-D] পার্থক্য প্রায় নেই; অপর পার্থক্যগুলি মূল শব্দের মধ্যে উষ্মীভবন ও অন্যান্য পরিবর্তন ঘটিত অথবা আদিস্বর সংরক্ষণ প্রবণতা হেতু এবং প্রধানতঃ মহাপ্রাণস্বর লোপঘটিত :

আদ্য (In) :	Ng—D	SCB	Ng—D	SCB
	উডান	উঠান	এ্যাদিগে	এদিকে
	ওডা	ওটা	এ্যাকটা	একটা
	অশান্তি	অশান্তি		
	আমরা	আমরা		

এই উদাহরণগুলিতে /ওডা/, /এ্যাদিগে/ প্রভৃতি শব্দ নারায়ণগঞ্জে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উচ্চারিত হয়, তেমনি নীচের /হ্যাদিগে/ প্রভৃতিও ; অন্যান্য ধ্বনি ক্ষেত্রে প্রভেদ দেখি না :

অনাদ্য (Non-In)

	বিলাতি	বিলাতী	হুদাহুদি	শুধুশুধু
	কোডা	কোঠা	ক'ইসি	বলেছি (ক'য়েছি)
	হোনা	শোনা	হ্যাদিগে	সেদিকে
	আমার	আমার	ক্যাডা	কে ওটা
অন্ত্য (final) :	ব (অ)'উ	বউ, বৌ	ব'ইসে	বসেছে
	বাঁচি	বাঁচি	বও	বস
	খাও	খাও	ছাও	দাও
	ঢাহা	ঢাকা		
	ব-র	ভর'		

কেবল /ittu/, /Oga/, /bolod/ প্রভৃতি শব্দ একই ধ্বনিতে একই অর্থে SCB-তে নেই। ইট্টু—একটু ; অগা ও বলদ প্রায় সমার্থক হয়ে পড়ে রাগত : ভাষণে, মন্দবাক্যেও ; SCBতে 'বলদ'-এর যে অর্থ Ng-Dতেও তা আছে (ox)।

আদিয়াবাদে মন্দবাক্যে /'অগা'/ 'বলদ' এবং /'উষারা/ 'অর্থের সামান্য ইতরবিশেষে' ব্যবহৃত হয়, /ইট্টু/ শব্দের তেমন ব্যবহার অল্প, বিকল্পে—

ইট্টু ১ এ-ট্টু, এট্‌ টু (e´ttu´)

২. ইট্টুনি, ইট্টুআনি (ittuani)

প্রথম উদাহরণে শেষ ধ্বনি সম্মুখ প্রসৃত (yotised) দ্বিতীয় উদাহরণে অনাদ্য অবস্থানে hiatus ঘটিত পিচ্ছিল ধ্বনিরাগম লক্ষণীয়।

Ng-Dতে উদাহৃত /OvddO/ Edige/, /OSSa/, /Hona/ প্রভৃতি শব্দ আদিয়াবাদে দেখি না ; এখানে [Edige] এবং [Hona] শব্দে উচ্চারণ হয় /এইদিগে/, /হুনা/ এবং [OSSa] শব্দ এখানে অপরিচিত। উদাহরণ :

১. এইদিগে আমার শইলডাও বালা না, হিফুট্ যাওয়নও লাগে ; কি করি।

২. তর গলাৎ কি দিসৎ গো ; হুনা ? [তর] জামাই-এ আনসে ?

এবং, ৩. আসাইগো, এট্টু দেইখ্যা যা (=একটু দেখে যাতো এসে) :

নারায়ণগঞ্জের উপভাষার সকল বৈশিষ্ট্যের এবং SCB-র সবশর্ত রেখেও আঞ্চলিক এই পার্থক্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তামিল ভাষার সাথে তার একটি উপভাষার এইরূপ

সামান্য পার্থক্য নিরূপণকালে অধ্যাপক পিল্লাই যে কথা বলেছিলেন, এখানেও তা প্রযোজ্য হতে পারে ; তিনি বলেছিলেন :

'The vowels in this (Jaffna) dialect have the same sound values as in the cen Tamil', there are also certain special characteristics some of which they might have developed locally ; and others, which the dialect might have preserved from the parent language without much change owing to the insular character of the land in which it is spoken ১৩

আদিয়াবাদের insular character বা এই বৈশিষ্ট্য লাভের সম্ভাবনার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি।

এই উপভাষায় /ই/ অপিনিহিতি ধ্বনি হলে এবং /আ/ বিপরীত স্পর্শ প্রতিবেষ্টিত হলে :

SCB	NG-D	A-D
ন্যায্য > ন্যায্যি	=[nAjjo]	/neijjo/ কখনো শুধু/ন্যায়েজ/বা/'ন্যয়জ'/ ("ন্যায়জ বিচার নাই") এবং কখনো : /ন্যয়/এবং কোথাও কোথাও/ন্যেজ্জি/ ।
ভাই	= bAai] /baVy/	যথা : বায়সসা[ব]/বাই সা [ব](কিন্তু /বাইসাবে/প্রচলিত আছে)।

অধ্যাপক কানাপাঠী পিল্লাই-এর একটি সূত্র A-D র ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে আমি ফল পেয়েছি, সেটিও এখানে উল্লেখ করলাম উক্ত ভাষাতাত্ত্বিকের ভাষাতেই :

'In some monosyllabic words with long a ending in the semi-vowel-y, the a is pronounced wlth lips drawn back…' (প্রাগুক্ত) আদিয়াবাদে এ ধরণের জিহবার পশ্চাদাকর্ষণ ঘটে :

১. হ্যায় যা' না =সে যায় না।

২. ক-ই, ত যা' [y] তো চা [y] না=যেতে চায় না, এত ব'লি ।

৩. মাছ বায় রে ? /বায় =ক. মাছ ভাসছে নাকিরে ? /ভাসছে ;

খ. মাছ মারছে রে ? /[মারছে]।

দ্ব্যক্ষরিক শব্দেও কখনো-সখনো এ পরিবর্তন আসে :

বাবায়>বা· আ·[ba·ae]

বাবায় যাইবো, বাবায় আইলে প্রভৃতি বাক্যে এবং কোন প্রশ্নের জবাবে যেমন 'ক্যাডা আনছে' —এসব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অক্ষরে দ্বৈতস্বরপ্রধান গঠনটি বিকল্পে বিপ্রসৃত /আ/ বা 'long vowel with lips drawn back'। এ ক্ষেত্রে দুই অক্ষরের মাঝে 'হিয়াটুস' পূরণার্থ একটি শ্রুতিধ্বনি পাওয়া যায়, সেই ভিত্তিতে LV সৃষ্টি হয়ে তার পূর্বোল্লিখিত উচ্চারণ ঘটে [ldb]।

তুং, /বা'য়ার/ বা /বা°য়ায়/' : [baoay] বা [baOae] বাতাস করে। এরূপ প্রবণতায় অনেক সময় শেষ অক্ষরের পরিবর্তন আসে যেমন, কোত্থেকে > কইত্যে এই ভাবে খনহার > খনহা; আফছায় > আবছা /আফছু; বাতিল > বাতি; দিয়ে [ফেল্লাম] > গ্যা [লাইলাম] প্রভৃতি।

অপরাপর ধ্বনিবৈচিত্র্য ও ধ্বনিপরিবর্তনের উদাহরণ :

a > ε /ai

/আদাই/ ∠ আদায়

/আইজন/ ∠ আয়োজন

বিকল্পে /a /ধ্বনি স্থিত

বুবায় ‍/ বুবু এ

u > ai

/সইন্ন/ ∠ শূন্য

r > ai

/পত্যেক/ ∠ প্রত্যেক

u > eu

/বের্ডরা/ < ভুরু

নিম্নশব্দগুলিতে দীর্ঘস্বর পাওয়া যায় :

দীর্ঘ/i/ : কুই (লত্) = কুই নামক একপ্রকার বনলতা

পী[পি]য়ারা = পিঁপড়া, এভাবে/মিছা, /চীরা্য/ (চিড়ছে) প্রভৃতি।

,,/u/ : উগ্‌লা = হোগলা [যেমন 'উগলাকান্দি' : গ্রামের নাম];

উগাইল্ = পিঁড়া বা মঞ্চবিশেষ।

পুষ্ = পৌষ, এভাবে 'দুদ্' প্রভৃতি।

দুরু' = ধোৎ[/duru/তে উভয়ত ধ্বনির দৈর্ঘ বিভিন্ন উচ্চারণে অর্থ পার্থক্য ব্যতিরেকে সম্ভব এবং প্রচল]

,,/e/ হেই = সে (shᵊ)

[অপর উদাহরণ'হে-ফি/সেদিক বা সেদিকে ; অন্য অবস্থানে স্বর-দৈর্ঘ সচরাচর দেখি না। আবার এই স্বর অনুদাত্ত হলে [হেই] মানে হয় [এই তো]।

„/o/ : ওনু = অনু [কিন্তু/ওনুমান/-এ তা'নেই।]

রোফ/রোফ্—রর্ডফ [ক্ষতিপূরণাত্মক বা compensatory মনে হয়]

„/ɛ/ : এ্যাডা—['বেটা'] শব্দের Nh ব্যবহার।

ব্যাডা—['লোক'] অর্থে যতটা আসে ['বীর'] অর্থে তারও অধিক অনুরণন পাই।

ব্যাত—বেত ।

এ ভাবে/ছন/, /সর/, /খ'াগ/, /ব'াতা/, /গাইল্/ প্রভৃতি শব্দ পাই। প্রতিটি ধ্বনির এই দীর্ঘ উচ্চারণে (বিভিন্ন অবস্থানে এলে) আঞ্চলিক স্বরবৈচিত্র্য ঘটে, কখনো তা' compensatory প্রকৃতি বা গুণ গ্রহণ করে, এবং কখনো অর্থ পার্থক্য ঘটায়, যেমন /সর/শব্দের /১/ ধ্বনির বৈচিত্র্যে এর (ক্রিঃ)/(বি) অর্থপ্রভেদ ঘটে। ক্ষতি-পূরণ দীর্ঘীভবনে কারো কারো মতে ঘোষমহাপ্রাণতার বিলোপ একটি সাধারণ ধর্ম।

ঘোষমহাপ্রাণতার বিলোপ নারায়ণগঞ্জ উপভাষায় যে বৈচিত্র্য আনে তাকে যুগলশব্দে পার্থক্য দেখানোর জন্য RT তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, উদাত্ত স্বরঘটিত ধ্বনিকে/V/ চিহ্নিত করে :

১. গাও (গ্রাম) কিন্তু/gavo/ঘা। এভাবে গর ('waysido ditch') ও /ghor/ঘর ; গোরা এবং/govra/ঘোড়া

২. জর এবং/ZoVr/; জাল এবং/ZaVL/('hot'); জামা এবং/ZaVma/ঝামা ; জির (কেঁচো) এবং/ZiVr/ঝি'য়ের ('of maid servant')।

৩. ডাক ('docall') /এবং/DaVK/ঢাক ; ডাহা (ডাকা) এবং /DaVlta/ঢাকা ; ডল ('DoL'—'container of Paddy') এবং /DoVl/ঢোল; ডিম ('Dima'—'Egg') এবং/DiVma/ঢিলে ; ডলা (বাঁশের মাছ রাখার ডলি) এবং/DuVla/'weavering from side to side'।

৪ দর এবং/doVr/'docatch'; দান এবং/daVn/ধান ; দোয়া (দুধ দুয়ানো) /doVa/ ধোয়া ; দুল এবং/duVla/ধূলা।

৫. বাত (রোগ) এবং/baVt/ভাত ; বালা (চুরি) এবং/baVla/ভালো ; বাপ এবং baVp/ভাবা ।

এই উদাত্ত/V/ধ্বনিটি সম্পর্কে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে এটি প্রথমে কোনও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি ছিল [VAs.] কিন্তু কোনও কারণে তা লুপ্ত হয়ে যায়, এবং ক্ষতি পূরণে এই স্বর উৎপন্ন হয়।

এখন, 'আদিয়াবাদের' সাথে এর প্রভেদ দেখাতে গেলে প্রথমে অমিল শব্দগুলি বেছে নেওয়া আবশ্যক :

ক আদিয়াবাদে নিম্ন শব্দগুলির ব্যবহার ভিন্নার্থক অথবা বিরল :

১ গর ('wayside ditch')

২ /ZiVr/; /ZaVma/

৩ /DaVk/

খ. আদিয়াবাদে নিম্ন শব্দগুলি অজানা বা ভিন্ন উচ্চারিত :

২. /ZaVl/

৩. /DuVla/; /Dima/

গ. আদিয়াবাদে নিম্নশব্দগুলির অর্থ বোধগম্য হলেও ব্যবহারে প্রভেদ আছে :

৩. ডল [dol] = 'container of Paddy' = [ডোলা] /ডুলা/, /জাবার/

৪. দোয়া = 'to milk' = দুয়ান্

৫. /baVP/ = 'Steam' = (বাফ্)

১. গোরা = root' = গুরা/গুরি

ঘ. আদিয়াবাদে নিম্নশব্দগুলির অর্থ পার্থক্য আছে :

২. /ZiVr/ 'of the maid servant' = ঝি'র, চাচীর/জোঠির।

এবং উপরোক্ত প্রায় শব্দগুলিকে ভিন্নভাবে উচ্চারণ করলে একটি করে তৃতীয় অর্থ পাওয়া যায়, এবং সেখানে 'tone' উদাত্ত না হয়েও 'Varried' হয়।

আদিয়াবাদে (AD)র সাথে NgD এর অপর পার্থক্য এখানেই যে, এই VT অবশ্যই RT থেকে পৃথক হওয়ায় [VAs] এর পরিবর্তন ও তারতম্য [ACT.] এর উপস্থিতি জরুরী নয়। নীচে এমনি কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করলে তা বোঝা যাবে :

'উরে [-সারে], দৈর্ঘে-প্রস্থে	করে, সে করে	চারা, ছোটগাছ	ব'রে ভ'রে
উ'রে, ওপরে বা কাছে	[অক-]করে, একেবারে	চারা, খোলা	বরে, আশীর্বাদে
[ধান-] উ'রে	করে, ট্যাক্সে	চা'রা, চারিয়েদে	বরে, বর্ধণে, বর্ষে

এ ছাড়া তিনটি বিভিন্ন প্রতিবেশে/দ/ধ্বনির উচ্চারণে প্রভেদ লক্ষ্য যোগ্য :

১. দ : ব্যবহার→/ইস্থন্ দ করে—/যাক্ দ = যাক গিয়ে।

২. দ : „ → [দিয়ে দাও অর্থে]।

৩. দ : „ → /আড়ু বাংগা দ/। — বর্ণের পরিচয় ইঃ।

সহধ্বনি প্রসঙ্গে নারায়ণগঞ্জের সহধ্বনিগুলি নির্দেশ করে এখানেও (AD) বলা যায় যে, NgDর দুটো সহধ্বনি [BHe] এবং [Fo] এখানেও ব্যবহারে পাওয়া যায় :

লক্ষ্যযোগ্য যে [AD]-তে /o'ti/-র ব্যবহার থাকলেও /o'nil/পাওয়া দুষ্কর। এবং /o'ti/-র ব্যবহার নিম্নরূপ: অতি ফাজিল, অতি চালাক। [ও'নিল] এখানে স্পষ্ট /অ-নিল/। তবে [হাজী] অর্থে /ও'জি/ পাওয়া যায়, সেখানে এ ধ্বনির ব্যবহার পাই। তাই আমার সন্দেহ এবং অনুমান এই যে, এই সহধ্বনি দু'টা [AD]-তে ভিন্নমান এবং সংজ্ঞা পেতে পারে।

ওপরের আলোচনায় আদিয়াবাদের স্বরধ্বনিগুলি এবং তার প্রয়োগ দেখাতে গিয়ে আমরা নারায়ণগঞ্জের শাখা উপভাষা হলেও [AD]-র স্বাতন্ত্র্য এবং তার প্রভেদ ক্ষেত্র নিরূপণে সমর্থ হয়েছি মনে করতে পারি।

আদিয়াবাদের স্বরধ্বনির বর্গীকরণ

	সম্মুখ (FV)		মধ্য (Neutral)	পশ্চাদ (BV)	
উচ্চ High	ই (i)			উ (u)	
উচ্চমধ্য High Mid		এ (e)			ও (o) / ও' (o')
(মধ্য) Mid low		এ্যা (ℰ)		অ [ɵ] / অ [ɵ']*	
নিম্ন Low	আ (a:)	আ (a) *	আ (a)		

* চিহ্নিত ধ্বনি সহধ্বনি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হয় নি।

৩ ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনির চাইতে ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে SCB এবং উপভাষাগুলির প্রভেদ স্পষ্ট। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে এই ব্যঞ্জনগুলিকে নয় (৯) ভাগে এবং উচ্চারণ রীতির দিক থেকে সাত (৭) ভাগে ভাগ করেছেন। সুখের বিষয় তিনি আঞ্চলিক পার্থক্যসমূহও উল্লেখ করে গেছেন। তবে তিনি যে পদ্ধতিতে তা' ভাগ করেছেন, অনেকের কাছে তা এখনও গৃহীত হতে পারে নি, প্রাচীন পদ্ধতিতেই তাঁরা এই ব্যঞ্জনধ্বনি সমূহের নামকরণ স্থির রেখেছেন।

যাইহোক, বাংলায় SCB সর্বমোট ব্যঞ্জন সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪ বা ৩৬টি। এর মাঝে স্পর্শধ্বনি ২০টি, যার মধ্যে ঘোষ এবং অঘোষ ধ্বনি সংখ্যা সমান অর্থাৎ ১০টি করে এবং অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণের সংখ্যাও তাই। এখন উপভাষার সাথে SCB -র পার্থক্য শুধু এখানে যে এই মহাপ্রাণঘোষ ধ্বনিগুলি এবং প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পর্শ ধ্বনিগুলি উপভাষায় নেই। ডঃ অনিমেষ পালও তাঁর গবেষণায় নারায়ণগঞ্জে মোট ৮ টি স্পর্শ ব্যঞ্জন এবং তার অঘোষ ধ্বনিগুলিতে উষ্মাপ্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। এ ছাড়া নাসিক্যধ্বনি তিনটি [ম, ন, ঙ], ১ টি দন্ত ['ছ'] ৪ টি শিসধ্বনি, একটি

দন্তমূলীয় পার্শ্বিক (ল) ও একটি দন্তমূলীয় কম্পনজাত (র) ধ্বনি মিলিয়ে সর্বমোট ১৮টি ব্যঞ্জন নির্দিষ্ট করেছেন তিনি। ডঃ অনিমেষ পাল / খ /, / ফ /, / থ /, / ছ / প্রভৃতি ধ্বনিরও পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন।

উল্লিখিত 'ব্যঞ্জন' সমূহের মূল ধ্বনির সহধ্বনির প্রকৃতি নির্ধারণে নিম্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। আন্তস্বরীয় রীতিতে [খ], [ফ], [চ], [ছ], [জ] ধ্বনিসমূহ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পায় :

দ্বিত্বতা : [চ], [জ]
স্বল্পস্থায়িত্বতা : [খ], [ফ]
অনুষঙ্গতা : [ছ]

এই সহধ্বনিগুলি কণ্ঠনালীয় অঘোষ শিস্ধ্বনি = /x/, দন্তোষ্ঠ শিসধ্বনি /f/ = ['প' -স্থলে 'প'-এর উষ্মীভবনের ফলে উচ্চারিত], দন্তমূলীয় তালব্য অঘোষ ঘৃষ্ট [/ts/-এর সহধ্বনিরূপে উচ্চারিত] = /c/, দন্তমূলীয় তালব্য ঘোষ ঘৃষ্টধ্বনি/J/ = [দন্তমূলীয়/Z/-এর সহধ্বনি], এবং সর্বশেষ সহধ্বনিটি দন্তোষ্ম ধ্বনি /s/ এর সহধ্বনি /ch/ = অঘোষ মহাপ্রাণ শিসধ্বনি।

এই সহধ্বনি উৎপত্তিহেতু বা উৎসটি নিম্নরূপে দেখানো যায় :

১ দন্ত্যঘৃষ্ট /ts/ → দন্তমূলীয় তালব্য অঘোষ ঘৃষ্ট /c/
২ অঘোষ জিহ্বামূলীয় স্পর্শ /k/ → কণ্ঠমূলীয় অঘোষ শিস /x/
৩ দন্তমূলীয় শিস /z/ → দন্তমূলীয় তালব্য ঘৃষ্ট /j/
৪ দন্তোষ্ম /s/ → অঘোষ দন্তমূলীয় তালব্য ঘৃষ্ট /ch/
৫ অঘোষ ওষ্ঠ্য স্পর্শ /p/ → দন্তোষ্ঠ উষ্ম /f/

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে দুটো স্পর্শ ধ্বনি ছাড়া অপর মূল ধ্বনিগুলি দন্ত্য / দন্তমূলীয় ঘৃষ্ট বা উষ্ম। এবং সহধ্বনিগুলির দন্তমূলীয় প্রবণতা অধিক। 'দন্ত্যতালব্য ঘৃষ্ট' উচ্চারণের মূলে তিব্বতী-বর্মী প্রভৃতি ভাষার প্রভাবই কার্যকর থেকেছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে দন্ত্যঘৃষ্ট বা দন্তমূলীয় ঘৃষ্টধ্বনি বলতে কোন স্পষ্ট ধ্বনি অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই মানেন নি ; তাঁর মতে এ ধ্বনিসমূহ প্রশস্ত দন্তমূলীয় এবং অঞ্চলভেদে তা' ঘৃষ্ট অথবা উষ্ম।

আদিয়াবাদ অঞ্চলের ধ্বনি প্রসঙ্গেও এ মন্তব্য যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এবং একমাত্র মাছমারার যন্ত্রবিশেষ /চাই/ প্রভৃতি শব্দে স্বরবৈচিত্র্য আনয়নের জন্য উচ্চারণ প্রভেদ লক্ষ্যযোগ্য হয়। একই ভাবে ঠাকুর শব্দের নারায়ণগঞ্জীয় উচ্চারণ Thaxur [AD]-তে অসম্ভব, Mexur শব্দটি অপরিচিত, DEXur শব্দের উচ্চারণ হয়

/ডোখ্/ এবং bo'ixal শব্দটি / বাইট্টাল্ / বিকল্পে বাইট্টালা।

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই এর একটি উদাহরণ পরীক্ষা করা যাক :

ঢাকনি→ [DD] : Daxni = /K/ → /x/

তিনি একে ঘর্ষণজাত /খ/ ধ্বনি বলেছেন ; এর বিকল্পে তিনি দেখিয়েছেন—

/k/ → /g/ → /h/

আদিয়াবাদে k→/x/ যথার্থ আসে না, বরং /h/ ধ্বনি বাঁক নেয়। অন্যত্র শব্দের রূপান্তর ঘটে।

অপর সহধ্বনি [ছ]-এর দ্বিত্ব প্রসঙ্গে এবং ডঃ পালের [khaccOr] উদাহরণ দৃষ্টে আদিয়াবাদের ধ্বনির আরেকটি প্রভেদ আমি লক্ষ্য করি :

[c] > /s/ এবং [cc]→/sc/

এবং বাকপ্রবাহঘটিত আন্তপরিবর্তনে এর সম্পূর্ণ রূপ : [Khas+Cɔr]। অপর উদাহরণ :

মন স' ক'খ না = মনে চায় [তো] বলুক না

mən s´ɔ kohx na

এ ছাড়া আদিয়াবাদে P> f স্থলে Regressive Voicing বা পরাগতানুরণনের উদাহরণ পাওয়া যায় নিম্ন উদাহরণে :

থাপ্পড় (ScB) : থাবড়া (AD)

[PP] → /b/

এখানে অন্তঃসন্ধিস্থলে অন্তস্বরাগম ঘটায় /b/ ধ্বনি এভাবে গঠিত হয়েছে। এবং বহির্সন্ধি স্থলে :

p> b

জমি] মাপ+দে=মাব্দে

বাপ+ভাই=বাবভাই

p> w

বাপে>বাফে=বা'আয়

৪.

নীচে আদিয়াবাদের উল্লিখিত এলাকা থেকে সংগৃহীত শব্দমালার কিছু উদাহরণ সংকলিত হলো, এর অন্তর্নিহিত শক্তি এবং বৈচিত্র্য সহজেই চোখে পড়বে :

পুরুষ ও বচন—

১. আমি, আমি এ—আমরা, আমরার

২. তুমি, তুমি এ—তুমরা, তুমরার, [তুমরায়]

৩ ক. হ্‌' হ্যায়, ত্যায়, ত্যো'—হ্যারা।

৩ খ হেই, হেইএ (স্ত্রীলিঙ্গে) —হেইরা, তা-ইরা [Nh].

৩ গ. তাইঙ্গে (Nh) —তাইঙ্গেরা (Nh)

বহুবচনের রূপ :

সাধারণ : বত্রিশটা মাছ, মাছের মধ্যে বাছা, শারির (শাড়ী) মধ্যে সারি (দোকানে), বা'র বাইর ছাত্র আইছে, ক্ষেতের দান থুইব কই, বালা বালা মানুষ প্রভৃতি। তুং 'ছুঅ ছুঅ যাওত ব্রাহ্মণ নাড়িয়া'

রা> এরা :

ক. তাইন্‌রা

খ হেইরা, (তেইরা), তাইনেরা, তাইরা

গ. ছৈঅলরা, কীচকরা, কামারেরা চামার্‌রা

ঘ ছাত্ররা, মুণিরা

রা :

ক. নাহীরা, বেহিরা

খ. ছেড়ারা, বেরা'রা, ক্ষেত্যারা

গ. নাইয়ারা, ছৈয়'রা, তালৈরা

ঘ. আ' ডুইরারা, আ' বাইত্যারা, বুইরারা

ঙ. কাস্‌লারা, চাসাইরারা

চ মাচ্ছারা

ছ হেরা, আমরা, তুমরা

জ. নাইডিরা

এরা :

ক হেরা

খ. সাবেরা বাপেরা, চুরেরা

ডি :

ক. এইডি, হেইডি, নাইডি, কতডি

খ. বইডি (গন্ধ), লালডি, কত্তাডি, ব

গ. গুস্‌তডি, মরা (ভাত/মাছি) ডি, হলাডি, বইডি (পুস্তক), কাপড়ডি, সুন্‌ডি, পয়সাডি বরবরডি, ছুডুডি, টুক্‌নিডি, বুইত্যাডি, নরমডি।

ঙ. পানি ডি (যেমন, পানিডি এক কচ্ করস না।

লি > গুলি :

ক. এৎলি, হেৎলি, কোৎলি, তোত্লি, ষংলি

খ. এইলি, হেইলি

গ মাছলি (মাছলি কত্ত আইসে ?)

ড্রি> ৎলি :

ক. এড্ডি, হেড্ডি (এড্ডি দা ভর্ত্তা খামু? সাদৃশ্যে হেড্ডি)

গুলান, গুলাইন :

ক. এই গুলান, হেই গুলান ; এই গুলাইন

খ. মানু গুলাইন (-পাজী অঃ)

গুলাইল :

ক. আছে গুলাইল, নাই গুলাইল

খ. খেড় গুলাইল (-রই- দ দে); মাছ গুলাইল (-তো ভর্ত্তা !)

ফাইৎ, আইন : বেডি ফাইৎ, বেডাফাইৎ ; বেডি আইন

আগে বা পশ্চাৎ বহুত্ব বাচক :

ক. সব মাইন্ষের কি কাম ? / সব কথা শ্যায্ অইতো না কই্লে/সরডি—

খ. ইতা হিতা বুঝিনা/এইতা ধরি না/আবিযাবিতা নেইগ্যা/ইতাসব কি ?

গ. (ই্) সব গফ্—/(ই্) সব মানুরে মানু কয় ?

ঘ যতগর্দিস আমার উপর/যত বা যত্ত কান্তাইলাস/যতমুণি লাগে/যত ট্যাহা—

ঙ 'আছে মলূ ন', খায় মলূ ন', যায় কত দিন'

চ কত মুরিদান, কত থালবিল

দ্বিত্ব বাচক :

ক তরা দুনু(এ) সিল্লা পারতি না ?

খ তরা দুইজনে জরা(য়) মিল্লা কাম করিস ? [দুইজনে> দুইঅনে, কখনো কখনো]

তির্যক কারক :

ক. হেইগরে হেইগরে কাম সারছে। হেরা হেরা…।

বহুবচন গুচ্ছ :

ক কামের আক্কি,—ডেহি,—গুয়াইল

খ সাদৃশ্যে ঐ> -গাতা,—পুকুনি,—গাং,—খাল।

সমষ্টিবাচক সমাসবদ্ধ শব্দে :

ক. তাঁতী সমাজ, ছাত্র সমাজ, হিন্দু সমাজ, পশু সমাজ

খ. পইখ্ পাহাইলে (পাখালি)

গ. তাঁতী মানুষ, পণ্ডিত মানু, [তুং, মধ্যবাংলায় মান> মানব বৃদ্ধমান = বৃদ্ধেরা। গোর্খবিজয়]

ঘ. বেডাফাইৎ, বেডিআইন> বেঠ্ঠাইন

সমষ্টিবাচক শব্দের ষষ্ঠিবভক্তি অন্তে ব্যবহার :

ক. মাইনষের পারা, —কিল্লা,—গতাগম,—কিলিবিলি,

খ মানু—কারগুস কেডাথায়।

গ. পইখের সমাজ, মাইনষের কাতার, মলবীর দল, পরার মানু (ছাত্র)

ঘ. গারির সিহল

ঙ. চারার মুড়া

নির্ধারক বহুবচন :

ক. বাইগ্গারা হাফ্ দইরা দইরা আনে/যেয় যেয় আইবা/যারা যারা গেছিন, হেরা-হেরা অই মিল্যা লইয়া সে।

খ. কেডে কেডা চাও / কেউ-এ কে-উ বু'লে না / মিলে মিলে পাইবা জিনিষ / বুইড়া বুইড়া কতা

অতিবিধি বহুবচন :

ক. রাসেরা (তুং 'আমরা সবকে'—পদ্মাবতী) হেরা হগলতে

অপরাপর বৈশিষ্ট্য : ক্রিয়া

ক. বের বেরাইয়া. পের পেরাইয়া, আডাইয়া

খ. খাইট্টা, হুইত্যা, গিয়া

গ. সুতা, হুত',

ঘ. লইট্টা রইছে, গুতামারা

ঙ. আইগ্যা, যাইগ্যা, লাগ্‌গা, লাইগ্যা

শব্দ সংকোচ :

ক. কইতাত্তাম

খ. কুনানতে, কইত্যে

বিদেশী শব্দ :

ক. র> ল : লেইল গাড়ী. লেডি, লেড়ু (রেডিও)

খ. বিপ্রকর্ষ : কুদরতি, অক্ত, বাকস্. নগদ, টেরাম, গরম

বিপ্রকর্ষ শব্দ :

গরব (গর্ব), জনম, যন্তর, পরব, রতন, গেরাম

প্রাচীন ও বিশেষ শব্দ :

কানাতারি <তুং কানাজুঞ্জি> কেন্দাই> কেন্নো ;

পশ্চিমবঙ্গের শব্দ :

হতু. গু্য়া (গু্ওটা) = 'বেদিশার গু্য়া'।

বন বা ঘাসের প্রতিশব্দ : এখানে বিশেষ কতগুলি শব্দ সংকলিত হলো ; আঞ্চলিক অভিধানে এগুলোর অধিকাংশই নেই—

দুর্বা, বাদাইল্যা, চেরসা, পল্যা, গুইচ্ছা ছুবা, কানাইয়া, চুঁস বন. হাইছাঁ, হাওয়া, কালমীনা, নরিঘনা, উলুঘ্রা, কলসী, হরমা, আদা-হরমা, পাওরা, জরা, আরাইল, ফুটকীবন, দলকলস, তিহির ডুগা, এলেমসা, গাগরা. বিক্না বন. ডেকি বন, কাডা গুডুইরা, আম গুডুইরা, নাগা বন, গান্ধ্রা বন, ক্ষেতা বন, গিমা বন, ইমা বন, মরিচা বন, চেনগা বন, চেনগা ছুবা, চুতরা বন, ব'নালা বন ডিঙ্গরাজ, চোতেন্নাস্, শালবন এ্যাছট্টা, চাল্লা, বইশা চাল্লা, লত বন, দুলালি, লনতি, কাইজ্ বন, বোত্তা. গিমা, লজ্জাবতী, বিশকাডালি, বিদ্যা-বন, কালবিদ্যা, হিয়ালমতি, কালশিয়ালা. কাডা বাবুর. বুইয়া বাবুর. শিয়াল কাডা, ফুটকা বন, বাইরালী, বিলাই আচরা, গুষ্নি বন নাগা, গাগরী।

বড় বন :

ইহর, বাতা, ছন, খাইল্লা, খাগ, কাইনলী, নল মুতরা, উগলা. নাগা, কাওয়া জিংগি, নাগাকুলি, বৌল্লা, বিন্নাফুল, কুইনত [লং], পিফিল, সতুন লত, তিংবাগুন, বুট বাগুন. কাড বাগুন, দুতরা।

খেলার শব্দ :

ক. মারবা. ছুয়া, কাসা, পাক্কা, জল্লা, এফি, ইছুনবিছুন, দাইরা ছী, দাগ, ফাই, সাম্, ডু।

খ. ডুক্কু ডুক্কু লায়
তবল' বাজায়
তবলার সুরে
মৌমাছি উরে।

অন্যপাঠ
ডুক্কু ডুক্কু কানাইয়া
নৌকা দিস বানাইয়া
যদি নৌকা উরে
বিয়া দিস দুরে।

গ. হায় নারে কমলা
পরে পথে জমলা (ঝামেলা)
পর পথে লাড়ি
কুরাল কাড়ি
কুরাল বুতা
ইষ্টিশানের মাতা।

ঘ. চাপিলা চুপিলা
ঘন ঘন মাছিলা

একা ধনি বেকার
কেমতে গেলি কামার শলা
কার্মার মাগি ডুব ডুব পানি
গাছের আগাত কল পানি
আমফুল জামফুল গোলাপফুল
এ্যাঙ্গা; ডেঙ্গা; ঠেংগা।

অন্য শব্দ :

ক. হোয়াগ্যাম ; চৈর ; ডিফ' ; এ্যাহাইট্ট ; গ.ফাট ; আবলা ; এনডেরা ; আঙ্গারি।।
খ মুচলেমেও [-পারতাম না]/; দে-হা-র /
গ. [বাঁশের-] পৌয়া ; [বাঁশের-] করুল ; [বাঁশের-] চৈক। প্রভৃতি।

৫.

ভাষার বিবৃতিদানের পদ্ধতি অনুয়ায়ী সকল দিক এবং সকল রীতি মেনে সিদ্ধান্তে আসতে হলে যে পরিসর প্রয়োজন, এখানে তার অভাবটাই বেশী করে চোখে পড়তে পারে; বাংলা ভাষায় সম্মুখ আদর্শ হিসেবে সে রকম আলোচনারও অভাব বড় বেশী। সীমিত পরিসরে ও উদ্দেশ্যে এখানে যেটুকু বিশ্লেষণ করা হয়েছে, আগামী কালে তারই ভিত্তিতে আরো আলোচনা হবে এটুকুই লেখকের প্রত্যাশা।

এ প্রবন্ধে গৃহীত উদাহরণসমূহের জন্য প্রধানভাবে আমি আমার গ্রাম থেকে করে আনা নোট এবং আমার মায়ের ও আমার গৃহসহকারীর (বয়স ১৭/১৮) উচ্চারণের ওপর নির্ভর করেছি।

আমার সিদ্ধান্ত, 'ঢাকাই উপভাষা' শব্দটির ঢালাও অর্থ ঢাকা জেলার সকল অঞ্চলের কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারেনা, বিভিন্ন অঞ্চলে তার বিভিন্ন রূপ এবং একটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড নাগরিকরূপও গড়ে উঠেছে খুব দ্রুত; এভাবেই নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার ভাষার সাম্যতা বা ঐক্য নারায়ণগঞ্জেরই পূর্ব-অঞ্চলে পাওয়া দুষ্কর। ভাষার বিবৃতমূলক পরীক্ষানুযায়ী [AD] কে অর্থাৎ 'আদিয়াবাদ অঞ্চলের উপভাষাকে একটি স্বতন্ত্র্যবৈশিষ্ট্যমূলক অন্ততঃ শাখা উপভাষা বলা যায়। এ সম্পর্কে আরো বিস্তৃত আলোচনায় আপরাপর তথ্য সম্পর্কে কেউ ভবিষ্যতে আমাদের অবহিত করতে সক্ষম করবেন, এই কামনা করি।

টীকা

১। ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী-সিলেটী। পরিক্রম ২.৬ মাঘ ১৩৬৯/মুহম্মদ আবদুল হাই, ফাল্গুন ১৩৬৯।

২। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই—ঢাকাই উপভাষা। সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা ১৩৭২।

৩। গোপাল হালদার—ভারতের ভাষা। কলিকাতা; জুন ১৯৬৭ (পৃঃ ৮২)।

৪। ঐ (পৃঃ ৮৩)।

৫। The story of Language, London 1966(P- 49)

৬। Mario Pei—Language for Everybody. C-G. Edition 1958 (P 107-8)

৭। W J. Entwistle—The Spanish Language, together with Portuguese; Catalan-and Basque (Faber & Faber; 1936) P. 82 উদ্ধৃতি G.L. Brook (ঐ পৃ ১৯)।

৮। Preface. ibid

৯। মুনীর চৌধুরী—The Language Problem in East Pakistan. International Journal of American Linguistics, Part (Linguistic Diversity in South Asia) III, VoL 26, No. 3. 1960 (P. 68 .

১০। Dr. A. K. Pal—Phonemes of a Dacca Dialect of Eastern Bengali and the Importance of Tone. The Journal of the Asiatic Society Vol III, No. 1 & 2 1965 (P. 44)

১১। ঐ; পৃঃ ৪৫

১২। মুহম্মদ আবদুল হাই—ঢাকাই উপভাষা। সাহিত্য পত্রিকা বর্ষা ১৩৭২ (পৃঃ ২৬)।

১৩। Dr. A. K. Pal—ibid (P. 40), পরবর্তী উদাহরণগুলোর জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৪। K. Kanapathi Pillani—The Jaffna Dialect of Tamil: A Phonological study. Indian Linguistics, Turner Jublee Volume No. 1, 1958 (P. 220).

উৎসাহী পাঠকগণের জন্য ছোট্ট নির্দেশ পঞ্জীটির উল্লেখ রাখা যেতে পারে:

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: ক. ODBL Vol I II & III

খ. Brief Sketch of Bengali Phonetics; London & Paris 1921.

গ. A Bengali Phonetic Reader London 1928.

২. মুহম্মদ আবদুল হাই: ক. A Phonetic and Phonological Study of nasals nasalization in Bengali.

খ. ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব দ্বি. সং.

গ. Dacca Dialect : Pakistani Linguistics; 1967

৩. W. Sutton Pope : An Introduction to Colloquial Bengali; Camb 1934

৪ E. M. Bykova etc : Kratkie svedeuija po fonetike ; slovoobrazo-vanijee bengal'skogo jazyka (Moscow; 1957)

৫. Ferguson & M. Chowdhury : The Phonemes of Bengali Language Vol 36 No 1. Jan-March 1960.

৬ নিসর্গ/ভাষাতত্ত্বসংখ্যা: ১৩৮০—সম্পাদনা; মনিরুজ্জামান।

প্রবোধকুমার ভৌমিক

আদিবাসী ও মেদিনীপুর

আদিবাসী বা উপজাতি অর্থে সাধারণভাবে আমরা আদিম বাসিন্দা (autochthones অথবা aboriginals)দের বুঝি। কেননা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা আদিম-জীবনাবদ্ধ ও সংস্কৃতিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বা বৃহৎগোষ্ঠী। জাতিসর্বস্ব এই ভারতভূমিতে বাস্তবিকই তারা উপ-জাতি বা খণ্ড জাতি। এই সমস্ত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শের কিছুদূরে, অপেক্ষাকৃত ক্লিন্ন, প্রাকৃতিক পরিবেশে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে। এই উপজাতি বা আদিবাসীদের কি সংজ্ঞা হওয়া উচিত এই নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কেননা এই সকল গোষ্ঠী আগের মত আর বিচ্ছিন্ন নয়। পৃথিবীতে আফ্রিকা মহাদেশকে বাদ দিলে ভারত-উপমহাদেশে এদের সংখ্যা যথেষ্ট। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতের মোট জন সংখ্যা ৫৪৭,৯৪৯,৮০৯। মোট উপজাতি (তফ্‌শিলভুক্ত) ৩৮,০১৫,১৬২, পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যা ৪৪,৩১২,০১১ মোট উপজাতি ২,৫৩২,৯৬৯। সম্প্রতিকালের নানা পরিবর্তন এদের দেহমনে এবং দিনচর্যায় যে প্রভাব এনেছে তা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, ফলে আদিম জীবনের সাংস্কৃতিক রূপরেণু (cultural trait)র স্বাভাবিকতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে, কোথাও হয়েছে শুদ্ধ। তবুও যাঁরা এই নিয়ে আলোচনা করতে চান, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করতে চান তাঁদের নির্ভরযোগ্য ও প্রত্যয়শীল সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া দরকার। নৃ-বিজ্ঞানীর

মতে আদিবাসী বা উপজাতি হল আদিম মানুষের উত্তরসূরী। এদের পূর্বপুরুষ একদিন প্রত্ন প্রস্তর যুগে (Palacolithic Age) পাথরের তৈরী হাতিয়ার তৈরী করে নতুন সভ্যতার পত্তন করেছিল। দীর্ঘস্থায়ী সেই সভ্যতায় ধীরে ধীরে নানা পরিবর্তন এসেছিল। এখনও এই উত্তরসূরী গোষ্ঠীদের জীবনে প্রকৃতি-নির্ভরতা বিদ্যমান। এছাড়া গোষ্ঠীর দলভুক্ত লোকজনের জীবনে কেবল যে সাংস্কৃতিক ঐক্য রয়েছে তা নয় আকৃতিগত সাদৃশ্যও থাকা অতি স্বাভাবিক। বেশীর ভাগঃক্ষেত্রে এদের নিজস্ব ভাষা (dialect) রয়েছে। আবার এদের বাসস্থান কতকগুলি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ; যদিও অর্থনৈতিক জীবনের তারতম্যে এই বাসস্থানের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। সমাজ-অনুশাসনের নানা রীতিনীতির মধ্যে স্বকীয়তা সহজে নজরে পড়ে। এই স্বকীয়তা, ভাষা ও রীতিনীতি-অনুশাসনের বন্ধনে সুসংবদ্ধ ও তীব্রতার আবেদনে মুখর, কখনও এদের জীবনে আনে ঐক্য ও গোষ্ঠী চেতনা (Group Conciousness)। এছাড়া উপজাতি-দিনচর্যায় প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ড বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বা অর্থবোধক ভূমিকা গ্রহণ করে। সেই সংগে জাগ্রত মূল্যবোধ গোষ্ঠীজীবনে আচরিত ক্রিয়াকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করায়। এছাড়া উপজাতি সমাজ জীবনে স্তর (Stratification) দেখা যায় না—যা আমাদের বহুধা-বিভক্ত সমাজ-জীবনে রয়েছে। অর্থনৈতিক জীবনে পারদর্শীতা বা বিশেষায়ণ (Specialization)ও লক্ষ্য করার মত নয়। ফলে সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এবং পরিবেশ পরিমণ্ডলের প্রভাব ও নির্ভরতা এদের জীবনে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে "ভিন্ন-সমাজ-নির্ভর" করে তুলতে পারে নি। এই অর্থ-নৈতিক বিচ্ছিন্নতা অনেকটা আদিবাসী অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি—যার মধ্যে প্রকৃতি-নির্ভরতা অতি সুস্পষ্ট। পরিবেশ পরিমণ্ডলে একান্ত নির্ভরতা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য তাদের মধ্যে স্ব-গোষ্ঠী চিন্তায় (in group feeling) প্রবুদ্ধ করায়। এর ফলে উপ-জাতি সমাজও স্ব-গোষ্ঠীতে বিবাহে (endogamy) প্রবৃত্ত হয়। স্বীয়-গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হয়। নিজ সমাজ পরিচালন বা শাসনতন্ত্র (Political Structure) এক বিশেষ রূপ নেয় ও বলিষ্ঠ হয়। যদিও সমাজ-শাসনের কাঠামো গোষ্ঠী মাত্রেই ভিন্নতর হতে পারে। অনেক সময় এই চেতনাবোধ কিছুটা সংকীর্ণ স্বাজাত্যবোধ (ethno centric) আনায়, অপরগোষ্ঠী বা সমাজ থেকে কেবল যে স্বাতন্ত্র্য রচনা করে তা নয় হিংস্রতার উচ্ছ্বাসে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উপজাতি বা আদিবাসী সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমাদিগকে উপজাতি জীবনের এই ভাবগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যদিও নানা পরিবেশে উপজাতি গোষ্ঠীর এই মানসিকতা

অথবা দিনচর্যার অনেক হেরফের হয়েছে। কোথাও হয়ত প্রভাবশালী আগ্রাসী সমাজ ব্যবহার সান্নিধ্যে স্বীয় ভাষা ও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে। তবুও অনেক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে চিরাচরিত পূজার্চনার ভাষায় অথবা অশরীরী শক্তিকে তুষ্ট করার 'তুক' বা যাদুমন্ত্রের মধ্যে এ সকলের নিদর্শন পাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। গবেষণা ক্ষেত্রে বা শিক্ষামূলক আলোচনায় আমরা যে সকল গোষ্ঠীকে উপজাতি বলে অভিহিত করি তাদের সকলেই কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তফ্‌শিল্ ভুক্ত (Scheduled) বলে চিহ্নিত নয়। ভারত সংবিধানে ৩৪১ বা ৩৪২ অনুচ্ছেদে কোন গোষ্ঠীকে বা তার অংশকে তফ্‌শিল ভুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং ঐ সমস্ত গোষ্ঠী তফ্‌শিলভুক্ত হলে পর প্রশাসনিক সর্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা পাবার সুযোগ পাবে। যদিও সংবিধানে প্রথমে মাত্র দশ বছরের জন্য তাদের এইভাবে তফ্‌শিল চিহ্নিত করে তাদের জীবনের অসাম্য ও ব্যবধান হ্রাস করার চেষ্টা বর্ণিত হয়েছে তবুও কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি বলে লোকসভায় এর মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য বাড়িয়ে দেওয়ার পিছনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের অভিমতই প্রণিধানযোগ্য। তবুও দেখা গেছে এমন অনেক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় রয়েছে যাদের জীবনে উপজাতিসুলভ সমস্ত গুণই পরিস্ফুট অথচ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তারা তফ্‌শিলভুক্ত বলে চিহ্নিত নয়। উদাহরণস্বরূপ মেদিনীপুর জেলার চিড়মার, গন্‌জু, কাকমারা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। খুব সম্ভব তাদের সংখ্যা কম এবং এমন কোন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ্ বা দলের নজরে তারা এখন পড়েনি। অনেক সময় অনেক গোষ্ঠীকে পরে তফ্‌শিল চিহ্নিত করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে কেবলমাত্র ৭টি গোষ্ঠীকে তফ্‌শিলভুক্ত-উপজাতি বলে গণ্য করা হয়েছিল। পরে রাজ্যের পুণর্বিন্যাসের ফলে এই গোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ে (Scheduled castes and Scheduled Tribe modification order, 1956)

একথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে উপজাতি গোষ্ঠী স্থান-কালের বন্দীদশা থেকে এখনও মুক্ত হতে পারেনি। তাই তাদের দিনচর্যায় পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের প্রভাব এমন ভাবে রয়েছে যে এর ফলে এদের জীবনযাত্রার অনেক ব্যতিক্রম সহজে নজরে পড়ে। আবার দীর্ঘদিন প্রতিবেশী পরিজনের নৈকট্য বা বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব এদের জীবনযাত্রা রীতি নীতিতে অনেক তারতম্য এনেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে মূলত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। কোন কোন গোষ্ঠী হয়ত দীর্ঘদিনের মধ্যে উপজাতিসুলভ বিনম্রতা কাটিয়ে

উঠেছে, কোন কোন গোষ্ঠী হয়ত হিন্দুয়ানির দিকে ঝুঁকে পড়েছে, এবং ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আমরা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে উপজাতিগুলিকে মূলত অর্থনৈতিক জীবনধারার সংগে সামঞ্জস্য রেখে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করার প্রয়াস পাবো। সেদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে—

১) শিকার-জীবী অরণ্যনির্ভর স্থাবর উপজাতি গোষ্ঠী
২) বন্য প্রথায় চাষে অভ্যস্ত পশুপালক (অস্থায়ী যাযাবর) উপজাতি গোষ্ঠী
৩) কৃষিকার্যে নির্ভরশীল উপজাতি গোষ্ঠী
৪) বিভিন্ন শিল্পাশ্রয়ী উপজাতি গোষ্ঠী।
৬) দেশান্তরী শ্রমজীবী উপজাতি গোষ্ঠী।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত উপমহাদেশের উপজাতিগুলিকে সংবিধানিক সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি ছিল সরকার তা দেওয়ার বদ্ধপরিকর এবং দীর্ঘদিনের সামাজিক অবহেলা থেকে তাদের মুক্ত করার জন্যও সচেষ্ট। এই পরিপ্রেক্ষিতে ও শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে উপজাতিগোষ্ঠীগুলি একদিন শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হয়ে অন্যান্য প্রতিবেশী বা পরিজনদের সাথে এক হয়ে ভারতের সুযোগ্য নাগরিক হয়ে দাঁড়াবে ও দীর্ঘদিনের অসামঞ্জস্যতাকে দূরে ঠেলে দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

॥ ২ ॥

যদিও উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে আমরা নানা পরিবেশে বসবাস করতে দেখি তবুও এই ঠিক অপেক্ষাকৃত ক্লিন্ন জংগলাকীর্ণ পরিবেশেই তাদের বেশীর ভাগকে দেখা যাবে যেখানে বর্তমান আগ্রাসী সভ্যতার ঢেউ পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারে নি। বর্তমানের মেদিনীপুরের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে এর পশ্চিমাংশের পরিবেশ পূর্বাঞ্চলের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কেননা পূর্বাঞ্চলে সমুদ্র বিধৌত তটভূমির সংলগ্ন নরম পলিমাটিতে গড়ে উঠা ভূখণ্ড ও বৃক্ষরাজির ধরণ পৃথক। আর পশ্চিমাংশ ছোটনাগপুরের ঢেউখেলান কাঁকুরে মাটির দেশে রয়েছে শাল পিয়াশাল কসুম বা আসনগাছের নিবিড়তা। এই অঞ্চলে বিশেষ করে কংসাবতীর তীরে বা বিনপুর থানার বেলপাহাড়ী অঞ্চলে আমরা নানাপ্রকার প্রস্তর যুগে ব্যবহৃত অমসৃণ

কখনও বা মসৃণ প্রস্তর নির্মিত আয়ুধ দেখতে পাই। তখন স্বাভাবিক ভাবে স্বীকার করা চলে যে আদিম প্রস্তর সভ্যতার ভিত্তি মেদিনীপুরের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে এককালে স্থাপিত হয়েছিল এই সকল অনগ্রসর তথাকথিত উপজাতি গোষ্ঠীই তাদের বংশধর। পরিবেশ পরিমণ্ডলের ধীর পরিবর্তন, নানাসংসর্গও সম্পর্ক হয়ত আদিম জীবন ধারার মন্থর স্রোতকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। তবুও বর্তমানের এই উপ-জাতিগুলির জীবনে আদিম জীবনাবদ্ধতা, প্রকৃতি নির্ভরতা বর্তমান — এদের দিনচর্যায় কথা কাহিনীতে, রীতি-নীতি কিংবা লোকগীতিতে সে সকলের নিদর্শন পাওয়া মোটেই কষ্টকর নয়।

বর্তমান মেদিনীপুরের বিরাট অংশ এককালে জংগলমহাল বলে পরিচিত ছিল। পরে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই জংগল মহালের কিছু অংশ বিহার, ওড়িশার সংগে যুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং জংগল মহলের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি বর্তমানে এই তিনটি রাজ্যে ছাড়িয়ে রয়েছে এবং তাদের আত্মীয়বন্ধন রাজনৈতিক সীমারেখার দ্বারা সীমিত নয়। যাইহোক, মেদিনীপুরে আয়তনের প্রধান তফশীলভুক্ত উপজাতি গোষ্ঠী হ'ল সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, খেড়িয়া, লোধা-শবর, ওরাঁও, কড়া, মহালি প্রভৃতি। তবে সাঁওতালদের সংখ্যা সবচাইতে বেশী। নিম্নের ছক থেকে উপজাতিদের একটি সংখ্যা জানা যাবে।

ছক ক

উপজাতি গোষ্ঠী ও জনসংখ্যা (১৯৬১)

ক্রমিক সংখ্যা	উপজাতিগোষ্ঠী	মোট জনসংখ্যা
১	ভূমিজ	২৭,১১৯
২	ভুটিয়া প্রভৃতি	১৪
৩	চাকমা	৩৬৬
৪	গারো	১
৫	হো	১০৬
৬	কড়া	১১,৪৪৯
৭	লোধা, খেড়িয়া	১১,২০৫
৮	মাগ্	৫
৯	মহালি	৫,৫৩৮
১০	মালপাহাড়িয়া	২,৪১৪
১১	ম্রু	১২৮

১২	মুন্ডা	১৬,৯৬০
১৩	মেচ্	২০৮
১৪	নাগেসিয়া	২
১৫	ওরাওঁ	৪,৫৮৮
১৬	রাভা	১৫২
১৭	সাঁওতাল	২৩৩,৭৯৮
১৮	শ্রেণী ভুক্ত নয় এমন	১৫,৬৮৪

উপরের ছকে দেখতে পাওয়া যাবে যে কিছু কিছু অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী মেদিনীপুর অঞ্চলে কর্মব্যপদেশে এসে পড়েছে। সাঁওতালদের আদিবাসভূমি মেদিনীপুর অঞ্চলের কোন এক পরগণা বলে অনেকের অভিমত। মুনড্া ও ওরাঁওরা ছোট-নাগপুরের পশ্চিমাংশ থেকে পূর্বাংশে চলে আসতে স্থুরু করেছে। কর্মের সংস্থানে অথবা অন্য কোন কারণে মেদিনীপুরের এই অঞ্চলকে ধীরে ধীরে তারা নিজ জন্মভূমি বলে মেনে নিয়েছে এবং বিহার বা ছোটনাগপুরের মুন্ডা উপজাতিগোষ্ঠীর সংগে তাদের মেলামেশার রেওয়াজও কমে গেছে। মেদিনীপুর অঞ্চলের গোপীবল্লভপুর, সাঁকরেল, নয়াগ্রাম অঞ্চলে মুণ্ডাদের বাস বেশী। নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ি, দাঁতন, ডেবরা অঞ্চলেও তাদের দেখতে পাওয়া যাবে। কড়া উপজাতি ঝাড়গ্রাম মহকুমা, সদর মহকুমার নারায়ণগড় ও কেশিয়াড়ি থানায় বাস করছে। লোধাদের দেখা যায় সমগ্র ঝাড়গ্রাম মহকুমায় আর সদর মহকুমার নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ি, খড়্গপুর, দাঁতন, ডেবরা, সবং প্রভৃতি থানায়। খেড়িয়াদের বিনপুর থানায় দেখা যায়। সবচাইতে আশ্চর্য যে আদমসুমারীর কর্তৃপক্ষ কেন যে খেড়িয়া ও লোধাদের এক সংগে মিলিয়ে পরিসংখ্যান তৈরী করেছেন তা আমাদের কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত লাগে; কেননা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ও বর্ণ বিশ্বাসে এই লোধাদের সংগে খেড়িয়াদের সম্পর্ক খুবই কম —বরং পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে গণ্য করা যুক্তিসঙ্গত। অতি অল্প সংখ্যক খেড়িয়া ঝড়গ্রাম মহকুমার বিনপুর থানায় বসবাস করলেও এদের পাওয়া যাবে ময়ুরভঞ্জ বা সিংভূম জেলায়। মহালিরা মেদিনীপুর সদর মহকুমার প্রায় সর্বত্র এবং ঝাড়গ্রাম মহকুমার প্রায় প্রতিটি থানায় বাস করে। সাঁওতালদের সংগে এদের কোন কোন বিষয়ে মিল আছে; যেমন ভাষা, টোটেম (Totem) বা গোত্র দেবতার বিশ্বাসে আর সামাজিক অনুশাসনে বা ধর্মবিশ্বাসের ধারায়। সেজন্য অনেকে এই মহালি গোষ্ঠীকে সাঁওতালদের এক বিশেষ গোষ্ঠী বলে অনুমান করে থাকেন। গ্রামাঞ্চলে আদিবাসীদের সংখ্যা কী রকম তার একটা হিসাব ১৯৭১

খৃষ্টাব্দের লোকগণনার রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। অবশ্য ঐ রিপোর্ট আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির পৃথক নামের কোন তালিকা নেই।

ছক খ

আদিবাসীর থানাওয়ারী সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা	থানার নাম	মোট জনসংখ্যা	আদিবাসী সংখ্যা
১	বিনপুর	১৯৩,০০০	৬৯,১৬৭
২	জাম্বনী	৬৮,৮৮৬	২০,৮৯১
৩	ঝাড়গ্রাম	১,১৯,৯৫৭	২৩,৯৩৬
৪	গোপীবল্লভপুর	১,২৬,৪৩৭	৩১,৭৮৮
৫	সাঁকরাইল	৬৭,৬১০	১৬,৩৫৮
৬	নয়াগ্রাম	৮২,২১৫	৩০,০৬৫
৭	মোহনপুর	৫৩,৩০১	২,০১৪
৮	দাঁতন	১,৬৯,২১১	১৯,৭১৭
৯	কেশিয়াড়ি	৭৬,৩৮৩	২১,৫৫০
১০	নারায়ণগড়	১৫৪,৭৮৭	৩১,২৩৮
১১	সবং	১৩২,৩০১	৭,০৩৪
১২	পিংলা	৯৫,২৬৯	৭,১০৭
১৩	খড়্গপুর	১৭০,৯৪৫	৩৪,৬৪২
১৪	খড়্গপুর টাউন	১৬১,২৫৭	২ ৮৯০
১৫	ডেবরা	১৫০,৫৪৪	২৬ ৪০৮
১৬	মেদিনীপুর	১৫৯,২৩২	১৭,০৮৮
১৭	কেশপুর	১৫৩,৫৯৪	৮,২৯৯
১৮	শালবনি	৯৮,৮৬০	১৬,১৯০
১৯	গড়বেতা	২৫৭,৪৪৩	৩৪.৭১৩
২০	চন্দ্রকোণা	১৫৬,৮৫১	৪,৮৬১
২১	ঘাটাল	১৪৯,৩৫৮	১,৭৫৫
২২	দাসপুর	২৩৭,৯৪৪	২,০৮১
২৩	পাঁশকুড়া	৩১০,৭৪১	৬,১৪৯
২৪	ময়না	১১১,৮৮৪	৯
২৫	তমলুক	২৩৬,৩৮৭	৪০৬
২৬	মহিষাদল	২২৪,০৫০	২৯৬
২৭	সুতাহাটা	১৬৫,৪৬২	৮৫৩

২৮	নন্দিগ্রাম	২৬১,৪০৪	৬১৮
২৯	ভগবানপুর	২১৭,২৮৪	৪৯
৩০	পটাশপুর	১৭২,৮৫৭	৯৩৩
৩১	এগরা	১৮৩,৬৭০	১,৭৫১
৩২	রামনগর	১৪৯,৯৫৫	৬১৫
৩৩	দীঘা	১৫,৩৯৮	৫৬
৩৪	কাঁথি	২৯০,০৫৩	১৬২
৩৫	খেজুরী	১৩৪,৭১৭	৪৭৪
	মোট সংখ্যা	২,০৩১,০৩৯	২০৮,৭৩৫

অতি প্রাচীনকাল থেকে এই সকল আদিম মানুষের গোষ্ঠী নানা কারণে তাদের বাসভূমি পরিত্যাগ করতো,—নতুন বাসস্থানের সন্ধানে তারা বের হতো। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই, ভূতপ্রেত বা অশরীরী শক্তির আনাগোনা, হিংস্র জন্তুর প্রাচুর্ভাব মড়ক বা আকস্মিক মৃত্যু, খাদ্য ও ভোগ্যবস্তুর স্বল্পতাই হ'ল প্রধান। সম্প্রতিকালে আমরা যেসব কারণে আদিবাসী গোষ্ঠীদের বাসস্থান ত্যাগ করতে দেখি তার মূলে রয়েছে জীবিকার সন্ধান। প্রকৃতি নির্ভর এই মানুষের দল জীবিকা বা কর্মসংস্থানের তাগিদে অন্যান্য সভ্য মানুষের গ্রামের কিনারে বসবাস সুরু করেছে। ডেবরা, নারায়ণগড়, সবং, কেশিয়াড়ি, খড়্গপুর প্রভৃতি থানায় আমরা এই রকমের ছোট গ্রামের নিদর্শন পাই। বিশেষভাবে ডেবরা, সবং অঞ্চলে বহু আদিবাসী 'নামাল' (migratory agricultural labour) নামে পরিচিত। চাষের সময় অথবা ধানকাটার সময় এই সকল গোষ্ঠীর লোকেরা দল বেঁধে অসমতল পাহাড়ী মাটির দেশ থেকে সমতল ভূমির দেশে 'নেমে' আসে; সংগে আত্মীয়স্বজন আর গৃহস্থালীর যৎসামান্য উপকরণ থাকে 'প্যাটরার' মধ্যে। দুএকবছর পরে যখন তারা দেখে যে তাদের নিজ বাসভূমির চাইতে এখানে কাজের নানা সুযোগ রয়েছে, আর প্রতিবেশী গোষ্ঠী অনেকটা সহানুভূতিশীল তখন তারা সেই গ্রামের কোন মজা পুকুরের পাড়ে, অথবা জংলা-ভাঙা জায়গায় নিজেদের আবাস তৈরী করে নেয়। তারপর আত্মীয়েরা ভীড় করতে থাকে। এইভাবে মেদিনীপুরের পূর্বাঞ্চলের থানাগুলিতে তাদের নতুন গ্রাম বা উপ-গ্রাম গড়ে উঠেছে। অবশ্য তাদের আদিবাসস্থানের গ্রাম থেকে এসব গ্রামের চেহারা আলাদা এবং গ্রামের গোষ্ঠী প্রশাসনতন্ত্র হয়ত অংকাংশে পরিবর্তিত। ধীরে ধীরে এরা এইসব অঞ্চলের বাসিন্দা বলে পরিচিত হয়। এই গ্রামগুলোকে আমরা উপ-গ্রাম (Satellite village) বলে অভিহিত করে থাকি।

॥ ৩ ॥

বাস্তব পটভূমিকায় বর্তমানের উপজাতিগোষ্ঠিগুলির অর্থনৈতিক কাঠামো লক্ষ্য করার মত। যদিও বাঁচার তাগিদ ও প্রকৃতি পরিমণ্ডলের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে অর্থ-নৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে তবুও দেখতে হবে প্রকৃতি নির্ভর এই গোষ্ঠিগুলি কেমনভাবে টিকে রয়েছে কেমনভাবে প্রতিবেশী পরিজনদের সাথে ঘটেছে তাদের অভিযোজন। পশ্চিম মেদিনীপুরের অরণ্য পটভূমিকায় যেসব গোষ্ঠি রয়েছে তাদের মধ্যে লোধা ও সাঁওতাল প্রধান। ঘরদোর বাঁধার সাজ সরঞ্জাম প্রকৃতি পরিবেশ থেকে সংগৃহীত হয়। তবুও লক্ষ্য করার মত যে সাঁওতালদের মাটির দেওয়াল দেওয়া চারচালা ঘরগুলি সাধারণভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেননা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা,দেওয়ালগুলোর বাইরের চাকচিক্যময় মনোহারিতা তাদের এক রুচির পরিচয় দেয়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে লোধাদের আবাস অত্যন্ত অপরিসর সংকীর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন। এরপর খেড়িয়া ও কোড়াদের । মুণ্ডাদের ঘরদোর একটু ভাল তবে কোন উপজাতির ঘরদোর সাঁওতালদের মত নয়। কোড়াদের কখনও কখনও গোলাকৃতি ঘর তৈরী করতে দেখা গেছে আর নানাবিধ পাতা দিয়ে তার ছাউনি তৈরী হয়েছে। প্রকৃতি নির্ভর এই উপজাতিগোষ্ঠিগুলি গ্রাম রচনা করার আগে অতিপ্রাকৃতশক্তিকে সন্তুষ্ট করার এক চেষ্টা পেয়েছে। তাই সাঁওতাল গ্রামে দেখা যাবে জাহেরস্থান, মাঝিস্থান, মুণ্ডাদের গ্রামে সারনা, লোধাদের গ্রামে বড়াম স্থান ইত্যাদি যেগুলি তাদের দেবতার পবিত্র আস্তানা। অবশ্য যখন একগোষ্ঠীকে বিভিন্ন বিরুদ্ধ পরিবেশে তার আদিম বাসস্থান ছেড়ে আসতে হয়, যখন নতুন করে গ্রামের পত্তনী করতে হয়, ঠিক সেই পরিবেশে তার বড়াম, সারনা পাওয়া কঠিন। তখন তারা যে কোন একটি পুরানো গাছের তলাকে দেবতার আস্তানা বলে গ্রহণ করে।

গ্রামে আসার জন্য নিজেরাই রাস্তা করে নেয়। তবে অন্যান্য উপজাতি অর্থাৎ আসাম অঞ্চলের উপজাতির মত তাদের গ্রাম গড়নের বৈচিত্র্য নাই। ছোট খাট ঘরগুলো যেন একত্রে ভীড় করে রয়েছে। ভূমিজ, মুণ্ডা বা লোধাদের জীবিকার অনুসন্ধানে অথবা অশরীরী শক্তির উৎপীড়নের ভয়ে তাদের পুরনো গ্রাম ছেড়ে নতুন গ্রাম পত্তন করতে দেখা গেছে। অবশ্য সরকারী আনুকূল্যে নতুন উপনিবেশগুলিতে বিশেষভাবে সাঁওতাল বা লোধাদের উপনিবেশে যে সব বাড়ীঘর তৈরী হয়েছে তাতে তাদের আদিম জীবনের ছাপ নেই। এই সব আদিবাসীরা রান্না করার জায়গায়

একটা উঁচু বেদীর মত রাখে—সেখানে বৎসরান্তে অথবা নবান্নের দিনে পূর্বপুরুষের আত্মার জন্য খাদ্যবস্তু উৎসর্গীকৃত হয়। মেদিনীপুরের এই উপজাতিগুলোর মধ্যে লোধা বা খেড়িয়াদের আর্থিক কাঠামো অপেক্ষাকৃত দারিদ্র জর্জর। লোধা বা খেড়িয়া গোষ্ঠী কৃষিমুখী গোষ্ঠী নয়। বনের ফলমূল, নানাবিধ শিকার বিশেষভাবে গোসাপ, পাখি ইত্যাদি সংগ্রহ এদের প্রধান কাজ। তূলো, ধূনো, কেন্দগাছের পাতা, অন্যান্য সাপের চামড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করে মহাজনদের কাছে বেচে দিয়ে তার বদলে চাল বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করে নেয়। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ বা ওরাঁওরা কৃষিজীবীগোষ্ঠী। যে কোন পতিত বা ডাঙ্গা জমিকে অতি সযত্নে পরিষ্কার করে নিয়ে চাষের উপযোগী করে তোলে এবং পরে সেগুলো ভাল ধানীজমিতে রূপান্তরিত করে। লোধাদের মধ্যে যারা মেদিনীপুরের পূর্বাঞ্চলে বিশেষভাবে কেশিয়াড়ি, নারায়ণগড়, দাঁতন, সবং, ডেবরা প্রভৃতি থানায় এসেছে তাদের অনেকে কিছু কিছু চাষের ধানীজমি সংগ্রহ করে সাবেকী ভাবে চাষ করার চেষ্টা পেয়েছে। তবে তাদের কৃষি বা গোপালনে তেমন বেশী উৎসাহ নেই। সরকারী প্রচেষ্টায় যেখানে তাদের জন্য ধানীজমি সংগৃহীত হয়েছে সেখানে তারা সেসব জমি নিজেরা চাষ না করে অন্যকে দিয়ে বর্গাচাষীর মত চাষ সুরু করেছে। আর তারা দিন মজুরী করে জীবিকার সংস্থান করছে। তার প্রধান কারণ হ'ল নিজ জমিতে চাষবাস বা আবাদ করতে গেলে যে পরিমাণ মূলধন দরকার তা সংকুলান করতে পারেনি অথবা তাদের চাষের যন্ত্রপাতি বা বলদ নাই। সেজন্য তাদের কৃষিমজুরী করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। মহালি উপজাতি বাঁশের কাজ করে। ঐ বাঁশের কাজের মধ্যে ঝুড়িই হ'ল প্রধান। বর্তমানে মেদিনীপুরে পানের চাষ অত্যন্ত বেড়েছে এবং পানের ব্যবসায়ীরা মহালিদের তৈরী ঝুড়ি কিনে থাকে। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে সপ্তাহে একদিন হাট বসে। বহুদূর হতে এরা হাঁটতে হাঁটতে হাটে আসে। নিজেদের তৈরী জিনিসপত্র বাজারে বিক্রী করে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করে। অনেক আদিবাসী অঞ্চলে বছরে বিভিন্ন সময় মেলা বসে। এই মেলায় তারা দৈনন্দিন জীবনের দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে উৎসাহী হয বেশী।

প্রকৃতি নির্ভর এই গোষ্ঠীগুলি আর প্রকৃতির দাবির উপর নির্ভর করতে পারছেনা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সরকারী জংগল আইন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের জীবিকার নতুন সংস্থান হওয়া দরকার। তাই তাদের তথাকথিত জীবনযাত্রার বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। পরিসংখ্যানে ও দেখা গেছে বর্তমানের বেশীর ভাগ আদিবাসী বছরে ২০০ দিন

পুরা কাজ করার সুযোগ পায় না। সেইজন্য এদের অর্থনৈতিক কাঠামো এত দুর্বল। যদিও স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে তারা কাজে অংশ গ্রহণ করে তবুও তাদের জীবনে অনিশ্চয়তার মেঘ জমে উঠেছে।

অবশ্য বর্তমানে সরকারী প্রচেষ্টায় রেল লাইন তৈরী, সড়ক নির্মাণে তারা ঘরের বাইরে এসেছে। হয়ত তাদের কেউ নিজের গ্রাম ছেড়ে চিরকালের জন্য বাইরে চলে এসেছে বাঁচার তাগিদে। এই বাইরের টানে তাদের চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে এবং এ পরিবর্তন অতি স্বাভাবিক। বিশেষভাবে বাইরের লোকের সংগে নানাবিধ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় তাদের জীবনাদর্শ ও বিশ্ব-জগত সম্পর্কে ধারণা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। এবং এই পরিবর্তন অতি স্বাভাবিক।

॥ ৪ ॥

সমাজের গঠন বৈচিত্র্য অনুযায়ী যে কোন সমাজকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয় ১) পিতৃকেন্দ্রিক বা পিতৃপ্রধান (Patriarchate) (২) আর মাতৃ কেন্দ্রিক বা মাতৃপ্রধান (Matriarchate)। পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের কর্তৃত্ব থাকে, বংশ বা পদবীর ধারা পুরুষের বা পিতার নিকট হতে পুত্রের উপর বর্তায়, বিবাহের পর স্বামীর বাড়ীতে স্ত্রী ঘরকন্না করার জন্য আসে। আর মাতৃকেন্দ্রিক সমাজে নারীই হ'ল পরিবার বা সমাজের কর্ত্রী। বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার মাতার নিকট হতে কন্যা এবং বিহাহের পর স্বামীর বাড়ীতে না গিয়ে স্বামীরাই স্ত্রীর পিতৃগৃহে এসে থাকে। এক কথায় আমাদের সমাজের ঠিক বিপরীত। এরকম মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাসিয়া বা গারোদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। অন্যান্য উপজাতি পিতৃকেন্দ্রিক।

প্রত্যেক সমাজের একধরণের বিশেষ কাঠামো লক্ষ্য করা যায় যার মাধ্যমে সামাজিক অনুশাসন বা ভাবধারা নিগূঢ়ভাবে সুসংবদ্ধ থাকে। প্রত্যেকটি উপজাতি অন্য গোষ্ঠী থেকে নিজেদের পৃথক করে নেয়। যেমন সাঁওতালরা নিজদিগকে 'হুড়' (মানুষ) মুন্ডারা 'হড়কো' বলে ভাবে অর্থাৎ অন্য গোষ্ঠী থেকে তারা নিজ দিগকে সহজে পৃথক করে নেয়। সেজন্য অপর গোষ্ঠীকে তারা 'দিকু' বলে। লোধারা সাঁওতাল, মুণ্ডা, কড়া, ভূমিজ প্রভৃতিকে 'আদিবাসী' আর বর্ণহিন্দুদের 'বাঙালী' বলে অভিহিত করে। এইভাবে এক গোষ্ঠীর সাথে অপর গোষ্ঠীর পার্থক্য

সহজে নজরে পড়ে।

প্রত্যেক সমাজ কতকগুলি 'কুল' (Clan) এ বিভক্ত। এই কুল অনেকটা হিন্দুদের গোত্রের মত। তবে তফাৎ এই হিন্দুদের গোত্রগুলোর নাম হয়েছে মুনি-ঋষিদের নাম থেকে আর আদিবাসী বা উপজাতিদের কুলের নাম হয়েছে কোন জীবজন্তু, গাছপালা, জ্যোতিষ্ক ইত্যাদি নৈসর্গিক বস্তুনিচয় থেকে। হিন্দুদের গোত্র হ'ল কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য ইত্যাদি। ঠিক তেমনি সাঁওতালদের হেমরম, হাঁসদা, ব্যসরা, টুডু; লোধাদের কোটাল, ভক্তা, লায়েক, পরামাণিক; মুণ্ডাদের চাণ্ডিল, টাও; ওরাঁওদের লাকরা ইত্যাদি। মহালিদের কুল-নাম সাঁওতালদের মত বলে অনেকের ধারণা অতীতে হয়তো সাঁওতাল ও মহালি এক গোষ্ঠি ছিল। প্রত্যেকটি 'কুলের' একটি করে 'কুল দেবতা' (Totem) রয়েছে। সেই কুলদেবতা এক একটি বিষয় বস্তু বা প্রকৃতিনিচয়ের অঙ্গ বলে তাকেই তারা শ্রদ্ধা বা ভক্তি জানায়। এমন কী সে সব যদি কোন ভক্ষ্য বস্তু হয় তবে সেই কুলদেবতাকে ঐ দলের লোকজন অতি সযত্নে পরিহার করে। যেমন হাঁসদা কুলের লোকেরা হাঁসকে তাদের কুলের দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা জানায়। ভক্তা গোত্রের লোকেরা জংগলে এক রকম আলু ('চিরকা') পাওয়া যায় তারই সাথে কুলদেবতার আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে ভেবে তারা কিছুতেই ঐ আলু (yam) খাবে না। মুণ্ডাদের 'টাও' হ'ল একরকম পাখি বিশেষ। এই পাখিকে তারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। ওরাঁওদের কাছে 'লারকা' অর্থাৎ 'বাঘ' হল কৌলিক দেবতা। এই সকল গোষ্ঠির লোকেরা নানা রকম কিংবদন্তী ও বা অলৌকিক কাহিনীর মাধ্যমে তাদের এই সম্পর্কের ইতিহাসকে অতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। এই কাহিনী হল কুলের মধ্যে আত্মীয়তাকে নিবিড় করার মত মন্ত্রের মত। সাধারণতঃ একই কুলে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। কেননা তাদের মতে এক কৌলিক দেবতা থেকে সেই কুলের উদ্ভব হয়েছে। কুলদেবতাকে পূজা বা পূর্বপুরুষের আত্মাকে পূজার মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন রীতিনীতির উদ্ভব হয়েছে। হিন্দু সমাজেও সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।

মেদিনীপুর জেলায় মুণ্ডাদের সমাজে আরও এক বিশেষ সামাজিক বিভাগ দেখা যায়। সেগুলি বংশ (Lineage) নামে পরিচিত। সেই বংশে রয়েছে অনেকগুলি 'পাতাভাই' (Sub-lineage) মুণ্ডারা কিন্তু এই 'বংশে' বিবাহ করে না। বিবাহ করার জন্য তাদের অন্য 'বংশে'র প্রয়োজন। তাদের ধারণা সুদূর কোন অতীতে হয়ত একজন নারীকে অনেকে পর পর বিবাহ করেছে। সেই বংশের

নাম হয়েছে ঐ নারীর নাম থেকে আর সেই নারী তার স্বামীর মৃত্যুর পর অথবা স্বামীকে পরিত্যাগ করে অন্য যতজন পুরুষকে বিবাহ করে তখন ঐ সকল পুরুষদের নামে পাতাভাইর নামকরণ হয়েছে। সুতরাং বংশের মাধ্যমে এক রক্ত সম্পর্ক বা আত্মীয়তার নৈকট্য থাকার জন্য একই বংশে বিবাহ সর্বতোভাবে পরিহার করা হয়। পরোক্ষভাবে তারা কোথাও কোথাও একই গোত্রে বিবাহ করে। মোটকথা উপজাতি সমাজের কাঠামো নিয়ে আলোচনা করলে জানা যাবে বেশীর ভাগ সমাজের মধ্যে রয়েছে গোত্র বা কুল (clan)। এই কুলই হল তাদের আত্মিক বন্ধনের দৃঢ় সূত্র। এরপর রয়েছে পরিবার। পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পিতাকে কেন্দ্র করে পরিবার গড়ে উঠে। অনেক সময় 'একান্নবর্তী যৌথ' পরিবার দেখা যায় তাতে বৃদ্ধ পিতামাতার সাথে তার বিবাহিত পুত্র বা পৌত্রাদি বসবাস করে। তবে অভাবক্লিষ্ট পরিবেশে একান্নবর্তী পরিবারের জৌলুষ কম। বেশীর ভাগ উপজাতি পরিবার গুলির কাঠামো হলো আত্মকেন্দ্রিক সরল পরিবার (Simple family) যেখানে স্বামীস্ত্রী ও তার অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা থাকে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিধবা মা, বা বৃদ্ধ পিতা অথবা অবিবাহিত ভাই ভগিনীকেও ঐ সকল পরিবারের সংগে একত্রে বসবাস করতে দেখা যায়। পরিবারের জীবন যাত্রায় ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ভাবে সকলের যৌথ দয়িত্ব থাকে এবং পরিবারের মধ্যে সাহচর্য ও সহানুভূতি লক্ষণীয়। এই পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধনের আর এক বহিপ্রকাশ পূর্ব-পুরুষ পূজা (Ancestor worship) বিশেষভাবে সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধারা বৎসরের বিশেষ এক সময়ে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে ফলমূল নিবেদন করে। আবার সাঁওতাল বা মুণ্ডারা সাধারণত পিতামহ মাতামহ এর নামানুসারে পৌত্র দৌহিত্রদের নামকরণ করে থাকে।

প্রায় প্রতিটি আদিবাসী সমাজে পরিণত বয়সে বিবাহ করার বিধি রয়েছে। অবশ্য অনেক জায়গায় হিন্দুদের সংস্পর্শে আসার জন্য তারা অপেক্ষাকৃত কম বয়সে বিবাহ করতে চেষ্টা পায়। বিবাহ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উপজাতির বিচিত্র রীতি প্রচলিত। সাঁওতালদের বিবাহে দুটি প্রধান অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত বিবাহের পাত্রকে কন্যাপক্ষের লোক কোলে তুলে নেয় আর কন্যার কপালে সিন্দুর দেয়। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। বহু প্রচলিত বিবাহের মধ্যে 'সাদা বাপলা' উল্লেখযোগ্য। এই বিবাহে বরকন্যার অভিভাবক পরস্পরের বাড়ী

গিয়ে ঘর পছন্দ করে থাকে। কখনও বা ঘটকের মাধ্যমে দিন ঠিক হয়। বিয়ের দিনে কন্যাপণ মিটিয়ে দিতে হয়। গ্রামের 'যগ মাঝি' গ্রামমান্য হিসাবে টাকা পায়। যখন বরকন্যা পরস্পরকে ভালবেসে বিবাহ করে তাকে 'অরইতুৎ' বলা হয়। ঐ সময় বর, কন্যার কপালে সিন্দুর দেয় ও তার হাত ধরে টানে। এই রকম বিয়েতে অনেক সময় নানা গোলযোগ ঘটে। কখনও কনের বাড়ীর লোকজন চড়াও হয়ে বরকে প্রহার দেয়। পরে গ্রামের মাতব্বরদের চেষ্টায় একটা নিষ্পত্তি হয় আর কনের বাবা পণটাকা হিসাবে কিছু মান্য পায়। সাঁওতাল সমাজে 'ঞির বল' নামে অদ্ভুত ধরণের বিয়ের রীতি প্রচলিত রয়েছে। এই বিয়েতে মেয়েটি কোন পাত্রকে পছন্দ করলে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। যদি তার আপত্তি থাকে তখন পাত্রীটি একরকম জলুম করে বরের বাড়ীতে হাজির হয়। আর অত্যন্ত গরীব সাঁওতালেরা 'টুংকি দিপিল বাপলা' অনুষ্ঠান করে। তাতে কেবল কন্যার কপালে সিন্দূর দেওয়া হয় মাত্র, অনুষ্ঠানের অন্য কোন জলুষ নাই। ওরাঁও সমাজে বিবাহের সাধারণ নিয়ম অনুসারে বরপক্ষকে কন্যার বাবদ পণ টাকা দিতে হয়। বিয়ের সময় বর বা কনেকে যে কোন গাছের সাথে বিয়ে করতে হয়। তারপর অন্যান্য রীতি রয়েছে। এ ছাড়া এদের সমাজে বিধবা বৌদিকে ছোট ভাই বিয়ে করে থাকে। খেড়িয়াদের বিয়ের রীতি অনেকটা ওরাঁওদের মত। যদিও 'ড্যাতম' বা ঘটক বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে ও দিন ঠিক করে থাকে। এদেরও কনে পণ দিতে হয়। বিয়ের দিন মুরগী বলি দিতে হয়; মুণ্ডা বা 'হো' সমাজেও ড্যাতমের মাধ্যমে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে থাকে তারপর কনেপণ। এর জন্য নগদ টাকা দিতে হয়। লোধা সমাজে বিয়ের জন্য কনেপণ দিতে হয়। এখন পণ টাকার পরিমাণ বেড়েছে। মেয়ে সোমত্ত হলে বিয়ের বাসরে বর কন্যাকে ফুল দেখায়। কেউ কেউ যখন পণ টাকা যোগাড় করতে পারে না তখন নামমাত্র পণ টাকা অর্থাৎ গ্রামমান্য হিসাবে ১·২৫ পয়সা দিয়ে 'সাঙা' করে। এদের বিবাহে বিচ্ছেদের কোন নিয়ম নেই। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ী থেকে পালিয়ে যায় বা স্বামীর বাড়ী যেতে অস্বীকার করে।

উপজাতি সমাজের এই বিবাহে কতকগুলো অনুশাসন লক্ষ্য করার মত। প্রথমতঃ তারা নানা তুকতাকের মধ্য দিয়ে ঠিক করে নেয় কোন বিবাহ বা মিলন শুভ। এছাড়া বিবাহযাত্রার আগে নানা রকমের অদ্ভুত রীতি নীতি মেনে চলে। তারপর কন্যাপক্ষকে তার মূল্য হিসাবে পণ টাকা দিতে হবে এবং এটা কন্যার অভি-

ভাবক তার প্রাপ্য হিসাবে নিয়ে থাকে। বিয়ের সময় পূর্বপুরুষের আত্মাকে এবং গ্রাম দেবতাদের সন্তুষ্ট করার বিধান রয়েছে। এককথায় এখনও তাদের যে আদিমতম বিশ্বাস তার সম্পূর্ণ বিলীন হয় নি। অবশ্য মেদিনীপুরে যে সকল সাঁওতাল, মুণ্ডা, মহালি বা কড়া খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের অনেকে সনাতন উপজাতি প্রথায় আর বিশ্বাস করছে না।

এই প্রসঙ্গে উপজাতি সমাজের ধর্ম বিশ্বাস প্রণিধানযোগ্য। কেননা পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের সংগে অভিযোজন করতে গিয়ে তাদের ধর্মবিশ্বাসের বিচিত্র দিক লক্ষ্য করা গেছে। স্বাভাবিক ভাবে আদি মানুষ যখন তার বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা দিয়ে কোন ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারতোনা তখন তারা অতিপ্রাকৃত বা অশরীরী শক্তিকে ঐ সকলের জন্য দায়ী করতো। তারা ভাবতো মানুষ নানা কারণে অতি-প্রাকৃত শক্তি বা অশরীরী শক্তির রোষে যখন পড়ে তখন তার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে ও জীবন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়। এই ভাবে সকল উপজাতি গোষ্ঠীর মনের মণিকোঠায় অতিপ্রাকৃত শক্তিনিচয়ের নানা প্রতিফলন রয়েছে। সাঁওতালরা 'মারাং বুরু' বা পাহাড়ের দেবতাকে বিশেষ ভাবে পূজা করে। 'জাহর এড়া' বা 'মঁড়েক'কেও সন্তুষ্ট করার চেষ্টা পায়। মুণ্ডাদের প্রধান দেবতা হ'ল 'সিং বোঙা'। এছাড়া নানা গ্রামের দেব দেবী রয়েছেন, বছরের বিভিন্ন সময়ে তাদের পূজা দিতে হয়। কখনও বা মুরগী ও পাঁঠা বলি দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করতে হয়। লোধাদের গ্রামের দেবতা 'বড়াম' বা 'গরাম'। আসলে বড়াম বনের দেবতা। বড়ামের জন্য বছরে দুতিনবার পূজা হয়, মুরগী ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। তাদের ধারণা বড়াম কোন কারণে ক্রুদ্ধ হলে গ্রামে নানা রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হবে। লোধারা চণ্ডী, শীতলা প্রভৃতি দেবীরও পূজা করে থাকে। এদের প্রত্যেকের পূজার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে এবং পূজক রয়েছে। ওরাঁওদের গ্রামের দেবতা থাকেন 'সারনা'তে। সারনা হল কুঞ্জ,—পুরনো গাছের তলাই হ'ল সারনা। অবশ্য সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা প্রত্যেক উপজাতিই যে কোন একটা গাছের তলাকে তাদের দেবতার আস্তানা বলে ধরে নেয়। ওরাঁওরা সারনা বুড়ী ছাড়া, সূর্যঠাকুর, চণ্ডী মহাদানিয়া প্রভৃতি শক্তিকে সন্তুষ্ট করে থাকে। পূজা পদ্ধতির জন্য তাদের নিজেদের সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছে। যারা এ বিষয়ে বিশারদ সমাজে তাদের পৃথক স্থান রয়েছে। প্রত্যেক সমাজের কিছু না কিছু উৎসব রয়েছে। এই উৎসবগুলি বছরের বিভিন্ন সময়ে ছড়িয়ে রয়েছে। উৎসবগুলির অনেকগুলি অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার সংগে জড়িত। অনেক আদিবাসী ফাল্গুন মাস

থেকে বছরের প্রথম গণনা করে। কেননা ঐ সময় গাছে নতুন পাতা হয়। ঐ পাতা বা ফুল তারা খায়। তাই ফাল্গুন মাসে 'সারহুল' পরব ওরাঁও সমাজে প্রচলিত। সাঁওতালরা ঐ সময় 'বাহা' পরব করে থাকে। তিনদিন অথবা পাঁচদিন ধরে এই উৎসব চলে। লোধারা চৈত্র সংক্রান্তিতে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে নতুন ফল নিবেদন করে ও উৎসব করে থাকে। আষাঢ় মাসে শ্রাবণ মাসে যখন নতুন ধান গাছ রোয়া হয় অথবা বোনা ধানের ক্ষেতে হাল দিয়ে 'কাড়ান' করা হয় তখন যথেষ্ট কম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উৎসবকে তারা 'যাগেল' পরব বলে থাকে। আবার আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে স্থানীয় কৃষিজীবী লোকদের সাথে অনেক উপজাতি 'নল' সংক্রান্তি করে থাকে। নল সংক্রান্তিতে ধানের গাছকে 'সাধ' ভক্ষণ করার আয়োজন আছে। মুণ্ডা, ওরাঁও প্রভৃতিরা ভাদ্রমাসের পার্শ্ব একাদশীতে করম ঠাকুরের পূজা করে। করম গাছের ডাল নিয়ে পূজার সূচনা। করম পরবের দিন অংকুরিত শস্যকে একটা বাঁশের ঝুড়িতে করে গ্রামের মেয়েরা মাতব্বরের বাড়ীতে নিয়ে যায়। সেখানে তারা নাচগান করে। সেই নাচগানের মাধ্যমে গ্রামের মেয়েরা তাদের বাপের বাড়ীতে আসে। করমের গানের অনেক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, সমাজের নানা ভালমন্দ, ঘটনা বা কিংবদন্তীকে কেন্দ্র করে, কখনও বা হিন্দুদের পৌরাণিক আখ্যানের ঠাকুর দেবতার বিক্ষিপ্ত কাহিনীও দেখা যায়। কার্তিক মাসের দীপালি পরবের সময় গো-বন্দনা বা 'গোঠ্ বঙ্গা' পূজা হয়। ঐ সময় গরুমহিষকে পূজা করা হয়। কখনও বা মহাদেবের উদ্দেশ্যে দুধ বা ছাগল/মুরগী নিবেদন করা হয়। মেদিনীপুরের অন্যান্য কৃষিজীবীগোষ্ঠী বিশেষভাবে মহাতোরা এই 'বন্দনা' পরবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীও তাতে যোগ দেয়। মোটকথা পশ্চিম মেদিনীপুরে এই উৎসব অন্যান্য লোক উৎসবের মত আঞ্চলিক। জাতি উপজাতির বৈষম্যের ব্যবধান সংকুচিত হয়, মানুষ মানুষের প্রাণের আরও কাছে আসে। গো বন্দনার মাধ্যমে গৃহপালিত পশুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানান হয়। এখানের অন্যতম লোক উৎসব 'টুসু'। এই টুসু যদিও মানভূম অঞ্চলের প্রধান লোক উৎসব হিসাবে পরিগণিত তবুও মেদিনীপুরের উপজাতি সম্প্রদায়ের কাছে এর আকর্ষণ কম নয়। এই উৎসব পৌষ সংক্রান্তিতে উদ্‌যাপিত হয়। কখনও বড়াম পূজা এর সংগে জড়িত। মেদিনীপুর শহরের পুরনো গাছের তলায় বড়ামের মাথা তৈরী করে উৎসব করা হয়। যাইহোক টুসু উৎসব কিন্তু পুতুলকে কেন্দ্র করে। বছরের এই সময়টিতে প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষের বাড়ীতে কিছুনা কিছু ধান চালের অভাব থাকে

না। এই পরিপূর্ণতার আনন্দে সহজ সরল অনাড়ম্বর মানুষগুলি বিহ্বল হয়ে যায়। মনে জাগে প্রাণ প্রাচুর্যের উন্মাদনা। তাই মেয়েদের নাচে ও গানে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো আলোড়িত হতে থাকে। পরের দিন 'টুসু' অর্থাৎ মাটির ছোট মূর্তি-গুলোকে যে কোন জলাশয়ে বা খাল নালায় বিসর্জন দেয়া হয়ে থাকে। এমনিভাবে মেদিনীপুর অঞ্চলের উপজাতি গোষ্ঠীদের উৎসবগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে স্থানীয় ভাব ও আঞ্চলিক ভাষায় কেমন যেন উদ্বেল হয়ে রয়েছে। এ সকল উৎসবের মাধ্যমে দুঃখকষ্টে ভেঙে পড়া মেহনতি মানুষগুলো তাদের দুঃখকষ্টকে ভুলে যায়, কখনও বা পচা ভাতের হাড়িয়া বা মহুল ফুলের মদ খেয়ে নিজদিগকে আরও সতেজ বা প্রাণবন্ত করে নেয়। এই সকল লোক উৎসবের গানের মধ্যেও আমরা অনেক সময় হিন্দু বা পৌরাণিক দেব-দেবীর আসন পাতা দেখতে পাই। হয়ত ধীরে ধীরে হিন্দুয়ানীর (Hinduisation)প্রভাব এদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আসছে। লোধাদের উৎসবে 'চাঙু' বাজে। চাঙু হ'ল বড় রকমের খঞ্জনী। খেড়িয়াদেরও রয়েছে চাঙু। এই চাঙুকে খড় পুড়িয়ে গরম করলে চামড়ায় টান পড়ে। তখন তাতে ঠিক রকমের আওয়াজ বের হয়। লোধারা চাঙু বাজিয়ে নানারকম 'বার-মাসি' গান করে যেটা অন্যান্য উপজাতির মধ্যে দেখা যায় না। মুণ্ডা, ওরাঁও, মহালি, সাঁওতালদের মধ্যে মাদল, ধামসা-রয়েছে। এছাড়া তাদের বাঁশীও আছে। মহালি বা সাঁওতালরা নাচের সময় নানাভাবে সাজে। তাদের নিজেদের ভাষায় বেশীর ভাগ গানগুলো তৈরী।

প্রত্যেকটি উপজাতির নিজেদের সমাজশাসন পদ্ধতি রয়েছে। এককালে যখন অন্যান্য মানুষের সংগে তাদের সম্পর্ক কম ছিল সেই কাঠামো অনুযায়ী তাদের সমাজ বা দেশ পরিচালিত হত। এখন তারা বৃহত্তর সমাজের এক অংশ, বৃহত্তর অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার সংগে তারা সংশ্লিষ্ট। তবুও এদের সমাজ শাসনতন্ত্র (Political System) লক্ষ্য করার মত। সাঁওতালদের গ্রামের প্রধানকে 'মাঝি' বলা হয়। গ্রামের সকল রকম উৎসবে সেই কর্তৃত্ব করে থাকে। মাঝিকে নিষ্কর জমি চাষের জন্য দেয়া হত। এখন আর সে সব নেই। মাঝি যদি কোন কারণে গ্রামের লোকের বিশ্বাস হারায় তবে আবার নতুন করে মাঝি নির্বাচন করা হয়। মাঝির সহকারীর নাম 'পারানিক'। পারানিক অনেকটা মন্ত্রণাদাতার মত—মাঝির অবর্তমানে মাঝির কাজ করা তার প্রধান কাজ। এদের সহকারীর নাম 'যগমাঝি'। গ্রামের অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের দিকে তাকে লক্ষ্য রাখতে

হয়। অথবা নাচগানের আয়োজন তাকেই করতে হয়। ডাকহাঁকের জন্য রয়েছে 'গোড়াইৎ'। মাঝির উর্ধতন মালিক হ'ল 'পরগনাইৎ'। অনেকগুলো গ্রাম নিয়ে পরগণা হয়। গ্রামের ভালমন্দ বা এক গ্রামের সংগে অন্যগ্রামের বাদবিসম্বাদ হলে পরগণাইৎ বিচারের আসর ডাকে। অনেক সময় সমাজগত ভাবে যদি তারা বিক্ষুব্ধ হয় তখন সমবেতভাবে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। ওরাঁওদের গ্রামের প্রধানের উপাধি হ'ল 'মহাতো'। আগের দিনে জমিদারের লোকের সংগে যোগাযোগ করে তাকে গ্রাম পরিচালন করতে হত। দেবদেবীর পূজার জন্য রয়েছে 'পাহাণ' বা 'বাইগা'। পাহানকে সাহায্য করার জন্য রয়েছে 'পূজার' বা 'পান ভারা'। 'পাহান', 'পূজার' বা 'মহাতো' গ্রামের এই সকল কাজের জন্য নিষ্কর জমি পেত। ভূমিজ বা লোধা এবং খেড়িয়াদের পূজা করার পুরোহিতের নাম 'দেহেরী' বা 'দেউড়ী'। তাদের সাহায্য করার জন্য রয়েছে 'আটঘরিয়া', ডাক হাকের জন্য রয়েছে 'ডাকুয়া'। গ্রামের প্রধানকে 'মুখিয়া' বলা হয়। এখন গ্রামের এই অনুশাসন অনেকটা আল্‌গা হয়ে গেছে। গ্রামের লোকজন কোন কারণে বিক্ষুব্ধ হলে আর তাদের প্রধান বা মুখিয়াকে জানায় না। কখনও বা থানায় কখনও বা কোর্টের আশ্রয় নেয়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে যারা নানা বিষয়ে পরামর্শ বা উৎসাহ দিয়ে থাকে। এইভাবে স্বাধীনতা লাভের পর এদের সমাজ-শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামসভায় অন্যান্য প্রাণকেন্দ্রকেরসাথে তারাও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে।

॥ ৫ ॥

বর্তমানের উপজাতিগুলিকে আমরা যেভাবে দেখছি শতাব্দীর ব্যবধানে এরা ঠিক এরকম ছিল না। বিরুদ্ধ পরিবেশ ও আঞ্চলিক দুর্গমতা যেমন একে অপরকে অনেকটা দূরে রেখেছিল, আবার অন্যদিকে তাদের মধ্যে জনসংখ্যার অল্পতা ও ভাষার দুর্বোধ্যতা পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। কালক্রমে বহিরাগত স্থাবর আর্যগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশে উপজাতি গোষ্ঠীগুলির জীবনে এল পরিবর্তন। অবশ্য এ পরিবর্তন সর্বত্র সমানভাবে ঘটেনি। ধীরে ধীরে আর্যীকরণ (Aryanisation) বা সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ (Acculturation) ঘটতে থাকে। প্রাচীন শাস্ত্রে বা পুরাণে এই সকল আর্যপূর্ব গোষ্ঠীগুলিকে 'ব্যাধ', 'শবর' 'কিরাত', 'দস্যু' বা 'নিষাদ'

রূপে পরিচিত হতে দেখি। মুসলমান রাজত্বে এদের মধ্যে ধর্মান্তরনের এমন বিশেষ নজির নেই। তবে বৃটিশ রাজত্বে এর এমন কী স্বাধীনতা লাভের পরও মেদিনীপুরের নানা জায়গায় উপজাতি গোষ্ঠীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হতে দেখা যায়। আবার সভ্য-মানুষের সংস্পর্শ এই নিরীহ মানুষগুলোকে প্রতিবাদ মুখর করে তুলেছিল। এদের সহজ-সরল জীবনের সুযোগ নিয়ে তথাকথিত সরকার অথবা ভদ্রবেশী প্রতিবেশী যেখানে তাদের উপর শোষণ অথবা অত্যাচার চালাবার চেষ্টা হয়েছে কালক্রমে সেখানে বিদ্রোহের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। এই উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর রুদ্ধ গর্জনের প্রতিধ্বনি ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৭খৃঃ), চুয়াড় বা লায়েক (১৭৭৩-১৮৩২) হাঙ্গামা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা লাভের পর সংবিধানের ৪৬ অনুচ্ছেদে এই সকল পিছিয়ে পড়া (Weaker Section) গোষ্ঠী-গুলিকে নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় রাজ্য উপদেষ্টা পরিষদ (Tribes Advisory Committee) রয়েছে। ঠিক মেদিনীপুর জেলায়ও জেলা উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। সাধারণত উপজাতি জনপ্রতিনিধিরাই এর সদস্য। এই উপদেষ্টা কমিটি নানা উন্নয়ন পরিকল্পনার সুপারিশ করে থাকেন। স্বাধীনতা লাভের পঁচিশ বছরের পর উপজাতি জীবনযাত্রা নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মেদিনীপুরের উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর জীবন ধারার এমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। দীর্ঘদিনের অস্বাচ্ছন্দ্য ও দারিদ্র্য, জীবন সংগ্রামের ব্যর্থতা, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনও সাধারণ মানুষের আরও অংশ গ্রহণের চেষ্টা, পরিবর্তিত মূল্যবোধ, জীবনাদর্শের পরিধির প্রসারতা সবকিছু মিলে পশ্চিম বাংলার নানাস্থানে বিশেষভাবে মেদিনীপুর জেলার উপজাতি অধ্যুষিত ডেবরা বা গোপী-বল্লভপুর অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ পায়। বিভিন্নস্থানে উপজাতি গোষ্ঠীগুলি সংবিধানিক উপায়ে নানাভাবে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করার চেষ্টা পায়, সাঁওতাল মহাসম্মেলন, মুণ্ডাসেবক সমাজ, লোধাশবর সম্মেলন হ'ল এসবের উদাহরণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'ঝাড়খন্দ' পার্টির আবির্ভাব ও উপজাতি মানসিকতার এক মূর্ত প্রতীক। এছাড়া সাঁওতালদের ভাষার দাবীও নানাভাবে পরিস্ফুট।

॥ ৬ ॥

স্বাধীনতালাভের পর সংবিধানের ধারানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যৌথ-

ভাবে এইউপজাতি মানুষগুলির উন্নয়নকল্পে সরকারের 'কল্যাণ বিভাগে'র মাধ্যমে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রকল্প নেয়। তার মধ্যে লোধাশবর ও খেড়িয়াদের জন্য কয়েকটি উপনিবেশ গড়ে তোলার প্রয়াস রয়েছে। কেননা লোধাশবর বা খেড়িয়াদের 'বিমুক্ত জাতি' (denotified community) বলে ঘোষিত করা হয় (১৯৫২ খৃঃ)। তার পূর্বে এদের অপরাধপ্রবণ জাতি (Criminal Tribe) বলে গণ্য করা হত। এই পরিকল্পনায় এদের আদর্শগৃহী হিসাবে গড়ে তোলার ইচ্ছায় পরিবার পিছু ১৫০০ টাকা ব্যয়ে নানাবিধ সুযোগ অর্থাৎ গৃহ নির্মাণ, চাষের জমি, বলদ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, ছাগল, মুরগী দেওয়ার ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। এই উদ্দেশ্যে লোধাদের জন্য ঝাড়গ্রামের অনতিদূরে আউলিগেড়িয়ায় বঙ্গীয় হরিজন সেবক সংঘের মাধ্যমে একটি উপনিবেশ, পুকুরিয়ায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে একটি উপনিবেশ গড়ে উঠে। এছাড়া বিনপুরে সরকারী প্রচেষ্টায় খেড়িয়া উপনিবেশ সম্পূর্ণ ব্যর্থতার স্বাক্ষর বহন করে। কেশিয়াড়ি থানায় হরিজন সেবাকেন্দ্রের প্রচেষ্টায় কুকাই উপনিবেশ সমাজ সেবক সংঘের প্রচেষ্টায় নারায়ণগড় থানায় ডহরপুর (বিদিশা) গ্রামে ও বিনপুরে ধানশোলা উপনিবেশ গড়ে উঠে। সাঁওতালদের জন্য 'ছোটনাগদোনা ডুমুরিয়া'তে একটি সরকারী পরিচালনে বিরাট উপনিবেশ গড়ে উঠে। কিন্তু সরকারী প্রকল্পগুলিতে পরিকল্পনার ত্রুটি ও অনেকস্থলে সরকারী অফিসারদের সহানুভূতির অভাবই এই সকল প্রকল্পগুলিকে ঠিকমত সার্থকধর্মী করার অন্তরায় রয়েছে। মেদিনীপুরের বহু উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কূয়া খুঁড়ে দেওয়া, সমবায়ের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক জীবনকে আর দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে এবং মুনাফাখোর ব্যক্তিদের কবল থেকে এদের রক্ষা করার জন্য সমবায় শস্যভাণ্ডার (Co-operative grain gola) গড়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও এই সকল শস্যভাণ্ডার ব্যর্থতার নিদর্শন হয়ে রয়েছে। এরপর কোন কোন স্থলে কৃষিজীবী উপজাতিদের জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কোথাও বা সরকারী চেষ্টায় এদের বলদ বা ছাগল কিনে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে উপজাতি মানুষগুলোকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চাইতে একরকম ভিক্ষুক শ্রেণীতে পর্যবসিত করা বয়েছে বলে অনেকের অনুমান। কেননা অর্থনৈতিক পুনর্বাসন বা পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের চেষ্টা করতে হবে কীভাবে তারা বৃহত্তর অর্থনৈতিক জীবনের সংগী বা একাংগী হতে পারে, কীভাবে তারা সমাজের দূরে সরে না থেকে অন্যান্য প্রতিবেশী মানুষের আরও নিকটে আসবে। মোটকথা কল্যাণবিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে কল্যাণ কামনার চেষ্টা না থাকলে

কোন প্রকল্পকে সার্থকধর্মীকরা যেতে পারে না। এছাড়া এদের মধ্য থেকে উপজাতি মানসিকতার নিরসন হওয়া যেমন দরকার তেমনি প্রতিবেশী পরিজনকে সামাজিক অবহেলা না করার জন্য ও নতুন মানসিকতার অনুশীলন করা দরকার। সকলের প্রচেষ্টায় হয়ত এই পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী আমাদের আরও নিকটে বন্ধু হিসাবে দাঁড়াতে পারবে। সরকারী উদ্যমে এদের ছাত্রছাত্রীদের পড়ার নানা সুযোগ দেয়া হয়েছে। এর ফলে বহু উপজাতি ছাত্রছাত্রী বর্তমানের শিক্ষা নেবার সুযোগ পেয়ে নানারকম সরকারী কাজে নিজদিগকে নিয়োজিত করতে পেরেছে। সরকারী প্রচেষ্টায় আশ্রম ছাত্রাবাস গড়ে তোলা হয়েছে। সেরকম কয়েকটি ছাত্রাবাস মেদিনীপুরের নানা-জায়গায় রয়েছে। এছাড়া বেলপাহাড়ীতে উপজাতি কল্যাণ বিভাগের পরিচালনায় একটি সরকারী বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রীদের আবাসগৃহ গড়ে তোলা হয়েছে। বহু উপজাতি ছেলেমেয়েদের সেখানে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছে এটাও আমাদের কম আনন্দের কথা নয়। এই শিক্ষার প্রভাবে তাদের মনকে বৃহত্তর সমাজের সংগে যুক্ত করে দেয়া সম্ভব। মোটকথা আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে যে এই সকল উপজাতি সমাজ দীর্ঘদিন পিছিয়ে রয়েছে। আমরা প্রতিবেশী পরিজন এদের প্রতি অত্যন্ত অনুদার দৃষ্টি নিয়ে দেখেছি। সকলের সমবেত চেষ্টায় ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে তারা একদিন বাস্তবিকই নতুন ভারত গড়ে তুলবে ও আমাদের বলিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসাবে পরিগণিত হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটলে এদের যে নিজস্ব সামাজিক কাঠামো রয়েছে তারও পরিবর্তন ঘটবে এবং সেই পরিবর্তনে এদের মানসিকতার পরিবর্তন আসতে বাধ্য। কোথাও বা পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত পরিবর্তন কোথাও অন্যান্য পরিবর্তনের স্রোতে আপন গতিতে পরিবর্তন। এই আপন গতিতে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক উপজাতি উদ্ভূত (Tribal derivative) গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় দেখতে পাই তারা ধীরে ধীরে হিন্দুয়ানীর দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ রাজ-বংশীদের উল্লেখ করা যেতে পারে। কেননা তারা এখন উপজাতি থেকে জাতিতে রূপান্তরিত। লোধাশবর বা ভূমিজরা নিজভাষা হারিয়ে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের ভাষা ও ভাবধারার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এইভাবে আমরা একদিকে অতি স্বাভাবিক ভাবে উপজাতি চরিত্রের নানা পরিবর্তন (detribalisation) দেখতে পাই। যেমন মুণ্ডারা স্থানীয় বৈষ্ণব বা পতিত ব্রাহ্মণদের নিয়ে সমাজের নানা ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করতে চেষ্টা পেয়েছে। অর্থাৎ তাদের মনে বৃহত্তর হিন্দু সমাজ একটি আদর্শ

(model বা reference) হয়েছে। আবার অন্যদিকে অন্যান্য বর্ণহিন্দুরা পর্যন্ত নানা কারণে বিশেষভাবে ঐন্দ্রজালিক কার্যকলাপ বা 'তুকতাক' বা যাদুর জন্য উপজাতি সমাজের বিশারদের নিকট হাজির হয়। সাপের 'গুনীন', ভূত ছাড়ান 'ওঝা' উপজাতি সমাজে বেশী এবং প্রতিবেশী অন্যান্য গোষ্ঠীরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ওদের দোরগোড়ায় হাজির হয়। আবার অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বিশেষ-ভাবে বিশ্বস্ত শ্রমজীবী মানুষ হিসাবে প্রতিবেশী সমাজে উপজাতি মানুষের প্রয়োজন অনেকের কাছে রয়েছে। এইভাবে তাদের উপরও প্রতিবেশী মানুষ নির্ভরশীল। এখন এই পারস্পরিক নির্ভরতা যদি বিভেদের অনৈক্যকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে তবে বলিষ্ঠ সমাজ গড়ে উঠবে। আমাদের প্রতিটি মানুষকে এমনিভাবে সামাজিক সমন্বয়ের (integration) কথা ভাবতে হবে। মোটকথা চিন্তা ও ভাবনার ক্ষেত্রে যদি আমরা বৈষম্যকে দূরে সরাতে পারি, তবে বলিষ্ঠ সমাজ গড়ে উঠবে।

অন্যদিকে আবার উপজাতিগোষ্ঠী বা উপজাতি উদ্ভূত গোষ্ঠীগুলির অনেকে পুনরায় তফ্‌শিলভুক্ত (Scheduled) হিসাবে চিহ্নিত হতে চায়। তার প্রধান কারণ সরকারী সাহায্য ও অনুদান। ফলে তাদের মানসিকতা এই উপজাতি-সুলভতা (Secondary tribalisation) প্রবল। আমাদের সেদিকে যথার্থ চিন্তা করতে হবে যাতে এই মানসিকতার উন্মাদনা যেন তাদের আচ্ছন্ন না করে। অপর পক্ষে সরকারকে সর্বস্তরের দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষকে জীবনে প্রতিষ্ঠা হবার দায়িত্ব নিতে হবে।

স্নধীর চক্রবর্তী

বাংলার লোকধর্ম ও লোকসংগীত

খাঁটি লোকসংগীতের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা হ'ল, অকৃত্রিম সরল পল্লীমানস থেকে উৎসারিত একপ্রকার গীতরীতি, যা ধুয়ো (Refrain) প্রধান, দেশজ সুরস্পন্দে ও একতালে গঠিত এবং গভীর আকুতিপূর্ণ ভাবে মণ্ডিত। জর্জিয়ান, স্কটিশ, জর্মনীয় প্রভৃতি খ্যাতিসম্পন্ন লোকসংগীতের ভাববস্তু বিশ্লেষণ ক'রে কোন জটিল, নিগূঢ় বা দুর্বোধ্য প্রসঙ্গ পাওয়া যায়নি অথচ দেশদেশান্তরে বহুকাল ধ'রে প্রচলিত লোক-সংগীতের সুরের উপাদান ও বয়নে বেশ মিল পাওয়া গেছে। বস্তুত পাশ্চাত্যদেশে চিরায়ত লোকসংগীতের যে নবমূল্যায়ন ঘটছে তা Theme এর চেয়ে Tune-এর প্রতি বেশী আগ্রহশীল। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ১৭৯২ সালে জনৈক জর্জ টমসন প্রখ্যাত কবি রবার্ট বার্নস্‌কে দিয়ে কয়েকশো স্কটিশ লোকসংগীতের সুরে কথা বানিয়ে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ স্কটিশ লোকসংগীতের সুর তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, গানের মূল বাণী তথা ভাবকে বর্জন ক'রে তিনি সুরকে নতুন ক'রে চালু করেছিলেন বার্নস্‌এর কবিত্বের সঙ্গে জুড়ে। বাংলার লোকসংগীতে এর বিপরীত দিকটাই স্পষ্ট। আমরা সুরের জন্য গানের মূল বাণীকে কখনই বিসর্জন দিতে পারি না। 'আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে' গগন হরকরার এই প্রসিদ্ধ বাউলগানের সুরটুকু আগাগোড়া অবিকৃত রেখে রবীন্দ্রনাথ বুনে দিয়েছেন তাঁর অসাধারণ বাণীলাবণ্য 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। দুটো গানের Thematic

পার্থক্য দুস্তর। কোথায় বাউলের একক নিঃসঙ্গ হৃদয় বেদনার আর্ত ব্যাকুলতা আর কোথায় রূপাঢ্য স্বদেশ গরিমার সার্বিক মূর্তি! গগন হরকরার গান আজও নিঃসঙ্গ বাউলের একতারায় বেজে চলেছে আর রবীন্দ্রনাথের গানটির পরিণতি ঘটেছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম্মেলক জাতীয় সংগীতরূপে। বর্তমান নিবন্ধের মূল প্রসঙ্গে এই সূত্রে আমরা এসে পৌছালাম। অর্থাৎ, বাংলা লোকসংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার ভাবের গৌরবে, সুর-তাল-ছন্দ তার অলংকার মাত্র। বাংলা লোক-সংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল গানের শেষে রচয়িতার ভণিতা যা আন্তর্জাতিক লোকসংগীতে নেই। অজানা কবির লিখিত বাণীতে ছন্দোময় সুরের চমক, এই হ'ল খাঁটি লোকসংগীতের চরিত্রলক্ষণ, যার থেকে বাংলা লোকসংগীত প্রথম থেকেই নতুন পথের পদাতিক।

বিশেষভাবে বাংলার লোকসংগীত কেন ভণিতাযুক্ত ও ভাবপ্রধান তার কারণ নির্ণয় করতে গেলে হাজার বছরের বাংলা কবিতা ও গানের ইতিহাসকে মনে রাখতে হবে। চর্যাপদ, বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলী, উনিশ শতকের প্রেম সংগীত, ফিকিরচাঁদের ও লালশশীর গান প্রভৃতি সবই তৎকালীন পল্লীভিত্তিক বাংলার মানসকুসুম। একটু সূক্ষ্ম বিচারে ধরা পড়ে, বাংলার লোকসংগীতের প্রতিবেশও স্বতন্ত্র কোন ভূমিখণ্ড নয়। লালন শাহ্, পাঞ্জ শাহ্, দুদ্দু, গোঁসাই গোপাল, কুবির গোঁসাই, হাউড়ে বা যাদুবিন্দু তাঁদের গান বানাবার সময় চিরকালীন বাংলা সৃজনধর্মের ভাবপ্রাধান্যকে উপেক্ষা করেননি। সেই জন্যই এঁদের গানে রূপক অলংকারের এত বর্ণাঢ্য বিস্তার। উদাহরণস্বরূপ কুবির গোঁসাইয়ের পদ লক্ষণীয় :

আবাদ কর চোদ্দ পোয়া জমি লয়ে
থাকো রে মন
খাটো কৃষাণ হ'য়ে॥
মন রে জোড়ো ধর্ম-হাল প্রবর্তক-ফাল
সাধক মুড়ায় সিদ্ধ-ইষ লাগাইয়ে॥
জোড়ান দিয়ে রিপুর স্কন্ধে
লাঙ্গল জোড়ো সাবন্ধে বেয়ে যাও প্রেমানন্দে
অনুরাগ—পাঁচনি লয়ে॥
মন রে কর ভক্তি-চাষ
উঠাও বিঘ্ন-ঘাস
জমি সমান করো ধৈর্য মইয়ে॥

এই গানের রূপ-রীতিতে বাংলা দেহতত্ত্বের গানের চিরন্তন ঐতিহ্য মিশে আছে। উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে এই যে প্রাকৃত জীবনের রূপককে গীতকার টেনে এনেছেন তারমধ্যে রয়েছে বাঙালীর নিজস্ব ভাবুকতা। বহির্জগৎ ও অন্তরাত্মার মিলনসুখের গভীর সত্য বা তত্ত্বকথা চিরকালের বাঙালী কবি ও গীতকারের উপজীব্য। বাঙালী লোকগীতকাররাও সেই ঐতিহ্যের ধারক। দেহ-তরী, দেহ-তরু, মন-মাঝি, দশেন্দ্রিয়, ছয়রিপু, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, রূপসাগর, মনের মানুষ প্রভৃতি রূপক ও প্রতীক বানাতে বাঙালী লোকগীতকার যেমন দক্ষ, শ্রোতারাও তেমনই নিপুণ ভাবগ্রাহী। অথচ তুলনামূলকভাবে উত্তর ভারতের কাজরী, সাবন, ঝুলন, হোরী বা চৈতী প্রভৃতি জনপ্রিয় লৌকিক গানে ভাবের গভীরতা ও রূপক-প্রবণতা নিতান্ত ক্ষীণ। বস্তুত, বাঙালীর মন নিতান্ত বাস্তবকে অতিক্রম ক'রে ভাবুকতার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে উৎসাহী। সেইজন্যই অন্যদেশের মত তাৎক্ষণিক প্রসঙ্গ ও তরল ভাব নিয়ে বাংলা লোকসংগীতের কায়াগঠন হয়নি। ভাদু, টুসু, বদঁ বা বোলান গানের সাময়িক প্রসঙ্গ মনে রেখেও আমরা বলতে পারি যে, খাঁটি বাংলা লোকসংগীত তত্ত্বনির্ভর, ভাবগভীর, দ্ব্যর্থবহুল, ও রূপকমণ্ডিত। এর কারণ বাংলা লোকসংগীতগুলির রচনার প্রত্যক্ষ উৎসভূমি হ'ল বাংলার বিচিত্র ও প্রাণবন্ত লৌকিক ধর্মগুলি। সিলেট অঞ্চলের মইষাল বন্ধুর গান বা আসাম উপত্যকার মাহুতবন্ধুর গান জাতীয় নিতান্ত আঞ্চলিক গানগুলি বাদ দিলে বাংলার লোকসংগীতের বিপুলসংখ্যক ভাবময় গানকে (যা সাধারণভাবে 'বাউল' নামক সামান্য লক্ষণে ভ্রান্তভাবে অভিহিত) বিশ্লেষণ করতে হ'লে চৈতন্যোত্তর বাংলা লোকধর্মের উৎসের বৃত্তে পৌছাতে হবে।

॥ ২ ॥

বস্তুত বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের এক ইতিহাস না লেখা পর্যন্ত অনভিজাত গ্রামকেন্দ্রিক সাধারণ মানুষের শতাব্দীবাহিত ধর্মাচরণের মূলসূত্রটি মিলবে না। নানা কারণে বাংলা লোকধর্মের উদ্ভব ও বিস্তৃতির এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রণয়নযোগ্য। বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস প্রণেতারা শ্রীচৈতন্যদেবকে বাঙালীর ধর্মমুক্তির ভগীরথরূপে নির্দেশিত করলেও সেই ধর্ম সমন্বয়ের প্রবল বেগ কিভাবে গ্রামীণ ধর্মকে জাগরিত করেছে তার বিবরণ উপস্থিত করেন নি।

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থে বাংলার যাবতীয় উপধর্মগুলিকে 'বাউল' নামের সাধারণ সংজ্ঞায় টেনে নিয়েছেন। ফলত, তাঁর মতে পশ্চিম বাংলার বাউলদের দুটি শ্রেণী। এক, রাঢ়ের বাউল; দুই, নবদ্বীপের বাউল।

আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু ভিন্ন। বাংলার লোকধর্মের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শাখা (যেমনঃ কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলরামী) আদপেই বাউল মতাবলম্বী নয় এবং পোষাক পরিচ্ছদেও তাঁরা স্বতন্ত্র। আলখাল্লা, কেশবিন্যাস, তিলকধারণ প্রভৃতির বদলে তাঁরা গৃহস্থের মত সাধারণ পোষাকধারী। চাষবাসে উৎসাহী। সামাজিক জীবনের শরিক। এঁদের ধর্মাচরণে বাহ্যিক আড়ম্বরের চেয়ে 'গোপ্ত' (অর্থাৎ গুপ্ত) সাধনা অধিক প্রচলিত। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মকেন্দ্রে এঁদের সাম্বৎসরিক যাতায়াত এবং বছরের বাকি সময় সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে গুরুপাটে অথবা স্বগৃহে নিজস্ব গুহ্যসাধনা অব্যাহতভাবে চলে। সেই কারণে এঁদের স্বতন্ত্রভাবে বাউলদের মত চিহ্নিত করা মুস্কিল। তাছাড়া, এইসব সম্প্রদায় ক্রমাগ্রসর আধুনিক সভ্যতার চাপে ও উচ্চবর্ণের প্রভাবে বিলীয়মান হয়ে আসছে। তবু শ্রীচৈতন্য-প্রভাবিত বাংলার বিচিত্র লোকধর্মের সজীব প্রবাহের সত্য ইতিহাস এই সব ক্ষীণায়ু ধর্মসম্প্রদায়ের দরিদ্র ও ভীরু গ্রামীণ ধর্মগুরুর সংসর্গে পরিস্ফুট হয়। হাতে-লেখা নানা পুস্তিকা ও বিচিত্র ভাষায় বিরচিত মন্ত্রতন্ত্র, আয়ুর্বেদ বিধি, কবচ নির্ণয়ের মধ্যে বাংলার ব্রাহ্মণেতর নানা সম্প্রদায়ের সবল জীবনযাপনের সুতীব্র সরসতা আমাদের নাড়া দেয়।

বিশেষভাবে নদীয়া জেলাতেই আউলেচাঁদ প্রতিষ্ঠিত কর্তাভজা সম্প্রদায়, সাহেবধনী প্রতিষ্ঠিত সাহেবধনী বা দীনদয়ালের ঘর, বলরাম হাড়ী প্রবর্তিত বলরামী-গোষ্ঠী, খুশী বিশ্বাসের নামে খুশীবিশ্বাসী সম্প্রদায় এবং লালন শাহ্ প্রবর্তিত লালন শাহী মত—এমন পাঁচটি প্রবল লোকধর্ম কিভাবে উদ্ভূত হ'ল তার কারণ অনুসন্ধান-যোগ্য। বস্তুত বাংলার ধর্মসাধনা ও সমাজবিপ্লবের ভিত্তিমূল নদীয়ার মাটিতে প্রোথিত এবং তার বীজাঙ্কুর নবদ্বীপে প্রথম শাখায়িত হয়। বাংলার আদি ইতিহাসে গৌড়ের পতনের পর নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে বাংলা সংস্কৃতির নবরূপ গড়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তীকালে নবদ্বীপ সংস্কৃত শাস্ত্র ও ন্যায়চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়। রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণসেনের প্রবর্তনায় যে বুধমণ্ডলী বিশুদ্ধ ভক্তি ও জ্ঞান মার্গের চর্যা করতেন মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলজীর আক্রমণে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গঙ্গাতীরবর্তী নদীয়ার কয়েকটি গ্রামে (বামুনপুকুর, বেলপুকুর, মুড়াগাছা, ধর্মদহ,

বিল্বগ্রাম, দেবগ্রাম ও কালীগঞ্জ) আত্মগোপন ক'রে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রাখেন। নদীয়ার জাতিবর্ণসংক্রান্ত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এই জেলা অব্রাহ্মণ প্রধান। প্রধানত বৈশ্য ও শূদ্র সম্প্রদায় নিয়ে এখানকার জনসমষ্টি গড়ে উঠেছে। অথচ উল্লিখিত সাতটি গ্রাম এখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণপ্রধান ও শাক্তধর্মে উদ্‌বুদ্ধ।

বিগত পাঁচশত বছরে নবদ্বীপকে কেন্দ্র ক'রে নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, নব্যতন্ত্র ও নব্যভক্তিবাদের এক অভূতপূর্ব সঙ্গমে সামগ্রিকভাবে বাঙ্গালীর ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির সত্য স্বরূপ নির্ণীত হয়েছে। নব্যন্যায়ের ক্ষেত্রে বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন প্রভৃতি শতাধিক পণ্ডিত চিরস্মরণীয়। বাংলার নব্যস্মৃতিশাস্ত্রে স্মার্ত রঘুনন্দনের নাম পূর্বাচার্য হিসাবে স্বীকৃত। বাঙ্গালীর দীর্ঘ জীবিত তন্ত্রসাধনার নবরূপকার 'তন্ত্রসার' প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (বর্তমানে বাংলার সর্বত্রপূজিত' কালীমূর্তি এঁরই পরিকল্পিত) নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন বলে অনুমিত হয়। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য নব্যভক্তিবাদের প্রবক্তা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব তথ্য। একদিকে ব্রাহ্মণের সমাজশাসন আরেক দিকে মুসলমানদের অত্যাচার থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্য শ্রীচৈতন্য উদার মানবধর্ম প্রচার করেন যার নামান্তর বৈষ্ণবধর্ম। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মুক্তিদূতরূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। নদীয়া তথা বাংলার লোকধর্মের উৎস সন্ধানে শ্রীচৈতন্যের পরিকল্পিত উদার ধর্মমত ব্যাপকভাবে খুঁজে পাই।

শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটকালে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব দেন। নিত্যানন্দ ও তাঁর পুত্র বীরভদ্র বহু ভ্রষ্ট ও পলাতক বৌদ্ধকে বৈষ্ণবধর্মের উদার ছত্রতলে আশ্রয় দেন। এই নিয়ে অদ্বৈতের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ হয়। শেষপর্যন্ত অদ্বৈত সমর্থিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম মূলত শান্তিপুরে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়; পক্ষান্তরে উদার বৈষ্ণবতার সার্বজনীন প্রসার সারা বাংলার অনুন্নত, মুমূর্ষু ও অবজ্ঞাত নানা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। হতমান মানবতার এই জ্যোতির্ময়োৎসবে শ্রীচৈতন্য হয়ে ওঠেন মুক্তিদূত ও ত্রাতার সাধারণ প্রতীক। সাধারণ মানুষের এই নবোন্মাদনা ও বিপুল উৎসবে নানা ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায়ের বিচিত্র বিশ্বাস ও আচার কালে কালে বৈষ্ণবধর্মে সংযুক্ত হয়ে যায়। এই সার্বিক সমীকরণের তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় বৈষ্ণবধর্মে অনুপ্রবেশ করে তন্ত্রসাধনা, বিকৃত বৌদ্ধবাদ, নাথপন্থের গুরুবাদ ও সহজিয়াধর্মের যৌন-যোগাচার। সহজিয়ারা বৈষ্ণবশাস্ত্রের গোপীভাবে সাধনার বিরোধিতা ক'রে নরনারীর মিথুনাত্মক (কৃষ্ণরাধার নামাশ্রয়ে) এক প্রত্যক্ষ

দেহবাদী সাধনা প্রবর্তন করেন। এই সাধনায়, 'The worshipper is to think of himself as Krishna and is to realise within himself the passion of Krishna for Radha, who is represented by the female companion of his worship. Through sexual passion salvation is to be found. The Radha-Krishna stories are held as the justification of their practice, which are secret and held at night.'১

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের অপ্রাকৃত কৃষ্ণরাধার বৃন্দাবনলীলা অতএব লৌকিক ধর্মকে স্বতন্ত্র পথচারী করল। লৌকিক ধর্ম সাধকরা কৃষ্ণরাধাকে তাঁদের কায়াসাধনার ভিত্তিমূলে আদর্শরূপে স্থাপন করলেন। প্রসঙ্গত তাঁরা সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করলেন নিত্যানন্দ, বীরভদ্র ও রায় রামানন্দকে এবং সর্বোপরি শ্রীচৈতন্য গৃহীত হলেন এই সব লোকধর্মের সর্বস্বীকৃত দিশারীরূপে। কারণ এঁদের 'জনশ্রুতি জাত ধারণা স্বয়ং চৈতন্যদেবের একটি গুহ্য সাধন প্রণালী ছিল। এই সাধনা ছিল পরকীয়া মৈথুনাত্মক।'

পরবর্তীকালে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউলেচাঁদকে চৈতন্যের অবতার-রূপে নির্দিষ্ট ক'রে এঁরা প্রচার করেন, 'চৈতন্যদেব স্বয়ং আউলেচাঁদরূপে পুনরাবির্ভূত হয়ে এই সাধন প্রণালী সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন।'২

নদীয়া জেলার চাকদহ থানার অন্তর্গত ঘোষপাড়ায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনপীঠ। আউলেচাঁদ উলা, ঘোলাডুবলি প্রভৃতি গ্রামকে দীক্ষিত ক'রে অবশেষে ঘোষপাড়ায় প্রেরিত শিষ্য রামশরণ পালকে খুঁজে পান।৩ রামশরণ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, জাতিতে সদ্‌গোপ। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ধনী নামে মুসলমান নারী মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে আবির্ভূত হন। পরে শালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত গ্রামে সাহেবধনী সম্প্রদায় উদ্‌ভূত হয়। এঁদের শ্রীপাট চাপড়া থানার অন্তর্গত বৃত্তিহুদাগ্রাম। সম্প্রদায় সংগঠকের নাম চরণ পাল, জাতিতে গোপ। খুশী বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ভাগাগ্রামে। খুশী বিশ্বাস জাতিতে মুসলমান। বলরামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলরামচন্দ্র নদীয়া জেলার মেহেরপুর নিবাসী, জাতিতে হাড়ী। লালন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক লালন শাহ্ নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়া থানার অন্তর্গত সেঁউরিয়া গ্রামে আখড়া বেঁধেছিলেন, তিনি ধর্মান্তরিত মুসলমান। এই তালিকা থেকে নদীয়া জেলার লোকধর্মের সূচনা ও বিকাশে ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের সুস্পষ্ট প্রাধান্য ও নেতৃত্বের চিত্র স্বতঃস্ফুট। শুধু শ্রীচৈতন্য পদস্পর্শ এর কারণ নয়;

তার সঙ্গে জেলার জনসমষ্টির সাধারণ চারিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। এই জেলার প্রধান অধিবাসীরা হলেন মাহিষ্য সম্প্রদায়, গোপ, সদ্গোপ, মুসলমান (প্রধানত মাহিষ্য সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত), কর্মকার, জোলা, যুগী, তাঁতি, প্রামাণিক ও অন্যান্য। বিগত দুই তিনশো বছরব্যাপী নদীয়ার অভিজাত শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব ধর্মের তীব্র প্রতিস্পর্ধীরূপে এইসব লোকধর্ম প্রধানত গ্রামকে ঘিরে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলার পণ্ডিতমণ্ডলী প্রধানত নগরকেন্দ্রিক অভিজাত শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব ধর্মের ইতিহাস প্রণয়ন করতে গিয়ে গ্রামে-গাঁথা লোকধর্মের প্রবল পরাক্রম ও সত্য-মূল্য যাচাই করেন নি। তা করতে পারলে আমাদের বৈষ্ণব ও শাক্ত পদসাহিত্যের সমান্তরালে বাংলার লোকধর্মবাহিত লোকসাহিত্যের এক স্বতন্ত্র গীতিশাখার রূপ উন্মোচন হ'ত! সেই পরিপ্রেক্ষিতে লালন শাহ্, পাঞ্জ শাহ্, লালশশী, কুবির গোঁসাই, যাদুবিন্দু প্রভৃতির গান যথার্থরূপে প্রতিভাত হ'ত। বাউল গানের অস্পষ্ট ও সাধারণ সংজ্ঞায় সীমিত থাকত না।

॥ ৩ ॥

ধর্মাদর্শগত সংঘাত, সংগ্রাম এবং তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া ও বৈপরীত্য নদীয়া জেলায় যেমন প্রত্যক্ষ তেমনই রোমাঞ্চকর। নবদ্বীপ-শান্তিপুরে বৈষ্ণব রসসাধনার চূড়ান্তরূপ দেখা যায়। সেখানকার পাড়ায় পাড়ায় বৈষ্ণবতীর্থ ও রসনিকুঞ্জ। নবদ্বীপের অদূরে অগ্রদ্বীপ বৈষ্ণবতীর্থ। চৈত্রমাসের বারুণীমেলায় এখানে জয়দেব-কেঁদুলীর মত বিপুল জনসমাগম ঘটে। শান্তিপুর ও নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণের রাসের উৎসব ভারতবিখ্যাত। এছাড়া নদীয়ার বিভিন্ন অংশে রাসযাত্রা ও স্নানযাত্রা লোকপ্রিয়। প্রসিদ্ধতমগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : চৈত্রমাসে কৃষ্ণনগরে বারদোল, কৃষ্ণগঞ্জের অন্তর্গত দিগম্বরপুরের স্নানযাত্রা, নাকাশীপাড়ার অন্তর্গত গোটপাড়ার স্নানযাত্রা। এছাড়া কালীগঞ্জের মহুরা, তেহট্টে কৃষ্ণরায়ের রাস, করিমপুরের মুরুটিয়া, চাকদার যশড়া, আড়ংঘাটার যুগল কিশোরের রাস ও শান্তিপুরের বাবলার রাসও প্রসিদ্ধ।

নদীয়ার ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এলাকায় শক্তিসাধনার বাহুল্য লক্ষণীয়। বামুন-পুকুর, বেলপুকুর, বিল্বগ্রাম ও কালীগঞ্জে কালীপূজার রাতে ঘরে ঘরে শক্তিসাধনা হয়। এছাড়া আঞ্চলিক শক্তিদেবীর বিবিধ পূজার তালিকার মূল্যবান। এই পর্যায়ে

উল্লেখযোগ্য কালীগঞ্জের অন্তর্গত জুড়নপুরের কালী, কৃষ্ণনগরের সিদ্ধেশ্বরী ও আনন্দময়ী, নবদ্বীপের 'পোড়া মা' বা বিদগ্ধজননী, বিল্বগ্রামের বিলেশ্বরী দেবী, মুড়াগাছায় সর্বমঙ্গলা ,বড়চাঁদ ঘরের যশদায়িনী, বীরনগরের উলাইচণ্ডী, যশড়ার বুড়ো মা, কালীগঞ্জের রাজরাজেশ্বরী ও বাগআঁচড়ার বাগ্দেবী। নবদ্বীপে বৈষ্ণব রাসযাত্রার জনপ্রিয়তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অজস্র শক্তিমূর্তি রাসযাত্রার দিন পূজিত হয়। শক্তি-পূজার ক্ষেত্রে অন্যতর উদাহরণ কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রীপূজা, যার পরিকল্পক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং। নদীয়া জেলায় শৈবপ্রভাব তুলনামূলকভাবে ক্ষীণ। নবদ্বীপের নিকটে সুবর্ণবিহার বৌদ্ধপ্রভাবের ক্ষীণসূত্র বহন করছে। এছাড়া 'নবদ্বীপে প্রাচীন মূর্তিগুলির মধ্যে যুগনাথ শিব, পারডাঙ্গার শিব, দণ্ডপাণি শিব প্রভৃতি বৌদ্ধ ভাবান্বিত।'[৪]

নদীয়া জেলার অভিজাত ধর্মসাধনার পাশাপাশি লৌকিক দেবদেবী ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের পরিচয় উন্মোচন করা প্রয়োজন। পঞ্চানন্দের পূজা এ জেলায় দুইস্থানে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত হরিশপুরে এবং নাকাশীপাড়ার বেকোয়াইল গ্রামে। অম্বুবাচীর পর্ব বসে কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত আশাননগরে, কৃষ্ণগঞ্জের খাটুরায় এবং নাকাশীপাড়ার সাহেবতলায়। মনসাপূজার প্রধান কেন্দ্র চাকদহের অন্তর্গত জলকর মথুরাপুরে, চাকদহে, মথুরাগাছিতে ও নাকাশীপাড়ার ব্রাহ্মণীতলায়।

বস্তুত, নদীয়া জেলার লোকধর্মের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় হিন্দুমুসলমান যৌথ সাধনার ক্ষেত্রে। নদীয়ার প্রসিদ্ধ পীরতলাগুলির সংখ্যাবাহুল্যে এই বিস্ময়কর সত্যের আভাস মেলে। উদাহরণত উল্লেখযোগ্য ঃ নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত নাঙ্গলা গ্রামের কাটাপীর, করিমপুরের থানাপাড়ার জঙ্গলী পীর, রাণাঘাটের মাজদিয়ায় গোরা শহীদ পীর, রাণাঘাটের হবিবপুরে মীর মহম্মদ ফকিরের দরগা, চাকদহের শ্রীনগরে গাজীসাহেবের থান, চাকদহের কুমারপুরে মাণিকপীর ও সত্যপীর, চাকদহের চাঁদমারীতে গাজীসাহেবের দরগা, চাকদহের ঘোড়াগাছায় ঘোড়াপীর, কুমারপুকুরের বড়পীর, হরিণঘাটার উত্তর রাজপুরে ফতেমা বিবির থান, হরিণঘাটার কাটডাঙ্গায় মাণিক পীর এবং শান্তিপুরের মালঞ্চগ্রামে গাজীমিঞার দরগা। সত্যপীর, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির conception-এ গত শতাব্দীর লোকধর্মের বহুপূজিত 'সত্য'-নিষ্ঠার পরিচয় মেলে। গুরু সত্য, সাঁই সত্য, খাকি (অর্থাৎ মাটি) সত্য, আলেক সত্য এই কথাগুলি সকল লোকধর্মের সাধারণ বীজমন্ত্র। এঁদের ধর্মসাধনায় গুরুবন্দনা, রতিশোধনের মন্ত্র, মাটির কার্য, নালের কার্য প্রভৃতি মন্ত্রসাধনে ও পদ্ধতিতে বিশেষ

ঐক্য রয়েছে। আমাদের সংগৃহীত এই জাতীয় গুপ্ত মন্ত্রের একত্র সন্নিবেশ থেকে গোরক্ষনাথের ঘর, কর্তাভজা বা সতীমা-র ঘর, সাহেবধনী বা দীনদয়ালের ঘর, কালার ঘর ও বলরামী সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতিগত সমতা প্রমাণিত হয়। যেমন :

সতীমা-র ঘর

বং চং হং সত্য।
ভগ শুদ্ধ নিরঞ্জন।
সতী মা সত্য। গুরু সত্য। বাক সত্য। ঠাকুর সত্য।

সাহেবধনী ঘর

ক্লিং গ্লিং দীনদয়াল সাহেবধনী সহায়।
গুরু সত্য। চারিযুগ সত্য। চন্দ্রসূর্য সত্য।
খাকি সত্য। দীননাথ সত্য। দীনদয়াল সত্য। দীনবন্ধু সত্য।

কালার ঘর

রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপ কামবীজ সার।
এই তিন বীজের পরে বীজ নাহিক আর॥
নিত্যরূপে কালাবীজ কালাসত্য সার।
তিলে তিলে না ভাবিলে তত্ত্ব জানা ভার॥
দোহাই কালা সত্য। কালা সত্য। কালা সত্য।

এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া চলে। আপাতত বাহুল্যবোধে তা বর্জিত হ'ল। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, এই সব লোকধর্মের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন খুবই ছিল যার জন্য মন্ত্র, আচার ও লোকবিশ্বাসের ক্ষেত্রে এতখানি মিল লক্ষিত হয়। এইসব বিতর্কিত এবং বহুশ নিন্দিত লোকধর্মসম্প্রদায় বাংলার লক্ষগ্রামে স্বনির্বাসিত ছিল ও আছে। ব্যাপকভাবে বাংলার উচ্চসমাজে এঁদের ভাবসাধনা উপেক্ষিত। সারস্বত সমাজেও এইসব লোকধর্ম উপেক্ষিত থেকে যেত, যদি না এইসব সম্প্রদায়ের কেউ না কেউ গান লিখতেন। কর্তাভজাদের ধর্মীয়তত্ত্ব রূপ পেয়েছে লালশশীর গানে, লালন-ঘরার মূল সত্য মেলে লালনের গানে আর সাহেবধনীদের দীনদয়াল মত অভিব্যক্ত কুবিরের গানে। এসব গান ধর্মতত্ত্বের রসভাষ্য শুধু নয়, এক একজন বিশিষ্ট লোক সাধকের অসাম্প্রদায়িক দর্শন সমৃদ্ধ জীবনবেদ। যারজন্য লালন বা কুবিরের রচনা অতি সহজে নাড়া দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের মত সৃজনশীল প্রতিভাকে কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত সমন্বয়বাদী ধর্মনেতাকে।

কুবির গোঁসাইয়ের রচিত বারোশত গানের মধ্যে অন্তত অর্দ্ধেক গান ধর্মমূলক।

এই জাতীয় গানে বিশেষভাবে রূপায়িত হয়েছে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচারের নিগূঢ় বাণী ও উপদেশ নির্দেশ। সেগুলির মর্মোদ্ধার করতে হ'লে দীনদয়ালের ঘর সম্পর্কে এবং তাঁদের নিজস্ব আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে হবে।

সাহেবধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে। সাহেবধনী একজন মুসলমান মহিলা ব'লে অনুমিত হয়। কুবির লিখেছেন :

> সেই ব্রজধামের কর্তা যিনি
> রাইধনী সেই নামটি শুনি
> সেই ধনী এই সাহেবধনী
> জঙ্গীপুরে যার মোকাম।

দোগাছিয়ার মুলীরাম পাল এই মহিলার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের পত্তন করেন। তাঁর পুত্র চরণ পাল এই সম্প্রদায়কে পরিবর্ধিত ও জনপ্রিয় ক'রে তোলেন মূলত তাঁর ঐশী শক্তির মহিমায় ও ভেষজ বিদ্যার প্রয়োগে। তাঁর আমলে দোগাছিয়া থেকে জলঙ্গীনদীর অপর পারে বৃত্তিহুদা গ্রামে সাহেবধনীদের শ্রীপাট গ'ড়ে ওঠে। এই সম্প্রদায়ের সূচনায় ইসলাম সংসর্গ ছিল ব'লে এই ধর্মমতে হিন্দুমুসলমান সম্পর্কে সমদর্শিতা রয়েছে। সাম্প্রদায়িক উপাস্যের নাম দীনদয়াল, যাঁর কখনও কখনও নামান্তর ঘটেছে দীনবন্ধু। সাহেবধনীদের পুথিপত্র ও পুস্তিকার শিরোদেশে লেখা থাকে 'শ্রীশ্রী৺দীনদয়াল প্রভুর পাদপদ্ম ভরসা'। বৃত্তিহুদার মূল-পাটে চরণ পালের ব্যবহৃত দণ্ড, ত্রিশূল ও হুঁকা আজও নিত্য পূজিত হয়। তাছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে সেইখানে ভোগরাগ নিবেদন, নিজস্ব গীতার্চনা ও সাহেবধনী-দের স্বকীয় 'গোপ্ত' সাধনা হয়। সাধনার স্থানের নাম 'আসন'। সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা স্বগৃহে 'আসন' নির্মাণ করতে অধিকারী তাঁদের নাম 'আসুনে ফকির'। প্রতি বৎসর অগ্রদ্বীপে চৈত্রী একাদশীতে এঁদের তিনদিনব্যাপী মহোৎসব হয়। সেখানে আসুনে ফকিররা সম্প্রদায় গুরুকে বংশানুক্রমিকভাবে খাজনা দেন। প্রত্যুপহার হিসাবে গুরু প্রত্যেক ফকিরকে দেন পাটি ও হুঁকা কলকে। তিনদিনব্যাপী মহোৎসবে চাল, চিঁড়া, গুড়, দই, তরকারী প্রভৃতি সবই সরবরাহ করেন শিষ্যরা। বিচ্ছিন্ন প্রয়াসরূপে আমরা সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ১৩২১ বঙ্গাব্দের 'অগ্রদ্বীপের কাগজ' বা হিসাব নিকাশ সমীক্ষা ক'রে দেখেছি, সে বৎসর প্রধান সেবাইত ছিলেন চরণ পালের প্রপৌত্র প্রাণভদ্র পাল। ব্যয় হয়েছিল ৪০৫ টাকা ১৫ পয়সা এছাড়া ভোগে লেগেছিল ৩০ মণ চাল, ১৬ মণ চিঁড়ে এবং ৫॥ মণ কলাই। উপস্থিত ছিলেন শতাধিক আসুনে ফকির। একেবারে হাল আমলে অর্থাৎ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের হিসাব

থেকে দেখা যায় ৪৪জন আসুনে ফকির মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। কাজেই সাহেবধনী সম্প্রদায় এখন লুপ্তপ্রচল হয়নি। বরং সম্প্রদায়ে নবগৃহীত শিষ্যের তালিকা থেকে এঁদের অস্তিত্বের চিহ্ন মিলছে। বর্তমান ধর্মগুরু জানিয়েছেন এখন সাহেবধনী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশী এবং কয়েক হাজার অজ্ঞানিত শিষ্য আছেন উত্তরবঙ্গের রংপুরে; রাজনৈতিক কারণে তাঁরা বিচ্ছিন্ন।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, সাহেবধনীদের সঙ্গে সাধারণভাবে বাংলার লোকধর্মের অনেক সাদৃশ্যসূত্র ও আচরণগত সমতা আছে। এঁরা বৈষ্ণবদের মত ভেকধারী নন। বাউলদের মত আলখাল্লাও পরেন না। প্রধানত গৃহী তবে পরকীয়া প্রকৃতি সাধনে অনাগ্রহী নন। এঁরা পুরোপুরি গুরুবাদী এবং গুরুবংশ বংশানুক্রমে মন্ত্রদীক্ষাদানের অধিকারী। বিশেষভাবে দীক্ষিত সদস্য যৌন যোগাচারের অধিকারী। বিন্দুসাধন, মাটির কাজ, বিষ্ঠা মূত্র রজ বীর্য একত্র করে পান, (যার ধর্মীয় নাম 'চারিচন্দ্রের সাধনা') এঁদের মধ্যে প্রচারিত। এঁরা জীবনবাদী। 'সাহেবধনী ঘরের শিক্ষার সত্য নাম' শিরোনামায় এঁদের গোপন পুথি থেকে আমরা যে বীজমন্ত্র পাই তাতে আছে :
(১) ক্লিং সাহেবধনী আল্লা ধনী দীনদয়াল নাম সত্য। চারিযুগ সত্য। কাম সত্য। করণ সত্য। ঠাকুর সত্য। দীনদয়াল সত্য। দীননাথ সত্য। দীনবন্ধু সত্য। গোঁসাই দরদী সাঁই/তোমা বই আর আমার কেহ নাই॥ ... ...
(২) গুরু তুমি সত্যধন/সত্য তুমি নিরঞ্জন। থাকি তোমার নাম সত্য। কাম সত্য। সেবা সত্য। ঠাকুর সত্য। বাক সত্য। গুরু সত্য।
—সাহেবধনীদের এইসব বীজমন্ত্র কুবিরের গানে সম্প্রসারিত ও ভাবঘন হয়েছে। আমরা কয়েকটি উদাহরণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে পাই এই সত্য।

প্রথমে লক্ষ্য করা যাক 'ক্লিং সাহেবধনী আল্লা ধনী দীনদয়াল নাম সত্য' এই বীজমন্ত্রটিকে। সাহেবধনী মুসলমান নারী হলেও এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশ্বাস যে তিনি রাধার অবতার। তত্ত্বটি রূপ পেয়েছে কুবিরের গানে :

> সেই ব্রজধামের কর্তা যিনি
> রাইধনী সেই নামটি শুনি
> সেই ধনী এই সাহেবধনী
> জঙ্গীপুরে যায় মোকাম॥

এই ব্রজতত্ত্ব থেকেই 'চারিযুগ সত্য' বীজ মন্ত্রটির অর্থোদ্ধার সম্ভব। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের পর কলিতে চৈতন্যলীলার মহিমা খ্যাপন করেছেন কুবির তাঁর অনেক

গানে। এই কৃষ্ণাবতার তত্ত্বের সঙ্গে সাহেবধনীদের তাত্ত্বিক যোগ (রাই = সাহেবধনী) সুতরাং স্বীকৃত। এঁর সঙ্গে তাঁরা ইসলামি তত্ত্বটুকু মিলিয়ে দিয়েছেন। কুবিরের অনবদ্য অভিব্যক্তি :

আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মা সার।
... ...
এক হাতে বাজেনা তালি এক সুরের কথা বলি
নীরে ক্ষীরে চলাচলি বীজের এই বিচার।
পিতা আল্লা মাতা আহ্লাদিনী মর্ম বোঝা হ'ল ভার

আল্লার হ্লাদিনীশক্তিরূপে রাধার কল্পনা ব্যাপারটি যেমন অভিনব তেমনই লৌকিক ধর্মসাধনার নিষ্কপট উদার চেতনা, সহ-জ সাম্যবোধ ও প্রবল সমীকরণ শক্তির পরিচয়। ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ধর্মের বীজমন্ত্রকে এমন অসামান্য ঐক্য মন্ত্রে পরিণত করা সার্থক কবিত্বের পরিচয়। এই উদারচেতনা থেকেই কুবির আরো পরিবর্ধিত সত্যোপলব্ধিতে পৌঁচেছেন :

একের সৃষ্টি সব পারি না পাকড়াতে।
আল্লা আলজিহ্বায় থাকেন আপন সুখে
কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।
... ...
এক হাওয়া এক আগুন পানি
একে একা দিনের লেখা এক রজনী
সবই এক জানি
নারি ঠাওরাতে।

এবারে লক্ষ্য করা যাক, বীজমন্ত্রের অন্তর্গত 'খাকি তোমার নাম সত্য' এই বাণীটির কুবিরকৃত ভাষ্য। 'খাকি' অর্থ মাটি। কুবির মাটির মহিমা ব্যক্ত করেছেন :

নাই এমন আর। এই মাটিকে খাঁটি কর মন আমার।
মাটি ব্রহ্মাণ্ড মূলাধার।
এই মাটিতে একে একে দীননাথ হয়েছেন দশ অবতার।
এই মাটিতে সৃষ্টি স্থিতি। করেছেন অখিলের পতি।
এই মাটিতে ভাগীরথী করেন সগরকুল উদ্ধার।
সাগরসঙ্গম এই মাটিতে রাত্রদিন ভাটি উজান বচ্ছে ধার।
নীচ হয়ে রয়েছেন মাটি এই মাটিতে বসত বাটি
হ'লে মাটি ম'লে মাটি মন মাটি কর সার।

চাষ আবাদ হয় এই মাটিতে ফলে তায় নানা শষ্য জীবাহার।

মাটি সম্পর্কে একই সঙ্গে জীবনধর্মী ও ঐশীভাবনার যুগলস্রোত কবিশক্তির দুর্লভ পরিচয় সন্দেহ নেই। কুবির সেই দুর্লভ ধ্যানদৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রে আরেক গানে বলেছেন :

আগে ছিল জলময় পানির উপর খাকি রয়
খাকির উপর ঘরবাড়ি সকল রে।
ভাইরে যে আল্লা সেই কালা সেই ব্রহ্মাবিষ্টু
ও সেই বিষ্টুর পদে হ'ল গঙ্গার সৃষ্টি রে।
ভাইরে হিন্দু মলে গঙ্গা পায় যবন থাকে জমিনায়
শাস্ত্র মতে বলি শোনো স্পষ্ট রে।
যখন এই খাকি একাকী সরে দাঁড়াবে
তখন সব নৈরাকার হবে।
সংসার যাবে রে গঙ্গা গঙ্গাজলে মিশাবে
সকলি গঙ্গা হবে যবনদের প্রমাদ ঘটাবে রে।
বুঝে দেখ দেখি হবে কি খাকি পালাবে
যবন ম'লে পরে কব্বর কোথা পারে রে।
এই সংসার অসার হবে ঘরবাড়ি কোথা রবে
এই কথাটির বিচার কর সবে রে।
পানি আছেন কুদরতে থাকি আছেন পানিতে
খাকির উপর স্বর্গমর্ত্য পাতালের এই কথা।
এই খাকিতে জীব জানোয়ার দেবতা পীর পয়গম্বর
বিরাজ করছেন সর্বদা রে।
আব আতশ খাক বাদ চারে কুলে আলম পয়দা করে
হিন্দু যবন জানে না কিছু বোঝে না বিরাজে এই সংসারে।
এই ব্যাভার মত চলন ভাই এতে কোন দ্বিধা নাই
জন্মমৃত্যু এই খাকিতে সবাই রে।

'খাকি তোমার নাম সত্য' এই সামান্য বীজটুকু কবি কল্পনার অমোঘ স্পর্শে এক বিরাট দার্শনিক সত্যের মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আব, আতস, খাক, বাদ অর্থাৎ জল আকাশ মাটি ও হাওয়া যে আমাদের মূল উপাদান এই সত্য এখানে ব্যক্ত হয়েছে। জাতি বর্ণ আচার যে জীবনের উপাদান নয় কবি পরোক্ষে তাই বলতে চান।

জাতি বর্ণ আচার যখন ভ্রান্ত পথ তখন সত্য হ'ল মানুষ। সহজ মানুষ বা মনের মানুষ। এই মনের মানুষের সন্ধানের নাম 'করণ'। বীজমন্ত্রের 'করণ সত্য'

বাক্যে তারই ইঙ্গিত। এই 'করণ' কিভাবে করা যাবে? কুবিরের গানে তার নির্দেশ নিম্নরূপ :

মানুষের করণ কর।
এবার সাধন বলে ভক্তির জোরে মানুষ ধর।

এই করণ সিদ্ধির মূলকৃত্য হ'ল কপটতা, অপদেবতা পূজা ও ভ্রান্ত আচার মার্গ পরিহার। তাই বলা হয়েছে :

হরি—ষষ্ঠী মনসা মাকাল
মিছে কাঠের ছবি মাটির ঢিবি সাক্ষীগোপাল
বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা কুটে মর?

করণ সিদ্ধির ব্যাপারে সাহেবধনীদের অন্যতর নির্দেশ হ'ল বৈদিক ধর্ম পরিত্যাগ, ভেদাভেদ পরিহার ও মানুষকে মানুষরূপে ভজন করা। প্রসঙ্গত কুবিরের বাণী :

মানুষে কোরো না ভেদাভেদ
কর ধর্মযাজন মানুষ ভজন ছেড়ে দাও রে বেদ।
মানুষ সত্যতত্ত্ব জেনে মানুষের উদ্দেশে ফের।

মনের মানুষের সন্ধান করতে হলে সাধনসঙ্গিনীর প্রয়োজন। যৌন-যোগাচারের মাধ্যমে মনের মানুষের গভীর উপলব্ধি ঘটে। সাহেবধনীদের বীজমন্ত্রে 'কামসত্য' কথাটির সারবত্তা এই সূত্রে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কামবীজ ('ক্লীং') ও কামগায়ত্রী ('ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা') সহযোগে কায়াসাধনার সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের চিত্র কুবিরের গানে রূপ পেয়েছে :

নীরে ক্ষীরে চলে তীক্ষ্ণধারে
পড়ে বিন্দু খ'সে মেঘসঞ্চারে।
সাধকের মধুর শৃঙ্গার কামধনুকে টংকার
আসকে ব্রহ্মকোটি ভেদ করে।
চিলিং মন্ত্র প্রকাশিয়ে যন্ত্রে যন্ত্র মিশাইয়ে
হৃদে কুচগিরি লয়ে আলিঙ্গন প্রহারে।
শেষে ভুজলতায় লতায় কষে
ভেদাভেদ করে অন্তরে অন্তরে।
ভেদাভেদ বেদ আঁদি তন্ত্র
কামগায়ত্রী কামবীজমন্ত্র সাধন করে যন্ত্রে যন্ত্র
একাচিত্র অন্তরে।

এই গানে যে সাধনার চিত্র তা লৌকিক ধর্মের কায়াসাধনা। পদকার বলছেন, মানবসমাজে ভেদাভেদ চেতনা সৃষ্টিকারী বেদ আদি তন্ত্র ত্যাগ ক'রে হ'তে হবে দেহ-সাধক। দেহের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে পরমকে, যার নামান্তর 'মনের মানুষ'। এখানে যে কামবীজ ও কামগায়ত্রীর উল্লেখ আছে তা কোন মন্ত্র নয়; দেহসাধনার প্রতীক শব্দধ্বনি মাত্র। যেমন, কামগায়ত্রীর বিস্তৃত মন্ত্র (ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবানায় ধীমহি তন্নঙ্গ প্রচোদয়াৎ) ব্যাখ্যা করলে ব্যাপারটি বোঝা যাবে। অপ্রকাশিতব্য গোপন পুথি 'আত্মকৌমুদী' গ্রন্থে রয়েছে:

কা শব্দে কহি এই নাসিকা প্রমাণ।
ম শব্দে অর্থ কসহ চক্ষুতে প্রমাণ॥
দে শব্দে কহি দুই দেহ বর্তমান।
বা শব্দে যুগলবাহু দোঁহাবিষ্ট গুণ॥
য় শব্দে দুই অঙ্গ সঘনে কম্পন।
বি শব্দে বক্ষ কহি সুখেতে মিলন।
দ্ম শব্দে হস্ত পুন কুচেতে মর্দন।
হে শব্দে করতল তাহাতে অর্পণ।
পু শব্দে উদরেতে রসের কমল।
ষ্প শব্দে কঙ্কালি ক'হি তাহার পরিমল॥
বা শব্দে বিকশিত ভগেন্দ্র বিন্দুদ্বার।
না শব্দে লিংগ নানা রিশাল রসাল॥
য় শব্দে উলস কহি ভাবের বিথার।
ধী শব্দে কহি ধীর সুখের শৃংগার॥
ম শব্দে মুখে মুখে একত্র মিলন।
হি শব্দে হুরঘিল সমান আচরণ॥
ত শব্দে তরল রস চুম্বন মাধুরী।
ন্ন শব্দে মধুররস দোঁহাতে আচরি॥
ঙ্গ শব্দে গরীয়ান রতির পণ্ডিত।
প্রচো শব্‌দে সুধারস অন্তেতে স্খলিত॥
দয়াৎ শব্‌দেতে কহি সুধাদান মাগি।
দোঁহ রস দোঁহ স্বাদ সদাক্ষণ ভোগী॥

কামগায়ত্রীর অর্থভেদ করতে কায়াসাধনার যে রূপ পরিস্ফুট হয় কুবিরের পূর্বোদ্ধৃত গানে তারই সার্থক রূপায়ন। তবে স্মরণীয় যে, এ সাধনা সুকঠিন এবং সকলের

আচরণীয় নয়। 'রাগময়ীকণা' নামক সহজিয়া গ্রন্থে সাধকের স্তরভেদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

> প্রবর্তজনের হরিনাম উপাসনা।
> পঞ্চনাম সার সাধকের উপাসনা।
> সিদ্ধের যে উপাসনা কামবীজ হয়॥

অর্থাৎ সাধনার প্রথম স্তরে নামাশ্রয় (প্রবর্তক), দ্বিতীয় স্তরে মন্ত্রাশ্রয় (সাধক) এবং শেষস্তরে রূপাশ্রয় (সিদ্ধ)। এই সিদ্ধ সাধক হ'তে গেলে হওয়া চাই নির্বিকার।

> কুবির বলে হ'লে নির্বিকারী
> চরণ পাবিরে সাধনজোরে॥

আমাদের সিদ্ধান্ত হ'ল, বাংলার লৌকিক ধর্মসাধনার কয়েক শতাব্দীবাহিত গোপন সাধনা ও তজ্জাত উপলব্ধি থেকে উৎসারিত হয়েছে অজস্র গান। সেগুলিকে বাউলগান নাম দেওয়া সংগত নয় এবং ভণিতাযুক্ত ব'লে তাদের লোকসংগীতের আওতা থেকে বাদ দেওয়াও অন্যায়। দেশভেদে লোকজীবন, লোকধর্ম ও লোক-সংগীতের পার্থক্য ঘটে। আন্তর্জাতিক লোকসংগীতের সঙ্গে বাংলার লোকসংগীতের একটি মৌলিক বৈপরীত্য রয়েছে। বাংলার লোকসংগীতে লৌকিক ধর্মসমাজ নির্ভর, অভিজাত সাহিত্যের সমান্তরাল ও মূলত তত্ত্বগর্ভ।

উল্লেখপঞ্জী

১। **The Chaitanya Movement. M. T. Kennedy. Calcutta 1925. P. 210**

২। বাউলতত্ত্ব: আহমদ শরীফ

৩। গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী: সতীশচন্দ্র দে। কলিকাতা ১৯৩৩, পৃ: ৩১-৩৭

৪। নবদ্বীপে সংস্কৃতচর্চার ইতিহাস: গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ। নবদ্বীপ ১৩৭১, পৃ-৭

নিশিকান্ত মাইতি

জীব বিজ্ঞান চর্চার ইতিবৃত্ত ও বিন্যাস

অধুনাকালে বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে বিভিন্ন শাখার একটা সামঞ্জস্য-বিধান করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান শাখাগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হওয়া উচিত। আজ একথা সর্বজনস্বীকার্য যে প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের উন্নত দেশগুলি বিজ্ঞানের শীর্ষদেশে বিরাজমান, কারণ তারা একত্রিত শক্তিতে সর্বশাখার সমন্বয়ে একটা বলিষ্ঠ যৌথ বিজ্ঞান ধারা গঠন করতে সক্ষম হ'য়েছে—আমরা সে বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছি, তার প্রমাণ যে কোন উচ্চমানের আবিষ্কারের ফলের দিকে আমাদের আজও চাতকের মত তাকিয়ে থাকতে হয়। প্রকৃতি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূ-বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র ও জোতির্বিজ্ঞানের মত—জীববিজ্ঞানও (Biology) একটি উল্লেখ্য স্থান দখল করে আছে। জড়-পদার্থ-বিজ্ঞান চর্চার সময়কাল থেকেই জীববিজ্ঞানের চর্চা চলে আসছে। আদিম মানুষের কাছে জড়বিজ্ঞানের প্রয়োগ পদ্ধতির অনেক আগেই জীব বিজ্ঞানের সাথে পরিচিতি ছিল বেশী। প্রাগৈতিহাসিক মানুষকে জীব-জগতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হ'ত। সেজন্য আদিকালের মানুষেরা বন্য প্রাণীদের অবস্থান, গতিবিধি লক্ষ্য করতো এবং সবার অলক্ষ্যে তাদের মধ্যে প্রকৃতি-বিজ্ঞান চেতনার ধারা গড়ে উঠে। বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদই তাদের খাদ্য, বস্ত্রের, আশ্রয়-ছায়ার সন্ধান দিত। এইসব কারণে আদি মানুষ বন্য জীবজন্তু, গাছ গাছালি সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতো। বুনো প্রাণীদের পোষ মানিয়ে মানুষের উপকারে লাগানো ভারতবর্ষেই

প্রথম উদ্ভাবন হয়, প্রাচীন ভারতীয়গণ বন্য পশু পক্ষীকে বশ করে নানান কাজে লাগিয়ে দেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বন্য প্রাণীদের বিবরণ পাওয়া যায়। ভারতীয় ঋষি-পণ্ডিতদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এই তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। ঋগ্বেদে কাঠের ঘুন-কীটের জীবন বৃত্তান্ত, শুশ্রুত বেদে কেঁচো ও জোঁকের বিবরণ পাওয়া যায়। বেদের বিবরণ মতে পুরুষের বীর্য ও স্ত্রীলোকের রক্তের সংমিশ্রণে মানব-ভ্রূণের উদ্ভব। দেহের শক্ত অংশ পিতা থেকে ও নরম অংশ মাতা থেকে বর্তায়। ভ্রূণ দেহে পুষ্টি আসে শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে। যাই হো'ক, সভ্যতা বিকাশের উষা-কাল থেকেই জীব বিজ্ঞান চর্চার উদ্ভব, যদিও প্রথমতঃ তা ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের ধূমজলে আবদ্ধ ছিল। অবশেষে নব জাগৃতির মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রকৃত সত্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হ'ল, তাও আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে।

প্রথমতঃ জীব বিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা দরকার। বহু বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই জীব বিজ্ঞান (Biological Science), দার্শনিক, চিকিৎসক, শরীরবিদ, দেহ-ব্যবচ্ছেদ-বিদ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী, ভৌতবিজ্ঞানীর আপ্রাণ চেষ্টায় জীব বিদ্যার দেব-দেউল গড়ে উঠেছে; অতি প্রাচীনকালে গ্রীক পণ্ডিত ও দার্শনিক অ্যারিস্টট্ল বিজ্ঞানের সর্ব-শাখায় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। দার্শনিক চিন্তাধারার একটি প্রবাহ জীব বিদ্যার দিকে ধাবমান হ'ল, তা প্রায় খৃষ্ট পূর্ব ৩৮৪—৩২২ অব্দে। সমস্ত পৃথিবী থেকে তিনি সমূহ প্রাণী ও উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন, পণ্ডিতপ্রবর প্লেটো ছিলেন তাঁর গুরু, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ছিলেন তাঁর শিষ্য। তিনি প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের গঠনপ্রণালী, বাসস্থান, ভৌগোলিক বিস্তারের কথা উল্লেখ করেন। জীব দেহের সংগঠন, উদ্ভব সম্পর্কে আগে জানা দরকার, সত্যিকার তিনিই প্রথম জীব বিদ্যাকে একটা বিশেষ বিষয় রূপে (Subject) খাড়া করলেন, যখন বর্তমান-কালের অনুবীক্ষণ যন্ত্র, তাপমান যন্ত্র, চাপমান যন্ত্র অথবা অন্যান্য কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির পাত্তাই ছিল না। সেই সময়ে অ্যারিস্টট্লই জীব বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলেন। তারও আগে গ্রীকদেশীয় বৈজ্ঞানিক হিপোক্রিটস্ খৃষ্টপূর্ব ৪৬০ অব্দে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। তিনি একজন সু-চিকিৎসক ছিলেন, সেজন্য হিপোক্রিটস্‌কে 'আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক' রূপে বর্ণনা করা হয়। যেহেতু চিকিৎসাশাস্ত্রের উপ-উৎপাদন হচ্ছে জীব-বিদ্যা—তাঁকেই 'আধুনিক জীব বিদ্যার জনক' বলা যেতে পারে। গ্রীসের খ্যাতনামা চিকিৎসক গ্যালেন (১৩০-২০০ খৃষ্টাব্দ) প্রথমে বানরের দেহ ব্যবচ্ছেদ করেন ও রক্ত

সঞ্চালন তন্ত্র পরীক্ষা করে দেখেন। প্লিনি (২৩-৭৯ খৃষ্টাব্দ) প্রাণীদের বিষয়ে দুইখণ্ড পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। যাক্, আধুনিক জীব বিদ্যার হোতা ছিলেন ভ্যাসালিয়াস—ইটালীতে ব্যবচ্ছেদ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন দীর্ঘকাল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের হার্ভে সাহেব ব্যাঙ কুকুর, বিড়ালের হৃদযন্ত্রের অবস্থান ও রক্তসঞ্চালনের কথা উল্লেখ করেছেন। শিরা, ধমনী, কৌশিক নালীর অবস্থানও তিনিই বর্ণনা করেন। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে ইটালীয়ান বৈজ্ঞানিক রেডী বললেন—উদ্ভিদ ও প্রাণীদের প্রজননের মধ্য দিয়েই বংশ বিস্তার হয়। "একেবারে শূন্য থেকে (De Novo) জন্ম বা ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন, রবিবারে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন" এই সব ধারণার পরিবর্তন দেখা দিল।

জন-রে সাহেব একজন বড় শ্রেণী-বিন্যাস বিজ্ঞানী (Systematic Biologist), তিনি প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ, নামকরণ ও পরিবর্তনশীলতার উল্লেখ করেন। ঠিক এইভাবে উদ্ভিদকূলের নামকরণ, শ্রেণীবিভাগ ও বাছাইকরণ ইত্যাদির কাজ করেন বেন্থাম, হুকার—পরে তা পরিমার্জিত হয় র‍্যাংলারের দ্বারা। জীব-বিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ব্যতিরেকে এক পাও নড়তে পারে না। অনুবীক্ষণ যন্ত্র, তাপমান যন্ত্র, চাপমান যন্ত্রের সাহায্য পদে পদে দরকার। অষ্টদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ডাচ্ বিজ্ঞানী লিউএন্ হুক প্রথম নিজ-আবিষ্কৃত লেন্সের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদেহ পরীক্ষা করে দেখলেন। আদ্যপ্রাণী, অ্যামিবা, চক্র-জীবানু প্রভৃতি হাজারো অনুবীক্ষণপ্রাণী দেখতে পেলেন। ম্যালপিঘি, লিউএন হুক, সোয়ামারড্যাম প্রমুখ প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরাই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ধারণা বদ্ধমূল করেন। এই সময়ে ফরাসী বিজ্ঞানী রাঁকো প্রকৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। জীব বিজ্ঞানে শ্রেণীবিন্যাস একটি অতি মূল্যবান শাখা, তাবৎ প্রাণী, উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ, নামকরণ, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করাই এই শাখার প্রধান কাজ। সুইডিস বিজ্ঞানী ক্যারোলাস্ লিনিয়াস 'আধুনিক জীববিদ্যার শ্রেণী-বিন্যাস বিজ্ঞানের জনক' রূপে পরিগণিত। তিনিই দ্বি-শব্দ-যুক্ত নামকরণ (বা Binomial nomenclature) এর স্রষ্টা। প্রত্যেকটি প্রজাতির (Species) বৈজ্ঞানিক নাম দুইটি ল্যাটিন শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়, যেমন মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হোমো স্যাপিয়েন্স (Homo-sapiens), ধানগাছের নাম ওরাইজা স্যাটাইভা (Oriza sativa), বা জবাফুলের গাছের নাম হিবিস্কাস রোজাসাইনেসিস (Hibiscus rosasinesis). অধ্যাপক লিনিয়াস আপসূলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় অধ্যাপনা করতেন এবং

'সিস্টেমা ন্যাচুরা' (Systema natura) নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ফরাসী বিজ্ঞানী জঁ্যা ল্যামার্ক (১৭৪৪—১৮২৯ খৃষ্টাব্দ) সৈন্য বিভাগ থেকে জীব বিদ্যা গবেষণায় চলে আসেন। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিষয়ে কাজ করেন, পরে বিবর্তন-বাদ (Evolution) নিয়ে গবেষণা করেন। ব্যবহার ও অব্যবহারজনিত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তনশীলতা বা নতুন নতুন অঙ্গের উদ্ভব-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান করেন। ব্যবহারের ফলে অঙ্গ উন্নত হয় এবং তা বংশ পরম্পরায় পরবর্তী বংশধরের মধ্যে বর্তিয়ে যায়। বিবর্তনের এই মতবাদ কুভিয়ঁ সাহেব নাকচ করে দেন এবং তৎকালীন সমাজের মানুষ জঁ্যা ল্যামার্ককে সম্পূর্ণ ভুলতে বসেছিল। তিনিই জীববিদ্যা বা Biology কথাটা রূপায়িত করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফরাসী প্রত্নবিদ বিখ্যাত কুভিয়ঁ (Cuvier) যিনি দুর্দ্ধান্ত নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র, তুলনামূলক ব্যবচ্ছেদ বিষয়ে (Comparative anatomy) কাজ করেন। তাঁর মতে পৃথিবী তার সমূহ প্রাণী ও উদ্ভিদসহ ধ্বংস হ'য়ে যায়, পুনরায় সব কিছুর সৃষ্টি হয়। পৌনঃপুনিকভাবে এই ঘটনা চলে আসছে। এই মতবাদ সর্বজন গ্রাহ্য হয় নি। জার্মাণ বিজ্ঞানী ওলফ্ সাহেবের মতে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে ক্ষুদ্র মনুষ্যাবয়ব অবস্থিত, পরে তা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। তিনি পক্ষীকূলের জন্ম বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। জার্মাণ ভ্রূণ-বিজ্ঞানী (Embryologist) ভন্ বিয়ার (১৭৯২—১৮৭৬ খৃঃ অব্দ) স্তন্যপায়ীদের ডিম্বাণু আবিষ্কার করেন। তিনটি ভ্রূণগত জন্মস্তরের (three germinal layers.) কথা উল্লেখ করেন। তিনিই আধুনিক ভ্রূণ-বিজ্ঞানের জনক (Modern Embryology)। অধ্যাপক মূলার উনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত শরীরবিদ ও ভ্রূণ-বিজ্ঞানবিদ। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীকে আমরা জীব বিজ্ঞানের এক নব-উন্মোচন যুগ বলতে পারি। জীব বিজ্ঞানে সর্ব শাখায় মূল্যবান আবিষ্কারের সূচনা হয়েছিল। তারই উপর বিংশ শতাব্দী যুগান্তকারী আবিষ্কার সমূহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হ'য়েছে।

'লক্ষ লক্ষ কোষের সমন্বয়ে জীবদেহ গঠিত'—এই তত্ত্ব দুইজন জার্মান বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আবিষ্কার করেন। শ্লেইডেন (Schleiden) উদ্ভিদ কোষ বিষয়ে ও শ্বোয়ান (Schwann) প্রাণীকোষ বিষয়ে গবেষণা করে "কোষ তত্ত্ব" 'Cell theory' আবিষ্কার করলেন। এই কোষ সমূহ খালি চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই গঠনপ্রকৃতি জানা যায়। মানবদেহের কোষ সংখ্যা ১,০০০,০০০,০০০, ০০০। পারকিনজি ও ভণ মহল্। কোষ মধ্যস্থ প্রোটো প্লাজমের বৈশিষ্ট ও অবস্থান

দেখেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ব্রাউন সাহেব নিউক্লিয়াস ও প্রোটোপ্লাজমের মধ্যেকার ব্রাউনিয়ান চলন এর কথা উল্লেখ করেন। টি-এইচ-হাক্সলি সাহেবের মতে 'Protoplasm is tha physical basis of life." প্রোটোপ্লাজম বিহনে কোন কোষই বাঁচতে পারে না। ইংলণ্ডের আওয়েল সাহেব বিবর্তন বাদ বিষয়ে গবেষণা করেন। তিনি হোমোলজি ও এ্যানালজিকে আলাদা করেন। তিনি পাখীদের দুইটী বিখ্যাত জীবাশ্ম আর্কিয়পটেরিক্স ও আর্কিয়রনিস নিয়ে গবেষণা করেন। সুইডেন বাসী প্রাণীবিদ অ্যাগাসীজ্ (১৮০৭—১৮৭৩ খৃঃ অব্দ) প্রথম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জীব বিদ্যার পত্তন করলেন। তাঁর মতে বর্তমান জীবকূলের সাথে প্রাগৈতিহাসিক জীবাশ্মদের প্রচুর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী পৃথিবীখ্যাত চার্লস রবার্ট ডারউইন জীব বিজ্ঞানে একটি নতুন যুগের প্রবর্তন করলেন। পুরানো ধারণা নস্যাৎ করে বিবর্তনবাদ ও মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব দিলেন। তিনি জন্মেছিলেন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে, পূরো শতাব্দী ব্যাপী গবেসণা, তত্ত্ব উদ্ঘাটন, পুস্তক প্রণয়ন করেই কাটিয়েছেন। তার মহাপ্রয়াণ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। জৈব-বিবর্তনবাদই হ'ল তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার--অপর নাম প্রাকৃতিক-নির্বাচন। এত জনপ্রিয় তত্ত্ব আগে কোনদিন আবিষ্কৃত হয় নি—ফলে এই তত্ত্বকে 'ডার উইনিসর্ম' বলে। বিবর্তনবাদের পূর্বসূরীরা ছিলেন—চার্লস ডারউইনের পিতামত এরাসমাস ডারউইন, বাফোন, ল্যামার্ক প্রভৃতি। জৈব-বিবতনবাদ আবিষ্কৃত হওয়ার আগে মানুষের ধারণা ছিল যে পৃথিবীতে তাবৎ জীবকূল অকস্মাৎ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন খেয়ালবশে। কারুর মতে সৃষ্টি স্তরে স্তরে হয়েছে—ধ্বংস হয়েছে, আবার নতুন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সব চাইতে যুগান্তকারী আবিষ্কার হ'ল ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব। তিনি চিকিৎসক পরিবার-ভুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। প্রাণী, উদ্ভিদ-ভূতত্ত্বে-ভৌগলিক অবস্থান-পৃথিবীর স্তর বিন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হ'তেন। 'বিগেল' নামক জাহাজে দক্ষিণ আমেরিকা, গ্যাল প্যাগোস দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি পরিভ্রমণ করেন। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে বিভিন্ন রকমের প্রাণী ও উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন। স্বাভাবিক অবস্থায় জীবকুল কেমন করে বেড়ে উঠে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে অভিযোজন করে নেয়, তাও পর্যাবেক্ষণ করেন। ঠিক সেই সময়ে ম্যালথাস সাহেবের বিখ্যাত জনসংখ্যা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হ'য়েছে। ডারউইন ম্যালথাসের দ্বারা প্রভাবিত হ'ন। ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন যুগান্তকারী পুস্তক 'প্রজাতির উদ্ভব' বা 'The origin of Species' প্রকাশ

করলেন। চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের দ্বারা বিবর্তনবাদের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেন। কিভাবে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হ'চ্ছে—প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক প্রজাতিই বহু সংখ্যক সন্তান সন্ততির জন্ম দিচ্ছে (Over-production), সেজন্য একটা জীবন যুদ্ধ অহরহ চলছে (Struggle for existence)। তাদের মধ্যে কিছু জয়ী হ'য়ে প্রকৃতির পরিবেশে নিজেদের অভিযোজন করে নিল (Survival of the fittest) এবং প্রকৃতি দেবী তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো—খাদ্য, পানীয়, আশ্রয় দিল—বেঁচে বর্তে বড় হওয়ার সব রকম সুযোগ সুবিধা করে দিল। ডারউইন সাহেব এইটাকে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতির নূতন পরিবেশে অভিযোজনের জন্য নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় এবং নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। ডারউইনের সমসাময়িক ওয়ালেশ সাহেব বিবর্তনবাদের উপর গবেষণা করেন। মালয় আর্কিপেলাগোর প্রাণীদের তথ্য সংগ্রহ করেন। ডারউইনের মতবাদের সমর্থন জানান। তিনি ভৌগলিক অবস্থানের সাথে প্রাণীদের সম্বন্ধ দেখান। হাক্সলি সাহেব তাঁর প্রখর বক্তৃতার দ্বারা ডারউইনের তত্ত্বকে ত্বরান্বিত করেন। জার্মান বিজ্ঞানী হেকেল প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগের একটি সম্বন্ধযুক্ত বৃক্ষের নক্সা তৈরী করেন। পুনরাবৃত্তি তত্ত্বের দ্বারা প্রমাণ করেন যে প্রত্যেকটি প্রাণী তার জীবন ইতিহাসের সময় কালেই তার পূর্ব পুরুষদের আকার একবার গ্রহণ করবেই।

ফরাসী জীবাণু বিজ্ঞানী জগতবিখ্যাত লুই পাস্তরের নাম আজ সমগ্র পৃথিবী সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে। তিনিই প্রথমে বাতাসের মধ্যে জীবাণুর সন্ধান পেলেন। তিনি তৎকালে ফ্রান্সের রেশম শিল্পকে জীবানুর হাত থেকে রক্ষা করেন, ভেঁড়া ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুকে 'মড়ক' থেকে বাঁচান। পাগলা কুকুর কামড় জনিত জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস আবিষ্কার ও তার প্রতিষেধক টীকার ব্যবস্থা করেন। গ্রিগর জোহান মেণ্ডেল 'আধুনিক প্রজনন বিদ্যার জনক', অষ্ট্রিয়ার মঠাধ্যক্ষ এই প্রকৃতি বিজ্ঞানী মটর শুটী নিয়ে মঠের বাগানের মধ্যে গবেষণা করেন। দীর্ঘকাল ধরে গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি অলক্ষ্যে একপার্শ্বে নামগোত্রহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। চার্লস ডারউইনও দেখেন নি। মটর গাছের শংকর মিলন ঘটান ও পরবর্তী বেশ কয়েকটী বংশানুক্রমের নথিপত্র রেখে যান। দেখা যায়, প্রথম বংশধররা সবাই একই রকম। দ্বিতীয় বংশধরদের মধ্যে মিশ্র চরিত্র ও অখণ্ড মুখ্য ও অখণ্ড গৌন চরিত্র দেখা দিল। গৌণ চরিত্র বৈশিষ্ট্য মুখ্য চরিত্রের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, পরের বংশধরদের মধ্য আবার প্রকাশ পায়। শংকরের মধ্যে দুইরকম চরিত্র বৈশিষ্ট্য

থাকলেও পরে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রস্ফুটিত হয়। তিনি এইসব তথ্য থেকে বংশ ধারার কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মেণ্ডেলের মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পরে তা পুনঃ আবিষ্কৃত হয়। কোরেন্স, শ্‌চারম্যাক, ডি-ভ্রাইস ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আলাদাভাবেই মেন্‌ডেলের বংশধারার থিওরিগুলি খুঁজে বার করলেন। বর্তমানে তা জীববিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট ফলিত-বিষয়রূপে পরিগণিত। গ্যালটন পিতামাতার সাথে বংশধরদের সম্বন্ধ গাণিতিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রতিভাধরদের পুত্রকন্যাগণ অধিকতর প্রতিভা ও মেধার অধিকারী না হ'য়ে মাঝারী অবস্থার দিকে পিছিয়ে আসে। জার্মান বিজ্ঞানী ভাইসম্যান বল্‌লেন—জীবদেহে দুই রকমের কোষ দেখা যায়—একটি দেহ-কোষ (Somatic Cell) অন্যটি যৌন-কোষ (Germ Cell)। যৌনকোষগুলি ক্রোমোসোম সংক্রান্ত বংশধারার সাথে যুক্ত আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বোভেরী দেখলেন, প্রত্যেকটি প্রজাতির একটি বিশেষ সংখ্যায় ক্রোমোসোম সূতো নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে। ডি-ভ্রাইসের মতে খাপছাড়া বংশধারার গতিকে 'মিউটেশন' বলে। হঠাৎ কোন চরিত্র-বিশিষ্ট-জীব দেখা দিলে, তাকে মিউটেশন থিওরীর দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়। প্রজনন বিজ্ঞান (Genetics) বিংশ শতাব্দীর একটি সর্বজনগ্রাহ্য শাখা, যাকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র টি-এইচ ম্যরগ্যান পুষ্ট করলেন। তিনি ১৯৩৪ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। অদৃশ্য জিনগুলি ক্রোমোসোমের লোকাশে (Locus) অবস্থিত, যারা পরবর্তী বংশধরে পিতামাতার চরিত্রগত বৈশিষ্টগুলি বহন করে আনে। এই জিন-তত্ত্বই ম্যরগ্যানের প্রধান আবিষ্কার। পরে ১৯৬৬ সালে আমেরিকার এইচ জে মুলার নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে কৃত্রিম মিউটেশন উৎপাদন করে জীবদেহে পরিবর্তন আনলেন: পরের জেনারেশনেও তার ফলাফল লক্ষ্য করলেন। ড্রোসেফিলা মেলানোগেসটার নামক ফলের মাছিই প্রজনন বিদ্যার প্রধান উপাদান হ'য়ে দাঁড়ালো। জার্মান ভ্রূণ বিজ্ঞানী স্পেম্যান ১৯৩৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান, তিনি উভচর প্রাণীর ভ্রূণ বিষয়ে গবেষণা করেন। ভ্রূণ বিকাশের সময়ে একটি জটিল রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়, যার দ্বারা অন্যান্য ভ্রূণের জাগরণের পথ নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই সময়েই ফলিত ভ্রূণ-বিজ্ঞানের সূচনা হ'ল। বর্তমানে এই বিষয়ে কতিপয় বিজ্ঞানী উচ্চমানের গবেষণায় লিপ্ত আছেন। ওয়াটসন ও ক্রীক সাহেব ১৯৬২ সালে নোবেল প্রাইজ পান। তাঁরা নিউক্লিয়সের মধ্যে ডি-এন-এ অনুর (Deoxyribose nucleic Acid) ত্রিতল গঠন নিয়ে গবেষণা করেছেন।

ডি-এন-এর নিউক্লিওটাইডের দ্বারা গঠিত ডবল হেলিক্যাল গঠন প্রণালী উদ্ঘাটন করেছেন। এই দশকের প্রারম্ভে (১৯৭০) স্থায়ীভাবে আমেরিকাবাসী ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ এইচ-জি-খোরানা ও নূরেনবার্গ নোবেল প্রাইজ পান। তাঁদেরও গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ডি এন এ সিনথেসিস্—যা থেকে কৃত্রিম রক্ত ও জীবন তৈরীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

জীববিজ্ঞান চর্চাও ভারতে এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই চলে আসছে। যদিও প্রাচীনকালে আমাদের দেশে এই বিজ্ঞানের চর্চা চল্‌তো। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জীব-বিজ্ঞান পঠন পাঠন এখন বেশ বিস্তৃতি লাভ করেছে। অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধশতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জীব বিজ্ঞান চর্চা চলছে। যদিও কেবলমাত্র উদ্ভিদবিদ্যা গত শতাব্দী থেকে চলে আসছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ও বেনারস হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম জীববিদ্যার শাখা খোলা হয়। তাছাড়া ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের পরিচালনায় কতকগুলি গবেষণাগারে জীববিদ্যা চর্চা হয়ে থাকে। ভারতীয় জীব বিজ্ঞানীদের অন্যতম স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু, ডঃ সুন্দরলাল হোরা, ডঃ হিমাদ্রী মুখোপাধ্যায়, ডঃ সাহানী, ডঃ স্বামীনাথন্, ডঃ এম এলরুনওয়াল প্রমুখ; বৃটিশ জীববিজ্ঞানী ডঃ জে বি এস হ্যালডেন দেশ ত্যাগ করে ভারতে নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং কলকাতায় ও কটকে প্রজনন বিদ্যায় গবেষণা ও একটি বলিষ্ঠ গোষ্ঠী তৈরী করেন। স্থায়ী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ভারতবর্ষীয় জীব-রসায়ন-বিদ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা কোষমধ্যস্থ ডি-এন-এর গঠন বৈচিত্র সংক্রান্ত অতি উচ্চমানের গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হ'ন। সমগ্র ভারতবর্ষে বহু বিষয়ের বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টায় ও বিদেশী বিজ্ঞানীদের সহায়তায় জীববিজ্ঞানের গবেষণা এখন বেশ উন্নত মানের হচ্ছে।

জীব বিজ্ঞানের (Biology) প্রধান দুটি শাখা উদ্ভিদ বিদ্যা (Botany) ও প্রাণী বিদ্যা (Zoology)— প্রথমোক্ত শাখা উদ্ভিদ বিষয়ে ও শেষোক্ত শাখা প্রাণীকূল নিয়েই আলোচনা করে। তাছাড়া শারীরবৃত্ত, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, ভূবিদ্যা, —অঙ্ক শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, রাশি বিজ্ঞান (Statistics)—এই বিজ্ঞানের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আদিতে উদ্ভিদ বিদ্যার সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সরাসরি যোগ ছিল। ওষুধ-উদ্ভিদকূল ছাড়া চিকিৎসা শাস্ত্র চল্‌তেই পারে না। সেজন্য জীব বিদ্যার সাথে চিকিৎসা বিদ্যা, পশুচিকিৎসা বিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, বন-বিজ্ঞান (Forestry), ডেয়ারী-বিজ্ঞান পুরাপুরি মিশে আছে। আদিতে জীববিদ্যার প্রধান শাখাগুলির

কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রেণীবিন্যাস—যা থেকে উদ্ভিদ বা প্রাণীকূলের বিস্তার তাদের বিভিন্ন নামকরণ, পৃথকীকরণ বিষয়ে আলোচিত হয়। অ্যানাটমি—প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহের অভ্যন্তরস্থ কলা-কোষ সমূহের বিন্যাস গঠন বৈচিত্র্য আলোচিত হয়। বহিরাকৃতি—এই উপশাখায় জীবদেহের উপরভাগের গঠন বৈচিত্র্য আলোচিত হয়। শারীরবৃত্ত—এই উপশাখায় শরীরের মধ্যেকার অঙ্গের ক্রিয়াকলাপ, পরিপাক প্রণালী, রেচন স্নায়ুতন্ত্রের, জনন তন্ত্রের বিষয়ে আলোচিত হয়। ভৌগলিক অবস্থান—পৃথিবীতে জীবকূলের অবস্থান, কোন্ অঞ্চলে কিভাবে বিস্তারলাভ করেছে। ইকলজি—বাস্তু-সংস্থান বিদ্যা—জীবদের বাসস্থান ও পারিপার্শ্বিক (Environment) অবস্থার সাথে অভিযোজন ইত্যাদি আলোচিত হয়। ভ্রূণ তত্ত্ব—এই উপশাখায় প্রাণী বা উদ্ভিদের ভ্রূণের উৎপাদন থেকে পুরো বৃদ্ধি আলোচিত হয়। নিষিক্তিকরণ থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্তি পর্যন্ত অলোচিত হয়। কোষজীববিদ্যা—উপশাখায় জীবদেহের চূড়ান্ত একক কোষ (Cell) বিষয়ে গবেষণা হয়। কোষের গঠন-বৈচিত্র্য রাসায়নিক, ভৌত সংগঠন প্রভৃতি বিশেষভাবে দেখা হয়। প্রজনন-বিদ্যা—এই শাখায় বংশগতির ধারা জীন সংক্রান্ত আলোচনা—ডি এন এ, আর এন, এ বিষয়ে গবেষণা হয়। প্রজনন বিদ্যার পুরাপুরি আলোচনা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই চলে আসছে। যদিও প্রজনন বিদ্যার জনক মেণ্ডেল সাহেব গত শতাব্দীর শেষের দিকেই মটশুটীর উপর পরীক্ষাগুলি চালিয়েছিলেন এবং সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করে যান। কিন্তু বংশধারার গতি এই শতাব্দীর গবেষণার বস্তু। বর্তমানে এই শাখার অনেক উন্নতি হয়েছে নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা চল্ছে। প্রত্নতত্ত্ব—প্যালিয়েণ্টলজি—প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি—যেমন প্রত্ন উদ্ভিদ বিদ্যা (Paleo-botany)-আদিকালের উদ্ভিদ বা তাদের জীবাশ্ম থেকে উদ্ভিদের জীবন বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সে সময়কার উদ্ভিদের অবস্থা, গঠন, ডিস্ট্রিবিউশন ইত্যাদি বোঝা যেতে পারে। প্রত্ন প্রাণী বিদ্যা (বা Paleo-Zoology)—এই বিভাগে প্রাচীনকালের প্রাণীদের জীবাশ্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে তাদের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান করা যায়। অণু-জীব বিদ্যা (Micro-Biology) শাখায় অণুবীক্ষণ জীবদের বিষয়ে আলোচিত হয়, বর্তমানে জীব বিদ্যার নতুন নতুন শাখায় গবেষণা চল্ছে। জীবরসায়ন (Bio-Chemistry) বিদ্যা জীববিজ্ঞানের রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ করছে। জীব-পদার্থ-বিদ্যা (Bio-Physics) জীব বিজ্ঞানের মৌল পদার্থ নিয়ে গবেষণায় সাহায্য করছে। জীব-কারিগরি বিদ্যা (Bio-Engineering) জীবদেহের

কারিগরী দিকটা আলোচনা করে। জীব-চিকিৎসাবিদ্যা (Bio-Medical) চিকিৎসা বিদ্যার জীবদেহ দিকটা বিশ্লেষণ করে দেখে। বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য পরস্পর পরস্পারের উপর নির্ভরশীল হতেই হবে। এককভাবে চলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইদানীং জীব বিজ্ঞানে বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে অঙ্কের যথেষ্ট প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। অঙ্কের সাহায্যে জীববিদ্যার অনেক সমস্যা সহজেই সমাধান করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এ ব্যাপারে বেশ যোগাযোগ রয়েছে। ঐই শাস্ত্রকে আমরা জীব-গণিত (Bio-mathematics) রূপে আকার দিতে পারি। ঠিক এইভাবে পরিসংখ্যান বিজ্ঞান কে (Statistics) জীববিজ্ঞান গবেষণায় লাগাতে পারা যায় এবং অতি সহজেই অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এই শাখাই জীব-পরিসংখ্যান বিজ্ঞান (Bio-Statistics) নামে পরিগণিত। প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাথে সমাজ বিজ্ঞানের যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। পপুলেশন-জীব-বিদ্যা (Population Biology) মনুষ্য-জীব-বিদ্যা (Human Biology) মনুষ্য-প্রজানন্ বিদ্যা (Eugenics) পুষ্টি-বিদ্যা, বাস্তু সংস্থান-বিদ্যা ইত্যাদিকে সমাজ বিজ্ঞানের সাথে যোগ করতে হবে। নৃতত্ত্ব, মনোবিদ্যা, সমাজ-বিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞনের গবেষকদের সাথে জীববিদ্যার গবেষকদের একই সূত্রে গ্রথিত করতে হবে।

জীববিজ্ঞানের পঠন পাঠন, গবেষণা সব কিছু নির্ভর করছে ভৌত-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে জীবকোষ সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। আদিতে কেবলমাত্র প্রাণী ও গাছ গাছড়ার জীবন-ইতিহাস, অর্থনৈতিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিষয়ে লোকেরা ওয়াকিবহাল ছিল। রবার্ট হুক সাহেব প্রথম হস্ত নির্মিত লেন্সের দ্বারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবদেহ পর্যবেক্ষণ করতেন। পদার্থ-বিদ্যার উন্নতির সাথে সাথে উন্নত মানের অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হ'ল, তাছাড়া অন্যান্য যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হওয়ায় জীববিদ্যার চর্চা বহুগুণ বেড়ে গেল। পদার্থ-বিদ্যার সহায়তায় যে সব হাতিয়ার তৈরী হয়েছে, তার দ্বারা জীব বিদ্যার গবেষণা আজ চরমে পৌছে গেছে। সেগুলি হ'ল—ইলেকট্রন মাইক্রোশকোপ, সিমেন্স ইলেক্ট্রন মাইক্রোশকোপ, ইনটারফিয়ারেন্স মাইক্রোশকোপ; ফেজ-কন্ট্রাষ্ট মাইক্রোশকোপ, পোলারাইজড্ মাইক্রোশকোপ, ইউনিট্রন-ইনভার্টেড মাইক্রোশকোপ, ডিপ-ফ্রিজ ডিসেকটিং মাইক্রোশকোপ, রঞ্জনরশ্মির মেসিন, মাইক্রোব্যালেন্স, গাইগার কাউন্টার মাইক্রোম্যানিপুলেটর, গাইগার মূলার কাউন্টার ইলেকট্রনিক স্টিমুলেটর, অ্যামিনকো-বোম্যান স্পেক্ট্রোফটোফ্লুরোমিটার, স্টোরেজোস্কোপ, মাইক্রোস্পেকট্রোফটোমেট্রিক

ইকুইপমেণ্ট ক্রিয়োস্ট্যাটস, রেডিও ট্রেসার ইকুইপ্‌মেণ্ট, রুম হিউমিডি ফাইয়ার্স, ইনসেকটারী, এয়ার কণ্ডিশানড্‌ ড্রোসেফিলা জেনেটিক্স চেম্বার ইত্যাদি। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও গবেষণাগারগুলিতে এই সব যন্ত্রপাতির দ্বারা জীব-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা চলছে। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং এর পেনিসিলিন স্ট্রেপটো-পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিটিন জাতীয় এণ্টিবায়োটিক্সগুলি জীববিজ্ঞান-গবেষণার ফলশ্রুতি। জীববিদ্যার সাথে কৃষি-বিজ্ঞানের নিকটতম সম্বন্ধ আছে। কৃষি-বিজ্ঞানীরা ও উদ্ভিদ-বিদ্‌রা উন্নত প্রণালীর চাষবাস ও উচ্চফলনশীল ধান, গম, যব, রাই, ভুট্টা উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। ডেয়ারী-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে রসায়ন ও জীব-বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে। পোলট্রি ও ভেটেরীনারী-বিজ্ঞানে জীব-বিদ্যার সংযুক্তিসাধন করতে হবে। বিজ্ঞানের সমূহ শাখার সমন্বয়ে ও সহায়তায় জীববিজ্ঞান আজ একটা বিশাল মহীরুহে পরিণত হ'চ্ছে। ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে আজ আর বিভিন্নশাখাবিজ্ঞানের বিরোধের স্থান নেই, কে বড় কে ছোট তার বিচার বিবেচনার দিন ফুরিয়েছে। পশ্চিমের দেশগুলোতে যে কর্মযজ্ঞের আয়োজন চল্‌ছে, সেই যজ্ঞে আমাদেরও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার সাথে ফলিত বিষয়ের যোগ সাধন করতে হবে। সমগ্র দেশব্যাপী সাধনার ফল সর্বস্তরের মানুষের দ্বারে পৌছে দিতে হ'বে। বিজ্ঞানের সুফল যাতে সর্বশ্রেণীর মানুষ সমানভাবে ভোগ করতে পারে, তার দিকেও সজাগ দৃষ্টি দিতে হ'বে।

শ্যামাপ্রসাদ বসু

বাংলায় ওস্টেণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উত্থান ও পতন : একটি ব্রিটিশ চক্রান্তের ইতিহাস

ওস্টেণ্ড কোম্পানী গঠনের পেছনে ছিল ফ্লাণ্ডার্স ও ব্রাবেণ্টের বিভিন্ন শহরের বিশেষ করে ওস্টেণ্ডের ধনী বণিকদের সক্রিয় উৎসাহ।

সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের স্বপ্ন ছিল ইংরেজ ও ডাচদের বঞ্চিত করে ভারতের বাণিজ্যের সিংহভাগ নিজের দখলে আনা। আনুষ্ঠানিকভাবে অবশ্য ১৭২২ সালের আগে ওস্টেণ্ড কোম্পানী সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে নি কিন্তু ১৭১৪ সালেই দেখা যায় তাদের একটি জাহাজ ব্যবসার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে ভাসছে।

ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড নতুন কোম্পানীর জন্মলগ্নেই নিজেদের অসন্তোষ গোপন রাখে নি। তাদের চোখে ওস্টেণ্ড কোম্পানী পূর্বদুনিয়ায় এক বিপজ্জনক আক্রমণকারী ছাড়া আর কিছুই ছিল না।১ ক্রমশঃ দেখা যেতে লাগল ভারতীয় মাল ফ্লাণ্ডার্সের মারফত গোপনে চোরাপথে খাস গ্রেট ব্রিটেনেই সস্তা দরে বিক্রি হচ্ছে। এই সব অবৈধ মাল-পত্তর সাধারণতঃ দশ-বারো দাঁড়ের বড় বড় নৌকোয় বয়ে নিয়ে যাওয়া হত ওস্টেণ্ড থেকে টেমস নদীতে।২

১৭১৭ সালে ওস্টেণ্ড থেকে ভারত অভিমুখী দু'টো জাহাজের নিছক আগমন সংবাদই এদেশের ইংরেজ ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিল। বিশাখাপত্তনম থেকে ১৭২৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লেখা চিঠি থেকে জানা যায় কিভাবে ওই দুই কোম্পানী ওস্টেণ্ডের জাহাজগুলো

ভারতে ভিড়তে যাতে না পারে সে ব্যাপারে নিজেদের মধ্য যে কোনো সহযোগিতা দেখাতে কোনো কসুর রাখে নি।৩

ওই বছরেরই ১৪ই মার্চের লেখা লণ্ডনের কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স-দের চিঠির বক্তব্য আরো সুস্পষ্ট। ভারতে তাঁদের কর্মচারীদের পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছেন তারা যেন কোনোভাবেই নতুন কোম্পানীর সাথে সংশ্রব না রাখেন। তাদের কর্ত্তব্য হবে নতুন কোম্পানীকে ব্যবসার দিক থেকে যেন সম্পূর্ণভাবে নিকম্মা করে রাখা হয়।৪

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ওয়ালপোল কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট নন। প্রয়োজনে ইংরেজ বাণিজ্যের স্বার্থে তিনি যুদ্ধ করতেও দ্বিধা করবেন না। কারণ তাঁর মতে ওস্টেণ্ড কোম্পানী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইংরেজদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে।৫

ফোর্ট উইলিয়মের বড়কর্ত্তা প্রেসিডেন্ট স্যামুয়েল ফিক সেই কত আগে থেকে ১৭১৮ সালে লণ্ডনের ডাইরেক্টরদের আশ্বাস দিয়ে ছিলেন যে তিনি দেখবেন কোম্পানীর কোন কর্মচারী, সাদা হোক বা কালো হোক ওই বদমাইস বামাল পাচার-কারীদের সাথে যেন কোন যোগাযোগ না রাখে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার তাঁকেও তাঁর ব্যর্থতার কথা হেড অফিসে জানাতে হল কিছুদিনের মধ্যেই। ওস্টেণ্ড কোম্পানীর ব্যবসা-পত্তরকে তিনি কিছুতেই বন্ধ করতে পারেন নি।৬

এ সম্পর্কে ১৭২০ সালে ২৬শে ডিসেম্বর ফিকের লেখা চিঠিটি তাৎপর্যপূর্ণ। চিঠির বিষয়বস্তু: "ইংরেজদের তরফে ওস্টেণ্ডদের কোনো রকম সাহায্য না দেয়ার ব্যাপারে এ পর্যন্ত কি কি করা হয়েছে।" শুরুতে বেশ বড় গলায় জাহির করা হয়েছে কোম্পানীর কর্মচারীদের সততা সম্পর্কে। ডাচদের আন্তরিকতা নিয়েও কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি। তাহলে প্রশ্ন, ওস্টেণ্ডদের বাংলায় কারা সাহায্য করছে? এর উত্তরে ফিক জানাচ্ছেন ফরাসীরা যত অনিষ্টের মূল—ওরাই সাহায্য করছে। তবে লণ্ডনের কর্ত্তারা যাতে তাঁর কর্মদক্ষতার উপর আস্থা না হারান সে কারনে তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন এবং সেই সাথে নিজেও আশা প্রকাশ করেছেন যে ওস্টেণ্ডরা যতই লাফালাফি করুক না কেন ব্যবসা থেকে শেষ পর্য্যন্ত লাভ আদায় করতে পারবে না।৭

স্যামুয়েল ফিক যে আশা প্রকাশ করুন না বা যে আশ্বাসই দেন না কেন ডাইরেক্টরা কিন্তু তাতে আশ্বস্ত হতে পারলেন না। বিশেষ করে বাংলা, মাদ্রাজ ও সুরাটে যেখানে ইতিমধ্যে 'হিথকোট' ও আরো বিভিন্ন নামের ওস্টেণ্ড কোম্পানীর

জাহাজ পৌছানোর খবর পৌছে গেছে। ফোর্ট সেণ্ট জর্জে পাঠানো ১৭২১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে তাঁরা ফিকের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিলেন। অন্যদিকে জোরের সাথে সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে বোধহয় কোম্পানীর কর্মচারীরই একাংশ ওদের সাহায্য করছে। 'আর এও জানালেন অনুসন্ধান করে জানা গেছে ফরাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। কারন ফরাসীরা যদি সাহায্য করত তাহলে অন্ততঃ পণ্যের মধ্যে কিছু ফরাসী-জাত মাল-পত্তর পাওয়া যেত। কোম্পানীর কর্মচারীদের একাংশের অসাধুতা সম্পর্কে উপরওয়ালাদের বক্তব্যকে বোধহয় একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কারণ তা' না হলে ওষ্টেণ্ড কোম্পানী কি করে প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়েও য়ুরোপের বাজারে কোম্পানীর দরে বা তার চেয়েও সুলভে মাল-পত্তর বিক্রি করতে পারে।৮

১৭১৯ ও ১৭২১ সালে পার্লামেণ্টে আইন পাশ করে ব্রিটিশ প্রজাদের বারণ করে দেয়া হল তারা যেন কোনভাবে ওষ্টেণ্ড কোম্পানীর সাথে আলাপ-আলোচনায় না বসেন বা যোগাযোগ রাখেন। ১৭২৩ সালের জানুয়ারী মাসে ওষ্টেণ্ড কোম্পানী সম্রাটের কাছে বাণিজ্যের নতুন সনন্দ লাভ করল। সেই বছরই বাংলাদেশে ২২শে জুন তারিখে ওদের একটি জাহাজ এসে পৌছালো। ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তাদের সাহায্যে বাংলার দেওয়ান মুর্শীদকুলী খাঁর কাছ থেকে কাশিমবাজারে কুঠি তৈরী করার অনুমতিও ওষ্টেণ্ড কোম্পানী পেয়ে গেল। বলাবাহুল্য বাজ পড়ল ইংরেজ ও ডাচদের মাথায়। কোনো রকম সময় নষ্ট না করে তারা নিজেদের মধ্যে যুক্তফ্রণ্ট তৈরী করে ফেলল। হুগলীর ফৌজদারকে ওষ্টেণ্ডদের হয়রানি করার জন্য প্রচুর ঘুষ দেয়া হল। আর সেই সাথে লিখিতভাবে ইংরেজরা মুর্শীদকুলীর দরবারে ওষ্টেণ্ড কোম্পানীর বিরুদ্ধে তাদের আর্জি পেশ করল।৯

ওষ্টেণ্ড কোম্পানী প্রথমের দিকে দেওয়ানের একান্ত প্রিয়ভাজন ফতেচাঁদ মারফত সত্তরহাজার টাকা ঘুষ দিয়েও মুর্শীদকুলী খাঁর কাছ থেকে ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় সনদ লাভ করতে পারে নি। অন্যদিকে বরং শুল্ক কর্মচারীদের হাতে নানাভাবে উত্যক্ত হয়েছে। অবস্থা এক সময়ে এমন চরমে পৌছালো যে এক মাথা-গরম করা ওষ্টেণ্ড কোম্পানীর জেনারেল শেষ-মেষ হুগলীর ফৌজদারের সাথে ছোট-খাট লড়াই করে ফেলল। আর এই ঘটনার পরিপূর্ণ সুযোগ ইংরেজরা গ্রহণ করল। তারা বাংলার সুবাদারকে আবার মনে করিয়ে দিল যে কিভাবে তারা আগেই তাঁকে ওষ্টেণ্ড কোম্পানীর নষ্টামী সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক করে দিয়েছিল। যাইহোক

মুর্শীদকুলী খাঁর সময় মাফিক হস্তক্ষেপের ফলে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে।১০

পরের বছর ১৭২৪ সালে কোম্পানী প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দিয়ে মুর্শীদকুলী-খাঁর কাছ থেকে একটি অস্থায়ী সনদ লাভ করে। অবশ্য বাংলায় অন্যান্যদের মত আড়াই শতাংশ শুল্ক দিয়ে ব্যবসা চালাবার ইচ্ছে ওষ্টেণ্ড কোম্পানীরও ছিল। তাই তারা একটি স্থায়ী সনদ লাভের জন্য মুর্শীদকুলী খাঁকে একলক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে প্রস্তুত ছিল এবং সেইমত প্রস্তাবও দিয়েছিল।

স্বভাবতঃই এত টাকা ঘুষ হিসেবে দেয়ার প্রস্তাব ইংরেজদের কানে যেতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আশংকিত হয়ে পড়ল। তারা নানাভাবে বাধা দিতে কসুর করলো না।

ইতিমধ্যে ওষ্টেণ্ড কোম্পানী মুর্শীদকুলী খাঁর কাছ থেকে সনদ পাওয়া সম্পর্কে একরকম নিশ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ কার দিল ইংরেজ ও ডাচদের তরফে হুগলীর ফৌজদারের মুর্শীদকুলী খাঁর কাছে দরবার।

১৭২৭ সালের গোড়ায় পরপর দু'বার ওষ্টেণ্ড কোম্পানী চেষ্টা করেও সনদ লাভ করতে ব্যর্থ হল। অথচ এই খাতে তাদের ব্যয় হল কম নয়। খোদ মুর্শীদকুলী-খাঁকে তারা মিছিমিছি একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিল।১১ কিন্তু কোনো প্রকৃত লাভ হল না। এক রকম হতাশায় পাগল হয়ে আক্রোশ বশে তারা সুরাট থেকে ফিরছিল একটা মুঘল জাহাজকে আক্রমণ করে লুঠ করল। এই ঘটনায় অবশেষে বাংলার সুবাদারের টনক নড়ল। মুর্শীদকুলী খাঁ তাদের কাম্য সনদ বা পরোয়ানা দিয়ে দিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরী হয়ে গেছে। কোম্পানীর ভাগ্যসূর্য্য সম্মিলিত য়ুরোপীয় শক্তিবর্গের ষড়যন্ত্রের ফলে অস্তাচলের পথে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে।

১৭২৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সেক্রেটারী অব ষ্টেট টাউনসেণ্ড তাঁর দেশের তরফে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার সাথে ওষ্টেণ্ড কোম্পানীকে ধ্বংস করার সম্মিলিত কর্মসূচীতে স্বাক্ষর প্রদান করলেন।১২

সম্রাটের একমাত্র বন্ধু স্পেনও তাঁকে পরিত্যাগ করল। সুতরাং এ অবস্থায় য়ুরোপে লড়াইয়ের ঝুঁকি নেয়া হবে নিতান্তই মুর্খতা। ১৭২৭ সালের চুক্তি মারফত রচিত হল ওষ্টেণ্ড কোম্পানীর মৃত্যু পরোয়ানা। প্রথমে সাত বছরের জন্য কোম্পানীকে বাতিল করা হল কিন্তু সাতবছর শেষ হওয়ার আগেই সেভাইলের

চুক্তি মারফত সম্রাট নিজেই ওষ্টেণ্ড কোম্পানীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিলেন।

প্রসংগ নির্দেশিকা

1. Mr. Foreman's letter to the Rt. Hon. Wm. Pulteney 1725, vide Historical Geograpy of the British Dependencies, Vol-VII, P 64
2. The Importance of the Ostend Company considered, 1726, P. 33 Vide, op. cit, P. 64 ; History of British India—Mill, Vol-3, P. 27 ; History of Commerce, Macpherson ; P. 298.
3. Letter from Vizagapatam, dt. Feb, the 4th 1717/18 (Records of Fort St. George)
4. London the 14th March 1718, General letter to Fort Marlborough (Records of Fort St. George)
5. Cambridge Modern History, Vol-VI ; P. 49.
6. Bengal Letters Received, Vol-I, dt, 24th Dec, 1718 (India Office Record Department)
7. Fort William dt the 26th December, 1720 (Records of FortSt. George)
8. London the 14th March, 1717, General letter to Fort Marlborough (Records of Fort St George)
9. General letter dated 9th January, 1724/5.
10. Ibid.
11. Bengal General dated 6th August 1726.
12. Fort William General dated 28th January, 1727/8 ; Bengal Past & Present, Vol-XX, P. 156.
13. Cambridge Modern History. Vol-VI, P. 59.

অনিমেষ পাল

বাংলা-ওড়িয়ার সীমারেখা

পশ্চিম বাংলা এবং উড়িষ্যার সীমান্তে নব্যভারতীয় আর্যভাষা ব্যবহারকারী জনসাধারণের কথ্য ভাষাটি বহুদিন ধরেই বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে। প্রায়ই দেখা যায় এ সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী কথা বলা হচ্ছে। কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃতি করা যাক, ১৯৬১ সালের Census Handbook (Midnapore Volume 1এর ৫৫-৫৬ পাতায় বলা হচ্ছে, "In central Midnapore the dialect is the variety classified by Dr. Grierson as South Western Bengali, which in the South, South Western police stations shades off into Oriya and has as great a title to be called a dialect of that language as of Bengali. It might almost be classed as a mixed sub-dialect of standard Bengali and Oriya, but it differs from both languages and possesses pecularities of its own which entitle it to be classed as an independent dialect." এই মতের প্রতিধ্বনি কয়েকবছর আগে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখেও শোনা গেছে—"The dialect actually is neither Bengali nor Oriya". (Language and Society in India/ Simla 1969/Page 552). ১৯২১ সালের Census Report এ Thomson মন্তব্য করেছিলেন—"a hybrid language with something of Oriya in it."।

১৯১১ সালের Census Report এ মনোমোহন চক্রবর্তী বলেছিলেন—"A distinct dialect of Oriya" কিন্তু তার পরেই তিনি বলেছেন যে খাঁটি ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে এর যে কেবল উচ্চারণগত পার্থক্য আছে তাই নয় এর ব্যাকরণও সম্পূর্ণ পৃথক। এর পর Grierson এর উক্তি আবারো স্মরণ করতে হবে —"The Oriya of North Balasore shows signs of being Bengalised and as we cross the boundary between that district and Midnapore we find at length almost a new dialect It is a mechanical mixture of corrupt Bengali and corrupt Oriya……however, the language is Oriya in its essence…Never the less, a person speaking this Midnapore Oriya is often unintelligible to man from Puri and vice versa."

সেন্সাস রিপোর্টে মেদিনীপুরের ওড়িয়া ভাষাদের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে :—

বৎসর—ওড়িয়া ভাষী জন সংখ্যা

১৮৯১—৫,৭২,৭৯৮

১৯০১—২,৭০,৪৯৫

১৯১১—১,৮১,৮০১

১৯২১—১,৪২,১০৭

১৯৩৯— ৪৫,১০১

১৯৬১— ২১,০২৩

৬১ সালে মেদিনীপুর জেলার লোকসংখ্যা সাড়ে তেতাল্লিশ লক্ষ আর ওড়িয়া ভাষীর সংখ্যা একুশ হাজার তাও খড়্গপুর রেল শহরেই এর মধ্যে নয়হাজার লোক বাস করে কর্মসূত্রে। দাঁতন থানায় সওয়া লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র দেড়হাজার ওড়িয়া ভাষী অথচ এর পরেই উড়িষ্যার সীমান্ত। অর্থাৎ, পণ্ডিতেরা যাই বলুন না কেন মেদিনীপুরের দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা মনে করে তাদের মাতৃভাষা বাংলা-ই।

ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে কি কোন মাপকাঠি নেই যাতে করে বলা চলে এটা ওড়িয়া ভাষার নমুনা এবং ওটা বাংলা ভাষার নমুনা? ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে মাপকাঠি অবশ্যই আছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর Origin and Development of Bengali Language গ্রন্থে আধুনিক বাংলাভাষার যে লক্ষণগুলিকে মাপকাঠি হিসাবে ধার্য করেছেন *১ সেগুলির নিরিখে চট্টগ্রাম কিংবা সিলেটের

উপভাষাকে বাংলা বলে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন ব্যাপার। তেমনি কাঁথি বা দাঁতন অঞ্চলের লোকদের ব্যবহৃত উপভাষাকেও সুনীতিবাবুর মাপকাঠিতে বাংলা বলে সাব্যস্ত করা মুস্কিল। সমস্যার এটা হল একদিক।

অন্যদিকে আরও একটা কথা বিবেচ্য। ধরুন, বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী দুটি গ্রামের কথ্যভাষা রেকর্ড করা হল। পশ্চিম বাংলার সীমানার মধ্যে যে গ্রামটি তার ভাষাকে বাংলা বলে দাবী করা হল। এই গ্রামটি থেকে অল্পদূরে অবস্থিত উড়িষ্যার সীমানার ভিতরে অন্য গ্রামটির ভাষাকে দাবী করা হল ওড়িয়া বলে। এখন যদি টেপরেকর্ডটি চালিয়ে দেখা যায় যে উভয় গ্রামের ভাষাই এক তাহলে দুটো দাবীই অর্থহীন হয়ে পড়ে। বাংলা-উড়িষ্যা সীমান্ত বরাবর গত দশবছর ধরে ঘোরা-ঘুরি এবং এই সীমান্ত এলাকার ভাষা পুংখানুপুংখভাবে পর্যালোচনা করে আমার দুটি কথা মনে হয়েছে। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সীমারেখাটা ভাষার সীমারেখার সঙ্গে সব সময় খাপ খায় না। এটা অবশ্য এমন কিছু নতুন কথা নয়। দ্বিতীয়তঃ, উড়িষ্যার সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে ঘনিষ্ঠ এমন বহু পরিবারকে দেখেছি, বিশেষ করে, উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে, যাঁরা সীমান্ত এলাকা থেকে কাছে কিংবা বেশ দূরে, পশ্চিম বাংলার ভিতরে বাস করেন। এদের কথ্যভাষা অনেক ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ বাংলা চলিত ভাষা। অতএব বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্বও উপভাষা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমি মানতে নারাজ। মেদিনীপুর জেলার প্রতিটি থানার এলাকা থেকে একটি করে, তেত্রিশটি গ্রাম বেছে নিয়ে একটি সমীক্ষা করার আমার সুযোগ হয়েছিল। প্রতিগ্রামের একজন ব্যক্তির নামধামসহ কথ্যভাষার টেপরেকর্ড করেছিলুম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। তারপর এই নমুনাগুলি অবলম্বন করে এক একটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে এক এক ভূচিত্র প্রস্তুত করে দেখলুম প্রতিটি ভূচিত্রই মোটামুটি ভাবে একটি মাত্র ছক ফুটিয়ে তুলছে। মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কথ্য-ভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশিষ্টতাগুলি চলিত বাংলার কাছাকাছি আর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কথ্যভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশিষ্টতাগুলি ক্রমেই চলিত বাংলা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে—দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কথ্যভাষাগুলির রূপতাত্ত্বিক বিশিষ্টতাগুলি কি ক্রমেই ওড়িয়ার কাছাকাছি হয়ে উঠছে? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেতে হলে আমাদের যেতে হবে সুবর্ণরেখা উপত্যকায়।

সুবর্ণরেখা নদী বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে সীমানা হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে নবাবী আমল থেকেই।২ এই নদীর পূর্ব-উত্তর পাড়ে হলো দাঁতন থানা

এলাকা। এই এলাকার মোট আটটি গ্রামের কথ্যভাষা আমার পর্যালোচনা করার সুযোগ হয়েছে। এই গ্রামগুলি হল—পানিথুপিয়া. গাজীপুর, সাবড়া, তরুয়া, সাবড়াপিং, গণপাদা, পোরলদা, এবং আরবসা। শেষোক্ত গ্রামের (জে, এল, নং ১৫১, দাঁতন) শ্রীতাপসকুমার প্রধান তাদের গ্রামের কথা ভাষায় আমাকে একটি গল্প বলেছিল। গল্পটির টেপরেকর্ড আমার কাছে আছে। সেই রেকর্ড থেকে অনুলিখিত গল্পটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। অবশ্য তাতে কিছু অসুবিধা আছে। প্রচলিত বাংলা বর্ণমালা অপরিবর্তিত রেখে প্রান্তীয় বাংলা উপভাষার নমুনা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় না কারণ এই সব উপভাষায় এমন ধ্বনি আছে এবং এমন বাক্যান্তর্গত স্বরের ওঠানামা আছে যা প্রকাশ করার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত বাংলা বর্ণমালায় নেই। ধ্বনি বা উচ্চারণ তত্ত্ব নিয়ে এ প্রবন্ধে কোন আলোচনা থাকছে না কাজেই গল্পটি প্রচলিত বাংলা বর্ণমালাতেই লেখা যেতে পারে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এতে যথাযথ উচ্চারণ রক্ষা করা যায় নি। এখন গল্পটা বলা যাক :—

"সাতবেউনি ঠাকুরর্ পূজার বসিছন্ পূজারি। গাঁর কেত্তে লুক্ পূজার ডলা লেইকি ঠাকুরের পুজা দেইতে আসিচন্। কেই মানষিক্ করিচি গটে ছেলি আবলে কেই বা চুটিয়া, কেই বা ষোল আনা, আবলে কাহার্ বি বিস্তর অসুক্ করিচি। সেই দিয়ার ঠাকুরের কোত্র ধারণা দেইচি। ঠাকুরর্ নাম ডাক্ বা তাঁকর্ দয়ার্ কথা বিস্তর্ দূর্ ছড়িই যাইচি। যদি কিছু হারিই যায়, বা কেই যদি বিপদের্ পড়ে বা বিস্তর্ অসুক্ করিচি, সেই সময়র যদি সিত্র সেই ঠাকুরকু মানষিক করে তাহানে তাহার্ ইচ্ছাপূরণ্ হেই যায়। আউ সেই সাতবেউনি ঠাকুরর পূজা করণ্ পত্নমাঝি। সেই দিয়ার তাঁকর্ নাম্ ডাক্ বিস্তর্ থিলা। গাঁর ভিত্র এছু তাঁকর্ অবস্থা ভালা। ঠাকুরর্ নাম্র সিত্র কেত্তেবার্ কেত্তে লুকক্ অনেক ডোমরিয়া দেই চন্ সেহির কেত্তে লুকর্ উপকার্ হেইচি। এই ভাবর তাঁকর আয় বেশ হেইথায় অউ বিস্তর সম্মান পাইথান। (এরপর থেকে কেবল অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে হস্ চিহ্ন দেখানো হবে।- লেখক।)

"কিন্তু এই সময়র তাঁকর গটে বিপদ পৌছিলা। সময়টা থিলা ইংরাজ রাজত্তর সময়। সেই সময়র গটে ইংরাজ সাহেব এই গাঁকু আইলা। তাঁকর ঠাকুরর উপর বিশ্শাস্ থিলানি। তাঁকর এই সবু পুজা ভল্ লাগিলানি। সিত্র এই সবু পূজা দেখিকিরি রাগি গলে আউ সেইছু গটে লাথি মারিকিরি পূজার ঘট্কু ভাঙ্গি দেলে ও পূজা নষ্ট করি দেলে। সেইটিকু যেই সব লুক পূজা লেই কিরি আসিথিলা তার মেনে পালিই গলে। কিন্তু সেই গাঁ আউ পাশাপাশি গাঁর যাহার মেনে মানষিক করি

কি ফাঁকি দেইতা বা ঠাকুরর নাম্‌র কিছি রাখি না দেইতা তাহানে সেই ঠাকুর তাহার তাহার মেনকার সবু ধংস করি দেইতে। এঁছু ঠাকুর কি সাহেবর উপর কিছি প্রতিশোধ লেবেনি? আউ গটে বড় কথা হেলা যে পতুমাঝির কি সম্মান যিব? তাহানে সেথে খাইতে না পাই কিরি মরি যিব। সিত্র এই ভাবর্ যে কলা মুলাটা লুক দউথায় তাবি মো পাইব নি। তাক এঁছু আউ কিয়ে দব? সিত্র সেই দিয়ার গটে ফন্দি বার করলা। আবলে সাহেব কহিচন যে আউ কেভি পূজা থেরকম ন হয়।

"একবারে শেষর সিত্র গটে ফন্দি বার করলা। এবারে সে গটে ভালাকিরি পূজার অয়োজন করলা। কিন্তু সিত্র এবারে তুলসি গছর্ বদল আউ গটে বিছাতি গছ লাগিই দেলা। পূজা হউচি খবর পাইকি সিত্র রাগি কিরি লাথ মারিকি ঘটটাকু ভাঙ্গি দেলা আউ সেই বিছাতি গাছটাকু উপড়ি দেলা। আউ তেতে বেলে সেই বিছাতি গছর আঁউশ লাগি কি তাঁকর হাতদুইটি জ্বালা করিতে লাগিলা। তেতে বেলে সে রাগিকিরি গটে ইংরাজী কথা কহিলা। তেতেবেলে টাকুর পদমাঝির গার ভর করলে আউ কহিলে "তু মোর ঘট ভাঙ্গি দেইচু আউ তুলসি গছ উপড়ি দেইচু। মু তকে ধংস করি দেমি।" তেতেবেলে সাহেব বুঝিলা যে ঠাকুর তার উপর রাগি যাইচন। সিত্র তেতে বেলে কোন উপায় ল পাইকি যন্ত্রণার ছটপট করতে করতে কইলা—"বাবা মতে রক্‌খা কর।" তেতেবেলে পতুমাঝি কইলা—"এ ব্যাটা বেশ জব্দ হেইচি। এই সময়র ইয়ার কোত্নু কিছি আদায় করি লিয়া যাউ।" কিন্তু এই সময়র পতুমাঝি কইলা যে তু ঠাকুরর্ নামর্ গটে শবিঘা জমি আউ শ টঙ্কা দেইদে। সাহেব কইলা—"হঁ বাবা মু দেমি, তুমতে এই জ্বালা ভালা করি দিঅ। মু এঁইছু লেখি দউছি।" পতুমাঝি কইলা। "না না তু দবুনি।" সাহেব কইলা—"হঁ হঁ, দেমি"। তেতেবেলে পতুমাঝি কইলা যে তু এই জাইগার মাটি তোর গার মাখি অধঘণ্টে ঠাকুরর্ কোত্র শুই র। এইবারে জ্বালা ভালা হেই গলা। এই কোত্নু সে জানিলা যে বঙ্গালী মেনকার ঠাকুর জাগ্রত। তাকু ল মাননে চলিবনি। তার পরষু পতুমাঝি বিস্তর বাহবা পাইলা আউ তার সাঁত্র পাইলা গটে শ টঙ্কা আউ গটে শ বিঘা জমি। সেই দিয়ার আজ্ঞা বংশ পরম্পরে ভোগ করি আসুচি আউ বিস্তর খ্যাতি লাভ করি আসুচি পতুমাঝির বংশ।"

এবার এই গল্পটি থেকে এই উপভাষার ব্যাকরণটিকে বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই ছোট্ট গল্পটিকে একশো এগারোটি ক্ষেত্রে চলিত বাংলার সঙ্গে আলোচ্য উপভাষাটির অমিল দেখা যাচ্ছে। এখন এই অমিলগুলিকে একটু সাজিয়ে

নিয়ে প্রথমে নামপদগুলি বিচার করে দেখা যেতে পারে।

ঠাকুরর=ঠাকুরের। সম্বন্ধ পদে-অর-বিভক্তি। চলিত বাংলায়-অর্-বিভক্তি ব্যবহৃত হয়, যেমন—ছোটর্, বড়র ইত্যাদি।

পূজার=পূজায়। অধিকরণ কারকে—র্+অ=র বিভক্তি। এই উপভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ।

কেতে লুক=কতলোক। ও-স্থানে-উ; পূর্ববাংলায় শোনা যায়।

কেই=কেউ। উ-স্থানে-ই। এই উপভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ।

গটে ছেলি=একটা ছাগল। ছেলি শব্দটি মধ্যযুগের বাংলায় পাওয়া যায়, যেমন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে।

ছুটিয়া=ছুটো। তুলনীয় পূর্ববঙ্গের—ছুইট্যা।

কাহার=কারো। সাধু বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

সেই দিয়ার=সেইজন্য। এই উপভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ।

কোত্র=কাছে। ঐ।

তাঁকর=তাঁর। ঐ।

সেই সময়র=সেই সময়ে। কালাধিকরণে-র-বিভক্তি। ঐ

সিত্র=সেখানে। উপভাবার বিঃ প্রঃ।

ঠাকুরকু=ঠাকুরকে। কর্মকারকে—কু-বিভক্তি। বিঃ প্রঃ।

তাহার্=তার। সাধু বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

ভালা=ভালো। তুলনীয় পূর্ববঙ্গের—বাঃলা।

ঠাকুরর্ নামর=ঠাকুরের নামে। সম্বন্ধপদে—অর্-বিভক্তি এবং অধিকরণ কারকে-র -বিভক্তি। বিঃ প্রঃ।

কেতে লুক্কু=কতো লোককে। কর্মকারকে—কু। বিঃ প্রঃ।

এই ভাব্র=এইভাবে। অধিকরণে—র-বিভক্তি। বিঃ প্রঃ।

এই সবু=এই সব। বিঃ প্রঃ।

পূজার ঘটকু=পূজার ঘটকে। সম্বন্ধ পদে—অর্-এবং কর্মকারকে-কু। বিঃ প্রঃ।

সেই টিকু=সেই দিকে। বিঃ প্রঃ।

তার মেনে=তারা। বহুবচনে—মেনে-। বিঃ প্রঃ।

যাহার মেনে=যারা ঐ ঐ

তাহার মেনকার=তাদের। সম্বন্ধ পদে, বহুবচনে—মেনকার-। বিঃ প্রঃ।

গছর = গাছের। সম্বন্ধবাচক—অর্ বিভক্তি। প্রথম অক্ষরে আ > অ। বিঃ প্রঃ।

বিছাতি গছ = বিছুটি গাছ। বিঃ প্রঃ।

আঁউর্শ = আঁশ। অংশু > আঁশু > আঁউশ > আঁইশ > আঁশ।

মু তকে = আমি তোকে। তু = তুই, কর্মকারকে—তকে = তোকে।

ইয়ার কোত্‌নু = এর কাছ থেকে। অপাদান কারকে—নু-বিভক্তি মেদিনীপুর জেলার পূর্বোত্তর অঞ্চলেও শোনা যায়।

অধ ঘণ্টে = আধ ঘণ্টা। আ > অ, আবার আ > এ বিঃ প্রঃ।

এই কোত্‌নু = এই থেকে। বিঃ প্রঃ।

বাঙ্গালী মেনকার = বাঙ্গালীদের। বিঃ প্রঃ।

বিভিন্ন কারকে যে বিভক্তিগুলির ব্যবহারে চলিত বাংলার সঙ্গে পার্থক্য প্রকট সেগুলি হল কর্মকারকে-কু-(ঠাকুরকু = ঠাকুরকে, গাঁকু আইল = গ্রামকে এল = গাঁয়ে এল), সম্বন্ধ পদে—অর্ (ঠাকুরর্ = ঠাকুরের) এবং অধিকরণে—র- (সেই সময়র = সেই সময়ে)। এ ছাড়াও আছে অপাদান কারকে—নু- (তারপরনু = তারপর থেকে)। কর্তৃকারকে বহুবচন বোধক—মেনে (বাঙ্গালী মেনে = বাঙ্গালীরা) এবং সম্বন্ধ পদে বহুবচন বোধক—মেনকার (বাঙ্গালী মেনকার = বাঙ্গালীদের)। পুরুষবাচক সর্বনাম-পদগুলিও চলিত বাংলা থেকে কিছুটা আলাদা : মো/মু = আমি ; তু = তুই ; তকে = তোকে (এটা অবশ্য গোটা মেদিনীপুর জেলাতেই পাওয়া যায়); তাঁকর = তাঁর; তারমেনে = তারা; তাহার মেনকার = তাদের ; তাকু = তাকে, ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে বেশ কিছু শব্দের ব্যবহার যেগুলি চলিত বাংলায় সম্পূর্ণ অপরিচিত অথবা যেগুলির উচ্চারণ চলিত বাংলা থেকে সামান্য আলাদা। অনেক ক্ষেত্রে, প্রথম অক্ষরে যেখানে চলিত বাংলায় -আ-রয়েছে, এই উপভাষায় সেখানে পাওয়া যায়-অ-ঃ যেমন গছ, ডলা, অধ, রখি = গাছ, ডালা, আধ, রাখি ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে উচ্চারণে সামান্য পার্থক্য চলিত বাংলা থেকে এই উপভাষাটির ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট করে তোলে, যেমন—ভালা = ভালো ; কেতে লুক = কতো লোক (পূর্ব বাংলায় -ও-স্থানে-উ উচ্চারিত হতে শোনা যায়) ; কিছি = কিছু ; কেই = কেউ ; এই সবু = এই সব; বিছাতি = বিছুটি ; আঁউশ = আঁশ ; অধঘণ্টে = আধঘণ্টা ; ইত্যাদি। কিছু কিছু শব্দ চলিত বাংলায় সম্পূর্ণ অপরিচিত, যেমন-গটে = একটা ; ডোমরিয়া = মাতুলী, ছেলি = ছাগল ; দুটিয়া = দুটো ; সেই দিয়ার = সেইজন্য ; কোত্র = কাছে ; সিত্র = সেখানে ; সেইটিকু = সেই দিকে ; কোত = কাছ ; সাঁত্‌র = সঙ্গে ; ইত্যাদি।

এরপর ক্রিয়াপদগুলির প্রয়োগ খুঁটিয়ে বিচার করে দেখা যাক :—

বসিছন = বসেছেন : পুরাঘটিত বর্তমান। সাম্মানিক প্রথমপুরুষ। উপভাষার বিঃ প্রঃ।

ডলা লেইকি = ডালা নিয়ে। যৌগিক অসমাপিকা। সাধু বাংলার—ইয়া-স্থানে-ই +কি। বিঃ প্রঃ।

পূজা দেইতে = পূজো দিতে। ইতে অন্ত অসমাপিকা। কিন্তু-ইতে- স্পষ্টতঃ আলাদা আছে, ধাতুর সঙ্গে মিশে যায়নি সাধু বাংলার মতো। দে + ইতে = দেইতে।

আসিচন = এসেছেন। পুরাঘটিত বর্তমান। সাম্মানিক প্রথম পুরুষ।৩ বিঃ প্রঃ।

মানযিক করিছি = মানসিক করেছে। পুরাঘটিত বর্তমান। ভদ্র প্রথম পুরুষ।৩ বিঃ প্রঃ।

অসুক করিচি = অসুখ করেছে। ঐ। ঐ। ঐ।

ধারণা দেইচি = ধর্ণা দিয়েছে। ঐ। ঐ। ঐ।

ছড়িই যাইচি = ছড়িয়ে গিয়েছে। ঐ। ঐ। ঐ। যৌগিক ক্রিয়া। প্রথম পদটি সাধু বাংলার ইয়াঅন্ত অসমাপিকার মত। ইয়া স্থানে-ই-।

হারিই যায় = হারিয়ে যায়। যৌগিক ক্রিয়া। সামান্য বর্তমান। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ। প্রথম পদটি সাধু বাংলার ইয়াঅন্ত অসমাপিকার মত। ইয়া স্থানে-ই-।

বিপদর পড়ে = বিপদে পড়ে। সামান্য বর্তমান। ভদ্র প্রথম পুরুষ। সাধু বাংলার অনুরূপ তবে বিশেষ্য পদে উপভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ।

পূজা করণ = পূজো করেন। নিত্য বর্তমান। সাম্মানিক প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।

বিস্তর থিলা = অনেক ছিল। নিত্য অতীত। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।

দেইচন = দিয়েছেন। পুরাঘটিত বর্তমান। সাম্মানিক প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।

উপকার হেইচি = উপকার হয়েছে। পুরাঘটিত বর্তমান। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।

হেইথায় = হতো। নিত্যবৃত্ত অতীত। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।

সম্মান পাইথান = সম্মান পেতেন। নিত্যবৃত্ত অতীত। সাম্মানিক প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।

পৌছিলা = পৌছুলো। নিত্য অতীত। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।

থিলা = ছিল। থিলানি = ছিলনা। নিত্য অতীত। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।

আইলা = এল। ঐ। ঐ। ঐ।

ভল লাগিলানি = ভালো লাগলো না। ঐ। ঐ। ঐ।

পুজা দেখি কিরি = পূজো দেখে। যৌগিক অসমাপিকা। ইয়া স্থানে "+ই+কিরি"। উপভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ।

রাগি গলে = রেগে গেলেন। যৌগিক ক্রিয়া। প্রথম পদে ইয়া স্থানে—ই। নিত্য

অতীত। সাম্মানিক প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।
লাথি মারিকিরি=লাথি মেরে। যৌগিক অসমাপিকা। ইয়া স্থানে "+ই+কিরি"। উপভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ।
ভাঙ্গি দেলে=ভেঙ্গে দিলেন। যৌগিক ক্রিয়া। প্রথম পদে ইয়াস্থানে—ই। নিত্য অতীত। সাম্মানিক প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।
করি দেলে=করে দিলেন। ঐ। ঐ। ঐ। ঐ। ঐ।
পূজা লেই কিরি=পূজো নিয়ে। যৌগিক অসমাপিকা। ইয়া স্থানে "+ই+কিরি"। উপভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ।
আসিথিলা=আসছিল। ঘটমান অতীত। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।
পালিই গলে=পালিয়ে গেলেন। যৌগিক ক্রিয়া। প্রথম পদে ইয়া স্থানে—ই। নিত্য অতীত। সাম্মানিক প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।
মানষিক করিকি=মানসিক ক'রে। যৌগিক অসমাপিকা। ইয়া স্থানে "+ই+কি"। বিঃ প্রঃ।
ফাঁকি দেইতা=ফাঁকি দিত। নিত্যবৃত্ত অতীত। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।
কিছি রখি=কিছু রেখে। অসমাপিকা। র। খ্ স্থানে রখ্+ইয়াস্থানে -ই। বিঃ প্রঃ।
না দেইতা=না দিত। নিত্যবৃত্ত অতীত। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।
করি দেইতে=করে দিতেন। নিত্যবৃত্ত অতীত। সাম্মানিক প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।
লেবে নি=নিবেন না। সাধারণ ভবিষ্যৎ। সাম্মানিক প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।
হেলা হল। নিত্য অতীত। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।
যিব=যাবে। সাধারণ ভবিষ্যৎ পুরুষ। বিঃ প্রঃ।
খাইতে ল পাইকিরি=খেতে না পেয়ে। প্রথম পদটি ইতেঅন্ত অসমাপিকা। সাধু ভাষার অনুরূপ। না স্থানে 'ল'। শেষের পদটি যৌগিক অসমাপিকা। ইয়াস্থানে "+ই+কিরি"। উপভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ।
মরিযিব=মরে যাবে। যৌগিক ক্রিয়া। প্রথম পদে ইয়া স্থানে—ই। সাধারণ ভবিষ্যৎ। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।
দউথায়=দিত। নিত্যবৃত্ত অতীত। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।
করলা=করল। নিত্য অতীত। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।
কহিচন=বলেছেন। পুরাঘটিত বর্তমান। সাম্মানিক প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।
করি দিঅ=করে দাও। যৌগিক ক্রিয়া। প্রথম পদে ইয়া স্থানে—ই। অনুজ্ঞা।

ভদ্র মধ্যম পুরুষ।৩ বিঃ প্রঃ।

লেখি দউচি = লিখে দিচ্ছি। যৌগিক ক্রিয়া। প্রথম পদে ইয়া স্থানে—ই। ঘটমান বর্তমান। উত্তম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।

তু দবু নি = তুই দিবি না। সাধারণ ভবিষ্যৎ। অন্তরঙ্গ মধ্যম পুরুষ।৩ বিঃ প্রঃ।

মাখি করি = মেখে। যৌগিক অসমাপিকা। ইয়া স্থানে "+ই+করি"। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে অন্যত্র প্রাপ্ত 'কিরি' স্থানে 'করি' পাওয়া যাচ্ছে। বিশিষ্ট প্রয়োগ।

ভালা কিরি = ভালো করে। অসমাপিকা, ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত। 'করে' স্থানে 'কিরি'। বিশিষ্ট প্রয়োগ।

লাগিই দেলা = লাগিয়ে দিল। যৌগিক ক্রিয়া। প্রথম পদে ইয়া স্থানে —ই। নিত্য অতীত। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিশিষ্ট প্রয়োগ।

পূজা হউচি = পূজো হচ্ছে। ঘটমান বর্তমান। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিশিষ্ট প্রয়োগ।

খবর পাই কি = খবর পেয়ে। যৌগিক অসমাপিকা। ইয়া স্থানে "+ই+কি"। বিঃ প্রঃ।

উপড়ি দেলা = উপড়ে দিল। যৌগিক ক্রিয়া। প্রথম পদে ইয়া স্থানে—ই। নিত্য অতীত। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিশিষ্ট প্রয়োগ।

আঁউশ লাগি কি = আঁশ লেগে। যৌগিক অসমাপিকা। ইয়া স্থানে "+ই+কি"। বিশিষ্ট প্রয়োগ।

জ্বালা করিতে লাগিলা = জ্বালা করতে লাগল। যৌগিক ক্রিয়া। প্রথম পদে ইতে অন্ত অসমাপিকা, সাধুভাষার অনুরূপ। দ্বিতীয় পদে 'লাগ' ধাতুর ব্যবহার কাজটির আরম্ভ হওয়া বোঝাচ্ছে। ফলে রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে এই যৌগিক ক্রিয়ার কাল নিত্য অতীত হলেও অর্থের দিক থেকে কালটি দাঁড়াচ্ছে ঘটমান অতীত। এই যৌগিক ক্রিয়াটির গঠন এবং অর্থব্যঞ্জনা সাধুভাষার অনুরূপ। শুধু সাধুভাষার 'লাগিল' স্থানে এখানে 'লাগিলা' হয়েছে।

দেইচু = দিয়েছিস। পুরাঘটিত বর্তমান। অন্তরঙ্গ মধ্যম পুরুষ। এই প্রয়োগটি সারা মেদিনীপুর জেলা জুড়েই শুনতে পাওয়া যায়।

দেমি = দেব। সাধারণ ভবিষ্যৎ। উত্তম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।

হেইচি = হয়েছে। পুরাঘটিত বর্তমান। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।

আদায় করি লিয়া যাউ = আদায় করে নেওয়া যাক। দ্বিতীয় পদটি অসমাপিকা, ইয়া স্থানে ই। তৃতীয় পদটি সাধু ভাষার আ-অন্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের অনুরূপ। 'লওয়া' স্থানে 'লিয়া'। শেষ পদটি ভাববাচ্যের অনুজ্ঞা। সাধুভাষার 'যাউক' স্থানে 'যাউ'।

দেই দে = দিয়ে দে। যৌগিক ক্রিয়া। প্রথম পদে ইয়া স্থানে—'ই'। অনুজ্ঞা। অন্তরঙ্গ মধ্যম পুরুষ। সাধুভাষার অনুরূপ।

শুই র = শুয়ে থাক। যৌগিক ক্রিয়া। প্রথম পদে ইয়া স্থানে—'ই'। অনুজ্ঞা। অন্তরঙ্গ মধ্যম পুরুষ। র <রহ। পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় ব্যবহৃত।

হেই গেলা = হয়ে গেল। যৌগিক ক্রিয়া। প্রথম পদে ইয়া স্থানে—ই। নিত্য অতীত। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।

তাকু না মান্নে চলিব নি = তাকে না মান্লে চলবে না। তৃতীয় পদ 'মান্নে' চলিত ভাষার "মানলে"-র অনুরূপ। তবে—লে স্থানে—নে পাওয়া যাচ্ছে। শেষ পদটি সাধারণ ভবিষ্যৎ। ভদ্র প্রথম পুরুষে—ইব বিভক্তি, পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় বহু ব্যবহৃত।

করি আস্থুচি = করে আসছে। যৌগিক ক্রিয়া। প্রথম পদে ইয়া স্থানে—ই। ঘটমান বর্তমান। ভদ্র প্রথম পুরুষ। বিঃ প্রঃ।

ক্রিয়াপদগুলির প্রয়োগ খুঁটিয়ে বিচার করে দেখা গেল যে বর্তমান কালের তিন শ্রেণীর,—নিত্য, ঘটমান ও পুরাঘটিত; অতীত কালের তিন শ্রেণীর,—নিত্য, ঘটমান ও নিত্যবৃত্ত এবং ভবিষ্যৎ কালের মাত্র এক শ্রেণীর—সাধারণ, ক্রিয়া পদের ব্যবহার এই গল্পে রয়েছে। এখন এগুলিকে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বর্তমান কাল : নিত্য বর্তমান : যায়, পড়ে, করন ইত্যাদি। ঘটমান বর্তমান : দউচি, হউচি, আস্থুচি ইত্যাদি। পুরাঘটিত বর্তমান : বসিচন, আসিচন, করিচি, দেইচি, কহিচন, ষাইচি, দেইচন, হেইচি, দেইচু ইত্যাদি।

অতীত কাল : নিত্য অতীত : থিলা, থিলানি, পৌছিলা, আইলা, ভল লাগিলানি, গলে, দেলে, হেলা, করলা, দেলা, গেলা, জানিলা ইত্যাদি।

নিত্যবৃত্ত অতীত : দেইতা, না দেইতা, দেইতে ইত্যাদি। হেইথায়, পাইথান,ও দউথায় ক্রিয়াপদ তিনটিকে যদিও নিত্যবৃত্ত অতীতের অন্তর্গত করা হয়েছে তবুও এগুলির অন্যরকম ব্যঞ্জনা আছে। এইগুলির মধ্যে ঘটমান অতীত ও নিত্যবৃত্ত অতীত মিশে গেছে। যথা পাইথান মানে পাইতে থাকিতে ছিলেন। অবশ্য ব্যাপারটা উপভাষা ব্যবহারকারীদের কাছেও স্পষ্ট নয়। ঘটমান অতীত : আসিথিলা ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল : সাধারণ ভবিষ্যৎ : যিব, দব, দবুনি, দেমি, চলিব নি ইত্যাদি।

গল্পটিতে অনুজ্ঞা ভাবের এই কটি ক্রিয়াপদ পাওয়া গেছে,—করি দিঅ, দেই দে, শুই র ইত্যাদি। ভাব বাচ্যে অনুজ্ঞা ভাবের মাত্র একটি ক্রিয়াপদ পাওয়া গেছে,

—লিয়া যাউ। বাংলা সাধু ভাষার ইয়া অন্ত অসমাপিকার ক্ষেত্রে এই উপভাষায় তিনটি বিভিন্ন প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে। (১) ছড়িই, হারিই, রাগি, ভাঙ্গি, করি, পালিই, রখি, লেখি, লাগিই, দেই, হেই, ইত্যাদি। (২) দেখি কিরি, মারি কিরি, লেই কিরি, পাইকিরি ভালাকিরি, ইত্যাদি। (৩) লেইকি, করিকি, পাইকি, লাগিকি, ইত্যাদি। ইতে অন্ত অসমাপিকার কয়েকটি মাত্র প্রয়োগ পাওয়া গেছে। এগুলি হল—দেইতে, খাইতে, করিতে ইত্যাদি। সাধুভাষার ইলে অন্ত অসমাপিকার ক্ষেত্রে এই উপভাষায় পাওয়া যায় '—নে'র ব্যবহার। অবশ্য এক্ষেত্রে আমাদের হাতে আছে মাত্র দুটি উদাহরণ—না মান্‌নে, তাহানে।

সাধু ভাষার ইতে অন্ত অসমাপিকা পদ এই উপভাষাতে পাওয়া যাচ্ছে প্রায় অপরিবর্তিত। ইলে অন্ত অসমাপিকার ক্ষেত্রে —ল-এর জায়গায় আসছে-ন-। কিন্তু ইয়া অন্ত অসমাপিকার ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে একাধিক বৈচিত্র্য। কতকগুলি ক্ষেত্রে ইয়া স্থানে পাওয়া যাচ্ছে-ই। এগুলি সাধারণত যৌগিক ক্রিয়ার প্রথমাংশ। অন্য ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে 'ধাতু+ই+কিরি অথবা-কি'। বাংলা কবিতার ভাষায় -ইয়া স্থানে-ই প্রয়োগ সুপরিচিত। তাছাড়া চট্টগ্রামের উপভাষায়ও এক্ষেত্রে -ই প্রয়োগ পাওরা যায়। মাত্র একঠি ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে 'ধাতু+ই+করি' (মাখি করি)। সম্ভবত এটি বক্তার নিজের প্রয়োগ। তবে মেদিনীপুর জেলার উত্তরাঞ্চলেও 'করি' যুক্ত অসমাপিকার ব্যবহার শোনা যায়।

এখন দেখতে হবে অব্যয় বা অব্যয় জাতীয় পদগুলির প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য। গল্পটি থেকে এ জাতীয় যে কটি প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে, তা হল—আবলে, আউ, এঁছু, সেহির, সেইছুঁ, কেভি, তেতেবেলে ইত্যাদি। এগুলির সবকটিই সাধু ও চলিত বাংলায় অপরিচিত। এগুলিকে বাংলা ভাষার সম্পত্তি বলে দাবী করা চলে না।

ইতিপূর্বে যে শব্দবিভক্তি এবং অনুসর্গগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে তার কয়েকটিকেই প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বাংলা ভাষার সম্পত্তিবলে দাবী করা যায় না, যেমন—কর্মকারকে -কু- এবং অপাদান কারকে -নু- বিভক্তি, কর্তৃকারকের বহুবচনে —মেনে, সম্বন্ধ পদের বহুবচনে—মেনকার। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এ জাতীয় প্রয়োগের অনুপাত কত? সামান্যই। অন্যদিকে প্রকাশভঙ্গী এবং ইডিয়ম প্রয়োগের বিষয়টি চিন্তা করলে চলিত বাংলার প্রবল প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

এবারে ক্রিয়াপদগুলির রূপ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বর্তমান কালের তিন প্রস্থ ক্রিয়ারূপের মধ্যে একমাত্র ঘটমান প্রস্থের '-উচি' ধাতুবিভক্তিটির

সঙ্গে বাংলা ভাষার কোন যোগসূত্র নেই। অতীতকালের তিনপ্রস্থ ক্রিয়ারূপের মধ্যে ঘটমান প্রস্থের '-থিলা' সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়। এছাড়া, অন্যসব ধাতু বিভক্তি -গুলির সঙ্গে (-থায় ও -থান বাদে) বাংলা ভাষার কোন না কোন স্তরের সম্পর্ক কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও বা পরোক্ষ। অর্থাৎ এই উপভাষাটির একমাত্র উচ্চারণ রীতি ছাড়া অন্যক্ষেত্রগুলিতে বাংলার দাবী অত্যন্ত জোরালো। ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে এই বিচার অবশ্য এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। এই উপভাষাটিকে সাধু এবং শিষ্ট ওড়িয়া ভাষার দিক থেকেও বিচার করে দেখতে হবে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তার কোন অবকাশ নেই। তবে একথা এই প্রবন্ধ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সাধু বা চলিত বাংলার নিরিখেই কেবল প্রান্তীয় উপভাষাগুলির চরিত্র বিচার করা চলে না। প্রাচীন ও মধ্যবাংলা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক বাংলা উপভাষা-গুলির কথাও এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। কোন একটা প্রয়োগ দেখে মনে হল যে সেটা ওড়িয়ার অত্যন্ত কাছাকাছি। তাতেই সে সম্বন্ধে রায় দেওয়া চলে না। হয়তো সেটা উত্তর বঙ্গীয় বা দক্ষিণপূর্ব বঙ্গীয় উপভাষায় বা মধ্য বাংলায় পাওয়া যেতে পারে। প্রান্তীয় উপভাষা যাকে ইংরেজীতে বলা হয় fringe dialect অনেক সময়ই খুব রক্ষণশীল হয় ফলে এগুলির মধ্যে অনেক প্রাচীন উপাদান জীবন্ত অবস্থায় থেকে যায়। এগুলি বলা হয় relics। এই জন্যই পঞ্চাশ বৎসর আগে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা যেমন এখনো গ্রহণযোগ্য তেমনি তাঁর দ্বারা প্রস্তুত বাংলা ভাষার লক্ষণের তালিকাটিকেও আরেকটু বাড়ানো দরকার। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমতটি প্রণিধান করা যাক—

"The Aryan speech seems to have been in two forms in Rāḍha, one of which used as a substantive auxilary the root thā along with the root ach, and employed the word māna, māṇa <mānava for indicating the plural of names of sentient beings and also retained the affix— n <ānām (the OIA genitive plural affix) in the oblique plural; and the other form of Rāḍha speech did not have these characteristics. From the former originated Oriya, and tha so called Bengali dialect of south west Midnapore".৪ একই সূত্র থেকে উদ্ভূত ওড়িয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের "তথাকথিত" বাংলা উপভাষা। এই জন্যেই আমাদের আলোচ্য নমুনাটিতে ওড়িয়াসদৃশ প্রয়োগ

অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু এই জন্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের কথ্যভাষাকে "so called Bengali Dialect" বা "তথাকথিত বাংলা উপভাষা" কেন বলা হবে? অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় যে ঐতিহাসিক বিচার করেছেন তার পরে কোনরকম দ্বিধার অবকাশ থাকা উচিত নয়। তাছাড়া, যে কোন রকমের অনুমানের থেকে তথ্যের সাক্ষ্য অনেক বেশী মূল্যবান।

১। **S. K. Chatterji – Origin and Development of Bengali Language. Vol I, Page 139**

২। যোগেশচন্দ্র বসু—মেদিনীপুরের ইতিহাস। পৃ: ২৪।

৩। প্রবন্ধ লেখক মধ্যম পুরুষে তিন শ্রেণী এবং প্রথম পুরুষে দুই শ্রেণী বোঝানোর জন্যে পুরোনো পারিভাষিক শব্দের বদলে নতুন পরিভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী—মধ্যম পুরুষ :— সাম্মানিক —আপনি, ভদ্র—তুমি, অন্তরঙ্গ—তুই।
প্রথম পুরুষ :—সাম্মানিক—তিনি, ভদ্র—সে।

৪। **S K. Chatterji—Origin and Development of Bengali Larguage. Vol 1 Page 137.**

নরেশ গুহ

বাংলা নাটকের আইরিশ প্রতিধ্বনি

বিশশতকী ইউরোপের কবি উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস-এর সঙ্গে প্রাচীন অথবা অর্বাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের কোনো ফলপ্রসূ যোগাযোগ হয়েছিল কিনা, কবির জীবনীকারেরা এ প্রশ্নটিকে তেমন আমল দিতে চান না। তাঁদের মতে, ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে আবহমান কাল থেকেই কোনো ইতিহাস চেতনা নেই। এখানে ইতিহাস কখন যে পুরাণের মধ্যে খেই হারিয়ে ফেলে তা বুঝে ওঠা দায়। আর এই ইতিহাস চেতনা নেই ব'লেই কাব্য লিখতে গিয়ে ভারতীয় কবিরা এতো অস্বাভাবিক রকমের অত্যুক্তি ক'রে বসেন যা উপভোগ করতে গেলে বিশেষ এক ধরণের মানসিক প্রবণতা প্রয়োজন। আর যারই থাক ইয়েটস-এর মধ্যে সে-রকমের প্রবণতা যখন, বিশেস করে বর্তমান শতকের প্রথম দশক থেকেই অনুপস্থিত, তাঁর পক্ষে কাজেই ভারতীয় ধ্যানধারণা কিংবা এদেশী কাব্যকলা বিষয়ে ভদ্রতার অতিরিক্ত উৎসাহ রক্ষা করা নাকি অবিশ্বাস্য। অথচ তাঁর রচনাশক্তির উদ্গমকালে মোহিনী চ্যাটার্জি, মধ্যবয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং আয়ুর অপরূপ শেষ দশকে শ্রীপুরোহিত স্বামী নামক ভারতীয় সাধুর সঙ্গ উল্লেখ না-ক'রেও উপায় নেই। পশ্চিমী লেখায় এই তিনের মধ্যে একমাত্র যাঁর প্রতি ঈষৎ মনোযোগ দেওয়া হ'য়ে থাকে তিনি ঐ প্রথমোক্ত বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ যাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে আধ শতকেরও বেশি পেরিয়ে এসে লেখা একটি আশ্চর্য কবিতায় তাঁর নামকে ইয়েটস অমর করেছেন। এঁর

কিংবা শ্রীপুরোহিতের সঙ্গে আইরিশ কবির সম্পর্ক বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য নয়। এমনকি বাঙালী বিশ্বকবি তাঁকে কতোটা কী ভাবে অভিভূত করেছিলেন কিংবা করেননি, তারও সবটা এখানে যাচাই করতে চাই না। আমার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলা এবং আইরিশ দুটি বিরোধী স্বভাবের নাটকের মধ্যে এযাবৎ অনুচ্চারিত একটি সম্পর্কের উদ্ঘাটন করা। একটির লেখক রবীন্দ্রনাথ, আরেকটির ডব্লু বি ইয়েট্স।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে, ইংরেজি গীতাঞ্জলির বিখ্যাত ভূমিকা রচনার অনতিকাল পরেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ পূর্ণ হ'য়েছিল, অন্তত কবি রবীন্দ্র-নাথের প্রতি এরিন্ আবেগের আকস্মিক উষ্ণতা আচম্বিতে হ্রাস পেয়েছিল। প্রকাশিত চিঠিপত্রে উল্লেখের ধরণ দেখেও উল্লসিত হওয়া কঠিন। এ কথাও মনে না-ক'রে পারি না যে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত সোনালি-গ্রন্থের পাতাতেও সোৎসাহে, স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে তিনি অভিনন্দন পাঠাননি। হয়তো কবির তুলনায় কবিভক্তদের প্রতি তিনি রুষ্ট ছিলেন বেশি, যেমন ছিলেন বর্ণর্ড শ। সব সত্ত্বেও, বাঙালী মহাকবির তির্যক প্রভাব তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত রচনায় এমন চমকপ্রদ ভাবে উপস্থিত যে রবীন্দ্রনাথের উপর থেকে কখনো তাঁর মন একেবারে উঠে গিয়েছিলো একথা ভাবা যায় না। মনোভাবের পরিবর্তন একটা ঘটেছিল নিশ্চয়ই, তবে সেটা 'গীতাঞ্জলি'তে আবিষ্কৃত কবিপ্রতিভার উৎকর্ষ ঘটিত নয়, কাব্য বিষয়ে স্বকীয় আদর্শ সংক্রান্ত।

অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের যেটুকু রচনা তিনি পাঠ করেছিলেন তা থেকে তাঁর কবিতায় অনুমিত ঈশ্বরাধিক্য ইয়েট্সকে প্রীত করেনি। রাণাডে রচিত উপনিষদের দর্শন বিষয়ক গ্রন্থটি উপহার নিয়ে অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র বসু যখন আইরিশ কবি সন্দর্শনে যান তখন ইয়েট্স তাঁকে বুঝিয়ে বলেছিলেন ভারতীয় কবির সঙ্গে তাঁর অমিলটা ঠিক কোথায়। মিলও অবশ্য ছিলো। উপনিষদের প্রতি আনুগত্য উভয়েরই প্রবল। কিন্তু ইয়েট্স-এর ধারণা হ'য়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত মৌলদ্বন্দ্বের চেতনা, দ্বন্দ্বাতীত শান্তি এবং মঙ্গলবোধের তলায় চাপা পড়েছে। নাটকীয় ভঙ্গীতে খাপ খুলে, সাটো-র প্রাচীন তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে উঠে আধুনিক ভারতবর্ষের প্রতি যে-বাণী তিনি পাঠিয়েছিলেন—'দ্বন্দ্ব চাই, আরো দ্বন্দ্ব চাই',—তার যথার্থ তাৎপর্য অধ্যাপক বসু বুঝতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। যদি অনুমান করা হয় যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে লাঠালাঠি

করানোই ছিলো ইয়েট্স-এর কাম্য তাহলে অনুমানকারীর পক্ষে এ-কবির দরজায় নাক না-গলানোই ভালো ছিলো।

আসলে ভারতীয় ঐতিহ্যের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় রাণাডের সঙ্গে ইয়েট্স-এর মিল ছিলো বেশি। এবং ভারতবর্ষে বিমূর্ত দার্শনিক চিন্তার ক্রম-পরিণতির পথ ধ'রে ভারতীয় ইতিহাসের বিবর্তন বিষয়েও তাঁদের প্রত্যয় ছিলো অভিন্ন। অদ্বয়ী আত্মনির্ভর ব্যতীত বীর্যের সাধনা সার্থক হয় না বটে, কিন্তু বীর্য-বানের পক্ষে ঐহিক জীবনভোগের প্রতি যতদূর মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, শান্তম্-শিবম্-অদ্বৈতম্-এর প্রতি প্রাণমনকে অত্যধিক ধাবিত করলে সেটা আর সম্ভবপর থাকে না। কাজেই রাণাডে-র ন্যায় ইয়েট্স-এরও ধারণা জন্মেছিল যে প্রথমে উপনিষদিক ভাবনাচিন্তার বিকাশ এবং পরে বৌদ্ধমতের প্রসারের ফলেই প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে বীর্যসাধনার ধারা একদা লোপ পেয়েছিল। এবং ইয়েট্স যেহেতু আইরিশ ভগ্নপুরাণের পুনরুদ্ধার এবং স্বীয় রচনায় তার প্রতীকী প্রয়োগের সাহায্যে বীর্যাভিলাষী-যুগের স্বপ্ন রচনায় সমধিক উৎসাহী ছিলেন কাজেই ইংরেজি 'সাধনা' গ্রন্থের লেখককে প্রতিপক্ষ হিশেবে গণ্য করতে তাঁর বাধেনি, কেননা উক্ত লেখক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—নিজেকে বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত ব'লে প্রচারতো করেইছিলেন, উপরন্তু অতিরিক্ত দ্বন্দ্বনির্ভর জ্ঞানে গ্রীক যুগ থেকে শুরু করে আবহমান কালের প্রতীচ্য সভ্যতাকে তিনি এক বাক্যে নামঞ্জুর ভেবেছিলেন। আমরা যারা বাংলা পড়তে পারি, ইংরেজি রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালি কবিকে যাঁদের চিনতে হয় না, সেই আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের এই চেহারা খুবই অচেনা ঠেকবে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলা ভাষা জানতেন না ব'লে, প্রচলিত অনুবাদ গ্রন্থাদিই ছিলো ইয়েট্স-এর সম্বল। ইংরেজি ভাষার রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালি কবির ভগ্নাংশ মাত্র তা আমরা সবাই জানি, কিন্তু ইংরেজি 'সাধনা' গ্রন্থের লেখককে বিদেশী পাঠক ভুল বুঝলে তা নিয়ে রাগ করাও সাজে না। 'গীতাঞ্জলি'র কবির সঙ্গে 'সাধনা'-র ভাবুককে ইয়েট্স মেলাতে পারেননি।

আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথে ইয়েট্স-এর আগ্রহ নিস্তাপ হ'তে শুরু ক'রে সেদিন থেকেই যেদিন অক্সফোর্ড প্রবাসী বাঙালি যুবক ক্ষিতীশ সেনের করা 'রাজা' নাটকের অনুবাদ 'দি কিং অব দি ডর্ক চেম্বার' ওদেশে প্রকাশিত হলো। ইয়েট্স-এর প্রধান উৎসাহেই লণ্ডনের এ্যালবার্ট হলে ভাষান্তরিত এই রূপক নাট্যের প্রথম অভিনয় করেছিলেন লিটল্ থিয়েটার ১৯১৩ সালে। অথচ' যদিও প্রায় একই

কবি ভগ্নীর কুয়ালা-প্রেস থেকে সীমিত সংস্করণে 'ডাকঘর'-এর অনুবাদ ছাপা হলো, এবং ডাবলিনের এ্যাবি থিয়েটরে সেই নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে ইয়েট্‌স রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহ ভরা চিঠিও লিখলেন, তবু 'রাজা' নাটক বিষয়ে তিনি নীরব। এ প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে ১৯১৩ সাল থেকেই ওদেশে ভারতীয় তান্ত্রিক গ্রন্থাদি আর্থার আভালন্ কৃত অনুবাদে প্রথম ছাপা হ'তে শুরু করে। সে সব গ্রন্থের আদি পাঠকদের মধ্যে ইয়েট্‌স অগ্রগণ্য, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কী কী বই কবি সারা জীবনে পড়েছিলেন তা নিয়ে ওদেশে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা হ'য়ে গিয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে গীতা উপনিষদ কিংবা কালিদাস তো বটেই, এমন কি নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'দি যাত্রা অর পপুলার ড্রামাস্ অব বেঙ্গল' নামক বইটিও (১৮৮২) তিনি প্রায় ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে ফেলে-ছিলেন। কিন্তু তিনি যে তন্ত্র শাস্ত্রও পড়েছিলেন সে কথা কেউ বলেন না। অথচ ১৯৬২ সালে কবিপত্নী নিজে আমাকে সেই গ্রন্থাবলীর কবিকৃত আশ্চর্য সংগ্রহ দেখিয়ে-ছিলেন ডাবলিনে, ব'লেছিলেন যে ১৯১৭ সালে তাঁদের বিবাহেরও অনেক আগে থাকতেই ডব্লু. বি. সে শাস্ত্রের চর্চা করেছেন। উপনিষদের বিমূর্ত চিন্তাভাবনার তুলনায় তন্ত্রোক্ত বীর্যসাধনার প্রতি তখন থেকেই যে ইয়েট্‌স-এর পক্ষপাত দেখা দিয়েছিল আমার সেই অনুমানের পক্ষে সব চাইতে বড়ো প্রমাণ তাঁর তৎকালীন কবিতাবলী—যেখানে রূপক হিসেবে প্রত্যক্ষ যৌন প্রসঙ্গের তিনি প্রথম অবতারণা করলেন। উপনিষদেরও সেই সব অংশের প্রতিই উৎসাহ ছিলো ইয়েট্‌স-এর যেখানে তাঁর নিজের অনুমিত বীর্যবান ক্ষাত্র সভ্যতার আদর্শ স্বীকৃতি পেয়েছে। 'এ ভিশান' নামক বহু আলোচিত এবং অনেকাংশে দুর্ভেদ্য ব্যক্তিগত দর্শনের গ্রন্থে একাধিকবার তিনি এ-প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ক্ষত্রিয় ঋষি জনক কিংবা অজাত শত্রু তাই তাঁর প্রিয় চরিত্র। কেননা বাগ্মী ব্রাহ্মণ গার্গ্যের ন্যায় অনন্য পরাব্রহ্মের প্রতি সমস্ত অভিপ্রায়কে ধাবিত করার প্রতি এঁদের সায় নেই। ক্ষত্রিয় বীর তাঁরা। রাজ্য থেকে অনাহার, অশিক্ষা দূর করার, এবং বহিঃশত্রুকে পরাভূত করার সমূহ দায়িত্ব তাঁদেরই হাতে। যে-পুরুষ আদিত্য মণ্ডলে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, জলে, দর্পণে, ধাবমান ব্যক্তির পশ্চাতে উৎপাদিত শব্দ মধ্যে, সকলদিকে ছায়াময় হয়ে বিরাজমান সেই ব্রহ্মের প্রসঙ্গে অজাতশত্রু অসহিষ্ণু না-হ'য়ে পারেন না: 'এতস্মিন্ মা মা সংবদিষ্ঠাঃ'। কেননা ক্ষত্রিয় ঋষির উপাস্য হলেন সেইআদি পুরুষ যিনি জ্যোতি ষ্মান্, তেজস্বী, অদম্য, জিষ্ণু, অন্যতস্ত্যজায়ী,

আত্মন্বী এবং সহিষ্ণু; যাঁর যজ্ঞে প্রতিদিন অবিরল সোমরস নিষ্কাশিত হয়; যিনি অবিজিত সৈন্যস্বরূপ; যাঁকে উপাসনা করলে তেজস্বী সন্তানের জন্ম হয়, ইহলোক থেকে প্রজাবংশ লোপ পায় না, শত্রুকে দমন করা যায়, উত্তম ভৃত্যাদির দ্বারা পরিবৃত থাকার সৌভাগ্য আসে, এবং আয়ুষ্কাল পূর্ণ না-হ'লে মৃত্যু স্পর্শ করে না। বাগ্মী গার্গ্য অবশেষে ক্ষত্রিয় ঋষির কাছে হার মেনেছিলেন। এবং এই ক্ষত্রিয় ঋষিই সাধুবাদ পেয়েছিলেন বিশশতকী এরিন কবির কাছে।

'গীতাঞ্জলি'-র পরে 'সাধনা', 'রাজা' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠের পর থেকেই, আমার বিশ্বাস, ইয়েট্‌স-এর কাছে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ তাই উপনিষদের বিমূর্ত চিন্তা ধারার প্রতীক হিশেবে প্রতিভাত হ'তে থাকেন। এবং ১৯২৩ সালে প্রকাশিত তন্ত্রশাস্ত্র, আর তার পরের বছর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ঔপনিষদ সংস্কৃতির সমান্তরালে প্রবহমান—হয়তো সাম্প্রতিক কালে অবজ্ঞাত—অন্য এক ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি দিনে-দিনে তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে ওঠে। 'গীতাঞ্জলি'-ঘটিত রবীন্দ্রনিষ্ঠায় আপাতত ভাঁটা পড়লেও বাঙালি কবির অসামান্য প্রতিভা তিনি যে ভুলতে পারেননি তা অবশ্য তাঁর একাধিক কবিতার অন্তর্গত প্রচ্ছন্ন উল্লেখ থেকেই ধরা যায়। মড গন্‌-এর কন্যা ইজোণ্ট স্বীয়জননীর অনু-সরণে যিনি কবির প্রেম প্রত্যাখ্যান করেন, সেই ইজোণ্টগণ এককালে যেহেতু রবীন্দ্রনাথে মজেছিলেন, বাংলা শিখতে উদ্যোগী হ'য়েছিলেন একমাত্র ঠাকুর কবিকে মূলভাষায় পড়বেন ব'লে, এমনকি তাঁর কিছু কবিতা ফরাসীভাষায় অনুবাদও করেছিলেন, কাজেই তাঁর প্রত্যাখ্যানের বেদনা জানিয়ে লেখা "ওয়েন আহার্ণে এ্যাণ্ড হিজ ডান্সার্স" (১৯১৭) কবিতায় ইয়েট্‌স অতি কৌশলে ঠাকুরকবির প্রসঙ্গ না এনে পারেননি, এবং 'দি গার্ড্‌নার' গ্রন্থের একটি কবিতা থেকে দুটি পংক্তি ঈষৎ বদল ক'রে নিজের কবিতায় তিনি জুড়েও দিয়েছেন :

> Let the cage bird and the cage bird mate and the wild bird
> mate in the wild.

কে খাঁচার পাখি, কে বনের, সেটা এ-প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। তাছাড়া মূল কবিতায় সঙ্গমের কথা ছিলো না, সাক্ষাতের কথা ছিলো, ইংরেজিতে যে-শব্দ দুটির একই উচ্চারণ। এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আর উপনিষদের পাখি—একই সঙ্গে দুইয়ের উল্লেখ করা হ'য়েছে তা আশা করি দৃষ্টি এড়াবে না। ১৯২২ সালে লেখা, পরে আংশিক ভাবে বর্জিত, "দি হেরো, দি গার্ল, এ্যাণ্ড দি ফুল" কবিতাতেও ইয়েট্‌স আবার

একবার রবীন্দ্রনাথে ফিরেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ সংস্করণে ছাপা এই কবিতাটি পড়লে সন্দেহ থাকবে না যে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'চিত্রা' নাটকের বক্তব্যকে অস্বীকার করার ইচ্ছা থেকেই কবিতাটির জন্ম। 'চিত্রা—বাংলা 'চিত্রাঙ্গদা'—নাটকের উত্তরে ইয়েট্‌স বলবেন: 'Only God has loved us for ourselves,' এবং আমরা যেহেতু ঈশ্বর নই, বিদেহী নই, কাজেই দেহকে আমরা সমাদর না-ক'রে পারি না। আমার বিশ্বাস 'চিত্রাঙ্গদা'-র প্রভাব, অন্তত সাময়িক ভাবে, ইজোল্ট-এর উপরেও পড়ে থাকবে, যেটা আইরিশ কবির মনঃপুত ছিলোনা। যে-'চিত্রাঙ্গদা' নাটককে বাংলাদেশের কোনো কোনো বিদ্বান ব্যক্তি একদা অশ্লীল জ্ঞান করেছিলেন, ইয়েট্‌স তাকে যদি বড় বেশি পবিত্র ব'লে ভেবে থাকেন তার কারণ নাটকটি তিনি বাংলায় পড়েননি, পড়েছিলেন রূপান্তরিত 'চিত্রা', যেখানে যবনভাষিনী চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলেন:

> 'Whom do you seek in these dark eyes, in these milk-white arms ?···Not my true self, I know. Surely this cannot be love, this is not man's highest homage to woman. Alas, that this frail disguise, the body, should make one blind to the light of the deathless spirit !'

"ফর এ্যান্ গ্রেগরি" নামের কবিতাতেও ইয়েট্‌স একথারই প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন ব'লে আমার বিশ্বাস:

> Only God my dear,
> Could love you for yourself alone
> And not your yellow hair

এ-কবিতার রচনাকাল ১৯৩০। অর্থাৎ এতদিন পরেও রবীন্দ্রনাথ হানা দিচ্ছেন আইরিশ কবির মনে, যদিও বিসদৃশ আদর্শের প্রতীক হিশেবে।

ইয়েট্‌স নিজের কবিতায় এ'ভাবে তাঁকে আজীবন মনে রেখেছিলেন একথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন ব'লে মনে হয় না, কেননা সমকালীন কবিদের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিলো নিতান্তই যৎকিঞ্চিৎ। ১৯১২ সালের সেই তপ্ত অনুরাগের যুগেও আইরিশ কবির কবিতাবলী তিনি প'ড়ে দেখারও উৎসাহ পাননি। বরং ইয়েট্‌স যখন 'গীতাঞ্জলি'-র স্মরণীয় ভূমিকা রচনার জন্য নর্মাণ্ডির নির্জনবাসী, ঠিক সেই সময় 'প্রবাসী' পত্রিকার জন্য ইয়েট্‌স বিষয়ে প্রায় ফরমায়েসী যে-প্রবন্ধটি তিনি তৈরি

করেছিলেন ("কবি য়েট্‌স", 'পথের সঞ্চয়') তা ইয়েট্‌স-এর কবিতা প'ড়ে লেখা নয়। —"তিনি যে কবি, তাহা তাঁহার কবিতা পড়িয়া জানিবার সুযোগ এখনো আমার সম্পূর্ণ ঘটে নাই।" প্রবন্ধটি প্রধানত কবিতার সমালোচনা ঘেঁটে লেখা! তাতে আবার জর্জ মূরের উল্লেখ করা হয়েছে, তার সঙ্গে ইয়েট্‌স-এর ব্যক্তিগত বিসম্বাদ সর্ববিদিত! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে সেসব কবিতা পড়বার সময় না-পেলেও, আমার ধারণা, ইয়েট্‌স নিজেই তাঁকে পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু কবিতা প'ড়ে শুনিয়েছিলেন তাঁর সেই আঠারো নম্বর ওবর্ণ বিল্ডিং-এর ঘরে, যেখানে ব'সে 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদ বিষয়ে অনেকদিন কথা হয়েছে উভয়ের মধ্যে। আমার এ-ধারণার কারণ ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের লেখা উল্লিখিত বাংলা প্রবন্ধে "এ কোট" নামে একটি কবিতার গদ্য ব্যবহার: "সংসারের রণক্ষেত্রে লড়াই করা যাহার ব্যবসায় তাহাকে কবজ পরিতে হয়; তাহাকে সংসারের সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন গ্রহণ করিতে হয়; নহিলে, পদে পদে চারিদিক হইতে তাহাকে আঘাত লাগে। কিন্তু আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যাহার কাজ, আবরণের অভাবই তাহার যথার্থ সজ্জা। কবি য়েট্‌সের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমার ঐ কথাই মনে হইতেছিল।" প্রবন্ধের এ-অংশটি আমি যে-কবিতার প্রতিধ্বনি ব'লে মনে করি Responsibility গ্রন্থে সংকলিত ইয়েট্‌স-এর সেই কবিতাটি হচ্ছে এই:

I made my song a coat
Covered with embroideries
Out of old mythologies
From head to throat;
But the fools caught it,
Wore it in the world's eyes
As though they'd wrought it.
Song, let them take it,
For there's more enterprise
In walking naked.

এ কবিতা রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই পড়েছিলেন ব'লে মনে হয়, কেননা ১৯১২ সালে লিখিত হ'লেও কবিতাটি প্রথম ছাপা হয় ১৯১৪ সালের মে মাসে শিকাগোর 'পোইট্রি' কাগজে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ যে পত্রিকায় প্রথম ছাপা

হয়েছিলো। গদ্যে কৃত সারমর্মটি এইজন্য উল্লেখযোগ্য যে ইয়েট্‌স-এর আর কোনো কবিতার প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথে খুব সম্ভব অনুপস্থিত।

প্রসঙ্গত বলি, 'মডার্ণ ল্যাঙ্গুয়েজ রিভিউ' নামে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা পত্রিকায় (অক্টোবর ১৯৬৫) জনৈক লেখক সাব্যস্ত করেছেন যে ইয়েট্‌স রচিত উদ্ধৃত কবিতাটির প্রেরণা হচ্ছে 'গীতাঞ্জলি'রই সাত নম্বর কবিতা, যার প্রথম পংক্তি হচ্ছে : 'My song has put off her ornaments'. লেখকের মতে কবিতাটি শুধু ইয়েট্‌স-কে নয়, অনুপ্রাণিত করেছিলো হিস্পানী কবি হিয়েমেনেথ্‌-কেও, যার ফলে তাঁরা উভয়েই অতঃপর স্বতন্ত্রভাবে আভরণবর্জিত 'নগ্ন কবিতা' রচনায় মন দেন, গ'ড়ে তোলেন আধুনিক কবিতার অকপট ঋজু ভাষা। 'গীতাঞ্জলি'-৭, ইয়েট্‌স-কৃত 'এ কোট' আর হিয়েমেনেথ্‌-এর 'ভিনো, প্রিমেরো, পিউরা'—এই তিন কবিতাই, লেখক দেখাচ্ছেন, 'express the rejection of a highly decorative poetry in favour of one stripped of ornamentation, a poetry of verbal discipline whose object is the most intense precise expression of particular feelings and experiences.'। আপাতত অবিশ্বাস্য মনে হলেও, আগাগোড়া প্রবন্ধ প'ড়ে দেখলে প্রতীচ্যে রবীন্দ্রনাথের অভিঘাত বিষয়ে নতুন ক'রে না-ভেবে পারা যায় না। 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার'—রবীন্দ্রনাথের এই মূল কবিতা প'ড়ে কেউ আমরা কখনো কল্পনা করিনি যে রবীন্দ্রনাথ এখনো কবি হিশেবে সালঙ্কারা রচনারীতি ত্যাগ ক'রে নিরাভরণ কাব্যরচনার প্রতি তাঁর অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। তবে, মূলের যথাযথ অনুকৃতি নয় যে-অনুবাদ তা থেকে ইয়েট্‌স বা হিয়েমেনেথ্‌ তাঁদের স্বকীয় কাব্যরীতির মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলার উন্মাদনা যদি পেয়ে থাকেন তাতে অবাক হবো কেন ? এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি আমি। এখানে শুধু এটুকুই প্রাসঙ্গিক যে রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রবন্ধে ইয়েট্‌স-এর কবিতাটি গদ্য চেহারায়, ভিন্ন উপলক্ষ্যে, ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও আজ পর্যন্ত সেটা কারও চোখে পড়েনি।

তৎসত্ত্বেও একথা ঠিক যে ইয়েট্‌স-কে শেষ পর্যন্ত ভালো লাগেনি রবীন্দ্রনাথের। কেননা, যে-স্বাদেশিকতার বেদনা থেকে এরিন্‌ চিত্তস্বাতন্ত্র্যের প্রথম প্রকাশ হয় তার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের মতে, 'স্বভাবতই বিস্তর ফেনিলতা' দেখা দিয়েছিলো। এবং এই বেদনার ফলে দেশের ঐতিহ্যের দিকে যখন দৃষ্টি পড়ে, যেমন ইয়েট্‌স-এর পড়েছিলো, তখন প্রবল অহঙ্কারবশে 'সাঁচ্চার সঙ্গে ঝুটাকে' আমরা সমান মূল্য দিয়ে বসি ব'লে

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। ইয়েট্স, তা তাঁর কাব্যসৃষ্টির সহায়ক জ্ঞানে হলেও, ভূতপ্রেত দিব্যযোনিতে উৎসাহী ছিলেন, একদা থিয়োসফির ভক্ত ছিলেন, এবং লণ্ডনের বেপাড়ায় অর্বাচীন দাসদাসী সমাদৃত ভূত-নামানো বৈঠকেও যাতায়াত করতেন ব'লে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁকে বেশি মর্যাদা দেওয়া সম্ভব ছিলো না। আসলে প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে কতোটা সাঁচ্চা কতোটা ঝুটা থাকে তা নিয়েই দুই কবির মধ্যে মূল বিরোধ, আমি অন্তত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

এই বিরোধ হয়তো অনুচ্চারিতই থাকতো যদি না কবির সপ্ততিতম জন্মদিনের অভিনন্দন উপলক্ষ্যে একটি সোনালি গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হতো বাংলা দেশে যাতে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে নতুন ভাবনার প্রয়োজন হতো ইয়েট্স-এর, এবং যদি না স্টার্জ মূর-এর সুপারিশে শ্রীপুরোহিত স্বামী নামক কবিযশোপ্রার্থী এক ভারতীয় যোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটতো তাঁর। উক্ত যোগী সান্নিধ্যের ফলে ইয়েট্স তাঁর শেষ জীবনে ভারতীয় যোগ শাস্ত্রাদি বিষয়ে কতিপয় দীর্ঘ এবং উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক প্রবন্ধই শুধু লেখেন নি, স্বোপার্জিত কড়িতে দেনা শোধ দেবার ইচ্ছে নিয়ে উজ্জ্বল কবিতা রচনার ভাবাতে উপনিষদেরও অনুবাদ করেছেন, এবং অবশেষে এমন একটি অর্থ গভীর ট্রাজিক প্রহসন লিখেছেন যার মধ্যে 'রাজা' নাটক অর্থাৎ 'দি কিং অব দি ডর্ক চেম্বার'-এর রূপান্তরিত প্রতিবিম্ব দেখার জন্য ভারী রকমের পরিশ্রম করতে হয় না। মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে পরিসমাপ্ত 'দি হর্ন্‌স এগ্‌' নামের এই 'অদ্ভুত, উদ্দাম, রাব্‌লেশিয় প্রহসন'টি-র বেপরোয়া উন্মাদনা পাছে আবার তাঁর বৃদ্ধ বয়সে ডাবলিন শহরে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাত করে, সেই আশঙ্কা ক'রেই শেষ পর্যন্ত, এমন কি নিজের প্রতিষ্ঠিত অ্যাবি থিয়েটরেও, সে-নাটকের অভিনয় তিনি আর করাননি।

প্রতীচীর মহাকবিকে যিনি এতদূর পর্যন্ত মাতিয়েছিলেন, শ্রীপুরোহিত স্বামী নামক সেই ভারতীয় যোগীটির নাম পর্যন্ত আমরা এদেশে শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না। বলা বাহুল্য, তিনি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কৃষ্ণমূর্তি শ্রীঅরবিন্দ, এমনকি দয়ানন্দ সরস্বতীর মতোও বিখ্যাত নন। ইয়েট্স অবশ্য এঁকে নিজে খুঁজে বার করেননি। ঘটক ছিলেন স্টার্জ মূর। যৌগিক সাধনায় সুষুপ্তিসিদ্ধি লাভ করেছিলেন ব'লে যোগীটি যে দাবী করতেন তার সত্যতা নির্ধারণে সাহিত্য পাঠকের দায় নেই। কিন্তু একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে ইয়েট্স-পুরোহিত সংসর্গ, পরিণামের দিক থেকে, এড্‌গার এ্যালেন পো-বোদলেয়ারের ঐতিহাসিক সংসর্গের সঙ্গেই তুলনীয়। পো-অনুবাদ করতে গিয়েই প্রতীচী কবিতার নিগূঢ় মন্ত্রণা আবিষ্কার করেছিলেন বোদলেয়ার;

অন্যপক্ষে শ্রীপুরোহিতের পরামর্শ থেকে ঐতিহ্য জিজ্ঞাসার আত্মকৃত মীমাংসা বিষয়ে ভারতীয় সমর্থন খুঁজে নিয়েছিলেন ইয়েট্‌স।

সংসারাশ্রমে শ্রীপুরোহিত ছিলেন মারাঠী ব্রাহ্মণ। ১৮৮২ সালে বেরারে তাঁর জন্ম হয়. এবং ১৯০৩ সালে তখনকার দিনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি-এ, পাশ করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্য প্রায় সবাই ছিলেন বাঙালী। কম বয়স থেকেই যোগসাধনার দিকে এই ব্রাহ্মণ বালকের মন গিয়েছিল। তীর্থ পরিক্রমা শেষ ক'রে তিনি সংসার ত্যাগে উদ্যত হ'লে তাঁর গুরু ভগবান শ্রীহংস তাঁকে কিছুকালের জন্য সংসারাশ্রমে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন যাতে তাঁর অন্তর থেকে বাসনার আগুন চিরতরে নিভে যায়। গৃহস্থ জীবনে তিনি বিবাহ করেন, একটি কন্যার পিতা হন, এবং শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর সম্মতি নিয়েই পাকাপাকি ভাবে সংসার ত্যাগ করেন। শুধু যে ধ্যানধারণা এবং অলৌকিক ঘটনাদি প্রত্যক্ষ করেই তিনি কাল কাটিয়েছেন তা নয়; মারাঠী হিন্দী উর্দু এমন কি ইংরেজি ভাষাতেও তিনি মরমী কাব্যরচনার প্রয়াস করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ যখন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়লো তখন বম্বাইতে উইল্‌সন্ কলেজের অধ্যক্ষ কোনো এক রেভারেণ্ড ডক্টর স্কট শ্রীপুরোহিতকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তার রচিত মরমী কবিতাবলীর খাঁটি সমাজদার খুঁজতে হ'লে সমুদ্র পেরিয়ে তাঁকে লণ্ডনেই শেষ পর্যন্ত পৌছতে হবে। নানা কারণে সে অভিযান তখন সম্ভব হয়নি। এর বহুকাল পরে, কবি শ্রীপুরোহিত স্বামী ভারতধর্ম মহামণ্ডলের পরিচয়পত্র পকেটে ক'রে হিন্দুধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিলেত যাত্রা করলেন ১৯৩০ সালে। উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার, কিন্তু তাঁর কবিযশোপ্রার্থী হৃদয়টি যথোচিত পরিমাণে উদাসীন ছিলো ব'লে মনে হয় না, কেননা বিলেত পৌছেই রটেনস্টাইন, স্টার্জ মূর প্রভৃতি ঠিক তাঁদের সঙ্গেই সর্বপ্রথম তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন যাঁরা ছিলেন প্রতীচ্যে রবীন্দ্রযশ-প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা। স্বামীজির 'বাবু ইংলিশে' লেখা ছ-সাতশো কবিতার পাণ্ডুলিপি নিয়ে কিঞ্চিৎ বিব্রত হ'য়ে স্টার্জ মূরকে অগত্যা 'গীতাঞ্জলি'-র ভূমিকা লেখকের শরণ নিতে হ'য়েছিল তার প্রমাণ আছে। ১৯৩১-৩২ সালে ইয়েট্‌স-কে লেখা স্টার্জ মূরের অপ্রকাশিত অথচ প্রসঙ্গিক চিঠিপত্রের কপি রিচার্ড এলম্যানের সংগ্রহে আমি দেখেছিলাম মনে পড়ে। রটেনস্টাইনের আত্মচরিত তৃতীয় খণ্ডে ইয়েট্‌স-এর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপে যে —ভারতীয় কবিযশোপ্রার্থীর উল্লেখ আছে তিনি এই মারাঠী স্বামীজি ব'লেই আমার বিশ্বাস। উত্যক্ত হ'য়ে ইয়েট্‌স তাঁকে এ-বিষয়ে যা লিখেছিলেন সেসব কথা

ইংরেজি ভাষায় কাব্যরচনালিপ্সু ভারতীয়দের প্রতি স্মরণীয় সতর্কবাণী ব'লে গণ্য হওয়া উচিত : 'I have no doubt that your Indian is, as you say, charming and sensitive, but he is writing in a language in whtch he does not thlnk Tell him to go back to India and start a boycott of the English language. When the English insisted on all the higher education of the Indian being carried on in English they did the greatest wrong to India, making a stately people clownish, putting indignity into their very souls. Probably your poet has talent, may even make a name for himself, if he will write in the language he has learned in childhood' শ্রীপুরোহিতের আশা কাজেই পূর্ণ হ'লো না, ইয়েট্স কিছুতেই 'গীতাঞ্জলি'-র মতো ভূমিকা লিখলেন না তাঁর কবিতার। কিন্তু নিশ্চয়ই এই ভেবে তিনি সান্ত্বনা পেলেন যে তার পরিবর্তে ইয়েট্স ম্যাক্‌মিলানকে দিয়ে তাঁর যোগিজীবনের আখ্যান ছাপিয়ে দিলেন, নিজে তার ভূমিকা লিখলেন, এবং সেই ভূমিকার শেষ দিকে স্বামিজীর কয়েকটি কবিতার অনুবাদেরও স্থান ক'রে দিলেন। এই ভাবে কবি পুরোহিত স্বামীর অনুপ্রবেশ ঘটলো ইংরেজি সাহিত্যে। ১৯৩৭ সালেও এই যোগী জীবিত ছিলেন কিনা আমার জানা নেই। থাকলে, ইয়েট্স সংকলিত 'দি অক্সফোর্ড বুক অব মডার্ণ ভার্স'-এর পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশাপাশি তাঁর নিজের সমপরিমাণ কবিতাকে আসন পেতে দেখে নিশ্চয়ই তিনি উল্লাস বোধ করেছিলেন। ইয়েট্স-এর এই কীর্তিটিকে ভ্রূকুঞ্চিত পাঠক গুরু-দক্ষিণা ব'লেই মেনে নেবেন।

স্বামীজির চরিত্রে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে স্টার্জ মূর আদি অনেকেই একে একে ত্যাগ করলেন তাঁকে ; অবিচলিত থাকলেন শুধু ইয়েট্স। সেটা এজন্য নয় যে তিনি এঁর কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন, কিংবা হিন্দু হওয়ার আশায় গুরু ব'লে মেনে নিয়েছিলেন এঁকে ; শুধু এইজন্য যে এতদিনে ইয়েট্সীয় পুরাণকল্পনায় একটি অত্যাবশ্যক প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন শ্রীপুরোহিত। সুহৃৎদের অনুরোধ, এমন কি স্বীয় পত্নীর নির্বন্ধ পর্যন্ত অগ্রাহ্য ক'রে, অসুস্থ শরীরে আইরিশ কবি ১৯৩৫ সালের শীতকালে চললেন ভূমধ্যসাগরীয় হিস্পানী দ্বীপ মেয়র্কাতে. যোগী সহযোগে দশপ্রধান উপনিষদের এক নতুন অনুবাদ প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে। পত্নী সঙ্গে না-থাকায়, তাঁর সেবাকর্মের ভার নিয়েছিলেন শ্রীমতী ফোডেন নামে এক বিত্তশালী

মহিলা। ইনি নিজের খরচায় স্বামীজিকে ভারতবর্ষে একটি আশ্রম বানিয়ে দেবার সংকল্প নিয়ে তাঁর স্বভাবচরিত্র বিষয়ে গোপনে খোঁজখবর করাচ্ছিলেন। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে এমন সব সাপ বেরিয়ে পড়লো যে তাঁর সন্ন্যাসীগিরিতে শ্রীমতীর আস্থা আর টিকতে পারলো না। চেষ্টার তিনি ক্রটি করেননি কিন্তু তবু তিনি টলাতে পারলেন না ইয়েট্‌সকে। অনুবাদ হিশেবে তাঁদের কৃত উপনিষদ কতদূর নির্ভরযোগ্য তা শুধু পণ্ডিতরাই বলতে পারবেন, কিন্তু বলিষ্ঠ এবং রূপবান কবিতা হিশেবে এই অনুবাদের তুলনা হয় না। এই সময় কবির দেহে উদরী রোগ দেখা দেয়, এবং খবর পেয়ে ইয়েট্‌স-পত্নী ছুটে এসে সন্ন্যাসীর টোট্‌কা চিকিৎসা থেকে তাঁকে উদ্ধার করার আগেই কবি যে আশ্চর্য এক প্রহসন রচনায় হাত দেন তারই নাম 'দি হার্ন্‌স এগ্‌', যাকে আমি এই প্রবন্ধের শিরোনামে বাংলা রূপক নাট্যের প্রতিধ্বনিময় আইরিশ প্রহসন ব'লে বর্ণনা করেছি।

২

উইলিয়াম ব্লেক এর ভাবীকথন আখ্যেয় রচনাবলীর মতো দুষ্প্রবেশ্য না হলেও, ইয়েট্‌স রচিত হ্রস্বাকার কাব্য-নাটিকাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে দুরূহ এবং কদাচ প্রহেলিকা প্রতিম হওয়ার ফলে বহু পাঠকের কাছেই তাঁর অসামান্য নাট্যপ্রতিভা আজ পর্যন্ত মোটামুটি অজ্ঞাত থেকে গেছে। অথচ আধুনিক কালে কাব্যনাট্যের পুনরুত্থান কর্মে তাঁর প্রভাব সর্বাগ্রে গ্রাহ্য। পরিণত বয়সে লেখা তার কাব্যনাট্য বিষয়ে দুচারজন যাঁরা লিখেছেন তাঁদের সঙ্গে, অন্তত 'দি হার্নস্‌ এগ' নাটকের ব্যাখ্যা বিষয়ে, আমার কোনোখানেই মেলে না।

বাংলায় এ-নাটকের নাম অনুবাদ করতে গেলে 'ব্রহ্মের ডিম' বলতে হয়, নয়তো লেখকের অভিপ্রায় অস্পষ্ট থাকে। রাজহাঁস, সারস, ঈগল, কিংবা বাজ-পাখিকে ইয়েট্‌স বহুকাল থেকেই তাঁর কাব্যে মন্ময়তার প্রতীক হিশেবে ব্যবহার ক'রে আসছিলেন। দ্রষ্টব্য 'প্লেইজ্‌ এ্যাণ্ড কন্‌ট্রোভার্সিজ' গ্রন্থে 'ক্যালভরি' নাটকের ইয়েট্‌স-কৃত টীকা। ভারতীয় শাস্ত্রে আত্মন্‌-ব্রহ্মণ-এর প্রতীক হিশেবে ব্যবহৃত পাখির দৃষ্টান্ত থেকে এই ধারণাকে তিনি পেয়ে থাকবেন, কেননা ১৯১৩ সালে লেখা "আর্ট এ্যাণ্ড আইডিয়াজ" প্রবন্ধেই উল্লেখ আছে যে মুক্ত আত্মার ভারতীয় প্রতীক হিশেবে ব্যবহৃত রাজহংস বিষয়ে ইয়েট্‌স অবহিত ছিলেন। হরভিৎস্‌-এর লেখা

দি ইণ্ডিয়ান থিয়েটর' (১৯১২) বইটিও তাঁর সংগ্রহে ছিলো, যাতে এই ভারতীয় প্রতীকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বর্তমান। ১৯১৩ সালের পরে লেখা বহু কবিতায় এই অর্থে পাখির ব্যবহার করেছেন ইয়েট্‌স। এমন কি ১৯১৫ সালে ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইপত্রে ব্যবহার করার জন্য স্টার্জ মূর-কে দিয়ে তিনি যে বুকপ্লেটটি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন তাতেও একটি সারসের মূর্তি আছে যাকে তিনি কালের বন্ধনীগত মর্ত্যজীবনে স্বীয় আত্মার প্রতীক ব'লে লিলি ইয়েট্‌স-এর কাছে লেখা অপ্রকাশিত তাঁর এক চিঠিতে বর্ণনা ক'রেছেন। আত্মন্-ব্রহ্মণের সাযুজ্যে বিশ্বাসী ছিলেন ব'লে, সেই সারসকেই ইয়েট্‌স আলোচ্য নাটকে ব্রহ্মের প্রতীক হিশেবে ব্যবহার করেছেন বললে ভুল হবে না। বস্তুময় বিশ্ব সেই আদি সারসেরই পবিত্র ডিম। পরম সারসকে নিবেদন না-ক'রে মানুষের পক্ষে তাঁরই ডিম্বভক্ষণের অধিকার আছে কিনা, এবং শাপগ্রস্ত হওয়ার ভয় দেখিয়ে সেই ডিম্বভোগ থেকে নিবৃত্ত করলে তার পরিণামে মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোন মহাপরিবর্তনের সূচনা হয়, ইয়েট্‌স-এর এই নাটকে তারই ইঙ্গিত আছে ব'লে আমার বিশ্বাস।

আপাতদৃষ্টিতে 'দি কিং অফ্‌ দি ডর্ক চেম্বার' এবং 'দি হার্নস্‌ এগ্‌' নাটক দুটির মধ্যে আকারে প্রকারে কিছুমাত্র মিল আছে ব'লে মনে করা শক্ত। রাজা ঠাকুরদা সুদর্শনা সুরঙ্গমা কাঞ্চী কোশল অবন্তী—এদের সঙ্গে আয়ে কনগাল কর্ণি এ্যাট্রাকুটা ক্যেট আগনেস্‌ বা জনৈক অবোধ চরিত্রের সাদৃশ্য কোথায়? কিন্তু বাহ্যসাদৃশ্যের নিষ্ফল সন্ধান এড়িয়ে, প্রতীকী ভাষার ভিতরমহলে তাকালে দেখা যাবে —দুই নাটকেরই কেন্দ্রে আছেন দুটি নারী চরিত্র যাঁরা জগতের অপ্রমেয় আদি পুরুষের সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন। তদুপরি, দুই নাটকেই ক্ষাত্রবীর্যসম্পন্ন দুটি পুরুষচরিত্র বর্তমান যাঁদের পক্ষে উপরোক্ত নির্গুণ আদি পুরুষে আস্থা রাখা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ সেই আদি পুরুষের নাম দিয়েছেন অন্ধকার প্রকোষ্ঠের অধীশ্বর, রাজা; বলেছেন, মাটির আবরণ ভেদ ক'রে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তাঁর ঘর। 'আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা', তাই একলা রানীর সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে অন্ধকারে। রানী সুদর্শনা সেই অন্ধকারের অরূপ অধীশ্বরকে মুখোমুখি দেখার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছেন, কিন্তু জানেন না যে দুঃখের আগুনে দগ্ধ না হ'লে, অন্তরের সেই অন্ধকারটি অপরূপের আবির্ভাবে কিছুতেই উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে না। আর তা যতদিন না হয় ততদিন পর্যন্ত রাজা বড়ো ভয়ঙ্কর, সহ্য করা যায় না তাঁর মুখের রেখাকে, ভয়ে বুক কাঁপে। অথচ তিনি আছেন সর্বত্র,—হাওয়ার গন্ধে, ফুলের সুবাসে, সঙ্গীতের মূর্ছনায়, এমন কি প্রলয়ের

রোষাগ্নিতে। তাঁর রাজত্বে সবাইকে রাজা ক'রে রেখেছেন তিনি, যদিও আপনাকে যথার্থ ক'রে না চিনতে পারলে তাঁকেও কখনো চেনা যায় না। সুদর্শনা অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন, পথ চেয়ে অপেক্ষা না-ক'রে, নিজের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করার আগেই তিনি রাজার মুখ দেখবেন ব'লে জেদ ধরেছিলেন। তার ফল যা হবার তাই হোলো। 'রূপের মোহে অন্ধ হ'য়ে', 'পাপের মধ্যে অগ্নিদাহ, বিষমযুদ্ধ, অন্তরে বাইরে অশান্তি' ঘটিয়ে অবশেষে তিনি সত্য মিলনের পথে পৌছতে পারলেন। ইয়েট্স রচিত আইরিশ নাটকে এই অরূপ অপরূপকে 'রাজা' বলা হয়নি বটে, যদিও 'রাজা' নাটকের ইংরেজি নামের প্রতিধ্বনি ক'রে অন্য এক নাটকে ইয়েট্স অভিপ্রেত পরমপ্রভুর নাম দিয়েছিলেন 'দি কিং অব দি গ্রেট ক্লক টাওয়ার'। আলোচ্য নাটকে তাঁকে রসিকতা করে বলা হয়েছে 'পরম সারস' যাঁর প্রেমে অধীর হ'য়ে যুগ যুগ ধ'রে অপেক্ষা ক'রে আছেন সেবিকা এ্যাট্রাকৃটা। রাজা সুদর্শনার মতো এঁদেরও মিলন হয় দৃষ্টির অতীত রাজ্যে—মার্তণ্ডের প্রজ্জ্বলন্ত কেন্দ্রটিতে, অথবা মধ্যরাত্রির নিবিড় অমায়, যখন পরম সারস চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা সব কিছুকে নির্বাপিত করে দেন। মিলনের অমানিশা কোনো দীপালোকে উদ্ভাসিত হতে পায় না। এ পর্যন্ত এ দুই নাটকের মিল খুব চমকপ্রদ। তদুপরি দুটি নাটকেই উল্লিখিত পরমের আবির্ভাব সূচিত হয় সঙ্গীতের সুরমূর্ছনায়। ইয়েট্স সেই সুরমূর্ছনাকে রবীন্দ্রনাথের মতো বীণার ঝঙ্কার বলেননি, বলেছেন—অলৌকিক এক বাঁশীর সুর যে বাঁশী তৈরি হ'য়েছিল আর এক সারসের জানু থেকে খসানো একখণ্ড অস্থি থেকে। একান্ত মনে সেই অলীক বাঁশীটি বাজাতে পারলেই সারস-প্রেয়সী এ্যাট্রাকৃটা ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে এসে দেখা দেন।

য়ুরোপীয় পাঠকরা এটা কী ভাবে কী বুঝতে পারেন আমার কোনো ধারণা নেই, কেননা আজ পর্যন্ত কোনো সমালোচনায় এ-প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখিনি। ভারতীয় পাঠকের অনায়াসে মনে পড়বে রাধাকৃষ্ণের কথা। ১৯২৪ সালে কিছু বৈষ্ণব কবিতার অনুবাদ প'ড়ে ইয়েট্স ভেবেছিলেন তিনিও অনুরূপ কিছু প্রেমের কবিতা রচবেন। আলোচ্য নাটকে সেই রূপকল্পটি তিনি বজায় রেখেছেন, তবে মেজাজটা কেন প্রহসনের হ'য়ে উঠলো তা নিচের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে। এ-নাটকে বলা আছে শ্রীমতী এ্যাট্রাকৃটাকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে বাঁশীটি নিজে বাজাতে না জানলেও চলবে। মূল্য ধ'রে দিলে অপর অভিজ্ঞ বংশীধরেরাই আপনার হ'য়ে সেটি বাদন ক'রে দেবে। এর মধ্যে পুরোহিত প্রথা নিয়ে রসিকতা করা হচ্ছে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে।

'রাজা' নাটকের অবিশ্বাসী ক্ষত্রিয় বীরের নাম কাঞ্চী; আইরিশ নাটকে তুলনীয় চরিত্র হচ্ছেন রাজা কন্‌গাল। এই দুই শুভনাস্তিকের ক্রিয়াকলাপের যারা সহায়ক তাদের সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই সাত, যে 'সাত'-এর ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আপাতত অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই সাতসঙ্গীর নাম রেখেছেন অবন্তী, কোশল, কলিঙ্গ, বিদর্ভ, বিরাট, পাঞ্চাল, এবং সুবর্ণ। 'দি হর্নস্ এগ' বিষয়ে লিখতে গিয়ে এফ. এ. সি. উইলসন ইয়েট্‌স-এর অনুসরণে গুণতে ভুল করেছিলেন, নয়তো দেখতেন যে কন্‌গালের পার্শ্বচরদের সংখ্যা ছয় নয়, সাত: মাথিয়াস মাইক, জেম্‌স, পিটার, জন, প্যাট, আর মালাকি। ছাপা বইয়ের চরিত্রলিপিতে এখন পর্যন্ত ছজনের কথাই বলা হয় বটে, কিন্তু নাটকের মধ্যে দেখা যায় চরিত্রলিপিতে অনুল্লিখিত আরো একটি চরিত্র, যার নাম জেম্‌স। কেন স্বয়ং ইয়েট্‌স এঁকে গুণতে ভুলেছিলেন তা আমার জানা নেই। ইয়েট্‌স আলোচকদের মধ্যে কেউ এ পর্যন্ত এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন বলেও জানি না। এ-ছাড়া, 'রাজা' নাটকে যেমন সুবর্ণ শেষ পর্যন্ত ছত্রধরের কর্ম নিয়ে স্বয়ম্বর সভায় প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকে, ইয়েট্‌স-এর নাটকেও, কোনো অজ্ঞাত কারণে, কন্‌গালের সাতসঙ্গীর মধ্যে পিটার-নামক একজনের যথোচিত খোঁজ পাওয়া যায় না নাটক খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পরে। সে যাই হোক, কন্‌গাল কাঞ্চীর মতোই এক ক্ষত্রিয় বীর, বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্র-স্থানীয় চিরন্তন দ্বন্দ্বের অস্তিত্বে যিনি বিশ্বাসী, যদিও সেই মৌল দ্বন্দ্বের সঙ্গে আত্যন্তিক ঐক্যের কোনো বিরোধ নেই। এই জন্য দেখা যাবে, নাটকের গোড়াতেই যে-যুদ্ধের অবতারণা করা হ'য়েছে তাকে চলিত অর্থে কোনোমতেই যুদ্ধ বলা চলে না, হয়তো বলা যায় রণনৃত্য। এই যুদ্ধে কোনো কৃপাণ বিপক্ষের কোনো ঢালকে স্পর্শ করে না, শুধু অন্তরীক্ষে মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি থেকে আমরা যুদ্ধ 'অনুমান' করি মাত্র। যুদ্ধশেষে প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলিঙ্গন বিনিময় ক'রে কন্‌গাল ভোজনশালার দিকে পা বাড়ান।

এইরকম কোনো এক যুদ্ধ শেষে অস্ত্র সংবরণ ক'রে কন্‌গাল এসে উপস্থিত হলেন এ্যাট্রাকৃটার পুণ্য পর্বতে, সঙ্গে সারসের ডিমে ভরা ঝুড়ি বহন ক'রে এক রাসভ-নন্দন আর সেই রাসভ পরিচালনার জন্য এক পাকা সহিস। কন্‌গালের পাচকেরা ডিমের উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে সবিশেষ পটু। সমস্যা হচ্ছে, পবিত্র সাধিকার আজ্ঞা না-নিয়ে, পরম সারসের পবিত্র ডিম আহার করা বিধেয় কিনা। এ কথা কে না জানে যে ডিম ভোজনের প্রকৃত অধিকার পূতচরিত্র সর্বত্যাগী সারস বধূ ছাড়া

আর কারো নেই। অন্ততপক্ষে সারস বধূর অনুমতি প্রয়োজন যা কন্‌গাল পাবেন না তাঁর ভক্তির অভাববশত। প্রত্যাখ্যাত কন্‌গাল অনুমান করলেন, রূপসী এ্যাট্রাকৃটা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কামনাবাসনাকে অসঙ্গত ভাবে দমন ক'রে রেখেছেন বলেই অলৌকিক সারসের প্রেয়সী সাজতে হ'য়েছে তাঁকে। কৌমার্যের তুষারে জ'মে গিয়ে নারীরাও হয়তো বালকদের মতো একান্তে তুষারপুত্তলি গড়তে বসে যার তারা নাম দেয় প্রভু অথবা পবিত্র পাখি, এবং সেই উপায়ে তাদের অবরুদ্ধ কামজ তৃষ্ণার সাধ মেটায় তারা। পার্সিয়ুস জননী ডানী-র প্রকোষ্ঠে স্বর্ণবৃষ্টির আকারে দেবতা জিউস-এর প্রবেশ, কিংবা তৃণশায়ী লেডার রোমাঞ্চিত দেহে অলৌকিক রাজহাঁসের পাখসাট—এই সব প্রাচীন উপাখ্যানের একই রহস্য। মানসিক ভ্রান্তি ছাড়া একে আর কিছু অনুমান করা ক্ষত্রিয়বীর কন্‌গালের পক্ষে অসম্ভব।

'রাজা' নাটকে অবিশ্বাসী কাঞ্চীও ভেবেছিলেন অদৃশ্য রাজা সুদর্শনার মনের ভ্রান্তি মাত্র। তাই সম্পূর্ণভাবে দৃশ্য এবং রূপসী রাণী সুদর্শনাকে অপহরণ করাটাই তিনি সুবুদ্ধি ব'লে বিবেচনা করেছিলেন। তারপর করভোদ্যানে আগুন লাগার পর কী কী ঘটলো তার সবটা বিস্তারিত বলার দায় ছিলো না রবীন্দ্রনাথের। আত্মহত্যায় উদ্যত হ'য়ে সুরঙ্গমার সম্মুখে সুদর্শনা একদিন শুধু সংক্ষেপে স্বীকার করেছিলেন: 'দেহে আমার কলুষ লেগেছে—এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগেনি। ··· তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হ'য়ে রয়েছে—সেখানকার দরজা কেউ খোলেনি প্রভু।' কাঞ্চী অথবা সুবর্ণের স্পর্শে সুদর্শনার দেহে কলুষ লেগেছিলো, এই পর্যন্ত বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইয়েট্স-এর কন্‌গাল কিছুই গোপন রাখলেন না। তিনি আরো বিষদ ক'রে পূজারিণীকে প্রথমে উপদেশ দিলেন—তার সারসপ্রেম উপশম-যোগ্য ব্যাধিমাত্র, সাত সাত যোদ্ধার তপ্ত আলিঙ্গনে ধরা দিলেই রোগমুক্তি ঘটবে। হ'তে পারে মর্তজীবন দুর্বিষহ, কিন্তু ভরা যৌবনেও যে-নারী উপভোগে বিরত তার মুখে ওসব পবিত্রতার কথা সাজে না। বরণ করো, নয়তো বৃত হও, বাকি কথা পরে হবে।—কন্‌গালের ভর্ৎসনা শুনেও এ্যাট্রাকৃটা তবুও অনড়। তিনি সেই অনঘ, অক্ষর, নির্গুণের জরায়ুর অভ্যন্তরে পুনঃপ্রবেশ না ক'রে ছাড়বেন না। অগত্যা কন্‌গালের সপ্তসেনাকে উদ্যোগী হ'য়ে বলাৎকার করতেই হলো। পরাভূত এ্যাট্রাকৃটা অভিশাপ দিলেন—পাপ হবে, অপবিত্র হাতে সারসডিম্ব ভক্ষণ করলে মূর্খ হ'য়ে জন্মাতে হবে, এবং মৃত্যুও হবে মূর্খেরই হাতে। তাতেও বিচলিত হলেন না কন্‌গাল।

কেননা মৃত্যু তো মূর্খই। সেই মূর্খের হাতে একদিন না একদিন যে ধরা দিতেই হবে এ আর নতুন কথা কী!

কিন্তু কন্‌গাল পারিষদ এই সপ্তযোদ্ধা কারা? এফ. এ সি. উইলসন বলেন, কন্‌গাল নিজে হচ্ছেন ভারতীয় মতানুসারে রজোগুণের প্রতীক, আর যেহেতু তার সঙ্গীদের তিনি গুণতে ভুল করেছিলেন কাজেই কন্‌গালের অনুচরদের সংখ্যা ছয় ধ'রে তাদের তিনি অনুমান করেছেন মানবজীবনের ষড়রিপু ব'লে—যাদের নাম কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ আর মাৎসর্য!

উইলসন অবশ্য 'রাজা' নাটকের সঙ্গে এ-নাটকের কোনো সম্পর্ক আছে ব'লেও জানতেন না, কাজেই ইয়েট্‌স-পুরোহিত স্বামী অনূদিত দশপ্রধান উপনিষদের পাতা উল্টে দেখার প্রয়োজনও তাঁর মনে পড়েনি। মনে পড়লে, মাণ্ডুক্যোপনিষদের ইয়েট্‌স -কৃত পাদটীকা তাঁর চোখ এড়াতো না। মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হয়েছে: সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম; অয়মাত্মা ব্রহ্ম; সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। এই 'চতুষ্পাৎ' আত্মার প্রথম পাদকে বলা হ'য়েছে বৈশ্বানর জাগ্রতাবস্থা যাঁর ভোগস্থান, যিনি বহির্বিষয়ে অনুভূতিসম্পন্ন, যাঁর সাতটি অঙ্গ, যাঁর উনিশটি মুখ, এবং যিনি যাবতীয় স্থূলবিষয় ভোগ করেন। কন্‌গাল-কে ইয়েট্‌স বলেছেন 'the great eater', ব্রহ্মাণ্ডকে ভোগ না-করলে তাঁর সুখ নেই। বৈশ্বানরের সপ্তাঙ্গ বিষয়ে ইয়েট্‌স তাঁর উপনিষদ গ্রন্থে পাদটীকা দিতে ভোলেন নি। উল্লেখ করেছেন যে দ্যুলোক তাঁর মস্তক, সূর্য—চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ —শরীর, জল—মূত্রাশয়, পৃথিবী—পাদদ্বয়, এবং অগ্নি তাঁর মুখ। কন্‌গালের সপ্ত অনুচর হলেন বৈশ্বানরের এই সপ্তাঙ্গ। আমার মনে হচ্ছে, ইয়েট্‌স এখানে বলতে চান যে এ্যাট্রাক্‌টার বিমূর্ত ব্রহ্মচিন্তার পরিণামে বিক্ষুব্ধ ক্ষাত্রবীর কন্‌গাল অপরিণামদর্শী ভোক্তায় পরিণত হ'য়েছেন। পতন হ'য়েছে তাঁর। ভাঙন ধ'রেছে ক্ষত্রসংস্কৃতির মধ্যে। আর তার ফলে মানব-ইতিহাসে যুগান্ত দেখা দেবার আর বিলম্ব নেই। ইয়েট্‌স-এর ইতিহাস চিন্তার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা দেখবেন আমার এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সে চিন্তার কোনো অমিল নেই। রাণাডেও মনে করতেন উপনিষদ এবং তৎপরবর্তী বৌদ্ধ বিমূর্তচিন্তার উদ্ভবের পরিণামেই প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে ক্ষাত্রবীর্য একদা অন্তর্ধান করেছিল। ইয়েট্‌স এই চিন্তাকে সমগ্র মানব-ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

কাঞ্চীর সাত অনুচরের নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও কি সচেতনভাবে মাণ্ডুক্যোপনিষদের এই সপ্তাঙ্গের কথা ভেবেছিলেন?—'যুদ্ধে যাবার পূর্বে বাবা এসে

বললেন, তুই একজনের হাত থেকে ছেড়ে এসে আজ সাতজনকে টেনে আনলি—ইচ্ছে করছে তোকে সাত টুকরো ক'রে ওদের সাতজনের মধ্যে ভাগ ক'রে দিই।' —এই 'এক', এই 'সাত' কি তিন-পাঁচ-দশের মতো নিছক কথার কথা? হয়তো তাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদপুষ্ট জানতেন ব'লে ইয়েট্স এই সাতের উপনিষদসম্মত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ক'রে থাকলে খুব অন্যায় করেননি।

'রাজা' নাটকের সুদর্শনার মতো ইয়েট্সীয় প্রহসনের এ্যাট্রাকৃটাও দেহের কলুষকে আমল দিতে রাজী নন। দুয়েরই প্রাণমন বিমূর্ত আদিপুরুষে উৎসর্গিত। দুয়েরই মনে এ-বিশ্বাস দৃঢ় যে বাসনার কলুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি দেহে লাগে তবু তা হৃদয়ের মধ্যে দাগ রেখে যায় না। সাতযোদ্ধার আলিঙ্গনে বদ্ধ উপভোগের অবসানেও এ্যাট্রাকৃটা তাই বলতে পারেন :

The Herne is my husband,
I lay beside him, his pure bride.

এ-ছাড়া দুই নাটকের মধ্যে আরো একটি সাদৃশ্যও মনে রাখা ভালো। নাটকের ঘটনাকাল উভয়ক্ষেত্রেই বসন্তপূর্ণিমা!

সাদৃশ্যের সীমারেখা এই পর্যন্ত। 'রাজা' নাটকের সমাপ্তি হয় বিদ্রোহী কাঞ্চীরাজের চরম পরাভবের মধ্যে। ঠাকুরদার মতো, রানী সুদর্শনার মতো, শেষ পর্যন্ত কাঞ্চীরাজকেও রাজা পথে বার করেছেন। ঠাকুরদার কাছে তাঁর বিনীত প্রার্থনা শোনা যায় : 'তোমাদের এই ধুলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি ক'রে নিয়ে যেতে হবে যাতে একে আর চেনা না যায়।' রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিপ্রায় মনে রাখলে এই পরিণামকে অবশ্যই মানতে হবে। কিন্তু তবু, বীররাজা কাঞ্চীর এই পরিণাম দেখে কোথায় একটু খেদ অনুভব না-ক'রে পারিনা। ইয়েট্স-এর অভিপ্রায় ভিন্ন। তিনি শেষ দৃশ্যে এ্যাট্রাকৃটার সঙ্গে পরম সারসের পুনর্মিলন দেখাতে উৎসাহী ছিলেন না। ইতিহাসে বিমূর্ত দার্শনিক চিন্তার উদ্ভাবনার সঙ্গে মানবসংস্কৃতির রূপ কিভাবে পাল্টায় সেই ভাবনাই তাঁর মনকে অধিকার ক'রে ছিলো। তাই 'দি হার্নস্ এগ্' নাটকে অরূপের সাধিকা এ্যাট্রাকৃটারই আপাতত জয় হলো, পরাভব ঘটলো বীর কন্গালের। পরমসারসের পরাক্রম মেনে নিয়ে, একে একে কন্গালের অনুচরেরা স্বীকার করলেন—পূজারিণী এ্যাট্রাকৃটার দেহ তারা স্পর্শও করেননি। চরিত্রের এই অধঃপতন অতি মর্মান্তিক। তাই দেখা যায়, নাটকের শুরুতে যে যুদ্ধক্রিয়ার রূপ ছিলো নৃত্যের রূপ, নাটকের পরিশেষে সেই যুদ্ধ পর্যবসিত

হলো, ভাঙা টেবিল চেয়ারের পায়া হাতে নিয়ে নিছক দাঙ্গাহাঙ্গামায়। ক্ষাত্রবীর্যের অবসান ঘটলো। তবু শেষ পর্যন্ত অবিচলিত রইলেন কন্‌গাল। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন, যে মৃত্যু মূর্খের হাত থেকে আসবে ব'লে অভিসম্পাত ছিলো। এবং সেই মূর্খ যখন সত্যি কয়েকটা কড়ি আর কিছু হাততালির প্রত্যাশায় তাঁকে হত্যার কসরৎ করতে উদ্যত হলো, শান্তচিত্তে বীর কন্‌গাল তখন স্বীয় অসির আঘাতে নিজের হাতে প্রাণ নিলেন।

এখানেও শেষ হয়নি প্রহসনের। এর পরে ইয়েট্‌স যা ঘটালেন তা সাধারণ নাটমঞ্চে কখনো কেউ দেখতে চাইবে কিনা সন্দেহ। অবিচল চিত্ত বীরের মৃত্যু প্রত্যক্ষ ক'রে এতক্ষণে পরমসারসের পবিত্র সেবিকা এ্যাট্রাক্‌টার মনে অনুতাপের সঞ্চার হলো। বীরের আলিঙ্গনে ধরা দিতে এতকাল যাঁর সায় ছিলো না, বীরের মৃত্যুশয্যার পাশে নিজের মূর্খ ভৃত্যের সঙ্গে তিনি রমণে উদ্যত হলেন! উদ্যত হলেন এই আশা নিয়ে যে বীরের আত্মা হয়তো বা তাঁর নিজের জরায়ুতে এসে পুনর্জন্ম নেবে, যার ফলে বীর্যবানের যুগ হয়তো নিঃশেষে সমাপ্ত হবে না। কিন্তু তার আর সময় ছিলো না, দেরি হ'য়ে গিয়েছিলো। সেই যে গাধাটা, পবিত্র সারসডিম্ব ব'য়ে বেড়ানোই কাজ ছিলো যার, হায়রে, সে ইতিমধ্যে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গিয়ে আর একটি গাধার সঙ্গে সঙ্গম শেষ করে ফেলল। তুষার গলেছিল এ্যাট্রাকটার কুমারী বুকে, কিন্তু কন্‌গালের আত্মা পুনর্জন্ম নিলো সেই হতভাগা গাধাটারই গর্ভে।

এইভাবেই তা'হলে ইতিহাসের এক একটা যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইয়েট্‌স বলতেন কালের চাকা ঘুরতে কমবেশি দুহাজার বছর লাগে। কন্‌গালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষাত্রযুগের অবসান হলো। যবনিকা পতনের পূর্বে নাটকে যে-যুগের আভাস দেখা যাচ্ছে সেখানে গর্দভদেরই রাজত্ব অনুমান করেছেন ইয়েট্‌স, চিন্তা আর কর্ম, দেহ আর মন, বস্তু আর সত্তা যেখানে দ্বিধাবিভক্ত।

দুই কবির মধ্যে যদিও কিছুই প্রায় মেলে না, তবু জীবনীকারদের মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ইয়েট্‌স আজীবন ভুলতে পারেননি, নয়তো মৃত্যুর মাত্র এক বছর পূর্বে তিনি 'রাজা' নাটকের প্রত্যুত্তর লিখতে বসতেন না। এই প্রত্যুত্তরকে ইয়েট্‌স একই কালে আখ্যায়িকার আকারে রচিত শ্রীপুরোহিতের দার্শনিক মত অথবা শ্রীপুরোহিত সমর্থিত তাঁরই স্বকীয় দর্শনজাত নাটিকা ব'লে বর্ণনা করেছিলেন।

আজহারউদ্দীন খান্

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০—১৯৩১)

মুসলমান জাগরণের উষালগ্নে প্রথম সার্থক ও বলিষ্ঠ গদ্যলেখক ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন যদিও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির অনুবর্তী লেখক। তবু মীর সাহেবের গদ্য রচনা ও রীতির খ্যাতিই মুসলমান সমাজ বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করার ভরসা পায় এবং ভীরুতাস্বরূপ যে কমপ্লেক্স ছিল তা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়। তার প্রধান কারণ ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের মূলমন্ত্র হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যে লালিত সেজন্যে তাঁর রচিত সাহিত্য মুসলমান সমাজ পাঠ করেছে, সাহস করে এগিয়ে গিয়ে তালিম নেয়নি আর তাঁকেও একান্ত আপন করে নিতে পারেনি তাঁর ঐ প্রবল ধর্মীয় চেতনার জন্য। মশাররফ হোসেন একদিকে বাস্তব জীবনের ওপর সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে এক বলিষ্ঠ বাস্তবসম্মত জীবনবাদ প্রবর্তন করেছিলেন যা "জমিদার দর্পণ" "উদাসীন পথিকের মনের কথা" "গাজী মিয়ার বোস্তানী" গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে যেটি বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন না পেলেও রচনারীতির গুণে তিনি প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অপরদিকে মীর সাহেব মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাংলা সাহিত্যে রূপায়িত করে বাংলা সাহিত্যের সম্পদে বৃদ্ধি করেছিলেন—"বিষাদসিন্ধু" "মোসলেম বীরত্ব" "এসলামের জয়" হজরত ওমর ও বেলালের জীবনী প্রভৃতির রচনাগুণে আকৃষ্ট হয়ে মুসলিম ঐতিহ্যে অনভিজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্রও রচনারীতির প্রশংসা করেছিলেন। মীর সাহেবের অনুবর্তী হয়ে তাঁর ইসলামী সাহিত্যসৃষ্টির পথে যাঁরা পদচারণা করেছিলেন

তাঁদের মধ্যে সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী অন্যতম। পিতার নাম খোন্দকার আবদুল করিম, মাতার নাম নূরজাহান খানম। মায়ের কাছেই তাঁর শিক্ষা দীক্ষা হয়েছিল। মায়ের প্রভাব তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করেছে। 'উদ্বোধন' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় মায়ের সম্পর্কে বলেছেন, "...মাতৃজীবনের সুনির্মল কাব্যানুরাগ এ হৃদয়কে কবিত্ব কুসুমোদ্যানে পরিণত করিয়াছে, যাঁহার জীবনের অগ্নিশিখাসম বিশুদ্ধ প্রভাব ও চরিত্র আমাকে প্রাণময়ী বাগ্মিতায় ভূষিত এবং উত্থান-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, যাঁহার অমৃতময় স্নেহ ও আশীর্বাদধারা দুঃখ-দৈন্য-পীড়া-সন্তপ্ত জীবন-মরুকে স্নিগ্ধশীতল অমৃতময় প্রেমপুণ্যের মঞ্জুকুঞ্জে বিশোভিত করিয়া রাখিয়াছে।" ১৮৮০ সালের ১৩ই জুলাই পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ শহরে তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন। সিরাজগঞ্জের অধিবাসী বলে তিনি নিজের নামের পাশে 'সিরাজী' নাম ব্যবহার করতেন। নামের পাশে জন্মস্থানের নাম ব্যবহার করার রেওয়াজে হয়তো তিনি উর্দু সাহিত্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। শিক্ষা তাঁর বেশীদূর হয়নি—মাইনর (ষষ্ঠ শ্রেণী) পর্যন্ত পড়েছিলেন কিন্তু তাতে তাঁর বিশেষ অসুবিধে হয় নি। নিজ অধ্যবসায়ে যা তিনি শিখেছিলেন সেটি তাঁর সাহিত্যজীবনকে সমৃদ্ধ করেছিল। তিনি যা কিছু লিখেছেন প্রাণ দিয়ে লিখেছেন, বইপড়া বুদ্ধি দিয়ে লেখেন নি, ফাঁকি দিয়ে কোন কথা বলেন নি। বাঙলাদেশের মুসলমান সমাজের জড়তা ভাঙার জন্য চারণের বেশে সারা দেশ তিনি চষে বেড়িয়েছেন। স্বচক্ষে যা দেখেছেন এবং দেখে যা তাঁর মনে হয়েছে তা অকপটচিত্তে বিভিন্ন জনসভায় যেমন ওজস্বী ভাষায় বক্তৃতা করেছেন তেমনি তাঁর বক্তব্যকে লিখিতরূপ দিয়ে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সাহিত্যে সজ্ঞান প্রসাধনকলার ধার তিনি ধারেন নি। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর যাদুকরী বাণীর আকর্ষণে জমায়েত হয়েছে, তাঁর নামের মোহে তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য ছুটে এসেছে। লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছে, পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা করেছে। বাগ্মী হিশেবেও তাঁর সুনাম ছিল। সেই সুনামের জনপ্রিয়তা আজ ইতিহাসের বিষয়—আর সেই অনতিক্রান্ত অতীত ইতিহাসের তিনি নিজেই আজ নিষ্করুণ বিস্মৃতি।

২.

ইংরেজ শাসনের প্রথম দিক মুসলমান জীবনে এক চরম সঙ্কটকাল গেছে। এক-

দিকে ইংরেজ মিশনারীদের খৃষ্টধর্ম প্রচার অন্যদিকে হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে শাসনযন্ত্রের বড় বড় পদে সমাসীন। এই আবহাওয়ায় মুসলমান দ্বিধাগ্রস্ত। ইংরেজী শিক্ষাকে পুরোপুরি তারা গ্রহণও করতে পারছে না আবার মিশনারীদের প্রলোভনকেও রুখতে পারছে না। এই বিপদ থেকে বাঙলার মুসলমানকে রক্ষা করেছিলেন মুসলিম বাঙলার রামমোহন মুন্সী মেহেরুল্লাহ। ইসলামীয় ঐতিহ্যের মূল ভাবধারা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করার মহান ব্রত তিনি নিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে সাহিত্যগুণান্বিত মনীষা বেশী ছিল না—জাতীয় চেতনামূলক সাহিত্য রচনা করার জন্য পরবর্তীদের প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ দেন। প্রধানত তাঁরই উৎসাহে যে ক'জন সাহিত্যসাধক জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সিরাজী একজন প্রধান পুরুষ। জাতি ও সমাজের কল্যাণ চিন্তা করার প্রেরণা পেয়েছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহর কাছ থেকে আর নিজ চিন্তাকে সাহিত্যরূপ দেবার প্রেরণা পেয়েছিলেন মীর মশাররফ হোসেনের কাছে। জীবনে ও সাহিত্যে এই দুজন সাধকের কাছে সিরাজীর ঋণ স্পষ্টোচ্চারিত।

১৩১০ সালে 'নবনূর' পত্রিকার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'সাহিত্যশক্তি ও জাতি সংগঠন' নামক প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যা বলেছিলেন সেটিই তিনি তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনে অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

> : বর্তমান বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্য আমাদিগের জড়তাপূর্ণ জাতীয় জীবনে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারের পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নহে। জাতীয় ভাষা আরবীয় এবং তৎসহ পারসী ও উর্দু হইতে এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী, ধর্মশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রা-দির অনুবাদ হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইতিহাস মুসলমান জাতির প্রাণীস্বরূপ। জাতীয় ইতিহাস এবং মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যতীত মুসলমানদিগের মৃতদেহে শক্তি সঞ্চারের অন্য কোন উপায় নাই।
>
> কবি বক্তা এবং লেখকগণই এক্ষণে আমাদিগের জাতীয় জীবন-সংগঠনের একমাত্র উপায়। সুতরাং জাতীয় উন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে, উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত রসনা ও লেখনী পরিচালনা করিতে হইবে। তাহাদিগকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহাদিগেরই উপর বিরাট বঙ্গীয় মুসলমান জাতির পুনরুত্থান এবং সুখসৌভাগ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। পবিত্র জাতীয় ভাষা আরবী এবং পারসী ও উর্দু হইতে জাতীয় ভাব রুচি ও তেজোরাশি আহরণ করিয়া বঙ্গভাষাকে নূতনভাবে গঠন করিতে হইবে।...
>
> যদি বঙ্গসাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করিতে চাও, যদি সাহিত্যশক্তি প্রভাবে

> জাতীয় জীবনতরীকে গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করিতে চাও—যদি বঙ্গসাহিত্যের দ্বারা জাতীয় কল্যাণ ও কুশল কামনা কর, তাহা হইলে সর্বপ্রকার কুচিন্তা ও কুকল্পনা, ভীরুতা দীনতার হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হও, বদ্ধপরিকর হও। সুচিন্তার উদ্যানে উচ্চ কল্পনায় স্বাস্থ্যকর উন্মুক্ত বায়ুতে ইহাকে বিচরণ করিতে দাও। জগতের যাবতীয় ধর্মবীরদিগের পবিত্র জীবনীর সৌন্দর্যরাশি সাহিত্যে প্রতিফলিত কর। পুরাবৃত্তের দৃশ্য প্রকটন করিয়া মানব জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি কোন্ কোন্ গুণে উন্নত এবং কোন্ কোন্ দোষে অধঃপতিত বা ধ্বংসের আবর্তে পতিত হইয়াছে, তৎসমুদয় দেখাইয়া দাও। ... প্রাণের উচ্ছ্বাসে, হৃদয়ের তেজে সত্যের প্রচারে, সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশকে অনুপ্রাণিত উদ্বুদ্ধ কর। দেখিবে, সাহিত্যশক্তির ঝটিকা-প্রভাবে অচিরেই জাতীয় জীবন মেঘোন্মুক্ত হইরা সৌভাগ্য-শশীর অমল-ধবল-কৌমুদী-ছটায় আলোকিত এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্যে সুশোভিত হইয়াছে।

—উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল। দীর্ঘতরও হতে পারত। সিরাজী সাহেবের সমগ্র সাহিত্য মানসের মর্ম উদ্ঘাটনে এই উদ্ধৃতির বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। এই আদর্শকেই সামনে রেখে তিনি তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনকে জাতির সেবায় ব্যয়িত করে নিজের ভবিষ্যৎকে বিস্মৃতির দিগন্তে ছুঁড়ে দিয়েছেন।

৩.

১৩০৬ সালে মুন্সী মেহেরুল্লাহর উৎসাহে সিরাজী সাহেবের প্রথম কাব্যপুস্তিকা "অনলপ্রবাহ" প্রকাশিত হয়। পরে আরও ১১টি কবিতা সংযুক্ত করে ১৩০৭ সালের পৌষ মাসে "অনলপ্রবাহ" পরিবর্দ্ধিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রথম কাব্য গ্রন্থই তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রধান কীর্তি। এই কাব্যগ্রন্থের প্রধান বক্তব্য দেশ ও স্বজাতিপ্রীতি—মুসলমানের নবজাগরণের প্রার্থনার সঙ্গে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। এই বক্তব্যকে সিরাজী সাহেব সারাজীবনে ঘুরেফিরে লিখেছেন, কবিতা-উপন্যাস-ভ্রমণ-প্রবন্ধ সবকিছুর মাধ্যমে ঐ কথাই ব্যক্ত করেছেন। কবির কথায় বলা যায়—

> : একমনে তোর একতারাতে
> একটি যে তার সেইটি বাজা—
> ফুলবনে তোর একটি কুসুম
> তাই দিয়ে তোর ডালিসাজা। ... ...

একটি মানসকুসুম দিয়ে সারাজীবনের ডালি সাজিয়েছেন। "অনলপ্রবাহ" নাম থেকেই বোঝা যায় প্রতিটি কবিতাই জাতীয় জাগরণের কবিতা। তৎকালীন ইংরেজ

সরকার ১৩১৭ সালে বইটি বাজেয়াপ্ত করে এবং হাজারীবাগ জেলে তাঁকে দুবছর অন্তরীণ করে রাখে। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তিনি বলেছেন—

: জাগাতে অতীত স্মৃতি জাগাতে জাতীয় প্রীতি
'অনলপ্রবাহ' খানি করিয়া রচন
বড় আশে বড় সাধে দিনু তোমাদের হাতে
হউক অনলময় অলস জীবন।

তাঁর এই কাব্যটি মুসলমান সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

মুসলমান-সমাজ দীর্ঘকাল ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে —প্রথম প্রথম তেমন কিছু অসুবিধে হয়নি। পরে অর্থনৈতিক চাপে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবার ফলে কলসীর জল যখন তলানিতে এসে ঠেকেছে তখনই বুঝেছে তারা কী ভুল করেছে। ভুল সংশোধনের উপায় ছিল না তখন অনুশোচনা করার অবকাশ প্রচুর ছিল। হিন্দু-সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হয়ে আর্থিক অবস্থাকে উন্নত করে ফেলেছে। আর মুসলমান সমাজের যে মুষ্টিমেয় অংশটুকুর হাতে কিছু অর্থ ছিল তারা নিজেদের অবস্থা ফিরিয়ে নিয়েছে কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান দরিদ্র্য থেকে আরও দরিদ্রতর হয়েছে। শুধু আর্থিক দারিদ্র্য নয়—শিক্ষা -দীক্ষায় মানসিক দিক দিয়েও দরিদ্র্য রয়ে গেছে। ফলে হতাশা, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য মুসলমান সমাজকে কুজ্ঝটিকার মত ছেয়ে ফেলেছে। সমাজের বৃহত্তর অংশের দারিদ্র্য সিরাজী সাহেবকে ব্যথিত করেছে এবং দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্য উদ্দীপ্ত করেছে। "অনল-প্রবাহ" সেই ব্যথা ও উদ্দীপনার কাব্য।

ব্যথা-বেদনায় মুহ্যমান হয়ে নৈরাশ্যের বাণী তিনি শোনান নি—অতীত ঐতিহ্যের শৌর্য-বীর্য জ্ঞানগরিমার কাহিনী তাদের শুনিয়ে উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন। অতীত ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মসম্বিত যেন তারা ফিরে পায় নতুন চেতনা নিয়ে তাদের যেন পুনর্জন্ম হয়। মুসলমান জাগরণ তাঁর প্রধান কাম্য হলেও তারই অন্তরালে স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ঐক্যশক্তিকে সংগ্রামী করে তুলতে চেয়েছেন—

: যে যেখানে আছ আজি সবে মিলে হও সম্মিলিত
এক পতাকার নীচে মহামন্ত্রে হওরে দীক্ষিত!
... ...
ইসলাম কংগ্রেস এক সব মিলি' করিয়া স্থাপন
উদ্ধার করহ তব দস্যু-হৃত স্বর্ণ সিংহাসন।

ব্যক্তিগত জীবনে সিরাজী সাহেব জাতীয় কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় তাতে তিনি ছিলেন। তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ করেছেন, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের তিনি একজন প্রধান সৈনিক ছিলেন।

"উচ্ছ্বাস" "উদ্বোধন" "নবউদ্দীপনা" "সঙ্গীত সঞ্জীবনী" প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থ ঐ মুসলমান সমাজের আত্মসম্মানবোধ জাগাবার কাব্য। এ সব কবিতায় হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। হেম-নবীনের জাতীয়তাবাদ যেমন সম্পূর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ তেমনি সিরাজী সাহেব সেই পন্থায় নিজ সম্প্রদায়কে জাগ্রত করতে গিয়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। ফলে আজকের দিনে হেম-নবীনের মতো তাঁর কোন কবিতাই রসোত্তীর্ণতার গভীরে নিয়ে যেতে পারে না। তবে পরবর্তী-কালে নজরুলের কণ্ঠে যে বিদ্রোহের বাণী ও যৌবনের জয়গান শুনেছি তার পূর্বাভাষ পেয়েছি সিরাজী সাহেবের কণ্ঠে। তিনি যেমন ঐতিহ্য কীর্তনের মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজের ক্লৈব্য ও জড়তাকে ভেঙেছিলেন তেমনি নজরুল ইসলামও মুসলিম ঐতিহ্যকে স্মরণ করে জাতিকে সংগ্রামমুখী করে তুলেছেন। নজরুলও নিজের জীবনে তাঁর প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। ১৯৪০ সালের ২২শে মার্চ কলকাতায় ইউরোপীয়ান এ্যাসাইলাম লেনে 'সিরাজী পাবলিক লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুম'-এর দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "তাঁহার সমগ্র জীবন ছিল অনল-প্রবাহ। আমার রচনায় সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রকাশ আছে।" তার মানে এ নয় যে নজরুলের জাতীয়তাবোধ সিরাজী সাহেবের মতো সঙ্কুচিত বরং নজরুলের জাতীয়তাবোধ রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্রের মত সম্প্রসারিত।

সিরাজী দুটি মহাকাব্যও লিখেছিলেন—কবিতার চেয়ে মহাকাব্যের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। 'মোহম্মদী' পত্রিকায় 'মহাকবি কায়কোবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে মহাকাব্য রচনায় কায়কোবাদের কৃতিত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মহাকবি নন গীতিকবি মাত্র সেকথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "তিনি বহুসংখ্যক সঙ্গীত গাথা ও কবিতা রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু একখানিও মহাকাব্য লেখেন নাই। সঙ্গীত, গাথা ও কবিতা বসন্তের ফুলের ন্যায়, উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।...কিন্তু মহাকাব্য হিমাচলের এই জিনিষ, যতদিন মানব-সমাজ থাকিবে, ততদিন উহাও থাকবে।" (শ্রাবণ ১৩২৬) এই মহাকাব্য রচনার পেছনে তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রেম, অতীত ইতিহাসের

প্রতি প্রবল আসক্তি লক্ষ্য করি। "স্পেন বিজয় কাব্যে"র লক্ষ্য ছিল

: গৌরব কাহিনী-গাথা করুক স্মরণ
গঠিত করুক সবে জাতীয় জীবন
উঠুক গগনে পুনঃ সৌভাগ্য চন্দ্রমা
মোহিত করুক বিশ্ব ইসলাম-সুষমা। (বন্দনা)

কাউণ্ট জুলিয়ানের কন্যা ফ্লোরিডার সতীত্বনাশ করে স্পেনের রাজা রডারিক; ফ্লোরিডার ধর্ষণের প্রতিশোধ নেবার জন্য জুলিয়ান মুসলমানদের পক্ষে যোগদান করে। তার সহায়তায় পিতাপুত্র তারেক ও আবদুল্লাহ অসীম বীরত্বে স্পেন জয় করে এবং সবংশে রডারিককে নিহত করে—এই হোল মোটামুটি কাহিনী। মোট আটটি সর্গে মহাকাব্যটি সমাপ্ত। মহাকাব্য রচনায় মধুসূদনের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়েছে। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে সিরাজী সাহেবের মৃত্যু হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনে দাগ কাটতে পারেন নি যতটা দাগ কেটেছেন মধুসূদন। আর মধুসূদন ছিলেন সিরাজী সমকালীন মুসলমান কবিদের প্রিয় কবি। মহাকাব্য রচনার প্লাবন এসেছিল তাঁদের মধ্যে। কায়কোবাদ, শেখ ফজলুল করিম প্রমুখ কবিরা মধুসূদনের রসভাণ্ডার থেকে দু হাত ভরে রত্ন আহরণ করেছেন কিন্তু অলঙ্কারের কোন স্থানে রত্নটি বসালে সৌন্দর্য খুলবে সেই প্রতিভার জহুরীপনা তাঁদের ছিল না। সেজন্যে দেখি সিরাজী সাহেবের "স্পেন বিজয় কাব্য" 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র স্থূল অনুকরণ—প্রভাব assimulate করার মত মনীষা তাঁর ছিল না। রডারিক যখন তার পুত্রের নিধন সংবাদ শুনল তখন শোকার্তা রানীর বিলাপ এবং রাজাকে দায়ী করার বিষয়টি 'মেঘনাদ বধের' বীরবাহুর পতনে রাবণের শোক, শোকার্তা মন্দোদরীর প্রবেশ ও ভৎর্সনার কথা মনে পড়ে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কোথায় সেই মহাকাব্যসুলভ গাম্ভীর্য, রাবণচরিত্রের পুরুষোচিত দৃঢ়তা? "মহাশিক্ষা" তাঁর আর একটি মহাকাব্য। মোহররমের কাহিনী নিয়ে এত বড় কাব্য এ পর্যন্ত নাকি আর কেউ লেখেন নি।' সমগ্র কাব্যটি প্রকাশিত হয় নি শুধুমাত্র 'বন্দনা' ও প্রথম সর্গটি 'আল-এসলাম' পত্রিকার ১৩২২ আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় বেরিয়েছিল। এই মহাকাব্যটি লিখতে তাঁর বার বছরের (১৮৯৮-১৯১০) ওপর লেগেছিল। পাণ্ডুলিপিটি তাঁর সিরাজগঞ্জের বাণীকুঞ্জে সংরক্ষিত আছে। এই মহাকাব্যের প্রথম খণ্ড ইমাম হোসেনের সাহাদৎ ১৯৬৯ সালে ঢাকার কেন্দ্রীয় উন্নয়ন বোর্ড প্রকাশ করেছেন।

৪.

সিরাজী কিছু উপন্যাসও লিখেছিলেন। উপন্যাস লেখার খাতিরে তিনি

উপন্যাস লেখেন নি—প্রয়োজনের বশবর্তী হয়ে "রায় নন্দিনী" "নুরুদ্দীন" "তারাবাঈ" "ফিরোজা বেগম" ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর সমকালে কিংবা তাঁর আগে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করার তাগিদে ইংরেজকে আক্রমণ করার সৎসাহস না দেখিয়ে অনেক ঔপন্যাসিক হিন্দুদের শৌর্যবীর্য উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করতে গিয়ে মুসলমান সমাজকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অথবা হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। জাতির জীবনে তার পরিণাম সুখকর হয় নি—ভারত বিভাগের এও একটি অন্যতম কারণ ছিল। হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বে হিন্দুর জয়ে মুসলমানরা যেমন খুশী হতে পারেন নি তেমনি মুসলিম নারীর সঙ্গে হিন্দুযুবকের প্রণয় কাহিনীও তাঁদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। 'অনল-প্রবাহে' ও সিরাজী এই কথার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—

: চেয়ে দেখ অই কত হীন দাস
কল্পনার বলে রচি উপন্যাস,
মিথ্যা কলঙ্কের করিয়া বিন্যাস
করিছে তোদেরে কত উপহাস
শ্রবণে যে-সব নাহি কি বাজে?

"রায় নন্দিনী" উপন্যাসের ভূমিকায় সিরাজী সাহেব তাঁর উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য স্বল্প-ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "নীচমতি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক উদ্ভট উপন্যাসিক লেখকই অতি জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিশ্বপূজ্য মুসলমানের মুণ্ডপাত এবং মর্ম বিদ্ধ করিতে অসাধারণ প্রয়াস স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আমি নিজে এবং আরও কতিপয় মুসলমান লেখক এ সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ নানা পত্র-পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় নাই।... দেশমাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদের সাবধানতার জন্য এবং মুসলমানের আত্মবোধ জন্মাইবার জন্যই উপন্যাসের ঘোর বিরোধী আমি, কর্তব্যের নিদারুণ তাড়নায় 'রায় নন্দিনী' রচনা করিয়াছি।" ইতিহাসের বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় থেকে মালমশলা নিয়ে একের পর এক মোট চারিটি উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন শুধুমাত্র হিন্দু লেখকের 'চৈতন্য উৎপাদনের জন্য'। তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে পাল্টা জবাব দেবার জন্য যেমন মুসলমানদের শৌর্যবীর্য বর্ণনা করেছেন তেমনি হিন্দুনারীর সহিত মুসলমান যুবকের প্রণয় চিত্র অঙ্কিত করেছেন। "রায় নন্দিনী" উপন্যাসে কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীর সঙ্গে ঈশা খাঁর, প্রতাপাদিত্যের কন্যা অরুণাবতীর সঙ্গে মহতাব খাঁর প্রণয়, "তারাবাঈ" উপন্যাসে সিরাজীর কন্যা তারাবাঈয়ের সঙ্গ বিজাপুরের সেনাপতি আফজল খাঁর প্রণয়, "নুরুদ্দীন" উপন্যাসে মালবের যুবরাজ

নুরুদ্দীনের সঙ্গে চিতোরের রাজকুমারী রুক্মিণীর প্রণয়লীলা অঙ্কিত হয়েছে। যে বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি 'নীচমতি' বলেছিলেন সেই বঙ্কিমচন্দ্রের ষোল আনা প্রভাব তাঁর উপন্যাসে পড়েছে—কী চরিত্রচিত্রণে, কী ঘটনা সংস্থাপনে, কী রচনারীতিতে। "রায় নন্দিনী" উপন্যাসের সূচনায় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে স্বর্ণময়ীর শিবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ এবং ঈশা খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সঙ্গে "দুর্গেশনন্দিনীর" শৈলেশ্বর মন্দিরে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়ে। "নুরুদ্দীন" উপন্যাসে কাপালিক চরিত্র "কপালকুণ্ডলা"র কাপালিকের অনুকরণে রচিত। মানব হৃদয়ের গভীর রহস্যের কথা তার অন্তর্নিহিত রসব্যঞ্জনার কথা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে যে ভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে সিরাজী রচিত উপন্যাস তার ধারে কাছে আসতে পারে নি। তাই সমসাময়িককালের উজান বেয়ে সেগুলি এ কালের তীরে বাসা বাঁধতে পারে নি। ক্ষণিক প্রীতি বা চমৎকারিত্ব উৎপাদন করে হারিয়ে গেছে। তবে মুসলমানদের মধ্যে সিরাজীই প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে মুসলমানের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী তাঁকে সেদিন জনপ্রিয় করেছিল আর সেই জন-প্রিয়তাই তাঁর উদ্দেশ্যকে সফল করেছিল।

৫.

সিরাজী সাহেবের যা উদ্দেশ্য ছিল তার সঠিক রূপায়ণ ঘটেছে প্রবন্ধ আলোচনা ও ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে। কবিতা-উপন্যাসে যেটুকু ঘাটতি ছিল প্রবন্ধ আলোচনায় তা পূরণ করে দিয়েছেন। যেমন "স্পেন বিজয় কাব্যে" মুসলমানদের বীরত্বের কথা কবিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছিলেন কিন্তু সব কথা বলার সুযোগ ছিল না তাই "স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা" গ্রন্থে ঐতিহাসিকদের তথ্য ও প্রমাণসহ উপস্থিত করেছেন।

গোঁড়ামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছেন। মুসলমান সমাজে যেসব অনৈসলামিক সংস্কার প্রবেশ করেছে তা তিনি সমূলে উৎপাটন করতে চেয়েছেন ফলে রক্ষণশীলদের তিনি বিরাগভাজন হয়েছেন। বাল্যবিবাহ ও একাধিক বিবাহের তিনি ঘোরতর বিপক্ষে ছিলেন, পীর-মুরিদ প্রথা, পীরদের কবর জিয়ারতের নিয়ম, এগারোই শরীফ পালন, ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন। মূল ইস-লামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার ব্রত তাঁর ছিল বলে অনৈসলামিক ক্রিয়াকাণ্ড তাঁর প্রতি-বাদের বস্তু হয়েছে। মোল্লা মৌলবীদের সঙ্গে তাঁর বাদ-প্রতিবাদ লেগেই থাকত—তিনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন বলে কাঠমোল্লারা তাঁকে খাটি মুসলমান বলত না। ধর্মকে

বিক্রী করে পেটের ভাত রোজগার করে যে সব মোল্লা এবং নিজেদের মর্জিমাফিক শরিয়তের বিধানের ব্যবস্থা করে সেই মোল্লা-মৌলবীদের তিনি দুচোখে দেখতে পারতেন না। তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি 'ইসলাম প্রচারক'-এ একটি দীর্ঘ ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন (১৯০৩ সেপ্টম্বর-অক্টোবর সংখ্যায়)। বিচারহীন সত্যে তাঁর আস্থা ছিল না, যুক্তিনিষ্ঠ সত্যের উপাসক ছিলেন তিনি। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন "মুসলমানকে দক্ষিণ হস্তে কুরআন এবং বাম হস্তে বিজ্ঞান গ্রহণ করতে হবে।"

মুসলমান সমাজ শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর। শিক্ষার প্রসার না হলে সমাজের উন্নতি হবে না—এই বিশ্বাস ছিল সিরাজী সাহেবের। পুরুষদের মধ্যে যদিও কিছু অংশ শিক্ষার আলো পেয়েছে কিন্তু নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার কোন ব্যবস্থা রক্ষণশীল সমাজ করে নি। নারী জাতির শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে সমগ্র সমাজের কল্যাণ ও মুক্তি হবে না—একথা তিনি প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সারাজীবন স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং "স্ত্রী-শিক্ষা" নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। অতীতে মুসলমান মহিলারা শিক্ষা ক্ষেত্রে কতদূর উন্নত ছিলেন সেই গৌরব কাহিনী তিনি "স্ত্রীশিক্ষা" গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। "তুর্কী নারী জীবন" "তুরস্ক ভ্রমণ" গ্রন্থে সেখানকার নারী প্রগতির কথা বলেছেন এবং এদেশের মুসলিম নারী কিরূপ দুঃসহ জীবন যাপন করছে তার প্রতিকারার্থে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শিক্ষার প্রদীপ প্রতিটি ঘরে জ্বালিয়ে দেবার জন্য তিনি আকুল আবেদন জানিয়েছেন—

> ঃ যদি তোমার ঘরবাড়ী ও স্বদেশকে সুসজ্জিত সুশোভিত ও সুবিন্যস্ত করিতে চাও, তাহা হইলে নারীর শিক্ষায় জীবনপাত কর। নারীর গর্ভে জন্মিয়া নারীর দুগ্ধে জীবন ধারণ করিয়া, নারীর বুকে শান্তিলাভ করিয়া যে ব্যক্তি নারীর শিক্ষা ও ধর্মগত স্বাধীনতার চিন্তা করিল না, নারীর সুখের জন্য, নারীব অজ্ঞানতা কাটবার জন্য অর্থ ব্যয় করিল না, নারীর দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার জন্য দুটি কথা বলিল না, নারীর হিতচিন্তায় মাথা ঘামাইল না, তাহার মতো অধম ও হতভাগ্য জীব কে? (নারী শক্তির উদ্বোধন ও জাতীয় জীবন)
>
> ঃ এ বঙ্গে যদি কেহ ইসলামের প্রকৃত ভক্ত ও অনুরক্ত থাকে, যদি কোন জাতীয় উত্থানকামী তেজঃদীপ্ত-মহাপ্রাণ-পুরুষ থাক, তবে সর্বাগ্রে মাতৃজাতির সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করতঃ অধঃপতনের খরস্রোত রুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হও। (স্ত্রীশিক্ষা)

তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, নিজের বই বিক্রী ও বক্তৃতা দিয়ে যা আয় করতেন তার বেশী অংশ শিক্ষা বিস্তারে ব্যয় করতেন। অনেক জায়গায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। গরীব ছাত্রদের বাসস্থান তৈরী করে দিয়েছেন। নিজের বাড়ীতেও গরীব

ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। নিজের মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন। এটা আজকের দিনে বলা যতটা সহজ সিরাজী সাহেবের সময়ে করা ততটা সোজা ছিল না।

তুরস্কে যাবার সাধ ছিল তাঁর বহুদিনের। স্কুলে পড়ার সময় জামালউদ্দীন আফগানীর জীবনচরিত পাঠ করে তুরস্কে যাবার ইচ্ছে জাগে। বাড়ী থেকে পালিয়েও গিয়েছিলেন কিন্তু কম বয়সের জন্য পথ থেকেই ফিরে আসতে হয়। তুরস্ক যাওয়া ঘটল তাঁর ১৯১২ সালের ২রা ডিসেম্বরে। বলকান যুদ্ধে তুরস্কের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ায় ডাক্তার মুখতার আহমদ আনসারীর নেতৃত্বে গঠিত মেডিকেল মিশনের সদস্য হয়ে তিনি তুরস্কে যান। সেখানে তিনি বছর দুয়েক ছিলেন। স্বাস্থ্য বিভাগের ইন্সপেক্টররূপে তিনি আহত সৈনিকদের সেবা করতেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তুরস্কের সুলতান তাঁকে "গাজী" উপাধি ও মূল্যবান খেলাত দান করেন। তাঁর সেবার কথা তুর্কীরা বিস্মৃত হয় নি। ১৯৩১, ১৭ই জুলাই সিরাজী সাহেব পরলোক-গমন করলে তুরস্কের দেশনায়ক মুস্তফা কামাল পাশা তাঁর পুত্রকে শোকে সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানিয়ে যে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, "আমার পুরাতন বন্ধু সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মৃত্যুতে আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। তিনি কেবল যে ভারতের গৌরব ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি ইসলাম সমাজের নেতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইসলাম জগতে এক বিখ্যাত ব্যক্তির অভাব হইল। তুর্কীগণ আপনার শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।"

বাংলা ভাষার উন্নতিসাধনে মুসলমানকে সচেতন করেছেন, তাদের হীন-মন্যতা দূর করেছেন ও উষ্মিত উপেক্ষাকে আঘাত করেছেন। 'মাতৃভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন "মাতৃভাষার উন্নতি দেখিয়া জাতির উন্নতির পরিমাণ অবধারণ করা যায়। যে জাতি যত উন্নত সে জাতির মাতৃভাষাও তত শ্রীসম্পন্না, যে জাতির সাহিত্য নাই, মানবজ্ঞাতিগণের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অতি অল্প। ... যদি কিছু মানবের প্রার্থনীয় থাকে তাহা সাহিত্য, যদি মানবের কিছু বরেণ্য থাকে তাহা মাতৃভাষা।" (প্রচারক : ১৩০৬ ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা) এখানেই তাঁর খাঁটি বাঙালীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

মুসলমান সমাজে যুগচেতনা সঞ্চার করার জন্য তিনি 'মিহির'(১৮৯১),'আখবারে ইসলামিয়া' (১৮৯২)'প্রচারক' (১৮৯৭), 'হাফিজ'(১৮৯৭), 'কোহিনূর' (১৮৯৮)'ইসলাম' (১৮৯৯), 'লহরী' (১৯০৩), 'নুরুল ইমান'(১৯০০),'নবনূর'(১৯০৩)প্রভৃতি সাময়িক পত্রে

অজস্র কবিতা প্রবন্ধ লিখেছেন। তার কিছু অংশ গ্রন্থভুক্ত হয়েছে—অধিকাংশই পত্রিকায় পড়ে আছে। তিনি নিজেও সিরাজগঞ্জ থেকে ১৯২০ সালে 'নূর' নামে এক স্বল্পায়ু মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন(প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৬, ফেব্রুয়ারী ১৯২০)। ১৩৩০ বৈশাখ থেকে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও তিনি 'সাপ্তাহিক সোলতান' বের করেন। এই পত্রিকায় মাথায় লেখা থাকত 'নবযুগের নবতন্ত্রের স্বাধীননীতির নির্ভীক সংবাদপত্র'। এই পত্রিকার তাঁর প্রচুর লেখা বেরিয়েছে।

নতুন সাহিত্যসেবকদের তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি নিজে প্রাচীনপন্থী লেখক ছিলেন হেম-নবীনের মতো কবিতা লিখতেন কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের কবিতাও তিনি উপভোগ করতেন। নজরুল ইসলাম জসীমউদ্দীনের তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। 'সওগাত' পত্রিকার তরফ থেকে যখন নজরুলকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয় তখন সিরাজী সাহেবের দারুণ অর্থ সঙ্কট সত্ত্বেও দশ টাকা মনিওর্ডার করে পাঠিয়েছিলেন। নজরুল ইসলাম ঐ ঘটনা বিবৃত করে বলেছেন, "সিরাজী সাহেব ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। তিনি আমাকে ভাবিতেন জ্যৈষ্ঠ পুত্র-তুল্য। তাঁহার নিকট হইতে যে স্নেহ আমি জীবনে পাইয়াছি তাহা আমার জীবনের পরম সঞ্চয়।" (নজরুল রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড) জসীমউদ্দীনও লিখেছেন, "সিরাজী সাহেব ফরিদপুরে আসিয়াই আমাকে খোঁজ করেন। খবর পাইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম।··· দেখা হইতেই তিনি আমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর কিছু মিষ্টি আনাইয়া নিজ হাতে মুখে তুলিয়া দিয়া আমাকে খাওয়াইলেন, অত আদর আর জীবনে কারও কাছে পাই নাই।··· তিনি আমায় কাছে বসাইয়া আমার লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন।" (সিরাজী স্মরণে : অনল-প্রবাহের উৎস কেন্দ্রে)

৬.

তারাপদ মুখোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তকে বলেছেন গ্রীক পুরাণের জেনাস দেবতার মত—তাঁর একমুখ অতীতের দিকে আর একমুখ অনাগত দিনের দিকে। এই উপমার জুড়িদার-রূপে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর নামও তোলা যেতে পারে। মুসলমান সমাজের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করার জন্য ইসলামের অতীত শৌর্য-বীর্যের বর্ণাঢ্য কাহিনী তাঁর সাহিত্যে যেমন আছে তেমনি আছে যুগচেতনার পটভূমিকায় মুক্তবুদ্ধির চিন্তা-ভাবনায় আত্মোপলব্ধির সঞ্জীবনী মন্ত্র। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে নবজাগরণের

প্রভাবে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা প্রধানত হিন্দুসমাজকে জাগ্রত করার সাহিত্য, উনিশ শতকের শেষের দিকে ও বিশশতকের গোড়ার দিকে মুসলমানরা তারই অনুকরণে যে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তা প্রধানত স্বসমাজকে জাগ্রত করার তাগিদে। সিরাজীর সাহিত্যও সেই তাগিদেরই সৃষ্টি। তিনি জসীমউদ্দীনকে বলেছিলেন, "আমি নিজের জন্য সম্মান চাই নে, অর্থসম্পদ চাইনে—আমি চাই এই ঘুমন্ত জাত আবার মাথা নাড়া দিয়ে জেগে উঠুক—সিংহ গর্জনে হুঙ্কার দিয়ে উঠুক। আমি চাই এমনই একটি মুসলিম-সমাজ যারা বিদ্যায়, সাহিত্যে, সাহসে, আত্মত্যাগে কারুর চাইতে পিছপা হবে না। যা কিছু মিথ্যা, যা কিছু অন্ধ সংস্কার তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। দেশের মেয়েদের পরদায় আবদ্ধ রেখে তাদের কাছ থেকে দুনিয়ার আলো-বাতাস বন্ধ করে রাখবে না—স্বাধীন সজীব একটি মুসলিম জাতি।" (সিরাজী-স্মৃতি ঃ অনল-প্রবাহের উৎস কেন্দ্রে) সিরাজীর সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে—যাদের জন্য তিনি সারাজীবন চিন্তা করেছিলেন তারা জেগেছে।

সিরাজী সাহেব সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তাঁর বাসভবন 'বাণীকুঞ্জ'-সাহিত্য সংস্কৃতি আলোচনার বৈঠক বসত। পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হত। এই বৈঠকে যেমন যেতেন 'সিরাজী চরিত' প্রণেতা এম সেরাজুল হক, কবি শেখ ফজলল করিম, ঔপন্যাসিক ইদরিস আলী, এ. কে ফজলুল হক, তেমনি যেতেন ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কবি রজনীকান্ত সেন, চারণ কবি মুকুন্দরাম দাস, 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি। তাঁর মৃত্যুর পর প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' বলেছিলেন, "তাঁহার প্রকৃতি ও আচরণে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিল না।" (ভাদ্র ১৩৩৮) অক্ষমের সঙ্গে সক্ষমের কখনও মিল হয় না, হলেও সেটি টিকে না। হিন্দুর মত সমশক্তিসম্পন্ন হয়ে মুসলমান সমাজকে দাঁড়াতে হবে তবেই একতা দীর্ঘস্থায়ী হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সিরাজী সাহেবের সেই স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। হিন্দু পুর্নজাগরণবাদ আর মুসলিম পুর্নজাগরণবাদ দুটি ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে দেশ ভাগাভাগি হয়ে গেল, দুটো ধারাকে সাগর সঙ্গমে মিলিয়ে দেবার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভা আমাদের সাহিত্যে দেখা দেয়নি। মুসলমান সমাজের ব্যথা বেদনার কথা রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি জানতেন না, আর নজরুলকেও হিন্দু সমাজ পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি।

আজ সিরাজী সাহেব যে অপঠিত অমরত্ব লাভ করেছেন তার একাধিক কারণ আছে। সমাজের উন্নতি চিন্তায় তিনি এমনই বিভোর ছিলেন যে আত্মপ্রতিষ্ঠায়

উদাসীন ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁর সমকালকে নিয়ে এত বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন ভবিষ্যতের জন্য কিছু রেখে যাওয়ার কথা ভাবেন নি। তাই তাঁর ঐতিহাসিক অমরত্ব ও গুরুত্ব মুসলমান জাগরণের মধ্যে—তিনি যতটা সাহিত্যিক তারচেয়ে বেশী আজ ঐতিহাসিক পুরুষ। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সম্মানের যেটুকু পাওনা সেটি আজকের বাটখারায় উপরি পাওনা। কেননা সাহিত্যের বিচার পরিমাণ দিয়ে হয় না, হয় উৎকর্ষ দিয়ে। সেই সাহিত্যিক উৎকর্ষ তাঁর রচনার মধ্যে নেই যা বস্তুকে অতিক্রম করে এক রসঘন ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করে। কিন্তু সিরাজী সাহেব ঘটনার গন্ধমাদন পর্বত তুলে এনেছেন, বিশল্যকরণীর খোঁজ পাননি। তাঁর সাহিত্য বোঝা বাড়িয়েছে তাই বস্তুর রূপকার তিনি, ভাবের কবি নন, প্রত্যক্ষ বিষয়ের বর্ণনা দিতে পারেন, দৃশ্য পরপারবর্তী রসের ব্যঞ্জনা আনতে পারেন নি। খাঁটি কথা বললেই খাঁটি সাহিত্য হয় না—সত্যাত্মক বাক্যকেও রসাত্মক হতে হয়। তবে সিরাজী সাহেব আগে সংস্কারক পরে সাহিত্যিক। তিনি তাঁর বিরাট কর্মযজ্ঞের মধ্যস্থলে সাহিত্যকে বসিয়েছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল লোক শিক্ষায় কাজের সুবিধার জন্য সাহিত্যকে বাহন করেছিলেন, বক্তৃতা আলোচনা ইত্যাদি হৃদয়গ্রাহী করার জন্য সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করেছেন ফলে তাঁর আবেগ সেদিন তাঁকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে তাঁর অন্বিষ্টে যেজন্যে নিজের সমকালে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ ছিলেন নির্বিশেষের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট। সারাজীবন তিনি আপন অন্তরের আদর্শের শিখাটিকে অনির্বাণ রেখে রক্ষণশীল সমাজের নিন্দাকে তোয়াক্কা না করে অবিচলিত চিত্তে আপন পথে চলেছেন। তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয়ের মধ্যে এমন অনেক বস্তু রয়েছে যাতে সুস্থ বিবেচনার পরিচয় আছে যা আজকের দিনেও আমাদের ভাবিয়ে তোলে, ভাবতেও অবাক লাগে তিনি তাঁর সমকালে এমন স্বচ্ছ ও প্রগতিশীল চিন্তা কীভাবে করেছিলেন। ধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "যেখানে শক্তি নাই, তেজ নাই, বিক্রম নাই, আধিপত্য নাই, সেখানে ধর্মও নাই।...শক্তিসাধনার ভিতর দিয়াই যথার্থ ধর্মপ্রাণতা লাভ করিতে হয়। এই পরাধীন ও পরপদ লুণ্ঠিত দেশে সেইজন্য যথার্থ ধর্ম যাহা তাহার প্রায় কিছুই নাই। আছে কেবল ধর্মের কতকগুলি বাহ্য আচার অনুষ্ঠান...যে দেশের অর্ধেক লোক পেট পুরিয়া আহার করিতে পায় না—ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিয়া মরে এবং নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অকালে কালসদনে গমন করে অথচ কোটি কোটি লোক তাহার প্রতিকার সাধনে তেমন কোনই চেষ্টা করে না তাহারা যদি ধার্মিক বা ধর্মশীল হয়, তাহা হইলে আমি জানি না অধার্মিক কাহারা?...সেইজন্যই

বলিতেছি যে, যেখানে শক্তি নাই, শক্তির সমাদর নাই, মহৎ হইবার বৃহৎ হইবার ইচ্ছা নাই, বিপুল হইবার বিরাট হইবার কল্পনা নাই, সেখানে ধর্মের বিন্দু-বিসর্গও নাই। আত্মোপলব্ধি, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রসারের ভিতর দিয়া ধর্মের স্থচনা এবং আত্ম-শক্তির বিপুল দ্যোতনা ও সভ্যতার বিপুল ব্যঞ্জনাতেই হইতেছে ধর্মের পূর্ণ পরিণতি।" (শক্তির প্রতিযোগিতা) ধর্মের এই দুঃসাহসিক যুক্তিনিষ্ঠ প্রগতিশীল ব্যাখ্যা অনেক অন্ধকার পেরিয়েও বিদ্যুতের ঝিলিক হানে। সেজন্য তাঁর কাছে যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন, যা পাইনি সে তো বড় নয়॥

পরিশিষ্ট

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর গ্রন্থপঞ্জী

ক. কবিতা ও গীতিকাব্য :

১ অনল-প্রবাহ (১৩০৬। ২য় সং বাজেয়াপ্ত। ৩য় সং বৈশাখ ১৩৬০, ঢাকা) ২ উচ্ছাস (১৩১৪)। ৩. উদ্বোধন (১৯০৭)। ৪. নবউদ্দীপনা (১৯০৭)। ৫. সঙ্গীত সঞ্জীবনী (১৯১৬) ৬. প্রেমাঞ্জলি (১৯১৬)। অপ্রকাশিত কাব্য : সুধাঞ্জলি। গৌরবকাহিনী। কুসুমাঞ্জলি। আবে হায়াৎ। কাব্য-কুসুমোদ্যান। পুষ্পাঞ্জলি।

খ. মহাকাব্য :

১. স্পেন বিজয় কাব্য (১৯১৪, ২য় সং ১৯২০)। ২. মহাশিক্ষা কাব্য ১ম খণ্ড (১৯৬৯, ঢাকা)।

গ. উপন্যাস :

১ রায়-নন্দিনী (১৯১৮, ২য় সং ১৩৩৫)। ২. তারাবাঈ (১৩২৫ বৈশাখ)। ৩ নুরুদ্দীন (১৯২৩ ?)। ৪. ফিরোজা বেগম (১৯২৪, ২য় স° ১৯৩৭)।

ঘ. প্রবন্ধ ও আলোচনা :

১. স্ত্রীশিক্ষা (১৩১৫, ৪র্থ সং ১৩২৩)। ২. সুচিন্তা (১৩৩০)। ৩. আদব-কায়দা শিক্ষা (১৩২১)। ৪, স্বজাতি প্রেম। অপ্রকাশিত গ্রন্থ : সুচিন্তা ২য় খণ্ড। মুক্তির বাণী। বিবিধ প্রবন্ধ। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় শতাধিক প্রবন্ধ।

ঙ. ভ্রমণ ও ইতিহাস :

১ তুরস্ক ভ্রমণ ১ম খণ্ড (১৯১৩)। ২. স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা বা মহানগরী কর্ডোভা (২য় সং ১৯১৩)। ৩. তুর্কীনারী জীবন (১৩২০)। অপ্রকাশিত গ্রন্থ : তুরস্ক ভ্রমণ ২য় খণ্ড। তুরস্কের ডায়েরী। নব্য তুর্কী। কারা-কাহিনী। সিরিয়া ভ্রমণ।

চ. গ্রন্থাবলী :

সিরাজী-রচনাবলী। আব্দুল কাদির সম্পাদিত। উপন্যাস খণ্ড। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৭।

ছ. উপন্যাসের নাট্যরূপ :

তারাবাঈ। আজিজ মেহের মসিহুর রহমান কর্তৃক নাট্যরূপ। এসরাফিল এণ্ড সন্স, ঢাকা ১৯৬৪।

জ. সম্পাদিত পত্রিকা :

১. নূর (মাসিক, ফেব্রুয়ারী ১৯২০)। সাপ্তাহিক সোলতান (১৩৩০, ২রা বৈশাখ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সহযোগ)

ঝ. সিরাজী সম্পর্কে গ্রন্থ :

১. মোহাম্মদ সেরাজুল হক—সিরাজী চরিত। ১৯৩৫। কলিকাতা।

২. ইজাবউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত—অনল প্রবাহের উৎস কেন্দ্রে। দরবার পাবলিকেশনস, ঢাকা ১৩৭৩।

৩. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান—সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৭০।

ঞ. সিরাজী সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিচ্ছিন্ন আলোচনা :

১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ১৯৫৬।

২. ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক-মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য। পাকিস্তান পাবলিকেশনস ঢাকা ১৯৫৭।

৩. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান—আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা। রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয় ১৯৬১। ২য় সং ১৯৬৯।

৪. কাজী মোতাহার হোসেন—অনল প্রবাহ। 'বাংলা সাহিত্যের সম্পদ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ। পাকিস্তান পাবলিকেশনস ঢাকা ১৯৫৬।

৫. ডঃ আনিসুজ্জামান—মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৭৫৭—১৯১৮। ঢাকা, লেখক সঙ্ঘ প্রকাশনী ১৩৭১ অক্টোবর ১৯৬৪)।

৬. আবুল কালাম শামসুদ্দীন—দৃষ্টিকোণ। ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৭৪।

৭. ডঃ গোলাম সাকলায়েন—বাংলায় মার্সিয়া সাহিত্য, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৪। ২য় সং ১৯৬৯।

খ. ঐ —মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক। ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৭।

গ. ঐ —সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-অগ্রহা ৭ ১৩৬৪।

ঘ ঐ —সিরাজী-মানস-পরিক্রমা। সাহিত্যিকী শরৎ ১৩৭৪।

৮. দরবার সিরাজী স্মৃতি সংখ্যা—সাপ্তাহিক, ১৩ই জুলাই ১৯৫৯।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

মেদিনীপুরের ভীমপূজা ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা

বিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ লোকসংস্কৃতি ["ফোকলোর" -এর সর্বজনস্বীকৃত বা অনুমোদিত প্রতিশব্দ অদ্যাপি আমাদের দেশে গৃহীত হয় নি। বর্তমান লেখক ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসাবে "লোককৃতি" শব্দটি চয়ন করেছেন। কেউ কেউ লোককৃতি শব্দটি গ্রহণ করে ব্যবহারও করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে সাধারণভাবে লোকসংস্কৃতি শব্দটিই ব্যবহৃত হল।] অন্বেষা নামান্তরে সামাজিক-ঐতিহাসিক বস্তুবাদী সচেতনতা যা প্রত্নসাক্ষ্যের পদচিহ্নে অনেক রহস্যের উন্মোচন ঘটায়। বলাবাহুল্য বাংলার সামাজিক—সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ব্যাপক বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে লোকধর্মানুষ্ঠান ও উৎসব পার্বণের মধ্য দিয়ে। বাংলার সংস্কৃতি সাধনায় অনাদৃত আঞ্চলিক লৌকিক দেবদেবী ও উৎসব-অনুষ্ঠানের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লৌকিক দেবদেবীর উদ্ভব, বিকাশ, প্রভাব ও বিচরণক্ষেত্রের ইতিবৃত্তের মাধ্যমে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বহুলুপ্ত তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব। এদিক থেকে অধিকতর ব্যাপক ও গভীর গবেষণা সাপেক্ষেও এই মুহূর্তে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মেদিনীপুর তথা বাংলার সামাজিক-অর্থ-নৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বহুবিধ লুপ্ত উপকরণ উদ্ধারের মূল্যবান সম্পদ। মেদিনী-পুরের লোকায়ত সমাজে ব্যাপকরূপে অনুষ্ঠিত ভীমপূজা ও উৎসব তার মধ্যে একটি।

ভীমপূজা মেদিনীপুর জেলার এক বিশিষ্ট লোক উৎসব। মেদিনীপুরের পার্শ্ব-বর্তী জেলায় ও অন্যান্য অঞ্চলের কোন কোন স্থানে ভীমপূজার প্রচলন দেখা গেলেও,

বাংলায় এই উৎসবটি প্রধানত মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপকরূপে অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর জেলার প্রায় সর্বত্রই অদ্যাপি ভীমপূজার ব্যাপক ও সর্বজনীন প্রচলন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। (বলাবাহুল্য ভীমপূজা কেবলমাত্র ঘাটাল মহকুমার সীমায় ও বাগদী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ধারণাটি অজ্ঞতাপ্রসূত)। প্রধানত লোকায়ত সমাজে নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ভীমপূজার অধিক প্রচলন দেখা গেলেও মেদিনীপুরের ভীম উৎসবের লোকায়ত সর্বজনীন রূপ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাঘ মাসের শুক্লাপক্ষের একাদশী তিথিতে ভীমপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উন্মুক্ত প্রান্তরে, ক্ষেতের ধারে, ধানের মরাই বা গোলার পাশে. গ্রামের মধ্যে বা সীমান্তে, হাট বা বাজারের মধ্যে অথবা রাস্তার মোড়ে বিরাট আকৃতির মূর্তি তৈরি করে ভীম-পূজা হয়। গদা হস্তে দণ্ডায়মান ভীমের বলিষ্ঠ মূর্তির অধিক প্রচলন থাকলেও ভীমের বীরত্ব ব্যঞ্জক বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে বিভিন্ন মূর্তি গঠিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বয়ঃবৃদ্ধের মুখে কাঁধে গদা ও হাতে লাঙল নিয়ে ভীমের মূর্তির বর্ণনা শোনা গেলেও, ব্যাপকরূপে মহাভারতোক্ত ভীমের বীর মূর্তিই প্রত্যক্ষ করা যায়। ভীমের বিভিন্ন প্রকার মূর্তির মধ্যে—গদা হস্তে একক ভীম, ভীমের জরাসন্ধবধ, কিচক বধ, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ, জতুগৃহ থেকে পলায়ন, হনুমানের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা, দুঃশাসনের রক্তপান, ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ, অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ, প্রভৃতি প্রধান। সাধারণত স্বর্ণাভ হলুদ, রক্তাভ খয়েরী বা ধূসর বর্ণের ভীম মূর্তি হয়। মূর্তির মাথায় দীর্ঘ কুঞ্চিত বাবরিচুল এবং মুখে জুলফি ও গোঁফ থাকে। আয়ুধ হিসাবে হাতে থাকে গদা, কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁধে ধনুক দেখা যায়। সাধারণত গ্রামগত বা পাড়াগত হিসাবে ও সর্বজনীনরূপে ভীমপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভীমপূজা ও উৎসবের উদ্যোক্তা, সহায়ক ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আদিবাসী সমেত বিভিন্নস্তরের হিন্দুদের দেখা যায়। স্থানভেদে ভীমপূজা অনুষ্ঠিত হয় দিনে, সন্ধ্যায় বা রাত্রে। সাধারণত একাদশীর তিথি ধরে পূজারম্ভ হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে রাত্রে চারপ্রহরে চারবার পূজা হয়। ভীমপূজায়—আতপ চাল, ফলমূল ও বিভিন্ন প্রকার মিষ্টির নৈবেদ্য দেওয়া হয়। পূজায় লেবু, নারিকেল, শশা লালআলু প্রভৃতি কাঁচাফল; নুনবিহীন লালআলু ও মুগডাল সিদ্ধ; লুচি, বাতাসা, তিলে পাটালি, সন্দেশ প্রভৃতির শীতল ও মকর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। মানত অনুসারে অনেকে ভীমের গলায় বৃহৎ আকৃতির বাতাসার মালা পরিয়ে দেয়। ভীমপূজায় কোন কোন ক্ষেত্রে অব্রাহ্মণ পূজারী দেখা গেলেও বর্তমানে সাধারণত ব্রাহ্মণ পুরোহিত ভীম পূজা করেন।

পূজারম্ভের পূর্বে নিকটবর্তী কোন জলাশয় থেকে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা উপবাসী প্রধান ভক্ত (যে জাতেরই হোন না কেন) জলঘট ভরে নিয়ে আসেন। জল ভরার সময় কোন কোন ক্ষেত্রে গঙ্গাপূজা করা হয় এবং পূজা স্থানে জলঘট আনা পর্যন্ত ঘটের আগে আগে একজন (সাধারণত নাপিত) সমস্ত পথে জলধারা দিতে দিতে আসেন। ঘট নিয়ে আসার সময় ঘটহাতে বা মাথায় কোন প্রকার কথা বলা নিষেধ। পূজাস্থানে মূর্তির সম্মুখে সাদাধান ছড়িয়ে ও গোবর দিয়ে তার উপর ঘটস্থাপন করা হয়। ঘটের উপর সাধারণত পঞ্চপল্লব, কাঁচাডাব, আতপচাল ভর্তি সরা রাখা হয় ও নূতন লাল গামছা দিয়ে সব আচ্ছাদন করা হয়। পূজায় পুরোহিত নারায়ণ শিলা আনেন এবং প্রথমে নারায়ণ পূজা ও গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে ভীমের মূর্তি ও ঘটে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয় এবং "ভীমায় নমঃ" বলে পূজা করা হয়। সাধারণত ভীমের কোন ধ্যানমন্ত্র নেই তবে দু একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের সূত্রে নিম্নলিখিত পদাংশ ধ্যানমন্ত্র রূপে উচ্চারিত হতে দেখা যায়—

"ওঁ ভীম সেন মহাবীর
মহাবিষ্ণু প্রসাধক :
ত্রাহি মাং বীর বীরেশ
ভীম সেন নমোঽস্তুতে।"

বা

"ভীমং কুন্তি সুতং
গদা যুত যুতং
ক্রোধান্বিতং ভীষণং।
অর্জ্জুনং নরপুঙ্গব মুর হরৌ
যস্ত ক্ষিপ্তেন শরেন
পাতাল ভাগীরথীং
গঙ্গপুত্রমুখে পতন মুমূর্ষু সময়ে
ত্বং কৃষ্ণং মিত্রং ভজে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রানুসন্ধান লব্ধতথ্যে এই মন্ত্রগুলি সাম্প্রতিক কালে স্থানীয় পুরোহিত বা পণ্ডিতগণ কর্তৃক রচিত বলে জানা যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভীমপূজায় যথাবিহিতরূপে আরতি, হোম ও পুষ্পাঞ্জলি অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে ঘট নাড়া দিয়ে প্রতিমার প্রাণ বিসর্জন ও পূজা শেষ হয় এবং পরের দিন স্থানীয় জলাশয়ে ঘট বিসর্জন দেওয়া হয়। পূজায় স্থানীয় সর্বশ্রেণীর ও বর্ণের

অধিবাসী অংশ গ্রহণ করেন। পূজায় ঢাক, কাঁসি, শঙ্খ প্রভৃতির বাজনা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পূজার স্থানে "জাগ দীপ" রাখা হয় এবং সারারাত অনেকে "জাগর" থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভীমপূজার দিনে—হালচাষ, ঢেঁকির কাজ, হাতুড়ি-হাপরের কাজ, চুলদাড়ি কাটা, কাপড় কাঁচা প্রভৃতির আনুষ্ঠানিক বন্ধ (ট্যাব) প্রতিপালিত হয়। পূজান্তে ভীমের জলঘট বিসর্জিত হলেও, মূর্তি বিসর্জিত হয় না—পূজাস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাসে—সন্তান লাভ, সম্পদ বৃদ্ধি, কুপ্রভাব মুক্তি, সুবর্ষণ-সুফলন, কৃষি সাফল্য, বন্ধ্যাত্ব মোচন জাগতিক মঙ্গল-বিধান প্রভৃতি ভীমপূজার মাহাত্ম্যরূপে বিবেচিত হয়। উচ্চ ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত অঞ্চলে ক্ষেত্র বিশেষে ভীমপূজার নানা প্রকার শাস্ত্রমন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতার প্রাধান্য দেখা গেলেও সাধারণভাবে লোকায়ত সমাজে শাস্ত্রীয় বিধি বিধানগত শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় এবং মূলত সমবেত আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে ভীম উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভীমপূজা উপলক্ষে মেলা সংগঠিত হয় যা এক থেকে সাত-আট দিন পর্যন্ত চলে এবং ভীমপূজা উপলক্ষে লাঠি খেলা, ব্যায়াম প্রদর্শনী, সার্কাস, থিয়েটার, যাত্রা, পুতুল নাচ প্রভৃতি আয়োজিত হয়।

ভীমপূজা অনুষ্ঠিত হয় মাঘমাসের শুক্লাপক্ষের একাদশী তিথিতে পত্রিকায় যা ভৈমী বা ভীম একাদশী রূপে চিহ্নিত। একাদশীতত্ত্ব অনুসারে ভীম একাদশীর প্রতিপালন বিষ্ণুপাদ পদ্মলাভের প্রকৃষ্ট উপায়—

"ততঃ পুণ্যামিমাং ভীমতিথিং পাপপ্রণাশিনীম।
উপোষ্য বিধানেন গচ্ছদ্বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
ভীম তিথিং ভৈমীত্বেন খ্যাতামেকাদশীং।

স্কন্দপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, গরুড় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, হেমাদ্রিব্রত খণ্ড; তত্ত্বসাগর, প্রভৃতিতে একাদশী তিথির মাহাত্ম্য ও উহা প্রতিপালনের নানাবিধ নিয়ম নির্দেশিত হয়েছে এবং যথাবিহিতরূপে একাদশীব্রত উদ্‌যাপনে বিষ্ণুলোক ও বিষ্ণুস্বরূপ প্রাপ্তির কথা ঘোষিত হয়েছে। তত্ত্বসাগরের মতে একাদশীপালন সর্বাধিক পুণ্যকর্ম এবং তা "স্বর্গ, মোক্ষ, রাজ্য ও পুত্রপদ।" "স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত ইহার নামান্তর হরিদিন বা হরিবাসর।"—

"ন দানং ন জপো হোমোনচান্যৎ সুকৃতংক্কচিৎ।
একতঃ পৃথিবী দানমেকতো হরি বাসরঃ।
ততোহপ্যেকা মহাপুণ্যায় চেয়মেকাদশী পরা।

জপ, তপ, দান, হোম, এমনকি পৃথিবীদানও একাদশী ব্রতের সমতুল্য নয়। নানা-পুরাণে—উৎপন্না-মোক্ষা, সফলা-পুত্রদা ষটতিলা—জয়া, বিজয়া—আমর্দকী পাপমোচনী-কামদা, বরূথিনী—মোহিনী, অপরা-নির্জলা, যোগিনী-পদ্মা, কামিকা-পুত্রদা, অজা—বাসনা, ইন্দিরা-পাপঙ্কুশা, রমা—প্রবোধিনী, সুমদ্রা—কমলা ষড়বিংশটি একাদশীর নাম উল্লিখিত হলেও সাধারণভাবে—শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্তন ও ভীম একাদশীর মাহাত্ম্যই লোকসমাজে সবিশেষ ঘোষিত হয়। লৌকিক প্রবাদে দেখা যায়—

শয়ন উত্থান পাশমোড়া
তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া।

বাসুদেবের নির্দেশে ভীম মাঘ মাসে যে একাদশী উপবাস পালন ও নারায়ণ পূজা করেছিলেন সেটাই ভৈমী একাদশী নামে পরিচিত। তাই ঐ মাঘী শুক্লা একাদশী ভীমের নামে চিহ্নিত হলেও মূলত নারায়ণ পূজার বিভিন্ন তিথির একটি অন্যতম একাদশী তিথি। শাস্ত্রানুসারে ভৈমী একাদশীর মূল পূজার লক্ষ্য নারায়ণ, ভীম উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু মেদিনীপুরের লোকায়ত সমাজে ভৈমী একাদশী তিথিতে স্বয়ং ভীমেরই প্রাধান্য সূচিত হয়। ভৈমী একাদশী সম্পর্কে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার কিংবদন্তীর প্রচলন দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে নির্জলা উপবাসে যে একাদশী পালন করে বিষ্ণুপূজান্তে ভীম জরাসন্ধ দুর্যোধনকে বধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই একাদশীর নাম ভীম একাদশী। গ্রামাঞ্চলে সংগৃহীত একটি তথ্যের সূত্রে দেখা যায়—মাতা কুন্তী একবার মাঘ মাসে পুকুরের জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকায় কিছুতেই স্নান করতে বা একাদশী ব্রত পালন করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, তখন পাশের ক্ষেত থেকে উঠে এসে ভীম লাঙলের ফাল গরম করে পুকুরের জলে ডুবিয়ে জল গরম করে দেন এবং মাতা কুন্তীর একাদশী প্রতিপালনে সহায়তা করেন। তখন থেকে কুন্তীর আদেশে বিষ্ণুর নির্দেশে ওই একাদশী ভীম একাদশী নামে বিঘোষিত হয়। অন্য মতে মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টিতে ভিজে ভীম যেদিন প্রথম মর্ত্যে চাষের কাজ শুরু করেছিলেন সেদিনটি ছিল মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী, ওই দিনটির স্মরণে প্রতি বৎসর ভীম একাদশী প্রতিপালিত হয়। মোটের উপর মেদিনীপুরের লোকসমাজে ভীম একাদশীর উদ্ভব সম্পর্কে শাস্ত্র-পুরাণ অতিরিক্ত নানা প্রকার স্থানীয় লৌকিক কিংবদন্তীর প্রচলন দেখা যায় যা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে মহাভারত ও ভীম সম্পর্কিত নানাপ্রকার কিংবদন্তীর সবিশেষ প্রচলন দেখা যায়। মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার সীমান্তে গড়বেতা

সংলগ্ন গণগনির ডাঙা লোকশ্রুতিতে ভীম ও বকরাক্ষসের যুদ্ধক্ষেত্ররূপে উক্ত হয় (এই প্রসঙ্গে গণগনির ডাঙ্গার বকরাক্ষসের হাড় বলে কথিত 'ফসিলাইজড উড'এর কথাও উল্লেখযোগ্য), বগড়ি কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ একারিয়া গ্রাম পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত বাসকালের একচক্রারূপে অভিহিত হয়, একারিয়া নিকটস্থ ভিকনগর গ্রামে পাণ্ডবগণ ভিক্ষা করতেন বলে জনশ্রুতি প্রচলিত। মেদিনীপুর শহরের তিন মাইল পশ্চিমে গোপগিরি মহাভারতোক্ত মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহ ছিল বলে কথিত হয়, দাঁতনের নিকটস্থ একটি পুষ্করিণী ভীমের পদাঘাতে সৃষ্টি বলে উক্ত হয়। খড়্গপুরের নিকটে ইন্দাগ্রামের খড়্গেশ্বর মন্দিরের সুপ্রশস্ত প্রান্তর হিড়িম্বাডাঙা নামে পরিচিত—জনশ্রুতি এই স্থানে হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ হয়েছিল এবং এখানেই ভীম হিড়িম্বাকে বিবাহ করেছিলেন। দিগ্বিজয়ার্থে পূর্ব দিকে বহির্গত ভীম বঙ্গদেশ জয় করেন এবং মেদিনীপুরের শালবনি থানার ভীমপুর গ্রাম পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন বলে কথিত হয়। তাছাড়া গোপগৃহে ভীমের পাদুকা প্রাপ্তির কথা, গোপের কাছে ও গণগনির ডাঙা প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকার ফাটলকে ভীমের গদার আঘাতের বা লাঙল চালানোর ফাটল বলে বর্ণনার কথা প্রভৃতি শোনা যায়। মোটের উপর বিভিন্নভাবে মেদিনীপুরের লোকসমাজে ভীমসম্পর্কিত নানাপ্রকার কিংবদন্তীর সবিশেষ প্রচলন দেখা যায়, যা এই অঞ্চলের লোকমানসে ভীমের আধিপত্যের স্মারক।

অবশ্য মেদিনীপুরে বিভিন্নভাবে মহাভারতের ও ভীম প্রসঙ্গের কথা প্রচলিত থাকলেও ভীমপূজার সঙ্গে 'মহাভারতের সম্পর্ক অভিন্ন এমন দাবি করা যায় না। বরং বিপরীত ক্রমে লৌকিক ভীমের আধিপত্যের সূত্রেই কালের বিবর্তনে—Para-qualisation' এর পথে মহাভারতের ও পৌরাণিক ভীমের প্রসঙ্গ মেদিনীপুরে পল্লবিত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। এদিক থেকে প্রচলিত লৌকিক পূজানুষ্ঠানের ভীম ও মহাভারতের ভীমের তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন। কুন্তীর গর্ভজাত পাণ্ডুর দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র ভীম, তাঁর জন্মকালে দৈব বাণী হয়—

সর্ব্বেষাং, বলিনাং শ্রেষ্ঠো
জাতোহয়মিতি ভারত।

ভীম শুধু মহাবাহু ও ভীমপরাক্রম অমিত শক্তিধর ছিলেন না, বলিষ্ঠ দেহ, দীর্ঘকায়, স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি ভীম দেখতে ছিলেন অতন্ত মনোহর। ভীম ছিলেন "স্বর্ণ বর্ণাভ দৃঢ়াঙ্গ মহাবিক্রম ও মহাবেগমান" (মহা ৩. ১৪৬,২৯/ম ৫৯০)। "তূবরক শব্দের অর্থ শ্মশ্রুহীন ধরলে ভীমের মুখমণ্ডল ছিল শ্মশ্রুগুম্ফ হীন।" এদিক থেকে দেখা যায়

মহাভারতের ভীম ও মেদিনীপুরের লোকায়ত সমাজে পূজিত ভীমের মধ্যে প্রধান পার্থক্য—গাত্রবর্ণ ও শ্মশ্রু-গুম্ফ প্রসঙ্গে। লৌকিক ভীমের রং সাধারণত রক্তাভ খয়েরী ও ধূসর (coptic red and grey) বা তামাটে বর্ণের যা মহাভারতের"স্বর্ণবর্ণাভ" ভীমের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্নতর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। তাছাড়া মহাভারতের ভীম "তূবরক"—"শ্মশ্রুগুম্ফহীন" কিন্তু লৌকিক ভীম সর্বত্র দীর্ঘ গোঁফ ও জুলফিযুক্ত। মূর্তিতত্ত্ব ও দেহাবয়বের বিচারে লৌকিক ভীমের ও মহাভারতের ভীমের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান, সর্বব্যাপী পৌরাণিক প্রভাব সত্ত্বেও সেখানে লৌকিক ভীমের মৌলিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং মধ্যমপাণ্ডব ভীমের নররক্তপান, হিড়িম্বা রাক্ষসীকে বিবাহ প্রভৃতি অনার্যসুলভ আচরণাদির কার্যকারণ সূত্রাবলী অনুসন্ধান যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য "The Mahabharat An Ethological Study" গ্রন্থে লেখক G. J. Held মহাভারতে অনার্য উপাদান বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বিশেষভাবে ভীম চরিত্র ও তার কার্যকলাপের উল্লেখ করেছেন।

পৌরাণিক প্রভাবে মহাভারতে ভীম চরিত্র যেভাবে ও রূপে চিহ্নিত হোক না কেন, মেদিনীপুরের লোকসমাজে পূজিত ভীম যে মৌল উৎসে—অপৌরাণিক-লৌকিক ভীম সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। সমগ্রভারতবর্ষের পটভূমিকায় ভীমপূজা কোথায় কিরূপে প্রচলিত বা অপ্রচলিত সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় মগ্ন না হয়েও বলা যায়, মেদিনীপুর জেলায় প্রায় সর্বত্র অনুষ্ঠিত ভীমপূজা এক সর্বজনীন লোকায়ত উৎসব প্রাগৈতিহাসিক প্রান্তরযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত মেদিনীপুরের হারানো অতীতের অন্ধকারে হয়তো যার আদিম উৎস বিস্তৃত। ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতি-হাসিক উত্থানপতনের অনেক নিদর্শন মেদিনীপুরে ছড়িয়ে আছে। মেদিনীপুরের বিভিন্নস্থানে নানা ধরণের প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সারা বাংলাদেশের মধ্যে প্রাকৃতিক বয়সে সর্বাধিক প্রাচীন বলে বিবেচিত হয়। বাংলার আদিম সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র এই প্রাচীনতম অঞ্চলে আদিম পার্বত্য ও বন্য সংস্কৃতির উত্থানপতনের ইতিহাস, তার অনেক নিদর্শন বিবর্তনের ধারায় লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের ও উৎসব—পার্বণের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে থাকা খুবই সম্ভব। এদিক থেকে প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত মেদিনীপুরের যে মৃত্তিকায় বিভিন্ন সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাত ও মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে তার পটভূমিকায় গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে ভীমপূজার আদিম উৎসে হয়ত আদিম বিশ্বাস অনুষ্ঠানের উত্তরাধিকার উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। ভীমের আয়ুধ হিসাবে ব্যবহৃত "গদা"টি এদিক থেকে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

নৃতত্ত্ববিদদের মতে গদা (Mace) নব্যপ্রস্তর যুগের অস্ত্র (Armorial term of Neolithic Age) যা গোষ্ঠিঅধিপতি বা সর্বোচ্চক্ষমতার অধিকারীর প্রতীক। এদিক থেকে আদিম উৎস গদাধারী ভীমের আদিম গোষ্ঠীসমাজের অধিপতি হওয়া অসম্ভব নয়। আদিম গোষ্ঠী সমাজে "the remarkable man among the rest"-এর কালক্রমে সুপ্রতিষ্ঠ পূজ্য হয়ে ওঠা (to develop into an established worship) সর্বজনীন ঘটনা। নৃতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর বিভিন্ন আদিবাসী উপজাতি সমাজের বিবিধ ধর্মানুষ্ঠান বিশ্লেষণ করে অনেক ক্ষেত্রে নানাবিধ বিশ্বাস সংস্কারে পুষ্ট পুর্বপুরুষ পূজার (Ancestor worship) প্রথার ইতিহাস উদ্ঘাটন করেছেন। অনুরূপভাবে মেদিনীপুরের ভীমপূজার মধ্যে আদিম উৎসে কোন গোষ্ঠী অধিপতি (Tribal chief) পূজার প্রথার অবশেস অনুসন্ধান করা এবং কালের প্রবাহে গোষ্ঠী অধিপতির লৌকিক দেবতায় রূপান্তরিত (Tribal chief transformed into Folk godling) হওয়ার লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করা হয়ত অসম্ভব নয়। উপযুক্ত তথ্যের অভাবে আপাতত কেবলমাত্র ঐ জাতীয় সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও, প্রমাণসিদ্ধরূপে এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা যায় যে ভীম মৌল উৎসে লৌকিক দেবতা এবং কৃষি অনুষঙ্গেই তার বিশিষ্ট বিকাশ।

কালের বিবর্তনে পৌরাণিক স্মার্ত প্রভাবে আদিম লৌকিক ভীমকে মধ্যম পাণ্ডবরূপে চিহ্নিত করলেও লোকায়ত সমাজে ভীম মুখ্যত চাষী। লোকপ্রচলিত বিভিন্ন কিংবদন্তীর সূত্রে দেখা যায় ভীমের প্রধান কাজ কৃষিকর্ম এবং লোকায়ত সমাজে ভীমের নাম—ভীম খেত্তী, ভীম সেন, ভীমছড়া, ভীম চাষী, হালুয়া ভীম ইত্যাদি। অবশ্য উচ্চ সমাজের প্রভাবে শিষ্টসাহিত্যে কৃষিঅনুষঙ্গে ভীম শিবের কৃষিকর্মের প্রধান সহায়ক। তবে কৃষি প্রধান বাংলাদেশের লোকায়ত সমাজে শিব একজন কৃষক, পৌরাণিক শিবের ন্যায় তিনি শ্মশানবিহারী যোগীশ্রেষ্ঠ প্রমথনাথ নন বরং স্ত্রী-কন্যাপুত্রবেষ্টিত গৃহী। বাংলার লোকসমাজে বিভিন্ন ভাবে ও রূপে শিবের গীত ও ছড়ার অস্তিত্ব দেখা যায়। অঞ্চল বিশেষের বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে শিবগীত ও কাহিনীর বিভিন্নতা দেখা যায়। কালক্রমে লৌকিক দেবতার কাহিনীমূলে বা শিব কাহিনীর মূলে পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান মিশ্রিত করে শিবমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হয়। শিবমঙ্গলকাব্যের প্রধান লৌকিক বিষয় শিবের চাষ। শূন্যপুরাণ ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত শিবের ছড়া থেকে এ গুলির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয় (ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ২০৭)।

বলাবাহুল্য পৌরাণিক শিবের সঙ্গে শিবের কৃষক চরিত্রের সামঞ্জস্য স্থাপন করা দুরূহ। প্রকৃতপক্ষে লোকায়ত বাংলার কৃষি সমাজের নিজস্ব সংস্কার অনুযায়ী শিবচরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে এবং কৃষিসহায়ক লৌকিক দেবতা ভীমের সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে যুক্ত হয়েছেন বলে অনুমিত হয়।

বাংলাদেশে বৈষ্ণব পদকর্তারূপে সবিশেষ খ্যাত বিদ্যাপতির শিব-দুর্গার লীলা বিষয়ক পদগুলি এদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "লোকসাহিত্যের দোসর স্থানীয়" (ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, ১৯৫৯, পৃঃ ৪০৫) এই পদগুলিতে লৌকিক শিবের রূপ প্রকট। বিদ্যাপতির পদে শিবকে মন দিয়ে কৃষিকার্য করার উপদেশ ধ্বনিত—

বেরি বেরি অরে সিব মো তোয় বোলো
কিরিষ-করিঅ মন লাই।
বিনু সরমে রহহ ভিখিএ পত্র মাগিঅ
গুণ গৌরব দূর জাই॥
খটগ কাটি হরে হর জে বাঁধাওল ত্রিসূল তোড়িঅ করু ফারে।
বসহা ধুরন্ধর হরলএ জোতিঅ পাঠএ সুরসরি ধারে॥

(পদ—৭৯২)

বিদ্যাপতির কাব্যে শিবশঙ্কর ও ক্ষেত্রপাল শিবঠাকুর এক হয়ে গেছেন এবং তাঁর কৃষিকর্মের প্রধান সহায়ক হয়েছেন—ভীম। অসমীয়া কবি রাম সরস্বতী রচিত "ভীম চরিত" কাব্যেও ভীম শিবের কৃষিকর্মের সহায়ক, ধান পাকার পর ভীমই ধান কাটতে তৎপর—

শঙ্করে বোলয়ে দেবী পকিলেক ধান
গরখীয়া পাঞ্চিয়া ধানর আগ আন॥
হেন শুনি পার্ব্বতীয়ে ভীমক পাঞ্চিলা।
কাঁচি খান লৈয়া ভীম তেখনে চলিলা॥
নিমিষেকে ভীমে ধান পেলাইলেক কাটি।
সরু সরু হাতেরে ভৈলেক তিন মুঠি॥
ধান কাটি ভীমে আসি বুলিলেক বাক।
এই ধান দাইবে লাগি পাঠাইলা আমাক॥ (ভীম চরিত)

বাংলা "শূন্যপুরাণ" কাব্যেও ভীম শিবের কৃষিকর্মের সহায়ক মুণিষ "খেত্তী"—

সরগর ভীম খেত্তীক জে হুঙ্কার পাড়িল।
আসি আত ভীম খেত্তী পরণাম করিল॥

আজ্ঞা দিলেন হর ধান জে দাইতে।
দখিন মুখেত উপনীত হইলেন খেতে॥
ছুব্বার গাঙ্গেত বহুত খানি জোলি
ভীম ধান দাইলেন আড়াই হাকুলি॥
... ...
ভীম খেত্তী হরে গিএ সব জানাইল।
জত ধান ছিল পরভু সকলি দাইল॥
ছুব্বার গাঙ্গেত বহুত খানি জোলি।
ভীম খেত্তী ধান-দাইলেন আড়াই হালি॥ (শূন্যপুরাণ)

মেদিনীপুরের কবি রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে দেখা যায় ভীম শিবের কৃষি কর্মের মুনিষ, হাল্যা। কবি রামেশ্বরের শিব সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের লৌকিক খণ্ডে দেখা যায় পার্বতীর পরামর্শে শিব দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের অচলাবস্থা দূর করার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট থেকে কৃষি জমির পাট্টা সংগ্রহ করেন, শূল ভেঙ্গে হাল প্রস্তুত করেন এবং কৃষিকর্মের জন্য কৈলাস ত্যাগ করে দেবীচকে যান। সঙ্গে চলেন শিবের কৃষিকর্মের প্রধান সহায়ক হাল্যা ভীম—

ভীম আছে হাল্যা আর অনির্ব্বাহ কি।
হর বলে হদ্দ কৈলে হেমন্তের ঝি॥
... ...
চন্দ্রচূড় চলে বৃষে চণ্ডী রন চায়্যা।
পিছু ভীম চলিল চাষের সজ্জা লয়্যা॥
... ...
এইরূপে প্রতিদিন যায় রাত্রিকাল।
ভীম কর‍্যা ভোজন প্রভাতে যুড়ে হাল॥ (শিবায়ণ)

ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্ত্তীর ভাষায়—রামেশ্বরের শিব এক হেলে চাষী, গৌরী তার দরিদ্র সংসারের কর্ণধার গৃহিণী, ভীম হেলে চাষীর হালুয়া মুণিষ (ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী—রামেশ্বর রচনাবলী, ১৩৭১, পৃঃ ২৪১)। ভীমের সহায়তায় শিবের চাষ সম্পর্কিত কাহিনী বাংলা, মৈথিলী, অসমিয়া সাহিত্যে সহজবিস্তৃতি লাভ করেছিল। শিব বা ভীম সম্পর্কিত এই বিশ্বাস মিথিলা থেকে উত্তরবঙ্গ পথে বাংলায় প্রচার লাভ করেছিল না প্রাচীন বাংলাদেশ থেকে মিথিলা-আসামে বিস্তার লাভ করেছিল তা ভিন্নতর গবেষণার বিষয়, তবে কৃষক শিবের কৃষিকর্মের সহায়ক ভীমের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত কাব্যে বাঙালী-অবাঙালী কবিগণ সম্ভবত পূর্বভারতের এক লোকায়ত আকর থেকেই

মূল উপাখ্যান পেয়েছেন। বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে বলা যায় লৌকিক ভীম কোন লোকায়ত কৃষি সহায়ক দেবতা, যা কালক্রমে স্মার্ত পৌরাণিক প্রভাবে শিবের অনুচর হিসাবে মহাভারতের ভীমের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। এই সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায় বাংলা 'শূন্যপুরাণে' যেখানে শিবের বিশ্বস্ত অনুচর জনৈক ভীম (মধ্যম পাণ্ডব ভীম নন)। অসমীয়া সাহিত্যিক রাম সরস্বতীই সম্ভবত লোকায়ত ভীমকে পাণ্ডুপুত্র ভীমে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায়—

> "বাঙলা "শূন্যপুরাণে" এবং অন্যান্য শিবায়ন কাব্যগুলিতে শিবের বিশ্বস্ত অনুচর হইলেন জনৈক 'ভীম'। কবি রামসরস্বতী শিবের বশংবদ ভৃত্য এই ভীমকে মহাভারতের পাণ্ডু পুত্র ভীমের সহিত অভিন্ন করিয়া লইয়াছেন।" (ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্তসাহিত্য, ১৩৬৭, পৃঃ ৩৬৮)।

মোটের উপর পৌরাণিক সংস্কার মিশিয়ে শিব ও ভীমকে যে ভাবেই চিত্রিত করা হোক না কেন, শিব যে কৃষিকর্মের দেবতা এবং ভীমই যে শিবের প্রত্যক্ষ কৃষিকর্মের সহায়ক একথা কোথাও অস্বীকার করা হয় নি। তাই ভীমের কুলগত পরিচয় কুহেলিকাচ্ছন্ন হলেও, বৃত্তিগত পরিচয়ে যে সে অস্ট্রিক কৃষি সংস্কৃতি জাত সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের আলোয় বস্তুবাদী বিশ্লেষণী দৃষ্টিভংগীতে অগ্রসর হলে ভীমের কুলগত পরিচয়ের কুহেলিকা উন্মোচন করাও অসম্ভব নয়। মহাভারতে বর্ণিত কুলগত পরিচয়ে ভীম কুন্তীর গর্ভজাত, পাণ্ডুর দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র। আর্যকুলোদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও এবং উচ্চ পৌরাণিক সংস্কারে সবিশেষ মার্জিত হওয়া সত্ত্বেও মহাভারতের কাহিনীর মধ্যেও ভীমের আচার-আচরণ ও কার্যকলাপ বহুলাংশে 'অনার্যজনোচিত' যা তার 'demonic origin' এর স্বাক্ষর বহন করে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন—

> "Another son of Vayu is Bhim of the Mahabharat, the second of five Pandava brothers. There are traces in his character which seem to indicate a demonic origin". (Encyclopaedia of Religion and Ethics Vol. II, 1930 Page 806)

এদিক থেকে "শিব পুরাণের" সূত্রে মহাবলশালী রাক্ষস রাজ রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের ঔরসে কর্কটীর গর্ভজাত যে ভীমের পরিচয় পাওয়া যায় তাও স্মর্তব্য। মোটের

উপর বিশেষজ্ঞের ভাষায় ভীমের অনার্য চরিত্র অনুধাবন করা যায়—

"Bhim was probably non-aryan hero, round whose name legends gathered." (Encyclopaedia of Religion)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে অদ্যাপি ভীম বিভিন্নরূপে পূজিত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—বইগা ও গণ্ড উপজাতিদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। শেষোক্ত উপজাতিদের মধ্যে ভীম বৃষ্টির দেবতা হিসাবে পূজিত হন—

"Bhim is a nationally worshipped hero may originally have been a Rakshasa............He is now the chief rain God of the Central Province." (Standard Dictionary of Folk lore and Mythology vol. 1, P 139)

মেদিনীপুরের ভীম পূজার কাল বিশ্লেষণে বলা যায় মাঘের শেষে সুবর্ষণের আশায় ও কৃষি সাফল্যের জন্য মাঘী শুক্লা একাদশীতে ভীমপূজার অনুষ্ঠান সম্ভব। বাংলায় লৌকিক প্রবাদেও মাঘের শেষে বৃষ্টি বিশেষ রূপে বন্দিত—

যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজা পুণ্য দেশ।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের কথা বাদ দিয়ে মেদিনীপুরের ভীমপূজার সূত্রে নিঃসন্দেহে বলা যায় —লৌকিক ভীম ও পৌরাণিক ভীমের মধ্যে আদান প্রদান হয়েছে আবহমানকাল ধরে। মেদিনীপুরের লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস মেদিনীপুরের মাটিতেই ("চক" অঞ্চলে) ভীম প্রথম চাষ করেন এবং ভীমের দ্বারাই কৃষিকর্মের প্রবর্তন হয়। বিবর্তনের ধারায় ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবে আদিম কোন কৃষি সহায়ক শক্তি বা লৌকিক দেবতার কাল-ক্রমে মহাভারতের মধ্যম পাণ্ডব ভীমের সঙ্গে বা শিবের কৃষিকর্মের উপাখ্যানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া epic of growth এর নিয়মে মহাভারতের পৌরাণিক ভীমের উৎসে ইতিকথাশ্রয়ী কোন আঞ্চলিক লোকনায়ক বা লৌকিক দেবতার (legendry local hero or regional folk godding) সক্রিয় প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়। এই সূত্রে বলা যায় মেদিনীপুর অঞ্চলের স্থানীয় আদিম-লৌকিক দেবতা (Local primitive or folk godling) ছিলেন ভীম। পরবর্তী-কালে "বিভিন্ন লৌকিক ধর্মসংস্কারগুলি 'এক হিন্দু ধর্মের বিরাট পক্ষছায়ায়" (ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস পৃঃ ২০০) আবৃত করার প্রচেষ্টায় লৌকিক ভীমের সঙ্গে মহাভারতের ভীমকে অভিন্ন করা এবং শিবকে কৃষক হিসাবে চিত্রিত করে

ভীমকে কৃষিকর্মের "মুনিষ"/"হালুয়া" হিসাবে গণ্য করা হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

হিন্দু পৌরাণিক ধর্ম ও কাব্যের পক্ষছায়ায় আবৃত হলেও মহাভারতের ভীমের সঙ্গে মেদিনীপুরে পূজিত লোকায়ত ভীমের আচরণিক ক্রিয়া ও অবয়বগত বৈসাদৃশ্য প্রকট যার দ্বারা অনুমিত হয় যে লোকায়ত ভীম মূলত মহাভারতের ভীম নন। লোকায়ত ভীম মহাভারতের ভীম হলে, মহাভারতের কাহিনী ও ভীমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মেদিনীপুরের কিংবদন্তীমূলক ঘটনাস্থলগুলি যথা—গড়বেতার গণগণির ডাঙ্গা খড়্গপুরের হিড়িম্বাডাঙ্গা, গোপ, প্রভৃতি অঞ্চলে কোন না কোনভাবে ভীমের অধিক প্রচলন থাকত। কিন্তু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ঐ সমস্ত অঞ্চলে ভীমপূজা পূজার তুলনামূলকভাবে কম বা একেবারেই অবর্তমান। মাঘী শুক্লা একাদশী তিথিতে বিষ্ণুপূজাই অনুষ্ঠিত হত ভীমপূজা প্রবর্তিত হত না, কেননা শাস্ত্রীয় তিথিতত্ত্বানুসারে ঐ তিথিটি ভীমের নামে চিহ্নিত হলেও মূলত নারায়ণ পূজারই প্রথাসিদ্ধ তিথি। শাস্ত্রানুসারে দেখতে গেলে ঐ দিন নারায়ণেরই পূজা হয়, ভীম পূজক মাত্র। কিন্তু শাস্ত্রানুশাসনে ভৈমী একাদশীতে ভীমের স্থান গৌণ হলেও লোকসমাজে ভীমের স্থানই মুখ্য এবং ভীম একাদশীর পূজা—ভীমপূজা, ভীমজাত, ভীমমেলা ও ভীমউৎসব হিসাবেই প্রতিপালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ও পুরোহিত প্রাধান্যের সূত্রেই অন্যান্য পূজার ন্যায় ভীম-পূজায় নারায়ণ শিলার ব্যবহার এবং বিষ্ণুপূজার প্রচলন ঘটেছে বলা যায়। শাস্ত্রীয় প্রয়াসে নারায়ণের পূজার প্রচলন সত্ত্বেও এই উৎসবে সর্বপ্লাবী ভীমের প্রাধান্য সন্দেহাতীত। শাস্ত্রানুসারে পূজাটি যে বিষ্ণুর নয়, একান্তরূপে ভীমের সে বিষয়ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দু'একটি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সর্বত্র ভীমপূজায় একটিই জলঘট ব্যবহৃত হয় এবং যা "ভীমের ঘট" (নারায়ণের ঘট নয়) রূপেই চিহ্নিত, যথা-বিহিত পূজিত ও বিসর্জিত হয়। পূজাটি যে মূলত ভীমের মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনী সূত্রে বিষ্ণুপূজা নয়—পূজার অবিসম্বাদী নামকরণও তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অপরপক্ষে শিবায়ণের কাব্যানুসারে ভীমপূজার প্রচলন হওয়াও সম্ভব নয়। শিবায়ণের প্রভাবে ভীমপূজার প্রবর্তন হলে ভীমপূজার সঙ্গে অনিবার্যভাবে শিব-পার্বতী বা অন্তত শিবের পূজার বিশেষ ব্যবস্থা প্রতিপালিত হত। বলাবাহুল্য প্রায় কোন ক্ষেত্রেই ভীমপূজার সঙ্গে শিবের পূজার বিশেষ ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায় না। প্রকৃত পক্ষে ভীম "শিব-নারায়ণ" নিরপেক্ষ একক মাহাত্মেই ব্যাপকরূপে লোক সমাজে পূজিত হন। লোক সমাজে ব্যাপকভাবে পূজিত ভীমই সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে

উচ্চসমাজের শিষ্ট সাহিত্যের উপকরণ হওয়া বা বিবর্তনের পথে লোকায়ত ভীমের মধ্যম পাণ্ডব ভীম ও শিবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া এবং একাদশী তিথিমাহাত্ম্যে নারায়ণ পূজার অঙ্গ হিসাবে বিঘোষিত হওয়া আশ্চর্য নয় ; কেননা লোকায়ত ক্ষেত্রে Little tradition ও Great tradition—এর এইরূপ প্রতিক্রিয়া জাত Universalization ও Parochialization হওয়া ভারতীয় সংস্কৃতি প্রবাহের অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে বিবেচিত হয়—

> "...study of the religion of a little community can contribute to understanding of process of universalization and parochialization which are greatly operative in Indian civilization."
> (Village India—Ed. Mckim Marriot, U S.A 1966, Page 218).

উদ্ভব ও বিকাশের স্তর-বিন্যাসে দেখা যায় মেদিনীপুরের ভীম পূজার মধ্যে কৃষি অনুষঙ্গই প্রধান। ভীম পূজায় ঘটের নীচে নূতন সাদা ধান ও ঘটের উপর নূতন ধানের আতপ-চালের সরা স্থাপনের বিশেষ রীতির ব্যাপক চল দেখা যায়। ভীমপূজার প্রধান মাহাত্ম্য—অমঙ্গল দূর, চাষের উন্নতি ও বন্ধ্যাত্ব মোচন। মূলত শস্য উৎপাদন ও কৃষি-কর্মের সাফল্য এবং সন্তান কামনাই ভীমপূজার মুখ্য উদ্দেশ্য। মাহাত্ম্য সম্পর্কিত প্রচলিত বিশ্বাসের মাধ্যমে বোঝা যায় পুত্রবরদানের দেবতা ও শস্য উৎপাদনের দেবতা হিসাবে ভীম সৃষ্টি বা উর্বরতাবাদের দেবতা (Fertility god) এক মূলতঃ কৃষি সহায়ক দেবতা (Agricultural deity)। আদিম বিশ্বাসে ক্ষেতের উর্বরতা ও নারীর উর্বরতা অভিন্ন এবং তাই অধিকাংশক্ষেত্রে শস্য কামনা ও সন্তান কামনা কমবেশী একই আচার অনুষ্ঠান আশ্রয়ী। ভীমের কৃষি সহায়ক চরিত্রের প্রধান পরিচয় বহন করছে ভীমপূজার কাল। ভীমপূজার কাল মাঘ মাস। পৌষ সংক্রান্তির ফসলোত্তর নবান্ন উৎসবের (Post-Harvest New-Rice Festival) পর মাঘ মাস বাংলার কৃষককুলের নূতন উদ্যমে কৃষিকর্মের প্রস্তুতির কাল। খনার বচনে দেখা যায় মাঘের মাটিই কৃষিকর্মের পক্ষে সর্বাধিক মূল্যবান—

"মাঘের মাটি/হীরের কাঠি"

কৃষি-সংক্রান্ত বিবরণেও দেখা যায় মাঘ মাস কৃষকদের সর্বাধিক মূল্যবান সময়—

> "The ploughing of the land starts with the first shower at the close of the winter. Rain at the end of the month of Magh (first fortnight of February) is considered the most

propitious for crops, specially Aman paddy." (District Census Hand book Murshidabad, 1961, Page 1098)

বাংলার লৌকিক প্রবাদেও দেখা যায় কৃষিকর্মের অনুকূল হিসাবে মাঘমাসের শেষের বর্ষণের বিশেষ খ্যাতি ঘোষিত হয়েছে—

"যদি বর্ষে মাঘের শেষ/ধন্য রাজা পুণ্য দেশ।"

এই সূত্রে মাঘমাসে ভীমকে পূজা করে কৃষি সমাজের প্রার্থিত সুবর্ষণ লাভ করার কামনার কথা অনুভব করা যায় এবং কোন কোন আদিবাসী সমাজে ভীমকে সুবর্ষণের দেবতারূপে চিহ্নিত করার কথাও উল্লেখ করা যায়। পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের মিশ্রণে গঠিত শিবমঙ্গল কাব্যগুলির কাহিনীতে দেখা যায়—"মাঘ মাসের শেষের দিকে খুব বৃষ্টি হইল। অনুচর ভীমকে লইয়া শিব জমি চাষ করিলেন, যথাসময়ে ধান রোপণ করা হইল প্রচুর ধান হইল; নারদের নিকট হইতে ঢেঁকিটি ধার করিয়া আনিয়া ভীম ধান ভানিল, গৌরীর সংসারে আর অভাব রহিল না" (ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস. পৃঃ ১৯৮) 'শূন্য পুরাণে'ও দেখা যায় ভীম খেত্তীর সহায়তায় চাষারম্ভের কাল মাঘ মাস—

"মাঘ মাসে গোঁসাই পিথিবি মঙ্গলিল
জতগুলি ভুম পরভু সকলি চসিল॥"

মোটের উপর লৌকিক প্রবাদ, শিবমঙ্গলকাব্য. শূণ্য পুরাণাদির সাক্ষ্যে দেখা যায় কৃষিকর্মের পক্ষে প্রকৃষ্টরূপে সহায়ক মাঘ মাসেই ভীম চাষ করেছিলেন এবং সেই সূত্রেই মাঘ মাস ভীমপূজার কাল রূপে বিবেচিত হয়। শুধুমাত্র মাঘমাসের পরোক্ষ-সূত্রে নয়, ভীম সম্পর্কিত প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাসের অবলম্বনেও ভীমের কৃষি চরিত্র প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান হয়। মেদিনীপুরের লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস মেদিনীপুরের মাটিতেই ভীম প্রথম চাষ করেন এবং ভীমের দ্বারাই কৃষিকর্মের প্রবর্তন হয়। এ সম্পর্কে একটি লৌকিক ছড়া উল্লেখযোগ্য—

"মেদিনীপুরের হালুই ভীম, ভীম হুড়া চাষী
তাই—ভীম একাদশী॥"

এখানে স্পষ্টতই কৃষিকর্মের সঙ্গে চাষী ভীমের প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং সেই সূত্রে ভীম একাদশী আখ্যা বিঘোষিত হয়েছে, যা ভীম একাদশী বা ভীম পূজার কৃষি অনুষঙ্গের স্বাক্ষর বহন করে। প্রকৃত পক্ষে মনে হয় কৃষককুলের নিকট পরম মূল্যবান মাঘ মাসই ভীম পূজার প্রকষ্ট কাল এবং একাদশী তিথি নির্বাচন সম্ভবত

পরবর্তী স্মার্ত ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ক্ষেতের ধারে, গ্রামের সীমান্তে বা মধ্যে চৌরাস্তার মোড়ে মূর্তি গঠন করে ভীমের পূজা করা হয় এবং পূজান্তে মূর্তি বিসর্জিত হয় না। পূজাস্থানে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কালক্রমে প্রাকৃতিক কারণে স্বাভাবিক ভাবে তা ভগ্ন ও বিধ্বস্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ দেহ ভীমমূর্তি পূজাস্থানে পূজার পরেও সম্বৎসর সংরক্ষিত থাকে। বৃহৎ আকৃতির জন্য ভীমের মূর্তি বিসর্জনের ব্যবস্থা হয় না বলে আপাতত মনে হতে পারে, কিন্তু বলা বাহুল্য ধারণাটি নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের পরিপন্থী। লৌকিক বিশ্বাসে মূর্তি বিসর্জনের যেমন বিশেষ তাৎপর্য থাকে, মূর্তি বিসর্জন না দেওয়ার মধ্যেও তেমন বিশিষ্ট বিশ্বাস সংস্কার সংক্রিয় থাকে। সাধারণতঃ অবিসর্জিত মূর্তি দুষ্ট প্রভাব বিতাড়নকারী শক্তিরূপে বিবেচিত হয়। এই হিসাবে গদাহস্তে দণ্ডায়মান ভীম লোক সমাজে দুষ্ট শক্তি ও অপদেবতার কুপ্রভাব মুক্তকারী বীরত্বের প্রতিমূর্তি ও দুষ্ট শক্তি বিতাড়নের মূর্ত প্রতীক হিসাবেপরিগণিত হন। পূজান্তে সম্বৎসর দণ্ডায়মান ভীম যেন প্রহরীরূপে ক্ষেত—খামার, গ্রাম—লোকালয় পাহারা দেন এবং এবং সমস্ত প্রকার দুষ্ট শক্তির কুপ্রভাব বিতাড়ন করে সকলের শুভ ও মঙ্গল বিধান করেন। এইভাবে দেখা যায় ভীম লোকসমাজে কুপ্রভাব মুক্তকারী বীরত্বের প্রতিমূর্তি এবং ক্ষেত্ররক্ষক ও দুষ্টশক্তি বিতাড়নের মূর্ত প্রতীক হিসাবে পরিগণিত হন।

অবশ্য বীরত্বের প্রতিমূর্তি ভীম বিবর্ত ধারায় বিশেষতঃ স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায়, সম্মিলিত যুবশক্তির প্রতীক হিসাবে পরিগণিত ও পূজিত হন। এ সম্পর্কে মেদিনীপুরের অধিবাসী ও শিবায়ণ কাব্যের গবেষক ও অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্তীর মতেও ভীমপূজা সম্মিলিত যুব শক্তির পূজা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মননশীলতায় ডঃ চক্রবর্তী ভীমপূজা সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তাতে ভীম-পূজার বিকাশের এক বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়েছে বলা যায়, কিন্তু ভীমপূজার মৌল তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হয়নি (অবশ্য শ্রদ্ধেয় ডঃ চক্রবর্তী সম্ভবতঃ তা করতেও চাননি)। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে পরিক্রমায় লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে মনে হয় স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় মহাভারতের কাহিনীসূত্রে অপরিমিত শক্তির অধিকারী, মহাবলশালী পরাক্রান্তবীর ও অমানুষিক অবিশ্বাস্য কর্মকাণ্ডের নায়ক ভীমেরপূজা সম্মিলিত যুবশক্তির পূজানুষ্ঠানে বহুলাংশে রূপান্তরিত হয়। রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, পাঠান মোগল, ইংরাজ আমল এমনকি স্বাধীনতাউত্তর কালেও মেদিনীপুরের সংগ্রামী আত্মা

ও বীরত্বের কথা সুবিদিত। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে লোকায়ত ভীমপূজা বিশেষ-ভাবে সম্মিলিত যুবশক্তির পূজোৎসব হিসাবে উদ্‌যাপিত হয় ও ব্যাপকতা লাভ করে।

মোটের উপর লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের আলোয় ভীমপূজার উদ্ভব ও বিকাশের প্রকৃতি বিশ্লেষণে বোঝা যায় মেদিনীপুরের ভীমোৎসবের ইতিহাস লোকধর্মানুষ্ঠানের সাধারণ রীতিতে বিবর্তনের ধারায় অন্তত তিনটি স্তরে বিন্যস্ত—আদিম স্তর, পৌরাণিক স্তর ও স্বদেশী আন্দোলনের স্তর। ভীমপূজা বিকাশের তিনটি স্তরকে নিম্নলিখিত রেখা চিত্রে প্রকাশ করা যায়—
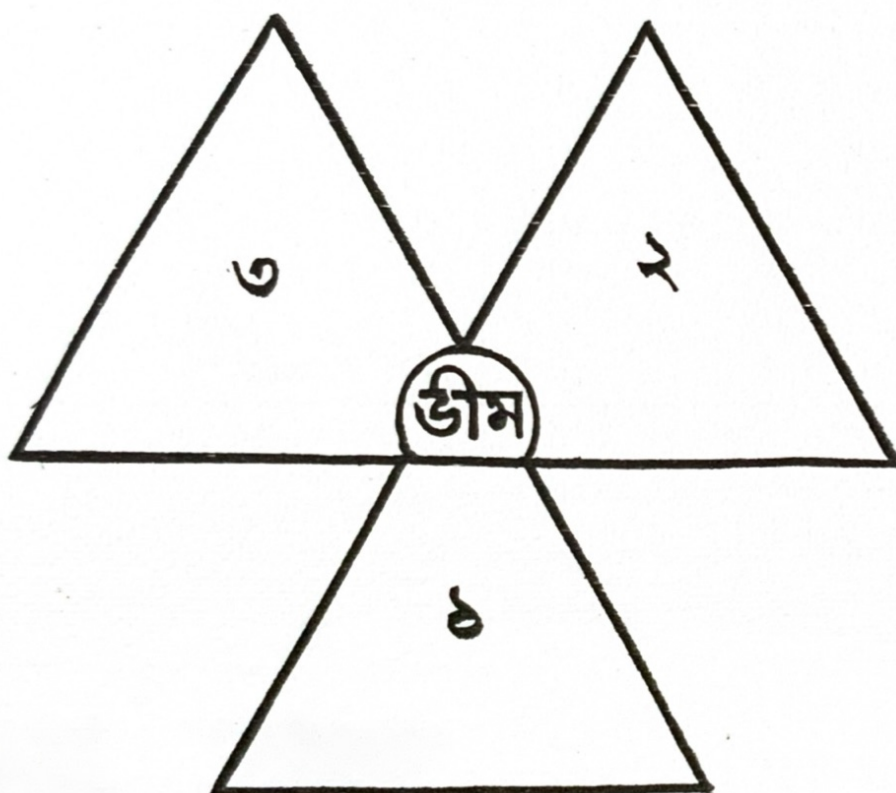
১=আদিম স্তর, ২=পৌরাণিক স্তর, ৩=স্বদেশী আন্দোলনের স্তর।

আদিম স্তরে মৌল উৎসে ভীম সম্ভবত ছিলেন গোষ্ঠী অধিনেতা, শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও কৃষি সহায়ক লৌকিক দেবতা, মধ্যবর্তী পৌরাণিক স্তরে লৌকিক ভীম মহাভারতের কাহিনীর সংগে সংগ্রথিত হয়ে মধ্যমপাণ্ডবে রূপান্তরিত হন এবং তৃতীয় স্তরে সম্মিলিত যুবশক্তির প্রতীক হিসাবে পরিগণিত হন :—
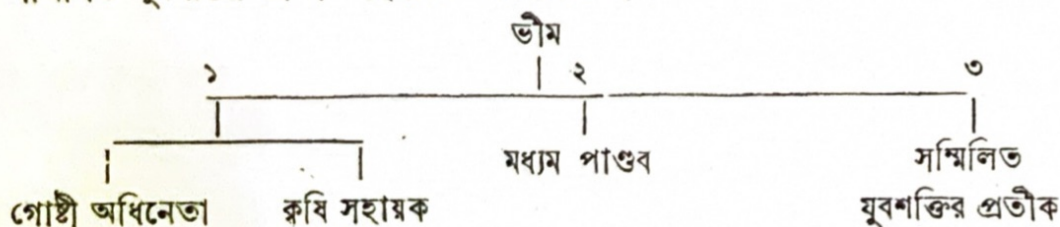
হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানে পুষ্ট বহুলোকায়ত ধর্ম-উৎসবকে আপাতদৃষ্টিতে পৌরাণিক শাস্ত্রীয় বলে মনে হলেও, লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যে যেমন তার আদিম লৌকিক চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়, মেদিনীপুরের ভীমপূজার ক্ষেত্রেও তেমনি অনুরূপ ঘটনা ঘটে। নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের আলোয় বিচার করলে ভীমপূজাকে স্মার্ত হিন্দুধর্ম অনুপ্রাণিত শাস্ত্রোক্ত পূজারূপে গণ্য করা যায় না; বিপরীতক্রমে ভীমপূজার মূল উৎস হয়ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহা-অরণ্যে বিস্তৃত এবং বিবর্তনের ধারায় বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রবাহিত বলে অনুমিত হয়। সমাজ পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে অনিবার্যভাবে ভীমপূজার বহুবিধ রূপান্তর সাধিত হয়েছে কিন্তু লোকসংস্কৃতিগত উৎখননে তার আদিমরূপ পুনরুদ্ধার হয়ত অসম্ভব নয়। সংস্কৃতি বিজ্ঞানী মাত্রেই জানেন মানুষের ন্যায় লৌকিক দেবদেবীরও আয়ুর অঙ্কে জন্ম-মৃত্যু—পরিবতন—রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরের ধারায় মেদিনীপুরের ভীম উৎসবের একদিকে আদিম বিশ্বাসের সক্রিয়তা এবং অপরদিকে পরিবর্তিত সমাজে পারিপার্শ্বিকের প্রতিক্রিয়ায় কমবেশী সমসাময়িক কালের প্রতিরূপ লক্ষ্য করা যায়। ভীমপূজা ও উৎসবের উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস নিম্নলিখিত রেখা চিত্রে উপস্থিত করা যায়—
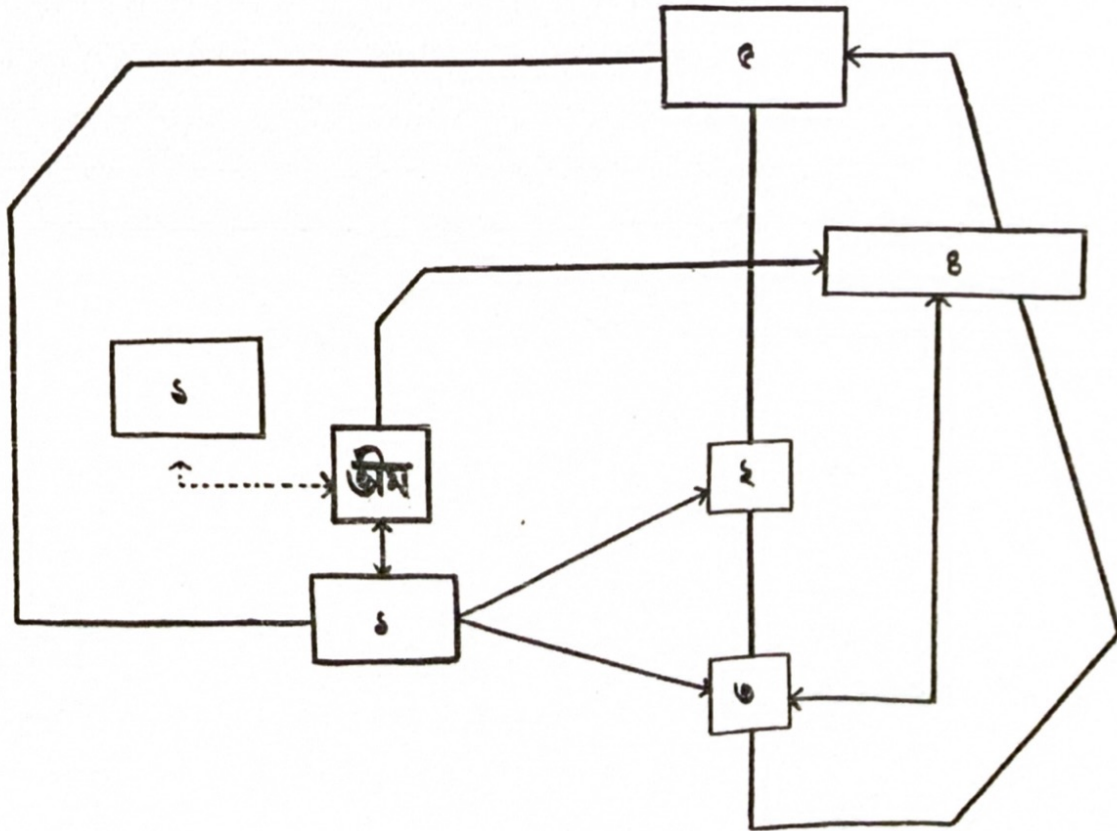
পূর্ব পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রেখাচিত্রের মাধ্যমে বলা যায়—ভীম আদিতে ছিলেন গোষ্ঠী অধিনেতা বা পূজ্য পূর্বপুরুষ (১ ↑); কৃষিসহায়ক লৌকিক দেবতা (১); শিব ভৃত্য (২); মধ্যম পাণ্ডব-কৃষিকর্মের সহায়ক শিব ভৃত্য-মুনিষ (৩); পরে সরাসরি মহাভারতের মধ্যম পাণ্ডব (৪); এবং সর্বশেষে জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় সম্মিলিত যুব শক্তির প্রতীক (৫)। ক্ষেত্র অনুসন্ধানে কতিপয় ক্ষেত্র ছাড়া যেহেতু ভীমের গোষ্ঠী অধিনেতা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বা পূজ্য পূর্ব পুরুষের নির্ভর যোগ্য প্রামাণিক তথ্য ব্যাপক ভাবে হস্তগত হয় নি তাই ভীমের প্রাথমিক আদিম উৎস ভগ্ন রেখায় নির্দেশিত হয়েছে। মোটের উপর সমাজ পারিপার্শিকের সংঘাত সমন্বয়ে Universalization ও Parochialization' এর পথে great tradition ও little tradition এর পারস্পরিক প্রভাবজাত অবস্থার বিশেষ রূপ, ভীমের উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। মোটের উপর পূর্বাপর নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের আলোয় ভীমপূজার উদ্ভব ও বিকাশের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণে বোঝা যায়—মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপক রূপে অনুষ্ঠিত ভীমপূজা এক সার্বজনীন লোকায়ত উৎসব, প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত মেদিনীপুরের হারানো অতীতের অন্ধকারে তার আদিম উৎস হয়তো বিস্তৃত। মেদিনীপুর জেলায় ঐতিহাসিক ভৌগোলিক ও সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমিকায় "ভীম কাল্টের" সামগ্রিক পর্যালোচনায় বলা যায়—যুগ পরিবেশের প্রভাবে মহাভারতে মধ্যম পাণ্ডবের বা শিবের উপাখ্যানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও এবং স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় সম্মিলিত যুব শক্তির পূজা হিসাবে বিবর্তিত হলেও, ভীম মূলত আদিম লৌকিক বিশ্বাস অনুষ্ঠানের উৎসে উদ্ভূত ও বিকশিত, অশুভ শক্তি বিতাড়ক, ক্ষেত্র ও গ্রাম রক্ষক এবং উর্বরতাবাদ সংশ্লিষ্ট কৃষি সহায়ক লৌকিক দেবতা॥

ঋণ স্বীকার :

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী প্রমুখর সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। তথ্য সংগ্রহে ও আলোকচিত্র গ্রহণে যথাক্রমে শ্রীতারাশিষ মুখোপাধ্যায় শ্রীমৃনাল দত্ত ও বিভিন্ন অঞ্চলের অগণিত গ্রামবাসীর সহৃদয় আতিথ্য দান আমাকে অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছে।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র

হিন্দু কলেজ : ডিরোজিয়ো : আধুনিকতা

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় বালকদের ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত করে তোলা। প্রথম যুগে ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শব্দজ্ঞান অর্জন, পরে দাঁড়াল বাক্য রচনা প্রণালী আয়ত্ত করা এবং ইংরেজীতে জমাখরচ রাখতে শেখা। English education, among the inhabitants of Bengal has hither to had little more than mere language for its' object; a sufficient command of which for conducting the details of efficient duty, comprehended the utmost ambition of native students. The spelling book, a few reading exercises, a grammar and a dictionary formed the whole course of their reading, except in a few isolated instances of superior ability and industry; little more was effected than a qualification of a copyist and an accountant."(১)

সাহেবদের সঙ্গে কাজকর্ম চালাবার পক্ষে যেটুকু ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন, সেইটুকু আহরণ করাই ছিল তখনকার হবু মুৎসুদ্দি বেনিয়ান সরকার মশাইদের অভিভাবক-বর্গের বাসনা। ১৭৮৯ সনে বাংলা ইংরেজী শব্দ-কোষ সংকলনের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন কলকাতার প্রধান প্রধান দেশীয় ভদ্রমহোদয়েরা।(২) হিন্দু কলেজের প্রথম নয় বৎসরের যে ইতিহাস (১৮১৭—১৮২৫), সে ইতিহাস অন্যান্য

ইংরেজী শিক্ষালয়ের 'কৃতিত্ব' অপেক্ষা অধিকতর গৌরবজনক ছিল না। হিন্দু কলেজের আর্থিক সংকট হিন্দু কলেজের নব রূপান্তরের হেতু। পর্তুগীজ বণিক জোসেফ ব্যাবেটো ছিলেন কোষাধক্ষ্য : তাঁর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় হিন্দু কলেজের গচ্ছিত টাকা নষ্ট হয়ে যায়। তখন কর্মকর্তারা সরকারী সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানালেন। সরকার ১৮২৪ সনের শেষের দিকে একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন; এই পরিদর্শকের নাম হোল ডাঃ হোরেস হেমান উইলসন। ভদ্রলোক শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী। ডাঃ উইলসন যখন হিন্দু কলেজের দায়িত্ব ভার নিলেন, তখনও হিন্দু কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরাও (1st class) Teg রচিত Book of knowledge পড়ত Enfield রচিত Speaker পাঠ করত। তখন আরবী ফারসী পঠন পাঠনের ব্যবস্থাও বলবৎ ছিল।

উইলসন সাহেব হিন্দু কলেজের শিক্ষার লক্ষ্য বদলে দিলেন ; তিনি স্পষ্ট-ভাষায় বললেন, সাধারণভাবে ইতিহাস, ভূগোল এবং ইংরেজি ভাষা জ্ঞান অর্জন হোল হিন্দু কলেজে শিক্ষার লক্ষ্য। The general result of he operations of the Hindu College is to give the Students a considerable command of the English Language, to extend their knowledge of History, Geography and to open to them a view of the objects and means of Science."(৩) (Wilson's Report 1825)। এই মন্ত্র বলে এক অসাধ্য সাধন হোল। ১৮২৮ সনে তিনি লিখেছেন—"Whilst those of the present first class admit of no comparision with anything yet effected by the College, and far exceed the expectations which I then expressed or entertained." (৪) এক নব রূপান্তর সাধিত হোল ; নবীন পাঠক্রম হোল প্রবর্তিত। এই নবীন পাঠ-ক্রমে উচ্চতর শ্রেণীর জন্য সাহিত্য, মনোদর্শন বা মনস্তত্ত্ব (Mental Philosophy), ইতিহাস, গণিত, ভূতবিদ্যা (Natural philosophy) ও ভূগোল স্থান পেল। সাহিত্যের পাঠ্যসূচীতে সেক্সপীয়ার, মিলটন, পোপ, ড্রাইডেন, অ্যাডিসন, জনসন, গোল্ড-স্মিথ, গ্রে, হোমার (অনূদিত); দর্শনে বেকন, লক, ষ্টুয়ার্ট, হার্টালি, রীড অ্যাবার-ক্রম্বি ; বিজ্ঞানে নিউটনের তিন শাখা (Three Sections), Optics, পোর্টারের বলবিদ্যা (Mechanics) হাইমারের জ্যোতির্বিদ্যা, হার্সেলের জ্যোতির্বিদ্যা, হলের ডিফারেন্সিয়াল ও ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস্, হিলের উচ্চতর গণিত ও জ্যামিতি ;

ইতিহাসে গ্রীস, রোম, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস—গিবন, হিউম, রবার্টসন প্রভৃতির রচনা; অর্থনীতিতে এ্যাগডাম স্মিথের সদ্য প্রকাশিত ওয়েলথ অব নেশন্‌স পাঠ্য তালিকায় স্থান পেয়েছিল। ন্যায়শাস্ত্রে মিলের লজিক, হোয়াটলির লজিক, এবং লেথামের ইংরাজী ভাষা সম্পর্কিত রচনা পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়েছিল।(৫) বলা -বাহুল্য এই সমস্ত গ্রন্থ পঠন-পাঠনের ফলে শুধু ভাষা জ্ঞান অর্জন নয়, সত্যিকার শিক্ষালাভও সম্ভব হোল। Novum oganum-এর ভূমিকায় হিন্দু কলেজের পরবর্তী অধ্যক্ষ মিঃ কার লিখেছিলেন "They (Bacon, Milton, Adam Smith and Shakespeare) will make him a moral and intellectual being." তা সত্য হতে চলল। ১৮২৪ সনে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষায় ছাত্রদের কার্যকলাপ দেখে সংবাদপত্রে বিদ্রূপ করা হয়। (৬)

॥ ২ ॥

আর ১৮২৮ সনের হিন্দু কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা দেখে জনৈক সাংবাদিক বলে-ছিলেন, হিন্দূ কলেজ বাঙ্গালী যুবকদের ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানে পূর্ণ করতে চায়, ইংরাজি সাহিত্য পড়ুক এবং তা উপভোগ করুক, এটা চায়। আর চায় তারা যেন express just conclusions on a clear and polished Style, founded upon a comprehensive view of constitution of Society, and the phenomena of nature."(৭) পূর্বেই বলেছি এই নবীন হিন্দু কলেজের রূপকার ছিলেন ডঃ উইলসন; ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় তিনি নবীন পাঠ-ক্রমটি তৈরি ও প্রবর্তন করেছিলেন। এই নবীন পাঠক্রম বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হতে লাগলেন। ডঃ রস, ও ডাঃ টাইটলার প্রভৃতি বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। দু জন শিক্ষকের নাম পাওয়া যাচ্ছে—২৩শে মে সমাচার দর্পণে। তা থেকে জানা গেল হিন্দু কলেজ ডিয়ার ম্যান ও ডিরোজিয়ো নামে দু জন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার গত ডিরোজিয়ো (১৮৭৩) জন্ম বার্ষিকী বক্তৃতায় বলেছেন যে ১৩ই মে ডিরোজিয়ো হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। সমাচার দর্পণের সংবাদটি ১৩ মে তারিখে প্রকাশিত হয়েছে; তার অর্থ এই নয় যে ঐ তারিখে ঐ নিয়োগ ঘটেছে। ৩রা মে ১৮২৬ সনে বৌবাজার স্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে হিন্দু কলেজ পটলডাঙ্গার নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত

হয়। এবং সম্ভবত তার পূর্বেই এই নব নিয়োগ পত্রাদি বিলি করা হয়েছিল। ডিরোজিয়োর কর্মকাল ১লা মে থেকে শুরু হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা। এর বিকল্প কোন তারিখ নির্ণয় করা যুক্তিবর্জিত কাজ। ১৮২২ সন থেকে বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে সর্বসাধারণের সম্মুখে ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করত। সারা বছর অনুশীলন করে তারা কতটা পড়তে, শিখতে ও বানান করতে শিখেছে তার পরিচয় দেওয়া হোত। এবং যারা উচু ক্লাসের ছাত্র, তাঁরা ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতেন। (৮) তাতেই অবশ্য তাঁদের কপালে সেদিন ভালো-ভালো চাকরী জুটত।

১৮২৪ সনের পরীক্ষার বিবরণের কথা বলেছি; তখন ছাত্ররা বিজ্ঞান বিষয়ে হাস্যকর জবাব দিয়ে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল হয়েছে। ১৮২৫ সনে ও তারা কেবল ভূগোল খগোল বিদ্যায় কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। (৯) অর্থাৎ তখনও তারা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেনি। ১৮২৬ সন থেকে হাওয়া পালটে যাচ্ছে একটু একটু করে। স্বয়ং উইলসন ইতিমধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ২৬ সনের বার্ষিক পরীক্ষার রিপোর্টে দেখছি—"শিক্ষার উপযোগিতা কি," তাই নিয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করছেন অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কৃষ্ণধন মিত্র ও রসিক কৃষ্ণ মল্লিক। এঁরা অনেকেই পরবর্তী যুগের মোটামুটি পরিচিত কেউ কেউ অতিশয় খ্যাত ব্যক্তি। (১০) ১৮২৭ সনে ছাত্রেরা প্রবন্ধ লেখায় নয়, আবৃত্তি ও বক্তৃতাতেই কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। ভাষাজ্ঞান শব্দ-জ্ঞানের অনেক ঊর্দ্ধে চলে গেছে। (১১) এর পূর্বেই অবশ্য নতুন শিক্ষকেরা যোগদান করেছেন। এই বিতর্কের অংশ গ্রহণকারী রাজকিশোর বসুর বক্তৃতার শেষাংশ উদ্ধৃত করা গেল—The European benefits consist solely in pecuniary assistance, where as ours are not only the same, but the gain of learning, which is still more substantial, and to conclude with saying, that we are safe every way, improving in literature and sciences day by day and shall continue to do so as long as theBritish Patronising sway shall rule over us." (Calcutta Govt. Gazette, 24 January, 1828) (১২)

১৮২৭ সন থেকে হিন্দু কলেজের পরিবেশে দারুণ পরিবর্তন ঘটে গেছে; তার পরিচয় কয়েক ঘণ্টার বার্ষিক উৎসবে ও চাপা থাকছে না। এই বৎসর বার্ষিক পরীক্ষা—উৎসবে ছাত্ররা যে সব প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক করল, তা শুধু জ্ঞান মূলক নয়,

চলমান জীবনের নানা জরুরী প্রসঙ্গ তাতে উঁকি দিল। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের বিতর্কের বিষয় ছিল—The consequences resulting to Europe and Asia by the discovery of the passage round the cape of Good Hope—উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে নৌপথ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার কি কি সুবিধা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের বিতর্কের বিষয় হোল—The Preference to be given to the public Distinction or to private happiness—ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, না সামাজিক সমৃদ্ধি-অনুসরনীয় কোনটি? বিতর্কে অংশ গ্রহণ করলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং গঙ্গা গোবিন্দ গাঙ্গুলী। গঙ্গা গোবিন্দ বল্লেন, "a life which is not serviceable to our fellow creatures is not at all to be preferred to one, which has for its object the benefits of our species, and in which one is actively engaged in promoting that philan-thropic end.......and I therefore prefer public distinction because in public life the greatest good can be done to a greater number of beings, which in private life, cannot be expected."(১৩) এই বিতর্কে মাধবচন্দ্র মল্লিকও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই বৎসর আরও তিনটি বিষয়ে তিন শ্রেণীর ছাত্ররা প্রবন্ধ লেখে। তৃতীয় শ্রেণীর বিষয় হোল The Conduct of Cariolanus ; চতুর্থ শ্রেণীর বিষয় হোল—The Preferrable claims to the Administration of different Grecian states ; পঞ্চম শ্রেণীর বিষয় হোল—Consequences of the Britons from the Roman conquest.

এ ছাড়া এই বৎসরের পরীক্ষা উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কাশীপ্রসাদ ঘোষের ইংরেজী রচনা। কাশীপ্রসাদ ঘোষ পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট ইংরেজী লেখক ও কবি ; The Hindu Intelligence' পত্রিকার সম্পাদক ও 'The Shair and other Poems' এর কবি। কাশী প্রসাদ ঘোষের শক্তিমত্তার প্রথম প্রকাশ এই বৎসরই ঘটে। কাশীপ্রসাদ সেকালের বিখ্যাত জেমস মিল লিখিত বৃটিশ ভারতের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম চারিটি পরিচ্ছেদের উপর এক সুনিপুন সমালোচনা প্রকাশ করলেন। ঐ সমালোচনা নিবন্ধে নানা প্রসঙ্গের অবতারণার পর তিনি লিখলেন যে, জেমস মিল হিন্দুদের চতুর্বগ কল্পনাকে 'দুর্বার শৃঙ্খলাহীন কল্পনা'র (wild and ungoverned imagination) পরিণতি বলেছেন। কিন্তু হিন্দুদের ঐ সিদ্ধান্ত আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার দ্বারা পুরোপুরি সমর্থিত হয়। (Chronology

in those times was closely allied to astronomy ; in fact the latter was the base of the former Science. তখন কাশীপ্রসাদ স্কুলের ছাত্র ; কিন্তু তাঁর এই মন্তব্য সেকালের প্রভাবশালী পত্রিকায় প্রতিধ্বনি তুলেছে। (When Mr. Mill wrote his History of the British India, he, very probably, never suspected that the pages of his work would be critically examined by a Hindoo, distinguished for his arguments in the English language, and familiar with the classical recondite learning of the west '(১৪) উক্ত সংবাদ পত্রে আরও বলা হল যে, ছাত্রদের কলম থেকে এই জাতীয় রচনার প্রকাশ খুবই অপ্রত্যাশিত ; কারণ মাত্র কয়েক মাসের শিক্ষায় এটা ঘটেছে। এই বৎসরের বার্ষিক উৎসবে আরও দুটি 'পরীক্ষা' প্রদর্শিত হয়— কাশী প্রসাদ ঘোষ ও হরচন্দ্র ঘোষের লেখা ইংরাজী কবিতা। প্রদর্শিত হয়েছিল ছাত্রদের আঁকা ছবি। উলাষ্টোন নামে একজন দক্ষ শিল্পী শিল্প-শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেছেন। সাংবাদিক লিখছেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিতর্ক—একই কক্ষে অনুষ্ঠিত হোত ; তখন ছাত্ররা হিন্দুস্থানী, ফরাসী ও বাংলায় বক্তৃতা দিত। আজ ছাত্ররা বক্তৃতা দিচ্ছে ইংরেজীতে। পূর্বে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করা ছিল মুখ্য লক্ষ্য। আজ ইউরোপীয়দের রাজনীতি ও কায়দা কানুন অনুকরণ করা হোল প্রধান লক্ষ্য। "This is certainly a grand step towards enlarging the sphere of this understanding and freeing them from the spell of prejudice.' (১৫)

১৮২৭ সনের বার্ষিক উৎসবে ছাত্রদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে এইটি হোল সাংবাদিকের অভিমত। এই পরিবর্তনের পিছনে কার অবদান সর্বাধিক ? কার শিক্ষকতা ও জীবনাদর্শ এখানে সব থেকে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে ? উইলসন, না উনিশ বৎসরের জনৈক কিশোর শিক্ষক ?

হিন্দু কলেজের প্রধান শিক্ষক J. J. D' Anselme পূর্বেও প্রধান শিক্ষক ছিলেন, আজও আছেন। নিশ্চয়ই এই পরিবর্তনের জন্য যাঁকে সাধুবাদ আমরা দিতে পারি না। ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় উইলন পরিবর্তনের হাওয়া এনেছেন। ক্যালকাটা মন্থলি জার্ণালে উইলসনের হিন্দু কলেজ সংক্রান্ত অবদানের কথা বিস্তৃতভাবে লেখা হয়। আমরা ঐ রিপোর্টটি সম্পূর্ণ তুলে দিলাম।

রিপোর্টটিতে চোখ বুলালে বুঝা যাবে উইলসনের কাজ প্রতিদিনের কাজ নয়, সাময়িক

কাঙ্ক। প্রতিদিনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে কার আদর্শ সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হয়েছিল? ব্যক্তি বিশেষের আদর্শ নয়। সিডনী কলেজ ও হিন্দু কলেজ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত হয়,১৬ক ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে পরিকল্পিত হয় উইলসনের অধিনায়কত্বে, এবং হেয়ারের সহযোগিতায়। পরিবর্তন নিয়ে এল নবীন পাঠক্রম এবং নবীন গ্রন্থকারেরা। ১৮২৮ সাল থেকে নতুন ছাত্র গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাচ্ছি; নতুন পর্ব সুরু হয়ে গেছে। আগামী কালের বামপন্থী সমাজের নেতৃবৃন্দের উদ্ভব ঘটছে। এইবৎসর কৃষ্ণমোহন, রসিক, গঙ্গাচরণ, হরচন্দ্র, শিবচন্দ্র. রাধানাথ আবৃত্তিতে যোগ দিয়েছেন। ১৮২৮ সালের বার্ষিক উৎসবে কৃষ্ণ-মোহন বন্দোপাধ্যায়কে ভালোভাবে দেখতে পাই। কৃষ্ণমোহন ডিরোজিয়োর ছাত্র ছিলেন না; কিন্তু তাঁকেই গুরুবলে মানতেন। এই বার্ষিক পরীক্ষায় লাল গোলাপ ও শ্বেত গোলাপদের কলহ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে তিনি নানা তথ্য পরিবেশন করলেন। তার থেকেও বড় খবর হোল, কৃষ্ণমোহন অক্সিজেন (oxygen) ও নাইট্রোজেনের মৌলিক উপাদান ব্যাখ্যা করলেন। সুন্দর আবৃত্তি করলেন। বেঙ্গল হরকরা কৃষ্ণমোহনের ভূয়সী প্রশংসা করে লিখল—Would the spirit of Addison have been present, he would have felt that his cheste idea of the soul had been enriched by the poetic spirit of the Hindoo child' (১৬) —কৃষ্ণমোহন ক্যাটোর স্বগতোক্তি সুন্দর ভাবে আবৃত্তি করেছেন।

১৮২৯ সালে ছাত্রদের লেখা ছয়টি সেরা প্রবন্ধ অভ্যাগতদের শোনান হোল; প্রবন্ধের বিষয়গুলি ছিল এই—

১. রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ শাসন বিধি?
২. মানুষের সদ্‌বৃত্তিসমূহের প্রকৃত নির্ণয়কারী কে? —দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য?
৩. ইতর জন্তু নিধন কি নীতি-সম্মত?
৪. ইউরোপীয় বা হিন্দু বিবাহপদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টি মানবজীবনে সুখসমৃদ্ধির পক্ষে প্রকৃষ্টতর?

এছাড়াও এ বৎসর ছাত্রদের রচিত ও অঙ্কিত কবিতা ও চিত্র প্রদর্শিত হয়।

১৮৩১ সালে হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিয়োর সম্পর্ক ছেদ করতে হয়েছিল। এই বৎসরের বার্ষিক পরীক্ষা-উৎসবে তিনটি প্রবন্ধ পাঠিত হয়; তার বিষয়বস্তু হোল—

১. উত্তরাঞ্চলে বর্বরদের আকস্মিক অভ্যুদয় এবং সেই কারণে রোমক সাম্রাজ্যের

বিনাশ—সভ্যতার অগ্রগতিতে এই দুই ঘটনার প্রভাব।

২. বিজ্ঞান-অনুশীলন অপেক্ষা ভদ্র সাহিত্য-অনুশীলন ব্যক্তি বিশেষ, জাতিবিশেষের কাছে অধিকতর সুখকর, হিতকর ও সম্মানজনক নয়।

৩. সামাজিক সন্তোষ উৎপাদনে ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব পালন ও সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন সম-প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র রামতনু লাহিড়ী প্রথম বিষয়টি অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখে সাধুবাদ পান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়ের উপর লিখেছিলেন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র রাধানাথ সিকদার এবং হরচন্দ্র ঘোষ। রাধানাথ লিখেছেন যে, ডিরোজিয়ো তাঁকে দর্শন পাঠে উদ্বুদ্ধ করেন।[১৬ক] এই সব প্রবন্ধ লেখক সকলেই "displayed considerable reading and very respectable powers, both of composition and reasoning."[১৭]

এর পরে হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিয়োর আর কোন সম্পর্ক থাকল না। এবং এই মর-জগৎ থেকে তাঁর বিদায় নেবার তারিখটিও খুব দূরবর্তী নয়।

এই সব বিবরণের তলায় তলায় কেবল কি উইলসন উপস্থিত আছেন? ডিরোজিয়ো কি নেই?

॥ ৩ ॥

শুধু কি বার্ষিক পরীক্ষার বিবরণীতে এই নতুন জীবনের স্পন্দন ধরা পড়েছে? পরীক্ষা—উৎসবে প্রবন্ধ পড়ে, বিতর্কে যোগদান করে, কবিতা লিখে, কবিতা আবৃতি করে ছাত্ররা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকে শানিত করে তুলত, একথা বললে সবটুকু বলা হবে না। ১৮২৮ সনে ডিরোজিয়ো একাডেমিক এসোসিয়েশন গঠন করেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন ঐ সভার সভাপতি, আর উমাচরণ বসু ছিলেন সম্পাদক।

একাডেমিক এসোসিয়েশন ছাত্রদের প্রথম আলোচনা-সভা। এর ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচনার যোগ্য। আলোচনা সভার প্রয়োজনীয়তা কিছু দিন ধরেই উপলব্ধ হচ্ছে, তার জন্য দাবীও উঠছে।[১৮] প্রথম প্রথম কলেজেই এই সভার বৈঠক বসত; পরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগানবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়, কলেজ কতৃপক্ষের আপত্তিতে। প্যারীচাঁদ বলেছেন ১৮২৯ বা ১৮৩০ সালে একাডেমিক এসোসিয়েশন গঠিত হয় হুগলী ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশানের গৃহে, পরে হেয়ার স্কুলে স্থানান্তরিত

হয়। ডিরোজিয়োর মৃত্যুর পর হেয়ার ঐ সভার সভাপতি হন। সপ্তাহে একদিন বৈঠক বসত, কয়েক ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলত। সভার শেষে হেয়ার সাহেব চাঁদিনী রাতে কত বিষয়ে না আলাপ করতেন। It was at last proposed to esatablish in 1829 or in 1830, a debating club, called Academic Association at the house now occupied by the Ward's Institution.

* * * * * *

We have alluded to the establishment of the Academic Association which afterwards was removed to Hare's School. After Derozios resignation, Hare was elected President. The meetings were held once a week and lasted for several hours, after which Hare sometimes walked with some of the members on moonlight nights and talked on different matters" ১৮ক প্যারীচাঁদ প্রথম এই সভার অধিবেশন কোথায় হোত, তার খোঁজ দেন কি। না দিলেও তাঁর বিবরণের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিবরণের খুব বেশি গরমিল নেই। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, ডিরোজিওর মৃত্যুর পর 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' হেয়ারের স্কুলে উঠিয়া আসে। এই যুবকদল মহামতি হেয়ারকে সভাপতিরূপে বরণ করিয়া সভার কার্য চালাইতে থাকেন। দুঃখের বিষয় ১৮৪৩ সালের মধ্যে ঐ সভা উঠিয়া যায়।" ১৯ এত দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়েছিল কিনা তা আমরা বলতে অক্ষম। তবে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত যে স্থায়ী হয়েছিল, তার প্রমাণ হস্তগত হয়েছে। ক্যালকাটা কুরিয়ের একাডেমিক এসোসিয়েশন সম্বন্ধে জানাচ্ছে—despite various efforts move to crush it at its bud, the spirit that animated its founder, continues to guide its operation to this day." ২০ ডিরোজিয়োর মৃত্যুর পরও উৎসাহী ছাত্রদের আনুকূল্যে এই প্রতিষ্ঠান কয়েক বছর টিকে ছিল। বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "ডিরোজিওর মৃত্যুর পর এই এসোসিয়েশনের অস্তিত্ব ছিল বলে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।" (বিদ্রোহী ডিরোজিও—পৃ ১৪৯)। ক্যালকাটা কুরিয়েরে খবরটি ঐ ধরণের সিদ্ধান্তের প্রতিকূলতা করছে।

১৮২৮ সালে হোক, আর ১৮২৯ সালেই হোক, প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একাডেমিক এসোসিয়েশন বাঙ্গালী সমাজজীবনে তীব্রভাবে প্রভাব ফেলতে থাকে। ঐ সভার কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও অনেক আলোচনা-সভা প্রতিষ্ঠিত

হতে থাকে। ইণ্ডিয়া গেজেটের একটি বিবরণী জনবুল পুনঃ মুদ্রিত করে। বিবরণটি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা উদ্ধৃত করছি।

The spirit of union spreads itself; and in the course of a short time a great number of literary societies have been formed in Calcutta consisting principally of the former and present leading students of the Hindu College, the school society's English Schools, and the seminary generally known by the name of Ram Mohan Roy's school. It has been ascertained upon enquiry that seven associations of this kind are now in existence, the proceedings of which are conducted exclusively in the English language. Most of them meet once a week, and some of longer intervals, for discussing questions in literature and science, and sometimes in politics, the number of members belonging to each varies from 17 to 50. At some of the societies written essays are produced, which become the subject of discussion ; at one of them lectures on intellectual topics are delivered in rotation by the members and at another by the president an East Indian gentleman of great abilities, whose name has been for some time familiar to the public ear as the author of some intersting poems Justice to the merits of this individual requires it to be said, that not content with a conscientious discharge of his duties as a teacher of the charge, he devotes his care and talents during a very considerable part of his time out of school, to the improvement not only of those immediately placed under his tuition, but of all such native youngmen as come within his reach. He is connected with one society only as president, but with most of the others as a member. In short, he lends a very able and active hand in raising the intellectual character of the native youth, many of the youngman who have enjoyed the advan-

tage of his instructions have distinguished themselves by their proficiency. He has lately commenced a course of evening lectures in metaphysics in the rooms of the society's school at Pataldanga, which are attended by about 150 native gentlemen. He was prevented from giving these lectures in the College rooms by the interference of misplaced authority. The example thus set in English has been imitated in Bengalee literature, and two or three associations have been formed principally of persons not connected with schools above mentioned, for writing upon and verbally discussing various subjects exclusively in the Begnalee language. These combinations have been, and will, no doubt, continue to be productive of very great advantage.[২১]

এই প্রবন্ধটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১. /১৮৩০ সালের ডিসেম্বরের পূর্বেই একাডেমিক এসোসিয়েশনের বৈঠক কলেজ-গৃহ থেকে মাণিকতলার বাগানবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

২. ডিরোজিয়ো একাডেমিক এসোসিয়েশন ছাড়া আরও অন্যান্য সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন ;

৩. পটলডাঙ্গার স্কুল সোসাইটির বিদ্যালয়ে নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন। এবং ঐ বক্তৃতা শ্রবণের জন্য দেড় শত ছাত্র যোগদান করছে।

৪. বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা তাঁরই আদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ডিরোজিয়ো প্রতিষ্ঠিত বিতর্ক সভার আলোচনা-পদ্ধতি ছিল অভিনব। এই আলোচনা-সভায় সর্ববিষয়ে মতামত প্রদানের স্বাধীনতা সকল সদস্যদের থাকত। যখন সভার আলোচনার বিষয়বস্তু একবার নির্বাচিত হয়ে গেল, তখন বক্তাদের দুই পক্ষ অবলম্বন করে বক্তৃতা দিতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা থাকত না। Their theory was that as professing inquiries after truth, they ought not to do violence to anyone's conscience, by constraining him to argue against his own settled convictions"[২২] কাজেই সবাইকে এই স্বাধীনতা দেওয়া থাকত যে তারা নিজের ইচ্ছামত যুক্তিতর্ক উত্থাপন করতে পারবেন। অনেক সময় একই পক্ষে আধ ডজন বক্তা বক্তৃতা করতেন। সভার সদস্যদের আলোচনা

শেষ হলে কোন অতিথি বা অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে তাঁকেও তাঁর মতামত দাখিল করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হোত। প্রধান আলোচ্য বিষয় বা তার সঙ্গে যুক্ত কোন বক্তব্য বিষয়ের ওপর মতামত দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হোত। এই আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া তখন ছিল একটা বিশেষ সম্মানের কাজ। যে সব মতামত এই সভায় প্রকাশ করা হোত, সেগুলিকে মজবুত করার জন্য ইংরেজ লেখকদের রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দাখিল করা হোত। ঐতিহাসিক বিষয় হলে রবার্টস ও গিবনের শরণ নেওয়া হোত, রাজনৈতিক প্রশ্ন হলে এ্যাডাম স্মিথ ও জেরেমি বেন্থাম, বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন হলে নিউটন ও ডেভি; ধর্মীয় হলে হিউম ও টমাস পেইন; দার্শনিক প্রশ্ন হলে লক, টীড, স্টুয়ার্ট ও ব্রাউন। আর সব বিষয়েই বক্তৃতা করার সময় ইংরেজী সাহিত্যের সব চাইতে জনপ্রিয় কবি বাইরন ও স্যার ওয়ালটার স্কটের রচনা থেকে ভুরি ভুরি উদ্ধৃতি ইতস্তত ব্যবহার করা হত।২৩ একদিনকার এ বিতর্ক অনুষ্ঠানে রেবরেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সেদিনকার সন্ধ্যায় আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল—"নারী শিক্ষার যৌক্তিকতা"। হিন্দু কলেজের পঞ্চাশটি ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টির যৌক্তিকতা সবাই মেনে নিলেন। একজন বিবাহিত যুবক চীৎকার করে বলে উঠলেন—এটা কি সত্য নয় যে আমাদের শাস্ত্রে নারীশিক্ষা নিসিদ্ধ? খোলাখুলিভাবে না হলেও কার্যত কি নিষিদ্ধ নয়? ন্যায় ও যুক্তির দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন অনুশাসন যদি শাস্ত্র গ্রন্থে থাকে, তবে সেই শাস্ত্রগ্রন্থকে আমি পদদলিত করি।" রেবরেণ্ড ডাফ বলছেন, The brave words won rapturous plaudits for the speaker". ২৪ একাডেমিক এসোসিয়েশনের কার্যকলাপ কী ভাবে চলত, ও বিসয়ে আরও একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং সভায় অংশগ্রহণকারীর জোবানবন্দী পাওয়া যাচ্ছে। হরমোহন চ্যাটার্জি হিন্দু কলেজের ছাত্র। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আচরণ ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি বড় নিবন্ধ লিখে যান। তাঁর পুত্র চণ্ডীচরণ চ্যাটার্জি সেই অনূদিত নিবন্ধটি ডিরোজিয়োর চরি[illegible] টমাস এডওয়ার্ডসের হাতে তুলে দেন। এডওয়ার্ডস তাঁর গ্রন্থে ঐ লিপি থেকে অংশ বিশেষ ব্যবহার করেছেন। আমরা এডওয়ার্ডস ব্যবহৃত উপকরণ থেকে হরমোহনের দুই একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। সুখের বিষয় রেবরেণ্ড ডাফের বক্তব্য এবং পূর্ব কথিত সংবাদ পত্রের বক্তব্যের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের মূলত কোন পার্থক্য নেই।

ডিরোজিয়ো বিদ্যালয়ে যে আলোচনা সভা স্থাপন করেছিলেন, তাকে প্রথম

শ্রেণী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের যোগদান করার অধিকার ছিল। ঐ সভায় কাব্য ও সাহিত্য থেকে এবং নীতি দর্শন থেকে পাঠ দান করা হোত। প্রায় প্রত্যহ ক্লাস বসবার পূর্বে বা পরে সভা বসতো। যদিও কলেজ কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে বা বিনা অনুমতিতে এই সভা বসতো, তবু ঐ সব বিষয়ে সুশিক্ষিত করার কাজে ডিরোজিয়োর স্বার্থ শূন্য উৎসাহ ও অনুরাগ ছিল অসামান্য। এমনই এক ভালবাসা ও মানবহিতৈষিতাবোধের দ্বারা তাঁর এই কার্য্যাবলী উদ্বুদ্ধ ছিল, যার কোন জুড়ি আজ পর্যন্ত মেলে না—এতকাল যতজন শিক্ষক হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করছেন, বা যাঁরা বিদায় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলের প্রসঙ্গ স্মরণে রেখেই বলছি। ছাত্ররাও তেমনি তাঁকে বুক ভরে ভালবাসতো; তাঁরা তাঁর উপদেশ অনুসারে পরিচালিত হতে চাইতো, প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কাজে তাঁকে নকল করতে চাইতো। ছাত্রদের মনের ওপর ডিরোজিয়ো এমনই প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ ব্যতীত অগ্রসর হতে চাইতেন না। অপর পক্ষে, ছাত্রদের সাহিত্যের রুচি তিনি তৈরি করে দিতেন; পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের কুফল সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করে তুলতেন; তাঁদের নীতিবোধ ও নীতি-অনুরাগ তৈরি করে দিতেন, যার ফলে তাঁরা তাঁদের যুগের পিছিয়ে-পড়া ধ্যান ধারণা থেকে সম্পূর্ণ উচুঁতে প্রতিষ্ঠিত হতেন।[২৫]

হরমোহন অবশ্য অতঃপর ডিরোজিয়োর ছাত্রদের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তাই বর্ণনা করেছেন। আমরা আপাতত এ বিষয়ে নীরব থাকছি।

এই সভায় কি কি আলোচনা হোত, সে বিষয় হরমোহন চ্যাটার্জির বক্তব্য অনুসন্ধান করা যাক। হরমোহন বলছেন, হিন্দু-ধর্মের নীতি ও আচরণবিধি খোলাখুলি উপহসিত ও নিন্দিত হোত; নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে ক্রুদ্ধ বিতর্ক হোত। হিউমের ভাবধারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হোত, সমর্থিত হোত উৎসাহের সঙ্গে। অধিকাংশ বিতর্ক সভায় হিন্দু সমাজের বর্তমান হীন অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হোত। হিন্দুদের বর্তমান দুর্গতির জন্য দায়ী করা হোত তাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার-আচ্ছন্নতাকে, উদারনীতিক শিক্ষা ব্যতীত এই দুর্গতির অবসান অসম্ভব বলে মনে করা হোত। নারী সমাজের দুর্গতিতে দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করা হোত। এক দিনের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, নারীদের অবশ্যই লেখাপড়া শেখাতে হবে। সভায় উপস্থিত সভ্যদের আশ্বস্ত করে বলা হয় যে, এই আন্দোলনের জনৈক নেতৃস্থানীয় সদস্যের স্ত্রী অতিশয় সুশিক্ষিতা

নারীশিক্ষা, বিচার ব্যবস্থার সহজ-লভ্যতা প্রভৃতি নিয়ে ডিরোজিয়োপন্থীরা, পরবর্তী যুগেও আন্দোলন করেছেন। তবে 'কলোনাইজেশন' বা 'উপনিবেশীকরণ' সম্বন্ধে তাঁদের মতামত পরবর্ত্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞানান্বেষণ উপনিবেশিক অধিকার মঞ্জুর করার বিরোধিতাই করেছিল।

বেঙ্গল স্পেকটেটর ইংরেজী ভাষায় পার্থেননকে সর্ব প্রথম ভারতীয় পত্রিকা বলে অভিহিত করেছে। কথাটা স্বজনতোষণ নয়। দ্বারকানাথের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে পারে। দ্বারকানাথ বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু সম্পাদকীয় কাজে কোন সহযোগিতা করেন নি। আর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' পরবর্তী পত্রিকা। 'বেঙ্গল হেরাল্ডে'র কর্তৃত্বভার গ্রহণও পরবর্তী ঘটনা। ১৮৩০ সনের মার্চ মাসেই পার্থেননের অপমৃত্যু ঘটল; কারণ "The good old man took fright and the sound of alarm was trumpetted by the Chundrica, the organ of the orthodox". Bengal spectator, vol I No 7. এই 'Good old man', হলেন ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়। পার্থেনন ইণ্ডিয়া গেজেট মুদ্রাযন্ত্র থেকে ছাপা হোত; সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত হয়েছিল। সমাচার দর্পণ তার প্রশংসা করেছিল—"তাহার প্রথম সংখ্যার কাগজে যে কএক প্রকরণ লিখিত আছে তাহা অতি সদ্ভাবযুক্ত রচিত এবং তাহাতে তল্লেখকের ইংরেজী পুস্তকের অতিশয় চর্চার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে।" ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০। ইণ্ডিয়া গেজেটে (১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০) বলা হয়েছিল, পার্থেনন হলো "a specimen of what Hindu by birth yet European by education, could do."[২৭] সম্ভবত এই সব প্রশংসাও ঐ পত্রিকার পক্ষে ভাল হয়েছিল। রিফর্মার ১৮৩১ সনে ৫ই ফেব্রুয়ারী আত্মপ্রকাশ করে; এনকোয়ারার ১৭ই মে আর জ্ঞানান্বেষণ ১৮ই জুন প্রকাশিত হয়। ডিরোজিয়োর স্ব-সম্পাদিত পত্রিকা "ইষ্ট ইণ্ডিয়ানে"র প্রকাশনার তারিখ ১৬ই মে, ১৮৩১। কাজেই পার্থেননের প্রথম পত্রিকার গৌরব অক্ষুন্ন থাকছে।

হিন্দু কলেজের ছাত্ররা দুই দুখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন আর তাঁরা কলেজের ছাত্র ছিলেন না। কাজেই সে পত্রিকা বন্ধ করে দেবার সাধ্য কলেজ কর্তৃপক্ষের ছিল না। ঐ বৎসর ২৩শে এপ্রিল হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিয়ো বিদায় গ্রহণ করেন। তার চব্বিশ দিনের মাথায় এনকোয়ারার আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য পত্রিকা প্রকাশনায় গুরু ডিরোজিয়োর আশীর্বাদ তাঁরা পেয়েছিলেন;

আনুকূল্যও পেয়েছিলেন।

ডিরোজিয়োর পদত্যাগে নব্যদল দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা হতোদ্যম হন নি। একাডেমিক এসোসিয়েসনের কার্য কলাপ বন্ধ হয় নি। বরং নব্যদল নানা কাজে আরও গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করল। ডিরোজিয়ো বিশ্বাস করতেন, "useful knowledge should preceed amusement,"

সেই সূত্রই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের যজ্ঞসূত্র। তাঁরা স্কুল সভা সমিতি সংগঠন ও পত্রিকা প্রকাশনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

মাধবচন্দ্র মল্লিক, রাধানাথ পাল ও গঙ্গাচরণ সেন হিন্দু ফ্রী স্কুল স্থাপন করেন। শারদা প্রসাদ বসু হিন্দু বেনেভোলেণ্ট ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক স্কুল স্থাপনার কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন।

রামমোহন রায় পরিচালিত 'সম্বাদ কৌমুদী' তে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই সব শিক্ষাবিষয়ক কর্মপ্রয়াস সপ্রশংসভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এমন কি এই ব্যাপারে 'এনকোয়ারে'র অভিমত উদ্ধৃত করে তার পোষকতা করা হয়েছে।

হেয়ার স্কুলের শিক্ষক কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় 'এনকোয়ারার' পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার প্রকাশনার অনুমতি পত্র গ্রহণ করতে গিয়েই তিনি পুলিশ অফিসে গঙ্গা জল স্পর্শ করে শপথ নিতে অস্বীকার করেছিলেন ; অস্বীকৃতির কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি হিন্দু ধর্ম মানেন না।[২৮]

পরবর্তীকালে জুরী হিসাবে শপথ গ্রহণ করতে গিয়ে রসিককৃষ্ণ মল্লিক গঙ্গাজল স্পর্শ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

'এনকোয়ারে'র আত্মপ্রকাশের একমাস পরে দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। জ্ঞানান্বেষণ ছিল প্রথমে কেবল বাংলা পত্রিকা, পরে দ্বিভাষিক হয়। কর্মচ্যুত হওয়ার পূর্বে এবং পরে ডিরোজিয়ো কখনও কখনও বেঙ্গল ক্রনিকল, বেঙ্গল হরকরা, হেসপেরাস প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সাংবাদিকতা করেছেন। হেসপেরাস পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে তিনি 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান' নামে এক স্বতন্ত্র পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই কারণে হেসপেরাসের পরিচালকবর্গ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।* হেসপেরাস এপ্রিল মাসের পরে ডিরোজিয়োর

* অধ্যাপক সুশোভন সরকার তাঁর "Bengal Renaissance and other Essays" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে ডিরোজিয়ো ভাগলপুর থেকে ফিরে হেসপেরাস ও ক্যালকাটা লিটারারী গেজেটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, হরকরাতেও লিখতেন। আর হেসপেরাস ১৮৩১ সনের পূর্বে আত্মপ্রকাশ করে নি।

ওপর নির্ভর করে আত্মপ্রকাশ করে। এটি ছিল একটি ক্ষুদে সাপ্তাহিক পত্রিকা।২৯

বেঙ্গল ক্রনিকলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। কারণ পুরস্কার বিতরণী সভার বিবরণটি তাঁর লেখা। হেয়ারের এমন রেখাচিত্র আর দ্বিতীয়বার কেউ আঁকেন নি। এনকোয়ারার পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে স্বয়ং ডিরোজিয়ো জড়িত ছিলেন বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। বিশেষ করে প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধটি তার লেখনী নিঃসৃত বলে কারও কারও ধারণা।

"গত ১৭ই মে অবধি এনকোয়ারার নামে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় সম্বাদপত্র এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত অল্প বয়স্কদের দ্বারা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান সম্পাদক হন তৎপত্রের ভূমিকার শেষভাগ অবলোকনে আমরা বোধ করিলাম যে পত্রের প্রথম ভাগের লিখিত সম্পাদকের স্বীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় তৎপত্রস্থিত বক্তৃতা এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকের দের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বৎসরের উর্দ্ধে নহে ইহাতে আমরা অবশ্যই আহ্লাদিত হইলাম এবং তাঁহারদের এতাবৎ অল্প বয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলাম।"

সম্বাদ কৌমুদীর প্রশংসালাভ করলেও এনকোয়ারার নরমপন্থী কাগজ ছিল না। প্রথম থেকেই এনকোয়ারার ছিল উগ্র মতবাদের পরিপোষক।

> "Having thus launched our bark under the denomination of Enquirer, we set sail in quest of truth and happiness."৩০

সত্য ও সুখের সন্ধান সে পেয়েছিল কি না, জানি না। কিন্তু মাত্র তিন বৎসরের আয়ুষ্কালে নানা বিতর্কের উদ্ভব ঘটিয়েছিল বা জড়িত হয়ে পড়েছিল এনকোয়ারার। হিন্দু সমাজের নামা আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে এখানে অবিরত লেখনী পরিচালিত হয়েছে। সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ, চড়ক পূজা, হিন্দু বিবাহ বিধি, পৌত্তলিকতা, দুর্গাপূজা উপলক্ষে আমোদ প্রমোদ, ভুয়া সন্ন্যাসী বৃত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐ পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়েও প্রবন্ধ লিখিত হোত। মফঃস্বল আদালতে দুর্নীতি, ভারত আইনের ৫ম বিধি, সংবাদপত্রের ডাকমাশুল, সরকার কর্তৃক জমিদারী ক্রয়, দেশীয় গ্র্যাণ্ড জুরি প্রথা প্রবর্তন প্রভৃতি প্রশ্নের সরকারী নীতি সমালোচিত হয়।

আবার শুধু নেতিবাচক বা সমালোচনা মূলক নিবন্ধ প্রকাশ হোত, তা-ই

নয়। নানা বিষয়ে সমর্থন সূচক প্রবন্ধও প্রকাশিত হোত। চুঁচুড়ায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অভিনন্দন জানান হোল, সংগঠকদের সাধুবাদ দেওয়া হোল। হিন্দুদের উন্নতির কোন পথ, এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা মূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। হিন্দু কলেজের কার্য কলাপ ডেভিড হেয়ারের তৈল চিত্র প্রস্তুতকরণ; মিশনারীদের স্কুল স্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে এই পত্রিকার উৎসাহব্যাঞ্জক সমর্থন উল্লেখ যোগ্য।

হিন্দু ফ্রী স্কুলের ত্রি মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিয়ো, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক ও দক্ষিণানন্দ মুখার্জী সহ এনকোয়ারার সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। এই পরীক্ষার এক বর্ণনা এনকোয়ারারে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩১ প্রকাশিত হয়। যে বক্তব্য এই প্রবন্ধে ভাষা পেয়েছে, তা অবশ্য স্মরণযোগ্য। এই প্রবন্ধে গ্রন্থকার বললেন হিন্দু কলেজ থেকেই এই জ্ঞানের আলো চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়ছে এবং কুসংস্কার ও অজ্ঞতার দুর্গ ধ্বসে পড়ছে।

The Hindoo Free School was first planned by a young gentle -man with the pure motive of communicating instruction to the native youth. The small fund that has been raised by subscription for its support, added with patriotic spirit with which its teachers have voluntarily given their assistance to it, without any desire of gain, gives us eause to hope that the Seminary will continue to shed its benign influence over such as come within its sphere.

* * * *

The natives have been hitherto indebted to European charity for education; they have had hitherto no Schools to attend but such as were established by the benevolence of the foreigners Time has produced a happy change; they now see in their countrymen images of brethren; they now feel the duty they owe to their country.

তারপর আন্দুল প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করে বলা হোল—'It is a pleasing incident that all these institutions have been projected and are materially assisted by the exertions

of youngmen whose youth would never create in the philosopher any expectation of what they are realizing. These considerations must be extremely gratifying to the feelings of a Philanthropist, and should produce happy conceptions in the minds of a Hindoo. The spirit of liberalism has been widely diffused, and, that the march of intellect will now be retarded is far from probable When upwards of three thousand boys are receiving systematic instruction in the refined language of England we have nothing but hope upon our side. The rays that have emanated from the Hindoo College and that are now diverging to other places must eventually dissipate the mists of ignorance and superstitution. When knowledge once begins its march, it cannot, without the greatest difficulty, be retarded in its progress. Prejudice and bigotry are hostile to truth, and, therefore, to knowledge; they cannot reign for any length of time.'৩১

প্রবন্ধকার রক্ষণশীলদের প্রতি একেবারে জেহাদ ঘোষণা করলেন।

Then let the fanatic and bigot bewail in silence the fate of their religion. The liberal, although now presecuted by the brutal tyranny of the priest craft, will soon have occasion to seal his triumph in the overthrow of ignorance Proud shall we be of such a day; and all the pains, all the troubles we are at present undergoing wll be lost in the high satisfaction we shall feel at the triumph of knowledge over ignorance; of civilisation over barbarsism; of TRUTH over falsehood!"৩২

এ রচনা অতীব উত্তেজিত (বা উদ্বুদ্ধ) যুবকের রচনা এবং এনকোয়ারের এই বক্তব্যও সম্বাদ কৌমুদীর প্রশংসাবাদ অর্জন করেছিল।

"এতদ্দেশীয় মহাশয় কর্তৃক এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাদান বিষয়ে ইনকোয়ারারে অত্যুত্তম লিখিয়াছেন। তৎপত্র সম্পাদক লেখেন যে, ইহার পূর্বে কেবল ইউরোপীয়

লোকেরদের বদান্যতাতেই এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাভ্যাস হইত। হিতৈষী বিদেশীয়েরদের কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয় ব্যাতিরেকে অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহা রূপান্তর হইয়াছে। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা স্বদেশীয়েরদের উপকারার্থ যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা সুজ্ঞাত হইয়াছেন।'৩৩ (সংবাদ কৌমুদী ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১)। কাজেই সংস্কারমূলক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল।

জ্ঞানান্বেষণ ১৮ই জুন আত্মপ্রকাশ করে; জ্ঞানান্বেষণ তার মুখবন্ধে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করে। এক প্রয়োজন এই যে এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদ বেদান্ত মনু মিতাক্ষর প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসি অনেকেই আপন২ জাতিবিহিত ধর্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমন কর্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্ট লোকেরই কর্তব্য নহে ইহার কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। তৃতীয় এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যাপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানা প্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতিবিস্তারিত রূপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশুবোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে২ প্রকাশ করিব। এবং অন্য২ বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না। ইতি"৩৪ক

স্বভাবতই জ্ঞানান্বেষণের এই বক্তব্য পরবর্তীকালে বদলে গেল, যখন রসিক কৃষ্ণ মল্লিক সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। তখন থেকে জ্ঞানান্বেষন দ্বিভাষিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বা ধর্মীর প্রশ্নে জ্ঞানান্বেষণ সুস্পষ্ট অভিমত ঘোষণা করতে থাকে।

পত্রিকার লেখকদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, তারকচন্দ্র বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। এ'রা সকলেই ডিরোজিয়োর শিষ্য; ডিরোজিয়োর ভাবধারাকেই জনপ্রিয় করে তোলার 'প্রয়াসী' হয়েছেন। জ্ঞানান্বেষণ ১৮৪০ সনে নবেম্বর মাসে বন্ধ হয়ে যায়। জ্ঞানান্বেষণের পরিচালকবর্গ অচিরেই আর একখানি পত্রিকা প্রকাশ

করলেন, তার নাম Bengal Spectator—১৮৪২ সনে এপ্রিল মাসে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাও ছিল দ্বিভাষিক। কিন্তু এই পত্রিকাও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার ইতিবৃত্তে এর একটা স্থান আছে। এই প্রথম বিধবা বিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত শ্লোকটি —'নষ্টে মৃতে' ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়ত এই পত্রিকা থেকে শুধু রাজনৈতিক উৎকণ্ঠা নয়, রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য সরাসরি সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া হয়।

এই যুগের হিন্দু কলেজের অন্যান্য ছাত্র ও একই প্রেরণায় নানা পত্র-পত্রিকা প্রচার করেছেন, তন্মধে সম্বাদ সার সংগ্রহ, জ্ঞানোদয়, বিজ্ঞান সেবধি, বিজ্ঞান সার সংগ্রহ প্রভৃতির উল্লেখ যোগ্য।

॥ ৬ ॥

ডিরোজিয়োর ভাবধারা তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে অবশ্যই প্রচার লাভ করে। ডিরোজিয়ো নিজেও নানা বক্তৃতায় প্রবন্ধে, কবিতায় ও চিঠি পত্রে তাঁর মনোজগতের নানা খবর ছাড়িয়ে রেখে গেছেন। ডিরোজিয়োর পূর্বে নব্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারে কেউ যেব্র তী হন নি, একথা বলা যায় না। স্যার উইলিয়ায় জোন্সের প্রসঙ্গ বাদ দিলাম। কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির নানা সদস্য এ ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। বিশেষ করে ডঃ ওয়ালিক, ও ডঃ ও' শগনেশি জীব বিদ্যা উদ্ভিদ বিদ্যা ও পদার্থ-বিদ্যা সম্বন্ধে নানা বক্তৃতা দিয়ে ও প্রবন্ধ লিখে বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জগতের সীমাবদ্ধতা হ্রাস করে দিচ্ছিলেন। সেই ১৭৯০ সনে ডঃ ডিনউইডি বিদ্যুৎশক্তি বিষয়ে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন।৩৪৭ (ক্যালকাটা গেজেট, ৪ ডিসেম্বর, ১৭৯০) এ ছাড়া দুই একজন সাংবাদিক এবং সিভিলিয়ান কর্মচারী ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। ক্যালকাটা জার্নালের জেমস সিল্ক বাকিংহাম হিকীর গেজেটের মত পরচর্চা করতে এদেশে আসেন নি। জ্ঞান চর্চার জন্যই এসেছিলেন। তাই অতীব দ্রুততার সঙ্গে তাঁকে বল পূর্বক এ দেশ থেকে বিতাড়িত করা হোল। জেমস ইয়ং ছিলেন জেরেমি বেন্থামের সঙ্গে পরিচিত, তিনিই রামমোহনকে বেন্থামের দৃষ্টি পথে নিয়ে আসেন ; বেন্থাম রামমোহনকে এক চিঠিতে এই বলে সম্বোধন করেন "intensely admired and dearly beloved collaborator in the service

of mainkind" রামমোহনের একেশ্বরবাদ বেন্থামের মতে ইউরোপীয় প্রভাবজাত—Rammohan Roy has cast off thirty five millions of Gods, and has learnt from us to embrace reason in the all important field of religion".৩৫ (The works of Jeremy Bentham—J. Browning (Edited) 1843. Vol X. 571)

রামমোহনের প্রভাবে দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি নব্য জ্ঞানবিজ্ঞানের উপাসক হয়ে ওঠেন। ১৮২৪ সনেই লাসিংটন লিখছেন—বিদ্যালয় (অর্থাৎ হিন্দু কলেজ) প্রতিষ্ঠার কারণ নব্য শিক্ষার জন্য হিন্দুদের ব্যাকুলতা। যে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়েছে, তা আগে কখনও দেখা যায় নি। হিন্দু চরিত্রের এই পরিবর্তন নতুন। "The establishment among themselves of the Vidyalaya manifests an anxiety for the dissemination of knowledge, highly creditable to the wealthy and respectable Hindoo, who were concerned in it, and the readiness with which they have admitted European co-operation, displays a degree of liberality, for which our former acquaintance with the Hindoo character had not prepared us."৩৬

লাসিংটন শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি; ১৮২৪ সনের মধ্যে হিন্দু যুবকদের মধ্যে ধর্মীয় চিন্তায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল, তারও উল্লেখ করেছেন।

"Indeed, it would appear that a great revolution has taken place among that class, for the Rev. Mr Adam states that, "a native gentleman on whose authority he can rely, computes that about one tenth of the reading native population of Calcutta have rejected idolatry, and of these his informant supposes about one third have rejectcd revelation altogether, though a few of them profess to do so, and the remaining two thirds are believers in the divine revelation of the Vedas."৩৭

শুধু ধর্মীয় মতামতে নয়, শুধু মনোজগতে নয়, বাহ্যজগতে, গৃহ সজ্জায়,

বেশভূষাতেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। বিশপ হিবারের সেই পরিবর্তিত চিঠি-খানি এখানে উদ্ধৃত করা গেল—"......at present there in an obvious and increasing disposition to imitate the English in everything, which has already led to very remarkable changes, and will, probably, to still more important. The wealthy natives now all affect to have all their houses decorated with corinthian pillars, and filled with English furnitures. They drive the best houses and the most dashing carriages in Calcutta. Many of them speak English fluently, and are tolerably read in English literature and the children of one our friends I saw one day dressed in jackets and trousers with round hats, shoes, stockings. In the Bengali newspapers of which there are two to three, politics are convassed with a bias, as I am told, inclining to whiggism ....Among the lower orders the same feeling shows itself more benificially, in a growing neglect of caste — is not merely a willingness, but an anxiety to send their children to our schools, and a desire to learn and speak English."[৩৮]

(Bishop Heber's letter to R. J Wilmost Horton — 1823)

সেকালের কাগজপত্রে দুই একজনের নামও পাওয়া যায়--হরিমোহন ঠাকুর বেশভূষায় ছিলেন পুরোদস্তুর সাহেব ; তাঁর গৃহ সজ্জাও ছিল বিদেশী শাস্ত্র সম্মত। রাজা রামলোচন ত একবার তাঁর এ্যাটর্নির দপ্তরে ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হয়ে সবাইকে হকচকিয়ে দিয়েছিলেন। সে ত ১৭৮০ সালেরই কথা।[৩৯]

(Good old days of Hon'ble John Company—W. H. Carey)

কাজেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বিদেশী পোষাক পরিধান ও বিদেশী খানাপিনা আস্বাদন, এমন কি বিদেশী বুলি উচ্চারণ অভিনব ব্যাপার নয়। সমাচার চন্দ্রিকা এবং সংবাদ প্রভাকরের সমালোচনা এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট ; সমালোচনার আসল হেতু হোল তাদের জীবন দর্শনের পরিবর্ত্তন। ডিরোজিয়োর পূর্বে বাংলার ভাব জগতে এমন আলোড়ন আর দেখা যায় নি।

কুসংস্কার আর কুপ্রথার বিরুদ্ধে ডিরোজিয়ো এবং ডিরোজিয়োপন্থীরা

বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা ঈশ্বর মানেন না, এ কথা বলেন নি; তাঁরা ঈশ্বর সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসু। রামমোহন থেকে এইখানে তাঁদের পার্থক্য; তাঁরা শুধু সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করেন নি। বিধবাদের বিবাহ দানের প্রস্তাব করেছেন। অধিকন্তু তাঁরা হিন্দু বিবাহবিধি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন।[১৮] কিন্তু হিন্দু পরিবার প্রথা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন নি। বরং দক্ষিনানন্দ পিতার সঙ্গে মতবিরোধের দরুণ গৃহত্যাগ করলে ডিরোজিয়ো তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দেন।

তাঁরা যুক্তির মহাপটে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা য়ুরোপীয় তথা আধুনিক যুক্তি বিজ্ঞান কেবল মাত্র পড়ুয়ার মনোভাব নিয়ে পড়েন নি। ডিরোজিয়োর কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি ছাত্রদের এই বিশেষ রুচি তৈরী করে দিয়েছিলেন। লকের গ্রন্থাবলী পড়ে রামগোপাল বলেছিলেন, "লকের মস্তক প্রবীনের ন্যায় কিন্তু রসনা শিশুর ন্যায়।"[৪০] নিঃসন্দেহে এই উক্তি স্মরণীয় উক্তি, কিন্তু তিনি যখন পিতামহের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পিতার কাকুতি-মিনতিতে বলেছিলেন, "আপনার অনুরোধে আমি সর্ববিধ কার্য করিতে এবং ক্লেশ সহিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মিথ্যা বলিতে পারিব না।" তখন তার আবাল্য লক-চর্চা যে শুধু পড়ুয়ার চর্চা নয়, তা বুঝতে পারি। "বৃদ্ধ বয়সেও জননীর সন্নিধানে আসিলে শিশুর মত হইয়া যাইতেন। অথচ মাতার অনুরোধেও নিজের হৃদয়স্থিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পুরাতন রীতি অনুসারে একটি আট বা দশ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই।'[৪১] ইনি হলেন রাধানাথ শিকদার। তাঁর 'প্রিন্সিবিয়ো' পাঠ যে বিলাস নয় অনুভব করতে পারি। যেদিন জননীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে বালকের এই উক্তি শ্রবণে "এ দিকে ত বলা হয় কিছুই মানি না, ওদিকে শ্রাদ্ধ কর্তে বসা হয়েছে, পৈতাটি বেশ ঝুলছে, বামনাই দেখান হচ্ছে।" রামতনু মর্মান্তিক লজ্জা পেলেন, তখন জীবন ও যুক্তির মধ্যে মেল বন্ধন ঘটল।[৪২] আদালতে দাঁড়িয়ে রসিককৃষ্ণ যেদিন বললেন, আমি গঙ্গা মানি না, সেদিন তাঁর স্পর্দ্ধা নবীন বয়সের স্পর্দ্ধা ছিল না, ছিল সত্যের স্পর্দ্ধা, যুক্তির স্পর্দ্ধা।[৪৩] সংবাদ পত্রে যখন এই ঘটনা উপলক্ষ্য করে বলা হোল যে, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, ধর্ম মানেন না, এই উক্তি করেছেন তখন তিনি প্রতিবাদ করে জানালেন......"আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, কোন ধর্মেই আস্থা নাই, একথা আমি বলি নাই। অন্য পক্ষে আমি বিচারপতির নিকট স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম—ঈশ্বরের কাছে আমার পবিত্র দায়িত্ব আছে এই জ্ঞানেই আমি এ জগতের কার্য করি।[৪৪] (Asiatic Journal 1835. May-August.

Bengal Hurkaru থেকে উদ্ধৃত।) উইলসনকে লিখিত পত্রে ডিরোজিয়ো ঠিক একই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন—"ছাত্ররা যদি কেউ নাস্তিক হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য যেমন নিন্দাবাদ আমার প্রাপ্য, তেমনি যারা আস্তিক হয়েছে তাদের জন্য সাধুবাদও আমার প্রাপ্য।[৪৫] এই কারণেই হরমোহন চ্যাটার্জি লিখেছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সত্যের উপাসক। কলেজ ''বালক'' সত্যের প্রতিশব্দ।

হরমোহনের এই ভাষণ গুণমুগ্ধ ছাত্রের ভাষণ হতে পারে, কিন্তু এর সঙ্গে ইতিহাসের অনাত্মীয়তা নেই। সম সাময়িক বিবরণ এর পাশে এসেই দাঁড়াবে।

লাসিংটনের বিবরণে বা 'গুড ওল্‌ড ডে'জ অব অনারেবল জন কোম্পানী'তে সেকালের জীবন চর্চার যে পরিবর্তনের সংবাদ আছে, তার সঙ্গে এই পরিবর্তন মিলিয়ে পড়লে বুঝা যাবে, এ শুধু পোষাক পরিচ্ছদের নবীনত্ব নয়, বা ঈশ্বর বিশ্বাস বা ঈশ্বর অবিশ্বাস নয়। এনকোয়ারারে তার নিদর্শন আছে।[৪৬] ডিরোজিয়োর পদত্যাগ পত্রেও তার কবুল আছে।[৪৭]

"Come then, ye friends of the Hindoos, and jointly, hail the approach of what is conducive to the interests of a nation and the civilisation of man. Welcome Truth, knowledge, Virtue and therefore, happiness.'[৪৮]

"If it be wrong to speak at all upon such a subject, I am guilty ; for I am neither afraid nor ashamed to confess having stated the doubts of philosophers upon this head, because I have also started the solution of those doubts Is it forbidden anywhere to agree upon such a question ? If so, it must be equally wrong to adduce an agreement upon either side or is it consistant with an enlightened notion of trust to lead overselves to only one view of so important a subject, resolving to close our eyes against all impressions that oppose themselves to it ?[৪৮ক]

॥ ৬ ॥

রামমোহন পন্থীদের সঙ্গে ডিরোজিয়োর নানা প্রসঙ্গে দৃষ্টিভিন্নতা ছিল।

রামমোহন যুক্তিবাদের সঙ্গে পরমার্থ-বাদকে মিলিয়েছিলেন যেমন মিলিয়েছিলেন জন লক, নিউটন, এবং পরবর্তীকালে ফেনিলন (Fenelon)। কিন্তু যুক্তির মুক্তি কতটুকু এগুলে সম্পূর্ণ হবে, বা আদৌ তার শেষ আছে কিনা, এটা দার্শনিকরাও ভেবে কুল কিনারা করতে পারেন নি; ডিরোজিয়ো দার্শনিক নন, বেঁচে থাকলে কি হতেন, বলতে পারি না। কিন্তু তিনি কোন সত্য প্রতিষ্ঠা করেন নি; জ্ঞানতত্ত্বে নতুন কোন অঙ্গীকার তিনি আনেন নি। এমন কি নতুন কোন পদ্ধতিবিজ্ঞানও (Methodology) তিনি গড়ে তোলেন নি। তিনি পড়তেন, জানতেন, বুঝতেন এবং তা প্রচার করতেন। তিনি জন লক পড়েছেন। তার বিরোধী অন্তর্বাদী দর্শনও তিনি পড়েছেন। আবার লকের পরিণতি হিউমে যতটুকু হয়েছে, সে খোঁজও মর্মজ্ঞের মত রাখেন। ফরাসী দার্শনিক গোষ্ঠীর যাঁরা লকের অনুসারী ডিরোজিয়ো তাঁদের সঙ্গে পরিচিত। যাঁরা ব্যতিক্রম, ডিরোজিয়ো তাঁদেরও অবহেলা করেন নি। ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা তার মনে প্রেরিত হয়েছে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ তিনি শুধু সাংবাদিকের মত জানেন নি; সেই যুদ্ধের অন্তর্নিহিত বক্তব্য তিনি অনুধাবন করেছেন। তাই টম পেইন তাঁর প্রিয় লেখক; টম পেইন ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার মুক্তি যুদ্ধের মধ্যে মেল বন্ধন করেছেন। ভারতবর্ষে ঐ দুইটি দুনিয়া কাঁপানো ঘটনার তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করেছেন—শুধু তত্ত্বগতভাবে নয়। তিনি ভারতের মাটিতে তার বীজ রোপণ করতে চেয়েছেন। টম পেইনের Rights of Man বা Age of Reason বই দুখানি ডিরোজিয়োর ছাত্রেরা যে পরম সমাদরে পড়েছেন, তার কারণ এইখানে। পাদ্রী ডাফ বিচলিত হয়েছেন — বিচলিত হয়েছেন ঐ জাতীয় অবিশ্বাসীর (infidel) গ্রন্থ ভারতবর্ষের যুবকেরা পড়ছে। শুধু পড়ছে না, খৃষ্টীয় মিশনারীদের খৃষ্ট মহিমার বা বাইবেল সমাচারের অলৌকিকতার দুর্গে দুর্গতি ডেকে নিয়ে আসছে তারই বুদ্ধি পরম্পরা অনুসরণ করে। সংবাদ প্রভাকরে অনূদিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, জনৈক সংস্কৃত পণ্ডিত তাঁর খৃষ্ট-বিরোধী সংস্কৃতগ্রন্থেও পেইন উদ্ধৃত করেছেন, অবশ্য অনুবাদের মাধ্যমে।[৪৯]

রামমোহন সর্ব ধর্মের সার সংগ্রহ করতে চেয়েছেন; ধর্ম তাঁর কাছে শুধু নীতি জ্ঞান নয়, ঈশ্বর বিশ্বাসও বটে। এই কারণে ডিরোজিয়ো রামমোহনকে "half liberal" বলেছেন। যুক্তির অঙ্গুলী ধরে তাঁরা সিকি এগিয়ে বিমূঢ় হতে চান নি। তাই পরিপূর্ণ যুক্তিবাদিতার সঙ্গে অর্ধ স্ফুট যুক্তিবাদের বিরোধ অনিবার্য। কিশোরীচাঁদ ঠিকই বলেছেন, "They felt and they asserted in

their lives that what is morally wrong, cannot be theologically right."৫০

সুশোভন সরকার বলেছেন, ইয়ং বেঙ্গলদের৫১ আচরণে রামমোহনের "Sense of decency" ও "theistic idealism" আহত হয়েছিল। 'Sense of decency'—এই মূল্যায়ান তর্কসাপেক্ষ। যাদের বয়স সীমা কুড়ি পার হয় নি, তাঁদের সঙ্গে পঞ্চাশ বৎসরের প্রৌঢ়ের জীবন ভঙ্গি মিলবে, এ প্রত্যাশা করা ন্যায় সঙ্গত নয়। যৌবন অতিশয্যের কাল, বাড়াবাড়ির সময়। যৌবনের ধর্ম আর প্রৌঢ়ত্বের আচরণ এক নিক্তিতে ওজন করা যায় না।

রামমোহনের সঙ্গে বা রামমোহন পন্থীদের সঙ্গে ডিরোজিয়ো বা ডিরোজিয়ো পন্থীদের বিরোধ অবিমিশ্র বিরোধ নয়। রামমোহনের সকল উদ্যোগ আয়োজন ডিরোজিয়ো পন্থীদের বাঞ্ছিত উত্তরাধিকার। তাই তাঁরা বহুস্থলে মিলেছেন, অনেক স্থলে মিলতে পারেন নি।

ডিরোজিয়ো পন্থীরা রাজনৈতিক ব্যাপারেও স্বতন্ত্র কথা বলেছেন; কিন্তু প্রধানত হিন্দু সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই তাঁদের বিদ্রোহ। সামাজিক কুপ্রথার তাঁরা বিরোধিতা করেছেন। রামমোহন হিন্দু পৌত্তলিকতার অঞ্চল ত্যাগ করলেন; ডিরোজিয়ো পন্থীরা এ ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন করার সুযোগ পান নি। কারণ তখনও তাঁরা শৈশবের ক্রীড়া অঙ্গন ত্যাগ করেন নি। কিন্তু সেই পৌত্তলি-কতার সঙ্গে বিচ্ছেদ যখন ব্রাহ্ম সমাজকে ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্বের অবসানে প্ররোচিত করল না; তখন তারা সমালোচনা করেছেন। এ সমালোচনা পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দ্বারা আরও প্রত্যক্ষ গোচরীভুক্ত হবে। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি যখন মসী ধারণ করলেন, ডিরোজিয়ো তখন রামমোহনকে সোৎসাহ সমর্থন করেছেন। সে-দিনের একটি ইতিবৃত্ত উৎকলিত করা গেল "তাঁহারা এক দিবস কলেজের এক ঘরে বসিয়া অভি-নন্দন পত্র লইয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে, উক্তপত্রের ইংরেজী রচনা রামমোহনের কি অ্যাডাম সাহেবের। এমন সময়ে প্রাতঃ স্মরণীয় ডিরোজিয়ো সাহেব আসিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন "তোমরা মানুষ, না এই দেয়াল? নারীহত্যারূপ ভীষন প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গেল, ইহাতে তোমরা কোথায় আনন্দ করিবে না অভিনন্দন পত্রের ইংরাজী কাহার রচনা এই বৃথা তর্কে তোমরা মত্ত। রামমোহন রায় ইংরাজীতে কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি জানিলে

তোমরা ইহা অ্যাডাম সাহেবের বলিয়া মনে করিতে না।"৫২ (মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত-নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চতুর্থ সংস্করণ। পৃঃ ৩৬৮)। সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়েছে। এই সংবাদ ডিরোজিয়োর কাছে মানব মুক্তির সংবাদ। ইণ্ডিয়া গেজেটেই ৮ই আগষ্ট (১৮৩১) তাঁর এই ঐতিহাসিক ঘটনা উপলক্ষে একটি কবিতা প্রকাশিত হোল—

> Hawk, heard ye not? The Widows wail is o'ver?
> The storm is passing, the rainbow's span
> Stretcheth from North to South; the ebon can of darkness
> rolls away;
> The breedzes fan the infant dawn; and morning's herald star
> Comes trembling into day! O! can the sun be far?৫৩

শুধু ডিরোজিয়ো নন্ ডিরোজিয়ো অনুগামীরাও নীরব থাকলেন না। Enquirer পত্রিকায় The Suttee, নামে একই সময়ে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়।

> Bentonik to thee shall many a baby owe
> The breast that sucked it, when papa will go,
> When papa's age to end shall draw!৫৪

সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে যে আইন জারী হোল, তাকে রদ করার জন্য ধর্মসভার সদস্যরা মিঃ ব্যাথিকে কৌশুলি করে বিলেত পাঠালে এনকোয়ারার লিখেছিল! That an Englishman in the nineteenth century would enlist himself as one of the defends of such a horrible rite as that of the Suttee, is what the historian could never dream of being obliged to record."৫৫

সে যুগে শ্রদ্ধা যেমন তাঁরা পোষন করতেন; সমালোচনাও তেমনি তাঁরাই করেছেন। যা সমালোচিত হওয়া উচিত বলে তাঁরা মনে করেছেন, তাকে সমালোচনা করেছেন। কারণ "সত্য অপেক্ষা প্রিয়তর তাঁদের আর কিছুই নয়।"

আমরা তাঁদের রামমোহন পন্থীদের সমালোচনার কয়েকটি উদাহরণ সংকলিত করছি।

১. ১৯শে ভাদ্র, ১৮৩১ সালে তখন ব্রহ্ম সভার পক্ষ থেকে দুইশত জন ব্রাহ্মণকে প্রনামী দেওয়া হোল, তখন ডিরোজিয়ো প্রতিবাদন জানালেন; সমালোচনা

করলেন—"We have always supposed that B amha shubha was not a Brahminical juggle, and that it was established by Rammohan Roy upon the purest principles of worship to God and love to man……charity is an excellent virtue; but when a select body of men are made the objects of it, to the exclusion of others, we like to know the reason of such a distinction. The Brahmins are not gods of our idolatory; but it does not therefore follow that others may not worship them if they please. We only think that to give the Brahmins up, on one account and to take them back, on another, is quite super derogatory. It is the same humbug in another name."[৫৬]

২. রামমোহনের সহচর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের গৃহে দুর্গোৎসব হোল; প্রথমে অবশ্য কাত্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ এ ব্যাপারে মুখ খোলেন। যাঁরা মুখে পৌত্তলিকতার নিন্দা করেন. অথচ স্বগৃহে মূর্তিপূজা করেন, কাত্রিকা তাঁদের নাম প্রকাশ করে দেয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় ডিরোজিয়ো বিষয়টির গুরুত্ব দিলেন। মিথ্যাচারের তিনি বিরোধী। ১৫ই অক্টোবর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় সমালোচনা বের হোল; তিনি বললেন নিজের পত্রিকায় ডিরোজিয়ো পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রায়শ ভৎর্সনা বর্ষিত হচ্ছে, অথচ নিজেই তাঁর গৃহে দুর্গপূজার অনুষ্ঠান করলেন; এ কেমন নীতি-আনুগত্য! সত্য অন্ধতা![৫৭]

ইণ্ডিয়া গেজেটে জনৈক পত্র লেখক এর জবাব দেবার চেষ্টা করলেন, তিনি লিখলেন প্রসন্ন ঠাকুর বাড়ীতে দুর্গাপূজা করেন, তার কারণ উত্তরাধিকার বিধি তাঁকে পূজা করতে বাধ্য করছে।

I have read in this morning's East Indian an attack against Baboo Prusunno Coomer Tagore the talented conductor of the Reformer for inconsistency;—for celebrating an idolatrons poojali; he has attacked idolatry through the Reformer, and at the same time is celebrating idolatrons worship in his house. He has attacked idolatry because he hates it from the bottom of his heart. I know he hates it as much as Mr.

Derozio, the Editor of the East Indian, or Baboo Krishna Mohona Banerjeah, the editor the Engnier, can do. Now for the other side of the story. He has celebrated an idolatrous poojah in his family house not because he approves of it, but because he cannot avoid doing it. The property he inherits from his ancestors is left to him on condition of celebrating this poojah every year ; for which a fund is deposited in his hands as a trust "৫৮

এই টুকু শুধু লিখলে বলবার কিছু থাকত না ; কিন্তু পত্র লেখক সেখানেই থামলেন না। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ডিরোজিয়া খৃষ্টধর্মাবম্বী।

May I ask Mr. Derozio if he never saw a rank deist going to the Temple of Christ, and worshipping at his altar without a grain of belief in the Bible ? It he answers in the affirmative, I think he should certainly expose their conduct as being more within the bounds of his vocation, then trouble himself about what Hindoo do, a subject on which, not withstanding pretensions, he has often betrayed great ignorance."৫৯

পত্র লেখক এর পর ডিরোজিয়োর বিশ্বস্ত অনুচরদের মধ্য মিথ্যাচারী আবিষ্কার করলেন। তিনি লিখলেন, আমি শুনেছি মাধবচন্দ্র মল্লিক তাঁর গৃহে দুর্গাপূজা করেছেন। অথচ তিনি ত হিন্দুধর্মের শ্রাদ্ধ করছেন। এ বিষয়ে ডিরোজিয়োর কি বলবার আছে ? আর তাঁর বন্ধু কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জিই বা কি বলেন ? মাধবচন্দ্র মল্লিক ছিলেন কট্টর ডিরোজিয়োপন্থী ; ২১শে তারিখে এক চিঠিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কড়া জবাব দিলেন।

What he has said of my having celebrated the Doorga poojah is a thing which is entirely against my principles and I never have acted, nor will act, against them, though I might be disliked by my kindred, hated by the Hindoos, and excommunicated by the Dhurma Shubha" (20 oct, 1835) ৬০

বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব ব্যাপারে যে সর্তাদির কথা পত্র লেখক প্রসন্নকুমার সম্পর্কে লিখেছিলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় তার জবাব দেওয়া হোল,

"No condition regarding the clebaration of the Doorga Poojah festival has been imposed upon the Baboo by his ancestors, nor is there any fund deposited with him for that purpose. When the property left to him, and his brothers was divided among them, they agreed upon themselves to celebrate the poojahs by terms, for a specified time. This period was limited to five years, the last of which has just expired. The agreement among the brothers was voluntary, not imposed upon them by ancestors."৬১ বলা বাহুল্য এ সব খুঁটিনাটি পারিবারিক খবর ডিরোজিয়োর জানবার কথা নয়; সম্ভবত ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয় এসব তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। এবং সে আত্মীয়টি বোধকরি দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
৩. ব্রাহ্মমতালম্বীদের ধর্ম বিষয়ক ধ্যান ধারণা ডিরোজিয়োর কাছে ন্যায় নীতি অনুমোদিত নয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান পত্রিকা প্রকাশ করার একটি উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সমাজের খবরাখবর বিস্তৃত ভাবে পরিবেশন করা। দেশীয়দের মধ্যে যে পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে, তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে তার সঙ্গে জড়িত বলে এই সব সংবাদ সংগ্রহ করা তাঁরপক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে।

The Hindoos of Calcutta are divided into several parties the orthodox being, as may be supposed, the largest and most opulent. It has several public organs—the Chundrika, the Prabhakar, the Ratnakar, other papers written in Bengallee language. They have no paper in English as yet ; but we have heard that a Chirstian was to have been employed by them to defend the cause of idolatry ! The editor of Enquirer threatened to expose him if he attempted to perpetuate the ignorance and superstition of Hindoos by defending their religious and evil practices. We believe this produced the desired effect, the christian has not yet inked his maiden pen, to prove that we should have more Gods than one.

Ramohan Roy is the founder or rather the leader of another

seat. But what his opinions are neither his friends nor foes can determine. It is easier to say what they are not, than what they are and this, we think, is the case with most thinking men. Ram mohan, it is well known, appeals to the Vedas, the Koran, and the Bible, holding them all probably in equal estimation, extracting the good from each and rejecting from all whatever he considers apocryphal He has been known to attend and join in prayer both among Christian and Hindoo unitarians ; but whether he prefers the forms of the one or the other it is difficult to determine. We have seen persons salute him as a Brahmin , and we have heard him pronounce the Brahminical benediction upon such occasions ; and if the proceedings of the Bramhu Shubha, as regulated at present have been sanctioned by him, it is obvious that the Brahmins are treated by his followers with as much respect, as they are by the most orthodox. He has always lived like a Hindoo, drinking a little wine occasionally in the cold weather. He has, we believe, sat at table with Europeans, but never eaten anything with them. His followers at least some of them, are not very consistent. Sheltering themselves under the shadow of his name, they indulge to licentiousness in everything forbidden to in the shastras, as meat and drink while at the same time, they fie the Brahmins, profess to disbelieve Hindooism, and never neglect to have poojahs at home. These persons, the Editor of Enquirer calls half-liberals, and well he may. The Reformer is their paper in the English language, and they have the Bungodoot and Cowmodee in the Bengalee."[৬২]

রামমোহন ও ব্রাহ্মসভা সম্বন্ধে ডিরোজিয়োর মূল্যায়নে যুক্তির একটা ফাঁক আছে। বাস্তব অবস্থা ও যুক্তিবাদিতার মধ্যে সামঞ্জস্য রচনায় ডিরোজিয়ো

ব্যর্থ হয়েছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি নব্যদের সম্বন্ধে লিখছেন, শেষোক্ত দল হলেন সর্বাপেক্ষা প্রতিভাসম্পন্ন গোষ্ঠী। কৃষ্ণমোহন, দক্ষিণানন্দ ও মাধবচন্দ্র এই দলভুক্ত।

রামমোহন বা ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে ডিরোজিয়োর যে সমালোচনা, তা গ্রহণ যোগ্য হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু তাঁর অন্যান্য বক্তব্য আমাদের সযত্ন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে। ডিরোজিয়ো এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন যে, হিন্দু সমাজের আচার ব্যবস্থা, সংস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর পক্ষে কোন মত প্রচার করা সুবিবেচনার কাজ নয়। এ ব্যাপারে হিন্দুরাই মত প্রকাশের অধিকারী। তবে এক্ষেত্রে যুক্তি ও বিবেচকের নির্দেশ অনুসারে চলতে হবে; এই ছিল তাঁর পরামর্শ। এক্ষেত্রে তিনি কোন রকম আপোষ মীমাংসার বিরোধী। ১৮৩১ সালেও দেখা গেল দুর্গাপূজার উৎসবে লাট সাহেব, হাইকোর্টের জজ থেকে শুরু করে অনেক গণ্যমান্য ইংরেজ নিমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছেন। তাঁদের পাশে গীর্জার ধর্মযাজক মহোদয়েরাও বিরাজমান। এমন কি বাইজী নাচের আসরেও তাঁরা অনুপস্থিত থাকছেন না। ডিরোজিয়ো খৃষ্টীয় মিশনারীদের এই আচরণকে ক্ষমার চোখে দেখেন নি। ২১শে অক্টোবর তিনি এক প্রবন্ধে খৃষ্টীয় মহাপুরুষদের এই কাজের নিন্দা করলেন। অর্থাৎ তিনি একটা নির্দিষ্ট নীতি মেনে চলতে চেয়েছেন; এ ক্ষেত্রে কোন গোঁজামিল তিনি বরদাস্ত করেন নি। এ হোল তাঁর কার্যক্রমের নেতিবাচক দিক। কিন্তু ইতিবাচক দিকও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হলে তিনি তাঁদের প্রাণ খুলে সমর্থন করছেন। আড়পুলি লেনের বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার দিনে উপস্থিত থেকে তিনি ছাত্রদের উৎসাহ দিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় তিনি জানালেন যে তিন হাজারের বেশি ছাত্র ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করছে।

"We believe that there are now upwards of three thousand native youth receiving instruction in the English language and becoming acquainted with the valuable stores of European literature and science in general."[৬৪]

ঐ প্রবন্ধে তিনি এই আধুনিক শিক্ষার প্রসারে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং মহামতি ডেভিড হেয়ারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আর তারিফ করলেন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের, যাঁরা নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে সোৎসাহে

এগিয়ে এসেছেন।

জাতীয় শ্রীবৃদ্ধিই ছিল তাঁর লক্ষ্য ; এই কারণে তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার স্থাপনে আপত্তি জানালেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি এক প্রবন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় লিখলেন— a theatre among the Hindoos, with the degree of knowledge they at present possess will be like building a palace in the waste ' তাঁর পরামর্শ ছিল ভিন্নরূপ—"we recommend our Hindoo patriots and philanthropists to instruct their countrymen, by means of schools ; and when they are fitted to appreciate the dramatic compositions of refined nation, it will be quite time enough to erect a theatre.' কারণ তাঁর বক্তব্য হোল' useful knowledge should precede amusement"৬৪

নাটক ও নাট্যশালার ব্যাপারে ডিরোজিয়ো আদৌ স্পর্শকাতর বা নীতি-বাগীশ ছিলেন না। ড্রামণ্ড সাহেবের ধর্মতলা একাডেমির ১৮২২/১৮২৩ সালের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে যে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল, তাতে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং ঐ নাট্যাভিনয় থেকেই তিনি মিঃ উইলসনের দৃষ্টিপথে পড়েন, যার ফলে তাঁর হিন্দু কলেজে শিক্ষকতায় যোগদান। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মার্চেণ্ট অব ভেনিসে' শাইলকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। দ্বিতীয় বৎসর 'ডগলাস' নামক ট্রাজেডিতে তিনি অবতীর্ণ হন। যথেষ্ট প্রশংসাভাগী হন।

তিনি এযুগের প্রয়োজনবাদী জীবননীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন ; বিশ্বাসী ছিলেন হিতবাদে। তাই জাতির প্রাথমিক প্রয়োজনই তাঁর কাছে প্রথম প্রয়োজন হয়ে দেখা দিল। অবশ্য এই ব্যাপারে তার প্রিয় ছাত্রদের সঙ্গেই তার মতবিরোধ হোল। মতবিরোধ সর্বক্ষেত্রেই শত্রুতাবোধক নয়, হিন্দু থিয়েটারের কার্যনির্বাহক কমিটিতে হরচন্দ্র ঘোষ, ও মাধবচন্দ্র মল্লিক স্থান পেলেন ; বা স্বেচ্ছায় যোগ দিলেন।

জাতীয় উন্নতির জন্য তাঁর ছাত্রেরা যখন যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, ডিরোজিয়ো সর্বদাই তার প্রচণ্ড উৎসাহদাতা ছিলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে জাতি বলতে তিনি কি বুঝতেন ? ভারতবর্ষ কি শুধু হিন্দুর ? মুসলমান কি অবাঞ্ছিত ? ইউরেশীয়দের স্বদেশ বা স্বভূমি কোনটি ?

ডিরোজিয়ো কবিতা লিখে প্রবন্ধ লিখে সভা সমিতিতে বক্তৃতা করে, এবং সংস্থবিশেষের অনুষ্ঠান পত্র (Prospectus) রচনা করে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

To, My Native Land এবং Harp of India ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত। Harp of India ১৮২৭ সালে প্রকাশিত তার প্রথম কবিতা সংকলনের মুখবন্ধে স্থান পেয়েছিল। To my Native Land স্থান পেয়ে ছিল The Faqueer of Jughiera-এ কাব্য গ্রন্থের মুখবন্ধে।* তখন সাহেব সুবোদের উন্নতনাসিকারযুগ ; নানা সুযোগ সুবিধা তাঁরা পেয়ে থাকেন ; অবশিষ্ট সুযোগ সুবিধার জন্য আন্দোলন করছেন—যেমন এদেশে অবাধ বসবাস ও ভূ-সম্পত্তি ক্রয়। আইন-আদালত তাদের জন্য পৃথক; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পৃথক চাই। ইংরেজ পরিচালিত কোন কোন বিদ্যালয়ে দেশীয় ছাত্রদের প্রবেশাধিকার অস্বীকৃত ছিল। এই পরিবেশে ডিরোজিয়োর শিক্ষাগুরু ড্রামণ্ড সাহেব পরিচালিত ধর্মতলা একাডেমিতে সর্বজাতির সর্ব বর্ণের প্রবেশাধিকার ছিল। এই নাতিস্বাতন্ত্র্য ডিরোজিয়োর অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করল। ঐ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় বিবরণী লিখতে গিয়ে তিনি কয়েকটি মৌলিক নীতি ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর মধ্যে হিন্দু ছাত্র ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের একত্রে পড়াশুনা তিনি খুব সমর্থন জাগালেন। এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ানদের সতর্ক করে দিলেন যে, তাঁরা যেন আর শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি না করেন।

এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠার উপযোগী বাস্তব পরিবেশ পূর্বেই উদ্ভূত হয়েছে। ইউরোপীয়দের দায়িত্বশীল সরকারী চাকরীতে প্রবেশ নেই, নৌ বহরে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল এ সব 'হিতকর' কাজ করেছিলেন কর্ণওয়ালিশ। উদ্ধৃত প্রবন্ধ রচনার দুই বৎসর পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান বা ইউরোপীয়দের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ হয়। ডিরোজিয়োর বন্ধু রিকেটস বিলেত গিয়ে-

---

* বিনয় ঘোষ লিখেছেন, ডিরোজিয়োর নিজের সংকলনে **The Harp of India** প্রথম কবিতা রূপে স্থান পেয়েছে। ব্রাডলে বার্ট সম্পাদিত ডিরোজিওর কাব্য সংকলনে **(Poems of Henry Louis Vivian Derozio A Forgotten Anglo Indian Poet, Oxferd university press 1923)** এই কবিতাটির পরে **'To India, My Native Land'** কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছে। ব্রাডলে বার্ট তাঁর সংকলনের ভূমিকায় ডিরোজিওর কবিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করেন নি। তাঁর সংকলন থেকে ডিরোজিওর নিজের সংকলনের কিছু কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছে।" (পৃ—১২৫)

বিনয় ঘোষ জানেন না যে, ডিরোজিওর কাব্য সংকলন দুইটি। প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয় ১৮২৭ সনে, তার প্রথম কবিতা, **The Harp of India** ; দ্বিতীয় সংকলন ১৮২৮ সনে তার ভূমিকায় ছিল **'To India, My Native land.'** ব্রাডলে বার্ট উভয় কাব্যের কবিতা নিয়ে একটি সংকলন করেছেন কাজেই প্রথম সংকলনের কিছু বাদ যাবেই।

ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়ানদের বক্তব্য যথাযোগ্য স্থানে পরিবেশন করার জন্য। কিন্তু ফল নাস্তি। তখন টাউন হলে সভা হোল; সংঘ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হোল। সমাজের নাম কি হবে তাই নিয়ে বিতর্ক হোল। কুড়ি বৎসরের সেই অত্যাশ্চর্য যুবকটি শেষ সিদ্ধান্ত দাখিল করেছিলেন—সমাজের নাম ইউরেশিয়ান হবে, না ইষ্ট ই'ণ্ডয়ান হবে এই সম্পর্কে। এমন কি, তখন তিনি শিক্ষাগুরু ড্রামণ্ডের বিরোধিতা করতেও ইতস্তত করেননি। এই সভায় তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা স্মরণীয়। এই বক্তৃতার অ-সাম্প্রদায়িক সুর সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই বিস্ময়কর।

The admission of East Indians to certain rights do not preclude the possibility of other classes of the population also securing for themselves the privileges to which they are entitled. If the East Indians were permitted to enjoy all privileges they now seek, it would be impossible to withhold the claims of others. The enemies have tried to set both the Europeans and the native community against them by saying that they seek exclusive privileges, well knowing that if they once enter the breach, these will be many to follow."৬৭

এই সমিতির যে ইস্তাহার বা অনুষ্ঠানপত্র (Prospectus) রচিত হোল, তার বুকের মধ্যেই এই স্বরও ধ্বনিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানপত্রের রচয়িতা কে, এ সংবাদ আজ অন্ধকারের গর্ভেই থাক। তবে এর বক্তব্যে ডিরোজিয়োর আন্তরিক সমর্থন আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথমে লর্ড বেকনের সেই অতিখ্যাত রচনটি (প্রবচনও বলা যায়) উদ্ধৃত করা হয়েছে — Knowledge is power—জ্ঞানই শক্তি।

তারপর জাতীয় জীবনের প্রসঙ্গ স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হোল, শুধু ইষ্ট ইণ্ডিয়ানদের প্রসঙ্গ নয়।

Nothing has of late excited more attention, from persons of all description, than the condition and prospects of the inhabitants of India. The subject was little considered a few years ago; but from various circumstances, it has now acqui-

red so much importance, that there seems to be but one opinion on the point—that the situation of the people of India may be, and requires to be improved. The apathy formerly so general, is rapidly giving place to a lively concern for promoting the true welfare of the people, on the broadest and most solid basis."৬৮

ডিরোজিয়ো এই সংগ্রামে জয়লাভের জন্য ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার কথা বলেছেন।

All the zeal of a will force would have been employed in vain, of the abolition of slavery had depended upon his individual exertions."৬৯

তাই গড়ে তুলতে হবে সংগঠন। কিন্তু তাই বলে এই সংগঠন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সংগঠন মাত্র হবে না।

"It will not be supposed however, that because the chief object of the society will be welfare of East Indians, there will be any display of illiberality towards other classes of community. So far from it, that it is specially intended to extend the benefits of the institution to other portions of the inhabitants of this country, consistently with the greater wants of the East Indians and their consequent stronger claims upon its attention."৭০

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান নামে তিনি এক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন; তার জন্য যে ইস্তাহার তিনি প্রচার করেন তাতে স্পষ্ট ভাষায় জানালেন— To prevent any misconception to which the name of the paper may give rise the proprietor begs to state that his journal will not be exclusively devoted to any particular interest, but that it will advocate the just rights of all classes of the community."৭১

ট্যাশ ফিরিঙ্গী ঘরের বিংশতিবর্ষীয় যুবা সর্ব সম্প্রদায়ের সম অধিকারের কথা বললেন। ঈশ্বর অনুভবের কথা নয়। ব্যবহারিক জীবনের এই মিলনের বাসনার তাৎপর্য আছে। অন্ততঃ উনিশ শতকের প্রারম্ভে জীবনের অনেক প্রধান অঞ্চলে

ধর্মনির্ভরতা হ্রাস পাচ্ছে, সংবাদ হিসাবে তার মূল্য অপরিসীম।

॥ ১০ ॥

তাঁর জীবিত কালেই রামমোহন অনুগামীদের সঙ্গে তাঁর ছাত্রদের প্রচণ্ড বিতর্ক শুরু হয়। মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের এই বিরোধে তিনি যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার অনুসন্ধান আজ পর্যন্ত কেউ করেন নি। ডিরোজিয়ো ও ডিরোজিয়োপন্থীরা, সর্বদাই একইপ্রকার সংযম ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন নি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শিষ্যদের বাড়াবাড়ি গুরুর ওপর আরোপিত হয়েছে।

'এনকোয়ারার' কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহত্যাগ প্রসঙ্গে যে বিবরণী দাখিল করে, ইণ্ডিয়া গেজেট তার সত্যতা স্বীকার ক'রে কিছু সমালোচনা করে। অবশ্য সে সমালোচনা ছিল বান্ধবোচিত।

ঠিক পরের সপ্তাহে ইণ্ডিয়া গেজেটের এই মন্তব্য সম্বন্ধে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ানে' ডিরোজিয়ো একটি প্রবন্ধ লেখেন। বেঙ্গল ক্রনিকলের সম্পাদকীয় দপ্তরের সঙ্গে ডিরো-জিয়ো যুক্ত ছিলেন; এই প্রবন্ধটি তাই ক্রনিকলে উদ্ধৃত হয়। এই প্রবন্ধের ভাষা ও যুক্তির মধ্যে ডিরোজিয়োর ভাষার যুক্তিমুখীনতা ও আবেগময়তা স্পষ্ট দেখা যায়।

ইণ্ডিয়া গেজেটে চরমপন্থীদের (ultras) সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এরকম বান্ধবোচিত সমালোচনা থাকত। একবার এই প্রকার সমালোচনার রেশ ধরে ডিরোজিয়ো তাঁর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় পুনরায় লিখলেন যে ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক কেবলই চাইছেন যে, চরমপন্থীরা আরো সংযত হোক, বিরুদ্ধবাদীদের সম্বন্ধে আরও উদার হোক। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান লিখল আমরাও তাই চাই। তবে নব্যদের সম্বন্ধে তাঁরা আর একটু সহনশীল হতে পারতেন। নব্যদের আমরাও সংযত হতে বলি "for violence is not proof of right."

॥ ১১ ॥

ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ; তিনি খৃষ্টীয় মিশনারীদের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা সমর্থন করেন নি; তিনি রামমোহনের তত্ত্ব জিজ্ঞাসারও সমর্থক ছিলেন না। তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন বললে সবটুকু বলা হয় না। তিনি

ছিলেন সত্যের দিশারী—সত্যের পূজারী। কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, তিনি নাকি হিন্দু ছাত্রদের হিন্দুধর্মের উপর আস্থাশূন্য করে ধীরে ধীরে খৃষ্টীয় ধর্মের দিকেই টেনে নিয়ে চলেছিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষায় ধর্মজিজ্ঞাসার স্থান ছিল না; এই কারণে রাজা রামমোহন রায় থেকে পাদরী ডাফ হিন্দু কলেজের শিক্ষার প্রতি অতিশয় বিরূপ ছিলেন। হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র Polytheist থেকে Diest, এবং Deist থেকে Atheist হয়েছে শুনে রামমোহন বলেছিলেন "শেষে বোধ হয় Beast হইবে"—এ গল্প শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের শুনিয়েছেন।৭২

হিন্দু কলেজের ছাত্ররা উপবীত ধারণ করতে অস্বীকার করেছিল, রামমোহনের মৃত্যুকালেও দেহে যজ্ঞোপবীত ছিল (সে মৃত্যু বিলেতে ঘটে), ছাত্ররা পৈতার পর গায়ত্রী মন্ত্র নয়, ইলিয়াদের অংশ বিশেষ আবৃত্তি করত। রামমোহন গায়ত্রীর নবীনতর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন; ছাত্ররা কালীঘাটে গিয়ে "Good Morning Madam' বলেছিল। তিনিও প্রিন্স দ্বারকানাথের বাড়ীর, দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ গ্রহণে নিমরাজি হয়েছিলেন। পৌত্তলিকতা না মানা আর ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ—এক নয়। 'ক্যালকাটা রিভিউ'এর প্রবন্ধলেখক ডিরোজিয়োর সঙ্গে অন্যান্যদের এক করে দেখেন নি।

রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্টকে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে যে চিঠি লিখেছিলেন, ঐতিহাসিকেরা তার প্রচুর সুখ্যাতি করেছেন। কিন্তু ঐ চিঠিতেই তিনি চেয়ে ছিলেন 'enlightened system of education' তাঁর প্রস্তাবিত পাঠ্য তালিকার মধ্যে 'Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences' ছিল, ধর্ম-শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। অথচ তিনিই ডাফ সাহেব এলে তাঁর স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য বাড়ী খুঁজে দিয়েছিলেন। ডাফ সাহেব হিন্দু কলেজের শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে বলেছিলেন—"the very ideal of a system of education without religion."৭৩

ধর্মহীন শিক্ষা থেকে খৃষ্টীয় মিশনারীর শিক্ষা ভাল—এই মত আমহার্ষ্টকে লিখিত পত্রের বক্তব্যের সঙ্গে মেলে না।

ডিরোজিয়ো সংস্কৃত শিক্ষার বিকল্প খৃষ্টীয় শিক্ষা মনে করতেন না। উইলসনকে তাঁর সেই বিখ্যাত চিঠিতে তিনি বলেছিলেন--ছাত্রদের দার্শনিক হিউমের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।

হিউম কি বলেছেন, তা হিউমের মুখ থেকেই শোনা যাক।

যেখানে যুক্তিবাদিতা নেই, প্রয়োগসাপেক্ষ যুক্তিবাদ নেই তার জন্য ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন—"Comit it then to the flames for it can contain nothing but sophistry and Musion."৭৪

হিউমের এই উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্য স্বভাবতই রীড ও ষ্টুয়ার্টের বক্তব্য অপেক্ষা অধিকতর মনোলোভন হয়েছিল নবীন ছাত্রদের। ঠিক একই করণে লক অপেক্ষা টমাস পেইন অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। লক কথা বলেছিলেন ন্যায়ের ছাত্রের মত শান্ত কণ্ঠে। পেইন সেখানে দুন্দুভি নিনাদিত করেছেন। স্বভাবতই লককে মানলেও এবং জীবনের মৌলিক উপাদান মনে করলেও পেইন্ অধিকতর আকর্ষণীয় হয়েছে। সে যুগ ছিল উত্তেজনার যুগ, প্রমত্ততার যুগ, কল কোলাহলের যুগ—পেইন এবং হিউম এর বাচনভঙ্গির সঙ্গে তাই সে যুগের দারুণ ঐক্য ঘটে গেছে।

পূর্বেই বলেছি ডিরোজিয়ো মৌলিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন না, দার্শনিক ছিলেন না। তিনি যুগের বাঞ্ছিত দার্শনিকদের ব্যাখ্যাকারী ছিলেন।

এ বিষয়ে তাঁর যে প্রবল আগ্রহ ছিল, তার পরিচয় দুটি রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ফরাসী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক M. Maupertins লিখিত "On Moral" প্রবন্ধটি মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ করেছিলেন। প্রথম পরিচ্ছেদে সুখ কি এবং দুঃখ কি' তা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে—অসৎ কাজের পরিমাণ সৎকাজ অপেক্ষা সচরাচর বহুগুণ বেশী হয়ে পড়ে কেন? তৃতীয় পরিচ্ছেদে আনন্দ ও বেদনাবোধের প্রকৃতি ও পারস্পরিক সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।৭৫

Maupertins ছিলেন Encyclopaedist দার্শনিকদের সহগামী। কাজেই তাঁর বক্তব্যে লকব্যাখ্যাত যুক্তিধারার অনুসরণ দেখা যায়। তাঁর লেখা একটি মাত্র মৌলিক দার্শনিক প্রবন্ধের প্রসঙ্গ আমরা বহুজনের লেখায় উল্লিখিত দেখেছি। জীবনীকার এডওয়ার্ডস ঐ প্রবন্ধটির জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েও সুফল পান নি। বিশপস কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ ডক্টর মিলস বলেছিলেন, ডিরোজিয়োর লেখা কাণ্ট-সমালোচনা যে কোন নামী দার্শনিকেরও সাধনার বস্তু হতে পারে।

ডিরোজিয়ো ছিলেন সর্বতোভাবে আধুনিক, এবং বিজ্ঞানের শক্তিতে আস্থাবান। মানব প্রগতিতে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিনি যুগের উৎকণ্ঠার দ্বারাই চালিত হয়েছেন।

Thermopylae, Freedom to the slaves, Greece, The Greeks at Marathon, The Deserted Girl, The New Attantis, Hope, এবং To the Students of the Hindoo College.

তিনি প্রকৃতি-প্রেমিক ছিলেন; কিন্তু মানব প্রেমিক, অধিকতর। তিনি জ্ঞানের সন্ধানী ছিলেন, কিন্তু সে জ্ঞান মানবমুক্তির জ্ঞান। তাই মৃত্যুর সাত দিন পূর্বেও এক স্কুলের বার্ষিক উৎসবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলেন যে, তিনি সপ্তাহে একদিন করে আইন, (law) রাজনৈতিক অর্থবিদ্যার (Political Economy) ক্লাস নেবেন।[১৩]

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়া গেজেট তাঁর সম্বন্ধে যা লিখেছে, সে-ই কথাই তাঁর সম্বন্ধে যথার্থ কথা।

"His praise consists in his having done that well to which he was appointed, and having entered heartily and zealously into that which others would have regarded as the mere routine of duty."[১৫]

এ কর্তব্যবোধ স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে গভীর ভালবাসা থেকে এসেছে।

ডিরোজিয়ো মৃত্যুকালে বাইবেলের বচন আবৃত্তি করেন নি; তিনি শুনতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্রের মুখ থেকে ক্যাম্পবেলের সেই বিখ্যাত কবিতাটি। ধর্মতলা একাডেমির বার্ষিক উৎসব পর্য্যালোচনা ছলে তিনি লিখেছিলেন –

"When a Hindoo casts off all appearance of Hindoo religious observance the majority of his countrymen naturally consider that person as an outcast. He is no longer a Hindoo. What then is he? He replies—a lover of Truth."[১৬]

ছাত্রদের পরবর্তী আচরণ নিশ্চয়ই ডিরোজিয়ো নিরূপণ করতে পারেন না! মধ্যবিত্তের বহু বৈপ্লবিক ভাবাদর্শের কী ভয়াবহ পরিণতি ঘটে, ইতিহাসে সে-উদাহরণের অপ্রতুলতা নেই। ফরাসী প্রজাতন্ত্রবাদের অধঃপতন সবারই জানা। কাজেই ডিরোজিয়ো শিষ্যদের কারো কারো অধঃপতন বা পথ পরিবর্তন বা 'উন্নতি' মধ্যবিত্ত জীবনের কথাসরিৎসাগর বলেই সন্তুষ্ট হতে হবে। ডিরোজিয়ো শেষ পর্যন্তও যুক্তবাদী ও সত্যসন্ধ।

॥ পাদটীকা ॥

১. John Bull, 18 January 1831.

২. Bengal Hurkara, 23 April, 1789

৩. H. H. Wilson's report on Education of 1828.

৪. ঐ

৫. An Address to Parliament on the Duties of Great Britain to India—Charles Cameron. London. Longman, Brown, Green and Longman 1853, P. 153

৬. John Bull, 25 Jan, 1824

৭. John Bull, 18 Jan, 1828

৮. Lushington—Religious Institutions, Benevolent Institutions etc. 1824 P. 182

৯. John Bull 26 Jan, 1825

১০. John Bull, 18 Jan, 1826

১১. Calcutta Gazette, Jan. 20, 1827

১২. Calcutta Gazette, Jan 24, 1828

১৩. ঐ

১৪. ঐ

১৫. John Bull, Jan 18, 1828

১৬ ক. John Bull, July 2, 1830

১৬. John Bull, Feb 19, 1829

১৬. ক ঐ

১৭. Calcutta Gazette, Feb 14, 1831

১৮. Bengal Harkara, Oct 20, 1824.
"I consider the formation of a society in Calcutta is a desideratum."

১৮ ক. David Hare Pearychand Mittra 1877

১৯. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তদকালীন বঙ্গসমাজ। নিউ এজ সংস্করণ

পৃষ্ঠা ১৪৩.

২০. Calcutta Courier June 5, 1839.

২১. India Gazette—Quoted in John Bull December 11, 1830

২২. India and India Missions-Alexander Duff. P. 614—615

২৩. ঐ

২৪. Life of Rev. Alexander Duff-George Smith 1879. P. 150

২৫. Thomas Edwards — Henry Derozio, the Euresian peot, Teacher and Journalist. Calcutta 1884 Chapter—VI

২৬. ঐ

২৬. ক Recollections of Rev. Alexander Duff — Lalbehari De

২৬. খ সমাচার চন্দ্রিকা—১৩ মার্চ, ১৮৩০

২৬ গ John Bull, Dec 11, 1830

২৬. ঘ Bengal Spectator, vol I. No 7

২৭. India Gazette, Feb 17, 1830

২৮. Sir Edward Ryan's letter to Lord Willam Bentinck. 16 June 1831. Bentinck Papers. India Office Library.

২৯. Bengal obituary. Holmes & Co 1848

৩০. India and India missions—Alexander Duff. P. 615

৩১ Enquirer, 6 Sept, 1831

৩২. ঐ

৩৩. সম্বাদ কৌমুদী, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮০১

৩৪ ক. যোগেশচন্দ্র বাগল স্মারক গ্রন্থ—জ্ঞানান্বেষণ—সুরেশচন্দ্র মৈত্র।

৩৪ খ. Calcutta Gazette, 4 Dec, 1790.

৩৫. The Works of Jeremy Bentham—J. Bowring (edited). 1843. vol X P 571

৩৬ Lushington—P 182

৩৭. ঐ P 222—23

৩৮. Bishop Heber's letter to Wilnot Horton. Dec, 1823

৩৯. Good old Days of Honble John Company—W H Cacy

৪০. শাস্ত্রী—পৃ. ১২৩
৪১. ঐ পৃষ্ঠা ১৩৫
৪২. ঐ পৃঃ
৪৩. ঐ, পৃ – ১২১
৪৪. Asiatic Journal, May, Augst, 1835. Quoted from Bengal Hurkara.
৪৫. উইলসনকে লিখিত ডিরোজিও পত্র ২৫ এপ্রিল, ১৮৩১।
৪৬. Edwards—Chapter VI
৪৭. Enquirer, 1831
৪৮. উইলসনকে লিখিত ডিরোজিয়োর পূর্ব্বোল্লিখিত পত্র।
৪৮ ক. ঐ
৪৯. ঐ
৫০ The College & Its Founder—Kissory Chandra Mittra
৫১. Bengal Renaissance and Other Essays—Sushobhan Sarkar 1970
৫২. মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত — নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪র্থ সংস্করণ পৃ. ৩৬৮
৫৩ India Gazette, Aug 8, 1831
৫৪. Enquirer, 1831
৫৫. Enquirer, 1831
৫৬. East Indian, 15 oct, 1831
৫৭. ঐ
৫৮. India Gazette, 21 oct, 1831
৫৯. ঐ
৬০. India Gazette, 20 oct, 1831
৬১. East Indian, 25 Oct 1831
৬২. ঐ
৬৪. ঐ
৬৪. ঐ 14 Sept, 1831

৬৭. East Indian 17 Dec. 1831
৬৮. ঐ
৬৯. ঐ
৭০. ঐ
৭১. ঐ
৭২. শাস্ত্রী—পৃঃ ৮০
৭৩. India and India missions—Duff P 654
৭৪. ঐ
৭৫. India Gazette—13 Feb, 1832
৭৬. Government Gazette—12 Dec, 1831

বিদ্যাসাগর-স্মারক-গ্রন্থ

প্রসঙ্গ কথা/বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ/উৎপল চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের দেড়শতম জন্মবার্ষিকীর সময়। উদ্দেশ্য ছিল (সমিতির স্মারকলিপি অনুসারে) :

পশ্চিম বাংলায় মেদিনীপুর শহরে বঙ্গ চর্চার একটি কেন্দ্র গড়ে তোলা

এই কেন্দ্রে বাঙালীর জীবন এবং সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা

বাঙালী সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান

বাঙালী সংস্কৃতির চর্চায় রত বিভিন্ন গবেষকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা

বিভিন্ন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, ইতিহাস ও সংস্কৃতির নজির স্বরূপ বিভিন্ন বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, এবং সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা

বিভিন্ন আদিবাসী সমাজ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে চর্চা করা

বাঙালী প্রতিভার পরিচায়ক স্বরূপ বিভিন্ন শিল্পকলা এবং সাহিত্যসৃষ্টিকে উৎসাহ দেওয়া

ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এবং ভারতের বাইরে বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রচার করা

গ্রন্থ, পুস্তিকা, সাময়িকী প্রভৃতি প্রকাশ করা

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা

উপরোক্ত ধরণের প্রচেষ্টা সমূহের দ্বারা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বহন করা

বাংলাভাষাকে জ্ঞানচর্চার উপযোগী ক'রে গড়ে তোলা এবং ব্যাপকঅর্থে বাঙালী সমাজের বিকাশ সাধনই ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের চরম লক্ষ্য। তাঁর জন্মের দেড়শ বছর পরেও কিন্তু তাঁর আরব্ধ কাজ খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়নি; তাই নতুন উদ্যমে সেই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আজ বড় বেশি ক'রে দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতা নিয়েও যদি এই কাজে নামা যায়, এক সময় না এক সময় আরও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই কাজে আগ্রহ অনুভব ক'রতে শুরু ক'রবেন এবং ফলে ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগরের আরব্ধ কাজ সত্যিসত্যিই এগিয়ে যাবে। মোটামুটি এই ধরণের চিন্তাধারাই বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রেরণা জুগিয়েছিল। উদ্যোক্তারা জানতেন তাঁদের ক্ষমতা খুবই সীমিত; কিন্তু সেই সীমিত ক্ষমতা নিয়েই যতদূর সম্ভব কাজ শুরু করা যাক, এটাই ছিল তাঁদের বাসনা। তাই শুধুমাত্র ফুল বেলপাতা পূজোআচ্চার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের দেড়শতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন শেষ না ক'রে তাঁরা এই পথ ধরেছিলেন।

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ প্রথমেই বিদ্যাসাগরের দেড়শতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংগ হিসেবে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের প্রচেষ্টা চালান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য স্বতন্ত্র ভূমিকায় নিবেদন করা হয়েছে। বর্তমানে শুধু এইটুকু ব'ললেই যথেষ্ট হবে যে, এই স্মারকগ্রন্থের কাজে বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজের কর্মীদের সীমিত সামর্থ্যের প্রায় সবটুকু নিয়োজিত হওয়ায়, তাঁদের পক্ষে অন্যান্য কাজ কর্ম আর বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তা সত্বেও বিদ্যাসাগরের দেড়শ তম জন্মবার্ষিকীতে তিনটি বিশেষ বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম সভাটিতে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করেন মেদিনীপুর কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার প্রতিহার। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি প্রদান করেন তরুণ গবেষক পাঁশকুড়া বনমালী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী। তিনি বহু উদ্ধৃতির সাহায্যে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির বিকাশের ধারাটি সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করেন। তৃতীয় বক্তৃতাটির বিষয় ছিল 'বর্ণ পরিচয়'। এই বক্তৃতায় 'বর্ণ পরিচয়ে'র গঠন ও পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করেন মেদিনীপুর কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডঃ অনিমেষকান্তি পাল।

(এর পর উল্লেখযোগ্য আরও দুটি প্রবন্ধসভার আয়োজন সম্ভব হ'য়েছিল। প্রথমটির বিষয় ছিল সিন্ধুলিপি। বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট সিন্ধুলিপিবিদ শ্রীসুধাংশু কুমার রায়। স্লাইড সহযোগে দেওয়া এই বক্তৃতায় শ্রীরায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে সিন্ধুলিপি চিত্রধর্মী অধিকাংশ য়োরোপীয় প্রাচ্যবিশারদদের এই ধারণা ভুল; বরং এইলিপির পূর্ণাংগ রূপকে ধ্বনিধর্মী মনে করার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।) প্রথমদিকের সীলগুলিকে চিত্রধর্মী মনে করার যাও বা অবকাশ থাকে, পরের গুলির ক্ষেত্রে তাও আর দেখা যায় না। সীলগুলির স্লাইড কালানুক্রমে সাজিয়ে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেন কিভাবে প্রাথমিক চিত্রধর্মিতা কাটিয়ে সিন্ধুলিপি বিকশিত হ'য়ে পুরোপুরি ধ্বনিধর্মী হ'য়ে উঠছে। শুধু ধ্বনিধর্মী হ'য়ে উঠছে তাই নয়, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির লিখিতরূপে ব্যবহৃত বিভিন্ন স্বরমাত্রারও আদি উৎস সিন্ধুলিপির এই বিকশিত রূপের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এছাড়া আরও রয়েছে যুক্তবর্ণের প্রয়োগ।

(দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সভাটির বক্তা ছিলেন রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে বিশিষ্ট বিশারদ শ্রীদিলীপ বিশ্বাস। বিষয় ছিল রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও পরবর্তীকালে তাঁর প্রভাব।) এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ধ'রে ধ'রে রামমোহনের অবদান ঠিক কতটা তা যাচাই করার সাম্প্রতিক প্রবণতাকে তিনি বিভ্রান্তিকর বলে মনে করেন। শ্রীবিশ্বাস বলেন, এভাবে রামমোহনের বিরাট ব্যক্তিত্ব পরবর্তীকালের ওপর কি গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। রামমোহনের প্রভাবের ব্যাপকতা ঠিক ততটা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিকশিত হ'য়ে ওঠার ক্ষেত্রে নয়, যতটা পরবর্তীকালের তরুণ সমাজের চেতনার রাজ্যে। যার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষিদের অকপট স্বীকারোক্তির মধ্যে।

আমাদের প্রতিটি সভায় আমরা উপস্থিত বিদগ্ধ ব্যক্তিবৃন্দকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ ক'রতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। বহুক্ষেত্রেই তাঁরা তা করায় আমাদের সভাগুলিকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে পারায় আমরা বিভিন্ন বক্তাদের মত এঁদের কাছেও ঋণী। আমরা আশা ক'রি ভবিষ্যতেও আমরা স্থানীয় এই বিদগ্ধ সমাজের সহযোগিতা পাব।

বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজের প্রথম সভাপতি হন ডঃ শ্যামাপদ পাল। সভাপতি হওয়ার পর থেকে আজ অবধি সমিতির প্রতিটি কাজকর্মে তিনি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা ক'রেছেন। সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং সমিতির প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজকর্মে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে বর্তমান সভাপতি ডঃ অনিমেষকান্তি পালের

আগ্রহও অপরিসীম। সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে সদস্যদ্বয় শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য ও শ্রীতরুণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদানও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। স্মারকগ্রন্থের দায়িত্বে নিযুক্ত সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিটি ব্যক্তিই এব্যাপারে তাঁদের যথাসাধ্য ক'রেছেন। তবে এক্ষেত্রে মুখ্য দায়িত্ব বহন করেছেন সদস্য শ্রীআজহারউদ্দীন খান্। যোগাযোগ ও প্রচারের ক্ষেত্রে অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন সদস্য শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়। একাধিক লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ ও রচনা সংগ্রহ কার্যে বর্তমান যুগ্ম সম্পাদক ডঃ বিষ্ণু বসুর ভূমিকাও যথেষ্ট। সভা-সমিতি আয়োজনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন সদস্য শ্রীনিশিকান্ত মাইতি। সমিতির হিসেবপত্র সঠিকভাবে রক্ষা করার দায়িত্ব বহন ক'রেছেন সদস্য শ্রীসুনীল ঘোষ। সমিতির প্রথম মহিলা সদস্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ও প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। এঁরা সবাই সক্রিয়ভাবে এভাবে কাজ না করলে সমিতির কাজকর্ম চালানো অসম্ভব হ'ত।

লেখকপরিচিতি

অনিমেষ পাল ॥ বাংলা ওড়িয়ার সীমারেখা, পৃ ৫১১—৫২৪

জন্ম : ১৯৩৪, পাঁচদোনা, ঢাকা, বাংলাদেশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পি-এইচ ডি। মেদিনীপুর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। ভাষাতত্ত্ব লোক-সংস্কৃতির উপর গবেষণা-ধর্মী প্রবন্ধাদি পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন, অবসর সময়ে বিদেশী ভাষা পড়ান। ঠিকানা : মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ॥ প্রথম ভাগের নব রূপায়ণ : একটি প্রস্তাব, পৃ ৩১৬-৩২৭

জন্ম ১৯৩৫, কোননগর, হুগলী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এম, এ। সরকারী প্রচার বিভাগে কর্মরত। ঠিকানা : ১৯, শিববাটী লেন, কোন্নগর, হুগলী।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন ? পৃ ৩০১—৩১৫

জন্ম : ৩রা জুন ১৯২০ নকফুল, যশোহর, ২৪ পরগণা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বাংলায় এম, এ ও ডি-ফিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের ইউ, জি, সি, অধ্যাপক এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ। গ্রন্থ : প্রাচীন বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১—৪), সমালোচনার কথা, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, উনিশ বিশ, রৈবতক

কুরুক্ষেত্র-প্রভাস (সম্পাদিত) প্যারীচাঁদ গ্রন্থাবলী (সম্পাদিত)। ঠিকানা: ১৪/২, ভট্টাচার্য পাড়া লেন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া ৪।

আজহারউদ্দীন খান্‌॥ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, পৃ ৫৪৪—৫৫৯

জন্ম: জানুয়ারী ১, ১৯৩০ মীরবাজার, মেদিনীপুর শহর। কলেজ জীবনের পর গ্রন্থাগার বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত। পেশা গ্রন্থাগার বৃত্তি। গ্রন্থ: বাংলা সাহিত্যে নজরুল, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল, বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ আবদুল হাই বিলুপ্ত হৃদয় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ (সম্পাদিত। ভূমিকা ডঃ ভবতোষ দত্ত), বঙ্গরঙ্গমঞ্চ শতবর্ষপূর্তি স্মারক-গ্রন্থ (সম্পাদিত)। ঠিকানা: 'সুদীপা' হবিবপুর বড়আস্তানা, মেদিনীপুর।

আহমদ শরীফ॥ একখানি বিশিষ্ট পুথি: শেখ শাদী বিরচিত গদা-মালিকা সম্বাদ, পৃ ১০৩—১১৬।

জন্ম: ১৩, ফেব্রুয়ারী ১৯২১ সুচক্রীদণ্ডী, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পি, এইচ, ডি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রফেসর ডীন কলা অনুষঙ্গ। গবেষণা ক্ষেত্র: মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য। সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ: বিচিত্র চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, স্বদেশ অন্বেষা, জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে, যুগ-যন্ত্রণা। গবেষণামূলক সম্পাদিত গ্রন্থ: দৌলত উজির বাহরাম খানের লায়লী মজনু, শাহবারিদ খানের গ্রন্থাবলী, আলাউলের তোহফা, সিকান্দরনামা রাগতালন্যমা ও পদাবলী, বিভিন্ন সঙ্গীতবিদের মধ্যযুগের রাগতালনামা, মুহম্মদ খানের 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ' মুসলিম কবি রচিত পদ সাহিত্য, চট্টগ্রামের হিন্দু কবির পদ সাহিত্য, মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ব্যাড়ী ভক্তিতরঙ্গিনী, কবীরের মধুমালতী, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি পরিচিতি, বাঙলার সুফী সাহিত্য, বাউল তত্ত্ব, নসিয়তনামা, সৈয়দ সুলতান—তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ প্রভৃতি প্রায় পঁচিশখানা গ্রন্থ। ঠিকানা: ৩৭ সি, ফুলার রোড, ঢাকা ২।

উৎপল চট্টোপাধ্যায়॥ বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ, পৃ ৬২৫—৬২৮

জন্ম: ১লা ডিসেম্বর ১৯৩৮, কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীতে এম, এ। রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন মহিলা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। ঠিকানা: সোগাস কম্পাউণ্ড, মেদিনীপুর।

কামিনীকুমার রায়॥ বাংলা ভাষায় শব্দবৈচিত্র্য, পৃ, ১৫৮—১৬৯

জন্ম: ১৯০৫, বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ বি, এ এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যে এম, এ—শেষোক্ত পরীক্ষায় ব্রহ্মময়ী স্বর্ণপদক, স্যার আশুতোষ পদক ও রমাইচন্দ্র মিত্র পুরস্কার লাভ। দৈনিক বঙ্গবাণীতে সাংবাদিকরূপে পরে

জীবনবীমার প্রচার বিভাগে চাকরী। 'লৌকিক শব্দকোষ' ১ম ও ২য় খণ্ড গ্রন্থটির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধিলাভ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, Central Institute of Indian Languages প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত। ঠিকানা : 'লোকভারতী,' ৫/১, হরিদেবপুর রোড, কলিকাতা ৪১।

কৃষ্ণা সোম ॥ বাংলা কবিতায় প্রেমবোধের রূপান্তর, পৃ ২৬৮—২৭৯

জন্ম : শ্রাবণ ২৫, ১৩৩৮ ফেনী, নোয়াখালী, বাংলাদেশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ ও পি, জি, বি, টি। বর্তমানে কেলেমাল বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। কবি ও প্রবন্ধকার হিসেবে সুখ্যাত। গ্রন্থ : অঙ্কুরের মুখ, আলো অন্ধকার, পৌষপার্বণ, সোনায় সবুজে। ঠিকানা : বিরাটী, কলিকাতা ৫১।

ক্ষেত্র গুপ্ত ॥ মৃত্যুঞ্জয় থেকে বিদ্যাসাগর : বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা, পৃ ৫৯—৭৬

জন্ম : ১৯৩০ ফিরোজপুর, বরিশাল, বাংলাদেশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের এম, এ, পি, এইচ, ডি। রবীন্দ্রভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা। গ্রন্থ : প্রাচীনকাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, মধুসূদনের কবিমানস ও কাব্যশিল্প, নাট্যকার মধুসূদন, মধুবিচিত্রা, মধুসূদনের পত্রাবলী, বঙ্কিম উপন্যাসের শিল্পরীতি ইত্যাদি। ঠিকানা : ২১২/বি, বাঙ্গুর এভিনিউ, কলিকাতা ৫৫।

গোলাম সাকলায়েন ॥ বাউল গান লোকসঙ্গীত না তত্ত্বকথা? পৃ ২০১—২২১

জন্ম : ১৯২৮ মার্চ, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার উল্লাপাড়া গ্রাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম-এ এবং মর্সীয়া সাহিত্যের ওপর গবেষণা করে পি-এইচ-ডি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। গ্রন্থ : বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য, মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ফকীর গরীবুল্লাহ, পূর্ব-পাকিস্তানের সূফী-সাধক, সেখ ফজলল করিম, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান, অন্তরঙ্গ আলোকে ডক্টর শহীদুল্লাহ, হিটলারের বিচিত্রজীবন (অনুবাদ), প্রবন্ধ বিচিত্রা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কবি মোজাম্মেল হক ও ফেরদৌসী চরিত (সম্পাদনা)। ঠিকানা : ডবলিউ ১৭-বি, আবাসিক ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

গৌর পাল ॥ আমাদের নবজাগৃতি ও বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি, পৃ ৩২৮-৩৪৮

জন্ম : ১৯৩২, কলকাতা ; পৈত্রিক নিবাস যশোর বাংলাদেশ। মেদিনীপুর কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের লেখক। গ্রন্থ : ফিরে ফিরে (কবিতা)। ঠিকানা : শহীদ নগর, মেদিনীপুর।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ॥ লোকনাট্যের কাহিনী ও চরিত্র, পৃ ১৭৭—১৮৪

জন্ম: ১৯২১। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের রীডার। বিভিন্ন উপন্যাসে নাট্যরূপ প্রদান ও পরিচালনা, বিভিন্ন নাট্য সংস্থার সহিত জড়িত। নাটক ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন। গ্রন্থ: বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা (১৯৭২), বাঙলা ছন্দ (১৯৫৩)। ঠিকানা: ২৯, ব্রাইট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৭।

জাহ্নবী কুমার চক্রবর্ত্তী ॥ শিক্ষায় শিক্ষাধ্যায়ের স্থান, পৃ ৩৭৫—৩৮৮

জন্ম: ১২ই পৌষ ১৩২৩ ইং ২৬ নভেম্বর ১৯১৬ কুটরিয়া, কালিহাতি, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ। এম, এ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। গ্রন্থ: সাহিত্যদীপিকা, শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, গাথা সপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, বাংলা সাহিত্যে মা, হিরন্ময় পাত্র, ভারত সাবিত্রী, কুমারী কন্যা কাহিনী, নিরঞ্জনা নদীর ঢেউ, সূর্যগঙ্গার ঘাট, ঝড়ো হাওয়া, দেশবন্ধু। ঠিকানা: নারিকেল বাগান, পোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা।

তারাশিস মুখোপাধ্যায় ॥ মেদিনীপুর জেলায় শিবগাজনে বৈচিত্র্য, পৃ ২৫১—২৬৭

জন্ম: জানুয়ারী, ১৯৩৪, তমলুক। আমেরিকার মিচিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে এম, এ। মেদিনীপুর জেলার লোকধর্ম ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের একজন অনুরাগী গবেষক। এক সময়ে ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব সমীক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি দেশ-বিদেশের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখার প্রতিও বিশেষ উৎসাহী। ঠিকানা: এ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া, ৭ জওহর লাল নেহেরু রোড, কলিকাতা ১৩।

তুষার চট্টোপাধ্যায় ॥ মেদিনীপুরের ভীমপূজা ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা, পৃ ৫৬০—৫৭৮

জন্ম: আগষ্ট ৩১, ১৯৩৫। এম, এ. পি-এইচ ডি। লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞান ও বাংলার লোক সংস্কৃতি গবেষণার বিষয়। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। গ্রন্থ: ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি, (কবিতা) জানালা ও অন্যান্য কবিতা। প্রকাশিতব্য গ্রন্থ: **Study of some folk Godlings of Bengal,** লোক সংস্কৃতি ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। ঠিকানা: ১/বি, রাণী শংকরী লেন, কলিকাতা ২৬।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ॥ বিদ্যাসাগরের একটি রচনার ভাষা বিচার, পৃ ৪১—৫৮

জন্ম: অক্টোবর ১৯২১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ-ডি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের রীডার ও বাংলা বিভাগের ভাষাতত্ত্ব অধ্যাপক। গবেষণার বিষয়: **A Study on Social group words**

in the early **OIA Texts**। গবেষণা গ্রন্থটি প্রকাশের প্রতীক্ষায়। প্রকাশের অপেক্ষায় আরও কয়েকটি গ্রন্থ : ভাষাতত্ত্ব চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানিতত্ত্ব ও ইতিকথা। বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষাতত্ত্বের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে ইংরেজি ও বাংলা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে থাকেন। ঠিকানা : ১০৮, মাণিকতলা মেন রোড, ব্লক ১৪, ফ্ল্যাট ৩৯, কলিকাতা ৫৪।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ॥ পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্ব, পৃ ৩৮৯—৪১১

জন্ম : ১৯১৫, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম, এ। বিভিন্ন সরকারী কলেজে ৩০ বৎসরকাল অধ্যাপনা, বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং স্মারক-গ্রন্থে শতাধিক প্রবন্ধের লেখক, বর্তমানে সাহিত্যতত্ত্ব ও বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে গবেষণারত। গ্রন্থ : আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য, সাহিত্য ও শিল্পলোক, মোহিতলালের কাব্য-পরিক্রমা, রবীন্দ্র-মন ও রবীন্দ্র সাহিত্য, দ্বারকানাথ ঠাকুর (অনুবাদ)। ঠিকানা : 'স্বপ্ন', বি ১০/৫৮, লেক প্লেস, কল্যাণী, নদীয়া।

নরেশ গুহ ॥ বাংলা নাটকের আইরিশ প্রতিধ্বনি, পৃ ৫২৫—৫৪৩

জন্ম : ১৯২৪, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক। ফুলব্রাইট রকফেলার ফাউণ্ডেসনের বৃত্তি নিয়ে ইয়েটস ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে গবেষণা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পি, এইচ-ডি। 'কবিতা' পত্রিকার সহ-সম্পাদক, কবি হিসেবেও সুখ্যাত। গ্রন্থ : দুরন্ত দুপুর (কবিতা ১৯৫১), **W. B. Yeats—An Indian Approach**। ঠিকানা : ৫, সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা ২৯।

নিশিকান্ত মাইতি ॥ জীববিজ্ঞান চর্চার ইতিবৃত্ত ও বিন্যাস, পৃ ৪৯৫—৫০৫

জন্ম : এপ্রিল ২৬, ১৯৩৫ তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার এম, এস-সি। বর্তমানে মেদিনীপুরের রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা কলেজ ও খড়্গপুর কলেজে অধ্যাপনা। 'মেদিনীপুর' সাপ্তাহিক পত্রের অন্যতম সম্পাদক, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ মেদিনীপুর শাখার সম্পাদক ও জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার সহিত যুক্ত। ইউ, জি, সি-র একজন রিসার্চ স্কলার। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। ঠিকানা : রবীন্দ্রনগর, মেদিনীপুর।

নীহাররঞ্জন রায় ॥ ভূমিকা

জন্ম : জানুয়ারী ১৪, ১৯০৪, ময়মনসিং, বাংলাদেশ। এম, এ; পি-আর এস; ডি-লিট। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব বাগেশ্বরী অধ্যাপক বর্তমানে এমেরিটাস অধ্যাপক। অসংখ্য গ্রন্থের বিদগ্ধ লেখক। গ্রন্থ : রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), বাঙলার নদনদী, বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, **Brahmanical Gods in Burma, Maurya and Sunga Art, Theravada Buddhism in Burma, Indo-Burmese Art** প্রভৃতি। ঠিকানা : ৬৮।৪।১, পূর্ণদাস রোড, কলিকাতা ২৯।

প্রবোধকুমার ভৌমিক ॥ আদিবাসী ও মেদিনীপুর, পৃ ৪৫৭—৪৭৮

জন্ম : জানুয়ারী ১৯২৮ আমদাবাদ নন্দীগ্রাম থানা, মেদিনীপুর। শিক্ষা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিষয়ে এম, এস-সি, ডি-ফিল ডি, এস-সি। পেশা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক। গ্রন্থ : **The Lodhas of West Bengal, Socio Cultural Profile of Frontier Bengal, Ocupational Mobility & Caste Structure of West Bengal, Four Midnapur Villages,** সমাজ ও সম্প্রদায়, প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি, উপজাতির কথা, মেদিনীপুর কাহিনী, বাংলার লোক উৎসব, আমাদের মেদিনীপুর। **Institute of Social Research & Applied Anthropology**'র প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭১এ বিজ্ঞান কংগ্রেসের হীরক-জয়ন্তী অধিবেশনে নৃবিজ্ঞান শাখার সভাপতি। ঠিকানা : ৭২৭, লেক টাউন, পাতিপুকুর, কলিকাতা ৩৭।

প্রবোধচন্দ্র সেন ॥ শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণ পরিচয়, পৃ ১—৪০ ঘ

জন্ম : ১৫ বৈশাখ ১৩০৪, ২৭ এপ্রিল ১৮৯৭, ত্রিপুরা, বর্তমান কুমিল্লা জিলা বাংলাদেশ। এম, এ (প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। খুলনা দৌলতপুর কলেজে ইতিহাস ও বাংলার অধ্যাপক (১৯৩২-৪২), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক (১৯৪২-৬২), অতঃপর বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও রবীন্দ্র ভবনের অধ্যক্ষ (১৯৬২-৬৫) ; বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। অসংখ্য গ্রন্থের বিদগ্ধ লেখক। গ্রন্থ : ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ পরিক্রমা, ছন্দজিজ্ঞাসা, ভারতাত্মা কবি কালিদাস, ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি, ধর্মবিজয়ী অশোক, ধর্মপদ পরিচয়, ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত, বাংলার ইতিহাস সাধনা ইত্যাদি। সম্পাদনা : রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' (২য় সং)। ঠিকানা : 'রুচিরা', পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

বিষ্ণু বসু ॥ সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক ও বাঙলা নাটক, পৃ ২৮০—৩০০

জন্ম : ১৯৩৪, ঢাকা, বাংলাদেশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পি-এইচ ডি। মেদিনীপুর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। সাহিত্য বিশেষত নাট্যবিষয়ে পড়াশুনা করে থাকেন এবং পত্র-পত্রিকায় নাট্যবিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। গ্রন্থ : প্রৌঢ়প্রহর (নাটক), দশরূপক (অনুবাদ)। ঠিকানা : ১৬৭, বাঙ্গুর এভিনিউ, 'বি ব্লক' কলিকাতা ৫৫।

বীতশোক ভট্টাচার্য ॥ সে : রাবীন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব, পৃ ৪১২—৪২৬

জন্ম : এপ্রিল ১৯৫১, মেদিনীপুর শহর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ছাত্র। শিল্পে আগ্রহী। সাহিত্যপাঠ, অনুবাদ এবং রচনায় অভ্যস্ত। গ্রন্থ : তিনজন কবি (কবিতা)। ঠিকানা : বাসন্তীতলা, মেদিনীপুর।

ভবতোষ দত্ত ॥ বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ ৩৪৯—৩৭৪

জন্ম : ১৯২৬, ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার এম, এ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চতর শিক্ষা বিভাগে (সিনিয়র এডুকেশনাল

সারভিস) কুচবিহার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। গ্রন্থ : ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, কাব্যবাণী, বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, মোহিতলালের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ঠিকানা : পাটাকুড়া কুচবিহার।

মনিরুজ্জামান ॥ ঢাকাই উপভাষা : আদিয়াবাদ প্রত্যঞ্চল, পৃ ৪২৭—৪৫৬

জন্ম : ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, ঝিনাইদহ বাংলাদেশ। পৈত্রিক নিবাস আদিয়াবাদ ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার এম, এ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। 'নিসর্গ' পত্রিকার সম্পাদক। গ্রন্থ : পুরুষ পরম্পরা, (গল্প), ভাষা সমস্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি সন্ধান, নূরজাহান ও সাজাহান (সম্পাদন)। ঠিকানা : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মুহম্মদ আবুতালিব ॥ উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য, পৃ ১১৭—১৫৭

জন্ম : ১ এপ্রিল ১৯২৮, গোয়ালখালি, টাউনখালিসপুর, খুলনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের লোকশিক্ষা সংসদের সাহিত্য ভারতী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। গ্রন্থ : বাংলা সাহিত্যের ধারা—প্রাচীন ও মধ যুগ, বাংলা সাহিত্যের একটি হারানো ধারা, লালন শাহ ও লালন গীতিকা ১-২, লালন পরিচিতি, বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়, হজরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ) এর জীবনেতিহাস, ফকীর নেতা মজনু শাহ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মুনশী জমীরউদ্দীনের আত্মজীবনী (সম্পাদিত), উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রচারের গোড়ার কথা, লোক সাহিত্য, ছোটদের মাওলানা কারামত আলী, সাহারার ফুল, উত্তরবঙ্গে সাহিত্য-সাধনা, আলফা-বিটা-গ্রামা : লিপিতত্ত্ব ও পাঠ সমালোচনা, পুঁথি সাহিত্য সমীক্ষা, বাংলা সাহিত্যে কায়কোবাদ, কবি গোলাম হোসেন জীবন ও সাহিত্যকথা, History of Rangpur, Lalan Shah, the mystic। ঠিকানা : ৭১-বি, আবাসিক এলাকা (পশ্চিম), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

নৃপেন মুখোপাধ্যায় ॥ প্রচ্ছদ

জন্ম : জুলাই ১৯৩০, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। সরকারী চারু-কারু মহাবিদ্যালয়ের ফলিত চিত্রশিল্পে ডিপ্লোমা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগে অঙ্কনশিল্পীর পদে কর্মরত।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ উনিশ শতকের মননচর্চা ও বঙ্গদর্শন, পৃ ২৩৩—২৫০

জন্ম : ১৯৩১, কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম, এ ও ডি-ফিল। মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মননশীল প্রবন্ধ লেখেন। গ্রন্থ : উপন্যাস প্রসঙ্গে। ঠিকানা : ২৭, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৫।

রাজ্যেশ্বর মিত্র ॥ শিক্ষা পরিকল্পনায় সঙ্গীত, পৃ ১৮৫—১৯১

জন্ম : ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭, আগরতলা ত্রিপুরা। পৈত্রিক নিবাস চব্বিশপরগণার পানিহাটি। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থায় কর্মরত এবং 'শার্ঙ্গদেব' ছদ্মনামে 'দেশ' সাপ্তাহিকে সঙ্গীত সমালোচনায় নিযুক্ত। গ্রন্থ : বাংলার সঙ্গীত, বাংলার গীতিকার, মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা, সঙ্গীত সমীক্ষা। ঠিকানা : ২/৭ এ, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৫॥

শ্যামাপ্রসাদ বসু ॥ বাংলার ওয়েষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উত্থান ও পতন : একটি বৃটিশ চক্রান্তের ইতিহাস, পৃ, ৫০৬—৫১৪

জন্ম : ১৯৩৪, তমলুক, মেদিনীপুর জেলা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম, এ। কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও অধ্যাপনা, বর্তমানে খড়্গপুর কলেজে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড, নন্দন, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি পত্রিকায় ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধাদি লেখেন। গ্রন্থ : মধ্যযুগে ভারত, **Rise & Fall of Khilji Imperialism, The Tughluqs! Years of Experiments**। ঠিকানা : তালপুকুর লেন, বল্লভপুর, মেদিনীপুর শহর॥

সুখময় মুখোপাধ্যায় ॥ পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালী রাজপণ্ডিত, পৃ ৭৭—৮৩

জন্ম : কলকাতায়। ১৯৫২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় (বাংলা) এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৩ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের গবেষকের পদ লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং বাঙলার ইতিহাস এই তিন বিষয়েই গ্রন্থরচনা করেছেন। প্রধান প্রধান গ্রন্থের নাম : বাংলার নাথ সাহিত্যে, রাজা গণেশের আমল, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, কৃত্তিবাস পরিচয়, বাংলায় ইতিহাসের দু'শো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ), রবীন্দ্র সাহিত্যের নবরাগ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্বিপ্রহর। এছাড়া ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাঙলাদেশের ইতিহাসে'র দ্বিতীয় খণ্ডের অর্ধাংশ ও তৃতীয় খণ্ডের কিয়দংশ রচনা করেছেন এবং পরলোকগত ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের সঙ্গে যুগ্মভাবে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল (এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত) সম্পাদনা করেছেন। ঠিকানা : পোঃ শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পশ্চিমবংগ॥

সুধীর করণ ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গোপীবল্লভপুর, পৃ ১৭০—১৭৬

জন্ম : ১৯২৪, মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার সীমান্তে অবস্থিত সিংভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ধলভূম পরগণার পূর্বাঞ্চলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এম, এ, ডি ফিল। এশিয়াটিক সোসাইটির বৃত্তিলাভ করে মেদিনীপুরের ভাষা সম্পর্কে

গবেষণা করেছেন। বর্তমানে সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ। গ্রন্থ রক্তঊষা, মধ্যাম শতক (কবিতা), রুকমিনি বিবি, অরণ্য পুরুষ (গল্প), সীমান্ত বাংলার লোকযান, লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্যে ঈশপ। ঠিকানা : সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।

সুধীর চক্রবর্তী ॥ বাংলার লোকধর্ম ও লোকসঙ্গীত, পৃ ৪৭৯—৪৯৪

জন্ম : ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪,শিবপুর,হাওড়া। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এম, এ, পি, এইচ-ডি। কৃষ্ণনগর কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। সম্পাদিত গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প। ঠিকানা : জে, এন, চ্যাটার্জী লেন, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র ॥ হিন্দু কলেজ : ডিরোজিয়ো : আধুনিকতা, পৃ ৫৭৯—৬২৪

জন্ম : ১৯২২, বিশই সাওরাইল, ফরিদপুর বাংলাদেশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পি-এইচ ডি। কর্মজীবনের প্রথম দশ বছর সাংবাদিকতা পরবর্তী বিশ বছর অধ্যাপনায় রত। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। ডিরোজিয়ো ও মধুসূদন দত্তের ওপর গবেষণায় নিযুক্ত। গ্রন্থ : বাংলা কবিতার নবজন্ম, বাংলা নাটকের বিবর্তন। ঠিকানা : 'মৈত্রেয়ী', ২৯/১/জি, হরেকেষ্ট শেঠ লেন, কলিকাতা ৫০।

সুহৃদকুমার ভৌমিক ॥ বাংলায় মৌল সাহিত্য, পৃ ২২২—২৩২

জন্ম : ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮, আমদাবাদ, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর। শিক্ষা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী ভাষাসহ তুলনামূলক সাহিত্যে এম, এ, ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম, এ। পেশা : উলুবেড়িয়া মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। 'হারিয়াড় সাকাম' (সবুজ পত্র) সাঁওতালী পত্রিকার সম্পাদক। লোক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ওপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ঠিকানা : পোঃ মেচেদা, মেদিনীপুর।

সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র ॥ নিউক্লীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের রূপরেখা, পৃ ১৯২—২০০

জন্ম : ১ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, মেদিনীপুর জেলার সাউটিয়া গ্রাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে এম, এস-সি,ডি-ফিল ডিগ্রী, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও মোয়াট স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। লেখকের পরীক্ষামূলক ও তাত্ত্বিক গবেষণার ফল দেশী ও বিদেশী বহু পত্রিকায় প্রকাশিত। বর্তমানে কলকাতার সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর সহযোগী অধ্যাপক। বাংলায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের লেখক। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। ঠিকানা : ৮বি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা ১৩।

হিমাংশুভূষণ সরকার ॥ দ্বীপময় ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বাঙালীর অবদান, পৃ ৮৪—১০২

জন্ম : ১৯০৫ জুলাই, বস্তাপ্রসাদ, মাণিকগঞ্জ মহকুমা, ঢাকা, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর এম. এ। আজীবন অধ্যাপনা, বর্তমানে সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের রেক্টর। প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানে ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতে বহু দেশ পর্যটন। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। গ্রন্থ : দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, **Ramesh Chandra Felicitation Volume (Edited)** প্রভৃতি।
ঠিকানা : রবীন্দ্রপল্লী, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গ সাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমিষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গ ভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি ;
ভারতীর পূজা তরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির রচনা উপলক্ষ্যে লিখিত, ২৪ ভাদ্র ১৩৪৫]

৬৬৮/১১০০/৮৯১'৪৪৪